মৌচাক

[ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র]

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

৩২শ বর্ষ, ১৩৫৮

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি
শিল্পী : কারপেচিও

বৈশাখ—১৩৫৮

৩২শ বর্ষ—১ম সংখ্যা

নতুন বছর

শ্রীঅজিত দত্ত

*

ঝমরু, তুমি বলতে পারো
কাল থেকে আজ তফাৎ কী?
আকাশ থেকে আজকে ভোরে
ঝরলো সোনা হঠাৎ কি?
বাতাস কি আজ বড্ড মিঠে
আকাশ কি আজ বেজায় নীল?
কালকে থেকে আজকে দিনের
কেমন ক'রে হয় অমিল?
এমনিতরো দিনটা ছিল,
এমনি ছিল আকাশ কাল,
কিন্তু তবু তফাৎ কিসে?
—আজ থেকে যে নতুন সাল।

নতুন বছর যায় না চেনা
রোদ কি হাওয়ার গুণ দেখে,
যায় না বলা নতুন সালে
ফুর্তি আসে কোত্থেকে।
আসল কথা, নতুন বছর
মনের মধ্যে দেয় হানা,
মন ভরে যায় আশার আলোয়
তাই সে নতুন যায় জানা।
মনের মধ্যে জমাট বাঁধে
মিষ্টি যত কল্পনা,
হয়তো ভাবো, জন্মদিনে
ফুর্তি হবে অল্প না।
পরীক্ষাতে প্রথম হয়ে
প্রাইজ পাওয়া এক গাদা,
নতুন জামা নতুন পুতুল
নতুন মজায় সুর সাধা।
কতই মজার মিষ্টি কথা
ভাবছো তুমি মন ভরে,
ভাবছি আমি, জাগছে আরো
হাজার লোকের অন্তরে।
নতুন সুরে নতুন রঙে
মন ছেয়ে যায় এই দিনে,
তাইতে বুঝি তফাৎ কিসে,
নতুন বছর নেই চিনে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের একালে ডাইনী নাই। ডাকিনী নাই। মায়াবিনী নাই।

সে হিসেবে একালের ছেলেরা ভাগ্যবান।

আমাদের আমলে, মানে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে ডাইনী ছিল। ডাইনী, ডাকিনী, মায়াবিনী। একালের ছেলেরা ডাইনী ডাকিনীর কথা শুনে হেসে উঠবে। কিন্তু সে আমলে আমাদের অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যেত এদের নামে।

আমাদের গ্রামে আমাদেরই বাইরের বাড়ীর পূর্বপ্রান্তে বড় একটা পুকুর, বড় বড় তালগাছে ঘেরা। তার উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনীর ঘর।

একেবারে গ্রামের প্রান্ত। একপাশে জেলে-পাড়া—অন্য পাশে বাউরীপাড়া—মাঝখানে খানিকটা খালি জায়গা। সেই খালি জায়গায় একটা অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছতলায় ছোট একখানি ঘর। তারপর, অর্থাৎ স্বর্ণের বাড়ীর পর পূর্বদিকে আর বসতি নাই, প্রান্তর চলে গিয়েছে। বালি আর লালচে মাটির প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যে লালুকচাঁদা নামে পুকুরটা ছিল গ্রামের শ্মশান, এখানে অবশ্য শবদাহ করা হ'ত না, মুখাগ্নি করা হ'ত। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকত—মড়ার বিছানা মাদুর, বালিশ ন্যাকড়া বাঁশ, মাটির সরা ভাঁড় আধ-পোড়া কুঁচি-কাঠি। পুকুরটার উপরে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। দিনের বেলাতেও কেউ সে গাছতলায় যেত না। রাত্রে সেটা জমাট অন্ধকারের মত থমথম করত।

স্বর্ণ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকত—সেই বটগাছটার দিকে।

আমরা তাই ভাবতাম।

নইলে—প্রান্তরটা যেখানে শেষ হয়েছে—সেখানেই সুরু হয়েছে ধানের ক্ষেত। সবুজ শস্যক্ষেত্র। কিন্তু ডাইনী কি সবুজ ভালবাসে? না—বাসতে পারে?

স্বর্ণ ডাইনী। আমাদের দেশের ভাষায় 'স্বনা ডান'।

শুকনো কাঠির মত চেহারা, শক্ত দু'পাটি দাঁত, একটু কুঁজো, মাথায় একমাথা কাঁচাপাকা চুল। চোখ দুটো নরুণে-চেরা চোখের মত ছোট। তাতে খয়েরী রঙের তারা। বিচিত্র স্থির দৃষ্টি। ভাবলেশহীন শুষ্ক—যেন খটখট করত দুটো হলদে পাথর ওই শুকনো ডাঙার বুকে। ডাইনীর দৃষ্টি!

এই দৃষ্টিতে ডাইনীরা কচি নধর দেহের, সুন্দর সুশ্রী মানুষের, তরুণী নববধূর দেহের অস্থি চর্ম মেদ মাংস ভেদ করে—ভিতরে প্রবেশ করে—খুঁজত প্রাণপুতলী। তাকে পেলে চুষে চুষে তারা খেয়ে ফেলে। নধর মানুষ শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে যায়, সোনার মত দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়; তরুণী নববধূর সব লাবণ্য ঝরে পড়ে; শুধু মানুষ কেন কচি পাতায় ভরা লকলকে সতেজ গাছ অকস্মাৎ শুকিয়ে যায়। ডাইনীরা তারও সরস প্রাণটুকু দৃষ্টিযোগে পান করে নেয় নিঃশেষে।

শুষ্ক গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তালগাছের মাথায় চিল চ্যাঁচায়—চি-ই-ই-লো! চি-ই-ই-লো, চি-ই-ই-লো!

কান পেতে শুনলে শুনতে পাওয়া যায়—ঘরের দাওয়ায় বসে ডাইনী তার সুরে সুর মিলিয়ে সঙ্গীত গাইছে—অনুনাসিক মিহি সুরে গাইছে—হিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-হুঁ। হিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-হুঁ!

রাত্রে—গভীর রাত্রে স্বর্ণ ডাইনীর ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায়—শব্দ উঠছে—হুট-পাট্, হুট-পাট, হুট-পাট।

বাট বইছে স্বর্ণ। যারা ডাইনী তারা ভগবানের অভিশম্পাতে রাত্রে মাটির উপর বুকে হেঁটে বেড়ায়। বাট বয়।

ভয় হয় না এর পর?

* * * *

স্বর্ণ তরিতরকারি বেচে বেড়াত। ওই ছিল তার জীবিকা। তিন চার ক্রোশ দূরের হাট থেকে কিনে আনত, বেচত আশপাশের গ্রামে। পান, কাঁচকলা ,পাকারম্ভা, শাক, কুমড়ো এইসব। আমাদের গ্রামে সে বেচত না। আশপাশের গ্রামেই বেচত। গ্রামের কারও বাড়ীতে ঢুকতে সে চাইত না। কি জানি—কার অনিষ্ট সে কখন ক'রে বসবে! তার ভিতর যে লোভটা আছে, সে যখন লক-লক ক'রে জিভ বার করে—তখন তো স্বর্ণের বারণ শুনবে না। কিন্তু স্বর্ণ যে লজ্জায় মরে যাবে! ছি-ছি-ছি! ওর ভিতরের ডাইনীটা তো ওর অধীন নয়! সেই তো ওর জীবনের মালিক, তারই হুকুমে ওকে চলতে হয়। তার হুকুম ছাড়া ওর মরবারও অধিকার নেই। তার ভিতরের যে ডাইনীটা—সে যে এক সিদ্ধ-বিদ্যা, তাকে কোন নূতন মানুষকে না-দেওয়া পর্যন্ত স্বর্ণ মরবে না।

স্বর্ণের মাসী কি কে যেন ছিল ডাইনী।

মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজনদের খবর পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেউ যায় নি। ভয়ে যায় নি, যদি সে কোন কৌশলে তাকে দিয়ে যায় ওই সর্বনাশা ভয়ঙ্কর বিদ্যা! সে যে ডাইনী হয়ে যাবে।

মৃত্যুর পর স্বর্ণ গেল। নিশ্চিত হয়েই গেল। বিদ্যা সে তো কাউকে দিয়ে গিয়েছে। নইলে মরণ হ'ল কেমন করে? গিয়ে দেখলে—তখন মাসীর অনেক আত্মীয় এসেছে, মাসীর যা ছিল ভাগ ক'রে নিয়েছে। সকলে চলে গেল। বিধবা তরুণী স্বর্ণ বসে রইল দাওয়ার উপর। তার যেমন অদৃষ্ট!

হঠাৎ ম্যাও ম্যাও শব্দ করে মাসীর পোষা বেড়ালটি তার গা ঘেঁষে বসল। ওটাকেই কেউ নিয়ে যায় নি। বেড়ালটা তার গায়ে গা ঘষলে, গর গর শব্দ করলে, লেজটা উঁচু করে তার নাকে মুখে ঠেকিয়ে দিলে। যেন বললে—আমাকে তুমি নিয়ে চল। তুমি কিছুই পাও নি, আমাকেও কেউ নেয় নি।

স্বর্ণের মায়া হ'ল। নিয়ে এল বেড়ালটা। মাছ ভাত দুধ খাওয়ায়, কোলের কাছে নিয়ে শোয়। পাশের জেলে পাড়ায় যায়, বাউরী পাড়ায় যায়।

সে দিন হইচই উঠল জেলে পাড়ায়।

জেলেদের একটা কচি ছেলের কি হয়েছে। ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে, আর কাঁদছে,—কাদছে যেন বেড়ালের মত আওয়াজ ক'রে!—এ্যাঁ-ও। অবিকল বেড়ালের শব্দ।

গুণীন এল। গুণীন দেখে বললে—ডাইনীর কাজ! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—ডাইনটা মনে হচ্ছে—

বলতে হ'ল না শেষটা—স্বর্ণের বেড়ালটা ছুটে এল উঠনে, রোঁয়া ফুলিয়ে লেজ ফুলিয়ে—এ্যাঁ—ও শব্দ করে থাবা পেতে বসল।

—এই। এই তো বেড়ালটা, এইটাই ডাইন।

—বেড়াল ডাইন?

—হ্যাঁ। কোন ডাইন মরবার সময় ওকে দিয়ে গেছে ডাইনী বিদ্যে।

—ঠিক কথা। স্বর্ণের মাসী ছিল ডাইনী। বেড়াল তো তারই! কি সর্বনাশ!

একটা জোয়ান জেলের ছেলে—দুরন্ত ক্রোধে—বসিয়ে দিলে এক লাঠি তার মাথার উপর। মাথাটা প্রায় চুর হয়ে গেল। কিন্তু তবু মরল না। লেজ পাছড়াতে লাগল, নখগুলো বের করে মাটির উপর আঁচড়াতে লাগল।

গুণীন বললে—সাবধান। কেউ কাছে যাবে না। ও এখন ডাইন মন্ত্রটি দেবার চেষ্টা করবে। নইলে ওর মৃত্যু হবে না।

সে মন্ত্র পড়লে, নিজের অঙ্গবন্ধন করলে—তারপর সন্তর্পণে লেজে ধরে—বের ক'রে ফেলে দিয়ে এল গ্রামের প্রান্তে।

স্বর্ণ ঘরে বসে সভয়ে কেঁপে উঠল।

লোকে তাকে গাল দিয়ে গেল। কেন এনেছিল সে ওই পাপকে।

সন্ধ্যের মুখে ক'টি ছেলে পথ দিয়ে গেল—তারা ব'লে গেল—বেড়ালটা এখনও মরে নি। ইঃ—কি গোঙাচ্ছে; বাপরে! শিউরে উঠল তারা।

স্বর্ণ গেল চুপি চুপি। না-দেখে থাকতে পারলে না।

সাদা দুধের মত বেড়ালটার রঙ—রক্তে-ধূলোয় পিঙ্গল হয়ে গেছে।—কি যন্ত্রণা-কাতর শব্দ!

স্বর্ণ এগিয়ে গেল—দু-পা, এক-পা ক'রে।

তাকে স্পর্শ করলে।

বেড়ালটা মরে গেল।

স্বর্ণের এ কি হ'ল?

স্বর্ণের চোখে এ কি দৃষ্টি! এ কি হ'ল তার? এ সব সে কি দেখছে? ওই যে গর্ভবতী ছাগলটা যাচ্ছে—তার গর্ভের মধ্যে দুটি ছাগল ছানাকে দেখতে পাচ্ছে। ওই যে কলা গাছটা—ওর ভেতর দেখতে পাচ্ছে—কলার মোচা!

তার জিভ সরস হয়ে উঠছে! লক লক করে উঠছে!

একি হ'ল তার? হে ভগবান!

* * *

এমনি ক'রে নাকি স্বর্ণ হয়েছিল ডাইনী।

সে আবার কাউকে ডাইনী বিদ্যে দেবে—তবে তার মরণ হবে। নইলে ওই মাথা-ভাঙা বেড়ালটার মত কাতরাবে, কাতরাবে, কাতরাবে—তবু তার মৃত্যু হবে না।

মৃত্যু চোখের সামনে বসে থাকবে।

ও বলবে—আমাকে নাও গো! আমাকে নাও।

মৃত্যু বলবে—কি ক'রে নেব? ওই বিদ্যে তুই আগে কাউকে দে—তবে নেব। নইলে তো পারব না! স্বর্ণের হাত নাই তার ভিতরের ডাইনীর উপর। সে কি গ্রামের কারুর বাড়ী যেতে পারে? বাপরে!

আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমি বলতাম—স্বর্ণ পিসী।

ছেলেবেলায় কখনও তার সামনে যেতে সাহস হ'ত না। বড় হবার পর ওপথে গিয়েছি এসেছি; নিজের ঘরের আধো-অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। চুপ ক'রে বসে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে—তাড়াতাড়ি দু'একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত।

আমার বিশ বাইশ বছর বয়স যখন হ'ল, তখন আমি তার বেদনা বুঝলাম। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেও সে বিশ্বাস করত—সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ ক'রে সে মনে মনে শিউরে উঠত। কাউকে চোখে দেখে ভাল লাগলে চোখ বন্ধ করত; চোখের ভাল লাগার অবাধ্যতাকে তিরস্কার করত। তার আশঙ্কা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে;—হয়ত বা খেয়ে ফেলেছে বলে শিউরেও উঠত। মনে হ'ত ডাইনীমন্ত্র-বিষাক্ত তার ভালবাসা—লোভ হয়ে তীরের মত গিয়ে তাকে বিঁধে ফেলেছে তার হৃৎপিণ্ডে।

ডাইনীতে আজ আর বিশ্বাস করি না। এ-কালের ছেলেরাও করে না। কিন্তু স্বর্ণ ডাইনীর ডাইনীত্বের একটি বিচিত্র পরিচয় আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই কথাটি বলব।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। কিন্তু ঘটনাটি আজও মনে হয় এই ক'দিন আগের দেখা ঘটনা। হঠাৎ শুনলাম—ও-পাড়ার অবিনাশ দাদাকে স্বর্ণ ডাইন খেয়েছে। অর্থাৎ ডাইনে নজর দিয়ে—দৃষ্টিবানে বিদ্ধ করেছে, তার ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাকে শুষে খাচ্ছে। গ্রামটা একেবারে তোলপাড় ক'রে উঠল। বিখ্যাত গুণীন ছিলেন আমাদেরই বাড়ীতে। আমার বাবা গ্রামের বাইরে বাগানে তারা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেইখানে থাকতেন—এক সন্ন্যাসী, পশ্চিম দেশীয় সাধু। আমি তাঁকে বলতাম গোঁসাইবাবা; অর্থাৎ গোস্বামী বাবা। তিনি জানতেন অনেক বিদ্যা। তাঁকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি এলেন; আমি তাঁরই সঙ্গে গেলাম, স্বর্ণ ডাইনের কীর্তি দেখতে এবং গোঁসাইবাবার ডাইন তাড়ানো দেখতে।

অবিনাশ দাদা, অবিনাশ মুখুজ্জের বয়স তখন সতের আঠারো। বাড়ীতে আছে মা আর দুই বোন। অবিনাশ দাদার মা—গোঁসাইবাবাকে বলেন গোঁসাই দাদা। অবিনাশ দাদা বলেন—গোঁসাই মামা। অবিনাশ দাদার বাড়ী তখন লোকে লোকারণ্য; স্বর্ণ ডাইন অবিনাশকে খেয়েছে, রামজী সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠার উপরে অবিনাশ দাদা শুয়ে আছেন চোখ বন্ধ। প্রবল জ্বর। ডাকলে সাড়া নাই। মাথার শিয়রে বসে মা। পাশে বসে বোন। চোখের জল ফেলেছেন। রামজী সাধু গিয়ে একপাশে বসলেন—তার পাশেই আমি।

ডাকলেন—ভাগ্না। অবিনাশ ভাগ্না।

কোন উত্তর দিলেন না অবিনাশ দাদা।

—অবিনাশ! এ! গায়ে নাড়া দিলেন।

এবার অবিনাশ ঘুরে শুল। বললে—মর হা' ঘ'রে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে। আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন?

—হুঁ! তু কৌন? মেয়েছেলে? কে রে তু?

অবিনাশ উত্তর দিল না।

—এ! তু কে রে? এ?

—বলব না।

—বলবি না।

—না।

মন্ত্র-পড়া সুরু হ'ল। বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র পড়েন আর ফুঁ দেন—ছু! ছু! ছু!

পরিত্রাহি চীৎকার করে অবিনাশ।—বলছি, বলছি, বলছি!

তবু মন্ত্র-পড়া চলল, সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকার।—ছু! ছু! ছু!

—বাবারে, মারে! মরে গেলামরে! ও গোঁসাই আর মেরো না! বলছি আমি বলছি!

—বোল! বোল তু কে? বোল!

—আমি স্বর্ণ!

আজও স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি।—আমি স্বর্ণ! চোখে সব দেখতে পাচ্ছি! থাক সে কথা!

গোঁসাই প্রশ্ন করলেন—স্বর্ণ? তু কাহে হিঁয়া? আঁ? এখানে কাহে?

—আমি একে খেয়েছি যে।

—হাঁ—হাঁ। উ তো জানছি। ওহি তো শুধাচ্ছি—কাহে—কাহে খেলি?

—কি করব? আমার ঘরের ছামনে দিয়ে এই বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে? কাহে বললি না—হামাকে দাও?

—কি করে বলব? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা। ভাগ্।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে বোল না।

আদেশের স্বরে গোঁসাই বললেন—যা তু। হামি বলছে।

—না। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না? আচ্ছা। এ দিদি, আন সর্ষা।

সরষে এল। হাতের মুঠায় সরষা নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র প'ড়ে—ছুঁ শব্দে ফু দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশদাদার গায়ে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা—বাবারে, মারে, ওরে মেরে ফেললে রে! ওরে বাবারে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না। আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ, যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশ কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না? চালাকি লাগাইয়েছিস, আঁ? হাত তুললেন রামজী সাধু, মারবেন ছিটে। অবিনাশ চীৎকার করলে আবার—না না। যাব, যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

—তব্ এক কাম কর্। ঘরের বাহারে একঠো কলসীমে জল আছে, দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জ্বরে অচেতন অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজীবাবাব বললেন—না। ঘর থেকে অবিনাশ বের হ'ল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দোতালার

[শেষ অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়]

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

'না, জনার্দন, তুমি যদি আবার ভূতের গল্প সুরু করো তা'হলে আমি চল্লুম—'

এই বলে তার কুশান্-চেয়ারটায় আরো আরামে আমি চেপে বস্‌লাম।

'না, ভূতের গল্প নয়।' মলিন হাসি হাসলো জনার্দন।—'ভূতের গল্প বলিনি।'

অনেকদিন বাদে বেড়াতে গেছি জনার্দনের বাড়ি—অনেক ভরসা নিয়ে। জনার্দন ভারতীয় খৃষ্টান, আর ভারী বড়োলোক। তাদের বাড়ি গেলে খাওয়ায় খুব।

ভালোমন্দ খাবার সখ চাগ্‌লে খৃষ্টান কিম্বা মুসলমান বন্ধুর বাড়িই বেছে নিতে হয়। কেননা মুর্গির ঠ্যাং ট্যাং নিখরচায় আর কোথায় মেলে? ভট্টাচার্য কি আরেক চকর্‌বর্‌তির বাড়িতে গেলে তো তা মিলবে না। চকর্‌বর্‌তিদের কথা বলাই বাহুল্য! তারা সজ্ঞানে কখনোই অপর কাউকে খাওয়ায় না, ভুলেও না—মুর্গি তো দূরে থাক, মুড়কিও নয়। নিতান্তই যদি চোর হয়ে তাদের রান্নাঘরে ঢোকো, তা'হলে এঁচোড় খেয়ে ছ্যাঁচোর হয়ে ফিরতে হবে।

অনেক দিন ভালোমন্দ কিছু পেটে পড়েনি, তাই জনার্দনের কথা মনে হোলো হঠাৎ। ভোজনেচ জনার্দন! স্মরণ করার সাথে সাথেই তার বাড়িতে আমার শ্রীচরণ পড়লো।

বাড়িতে তার কেউ ছিল না তখন। বোধ হয় সিনেমায় কি আর কোথাও গেছে। জনার্দন একাই বসে ছিলো ড্রইং রুম্ আলো করে। একটু ম্লান মুখেই যেন।

আমি গিয়ে বসেছি, বসে বসে, তার সঙ্গে ডিনারে যোগ দেয়ার কথাটা কি করে পাড়া যায় ভাবছি মনে মনে—সে বললে, 'চকর্‌বর্‌তি, তুমি ভূত দেখেছো কখনো?'

'না না, ভূতের কথা নয়। ওসব কথা পাড়লে আমি উঠে যাবো—' বাধা দিই আমি।

ভূতে আমার ভীষণ ভয়। চোখে কখনো দেখিনি বটে, কিন্তু ভূতে আমি বিশ্বাস করি। এবং ভূতদের কখনো বিশ্বাস করি না। তারা খুন করতে পারে। তাদের সাত-খুন মাপ।

ভূতরা ভারী মারাত্মক, আমার মতে।

'না না, আমি ভূতের কথা পাড়ছিনে,' সে বললে: 'কিছুক্ষণ আগে সাদা একটা ছায়ার মতন কী দেখলাম না, সেই কথাই বলছিলাম। সেটা যে ভূত, তা আমি বলছিনে—'

'তাই বলো।' আমি বলি—ব'লে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি: 'বলো তা'হলে।'

'আজ বিকেলে কেন জানিনে ভাই, বাবার কবরটা দেখবার একবার সাধ হোলো...' সুরু করলো জনার্দন: 'জানো তো আমরা খৃষ্টান? মরলে আমাদের পোড়ায় না, গোর দেয়। তোমাদের যেমন নিমতলায় গতি, আমাদের তেমনি গোরস্থানে নিয়ে যায়...'

'জানি জানি। কাবার হলেই তোমাদের কবর হয়—কে না জানে?' আমি বলে উঠি। খাবারে যোগ দিতে এসে কবরের খবরটা একটুও ভালো লাগে না। আর সত্যি বলতে, আমাদের নিমতলার রাস্তাটা নিমের মতই তেতো লাগতে থাকে আমার।

'...গেছি আজ গোরস্থানে। ইটিলির গোরস্থান। সেইখানেই আমার বাবাকে...' জনার্দন বলে চলে—'সন্ধ্যে হয় হয়, রোদ পড়ে এসেছে তখন। এই একটু আগেই তো! গেট পেরিয়ে একটু এগুতেই অদূরে সাদা ছায়া-মূর্তির মতন কী যেন একটা চোখে পড়লো... দেখেই-না একটা কবরের পাথরের আড়ালে আমি গা-ঢাকা দিয়েছি...'

'সাদা ছায়া-মূর্তির মতন? তার মানে?' আমি জানতে চাইলাম।

কথাটা সে কানে তোলে না, আপন মনেই বলতে থাকে—'গা-ঢাকা দিয়ে দেখছি ছায়া-মূর্তিটা কী করে! নড়ে-চড়ে কিনা। কিন্তু না, তার নড়বার নামটি নেই...'

'কিন্তু সেই মূর্তিটা...সেটা কী?' আমার প্রশ্নবাণ আবার।

'আমি ভালো করে লুকোলাম পাথরটার আড়ালে, যাতে সেই ছায়া-মূর্তিটা আমাকে না দেখতে পায়...চৌকো এবং বেশ উঁচু—মাথার দিকটা গোল...'

'সেই ছায়া-মূর্তির?'

'না না, সেই কবরের মাথার পাথরটার কথাই বলছি—যার আড়ালে আমি লুকিয়েছিলাম...'

'ঠাণ্ডা জল দাওতো এক গেলাস।' আমি বল্লাম।

'গড়িয়ে খাও।' বলে সে কুঁজো দেখিয়ে দিলে।

বেশ বড়ো এক গেলাস জল গড়িয়ে আনলাম। রাখলাম আমার সামনে, টিপয়ে।

এমনিতেই আমার জলতেষ্টা অগাধ, তারওপরে গোরস্থানের গল্প শুনে গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে এসেছিলো।

'তারপর···লুকিয়েই রয়েছি আমি···প্রায় মিনিট পাঁচেক হবে···পাথরটার পাশ দিয়ে মাথা বাড়ালাম···উঁকি মারলাম এক ধার দিয়ে···দেখলাম মূর্তিটা তখনো ঠিক সেইখানে··· সেইরকম দাঁড়িয়ে···ঠায়···'

'কবরের মাথার পাথরটা ?'

'না না, সেই সাদা মূর্তি।···তারপর মনে হোলো মূর্তিটা যেন নড়লো···আসতে লাগলো আমার দিকে···আবার আমি গা-ঢাকা দিলাম পাথরটার আড়ালে।···ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেছি তখন···'

'কাঠ হবার কথাই।' বলে আমি কাষ্ঠ-হাসি হেসে আরেক ঢোঁক জল খেলাম।

'আরো মিনিট পাঁচ কাটলো। কিন্তু আসতে দেখলাম না কাউকে। তখন সাহস করে আবার আমি উঁকি মারলাম···দেখলাম, সেই সাদা মূর্তিটা···সেইখানে দাঁড়িয়ে···'

'কোন্‌খানে ?'

'একটা গাছের সামনে—ঠিক সাম্‌নেটায়···'

'কি রকম দেখতে ?'

'সেই গাছটা ?' জনার্দন জিগেস করে।

'না না, তোমার সেই সাদা মূর্তি ?' আমার সিধে জবাব।

'প্রাচীন কালের পাদ্‌রিদের মতন···অবিকল! সেইরকম ঢিলেঢালা সাদা পোষাক পরনে···ধব্‌ধবে সাদা···তারপর সমস্তই আমার চোখে পড়লো···তার মুখ···চোখ···হাত পা··· যেমন সে-যুগের পাদ্‌রিদের চেহারা ছবিতে দেখেছি···চার শো বছর আগেকার পাদ্‌রি···'

'বললাম না তোমায় যে ভূতের গল্প বোলো না আমায় ?' আমি ককিয়ে উঠি : 'ভারী ভয় খাই আমি। আমার হার্ট উইক। হার্ট ট্রাবল্ আছে তার ওপর।'

'না, ভূত নয় সে।' জনার্দন জানালো। বেশ দৃঢ়স্বরেই বলল : 'ভূত কখনোই নয় সে।'

'ভূত নয় ?'

'না, একদম্ না। একটা পাদ্‌রি···বল্‌ছিতো···'

'তাই বলো।' আমি হাঁফ ছাড়লাম।

'কিন্তু এদিকে আমি ঘেমে নেয়ে উঠেছি···সেই পাদ্‌রিকে দেখেই···চেঁচিয়ে উঠবো, কি দৌড় লাগাবো ঠিক পাচ্ছিনে···কে যেন ইস্ক্রুপ দিয়ে আমাকে এঁটে দিয়েছে মাটির সঙ্গে··· নড়বার আমার শক্তি নেই···একচুলও না···ওঃ সে যে কী ভয়ানক অবস্থা !···'

জনার্দন ঢোঁক গেলে।

'...তারপর চলতে শুরু করলো পাদ্‌রিটা মেরী মাতার কৃপায়, চলে গেল সেখান থেকে... দূরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল...তারপর ইস্ক্রুপ্‌গুলো আল্‌গা হলে...'

'কিসের ইস্ক্রুপ ?' আমি জিজ্ঞাস করি।

'বল্‌লাম কি চৈতন ?' সে বলে : 'সেই ইস্ক্রুপ্‌ যা মাটির সঙ্গে আমাকে এঁটে রেখেছিলো...'

'ও!' আমাকে আরেক ঢোঁক্ জল খেতে হোলো।

আমি তখন...পাদ্‌রিটা যেদিকে গিয়েছিলো সেইদিকে যেতে লাগ্‌লাম...কেন জানিনা, কে যেন তার দিকে টেনে নিয়ে চললো আমায়...তাকে ফলো করে চলেছি এমন সময়ে হঠাৎ তাকে দেখতে পেলাম আবার...দূরে আর একটা কবরের কাছে দাঁড়িয়ে...মনে হোলো যেন কবরটা ফুঁড়েই সে উঠলো ..সেই রকমই যেন দেখলাম...'

'না, ভূতের গল্প আমি শুনব না।'

'না ভূত নয়।' আশ্বাস দিলো জনার্দন—'স্পষ্ট দেখলাম তাকে কবর ফুঁড়ে উঠতে—তবে সেটা চোখের ভ্রম হতে পারে। তারপর দেখলাম তাকে চলে যেতে। কবরের মাথার পাথরখানার ভেতর দিয়ে তাকে চলে যেতে দেখলাম। স্বচ্ছন্দে সে পাথরটার পাশ কাটিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু কী রুচি, তা না গিয়ে সটান্ সেই পাথর ভেদ করে...যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল পাদ্‌রিটা...'

'কী সর্বনাশ!' আমার বুক ধড়ফড় করে।

'কিন্তু আমি আর ভয় পেলাম না। ফলো করে চল্লাম পাদ্‌রিকে। পাদ্‌রিটা আস্তে আস্তে আরেকটা কবরের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো। কী যেন পড়তে লাগলো তার পাথরটার খোদ্‌কারিতে। তারপর সে...সেই কবরের মধ্যে ঢুকে গেল—মাটির তলায় আস্তে আস্তে... নেমে গেল।'

'না না, ভূত নয়। ভূতের গল্প না—' আমি চেঁচিয়ে উঠি।—'ভূতের গল্প তুমি বোলো না আমায়।'

'না, ভূতের গল্প নয়। ভূতের কোনো কথাই না।...তারপর আমি করলাম কি.. গেলাম সেই কবরটার কাছে...যেখানে গিয়ে পাদ্‌রিটা অমন করে উপে গেল হঠাৎ...'

'হ্যাঁ, শুনেছি শুনেছি...' আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।—'আর বেশি করে—বিশদ করে বলতে হবে না...'

'তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে...আমি কবরটার মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম...পাদ্‌রিটা ঠিক

যেখানে দাঁড়িয়েছিল···তারপর তার সেই পাথরটার গায়ে পাদ্রিটা কী পড়ছিলো দেখতে গেলাম আমি···চাঁদের আলোয় পড়া গেল বেশ···দেখা গেল স্পষ্টই···খোদাই করা রয়েছে সেখানে··· জনার্দন তরফদার···এখানে সমাহিত ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০···গোটা গোটা অক্ষরে আমার নিজের নাম···আর গত-কালের তারিখ···'

'বলে্ছি-না, ভূতের গল্প শুনতে আমি রাজী নই—'আমি না বলে পারি না। একটু রূঢ়-কণ্ঠেই বলি—বলতে বাধ্য হই: 'আর তুমি, খালি খালি আমার কাছে সেই ভূতের কথাই পাড়ছো!'

'না ভূত নয়।' জনার্দন ম্লান মুখে জানায়—'আমি হলফ্ করে বলতে পারি ভূত নয়।'

'ভূত নয়, তা'হলে কি?'

'বলছি না, আমি? আমিই তো।' সে বলে: 'আমার নিজের নাম খোদাই করা দেখলাম সেই কবরটার পাথরে। তাতে আবার গত-কালকের তারিখ···'

'কিন্তু তার কি কোনো মানে হয়?' আমি বিরক্তি প্রকাশ করি। জলজ্যান্ত সামনে বসে তার এই রসিকতার অর্থ বুঝিনে।

'তার মানে তুমি জানতে চাও?' জিগেস করে জনার্দন।

'হ্যাঁ, চাই। চাই বই কি?'

'তা'হলে আমার আর কোনো দোষ নেই···'

এই না ব'লে জনার্দন সেই দণ্ডে···সেই খানে···আমার চোখের উপর···জনার্দন উপে যায়।

যবদ্বীপের মহাভারত

খুব প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ থেকে বহু হিন্দু পরিবার যবদ্বীপে গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন—তার বহু নিদর্শন যবদ্বীপের বাসিন্দাদের আচার ব্যবহারে, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, বিদ্যমান আছে আজও। সে সব হলো ইতিহাসের কথা। যবদ্বীপে একখানি প্রাচীন কাব্য পাওয়া গেছে—কাব্যের নাম 'ভ্রাত-যুদ্ধ'। এ কাব্য রচনা করেছেন কবি পাসেদা-১০৭৯ খৃষ্টাব্দে —এ কাব্যে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র; পাণ্ডু; বিদুর-এঁরা তিন ভাই ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কাব্যটি নানা ছন্দে লিখিত। মহাভারতের সব ঘটনাই এ কাব্যে বর্ণিত আছে—নেই শুধু জতুগৃহ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, পাশাখেলা, পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যুর সপ্তরথীর চক্রে বন্দিত্ব আর পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের প্রসঙ্গ।

বৈশাখী-দুপুরে

শ্রীসুনির্মল বসু

বৈশাখ এলোরে—
বৈশাখ এলোরে—
হঠাৎ দুপুর বেলা—
শুরু হোলো কোন খেলা,—
উদ্দাম ঝোড়ো-হাওয়া
চলে এলো-মেলোরে—
বৈশাখ এলোরে।

বন্ জুড়ে বন্ বন্ উড়ে চলে ঘূর্ণি,
ঘুর্ ঘুর্ ঘুরপাকে সব যায় চূর্ণি ;
ধূলোটের উৎসবে—
মাতে ঝোড়ো ভূত সবে,
দিকে দিকে ওড়ে ঐ ধূলোময় উড়্নী,
উড়ে চলে ঘূর্ণি।

বাঁশের ঝাড়ে শাঁই শাঁই শাঁই, কাঁপছে রে কার ধাক্কায়?
মাঠের ফাঁকায় ঝাউয়ের শাখায় কোন্ সে চপল পাক্ খায়?
ওলোট্-পালোট্ বনের বেণী, ঝরছে পাতা ঝুর্‌ঝুর্,—
কাতার দিয়ে পাতার ঘুড়ি চল্‌ছে উড়ে দূর্ দূর্।
এলোমেলো ডালপালা সব ঘূর্ণি ঝড়ের ঝট্‌কায়,—
পল্‌কা যত শালের কলি আল্‌গা হয়ে ছট্‌কায়।
কৃষ্ণচূড়ার পাঁপড়ি যত ছিট্‌কে পড়ে চারধার,—
সজ্‌নে গাছে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ বাজ্‌না বাজে বার বার।
উজাড় হোলো আজ্‌কে যেন ফজলী আমের জঙ্গল,—
উল্লাসে আজ ছুট্‌লো সেথায়, জুট্‌লো ছেলের দঙ্গল।

দুপুরবেলা আকাশখানা
তপ্ত যেন তাওয়া,—
বন্‌বনিয়ে শন্‌শনিয়ে
ছুট্‌ছে ঝোড়ো হাওয়া।
ছুট্‌ছে হাওয়া, ঝড়ের পথিক,—
বুঝি না ওর ভাব্ ও গতিক্,
সারা দুপুর ধ'রে কেবল
কোথায় আসা-যাওয়া!
কোন্ খেয়ালীর কোন্ সে খেলা,
কোন্ সে গীতি গাওয়া?

ঘূর্ণি পুরে...দিন দুপুরে...মাঠ্‌টি জুড়ে জোর,
কেবল ঘোরে...খেয়াল ভরে,...নাই কোনো কাজ ওর!
বাসার থেকে...উঠ্‌ছে ডেকে...উদাস কবুতর,—
আস্‌ছে ভেসে...মাঠের শেষে...ঝোড়ো কাকের স্বর।

কাঠবিড়ালী···ঘুমায় খালি,···লাগ্‌লো ঝড়ের ধুম্,—
দম্‌কা বায়ে···গাছের ছায়ে···ভাঙ্‌লো এবার ঘুম্।
প্রজাপতি···চপল অতি,···হাল্‌কা ডানা তার,—
হাওয়ার তোড়ে···ছট্‌কে পড়ে,···পথ মেলেনা আর।
ফুলের ঝুরো·· রেণুর গুঁড়ো···হাওয়ায় ঝরে যায়—
ঝাপ্‌টা ঝড়ে···উপ্‌চে পড়ে···মধুর কণা হায়!
জলার কাছে···কলার গাছে···আজকে সারাক্ষণ,
দুপুর জুড়ে···ঘুঘুর সুরে···উদাস করে মন।
মাঠের পারে···ঘাটের ধারে···তাল সুপারির সার—
ঝাঁকড়া মাথা·· কোঁকড়া পাতা···নাড়ছে অনিবার।

হাওয়ায় কাঁপা চাঁপার ছায়ায় কাঁপ্‌ছে সবুজ ঘাস,
তারই পাশে ডাক্‌ছে ঝিঁঝি, শুন্‌তে কি তা পাস্?
থোকা থোকা শ্বেত করবী ঝরতেছে টুপ্‌টুপ্,—
ছাতিম গাছের শুক্‌নো ডালে কাঠ-ঠোক্‌রা চুপ।
বৈশাখী কোন্ বৈরাগী আজ গৈরিক-বাস গায়—
ঘূর্ণি-পাকের সুর-পাকেতে দিক্ কাঁপিয়ে যায়।

আকাশ চিরে

বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব কৌশলে ব্যবস্থা হয়েছে—রেডিয়ো-আলোকধারা চলবে আকাশের বুক-চিরে নিঃশব্দে। সে আলোর পথে এরোপ্লেন পড়লে, যন্ত্রের ভোল্ট-মীটারে তখনি তার আভাস জাগবে। জলে রাতে কুয়াশায় কোনো এরোপ্লেনকে খুঁজে পেতে আর এতটুকু অসুবিধা থাকবে না। কুয়াশার ঘোরে এ আলোকধারার কল্যাণে প্লেনে প্লেনে ঠোকাঠুকির আর ভয় থাকবে না। মেঘাচ্ছন্ন পাহাড়ে পড়ে প্লেন যাত্রীসমেত চূর্ণবিচূর্ণ হবে না। এ অলোক যেমন খুশি সব দিকে চকিতে সঞ্চালিত করা যায়। চৌদ্দ মাইলের মধ্যে এবং তিন হাজার ফুট উঁচুতে কোনো প্লেন কুয়াশা বা ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকলেও—প্লেনকে এ অলোয় স্পষ্ট দেখা যাবে।

নূতন বাংলার প্রথম কবি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তোমরা কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়েছ? পুরানো বাংলার শেষ কবি ভারতচন্দ্র আর রামপ্রসাদ। নূতন বাংলার প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিছু কম দেড়শো বছর আগে (১২১৮ সালে)।

যে যুগে পলাসীর যুদ্ধ হয়, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ছিলেন সেই যুগের কবি। এ-দেশে ইংরেজ তখন সবে শিকড় গেড়ে কায়েমী হয়ে বসবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বৃটীশ রাজ্যের বনিয়াদ তখনো শক্ত হয়নি এবং ইংরেজিয়ানা বলতে কি বুঝায়, বাঙালী তাও জানত না। তাই ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সমস্ত কবিতা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেও এতটুকু ফিরিঙ্গী গন্ধ আবিষ্কার করা যাবে না। এই জন্যেই বলতে হয় খাঁটি বাংলার শেষ কবি ভারতচন্দ্র আর রামপ্রসাদ।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের যুগে এ-দেশে বইতে সুরু করেছে দস্তুরমত বিলেতী হাওয়া। বাঙালী ইংরেজী বলতে, কোট-পেণ্টুলুন পরতে, খানার টেবিলে ব'সে ছুরি-কাঁটা ধরতে, রামপাখী খেতে এবং সভায় গিয়ে রাজনীতি নিয়ে বক্তৃতা করতে শিখেছে। ঈশ্বর গুপ্তের বহু ব্যঙ্গ কবিতার ভিতরে সেই সব ইঙ্গবঙ্গ উপসর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর পূর্ববর্তী কোন বাঙালী কবির কাব্যে ঐ সব বিষয় স্থান পায়নি। এই জন্যেই তাঁকে বলি নূতন বাংলার প্রথম কবি।

দেশের হালচাল দেখে গুপ্তকবি দুঃখ ক'রে বলছেন :

"একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া,
আর দিকে মোল্লা ব'সে মুর্গি মাস নিয়া।
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা,
আরদিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খানা।

* * *

পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফেলে কেটে,
বাপ পূজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে।"

মেয়েদের ইংরেজীয়ানার দিকে সত্যদ্রষ্টা কবি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আজ তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সফল হয়েছে :

"তখন, 'এ-বি' শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন, আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ-সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব, কাঁটা-চামচে ধরবে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই, আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে,
এরা, আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি মস্ত গুণ, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তিনিই হচ্ছেন প্রথম স্বদেশ-ভক্ত কবি। তাঁর পূর্ববর্তী বাঙালী কবিরা দেশকে ভালোবাসতেন না, এমন অপবাদ দিতে পারি না—স্বদেশকে ভালোবাসে না এমন মানুষ কে আছে? নিশ্চয়ই তাঁরা স্বদেশকে ভালোবাসতেন। কিন্তু স্বদেশের আশা-নিরাশা আলোচনা করা তাঁরা কাব্যের ধর্ম ব'লে মনে করতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতচন্দ্রকে দেখানো যেতে পারে। বিধর্মী ফিরিঙ্গীর আক্রমণে দেশের সর্বনাশ হ'ল পলাসীর প্রান্তরে। এতবড় একটা ওলটপালটে বাঙালী ভারতচন্দ্র যে প্রাণে বেদনা অনুভব করেছিলেন, এটুকু আমরা অনায়াসেই অনুমান ক'রে নিতে পারি। কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না কবির সে বেদনাকে।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তই নানা কবিতার ভিতর দিয়ে বাঙালী জাতিকে সর্বপ্রথমে শোনান অধীনতার দুঃখ এবং স্বদেশের দুর্দশার কথা। তিনি হচ্ছেন বাংলার প্রথম চারণ-কবি এবং পরে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে দেখা দিয়েছেন: মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি। তাঁর 'স্বদেশী' কবিতার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধার করছি।

স্বদেশ সম্বন্ধে কবির উক্তি:

"জানোনা কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
সে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে।"

ভারতবাসীকে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন:

"জাগ জাগ জাগ সব ভারত-কুমার,
আলস্যের বশ হয়ে ঘুমায়োনা আর।
তোল তোল তোল মুখ, খোলরে লোচন,
জননীর অশ্রুপাত কররে মোচন।

ভেঙেছে শোবার খাট পড়িয়াছে ভূমে,
এখনো তোমার এত সাধ কেন ঘুমে ?”

কবির এই আশা আজ সফল হয়েছে :

“স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে,　　ভারতের জরা-দেহে
করিবেন শোভার সঞ্চার।
দূর হবে সব ক্লান্তি,　　পালাবে প্রবলা ভ্রান্তি,
শান্তিজল হবে বরিষণ।
পুণ্যভূমি পুনর্বার,　　পূর্বমুখ সহকার,
প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন।”

অন্যত্র বলেছেন :

“ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে,　　দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি,　　দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।”

বিলাতের টোরি ও হুইগ সম্বন্ধে :

“কিছুমাত্র নাহি জানি রাম রাম হরি,
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টোরি।
হুইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে,
হুইগের অর্থ কভু শুনি নাই কানে।
টোরি আর হুইগের যে হন প্রধান,
আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান।”

ইংরেজ সম্পাদক সম্বন্ধে :

“এ দেশেতে আছে যত সম্পাদক সাদা,
সকলেই আমাদের বড় ভাই—দাদা।”

আবার, নিত্যদৃষ্ট যে সব জিনিস অন্যান্য কবিরা কাব্যলোকের বাইরে ঠেলে ফেলে দিতে চান, ঈশ্বর গুপ্ত আদর ক’রে তাদের নিজের কবিতার খাতার ভিতরে তুলে রাখেন।

পাঁটাকে দেখে বলেন :

"রসভরা রসময় রসের ছাগল,
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।
* * *
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান;
সাধু সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান।
* * *
* * *
মজা দাতা অজা তোর কি লিখিব যশ ?
যত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস।
গিলে গিলে ঝোল খায় আস্বাদন হত,
তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত।
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা,
ম'রে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম নেয় তারা।"

এ ছাড়া অ্যাণ্ডাওয়ালা তপ্‌সে মাছ, আনারস, হেমন্তে বিবিধ খাদ্য, পৌষ-পার্বণ প্রভৃতি অনেক কিছুই কবির কাব্যে স্থান লাভ করেছে। আবার তাঁর ভাণ্ডার খুঁজলে উচ্চতর শ্রেণীর বহু কবিতারই সন্ধান পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। * * * তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন।" অথচ তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে।

আর এক কারণে ঈশ্বর গুপ্তের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন সে যুগের সাহিত্যনায়ক। কেবল পদ্য নয়, তিনি গদ্য রচনাও করতেন। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "সংবাদ-প্রভাকরে"র নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই পত্রিকায় তিনি সাদরে বহু নূতন কবিকে আশ্রয় দিতেন, উপদেশ দিতেন, পথনির্দ্দেশ করতেন। প্রতি-বৎসরে একবার ক'রে তিনি একটি বিরাট সভার আয়োজন করতেন, এবং সেখানে উপস্থিত থাকতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি। সভায় তাঁর ছাত্ররা নিজের নিজের কবিতা পাঠ করতেন। যাঁদের কবিতা সকলের ভালো লাগত, তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হ'ত নগদ টাকা।

তিনি ছিলেন তখনকার সাহিত্য-গুরু। অনেক শিষ্যই তিনি তৈরি ক'রে গিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের নাম। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রভৃতি আরো অনেকে তাঁর কাছে শিক্ষানবীসি করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে উপদেশ দেবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে গিয়েও উপস্থিত হতেন।

নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষও তাঁকে আদর্শরূপে রেখে কবিতা রচনা করতেন। সমাজে গুপ্তকবির অসাধারণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলেছেন :

"আমাদের ছেলেবেলায় হাফ-আখড়াই পাঁচালির খুব চলন ছিল। একদিন ছেলেবেলায় আমি এক পাঁচালির গাওনা শুনতে যাই—খুব ভিড়ে। দেখলেম সেই গোলমালের মধ্যে একজন

সহাস্যবদন পুরুষ এলেন—মুখে-চোখে তাঁর প্রতিভার ছবি—বেশ উজ্জ্বল মূর্তি—bright face—আসরের তাবত লোক তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠল—বেজায় খাতির, বেজায় সম্মান। তাঁর নাম জানবার জন্য আমার কৌতূহল হ'ল। পাশের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম ইনিই কবি ঈশ্বর গুপ্ত। গুপ্তকবির এই রকম সম্মান-প্রতিপত্তি দেখে তখন একবার কবি হবার সাধ হয়েছিল।"

ঈশ্বর গুপ্তের যুগে প্রথম ইংরেজী সভ্যতার চাকচিক্যে ভুলে শিক্ষিত বাঙালীরা দেশের সব-কিছুকেই অনাদর করতে শিখেছিল। তাদের সব চেয়ে বেশী ঘৃণা ছিল বাংলা ভাষার উপরে। এমন কি মাইকেল মধুসূদনও প্রথমে বাংলা ভাষা প্রায় জানতেন না বললেই হয়। "পৃথিবী" শব্দটি বানান পর্যন্ত করতে পারতেন না। কবিতা রচনা করতেন ইংরেজীতে। এইজন্যে পরে তিনি অনুতপ্ত হয়ে লিখেছিলেন :

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

মাতৃভাষার প্রতি এই অবহেলা ঈশ্বর গুপ্তের বুকে বড় বাজত। তাই তিনি বলেছেন :

"হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ ॥"

তাই তিনি মাতৃভাষা দ্বেষী ইঙ্গবঙ্গকে শেখাতে চেয়েছিলেন :

যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরদেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে,
মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

আধুনিক বাংলা ভাষার মূলে ছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। কারণ তাঁর কাছ থেকেই উপদেশ ও প্রেরণা লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্যকার মনোমহন বসু প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষরা তখনকার দিনে অবহেলিত বাংলা ভাষায় উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

আজ এ-উপদেশ অতিশয় সহজ ও পুরাতন ব'লে মনে হবে, কিন্তু গুপ্তকবির যুগে একমাত্র তিনিই দরাজ বুকে এমন কথা বলতে পেরেছিলেন। না, সেই সময়কার আর এক কবির মুখেও আমরা এই রকম উক্তি শুনতে পাই :

"নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা ?"

রবিবার

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

'ভিক্ষা দাও মা,'—'আজ এস বাবা, সময় যে নাই হাতে,'
'ভিক্ষা পাই মা'—'পাবে বৈকি মা, এস রবিবার প্রাতে।'
সেই রবিবারে ভিক্ষার পরে ছুটির সকাল বেলা
এক আবদার ছিল সে আমার সদলে সাঁতার খেলা।
গঙ্গার ঘাটে জননীর সাথে যেতেম সেদিন স্নানে
পায়ে ছ'ড়ে কেটে যাইতেন হেঁটে তবু না যেতেন যানে।
কোথা রবিবার সে রবি আমার অতীতে গিয়েছে ডুবে
পাঠশালা নাই তবু ছুটি নাই সব ছুটি গেছে উবে।
দিনে ছুটি বেলা দুই মুঠো চাল জননী দিতেন রাখি
আঙিনা হইত ধূলায় ধন্য ভিখারী-চরণ মাখি।
কোথা রবিবার, সে রবি আমার, অতীতে পড়েছে ঢলি
আম্র-লবণে পল্লী-কাননে ভাবি আঁখি ছলছলি।
গায়ে উঠে খড়ি, ধূলো চচ্চড়ি হাতে মুখে কালি এঁকে
হতাম ধন্য, আজি নগণ্য, ভাবি প্রসাধন মেখে।
ছ'দিনের শেষে মাসে চারিদিন পথ-প্রতীক্ষা করি
যে রবি উঠিত শিশু কৈশোরে সোনার রশ্মি ভরি,—
সে রবি কোথায়, করি হায় হায়, সে রবি হারানু হেলে
শেষ করি পাশ ছাড়ি নিঃশ্বাস হইনু কাজের ছেলে।
সেই কাজ হতে কত না কাজের হাজার বয়ন বুনি
প্রাসাদ গড়িনু প্রসাদ লভিনু শত সুখ্যাতি শুনি।
সে 'রবি' কোথায় সে 'আমি' কোথায়, কোথা জীবনের ছুটি
ধূলো মুঠি ধরি হ'ত সোনা মুঠি, সোনা আজ ধূলো মুঠি!
অনাদরে হায়! বার আসে যায় সমাদর নাই কারো
রবি সোম বুধ জল বুদ্বুদ গণিতে কেহ কি পারো?
অবাধ গমনে সমবয়সীর কাঁধে পিঠে কোলে চড়ে
যে রবি উঠিত ভরিয়া উঠিত স্বর্গের সমাদরে।
কাক বেঁধে পায়ে ঘুড্ডি উড়ায়ে এক ঘুমে যেত রাত
জননী দিতেন চরণে বুলায়ে সাশ্রু স্নেহের হাত।
আজি তা'রি লাগি, তোমাদের মাগি, যযাতির শিশুকাল
বৃদ্ধ নহুষ, হিসাবেতে হুঁস, বেঁচে থাকা জঞ্জাল।
তোমাদের ভাই আনন্দ রবি উঠে প্রতি রবিবারে
আমাদের রবি উদিবে এবার পৃথিবীর পরপারে।

সুতো-নাদা

(সংগ্রহ)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

একছিল তাঁতি, আর তার ছিল এক তাঁতিনী। তাঁতি যেমন খাটিয়ে তার বৌটি তেমনি কুঁড়ে। তাঁতিনীর আঠারো মাসে বচ্ছর, কোনো কাজ তাকে একবার বললে হয় না। তবে হাতে যা না পারে, বুদ্ধিতে সারে।

একবার তাঁতি দশখানা গামছার জন্যে টানা দিয়েছে, এদিকে পড়েনের স্থতো গেছে কম প'ড়ে। বাড়ীর পাশেই দেবকাপাসের গাছ, তাঁতি একরাশ তুলো এনে তাঁতিনীকে বললে, "ও বৌ, গামছার স্থতো কম প'ড়ে গেছে, আজ যে রকম করে পারিস একনাদা স্থতো কেটে রাখবি, না হ'লে কাজ আটকে থাকবে।" কাকে বলেছে তো কা'কে বলেছে, তাঁতিনীর গেরাজ্যি নেই। দু'দিন যায়, তিনদিন যায়, তাঁতিনীর স্থতো কাটা হয়ে ওঠে না। শেষে তাঁতি একদিন ভীষণ রেগেমেগে বললে, "কাল সকালে যদি স্থতো না পাই তবে তোরই একদিন কি আমারই একদিন!" এই বলে তাঁতি হাটে চলে গেল। তাঁতিনী রান্না-খাওয়া সেরে তুলোগুলো নিয়ে বসল। বীচি ছাড়াতে, পাঁজ করতে, চরকা পাড়তে হাই উঠে গেল; তাঁতিনী পাঁজগুলি ঝাঁপির মধ্যে পুরে রেখে সেখানেই শুয়ে পড়ল। এক ঘুমেই সন্ধ্যে।

তাঁতি রাত্রে ফিরে দেখলে তুলোর বীচি ছড়ানো, চরকা পাড়া। দেখে ভারী খুশি। খেতে বসে বললে, "স্থতো কেটে রেখেছিস তো?" তাঁতিনী মাথা নেড়ে বললে, "হুঁ"। তাঁতি ক্লান্ত ছিল, সে-রাত্রে আর বেশী কথা হ'ল না! তাঁতি-তাঁতিনী সকাল সকাল খেয়েদেয়ে সোঁদা নাদা দুই ছেলেকে নিয়ে কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাতদুপুরে তাঁতিনী ধড়মড় করে উঠেছে। ঘরের আগড় খুলতেই তাঁতির ঘুম ভেঙেছে, বলে, "যাস কোথায়?" তাঁতিনী বললে, "পেটটা কেমন কামড়ে উঠল। একবার বার থেকে আসি।" তাঁতি আর কিছু বললে না। তাঁতিনী পুকুরপাড়ে গিয়ে হেলার ফুল তুললে,

জলের ধারে গিয়ে সোলা তুললে। হেলার ফুলের মালা করে গলায় পরলে, সোলার খোসা ছাড়িয়ে চাকা চাকা করে কেটে সুতো দিয়ে গেঁথে হাতে, পায়ে, গলায় পরলে, ঠিক যেন হাড়ের মালার মতো দেখতে হ'ল। তখন কেলে হাঁড়ির কালি হাতে মুখে মেখে চুলগুলো উস্‌কোখুস্‌কো করে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে নিজের ঘরের জানালার কাছে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়লে,"হুঁ-উ-উ-উ-উ !"

তাঁতি ঘুম-চোখে উঠে জানালা খুলেই অবাক, দেখে এক বিকট মূর্তি পেত্নী দাঁড়িয়ে! ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "কি চাই মা তোমার? দোহাই মা, আমাকে প্রাণে মেরোনা, যা চাইবে তাই দেব।"

পেত্নী খলখল করে হেসে উঠল, তারপর এলোচুল দুলিয়ে লম্বালম্বা হাত নেড়ে নাচতে লাগল, "হেঁলার ফুঁল, সোঁলার মাঁলা, আঁমার বাঁড়ী কেওরতলা। ঝম্, ঝম্, ঝম্।"

একে ঐ মূর্তি, তার ওপর সেই বিকট নাচ। তাঁতির তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ভয়ে ভয়ে বললে, "দোহাই মা, আমার কোনো অপরাধ নেই। কি পেলে তুমি খুশি হবে বলো, এখনি দিচ্ছি।"

পেত্নী নাচতে নাচতে বললে, "ঘর-গিন্নী নেব না, সোঁদা-নাদা নেব না, সুতো-নাদিটি নেব।"

এই কথা? তাঁতির তো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এত সহজে উদ্ধার পাবে তা সে ভাবতেই পারেনি। তাড়াতাড়ি তুলোর ঝাঁপিটি এনে জানালা গলিয়ে পেত্নীর হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও মা এই নাও; আশীর্বাদ করে যাও।" বলতে বলতেই পেত্নী সুতোর ঝাঁপি নিয়ে অদৃশ্য হ'ল।

খানিক পরে তাঁতিনী আগড় ঠেলে ঢুকল, ভিজে কাপড় ছেড়ে গা-হাত মুছে শুকনো কাপড় পরে শুতে এল। তাঁতি বললে, "তাঁতিনী, আজ পিতৃপুণ্যে প্রাণে বেঁচে গেছি। তুইও বেরোলি আর ইয়া এক পেত্নী এসে হাজির।" সমস্ত শুনে তাঁতিনী বললে, "তাইতো, আমার ক'দিনের পরিশ্রম, অত বড় সুতো-নাদা নিয়ে গেল!" তাঁতি বললে, "যাকগে, যাকগে, তুই দুঃখু করিস নি বৌ। না হয় গামছা বুনতে দু'দিন দেরিই হবে। প্রাণে বাঁচলে অমন কত সুতো-নাদা মিলবে।"

খুকুমণি

মিষ্টিমণি সোনামণি কার করেছে ঘর আলো,—
গাপ্পু গুপু ট্যাপারিটি ঠোঁটটি চেপে হাসছে ভালো।

শিশুদের আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার
পনেরো টাকা

❋

দ্বিতীয় পুরস্কার
দশ টাকা

❋

তৃতীয় পুরস্কার
পাঁচ টাকা

১নং নান্নু পিণ্ট ২নং

বর্তমান বৈশাখ সংখ্যা থেকে আগামী ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ মাসের জন্য আমরা শিশুদের একটি আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। ভারতীয় শিশুরা অন্য কোন দেশের শিশুদের চেয়ে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে যে কোন অংশে কম নয়, এর দ্বারা সে কথাটাই প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। সদ্যজাত শিশু থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের আলোকচিত্র এই প্রতিযোগিতায় গ্রহণ করা হবে। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকা সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। ইচ্ছে করলে একখানি ছবির একাধিক ভঙ্গী (pose) বা একই লোক একাধিক শিশুর ছবি পাঠালে প্রতিযোগিতায় গৃহীত হবে।

ফটোগুলি রেজেষ্টী ডাকে পাঠালেই ভালো হয় এবং ফেরত পেতে হলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক খামের উপর **'আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা'** কথাটি লেখা প্রয়োজন। ছবিগুলির সাইজ খুব বড় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, লাবণ্য, পোজ্ ও ফটোগ্রাফির ভালোমন্দের বিচারের উপর পুরস্কার দেওয়া হবে এবং আলোকচিত্রগুলি কাগজে ছাপা হবে।

১৫ই ভাদ্র পর্যন্ত আলোকচিত্রগুলি গৃহীত হবে এবং আশ্বিন সংখ্যায় ফলাফল প্রকাশিত হবে।

তোমরা হেনরী ফোর্ডের নাম শুনেছ নিশ্চয়? যদি না শুনে থাক তো ফোর্ড মোটর গাড়ির নাম নিশ্চয় শোনা আছে। যদি তাও না শুনে থাক তো এই মোটরের যুগে জন্মানই তোমাদের ভুল হয়েছে বলতে হবে।

অবশ্য ফোর্ডগাড়ি মোটরের রাজাও নয়, উজীরও নয়। এখন তবুও অনেক রকম 'মডেল' বেরিয়েছে, আরও পাঁচটা ভালো মোটরের সঙ্গে বাহার দিয়ে দাঁড়াবার মতোও হয়েছে, কিন্তু এক সময় এমনি ফনফনে হালকা আর ন্যালাক্ষ্যাপা গোছের ছিল যে ওর নামই পড়ে গিয়েছিল Tin Lizzie অর্থাৎ টিনের খেলনা।

তা পড়ুক, হেনরী ফোর্ড এসব ঠাট্টার কথা কানে তোলবার মতো মানুষ ছিলেন না। বাণিজ্য-শিল্প নিয়ে তাঁর নিজের একটা আদর্শ ছিল। তাঁর কথা ছিল আমি গণতান্ত্রিক দেশের লোক, সেখানে সবাই খানিকটা ক'রে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী; রাজারাজড়ার যুগ্যি দামী গাড়ি তোয়ের না ক'রে—আমি এমনি গাড়ি বাজারে ছাড়তে চাই যা অতি সাধারণ গেরস্তরও নাগালের না বাইরে পড়ে।

তিনি বলতেন এমন অবস্থা দাঁড় করাব মোটর-শিল্পে যে এ্যামেরিকার প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজনের একখানি ফোর্ড গাড়ি থাকিবেই।

অবশ্য মানুষ যতটা ভাবে ততটা সব সময় পেরে ওঠে না, তবে বাণিজ্য-শিল্পে হেনরী ফোর্ড যে একটা যুগান্তর এনে ফেলেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর কারখানা এক সময় পৃথিবীর বৃহত্তম কারখানা হয়ে উঠেছিল এবং এখনও যে পৃথিবীর বৃহত্তম কারখানাগুলির মধ্যে একটি এতে কোন সন্দেহ নেই, আর এটাও এক রকম নির্বিবাদেই বলা যায় যে সস্তা আর কাজের গাড়ি হিসাবে ফোর্ড গাড়িই সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে সব চেয়ে বেশি করে।

হেনরী ফোর্ড ছিলেন সামান্য একজন গেরস্তর ছেলে। তার মানে তিনি বাপমায়ের

দিক থেকে এমন কিছু পান নি যা তাঁকে এত বড় একটা কীর্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। তবে হ্যাঁ, এ-কথাটাও বলা একদিক দিয়ে ভুলই কেননা টাকাকড়ি কিম্বা একটা কারবারের গোড়াপত্তন—এ ধরনের কিছু না পেলেও আসল জিনিসটা তো তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই—সেটা হচ্ছে হিসাবের মাথা। অন্যান্য ক্ষেত্রে যাই হোক, ব্যবসাক্ষেত্রে—যেখানে পদে পদেই লাভ লোকসান খতিয়ে চলতে হয়—ঐ জিনিসটি সব চেয়ে বড় সহায়। অদ্ভুত ছিল হেনরী ফোর্ডের এই হিসাবের মাথা, লাভ টানবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি। বণিক সাধারণতঃ ব্যবসার একটা দিকই নিয়ে থাকতে পারে বা থাকে—যেমন ধরো, আমি মোটর গড়া নিয়েই থাকি, ক আমায় লোহা যোগাক, খ কাঠ সরবরাহ করুক, গ আমার কারখানার কয়লা দিক, ইত্যাদি। হেনরী ফোর্ড ভাবলেন—বাঃ, লোহা-কাঠ-কয়লা জোগাবার মধ্যেও যখন একটা মোটা রকমের মুনাফা রয়েছে, তখন বোকার মতো সেটা ক-খ-গ'এর পকেটে তুলে দিই কেন? যেমন চিন্তা তেমনি কাজ—কালক্রমে দেখ গেল ফোর্ডের নিজের নিজের জঙ্গলই কাঠ জোগাচ্ছে, নিজের খনি জোগাচ্ছে লোহা আর কয়লা; মুনাফা তোলবার ফিকির-ফন্দি দেখে সবাই হাঁ-করে রয়েছে।

এই ফিকির-ফন্দি দেখে একদিন তাঁর মাকেও হাঁ-করে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সে-কথা বলবার আগে একটা কথা তোমাদের বলে না দিলে হেনরী ফোর্ডের প্রতি দারুণ অন্যায় করা হবে—তাঁকে হয়তো একজন নীচ মুনাফা-খোর বলেই মনে করবে তোমরা—কর্মবীর হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কতবড় উদারচেতা মনস্বী পুরুষ ছিলেন সেটা টের পাবে না। লাভের অংশ অন্যের পকেটে যাক এটা অবশ্য ফোর্ড বরদাস্ত করতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর অধীনের যত মানুষ—ছোট থেকে নিয়ে বড় পর্যন্ত—সবই যাতে তাঁর বিপুল ব্যবসায়ের লাভের অংশীদার হতে পারে, নিজের শক্তি-সামর্থ মতো—তার ব্যবস্থা তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে করে দিয়েছিলেন। ব্যবস্থাটার নাম Profit-Sharing অর্থাৎ মুনফা-ভাগীদারি। ঠিক এই জিনিসটি উত্তরকালে আমাদের সময়ে শাখা-প্রশাখায় সমাজ-তন্ত্রবাদের মধ্যে রূপ নিয়েছে;—ছেঁড়াছিঁড়ি কাড়াকাড়ির বীভৎসতার মধ্যে। অবশ্য বলতে পার ব্যবস্থাটা চালনার মধ্যে এক ধরনের হিসাব ছিলই হেনরী ফোর্ডের মনে—প্রতি মানুষটির স্বার্থ কারখানার সঙ্গে জড়িত করে মুনাফার অংশ বাড়ানো—কিন্তু এত হিসাবের অলি-গলির মধ্যে প্রবেশ করতে যাওয়া তোমাদের হিসাবেরই বাড়াবাড়ি নয় কি? না, এর মধ্যে সে মস্ত বড় একটা উদারতা ছিল—অন্ততঃ সে-যুগে, এটা পুরোপুরিই ভাগ-বিয়োগের মধ্যে ফেলা যায় না।

এইবার সে হিসাবের ফিকির-ফন্দিতে মাকেও তাক লাগিয়ে দেওয়ার কথাটা বলে শেষ করি।

ফোর্ডের খুব ছেলেবেলার কথা। মা গেছেন একটা দোকানে সাওদা করতে, ছেলেও গেছে সঙ্গে। আহা, ছোট্ট ছেলে মার সঙ্গে এসেছে দোকানে, খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়াটা কি ভালো দেখায়? একটি ঝুড়িতে ছোট ছোট ট্যাপারি-জাতের একরকম ফল ছিল—বিক্রির জন্যেই—দোকানী বললে, "খোকা, এক আঁজলা তুলে নাও।"

খোকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, বড়দের সামনে ছোটরা যেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে থাকে দাঁড়িয়ে। নেবার ইচ্ছেও আছে, অথচ···"নাও তুলে, লক্ষ্মীটি; বাড়ি গিয়ে খেও।"

খোকার সেই একই ভাব, নট্ নড়ন্‌চড়ন্ নট্ কিচ্ছু।

দোকানী আরও কয়েকবার বললে। ছেলেমানুষ, বোধ হয় অন্য রকম ভেবেছে। সেই জন্যে জানিয়ে দিলে দাম-টাম কিছু দিতে হবে না। ফল কিন্তু কিছুই হোল না। লজ্জার বাড়াবাড়ি দেখে মাও বললেন নিতে, তবুও সেই এক ভাব।

তখন দোকানী উঠে এসে নিজেই এক আঁজলা নিয়ে, ওর জন্যে মায়ের কাছে দিয়ে দিলে; কি আর করে বেচারি, বলে ফেলেছে, অথচ ছেলেটি এত লাজুক···

*　　　*　　　*

বাড়িতে এসে মায়ের কাছে বকুনি—

"তুমি ভয়ঙ্কর অভদ্র হয়েছ হেনরী; একটা লোক তোমায় আদর করে দিতে চাইছে একটা জিনিস, কোথায় ধন্যবাদ দিয়ে সেটা নেবে, না, নিজের গোঁ ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলে!"

"নিয়েছি তো মা; ধন্যবাদও তো দিলাম।"

"সে যখন বেচারি বাধ্য হয়ে উঠে নিজের হাতে দিলে। না, বড্ড অসভ্য তুমি।"

ছেলে একটু লজ্জিতভাবে চোখ তুলে চাইলে, বললে—"আমি তো সেই জন্যেই নিজের হাতে নিতে যাই নি মা, জানি ও উঠে এসে দেবেই।···দেখলে না, আমার হাতের চেয়ে ওর হাত কত বড়, আমি নিজে নিলে এতগুনো আঁটত'?"

এঁকে দেখাও—এঁকে, ওঁকে, সবাইকে

এলোপাতাড়ি ছবি

L আর O-তে মাকড়সা

'এল' আর 'ও'—এই দুটি ইংরেজী হরফ দিয়ে—খালি L আর O-র সাহায্যে কতরকমের ছবি তৈরী করতে পারো তুমি?—কই কর দেখি?

কতকগুলি নমুনা দেওয়া হ'ল এখানে।

যদি আরো এ-ধরনের করতে পারো—এঁকে পাঠাও। ভালো হ'লে, ছাপা হবে তোমাদের এই মৌচাকেই।

L আর O-তে শুঁয়োপোকা

L আর O-তে বেড়াল

দুটি কুকুর

পদাতিক

নাচুনে মেয়ে

সোজা লাইনের কারসাজি

শুধু সোজাসুজি লাইনে, একটিও গোল রেখা না টেনে, কোন মজার ছবি তুমি আঁকতে পারো? পারো ত' এঁকে পাঠাও, মৌচাকে বেরুবে, অবশ্য যদি ভালো হয়। এখানে তিন রকমের তিনটি নমুনা দেওয়া হ'ল।

১৩৫৭ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে আরম্ভ

(পূর্ব-প্রকাশিত অংশের সংক্ষিপ্তসার)

[নারকোল গাছ আর কলাবাগানে ঘেরা ছোট একটি দ্বীপ। যুদ্ধের সময় সেই দ্বীপে একটি হাসপাতাল তৈরী হয়েছিল। আমেরিকান সৈন্যদের হাত থেকে সে-দ্বীপ একবার জাপানীদের হাতে চলে যায়। এখন শান্তির সময় আবার আমেরিকানদের হাতে চলে এসেছে। সেই হাসপাতালের একটি কেবিনের সামনে কাঠের বোর্ডের ওপর লেখা 'কেস নম্বর ৪৯'। 'কেস নম্বর ৪৯'-এর আসল নাম ধাম কেউ জানে না। সে নিজেও জানে না কোথায় তার বাড়ি, কে তার বাবা। ডাক্তারেরা তার ফোটো তোলে—তার ছবি ছাপা হয় আমেরিকার মেডিক্যাল জার্নালে। তাকে নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। কোনও দিন তা'কে উপোষ করিয়ে রাখা হয়—কোনও দিন বিচিত্র খাবার খেতে দেওয়া হয়। সে যেন ল্যাবরেটরীর খরগোশ। তাকে নিয়ে চলে সারা পৃথিবীতে অমানুষিক গবেষণা। যুদ্ধের সময় শরীরের সর্বাঙ্গে বোমার আঘাত লেগে সে স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। তারপর তার স্মৃতি ফিরিয়ে আনবার অক্লান্ত চেষ্টায় ডাক্তার নার্স আর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষদের আর নিদ্রা নেই। এমনি করে কয়েক বছর কাটবার পর হঠাৎ একদিন একটা বই পড়তে পড়তে তার হারানো স্মৃতি ফিরে আসতে লাগলো। তার মনে হলো বইটা তা'কে নিয়েই লেখা। তার আসল নাম রাতুল। সে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল। অগাধ টাকার মালিক তার বাবা। কলকাতার এক কলেজের দর্শনের অধ্যাপক নিত্যানন্দ সেন তাঁর ছেলে রাতুলকে নিয়ে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে এই বই লিখেছেন। তার কাছে একদিন খবর পাঠানো হয়েছিল যে, যুদ্ধে তাঁর ছেলে মারা গেছে। সেই বিপত্নীক অধ্যাপক শোকে অধীর হয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরলোকতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে সুরু করেন এবং তাঁর গবেষণায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। দিনের পর দিন তিনি তাঁর নিহত ছেলের অদৃশ্য আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, আর তার বিবরণ সারা ভারতবর্ষের খবর-কাগজে, রেডিওতে, আর তাঁর বইয়ে বেরোয়। রাতুলকে নিয়েই তার বাবা অনেকগুলো বই লিখে ফেলেছেন। হাসপাতালের কেবিনের মধ্যে শুয়ে শুয়ে 'কেস নম্বর ৪৯' ওরফে রাতুল সমস্ত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে একদিন কাউকে কিছু না বলে শেষ-রাত্রে হাসপাতাল ত্যাগ করলে। হাতে একটা পয়সা নেই। জাহাজ তখন জেটিতে

দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে সকলের অজ্ঞাতে গিয়ে সে ঢুকলো জাহাজের খোলের ভেতর। উদ্দেশ্য—সে আবার তার বাবার কাছে গিয়ে সশরীরে হাজির হবে—চমকে দেবে তার বাবাকে। বলবে—রাতুল মরেনি। সে বেঁচেই আছে। কারুর কোনও মারাত্মক ভুলের জন্যেই তার মৃত্যু-সংবাদ বাবাকে জানানো হয়েছিল। কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে যখন তাকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেছে শত্রুপক্ষ, স্বপক্ষের লোকেরা ভেবেছে সে মারা গেছে। আরো অনেক মৃতদেহের সঙ্গে তার মৃতদেহ হয়ত মিলিয়ে একাকার হয়ে গেছে। এদিকে স্মৃতি-ভ্রংশ হয়ে সে-ও নিজের সঠিক পরিচয় দিতে পারেনি। সেই রাতুল এখন বিনা টিকিটের যাত্রী। লুকিয়ে লুকিয়ে আত্মগোপন করে জাহাজে চলেছে সে। হঠাৎ কিন্তু বিচিত্রভাবে ধরা পড়ে গেল ভোম্বলদাসের কাছে। ভোম্বল একটা বাপ-মা-হারা জাহাজের ছোট কর্মচারী। একদিন তার জন্মের পর তার মা নাকি আউটরাম ঘাটের গেটের ওপর তাকে ফেলে রেখে পালিয়েছিল। তারপর থেকে লাটু গুণ্ডার বাড়ীতে মানুষ। গুণ্ডামি ভাল লাগে না তাই একদিন সেখান থেকে পালিয়ে জাহাজের চাকরি নিলে। কিন্তু ভোম্বলের আসল সখ ম্যাজিকের দিকে। ম্যাজিক শিখে একদিন সে সবাইকে চমকে দেবে—এই তার সাধনা। কিন্তু সেই ভোম্বলও এক ঘটনায় রাতুলকে জাহাজ থেকে এডেন বন্দরে নাবিয়ে দিলে। এডেনের রাস্তায় কপর্দকশূন্য হয়ে নেবে রাতুল বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু খানিক পরেই ভোম্বলের অনুশোচনা হওয়াতে সে রাতুলের সঙ্গে দেখা করে আবার বললে, যে তার অন্যায় হয়েছে, হাজার হোক দু'জনেই বাঙালী—সে যেন কিছু মনে না করে। রাত ন'টার সময় জাহাজ ছাড়বে, সেই জাহাজেই যেন সে এসে ওঠে। তার জন্যে সে খাবার প্রস্তুত রাখবে। সেই রাত্রে রাতুলের বাবার রেডিওতে বক্তৃতা হবার কথা ছিল। রাতুল সেই বক্তৃতা শোনবার উদ্দেশ্যে এক চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেই চায়ের দোকানের মালিক ভবতোষবাবু হঠাৎ তাকে দেখে—'হরিদাস' বলে ডাকলে। ভবতোষবাবুর বন্ধু হরিদাসকে নাকি হুবহু রাতুলের মতন দেখতে। খাতির করে চা খাওয়ালে। তারপর কলকাতা ষ্টেশন খুলে বাঙলা গান শোনালে। শেষে সুরু হলো তার বাবার বক্তৃতা। রাতুলের মৃত্যুর খবর—ইত্যাদি বর্ণনা করে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তার বাবা। বক্তৃতা শুনতে শুনতে কখন দশটা বেজে গেছে খেয়াল নেই। যখন হুঁশ হলো তখন জাহাজ ছেড়ে যাবার কথা। ভবতোষবাবু বললে—তার নিজের বাড়িতে রাতুল স্বচ্ছন্দে আশ্রয় নিতে পারে। অগত্যা রাতুল ভবতোষবাবুর বাড়িতে গিয়ে উঠলো। সেইখানে ভবতোষবাবু এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন রাতুলকে। প্রস্তাবটা হলো এই: ভবতোষবাবুর বন্ধু হরিদাসের কেউ নেই পৃথিবীতে। দু'জনে পালিয়ে এসে এডেনে ব্যবসা সুরু করেছিল। কিন্তু হরিদাস সন্ন্যাসী হয়ে একদিন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে। তার চলে যাবার পর বর্মা থেকে একটা চিঠি আসে তার দূর সম্পর্কের মৃত দাদামশাইয়ের উকিলের কাছ থেকে। মৃত দাদামশায়ের নিকট-আত্মীয় কেউ নেই—তাই তাঁর অগাধ সম্পত্তি সমস্ত তাঁর নাতি হরিদাসকে দিয়ে গেছেন উইল করে। কিন্তু হরিদাস আর কখনও ফিরবে না। প্রায় দু'লক্ষ টাকার সম্পত্তি হাতছাড়া হবার উপক্রম। রাতুল যদি হরিদাস সেজে টাকাটা হস্তগত করে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। ভবতোষবাবু বললে—সমস্ত রাত রাতুল ভাবুক—ভেবে সকাল বেলা তার মত জানালে চলবে। রাত্রে ভেবে ভেবে কিছুই কূলকিনারা পেল না রাতুল। শেষ-রাত্রের দিকে হঠাৎ কে যেন—'হরিদাস—হরিদাস' বলে তার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিতেই রাতুল দেখলে ভবতোষবাবু—এক হাতে টর্চ আর এক হাতে লক্ লক্ করছে একটা মস্ত বড় ছোরা।]

[পড়ে যাও]

ভয়ে নয়, হতাশায় রাতুল একবার চীৎকার করতে চেষ্টা করলে। এর চেয়ে ভীষণ বিপদের মধ্যে সে পড়েছে। আরো অনেক ভয়ঙ্কর সে সব অভিজ্ঞতা। একেবারে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা। মানুষের প্রাণ নিয়ে যেখানে ছিনিমিনি খেলা চলে। জীবন যেখানে সস্তা—সেই সব অভিজ্ঞতা সে একবার আস্বাদ করেছে।

কিন্তু এ তো নয়। বাবার সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। বাবা আর তাকে দেখতে পাবে না। বাবার শেষ জীবনে আর সে বাবাকে শান্তি দিতে পারবে না। একদিন বাবার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাবার মনে যে-নিদারুণ ব্যথা দিয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ আর সে করতে পারবে না। হতাশায় রাতুলের গলার আওয়াজ যেন কে বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু ভবতোষবাবু ততক্ষণে এগিয়ে এসেই রাতুলের গলাটা টিপে ধরেছে।

ঠিক টিপে ধরেনি। টিপতে যাবার জন্যে একটা হাত বাড়িয়েছে—

আর সঙ্গে সঙ্গে রাতুল একটু পেছনে সরে গিয়েই ধরে ফেলেছে ভবতোষবাবুর হাতখানা। মুহূর্তের মধ্যে বাঁ হাত দিয়ে একটা পায়ে টান দিতেই ভবতোষবাবু পড়ে গেছে চিৎ হয়ে।

এক নিমেষে রাতুল উঠে বসলো ভবতোষবাবুর বুকের ওপর। লম্বা চওড়া চেহারা। মোষের দুধ আর ঘি খাওয়া শরীর রাতুলের হাতের চাপে একেবারে বে-কায়দা হয়ে নিরুপায়ের মতন শুয়ে শুয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

একবার ওঠবার চেষ্টা করতেই রাতুল কনুই দিয়ে পেটে চাপ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষবাবু এক ভীষণ চীৎকার করে উঠলো…

সে চীৎকারে রাতুলের ঘুম ভেঙে গেছে।

রাতুল সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে চোখ চেয়ে দেখলে—কোথায় কে! সে তো সেই বিছানায় শুয়েই আছে। উঠে আলো জ্বাললে রাতুল। পাশের কুঁজো থেকে এক গ্লাশ জল গড়িয়ে খেলে।

তবে সে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই বীভৎস স্বপ্ন দেখছিল নাকি!

আশ্চর্য!

তাই তো বটে! একি অদ্ভুত স্বপ্ন। কেন যে এমন স্বপ্ন দেখলে কে জানে। সমস্ত রাত সে হরিদাসের কথা ভাবতে ভাবতেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল; তারপর ঘুমের মধ্যে সেই-চিন্তার নাগপাশে জড়িয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু ভবতোষবাবুই বা তাকে খুন করবার চেষ্টা কেন করবে। যদি সে রাজী নাই হয়। যদি সে ভবতোষবাবুর প্রস্তাবে রাজী না-ই হয় তা'হলেই বা কে কী করতে পারে? কিন্তু এই অবস্থায় রাজী না হয়েই বা উপায় কী!

ঘরের দেয়ালে একটা ফোটো টাঙানো ছিল। বোধ হয় হরিদাসের ফোটো। প্রায় রাতুলের মতন চেহারাই বটে। একটা সাদা পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে কাবলী জুতো। চুলটাও প্রায় তারই মত করে কাটা।

আজ থেকে তাকে আর কেউ রাতুল বলে জানবে না।

ভাবতেই যেন কেমন কষ্ট হলো রাতুলের। নামে কি আসে যায়। সত্যি কথা। কিন্তু আজ থেকে কি তার অতীত জীবনটাকে একেবারে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হবে। তার বাবা বলে কেউ থাকবে না। তার নিজের বাড়িতে তার ঢোকবার অধিকার পর্যন্ত থাকবে না। জীবনে কত রকম অভিজ্ঞতাই তার হলো। আরো কত হতে বাকি আছে। একদিন তাকে সবাই জানতো রাতুল বলে। তারপর সে-নাম বদলে গিয়ে তার নাম হলো 'কেস নম্বর ৪৯'। আর এখন থেকে হবে হরিদাস। কোন এক হরিদাসের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিতে হবে। এ যেন চিরস্থায়ীভাবে ছদ্মবেশ পরে থাকা। থিয়েটারে একরাত্রের জন্যে 'আলমগীরের' পার্ট করা কত আনন্দের—আর সারা জীবন আগমগীরের পোষাক পরে ঘরে-বাইরে ঘুরে বেড়ানো—সে কী ভীষণ দুর্দৈব! নাম থেকে হাতের লেখা পর্যন্ত সমস্ত তার বদলে যাবে। হরিদাসের পরিচয় তার পরিচয়। হরিদাসের শিক্ষা তার শিক্ষা, হরিদাসের আত্মীয় তার আত্মীয়, হরিদাসের বন্ধু তার বন্ধু, হরিদাসের শত্রু তার শত্রু!

একটা সুটকেশ ছিল ঘরের মধ্যে। রাতুল ঢাকনাটা তুলতেই খুলে গেল। ভেতরে কাপড় জামা, তার তলায় অনেকগুলো চিঠি। একটা চিঠি খুলে পড়তে লাগলো রাতুল। বাঁকা-চোরা হাতের লেখা—

"পল্টু দা, কয়েকমাস তোমার কোনও খবর পাইনি, আমরা বেঁচে আছি কি মারা গেছি তা-ও তোমার খোঁজ রাখবার দরকার হয় না—জানি না এমন পাথরের মত তোমার মনটা কে তৈরী করেছিল—এবার কাঁচামিঠে গাছে খুব আম হয়েছে, পেকে পেকে পড়ে থাকে গাছতলায়…যখন দুপুর বেলা একলা গিয়ে দেখি আমার ভারী কষ্ট হয়…মা বলছে আমি নাকি বড্ড রোগা হয়ে গেছি…তোমার পোঁতা সেই পেয়ারা গাছটাতে এবার ফল হতে আরম্ভ করেছে, তুমি বলেছিলে ও-পেয়ারা প্রথম হলে বুড়োশিবতলার ঠাকুরকে দিতে…আমি প্রথম ফলটা গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুরের পায়ের কাছে দিয়ে এসেছি…খেয়ে দেখলাম খুব মিষ্টি পেয়ারা…আর জানো, সেদিন ঝড়ে বার-বাড়ির সজ্‌নে গাছটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়েছে…"

আর একখানা চিঠি…

"…পল্টু দা' আমার কোনও চিঠিরই উত্তর পেলাম না—জানি না তোমার হাতে এ-চিঠি

পৌঁছোয় কিনা—নাকি পোষ্টমাষ্টার নিজেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে আর হাসে। হয়ত পাগলী ভাবে আমাকে···আমার চিঠি লিখতে আর ভাল লাগে না—এক তরফা কত লিখি···কিন্তু মা কিছুতেই শোনে না, অন্ধ কিনা, তাই হয়ত আমার ভাবনাটা বড্ড ভারী হয়ে বুকে চেপেছে··· বলে—উত্তর পাস্ আর না-পাস্ চিঠি লিখে যা···কিন্তু পন্টুদা, আর কেউ না চিনুক আমি তো তোমাকে চিনি···ফুটবল খেলতে গিয়ে যেদিন তুমি পা ভেঙে বাড়ি ফিরলে—আর যে কোনও ছেলে হলে কেঁদেকেটে বাড়ি মাথায় করতো···কিন্তু তুমি বালিশে মুখ গুঁজে সেই যে পড়ে রইলে··· সারা রাত তোমার পায়ে আমি সেঁক দিয়ে দিলাম—আমি জানতাম কী দারুণ ব্যথা হয়েছিল সেদিন···এক একবার আমি ভাবতাম তোমার বাপ মা ভাই বোন নেই, না-ই বা থাকলো··· আমার তো বাপ মা আছে—তোমাকে ধরে রাখতে পারবো···কিন্তু···আচ্ছা পন্টুদা' তুমি বলেছিলে, তেমন করে ডাকতে পারলে ঠাকুর কথা শোনেন···সে কোন্ ঠাকুর পন্টুদা'—সে কোন্ ঠাকুর···আমাদের বুড়োশিব কিন্তু একেবারে কালা না···"

এই রকম প্রায় তিন শো চিঠি। চিঠির নিচে নাম সই করেছে শৈল। কে এই শৈল? হরিদাসের ডাক নাম বুঝি পন্টু। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস, এমনি অসংখ্য চিঠি লিখে গিয়েছে। রাতুল তারিখটা লক্ষ্য করলে। সব চেয়ে পুরোন চিঠিটি তিন বছর আগের লেখা। কাল সময় করে সমস্ত চিঠিগুলো পড়ে নেবে।

বাক্সর ভেতরের পাঞ্জাবী ধুতি বার করলে রাতুল। একটা পাঞ্জাবী নিজের গায়ে পরলে। ঠিক ফিট্ করেছে। কোনও খুঁত নেই। যদি হরিদাসই তাকে হতে হয় বাধ্য হয়ে, তখন তো হরিদাসই তাকে সাজতে হবে। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে তাকে হরিদাস সাজতেই হবে; তারপর হাতে টাকা এলেই সে আবার বাড়ি ফিরে যাবে। জাহাজের টিকিট কাটবে···নয়ত এরোপ্লেনের।

রাত হয়ত শেষ হয়ে আসছে। বাইরে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে রাতুল। অচেনা দেশের ভোর। তবু ভোর বুঝি সব দেশে একভাবেই হয়। নীল্‌চে নীল্‌চে অন্ধকার, আর ঝাপসা ঝাপসা আলো।

সেই হরিদাসের পোষাক পরে রাতুল ভাবতে চেষ্টা করলো। কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর বাড়ির কথা আর নয়। সে-বাড়ির কথা, সেই গোবিন্দর কথা, বাবার কথা এখন বুঝি অনধিকারচর্চা তার কাছে।

খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের লোনা হাওয়া হু হু করে মুখে এসে লাগছে। কিছু দেখা যায় না কোনও দিকে। কিন্তু রাতুলের মনে হলো সে যেন দেখতে পেলে। ভোর বেলা আম কুড়োতে বেরিয়েছে হরিদাস আর একটি ছোট মেয়ে। তার নাম শৈল। শৈলর আঁচলে

গুচ্ছের আম। হরিদাস আম কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখছে শৈলর আঁচলে। কাঁচামিঠে আমগাছতলায় আসতেই শৈল পেছন থেকে ডাকলে—পল্টু দা'—

পল্টু পেছন ফিরে বললে—কি রে শৈলি—

—বড় ভয় করছে পল্টু দা'—ওখানে শাঁড়া গাছের পেছনে কে নড়ে উঠলো—

—ভয় কিসের, আয়—

বলে পল্টু দুই হাত দিয়ে ছোট বোনটির মত শৈলকে জড়িয়ে ধরে রইল। বললে—কিছু ভয় নেই রে—বুকে হাত দে, বুকে হাত দিয়ে বল্—রাম্ রাম্—রাম—রাম—কুড়ি·বার রাম-নাম জপ কর···ভয় পালিয়ে যাবে—

সেই ভোরবেলা আমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে সেদিন শৈল পল্টুদার কথায় কত কুড়িবার রাম-নাম জপ করেছিল সে হিসেব শৈলর চিঠিতে লেখা রয়েছে। কোথায় কোন্ গ্রামের প্রান্তে কোন্ অখ্যাত জনপদে শৈল থাকে আর কোথায় তার পল্টুদা—হিমালয়ের কোন্ দুর্গম গুহায় আশ্রয় নিয়েছে কোন্ পরমাশ্চর্যের সন্ধানে কে খবর রাখবে।

পেছন থেকে দরজা ঠেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ভবতোষবাবু এল। সারা গায়ে মাটি মাখা, লেংটি পরা। এতক্ষণ বুঝি কুস্তি করছিলো। কী অটুট চেহারা। স্বপ্নে এই ভবতোষবাবুকেই রাতুল কাবু করে চিৎ করে ফেলেছিল।

বললে—কুস্তি করে এলাম—এইবার দোকানে যাব—তোমার চা আর দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি ভাই—

খানিক পরে ফিরে যাবার আগে ভবতোষবাবু পেছন ফিরে বললে—আমার ব্যাপারটার কিছু ভেবেছ নাকি—রাজী তো—

রাতুল ভবতোষবাবুর মুখের ওপর চোখ দু'টো স্থির করে রাখলে। তারপর বললে—আমি রাজী— (ক্রমশঃ)

নিডুবি জাহাজ

ব্রান্‌স্‌উইকের শিল্পীরা এক মজার জাহাজ তৈরী করেছেন। এ জাহাজ ভাঙ্গবে না, ডুববে না। জাহাজে সাতটি মোটরে সাতখানি পাখাওয়ালা প্রোপেলার চলে। সব ক'টি মোটর চললে জাহাজ পায় ২১৫০ হর্স-পাওয়ার। তার ফলে জাহাজ চলে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে। জাহাজখানি লম্বে ৮০ ফুট—চওড়ায় ২২ ফুট। দুটি ডেকে দুশো যাত্রী এবং তিনশো টন মালপত্রের সঙ্কুলান হয়। জাহাজ যখন দাঁড়ায়, তখন জলের নীচে থাকে ১২ ফুট—যখন চলে তখন জলের বুক ছুঁয়ে ছুটতে থাকে। এ-জাহাজ এখন ফেরির কাজে ব্যবহার হচ্ছে। মার্কিন গভর্ণমেণ্ট ছোটখাটো পাড়ির কাজে সর্বত্র এই জাহাজের প্রচলন করবে।

নতুন ধরনের গোলক-ধাঁধা

ঋতুচক্র

ডান ধারের (তলদেশে) শরৎ-কাল থেকে চলতে সুরু করো। তারপরে যথাক্রমে ঋতু পর্যায় (শীত —বসন্ত—গ্রীষ্ম) ভেদ করে চলে যাও—তোমার যাত্রা শেষ হোক মাঝখানের সূর্যে পৌঁছে। এক পথ দিয়ে দু'বার যেতে পারবে না, বা কোনো পথ-রেখা ডিঙিয়ে যাওয়াও চলবে না।

গোলক-ধাঁধার পথের হদিশ

বিভিন্ন ঋতুচক্রে যাবার আগে একবার করে সূর্যলোক ছুঁয়ে যাও।
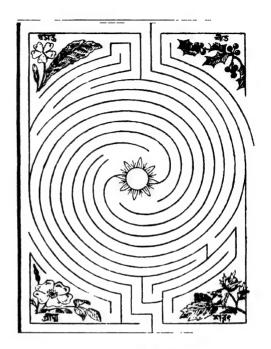
সেতু-অতিক্রম

অভিযাত্রী ভদ্রলোক (ডানদিকের তলায়) অদ্ভুত নদীটার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে পৌঁছুতে হবে ওপারের আস্তানায় (বাঁ-দিকের মাথায়) এবং যাবার পথে প্রত্যেকটা সেতুই একবার ক'রে পেরুতে হবে—আস্তানার গোড়ায় গিয়ে তাঁর যাত্রা-শেষের আগে। কতরকম বিভিন্ন পথে সেতু পার হয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব? নদীর এ-ধারের যে কোনো সেতু দিয়েই তিনি পাড়ি জমাতে পারেন—এবং যে কোনো সেতু যখন যেভাবে ইচ্ছে পেরুতে পারেন—কিন্তু কোনোটাতেই একবারের বেশি নিজের পায়ের ধুলো দিতে পারবেন না। ছাখো তো, কতো রাস্তায় কতো রকমে তাঁর আস্তানায় পৌঁছনো যায়?

ধাঁধার জবাব
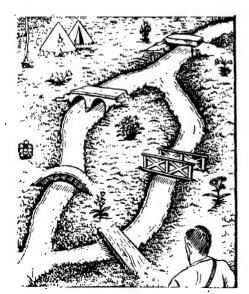
ডাইনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[অষ্টম পৃষ্ঠার পর]

বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখাছিল, সেটার কানা দাঁতে কমড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধ'রেই সে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসীটা খ'সে প'ড়ে ভেঙ্গে গেল, সে নিজেও প'ড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোঁসাইবাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সন্ত-যুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মত পাঁজাকোলে ক'রে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুয়ে দিলেন। গোঁসাইবাবার পাশে পাশেই রয়েছি আমি। এবার গোঁসাইবাবা ডাকলেন—অবিনাশ! মামা!

—অ্যাঁ?

—কেমন আছ?

—ভাল আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশদাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিত্তে ডাইনী আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে দফা যে মার খেয়েছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

অনেকদিন পর, তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা সুরু করলে। পান তরকারি নিয়ে আসত। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ।

স্বর্ণ আসত এর পর আমাদের বাড়ী। আমার ভয় চ'লে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ পৃথিবী পরিত্যক্ত স্বর্ণ।

স্বর্ণ ছাড়া আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক বেশী। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশ্বত্থগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশ্বত্থগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়েছিল। একদিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, মনে হ'ত গাছটার আধখানা আছে আধখানা নাই। শুনতাম ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরমকালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে ব'সে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে গান গল্প করছে, এমন সময় আকাশ-পথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলেছে। সকলে বিস্মিত হ'ল—এ কি? আশ্চর্য মেঘ তো!

গুণীন হেসে বললে—মেঘ নয়, গাছ উড়ে চলেছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে?—কি বলছ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনী-বিদ্যা যারা জানে, তারা গাছে ব'সে বিদ্যার প্রভাবে গাছকে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তর। ডাকিনী চলেছে আকাশ-পথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে—তুমি ধোঁকা দিচ্ছ।

—দেখবে?

—দেখাও।

গুণীন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে একটা চীৎকার উঠল, চিলের মত চীৎকার, এক সঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল দুরন্ত ক্রোধে আকাশের বুক-চিরে চীৎকার ক'রে উঠল, ঈ—!

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ করেই চলল। মেঘের মত জিনিসটির গতি থামল না, কিন্তু সে সামনে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপর নেমে এল এক অশ্বত্থগাছ। গুণীনের মন্ত্র তখনও থামে নি। মাটি ফাটল, গাছের শিকড় মাটির সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি এখানে জন্মানো গাছের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা—গাছের মাথায় দেখা দিল অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে, একপিঠ এলোচুল কিন্তু সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন, দশের সামনে এই অবস্থায়! আমাকে লজ্জা দিলে? আমি ডাকিনী হলেও মেয়েছেলে, আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন হাত বাড়িয়ে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে।—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী—তাদের সবুর হ'ল না।; একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন তাকে ধমক দিলে—না।

ততক্ষণে আর একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুড়ে দিলে। গুণীন আঁতকে উঠল—করলি কি? করলি কি?

ডাকিনী খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিকে ঢেকে নিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের দিকে গামছাটার প্রান্তটা ধ'রে উপরের দিকে টেনে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার ক'রে ফেলে দিলে। গুণীন মর্মান্তিক চীৎকার করে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়াও পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশঃ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উল্টে গেল। চামড়া ছাড়ানো মানুষটা পশুর মত আর্তনাদ ক'রে উঠল। ডাকিনীর খিল-খিল হাসি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে। গুণীন সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল; মন্ত্র আধখানার বেশী পড়তে পারলে না সে। গাছটা আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মত চ'লে গেল—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে। ওই অশ্বত্থ গাছটা সেই আধখানা গাছ।

আজ সে কালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনীতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। ডাইনীও আজ আর নাই বললেই হয়। অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে যারা আজও ডুবে আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে। সে কালের ডাইনীর বিচিত্র গল্পও আজ লোকে ভুলে আসছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শুধু অন্ধ বিশ্বাসই তো নাই—আছে কত মানুষের মর্মান্তিক বেদনা। সারাটা জীবন তারা এই অপবাদের গ্লানি বহন করে চলত, নিজেরাও বিশ্বাস করে নিত এই অপবাদকে সত্য ব'লে, আর ভগবানকে ডাকত—স্বর্ণের মত—আমার এ-লজ্জার বোঝা নামিয়ে দাও প্রভু, এ ভয়ঙ্কর জীবনের অবসান কর। চোখের জল মুছে ফেলত কাপড়ের আঁচলে; মাটিতে কোন-ক্রমে একফোঁটা ঝরে পড়লে—শিউরে উঠত; মা বসুমতীর বুক যে জ্বলে উঠবে!

গুণীর পুরস্কার

শ্রীকালিদাস রায়

গাহিল গায়ন গুণী একজন নৃপতির সভাতলে,
দিল সাধুবাদ, তুলি জয়নাদ যত পারিষদ দলে।
নৃপতি তাহার কণ্ঠের হার খুলি, পরাইল তায়।
মানিক রতনে গাঁথা তা যতনে ঝকমক করে গায়।
রাজা কয় শুনি "বল দেখি গুণী, এত যে গেয়েছ গান।
পেয়েছ কি আর হেন উপহার, হেন অমূল্য দান?"
কহিল গায়ন হাসিয়া "রাজন্, কি আর দিয়েছ মোরে।
গলে না পরালে যেতাম যে ভুলে নিয়ে যেতে সাথে ক'রে।
এত যারে দামী ভাবিয়াছ স্বামী তোমারি থাকুক আহা!
তোমার কণ্ঠ শূন্য করিয়া নিতে চাই নাক তাহা।
মণি-মাণিক্য হীরকে খচিত উষ্ণীষ শিরে যার
কেন বল' দেখি ছিন্ন মলিন কাঁথাখানি ঘাড়ে তার।
এযে এক সাধু ভক্ত পাগল দীন ভিখারীর দান।
বাহুপাশে মোরে বাঁধিল মুগ্ধ শুনিয়া আমার গান।
মোর চেয়ে তিনি ঢের বেশি গুণী তাঁর পায় নম' নম'!
কাঁথাখানি দিয়া বলিল "বৎস আর কিছু নাই মম।
সেই হতে আমি কাঁধে বহিতেছি সে মহাদাতার দান।
যে মান পেয়েছি তার তুলনায় তুমি কিবা দিবে মান?
সে কাঁথা পরশে আজো এ বয়সে পরাণ রয়েছে তাজা,—
তিনি সুরধামে, তাঁর তুলনায় কী দান দিয়েছ রাজা!"

★

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

★

সেবারে পূজার ছুটিতে স্বাস্থ্যান্বেষীদের বড় ভিড়। কাছাকাছির মধ্যে সাঁওতাল পরগণায় ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর যত শহর আছে সবগুলির সবগুলি বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে—অথচ লোক আসার বিরাম নাই। যাহারা বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছে তাহারা জায়গা পাইতেছে, যাহারা অমনি আসিতেছে, ষ্টেশনে কয়েক ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া অন্য স্থানে যাত্রা করিতেছে; বিরক্ত হইয়া অনেকে আবার কলিকাতাতেও ফিরিয়া যাইতেছে।

প্রফুল্লরা কোন একটি স্বাস্থ্যকর শহরে একটি বাসার সন্ধান করিতেছিল—কিন্তু সব জায়গা হইতেই খবর আসিতেছে, আর কয়েকদিন আগে চেষ্টা করিলেই বাড়ী পাওয়া যাইত—এখন নিরুপায়। প্রফুল্লরা প্রায় যখন হতাশ হইয়াছে—তখন সিংভূম জিলার কোন একটি ছোট শহর হইতে নরেনের চিঠি আসিল। নরেন প্রফুল্লর সহপাঠী। এখন উক্ত স্থানে সে কাঠের ব্যবসা করে। নরেন লিখিয়াছে যে একটি বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে, বাড়ীটি ছোট তবে নূতন, স্থানের অভাব রঙের জৌলুষে পূরণ করিয়া দিতে পারিবে, আর ভাড়াটাও চাহিদার তুলনায় সাধ্যের একেবারে বাহিরে নয়।

প্রফুল্ল আনন্দিত হইয়া টেলিগ্রাফ করিয়া দিল—"এনগেজ এট্‌ওয়ান্স"—অর্থাৎ এখনি ভাড়া করিয়া ফেলো।

নরেন তারে জবাব দিল—"এনগেজড্‌ ষ্টার্ট"—ভাড়া করা হইয়াছে, রওনা হও।

পরদিন প্রফুল্ল তাহার স্ত্রীপুত্র ভাই বোন ও একটি চাকর সহ উক্ত স্থানে যাত্রা করিল।

স্থানটির নাম যে কেন গোপন রাখিতেছি গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বেলা আড়াইটার সময়ে প্রফুল্ল সপরিবারে নির্দিষ্ট ষ্টেশনে আসিয়া নামিল—নরেন প্লাটফর্মে

উপস্থিত ছিল, সে প্রফুল্লদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নরেন আগেই কয়েকখানা সাইকেল রিক্সাকে বলিয়া রাখিয়াছিল, এবারে সকলে সেই-রিক্সা যোগে বাড়ীর দিকে চলিল; মিনিট কুড়ি পরে তাহারা সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। প্রফুল্লরা দেখিল সত্যই বাড়ীটি নূতন আর সুন্দর, অবশ্য ছোট সন্দেহ নাই, তবে তাহারাও তো সংখ্যায় অগুণতি নয়, তাছাড়া বাড়ীর কম্পাউণ্ড বেশ বড়। দিনের বেলায় সেখানে কাটাইলেই চলিবে, খোলা হাওয়ায় থাকিতেই এখানে আসা।

প্রফুল্ল নরেনকে সঙ্গে করিয়া কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঘুরিয়া চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইতেছিল—

নরেন বলিল—এবার বড় ভিড়, চালাঘরখানা অবধি প'ড়ে নেই।

প্রফুল্ল শুধাইল—এমন কি প্রতিবছর হয়?

—আরে রাম! সব প'ড়ে থাকে, এবারে একটা বাড়ীও খালি নেই। কত চেষ্টা ক'রে যে এই বাড়ী পেয়েছি—

—আচ্ছা ঐ বাড়ীটা যেন খালি মনে হচ্ছে—

এই বলিয়া সে অদূরবর্তী পাশের বাড়ীটা দেখাইল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের প্রচুর প্রাচীন গাছপালার মধ্যে মস্ত একটা বাড়ী।

নরেন বলিল—ও একটা পুরনো বাড়ী।

—যে চাহিদা তাতে পুরনো আর নূতন।

—ও বাড়ী ভাড়া দেয় না।

—বড়ীওয়ালা আসে বুঝি?

—কখনো তো দেখিনি।

—আশ্চর্য! ভাঙাচোরা বুঝি?

এমন কিছু অব্যবহার্য নয়।

ভাড়া বেশি বলে মনে হয়।

—অসম্ভব নয়। তাছাড়া ও-বাড়ীটা সম্বন্ধে—এমন সময়ে চায়ের ডাক পড়িল, আলাপের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, দু'জনে ফিরিয়া আসিল।

২

শহরের কাছেই সুবর্ণরেখা নদী। নদীর একস্থানে কতকগুলা বড় বড় পাথরের খণ্ড পড়িয়া আছে। আগন্তুকগণের সেটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। কলিকাতার বাবুরা আসিয়া সে স্থানটা

দেখিতে যায়। শূন্য নদী খাতে শুষ্ক পাথরের খণ্ডগুলি দেখিয়া 'আহা আহা' করে, ফটো তুলিয়া নেয়, এবং জ্যোৎস্না রাত্রে সেখানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা বুঝিতে পারে না সেখানে এমন কি দেখিবার আছে, ভাবে কলিকাতার বাবুদের দৃষ্টিই আলাদা।

সেদিন প্রফুল্ল ও নরেন সন্ধ্যার আগে সেখান হইতে ফিরিতেছিল। যখন তাহারা বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে প্রফুল্লর চোখ সেই পাশের বাড়ীর দিকে পড়িল, সেদিনের অসম্পূর্ণ আলাপ তাহার মনে পড়িল, শুধাইল—সেদিন এই বাড়ীটার কথা কি বলছিলে?

নরেন বলিল—হাঁ, বাড়ীটা হানা-বাড়ী।

কৌতূহলী প্রফুল্ল শুধাইল—কিছু দেখেছ?

—না, শুনেছি।

—কি শুনেছ?

—বাড়ীটায় রাত-বিরেতে নাকি আলো দেখা যায়, মনুষের গলার আওয়াজ শোনা যায়, ওখানে নাকি কে আত্মহত্যা করেছিল।

—প্রমাণ কি?

—আরে প্রমাণ নেই, সেই তো ভয়! তাছাড়া এসব জিনিষ কখনো প্রমাণ হয়?

—কেউ সন্ধান করেনি কেন?

—স্থানীয় লোক ভয়ে ওখানে প্রবেশ করে না।

প্রফুল্ল বাড়ীটার দিকে তাকাইল। ছমছমে অন্ধকারে প্রকাণ্ড বাড়ীটা মুখ ভার করিয়া দণ্ডায়মান। প্রফুল্লর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নরেন বলিল—মেয়েদের এসব কথা বলোনা, অযথা ভয় পাবে। তবে দেখো কেউ যেন ওদিকে না যায়, বিশেষ সন্ধ্যার পরে।

দু'জনে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। যখন দু'জনে চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছে—প্রফুল্লর ছোট ভাই টেবিলের উপর কতকগুলি শিউলি ফুল রাখিল।

প্রফুল্ল শুধাইল—কোথায় পেলিরে?

সে বলিল—পাশের বাড়ীতে প্রচুর আছে।

নরেন বলিল—এ যে সন্ধ্যাবেলাকার ফুল এখনো সব ফোটেনি।

গীতীশ বলিল—এখনি তুলে আনলাম, কত ফুল ওখানে।

নরেন প্রফুল্লর দিকে তাকাইল।

রাত্রে শয়নের পূর্বে প্রফুল্ল পত্নীকে বলিল—গীতীশ সেই যে ফুলগুলি তুলে এনেছে, ভালো করেনি।

পত্নী ভাবিল পরের বাড়ীর ফুল মনে করিয়া প্রফুল্ল একথা বলিতেছে, তাই বলিল—খালি বাড়ী—আনলোই বা!

—সেই জন্যই তো বলছি।

—কেন, কি হ'ল?

তখন সবিস্তারে সব কথা প্রফুল্ল তাহাকে বলিল—এবং সাবধান করিয়া দিল—একথা যেন ছেলেমেয়েদের না বলা হয়!

—নিশ্চয়, একথা কি আর বল্‌তে আছে বলিয়াই পত্নী তখনি গৃহান্তরে গিয়া তাহার দুই ননদকে ও গীতীশকে সব বলিয়া ফেলিল—কিছু রঙ চড়াইয়াই বলিল।

বড় ননদ ফুলু বলিল—তাই বলো বৌদি, ও বাড়ীটার দিকে তাকালেই গা ছমছম করে।

ছোট ননদ টুলু বলিল—আমি কাল রাতে একবার ছাদে গিয়েছিলাম, মনে হ'ল বাড়ীটার জানলায় যেন আলো!

গীতীশ কিশোর বালক, ভয় পাইয়াছে বলা চলে না, কিন্তু যেখানে তাহার দুই বোন একরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, সেখানে তাহার অন্যরূপ বলা চলে না, তাই বলিল—আমি যখন আজ সন্ধ্যাবেলায় ফুল আনতে যাই, মনে হ'ল বাড়ীর দোতালার বারান্দায় একটা যেন Shadow। তারপর বলিল—অবশ্য ভূতে আমি বিশ্বাস করি না।

ফুলু বলিল—ভারী বীর কিনা! তবে Shadow কিসের?

—অবশ্যই মানুষের!

—তবে মানুষটা দেখ্‌তে পেলে না কেন?

—অন্ধকার ব'লে।

—আহা কি বুদ্ধি! অন্ধকারে মানুষ দেখা গেল না—অথচ ছায়া দেখা গেল! একি হয় নাকি?

তাহাদের বৌদি জয়তী বলিল—হয় কি নয় সে তর্ক থাক। ওদিকে আর যেওনা। আর এক কাজ করো—ওদিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়ো। সেদিন এই পর্যন্তই।

পরদিন নূতন কৌতূহলে সকলে পাশের বাড়ীর দিকে তাকাইল। ওবাড়ীতে একটু শব্দ হইলেই,—যদি একটা কাক জোরে ডাকে বা একটা জানলা খট্ করিয়া পড়ে সকলে নূতন অর্থভরা

চাহনিতে পরস্পরের দিকে তাকায়। অবশ্য প্রফুল্ল এর মধ্যে নাই, কথাটা তাহার মনের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় প্রফুল্ল নরেনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাহার স্ত্রী, দুই বোন ও ভাই বসিয়া জটলা করিতেছে, পুরনো চাকর হরি প্রফুল্লর ছোট ছেলে ও মেয়েকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে।

ফুলু বলিল—বৌদি কাল রাত্রে ওদিকে যেন একটা চাপা কান্না উঠছিল।

টুলু বলিল—আমিও শুনেছি।

গীতীশ বলিল—কুকুর কেঁদে থাকবে।

ফুলু ও টুলু বিরক্ত হইয়া শুধাইল—তুমি শুনেছ?

—অবশ্য শুনিনি, তবে কুকুর ছাড়া আর কি হবে?

ফুলু বলিল—তবে কেন কথা বল্‌তে এসেছ?

টুলু বলিল—জানো কুকুরে Spirit দেখ্‌তে পায়।

সকলের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এমন সময়ে হরি মিপু ও তিপুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হরি বলিল—বৌদি, ও বাড়ীতে মস্ত একটা হনুমান আছে। গাছের উপর খুব শব্দ করছিল।

চার জনে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল—

—কি ক'রে বুঝলি হনুমান?

—তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় গাছের উপর কি আর লাফাবে?

—সন্ধ্যাবেলায় কি হনুমান লাফায়? হনুমান যে কখন লাফায় না, জানা না থাকায় হরি বলিল—স্পষ্ট দেখলাম।

—কি দেখ্‌লে?

—কালো একটা কি!

—হনুমান কি কালো হয়?

—তাছাড়া আর কি হবে?

—যাই হোক, ওদিকে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেওনা—এই বলিয়া বৌদি ছেলেমেয়েদের লইয়া উঠিয়া গেল।

ফুলু বলিল—হরি ওদিকে আর যেও না।

—কেন দিদি!

—কেন নয়! যেওনা বলছি।

টুলু বলিল—ও বাড়ী ভালো নয়!

গীতীশ ঠাট্টার স্বরে বলিল—গোষ্ট!

—মানে ভূত প্রেত আছে!

হরি বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তাই হবে দিদি! কাল রাতে ও বাড়ীর জানলায় যেন একটা আলো দেখ্‌তে পেয়েছি।

ফুলু ও টুলু সমস্বরে গীতীশের প্রতি বলিল—কেমন এবার হ'ল তো বীরপুরুষ!

—ভূতে কি আলো নিয়ে চলাফেরা করে!

—প্রয়োজন হ'লে করে।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—বেশি বড়াই করো না, টেরটি পাবে।

—ভালই হবে, একটা নতুন জিনিষ জানা যাবে।

তারপরে গীতীশ বলিল—এত তর্কে কাজ কি! ঐ তো ক্যালেণ্ডারে দেখা যাচ্ছে পরশু অমাবস্যা—আমি ঐদিন রাতে যাবো ও বাড়ীতে, বাজি রাখতে রাজী আছো?

ফুলু বলিল—একশ বার রাজী।

টুলু বলিল—না।

—কেন? হেরে যাবে বলে?

—বিপদ ঘট্‌লে দাদার কাছে কে জবাবদিহি করবে?

—ঐ ব'লে পিছিয়ে যাওয়া! আচ্ছা, তোমরা বাজি রাখো না রাখো—আমি যাবই।

—অনেক হয়েছে—এখন থামো।

পরশু দিন। শনিবারে অমাবস্যা পড়িয়াছে। শনিবারই যথেষ্ট, তার উপর আমাবস্যা। ভূত-প্রেতের বারো পোয়া সুবিধা। আরও একট সুযোগ জুটিয়া গেল। সকাল বেলার গাড়ীতে প্রফুল্ল নরেনের সঙ্গে টাটানগর বেড়াইতে গেল। বলিয়া গেল, ফিরিতে অনেক রাত হইবে; বারোটার এদিকে নয়।

গীতীশ বলিল—আজ রাত্রে যাবো।

ফুলু বলিল—এমন কাজ ক'রো না।

টুলু বলিল—যাবে মানে অন্ধকারে খানিকটা কোথাও লুকিয়ে থেকে এসে বাহাদুরি করবে যে গিয়েছিলাম।

গীতীশ বলিল—আচ্ছা এক কাজ করো। সন্ধ্যার আগে তোমাদের একখানা রুমাল ঐ বাড়ীটার সামনে রেখে আসবো। তারপরে রাতে গিয়ে ওখানা আনবো। আর কি প্রমাণ চাও?

ব্যাপার শুনিয়া তাহাদের বৌদি নিষেধ করিল, বোনেরাও নিষেধ করিল, কিন্তু গীতীশ কিছুই শুনিবে না।

তাহাদের এক ভয় পাছে গীতীশের কোন বিপদ ঘটে। আর এক ভয় পাছে প্রমাণ হইয়া যায় সত্যই ও বাড়ীতে ভয়ঙ্কর কিছু নাই। পাশের বাড়ীতে ভীতিজনক কিছু আছে সে এক নূতন অভিজ্ঞতা, কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া কত গল্প করা যাইবে—সে সুযোগ তাহারা এমন ভাবে নষ্ট করিতে চায় না।

কিন্তু সমবয়স্ক মেয়েদের কাছে গীতীশের পৌরুষ আহত হইয়াছে, সে কিছুই শুনিবে না। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও অপরাহ্ণে ও বাড়ীতে রুমাল রাখিতে গেল। দুই বাড়ীর মাঝখানে ছোট একটা প্রাচীর, ডিঙাইয়া অনায়াসে পার হওয়া যায়। ফুলু ও টুলু প্রাচীরের কাছে গেল, গীতীশ রুমাল লইয়া প্রাচীর পার হইয়া ও বাড়ীর বাগানে ঢুকিল। তাহারা দেখিল বাড়ীটার সমুখে যে বাঁধানো বসিবার জায়গা আছে, সেখানে গীতীশ রুমালখানা রাখিল, তারপরে সে ফিরিয়া আসিয়া প্রাচীর পার হইল!

—কেমন দেখ্‌লে তো যে রুমাল রেখে এলাম।

গীতীশ কিছুতেই নিষেধ শুনিবে না। শেষ মুহূর্তে তাহার দুইবোন ও বৌদি কত করিয়া বারণ করিল, হাতে ধরিল—কিন্তু সে অটল।

অগত্যা তাহারা নিরস্ত হইল।

রাত বারোটার কাছাকাছি গীতীশ একখানি লাঠি হাতে রওনা হইল।

দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার বোন ও বৌদিরা ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আশা-আশঙ্কায় মিনিট গনিতে গনিতে দেখিতে লাগিল। তাহারা দেখিল গীতীশ ধীরে ধীরে প্রাচীরটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, এবারে প্রাচীরের উপরে উঠিল, ঘন অন্ধকারেও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এবারে খুব সম্ভব সে ওপারে নামিয়াছে, কারণ তাহার শাদা জামাটা আরও অস্পষ্ট, এবারে আরও অগ্রসর হইয়া গেল—না! আর কিছু দেখা যাইতেছে না। বোধ করি গাছে আড়াল করিয়াছে! মেয়ে তিনটির ভয়ে নিঃশ্বাস পড়িতেছে না! কতক্ষণ হইল! এক মিনিট, তিন মিনিট, না দশ মিনিট! ভয়ের মুহূর্ত আর ফুরাইতে চায় না!

এমন সময়ে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া গীতীশের আর্তস্বর উঠিল!

আলো হাতে করিয়া মেয়েরা, প্রাচীরের দিকে ছুটিয়া গেল!

প্রাচীরের কাছে এদিকে শাদা কি একটা বস্তু! লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল—মূর্ছিত গীতীশ!

'জল আন্, পাখা আন্, স্মেলিং সল্ট আন্!'

বিপদের উপরে বিপদ। এমন সময়ে প্রফুল্ল ও নরেন আসিয়া উপস্থিত। তাহারা এই মাত্র ষ্টেশন হইতে আসিতেছে, বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র কোলাহল শুনিতে পাইয়াছে।

নরেন বলিল—সব বুঝেছি! কি সর্বনাশ! প্রফুল্ল বলিল—লক্ষীছাড়া বুঝি বাহাদুরি দেখাবার জন্যে ও বাড়ী গিয়েছিল।

—নাঃ ভয় নেই, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকই পড়ছে।—নরেন ইতিমধ্যে তাহার বুকে পিঠে হাত দিয়া দেখিয়া লইয়াছে।

তখন সকলে মিলিয়ে মূছিত গীতীশকে তুলিয়া লইয়া ঘরে গেল। শেষ রাতে তাহার মূর্ছা ভাঙিল বটে, কিন্তু এত দুর্বল যে কথা বলিতে পারিল না। নরেনের আর সে রাত্রে বাড়ী যাওয়া হইল না। সারা রাত্রির সেবা-শুশ্রূষার পরে গীতীশ এতক্ষণে সম্পূর্ণ সম্বিৎ ও বাক্শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। প্রথম কথাই সে বলিল—রুমালখানা কই? সেখানা আমি সঙ্গে এনে-ছিলাম।

—কিন্তু ভয় পেয়েছিলে কেন? কিছু দেখনি কি?

—সে আমি বল্তে পারবো না! শাদা শাদা অনেকগুলো মূর্তি!

—তখনি বলেছিলাম যেও না!

গীতীশ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—ও বাবা!

এমন সময়ে বাহিরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

নরেন বলিল—দেখোতো প্রফুল্ল ব্যাপারটা কি?

প্রফুল্ল জানালায় উঁকি মারিয়া বলিল—এ আবার কি? পাশের বাড়ীটা যে পুলিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে!

—সত্যি? তাইতো দেখি! এ আবার কি রহস্য?

রহস্যভেদের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিতেই একজন দারোগা নরেনকে বলিল—যাক্, আপনি আছেন আর ভয় নেই।

—কি হয়েছে?

—একবার কষ্ট ক'রে সার্চওয়ারেণ্টের সাক্ষী হবার জন্য ও বাড়ীতে যেতে হবে।

—কি ব্যাপারটা আগে শুনি।

—আজ কয়েকদিন হ'ল ওখানে কয়েকজন ফেরারী আসামী বাস করছিল। খুঁজতে খুঁজতে এই মাত্র সন্ধান পেয়ে তাদের arrest করেছি!

—ওটা না ভূতের বাড়ী?

—সেই ভয়ের সুযোগ নিয়েই ওখানে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল, ভেবেছিল কেউ সন্দেহ করবে না।

—ক'জন লোক?

—ছ'জন।

—চলো প্রফুল্ল একবার ঘুরে আসি।

—চলো, পাশের বাড়ীটা দেখবার কৌতূহল ছিল, দেখা হয়ে যাক্!

নরেন দারোগার উদ্দেশে বলিল—চলুন যাওয়া যাক।

তাহারা তিনজনে পাশের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

দুপুর

শ্রীশ্যামল দত্ত

দুপুর ঘুমোয়: স্তব্ধ কিষান পাড়া।
হাওয়ার ঝুমুর গাছের পাতায় বাজে।
এখন নেইকো কারো কাজের তাড়া:
তাই বুঝি যাইনি কেউ মাঠের কাজে!

নিটোল কালো দীঘির চতুর্দিকে
সাজানো বেশ তাল-তমালের সারি।
আকাশে মেঘ রঙীন-কালো-ফিকে—
দিচ্ছে যেন কোন্ অজানায় পাড়ি!

কিষান বধূ নাচায় পায়ে ঢেঁকি:
একটানা মিষ্টি আওয়াজ আসে।
অলস বেলায় ব'সে আমি তাই দেখি—
শ্রান্ত নিঝুম্ এই—অবকাশে।

উপন্যাস

মায়ের গলার হার

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১

একটায় চাল, একটায় আটা আর একটা ছোট থলিতে চিনি—সবসুদ্ধু গোটা তিনেক রেশন ব্যাগ নিয়ে অমল নিজেদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘামে ভেজা ময়লা গেঞ্জিটা পিঠের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। দুটা হাত ব্যথায় টন টন করছে। রেশনের দোকান কাছে না। বৈশাখ মাসের এই চড়া রোদে বার তের মিনিটের পথ হেঁটে আসতে হয়েছে অমলকে। তা হোক, কিন্তু বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আজও স্কুলে লেট হতে হবে, আজও ক্লাস-টিচার শৈলেনবাবু এক-ক্লাস ছেলের সামনে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবেন। সেই কথা ভেবেই সবচেয়ে বেশি অস্বস্তি হোল অমলের। এই দিনে-দুপুরেও সদর দরজাটা বন্ধ। হাতের ব্যাগগুলি নামিয়ে রেখে এবার সে জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগল।

'দেখ তো মা, বাড়ীতে ডাকাত পড়ল নাকি। নিশ্চয়ই অমুটা এসেছে। সে ছাড়া অমন বেআক্কেলের মত কড়া নাড়বে আর কে।'

ঘরের ভিতর থেকে মেজদা কমলের বিরক্ত, কর্কশ গলা শোনা গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে অমলও দাঁতে দাঁত পিষে মনে মনে বলল, 'নবাব, শুয়ে শুয়ে কেবল হুকুম জারী করবেন, কে যে কত বড় বেআক্কেল তা সবাই জানে।'

একটু বাদে রেণুকা এসে দোর খুলে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'আয়, ব্যাগগুলি দে আমার কাছে; ইস ঘেমে একেবারে ভিজে গেছিস যে!' ব্যাগগুলি অমলের হাত থেকে তুলে নিলেন রেণুকা। তারপর একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁরে, অত জোরে জোরে কড়া নাড়ছিলি কেন? কমলের ঘুম ভেঙে গেছে বলে ও যে রাগারাগি করছে।'

অমল ভিতরে আসতে আসতে বলল, 'রাগারাগি করছে! করলেই হোল, ওর রাগের

ধার ধারে কে। ভারী নবাব এসেছে কিনা, একটু কড়া নাড়লেই ওর ঘুম ভেঙে যাবে। তুমি ওকে বড় বেশি ভয় কব মা।'

রেণুকা চুপি চুপি বললেন, 'আস্তে, আস্তে, শুনতে পাবে।'

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়েছে। বিছানা ছেড়ে সোজা উঠে এসে কমল একেবারে ওর সামনে। কমল অমলের চেয়ে মাথায় বেশ খানিকটা উঁচু। বয়সেও বছর পাঁচেকের বড়। কয়েক রাত পর পর প্রেসে নাইট ডিউটি দেওয়ায় চোখ দুটো অমনিতেই লালচে হয়ে উঠেছিল! রাগে এখন তা আরো লাল আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

কমল চড়া গলায় বলল, 'কি বলছিস বল্, আমার সামনে বল্।'

অমল একটু ঘাবড়ে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল, 'কী আবার বলব।'

কমল গর্জে উঠল, 'কী আবার বলবি। মিথ্যেবাদী, ভীতু, কাপুরুষ কোথাকার!' ব'লে ঠাস ঠাস করে কমল গোটা দুই চড় বসিয়ে দিলে অবাধ্য ছোট ভাইয়ের গালে।

রেণুকা তাড়াতাড়ি মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, 'আঃ! থাম থাম। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে কমল। ছেলেটা রোদে পুড়ে ঝলসে রেশন নিয়ে এল, আর তুই তাকে অমন করে মারছিস।'

কমল বলল, 'না মারবেনা, ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করবে। রেশন নিয়ে এসেছে তবে আর কি মাথা কিনেছে। রেশন কি অমনি আসে, না তার জন্য টাকা রোজগার ক'রে আনতে হয়! তুমি ওকে আস্কারা দিয়ে দিয়েই এমন সর্বনাশ করলে মা। তোমার জন্তই ওর এমন বাড় বেড়েছে। লঘুগুরু জ্ঞান নেই—মুখে যা আসে তাই বলবে, না?

রেণুকা আর কোন কথা বললেন না। রেশন ব্যাগগুলি একটা একটা করে ভিতরের ঘরে নিয়ে যেতে লাগলেন। রাগে দুঃখে চোখে কেবল জলই এল না অমলের, আগুনও জ্বলতে লাগল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মেজদার দিকে একবার তাকিয়ে অমল ঘরে ঢুকে আধময়লা, ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া ছিটের সার্টটা গায়ে চড়াল, হাতের কাছে যে ক'খানা বই খাতা পেল বগলে পুরল, তারপর পুরোন তালি দেওয়া স্যাণ্ডেল জোড়ার ভিতরে পা গলিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, 'আমি চললুম স্কুলে।'

রেণুকা গম্ভীর মুখে রেশনের আটা থেকে ভুষি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না। বুড়ী ঠাকুরমা বারান্দার এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ ক'রে বসেছিলেন। দু'চোখেই ছানি পড়েছে। কিচ্ছু দেখতে পান না। তিনি বলে উঠলেন, 'তুই কি না নেয়ে, না খেয়েই চললি নাকি? খেয়ে যা।'

বউদি ইলা বারান্দার আর এক কোণে বসে বাকি রান্না শেষ করছিল, তাড়াতাড়ি উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'কেন না খেয়ে যাওয়ার কি হয়েছে। চান করে এসে খেয়ে যাও অমু। কতক্ষণ আর লাগবে।'

অমল বলল, 'আমি খাব না, আমার খাওয়ার সময় নেই। ছাড়, পথ ছাড়।'

ইলা এবার অমলের হাত ধরল, 'লক্ষ্মী ভাই অমন মাথা গরম করে নাকি, এসো খেয়ে যাও। নিজের হাতে বাজার করে মাছ নিয়ে এসেছ। মাছটি বেশ ভালো আজকের। অমল ঠাকুরপো বাজারে না গেলে এমন ভালো মাছ আসে না।

অমল এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'থাক থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। ভালো মাছ আসে না, ওই বলে বলে রোজ আমাকে বাজারে পাঠাও, আর এদিকে আমার পড়ার দফারফা। সরো, সরে দাঁড়াও।' অমল ফের বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে ইলা আবার তার হাত ধরল, 'এসো, খেয়ে যাও।'

অমলের আর ধৈর্য রইল না, 'বলছি যে সময় নেই, এগারটা বাজে ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। তবু হাজার বার খেয়ে যাও, খেয়ে যাও। ওসব ন্যাকামী বড়দার সঙ্গে ক'রো, আমার সঙ্গে নয়।'

আর এক ঝটকায় ইলাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে অমল উঠানে নামল। কমল বিছানা থেকে উঠে এসে এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, এবার তড়াক করে নেমে অমলের ঘাড় ধরল, 'বাঁদর কোথাকার মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলিস তুই, এত বড় আস্পর্দা। বের হ, বের হ বাড়ি থেকে। পড়াশুনো! পড়াশুনো না ঘোড়ার ডিম। সভ্যতা-ভব্যতাই যদি না শিখলি ত' কি হবে পড়াশুনো ক'রে? যা বেরিয়ে যা।'

কমল ওর হাত থেকে বই খাতাগুলি কেড়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অমলকে ঠেলতে ঠেলতে সদর দরজার বাইরে দিয়ে এল।

অমল ঘাড় ফিরিয়ে আরক্ত চোখে একবার দাদার দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'বড়দা আসুক বাড়িতে। তাকে বলে এর শোধ যদি না তুলি'—

কমল বলল, 'তুলিস তুলিস, এসব কথা দাদার কানে গেলে তোর হাড় মাস আলাদা ক'রে ছাড়বে। আমি তো তবু তা বাকি রেখেছি।' বলে কমল ভিতরে চলে গেল।

অমল দ্রুত পায়ে হন হন ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল, পিছন থেকে কানে এল, 'অমু অমু, আমার মাথা খাস্। শোন, শুনে যা।'

সদর দরজা পার হয়ে একেবারে গলিতে নেমে পড়েছেন রেণুকা। হাতে অমুর সেই বই খাতাগুলি।

অমল ফিরে এসে বলল, 'কি বলছ।'

রেণুকা বললেন, 'আয় খেয়ে যা।'

অমল মাথা নাড়ল, 'না।'

রেণুকা বললেন, 'আচ্ছা তা'হলে স্কুল থেকে ফিরে এসে টিফিনের সময় খেয়ে যাস, কেমন? আমি ভাত মাছ সব বেড়ে ঢাকা দিয়ে রাখব।'

আঁচলের গিট খুলে একটি দোআনি বের করলেন রেণুকা। বললেন, 'আর এই নে, দোকান থেকে কিছু কিনে খেয়ে নিস।'

অমল মায়ের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। রোগা রোগা চেহারা মার। মাথার আঁচলের লাল পাড়ের নিচে একটা জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা নেই, তাব বদলে নীল মোটা একটা শিরা ভেসে উঠেছে। উস্কোখুস্কো চুল। সিঁথিতে অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগ।

অমল বলল, 'আমি স্কুলে যাব না মা। মেজদা কেন আমাকে অমন ক'রে মারল।'

রেণুকা একটু হাসলেন, 'মেজদার ওপর রাগ করে স্কুলে যাওয়া তুই বন্ধ করতে চাস নাকি। তুই এত বোকা কেনরে। লেখাপড়া শিখলে লাভ হবে কার। তোর না তোর মেজদার। মেজদাই না হয় মেরেছে, স্কুলে তো আর তোকে মারেনি, স্কুলের ওপর রাগ কিসের তোর।'

অমল বলল, 'কিন্তু তুমি মেজদাকে কিচ্ছু বলবে না?'

রেণুকা বললেন, 'বলব বইকি, নিশ্চয়ই বলব। নিমু অফিস থেকে বাসায় আসুক। আমি সব তাকে বলে দেব। নিমু ওকে আচ্ছা করে বকবে তবে ঠিক হবে। জানিস তো, আমি বললে কোন কাজ হয় না। আমাকে ও গ্রাহ্যই করে না, ঠিক একেবারে তাঁর মত বদরাগী আর গোঁয়ার হয়েছে। তিনিও ঠিক ওই রকমই ছিলেন।'

অমল বুঝতে পারল তার বাবার কথা বলছে মা। সংসার ছেড়ে বাবা অনেকদিন আগে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। অমলের তখন ছ'বছর বয়স। তখনকার কথা কিছু মনে নেই। কিন্তু বড় হয়ে অমলের বার দুই দেখা হয়েছে বাবার সঙ্গে। সেবার হরিদ্বার থেকে কালীঘাটে এসেছিলেন। পরনে গৈরিক আলখাল্লা, মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা। কাঁধে একটা গৈরিক রঙের ব্যাগ। তার মধ্যে গীতা, তুলসীদাসী রামায়ণ আর টুকিটাকি কি সব জিনিসপত্র। ধীর স্থির সুন্দর শান্ত মূর্তি। দেখলে মনেই হয় না মেজদার মত কোনদিন অমন বদমেজাজী, হিংসুটে আর গোঁয়ারগোবিন্দ ছিলেন বাবা।

বাবার সঙ্গে অবশ্য মা রাগ করে দেখাই করেনি। ঠাকুরমা অনেক কাঁদাকাটি করেছিলেন। কিন্তু বাবা শান্ত ভাবে শুধু বার বার বলেছিলেন, 'তুমি ফিরে যাও মা।'

বড়দা আর মেজদাও দেখা করতে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ তারা বেশি কথা বলেনি, বেশিক্ষণ থাকেও নি সেখানে। অফিস আছে বলে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল। বাবাকে ওরা দেখতে পারে না। বাড়িতে কোনদিন তাঁর কথা উঠলে ধমকে সে প্রসঙ্গ বন্ধ ক'রে দেয়। বাবার উপর সবারই ভারী রাগ। অবিবেচক, দায়িত্বহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন বাবার জন্যই সবার এত দুঃখ কষ্ট।

কিন্তু সবাই চলে এলেও অমল আর তার ঠাকুরমা আসেনি। কালীঘাট আশ্রমে তারা দু'জন সারাদিন বাবার সঙ্গে কাটিয়েছিল। দুপুরের দিকে ঠাকুরমা ঘুমিয়ে পড়ায় অমল চুপি চুপি বাবার কাছে এসে বসে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি অনেক জায়গা ঘুরেছেন না?'

বাবা তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তা ঘুরেছি।'

অমল বলেছিল, 'আমারও মাঝে মাঝে অমন ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করে। মনে হয় আমিও বেরিয়ে পড়ি।' বাবা একটু হেসে বলেছিলেন, 'তাই নাকি। কিন্তু তোমার তো এখন বেড়িয়ে পড়বার সময় নয়। মন দিয়ে লেখাপড়া করবার সময়। তাই করো।'

এর জবাবে অমলের অবশ্য অনেক কথা মনে এসেছিল। বললেই হোল মন দিয়ে লেখা-পড়া কর। কিন্তু কি ক'রে মন দেবে পড়ায়। স্কুলে যদি মাইনে বাকি থাকে, সময় মত বইপত্র না জোটে, সংসারে অভাব-অনটন ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে, পড়াশুনোয় কি করে মন লাগবে অমলের। দাদারা যদি ভালো না বাসে, সব সময় গালমন্দ খিটিমিটি করে, কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে বলে, 'এখন একটা কাজকর্ম দেখে নে'—তা'হলে কি আর সে-সংসারে থেকে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে মানুষে?

কিন্তু এসব কথা বাবাকে বলেনি অমল, কোন রকম নালিশ জানায় নি। সে যেন কেমন ক'রে বুঝতে পেরেছিল এ লোকের কাছে কারো বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই। এর বিরুদ্ধেই বড় বড় নালিশ ঝুলছে।

অভাব-অভিযোগ জানাবার বদলে বাবার কাছ থেকে ভারতের নানা জায়গার গল্প সোনার চেষ্টা করেছিল অমল। কিন্তু তাও ভালো ক'রে শোনা হোল না।

'শিবানন্দজী, এদিকে আসুন তো একবার। হরিদ্বার থেকে স্বামীজী চিঠি লিখেছেন। আজই আপনাকে সেখানে রওনা হতে হবে।'

গৈরিকধারী আর একজন সন্ন্যাসী বাবাকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে ছিলেন। সেই দিনই তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে যান। তারপর দু'বছরের মধ্যে আর দেখা হয়নি।

(ক্রমশঃ)

[তোমাদের প্রকাশিত লেখাগুলি ছাড়া গত বৎসরের যে লেখাগুলি আমাদের হাতে মনোনীত হয়ে আছে, এবং প্রতিযোগিতায় যেগুলি পুরস্কার পেয়েছে, সেগুলির একটি তালিকা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হবার কথা ছিল, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ বর্তমান সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না—আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।]

একখানি চিঠি

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আসন্ন নববর্ষে আপনি এবং 'মৌচাক' আমার আন্তরিক শুভকামনা গ্রহণ করিবেন। এই উপলক্ষে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এবার আমার M. A. পরীক্ষার final year, অতএব বাড়ীর সকলে এবং বন্ধুবান্ধবদের পরিহাসের চোটে বাধ্য হয়ে আমায় 'মৌচাকে'র মৌ-মণ্ডলী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে! দশ-বারো বছর আগে, স্কুলের এক নিম্নশ্রেণীতে থাকতে প্রথম আপনাদের 'মৌচাকে' আমি প্রবেশ করি; এতদিন প্রতিটি মাসে তার মধু-পরিবেশন আমায় অনাবিল আনন্দ দিয়ে এসেছে। আজ তার মায়া কাটানো সত্যিই দুষ্কর, কিন্তু অনেকের মতে এখনো 'মৌচাক' পড়াটা নাকি আমার পক্ষে খুব একটা শোভন ব্যাপার নয়। যাক্, আমি তাদের সঙ্গে মোটেই একমত নই, আমার মতে 'মৌচাক' আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইকেই আনন্দ দিতে পটু। এতদিন ধ'রে যে সমস্ত লেখকরা আমাদের সুন্দর সুন্দর উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পরিবেশন করে আনন্দ দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। শিশুমনের রঙ্গীন কল্পনাকে তাঁরা যে কতখানি আনন্দ দিতেন তা তাঁরা নিজেরাই জানেন কিনা সন্দেহ। "জান কি"র পৃষ্ঠায় অসংখ্য নতুন তথ্য আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সাহায্য করেছে। আর মধুদি'র 'মধুচক্র' তো আমাদের মৌচাকের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর সস্নেহ উপদেশ, অনুযোগ বা রসালাপের জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। আপনাদের "পূজা-সংখ্যা"র সুমধুর আয়োজনও শারদীয় উৎসবের আনন্দ সর্বদা বাড়িয়ে দিত।

আশা করি নতুন বছরে 'মৌচাকে'র আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে। চৈত্র মাসের মৌচাকও খুব ভালো লাগল।

আরেকবার আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং 'মৌচাক'কে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি শেষ করছি।

শুভার্থিনী—শ্রীমঞ্জুলা দাস

প্রতিবিম্ব
শিল্পী : শ্রীহারুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমাবস্যার রাতে

সুধীন অনেকদিন পরে দেশে এল বন্ধু বিনয়কে নিয়ে। সুধীনের মা বিনয়কে খুব আদর যত্ন করে বসালেন।

বিনয়কে সুধীন একদিন বললে—মাছ ধরতে যাবি আজ রাতে ?

—রাতে! বাবারে যে সাপখোপের বাসা তোদের এই অঞ্চলে—বাড়ী থেকে বেরুতেই গাটা কেমন যেন শিউরে ওঠে! রাতে না গিয়ে আজ দুপুরেই চল্ না ?

তা হয়নারে,—পরের পুকুর যদি দেখে ফেলে মাছ ধরতে ? তার চেয়ে আজ অমাবস্যার রাত—চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে, কেউ অন্ধকারে তত ভাল আমাদের চিনতে পারবে না।—যাবি ?

বিনয় কি ভেবে বললে—যাব।

রাত তখন দুটো কি তিনটে—দ্বারে কে যেন করাঘাত করল। বিনয় সেই শব্দ শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ কচ্‌লে বিছানা থেকে নামল। তারপরে গায়ে একটা সার্ট চাপিয়ে ঘরের কোণ থেকে ছিপ দুটো নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

ঘনঘোর অমাবস্যার রাত্রি—সন্‌সন্ করে বাতাস গাছের পাতায় মৃদু-মর্মর শব্দ তুলে বয়ে চলেছে। বিনয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়িতে একটা টর্চ পর্যন্ত সঙ্গে না আনতে পারায় তার পথ চলতে খুব কষ্ট হতে লাগল। সে সুধীনকে ডাকল—সুধীন, তোর কাছে টর্চ আছে ?

কিন্তু সুধীন ত' ভাল—কেউই এ কথার উত্তর দিল না।

বিনয় একটু চুপ করে থেকে আবার ডাকল—সুধীন। কিন্তু এবারেও কোন উত্তর এল না। বিনয়ের মনে একটু খট্‌কা লাগল ; তবে কি সুধীন পিছনে পড়ে রইল ! এই রকম ভাবতে ভাবতে বিনয় পথ চলতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই তার ধারণা হ'ল—নাঃ, সুধীন পিছনেই বা পড়ে থাকবে কেন ? তার আগেই ত' সুধীন চলেছে পথের উপর দিয়ে হেঁটে···ঐ ত' তার পা-চলার রীতিমত ধুপ্‌ধুপ্ শব্দ !···এটা ভেবে বিনয় কতকটা স্বস্তি পেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে জাগল একটা সমস্যা-জড়িত প্রশ্ন। সত্যিই আগের লোকটা যদি সুধীন হয়, তবে

তার কথার উত্তর না দিয়ে তাকে পিছনে ফেলে এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছে কেন !
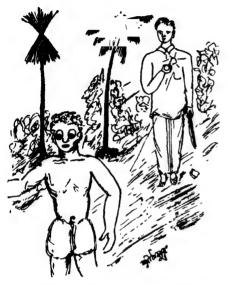
সামনে একটা লোক চলেছে—পেছনে বিনয়

সেই সময়ে পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে জ্বালবার জন্য পকেটে হাত দিয়ে দেখে দেশলাই নেই।

বিনয় বলল—সুধীন, তোর কাছে দেশলাই আছে ? কিন্তু এবারেও সে কারও কাছ থেকে কোন উত্তর পেল না। শুধু বাতাসের একটানা হাড়কাঁপানো সোঁ সোঁ গর্জন আর আগের লোকটার ধুপ্ ধুপ্ চলার শব্দ !...

এই সময় হঠাৎ পায়ে কি একটা বেধে মচ্ করে শব্দ হ'ল। বিনয় হাত দিয়ে সেটা তুলে নিয়ে দেখে দেশলাই। তখনি কাঠি দিয়ে দেশলাইটা জ্বালাতেই সে যা দেখতে পেল তাতে তার অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে উঠল। এতক্ষণ সে যার পিছনে এসেছে, সে সুধীন নয়—অদ্ভুত একটা লোক—বড় বড় পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।...

বিনয়ের পাশ দিয়ে তখন একটা গরু হুড়মুড় করে ছুটে যাচ্ছিল। বোধ হয় কোন লোকের গোয়াল থেকে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে গরুটা। বিনয় ক'ষে তারই লেজের প্রান্তভাগটা ধরল। গরুটা বিনয়কে নিয়েই বড় বড় কাঁটা-বন, মাঠ পার হয়ে ছুটতে লাগল। বিনয়ের গায়ের জায়গায় জায়গায় কাঁটার ঘষায় ছড়ে গেল। ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগল সেই সমস্ত ক্ষতস্থান দিয়ে। গরুটা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সকালের আলো দেখা দিল ততক্ষণ এমনি দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে বিনয়কে নিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। অবশেষে গরুটা পরিশ্রান্ত হয়ে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল।...

ভোর হ'লে কয়েকজন চাষা মাঠে কাজ করতে এসে গরুর লেজের প্রান্তভাগে প্রায় সংজ্ঞাহীন বিনয়কে ঝুলে থাকতে দেখে যেমন খুব অবাকও হ'ল, ভয়ে শিউরেও উঠল তেমনি—তার ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা দেখে। তখুনি কয়েকজন চাষা গরুটাকে ধরে ফেললে, আর কয়েকজন জল নিয়ে এসে বিনয়ের চোখেমুখে ছিটিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বিনয়ের জ্ঞান ফিরে এলে চাষারা তার এই শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলে। বিনয় তাদের গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা খুলে বললে।

চাষা যারা সব শুনে মন্তব্য করলে—এ-দেশে এরকম যে ঘটবে তাতে বিচিত্তির কিছু নেই—আপনাকে নিশিতে ডেকেছিল।

শ্রীঠাকুর

গ্রামের প্রভাত

শিল্পী : কুমারী সর্বাণী বসু

দুষ্টু মেয়ে চাই

লক্ষ্মী মেয়ে তোমরা যেন হয়োনা কেউ ভাই,
ঘরে ঘরে দুষ্টু মেয়ে আজকে মোরা চাই।
বুকে যাদের সাহস আছে মনের মাঝে বল,
শুভ্র-হাসির ছোঁওয়ায় যাদের মুখটি ঝলমল,
এমনিতর দুষ্টু মেয়ে আজকে মোরা চাই
ঘরে ঘরে এমনি মেয়ে আজকে জাগো ভাই।

পথের বাধা মানবেনাকো করবেনাকো ভয়,
বিপদ আঘাত মাঝে যাদের বুকটি উঁচু রয়।
দুঃখ ব্যথায় মলিন কভু হয় না যাদের হাসি,
কথায় কথায় নয়ন জলে যায় না যারা ভাসি,
এমনিতর দুষ্টু মেয়ে আজকে মোরা চাই
ঘরে ঘরে এমনি মেয়ে আজকে জাগো ভাই।

হাসিখুশি চঞ্চলতায় পূর্ণ সারা প্রাণ,
কণ্ঠে যাদের বাজবে সদাই মিলন-বীণার গান।
শক্ত দৃঢ় দেহ যাদের তেজস্বিনী ভাষা,
সবার তরে বক্ষে জাগে অসীম ভালবাসা—
এমনিতর দুষ্টু মেয়ে আজকে মোরা চাই,
ঘরে ঘরে এমনি মেয়ে আজকে জাগো ভাই।

ভাবনা-বিহীন চিত্ত যাদের ভয় নেইকো মনে,
সাঁতার দেবে নদীর জলে ঘুরবে বনে বনে।
কালবোশেখীর ঝড়ের নাচন দেখবে নয়ন ভ'রে,
নদীর জলে ঢেউয়ের মাতন জাগে কেমন ক'রে—
এমনিতর দুষ্টু মেয়ে আজকে মোরা চাই,
ঘরে ঘরে এমনি মেয়ে আজকে জাগো ভাই।

শ্রীরেবা সিংহ

শিকারী

ফটো : শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

নতুন বই

সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন
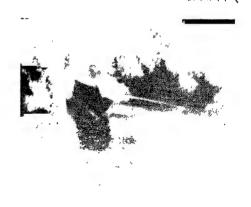
মানুষের বন্ধু—শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য ১।০

মানুষের সত্যিকার বন্ধু তাঁরাই—যাঁরা শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে সুখী করতে চেয়েছেন—দূর করতে চেয়েছেন মানুষের রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা। এবং এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র সেইসব বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে—যাঁরা তাঁদের জীবন-ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের দ্বারা মানুষের রোগ-মুক্তি ও ব্যাধি-মুক্তির পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের মধ্যে এমনি কয়েকজন মনীষীর জীবনী প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষা ঝরঝরে ও বলার ধরন সুন্দর—শিশু-মনকে সহজেই তা স্পর্শ করবে। এ বই প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পড়া উচিত। বইখানির ছাপা বাঁধাই সুন্দর এবং কয়েকখানি সুন্দর ছবি আছে।

শকুন্তলা—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা। সুহৃদ রুদ্র কর্তৃক ৩৩ বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলার নাম সবার উপরে। এই অমর কাব্যের মূল ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজ গদ্যে, পদ্যে ও রূপকথায় লেখক কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে বইটি প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যিক ব্যতীত লেখক খ্যাত-নামা শিল্পীও। সে কারণ তাঁর রচনার মধ্যে যেমন রসসৃষ্টির সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি চিত্রগুলির মধ্যে শিল্প-রুচির নিদর্শন মেলে। বইটির কাগজ, ছাপা, পচ্ছদপট ও তিন রঙা ছবিগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবার হাতে তুলে দেবার মত বই 'শকুন্তলা'।

ছোটদের গ্রন্থাবলী—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৪৲

ছেলেমেয়েদের জন্য যে দু'চার জন হাসির গল্প লিখে থাকেন, তাঁদের মধ্যে শিবরামবাবুর নাম সবার উপরে। তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি রসের কথা, রসিকতা এবং ঘটনার কৌতুকতা নিরস মনকেও রসিয়ে তোলে। তাঁর প্রকাশিত এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাঠকদের বহু ভালো গল্প একসঙ্গে পাবার সুযোগ হ'ল। গল্প ছাড়া এর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসও স্থান পেয়েছে। বই-খানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয়। হাস্যরসের ভক্ত ছেলেমেয়েরা শুধু নয়, প্রবীণরাও এই গল্পগুলি পড়ে খুশি হবেন।

কালোর বই—শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার। দিগন্ত পাব্লিশার্স, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা। মূল্য ১॥০

কালোর বই শিশু-সাহিত্যে সত্যই একটি নতুন ধরনের বই। এত সুন্দর ক'রে জীবজন্তুদের সঙ্গে মানুষের চরিত্রকে মিলিয়ে-মিশিয়ে ছড়ায়, গল্পে লেখক যে রসসৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই অপূর্ব। এর জন্য আমরা লেখককে ধন্যবাদের সঙ্গে শিশু-সাহিত্যে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। একমাত্র অবনীন্দ্রনাথের পর এ-ধরনের প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ আর কেউ করেন নি। ছবিতে-ছাপায়-লেখায় এমন সুন্দর একখানি বই সব ছেলেমেয়েদেরই পড়া উচিত।

মধুচক্র

নববর্ষ—বর্ষ-পথিক থেমেছে বারোটি মাসকে প্রদক্ষিণ করে। তাকে নব-কলেবরে নতুন রূপে দেখবার আশায় আমরা ব্যকুল প্রতীক্ষা করছি। বছরের স্থরুতে নতুন আশা নব নব আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনায় চিত্ত ভরে উঠছে—গত বছরের যতকিছু গ্লানি ম্লানিমা সব মুছে যাক, যা কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেছে তার এতটুকু রেখাও যেন আমাদের মনকে আর না স্পর্শ করে। নব-জাগরণে, নতুনের স্পর্শে, নব-আশায় আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি। আজকের দিনটি ঘিরে এই প্রার্থনাই রইল।

চির-নূতনেরে দিল ডাক—আবার যখন তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে তখন একটি মাস শেষ হয়ে যাবে—আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শুভ-জন্মদিনটিও চলে যাবে। এই দিনটি ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর একটি গৌরবজ্জ্বল দিন—এই দিনটিতে পৃথিবীর বুকে যে ক্ষুদ্র শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তাঁর কথা আমরা সবাই জানি। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েকে সেই একটি ছবি যা দেখালেই তারা আনন্দে চীৎকার করে বলে ওঠে: 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ'! বাস্তবিকই এই আমাদের কথা কয়টির ভিতর এমন একটি তৃপ্তি আছে যা শুধু আনন্দই দেয় না, গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীর বুক।

তোমরা যারা এখনও অনেক ছোট—তাদের অনেকেই কবিগুরুর সব কথা ভালো করে জান না। জান না তাঁর শান্তিনিকেতনকে—জানোনা তাঁর অধ্যবসায় ও সাধনাকে। তাই ছোট্টদের বলি যাদের অক্ষর পরিচয়ও হয়েছে, তারা রবীন্দ্রনাথের লেখা তাদের উপযুক্ত যেসব বই আছে তা পড়ো, তাঁকে জানো, তাঁকে বোঝবার—অর্থাৎ তিনি কি ছিলেন তা জানবার স্থযোগ গ্রহণ কর,—শুধু তাঁর জন্মদিনে ছবির নিচে প্রণাম করাটাই বড় কাজ নয়—তাঁকে চেনো বোঝো—বুঝে তোমাদের ক্ষুদ্র বুকে যত ভালবাসা শ্রদ্ধা আছে তা সব নিবেদন কর তাঁর উদ্দেশে। আর যারা বড় হয়েছ, জীবনের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছ, তাদের আর বেশী কি বলবো—তাদের নিজেদেরই অনুপ্রেরণায়, নিজেদের উৎসাহেই এসব করবে ব'লে, করাবার কিছু নেই বলেই আমার মনে হয়।

২৫শে বৈশাখ দিনটি তোমরা কোনদিন ভুল না। রবীন্দ্র জন্মদিবস পালন করা মানে—খুব ঘটা করে নাচ গান উৎসব নয়। আমি মনে করি শান্ত পরিবশের মধ্যে অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে আমরা যা করি বা করে থাকি তার মূল্য অনেক—এই আড়ম্বরবিহীন, একান্তভাবে —মনের গভীরে যে স্মরণ—তাই হয় সার্থক, তাই হয় সত্য। কবি নিজে তাঁর 'ভাঙা মন্দির'

কবিতায় এক জায়গায় লিখেছেন: 'উৎসব রসে সেই তো পূজন জীবন উৎসতীরে'। তোমরা যারা এই কবিতাটি না পড়েছ—'পূরবী' থেকে পাঠ করে দেখো কত ভাল লাগবে। আবার বলি: ২৫শে বৈশাখকে তোমরা ভুল না—তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ কর, বরণ কর।

মজার খেলা—মজার খেলার উত্তর যাদের ঠিক হয়েছে তাদের নাম—মৈত্রেয়ী দত্ত, বহরমপুর; অনিমা সান্যাল, জলপাইগুড়ি; লতা নিয়োগী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মিঠানী; নলিনী রায়, কটক; সুব্রত সেন, চাইবাসা; অশোককুমার সরকার, গড়বেতা; পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা; বাণী মজুমদার, লক্ষ্ণৌ; অমিত রায় ও প্রেমেন আঢ্য, কোলকাতা; অলক চক্রবর্তী, কোলকাতা; পিণ্টুবাবু, লক্ষ্ণৌ; জয়, দার্জিলিং; অজন্তা চক্রবর্তী, কোলকাতা; নীপু সেন, কোলকাতা; প্রভাত সরকার, অমর মল্লিক, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত ভট্টাচার্য ও রণজিৎ ঘোষ, কোলকাতা; নন্দনের সভ্য-সভ্যাগণ, ব্রততী চট্টোপাধ্যায়, মাণিকতলা; গোপা পাল, কোলকাতা; তনিমা মুখোপাধ্যায়, বেহালা; অরুণ ও প্রতিমা চক্রবর্তী, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট; মণি সেন, দার্জিলিং; বাণী সিংহ, কোলকাতা; রত্না রায়, দমদম। নতুন মজার খেলাটি দিচ্ছে অলক চক্রবর্তী কোলকাতা থেকে:—

"কন্যার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রং যেন ফিঙের পালক, চোখ দু'টিতে হরিণের চমকে ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদী নিয়ে এল স্বর্ণ চন্দন বাটা, তাতে মুখের রং হবে যেন চাঁপা ফুলের মতো। কেউ-বা আনল ভৃঙ্গলাঞ্ছন তেল, তাতে চুল হবে পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ বা আনলে মাকড়সাজাল শাড়ী। কেউ-বা আনলো হাওয়া-হালকা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মত হয় না।"

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি—অলক চক্রবর্তীর মত তোমরাও মজার খেলা পাঠাতে পারো। কিন্তু বইয়ের লেখক, পৃষ্ঠা, সব লিখবে এবং এইটুকু আমার উপর নির্ভর করবে—যদি আমি বুঝি সেটা ছাপা হবে। এনিয়ে তোমরা পরে কোনো অনুযোগ করতে পারবে না।

তোমাদের চিঠির উত্তর—সলিলচন্দ্র সেনগুপ্ত (ভুবনেশ্বর)—মৌচাক এখন তো ভাই ঠিক নিয়মেই আত্মপ্রকাশ করে, তোমার কাছে পৌছতে তার গতি এত মন্থর হয় কেন? ভাবিয়ে তুললে সলিল; কেননা তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই—দৈবাৎ এক সময়ে হয়তো হতে পারে, কিন্তু তুমি কি এটা বাঁধাধরা হিসাবে ফেলছো নাকি? আর 'মজার খেলা' প্রকাশিত হয়না এই বা কেমন কথা বলোতো ভাই? এ ছাড়া ধাঁধার সম্পর্কে তোমার অভিযোগও ভিত্তিহীন। তুমি হয়তো অনেকদিন 'মৌচাক' হাতে পাওনি বা পড়নি—উপরি উপরি 'কয়েকমাস' মৌচাক দেখো

তোমার কথার সমতারক্ষা হবে না। আমাকে তুমি অনায়াসে তুমি বলতে পারো। **প্রণব ও প্রভাত ভট্টাচার্য** (আসানসোল)—তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হোষ্টেলে ভর্তি হয়েছ শুনে খুব খুসী হয়েছি। ওখানকার জীবনযাত্রা ও আদর্শ আমার খুব ভালো লাগে—যদি সম্ভব হয় সকাল থেকে রাত তোমরা কি কর, কি ভাবে চলো, সব সুন্দর ক'রে গুছিয়ে লিখে জানিও। **ইরা চৌধুরী** (ভবানীপুর)—উত্তর পাওনি বলে যে অভিযোগ করেছ তা কিন্তু ভাই ঠিক নয়। চিঠি পেলে উত্তর দেবো না কেন—তার তো কোনও কারণ নেই। টিকিট পাঠিয়েছিলে আর আর কি বলতে চেয়েছিলে আবার যে ভাই লিখতে ও করতে হবে—কারণ সে চিঠিখানি নিশ্চয়ই পথে কোথাও বিশ্রাম করছে। **বিভা** (লক্ষ্ণৌ)—আশা করি এতদিনে তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, কেমন হলো জানিও। পিণ্টুকে সভ্য করে নাও,—সবরকম হাতের লেখা পড়েই আমরা অভ্যস্ত আছি—কাজেই কোনো অসুবিধা হবে না। **সুজিতকুমার চৌধুরী** (নিউ দিল্লী)—আট আনার ডাক টিকিট পাঠালেই মৌমাছি দলভুক্ত হবে, কিম্বা বাৎসরিক চাঁদার সঙ্গে আট আনা বেশী দিলেও হবে। লেখা সব সম্পাদক মশায়ের নামে পাঠিও—তিনিই বিচার করেন সব লেখা। **গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়** (মিঠানী, বর্ধমান)—চিঠি হাতে এলেই উত্তর দিয়ে থাকি। বিষ্ণুচরণ ঘোষ মশায়কে তুমি অল ইণ্ডিয়া রেডিও ১, গ্যারষ্টিন প্লেস, কলিকাতা—এই ঠিকানায় লিখলে তিনি পাবেন। ব্যায়াম পত্রিকার ঠিকানা আমি জানি না। হিন্দী শেখা দরকার—তবে সেটা কেমন করে ও কি ভাবে হবে ভেবে বলবো। **বাণী সিংহ** (সর্দার শঙ্কর রোড, কলিকাতা)—তোমার ডাক টিকিট পেলাম, ঠিক আছে, বন্ধুত্ব পাকা হলো। তোমার পরীক্ষা খুব ভালো হোক—এই আশাই করি। **কানাইলাল ঘোষ** (চন্দননগর)—গল্প শুনবে? আমি রাজী আছি, কিন্তু!—আসতে বলতেই পারো, কিন্তু ভাই কবে সম্ভব হবে বলতে পারি না। বাড়ীর ঠিকানা কি হবে? মৌচাকই তো যথেষ্ট। **অশোক সরকার** (গড়বেতা), **সুব্রত সেন** (চাইবাসা), **নন্দিনী রায়** (কটক) **পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়** (গোবরডাঙ্গা)—তোমার চিঠি পেয়েছি। পার্থ, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, মিঠানী বর্ধমানের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—রাজী আছ তো? জানিও বা ওকে চিঠি লিখো। **রত্না রায়** (দমদম)—তোমরা যদি নিজে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাও তা'হলে আমি কি করি বলোতো?—মধুচক্রের গুঞ্জন থেমে যাচ্ছে যে। কলকণ্ঠে ভরে উঠুক মধুচক্র—এসো তাড়াতাড়ি, সকলকে ডাক দিলাম।

সকলে নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিও। তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**।

বিতর্ক-সভা

বিতর্ক-সভার সিদ্ধান্ত স্থানাভাবে এ-মাসে প্রকাশিত হ'ল না—আগামী মাসে প্রকাশিত হবে এবং এ-সম্পর্কে যাদের লেখা ছাপা হয়েছে বা হয়নি তাদের সকলকে নিয়েই সভাপতি মহাশয় আলোচনা ক'রে তাঁর মতামত জানাবেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

ভাবের অভিব্যক্তি

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

৩নং

৪নং

৫নং

৬নং

গত বৈশাখ মাস থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে, আগামী ভাদ্র মাসে শেষ হবে। যে কোন লোক এই প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠাতে পারেন। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ফটো গৃহীত হবে।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৮

৩২শ বর্ষ—২য় সংখ্যা

লেখক হবার সখ

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

*

দাওনা বলে মস্ত লেখক হবো কেমন ক'রে,
ইচ্ছে আমার পূর্ণ হবে, রাত্রি যাবে ভোরে !
সকল স্কুলের গুরুমশাই আমার কবিতার
করতে বলবে ব্যাখ্যা মানে, পারবে না যে তার
হবে জোরে কানমলা, বেত, গাধার টুপি মাথায় ;
আমারি গান গাওয়া হবে সব সমিতি-সভায়।
দোকান পাশে দাঁড়িয়ে অবাক দেখবো চেয়ে চেয়ে
আমার কাব্য কিনছে, নিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে ;
চকচকে আলমারী-ভরা ঝকঝকে বইগুলো
হাসবে যেন আমায় দেখেই ; পড়বে রাণু-ভুলো
'মৌচাকে'তে গল্প নতুন, 'ফুলঝুরি'তে ছড়া ;
বাবা পড়বে আমার গল্প বিভীষিকায় ভরা,

উঠবে কেঁপে শয্যা'পরে, ঘুম যাবে কোন দূরে ;
বাদল-ধারায় আকাশ যবে ভরবে ব্যথা-সুরে।
মা পড়বে কাব্য আমার, ভুলবে ঘরের কাজ ;
সজল হাওয়া খেলবে ঘরে, ডাকবে মেঘে বাজ !
ট্রামে হয়ত যাচ্ছি আমি প্রতিমাদি'র বাসায়,
তুইটি মেয়ে পড়ছে বসে 'বসুধা'রি পাতায়
রোমাঞ্চকর ছোটগল্প, বলছে হ'লে পড়া,
'এমন লেখা পাইনেকো আর দারুণ থ্রিলে-ভরা,
ভাবছি এখন লেখক সাথে, আলাপ ক'রে আসি ;'
আমি তখন অনেক কষ্টে চাপছি বসে হাসি !
আসবে ডাকে নানান রকম রঙিন চিঠি বই,
'টাকা দিলাম আগাম ক'রে গল্প এলো কই ?'
'ভুল না ক'রে প্রবন্ধটা পাঠিয়ে দেবেন ডাকে।'
'আসবো নিয়ে কাব্যচয়ন যে কোন এক ফাঁকে।'
নেবো বহু বিরাট সভায় সভাপতির আসন,
অটোগ্রাফের তরে লোকে আসবে যখন তখন।
দূর দেশে এক শীতের রাতে রেস্তোরাতে বসে
ভাব জমিয়ে লোকের সঙ্গে কফি খাচ্ছি কসে,
কথায় কথায়—তর্ক যবে লেখক নিয়ে চলে
'চেনেন অপু রায়কে মশাই ?' হঠাৎ যদি বলে,
বলবো হেসে, 'দেখেছিলাম কয়েক বছর আগে,
তার লেখা তো পড়তে আমার ভীষণ ভালোলাগে !'
দারুণ মজা লাগবে এসব ভাবতে মনে মনে
আমার নাটক অভিনয়ে ডাকবে সবাই ফোনে।
লেখক বলে সবার কাছে পাবো অনেক আদর,
আসবে না তো সন্ধ্যাবেলা প্রাইভেট টিউটর !
যাবে না আর পাঁচু চাকর ইস্কুলে রোজ ধ'রে,
দাও না বলে মস্ত লেখক হবো কেমন করে।

গঙ্গার কূলে থাকেন ঋষি। জপ-তপ, পূজা-আর্চা নিয়েই সারাদিনটা কাটে—সন্ধ্যা হলে আহ্নিক সেরে ঐ গঙ্গার ধারেই তালপাতার একটু ছাউনি—সেই ছাউনিতে গিয়ে নিজের হাতে হবিষ্যি রান্না করেন—রান্না হলে হবিষ্যি খাওয়া—তারপর ঘুম। ত্রিসীমানায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ঋষি একা থাকেন—সঙ্গী বা সাথী বলতে তাঁর ছাউনিতে থাকে এক নেংটি ইঁদুর। খাওয়া হলে ঋষির পাতে যেটুকু যা পড়ে থাকে, তাই খেয়ে নেংটি আছে বেঁচে।

ঋষির গা-ঘেঁষে নেংটি ছুটোছুটি করে—বাঘ-ছাল পেতে ঋষি শুলে নেংটি সেই বাঘ-ছালে ঋষির পায়ের কাছটিতে প'ড়ে ঘুমোয়। নেংটির উপর ঋষির ভারী মায়া—নেংটিকে ডেকে ঋষি তার সঙ্গে কথা কন—নেংটিকে তার সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করেন...নেংটি বলে।... এমনি করে দিনের পর দিন কাটছে!

একদিন ঋষির খাওয়া হলে নেংটি বললে—প্রভু, আমার উপর আপনার অসীম দয়া—মানুষের মতো কথা কইবার শক্তি দিয়েছেন আমাকে—কিন্তু আপনি কি রাগ করবেন, যদি আমার মস্ত দুঃখ আপনার চরণে আমি নিবেদন করি?

হেসে ঋষি বললেন—না না নেংটি—তুমি নির্ভয়ে বলো, কি তোমার নিবেদন।

নেংটি তখন বললে—আপনি দিনের বেলায় জপ-তপ নিয়ে বাইরে থাকেন—ছাউনিতে আমি একা—তখন একটা বেরাল এসে যা করে...ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে থাকি...নেহাৎ আপনি আছেন তাই—না'হলে কবে আমায় গপ্ করে খেয়ে ফেলতো!

ঋষি বললেন—হুঁ...তা বেশ, বলো কি তুমি চাও?

নেংটি বললে—দয়া করে আমায় যদি বেড়াল করে দেন্ তা'হলে আমি নির্ভয়ে বাঁচতে পারি।···

ঋষি বললেন—তথাস্তু! মন্ত্র-পড়া জল তিনি দিলেন নেংটির গায়ে ছিটিয়ে।

চক্ষের পলক পড়লো না···ঋষির কথার সঙ্গে সঙ্গে নেংটি হলো বেরাল···ডাকলো, ম্যাও···

তারপর দিন যায়, রাত আসে···রাত্রি যায়, দিন আসে···

ক'দিন পরে ঋষি বললেন—কিগো পুশু···বেড়াল হয়ে আরামে আছো তো?

ভুরু কুঁচকে পুশু বললে—আপনার অসীম দয়া প্রভু—কিন্তু···

ঋষি বললেন—কিন্তু কিসের আবার?

নেংটি-পুশু বললে—আজ্ঞে ক'দিন ছিলাম ভালো—সম্প্রতি এই বিপদ···মানে, নদীর ওপারে থাকে একপাল কুকুর—দিনের বেলায় আপনি যখন জপ-তপ করেন, তখন তারা জিভ্ বার করে যে-চোখে আমার পানে তাকায় প্রভু···আপনি আছেন তাই···না'হলে দাঁতে কেটে আমায় কি যে করতো!···

ঋষি মনে মনে হাসলেন—বললেন—হুঁ···তা'হলে তোমার অভিপ্রায়টি কি?

কাকুতিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে নেংটি-পুশু বললে—আজ্ঞে, দয়া করে আমায় যদি কুকুর করে দেন্, তা'হলে নিশ্চিন্ত হয়ে···

—বেশ! ব'লে মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে ঋষি বললেন—তাই হোক···তুমি কুকুর হও!

কথার সঙ্গে সঙ্গে নেংটি হয়ে গেল ইয়া এক তাগড়া জোয়ান কুকুর···

আবার এতদিন যায়, ততদিন যায়—নেংটি কুকুর এসে একদিন ঋষিকে বললে—আবার আপনাকে জ্বালাতন করছি, প্রভু···

ঋষি বললেন—কেন, আবার কি হলো তোমার?

নেংটি কুকুর বললে—কুকুর হয়ে দেখছি প্রভু, অনন্ত জ্বালা!—আপনার ঐ হবিষ্যির গুঁড়ো খুঁটে খেয়ে পেট ভরে না।···আপনি আমাকে এত বড় কুঁদো দেহ দিয়েছেন, ও-খাওয়াতে এত বড় দেহ থাকবে কেন? এর চেয়ে আমায় যদি বাঁদর ক'রে দেন—তা'হলে মনের সুখে এ-গাছে ও-গাছে ঝাঁপ দিয়ে আমি নানা ফলমূল খেয়ে পেট ভরাতে পারি! আমার উপর আপনার অসীম দয়া প্রভু—তাই একথা বলতে ভরসা পাচ্ছি!···

ঋষি মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে তার গায়ে দিয়ে বললেন—তাই হোক···তুমি বাঁদর হও!

বাঁদর হয়ে নেংটি মহানন্দে হুপহাপ করে লাফ দিয়ে গাছে উঠলো। তারপর এ-গাছ

ও-গাছ করে ফল যা খেলো···পেট ভ'রে খেতে পেলে যে কী-আরাম···আজ সে তা বুঝলো—বুঝে মহাখুশি !

কিন্তু এ-খুশি ক'দিন বা !···

শীতের পর গরমকাল···গঙ্গার বুকে চড়া পড়েছে···খাল-বিল-পুকুর-ঝিল শুকিয়ে টা-টা করছে—তেষ্টায় ছাতি ফাটে—বাঁদর জল খেতে কোথায় যায় ? গঙ্গার কাদায় পড়ে মোষের পাল···ভয়ে বাঁদর সেদিকে ঘেঁষতে পারে না।

একদিন দু'দিন তিনদিন কাটবার পর বাঁদর গিয়ে আবার ঋষির কাছে পড়লো। বললে—প্রাণ আর বাঁচে না প্রভু !

ঋষি বললেন—কেন, আবার কি হলো তোমার ?

নেংটি-বাঁদর বললে—তেষ্টায় প্রাণ যায় প্রভু···জল খেতে হলে মোষ হওয়া ছাড়া উপায় নেই···দয়া করে আমায় মোষ করে দেন্ যদি···

নেংটির উপর ঋষির অত্যন্ত মায়া···দিলেন তিনি তাকে তখুনি মোষ করে···

মোষ হয়ে সে গিয়ে নামলো জল-কাদায়···রোদের তাপ ঘুচলো···ভিজে কাদায় নাক-মুখ গুঁজে জল খেলো···জল খেয়ে তেষ্টা মিটলো—আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো যেন নেংটি-মোষ।

তারপর একদিন যায়—দু'দিন যায়—তিন দিনের দিন···বনে ঘুরতে দেখে, নেংটি মোষ দেখে—রাজ্যের রাজা এলেন বনে—রাণীকে নিয়ে প্রকাণ্ড এক হাতীর পিঠে চড়ে। হাতীর পিঠে মখমলের হাওদা—তাতে সোনার জরির ঝালর ঝুলছে—হাতীর মাথায় সোনার মুকুট—বড় বড় দাঁতে হীরে-মোতির বালা পরানো···রাজার লোকজন চামর দুলিয়ে পাখা করছে···হাতীর পিঠে যাতে মশা-মাছি না বসে।

হাতীর সাজসজ্জা আর আদর দেখে নেংটির মন ভেঙে পড়লো ! কী সে মোষ হয়ে নাচানাচি করছে ! বনের মোষকে কেউ দেখে না···খবর নেয় না···আদর করে না···মোষের বদলে হাতী হতে পারলে !···

এলো সে আবার ঋষির কাছে—

ঋষি বললেন—এই যে নেংটি···কেমন, এখন দুঃখ ঘুচে মনের সুখে আছো তো ?···

মুখখানা কাঁচুমাচু করে নেংটি বললে—না প্রভু···মোষ হয়ে কী আর হলো ! আমায় যদি হাতী করে দেন তা'হলে কেমন সোনার ঝালর-দার মখমলের হাওদা আমার পিঠে চাপিয়ে সেই হাওদায় বসে রাজা-রাণী বেরুবেন শহরে—

ঋষি হাসলেন। হেসে বললেন—বেশ…এই কথা…এর জন্ম আপসোস থাকবে কেন, তোমাকে হাতীই করে দিচ্ছি।…

আবার সেই মন্ত্র-পড়া জল ছিটুনো! জল ছিটিয়ে ঋষি বললেন—তুমি হও হাতী—রাজার হাতীশালের হাতী!

নেংটি চক্ষের নিমেষে হলো হাতী…রাজার হাতী…রাজার লোকজন কোথা থেকে খবর পেয়ে এসে তাকে নিয়ে গেল রাজার হাতীশালে!

হাতীশালে কত তার আদর—দশজন চাকর হামেহাল তাকে দেখছে…তাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো—রাত্রে চামর দুলিয়ে মশা-মাছি তাড়ানো—নেংটি ভাবে, আমিই বা কে রাজাই বা কে!

তারপর রাণীর একদিন ইচ্ছা হলো, তিনি গঙ্গাস্নান করতে যাবেন! রাজা বললেন—ঐ নতুন হাতীটাকে আনো—রাণী নতুন হাতীর পিঠে চড়ে স্নান করতে যাবেন!…

হাতীশাল থেকে নেংটি-হাতীকে আনা হলো…রাজা হাতীর পিঠে হাওদায় চেপে বসলেন। রাজা পিঠে উঠতে নেংটি-হাতীর কী আনন্দ…রাজা তার পিঠে বসেছেন! রাজার পর রাণী উঠছেন পিঠে…নেংটির হলো রাগ! কী…রাণী হাজার হোক্ মেয়েমানুষ—রাণীকেও পিঠে বইতে হবে! এমন অপমান!…সে খাপ্পা হয়ে উঠলো—মাথা নেড়ে এমন করে গা-দুলোলো যে রাণী ছিট্‌কে পড়ে গেলেন রাজবাড়ীর দেউড়ির সামনে। হাঁ হাঁ করে লোকজন এলো ছুটে—রাজা নেমে পড়লেন হাতীর পিঠের হাওদা থেকে…নেমে রাজা নিজে যত্ন করে রাণীকে তুললেন মাটি থেকে…তুলে হুকুম দিলেন—তাঞ্জাম আনো…তাঞ্জাম—

লোকজন তাঞ্জাম নিয়ে এলো…রাণীকে রাজা তাঞ্জামে বসালেন—রাণীর গায়ের ধূলো দিলেন ঝেড়ে…তারপর কত সহানুভূতি…কত আদর…নেংটির পানে চেয়ে রাজা বললেন—নিয়ে যাও এ হাতী…এটি ভারী দুষ্টু…নেহাত বুনো…ওকে হাতীশালের বাইরে বেঁধে রাখবে…খুলে নাও ওর পিঠ থেকে হাওদা…ও আগে ঢিট হোক্…তারপর ওর পিঠে চড়া…

নেংটির হাতীশালে ঠাঁই হলো না…রাজার লোকজন তাকে হাতীশালের বাহিরে রাখলো বেঁধে…

তারজন্য নেংটির দুঃখ নেই…তার দুঃখ যে, হাতীর কী-ই বা আদর রাজার কাছে…হাতীর চেয়ে ঢের বেশী আদর ঐ রাণীর,…সে ভাবলো—নাঃ, আমাকে রাণী হতে হবে!…

কোনোমতে বাঁধন খুলে নেংটি এলো ঋষির কাছে ফিরে…ঋষি বললেন—কেমন, হাতী হয়ে মনের সাধ মিটেছে তো—ভালো আছো?

নিঃশ্বাস ফেলে নেংটি বললে—না প্রভু···হাতীর উপরে রাণী···হাতীর চেয়েও রাণীর অনেক বেশী আদর দেখছি রাজার কাছে !···

হেসে ঋষি বললেন—তুমি এখন রাণী হতে চাও তা'হলে ? ··

নেংটি-হাতী শুঁড় নেড়ে বললে—আপনার দয়া প্রভু ··

ঋষি বললেন—এবার তুমি আমায় বিপদে ফেললে নেংটি !—কোথায় এখন আমি রাজ্য পাই বলতো, যে রাজ্যের রাজা তোমায় করবে রাণী ! উঁহু···আমি তোমাকে পরমা-সুন্দরী কন্যা করে দিতে পারি—সে কন্যার দেহে এমন রূপ হবে যে, শুধু মানুষ রাজা কেন···দেবতা গন্ধর্ব-কিন্নর রাজ পর্যন্ত সে রূপে মুগ্ধ হবেন !···কি বলো, তাতে রাজী আছো ?

নেংটি-হাতী বললে—আমি রাজী, প্রভু।

ঋষি তখন হাতীর গায়ে মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে তাকে চক্ষের নিমেষে ক'রে দিলেন পরমা-সুন্দরী কন্যা !···ক'রে সে কন্যার তিনি নাম দিলেন পোস্তমণি !

কন্যা পোস্তমণি ঋষির কাছে ঋষির ছাউনিতেই থাকে—দিনের বেলায় গাছে গাছে ফুল তোলে। ফল পাড়ে···গাছে গাছে জল দেয়···গাছের ডালে পখীরা বসে গান গায়··· পোস্তমণি সেই সব পাখীর গান শোনে···ফুলে ফুলে প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায়।···পোস্তমণি কন্যা আঁচল ছড়িয়ে প্রজাপতি ধরে—কখনো বসে নিজের মনে ফুলের মালা গাঁথে !

একদিন বিকেলে ঋষির পাতার ছাউনির কোণে বসে পোস্তমণি মালা গাঁথছে, দেখে বেশ জাঁক-জমকের পোষাক-পরা এক বিদেশীমানুষ···বিদেশীমানুষ আসছে ছাউনির দিকে ···বিদেশী এলো পোস্তমণির কাছে···

পোস্তমণি বললে—তুমি কে গা ? তোমাকে বিদেশী মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

বিদেশী বললে—আমি এ বনে মৃগয়া করতে এসেছি···একটা হরিণের পেছনে ছুটে ছুটে পা গেছে ভেরে—হরিণকে পাইনি···খিদেতেষ্টা পেয়েছে বড্ড···ঋষির-আশ্রম দেখে এখানে এসেছি, কিছু যদি খেতে পাই, তাই।

পোস্তমণি বললে—এসো তুমি···কিন্তু এখানে কি বা আছে আমাদের তোমাকে দেবো খেতে ! আমরা বড় গরীব···তবু আমার যা সাধ্যে কুলোয়···দেবো। তোমার যোগ্য···মানে, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কোনো রাজ্যের রাজা।

বিদেশী শুধু হাসলো—এ-কথায় জবাব দিলে না।

পোস্তমণি জল নিয়ে এলো কলসীতে করে—এনে বিদেশীর পা ধুইয়ে দিলে। বিদেশী বলে

উঠল—উঁহু···না, না, না ··তুমি ঋষির মেয়ে···ব্রাহ্মণ, আর আমি হলেম ক্ষত্রিয়—আমার পায়ে তুমি জল দিবে কি!

পোস্তমণি বললে—আমি ঋষির মেয়ে নই, বিদেশী···জাতে বামুনও নই···তাছাড়া তুমি অতিথ। অতিথ আর দেবতা—দুই সমান।

বিদেশী বললে—আমি রাজা সত্যি—কিন্তু তুমি ঋষির মেয়ে নও—বামুনের মেয়ে নও—কার মেয়ে তুমি গো?

পোস্তমণি বললে—ঋষির কছে শুনেছি, আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে!

রাজা বললেন—ক্ষত্রিয়! আচ্ছা, বলতে পারো তোমার ক্ষত্রিয়-বাবা রাজা ছিলেন কি? কেন না, তোমার রূপ···আর আমাকে এই যে খাতির-যত্ন···এ দেখে আমার মনে হচ্ছে, তুমি নিশ্চয় রাজকন্যা।

পোস্তমণি এ-কথার কোনো জবাব দিলে না। জবাব না দিয়ে কুঁড়ের মধ্যে গেল—গিয়ে কুঁড়ের মধ্য থেকে পাতার বড় ঠোঙায় ভরে নিয়ে এলো এক ফল—চমৎকার খেতে পাকা ফল—এনে রাজার সামনে দিলে ধরে···রাজা খাবেন!

রাজা বললেন—উঁহু ও ফল আমি খাবো না—যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার কথার জবাব দেবে, কন্যা।

তখন পোস্তমণি বললে—ঋষির নাম শুনেছি, আমার বাবা ছিলেন এক রাজ্যের রাজা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে আমার মাকে নিয়ে তিনি এই বনে এসেছিলেন···তারপর বাবাকে বাঘে খেয়ে ফেলে—আমি তখন আঁতুড়ে মায়ের কোলে—বাবার খবর শুনে আমার মা গেলেন মরে—বনে গাছতলায় আমি ছিলাম পড়ে—যে গাছের তলায় ছিলাম সেই গাছে ছিল মস্ত মৌচাক—সেই মৌচাক থেকে মধু ঝরে-পড়ে আমার মুখে যেতে···আর সেই মধু খেয়েই আমার প্রাণ বাঁচে। তারপর ঋষি আমায় পেলেন—পেয়ে নিজের কাছে এই ছাউনিতে নিয়ে আসেন—সেই থেকে আমি এখানে ঋষির কাছে আছি···ঋষি আমায় মানুষ করেছেন!···শুনলেন তো মহারাজ···এই দুঃখিনীর পরিচয়···এবার আপনি খান্···

এ পরিচয় শুনে রাজার মনে মায়া হলো; রাজা বললেন—নিজেকে দুঃখিনী বলে দুঃখ করো না। তোমার মতো রূপসী কন্যা···রাজার প্রাসাদ আলো করবে তুমি!

তারপর ঋষিকে রাজা বললেন,—এই কন্যাকে আমি বিয়ে করে পুরীতে নিয়ে যাবো—একে আমি করবো পাট-রাণী!

ঋষি বললেন—বেশ।

তিনিই দিলেন পোস্তমণি কন্যার সঙ্গে রাজার বিয়ে—বিয়ে করে কন্যাকে নিয়ে রাজা পুরীতে ফিরলেন।

রাজার রাণী ছিলেন—রাজা আবার বিয়ে করে নতুন রাণী এনেছেন দেখে, লজ্জায় তাঁর মাথা যেন কাটা গেল। পোস্তমণিকে রাজা করলেন পাট-রাণী…পোস্তমণি যা চান, রাজা এনে দেন…পোস্তমণি হলো রাজার মাথার-মণি।

কিন্তু আসলে নেংটি তো…বেচারী! এ সুখ তার ভাগ্যে সইলো না। একদিন পুরীর কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে আছে পোস্তমণি—হঠাৎ মাথা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে ঝুপ করে সে পড়ে গেল কুয়োর মধ্যে…পড়েই তার মৃত্যু।

রাজা শোকে অধির…ঋষির কাছে ছুটিলেন। গিয়ে বললেন—পাট-রাণীকে বাঁচিয়ে দিন, ঠাকুর।

ঋষি বললেন—অসম্ভব! ওর হলো নেংটির জান—এতটুকুন! আসলে ও ছিল নেংটি-ইঁদুর…তারপর হলো বেরাল,…তারপর এমনি নানারকম হতে হতে শেষে হয়েছিল পরমাসুন্দরী কন্যা পোস্তমণি!…তুমি দুঃখ করো না, মহারাজ…এখন ও কুয়োয় ডুবে মারা গেল যখন, তখন এক কাজ করো। মাটি ফেলে-ফেলে ঐ কুয়ো ভরাট ক'রে ফেলো—দেখবে সেই মাটিতে হবে পোস্তর গাছ…গাছের ফুল হবে রাঙা…দেখে মন জুড়িয়ে যাবে…আর দানা হবে…সে দানার আঠায় হবে আফিং। এ এমন গাছ যে ওর দানা আর আঠা…মানুষ একবার স্বাদ পেলে ছাড়তে পারবে না। আঠার নাম হবে আফিং…খাও মজা পাবে…কল্‌কেয় দিয়ে হুঁকোয় ঠানো—মশগুল হবে! আফিঙে নেশা যা লাগবে…খাসা! তবে আঠায় বলো, ধোঁয়ায় বলো—আফিং যে খাবে—তার মেজাজ হবে…পোস্তমণি যা-যা ছিল ঠিক তাদের মতো…মানে, ইঁদুরের মতো সবকিছু সে নষ্ট করবে…বেড়ালের মতো দুধ খাবার যম,…কুকুরের মতো ঝগড়াটে…বাঁদরের মতো নোংরা…মোষের মতো হবে বুনো গোঁ…আর রাণীর মতো ঝাঁজালো তেরিয়া মেজাজ!

খোকায় ভালোবাসে না কে?

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

খোকায় ভালোবাসে যে ঐ নীল আকাশের তারা।
সন্ধ্যেবেলা তাকিয়ে থাকে তাইতো দিশেহারা।
হঠাৎ হাতে-লেখার কালে
চুমকুড়ি খায় ফুলকো গালে,
জানলা বেয়ে চুপি চুপি ছড়ায় আলোর ধারা
নীল আকাশের তারা।

খোকায় ভালোবাসে না কে নিখিল ধরণীতে?
পরশে তার আশার আলোক উথলে উঠে চিতে।
চাঁদের রেণু অঙ্গে মেখে
রামধনুকের দেশের থেকে
এসেছে সে কল্পলোকের পুলকটুকু দিতে।
নিখিল ধরণীতে।

তুফান মেলে অবাক কাণ্ড

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৪২ সালের অক্‌টোবর মাসের শেষ। শীত পড়ে এসেছে।

যাবো দিল্লী, কালীপূজার ঠিক ছু'দিন আগে। ভীড়ের কথায় আর কাজ কি? গাড়ি ছাড়বার প্রায় একঘণ্টা পূর্বে গিয়েছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় ছোট সুটকেশ আর ভদ্রভাবে বাঁধাছাঁদা ছোট বিছানাটি আর জলের কুঁজোটি নিয়ে তো উঠলাম। দেখি আমারও আগে যারা এসেছেন, তাঁরা একেবারে বিছানা বিছিয়ে কায়েম জায়গা দখল করে নিশ্চিন্ত হয়ে আধা-শুয়ে আধা-বসে বেশ আনন্দেই খোসগল্প জুড়ে দিয়েছেন; কে উঠলো না উঠলো তাদের লক্ষ্যের বিষয়ই নয়।

সামনাসামনি ছু'খানা বেঞ্চে দুইজন দিল্লীওয়ালা নিজ নিজ বিছানায় এই দিন-দুপুরে শুয়ে জায়গার দখল রাখছেন। সুটকেশটি বেঞ্চের তলায় আর বেডিংটা বাঙ্কের উপর এক রকম ক'রে ঠেসে ঢুকিয়ে, একটু ভদ্রভাবে মিয়াঁ একজনের মুখের দিকে তাকাতেই তৎক্ষণাৎ তিনি নম্রভাবে, বৈঠিয়ে বাবুজি,—এই, বাবুজিকো বৈঠনে দেওনা, বোলে তাঁর সামনের দোসরকে হুকুম করলেন মিয়াঁ। তামিল করবার লোক কাছে থাকলে হুকুম করাটাই স্বাভাবিক।

যাই হোক, সামনের মিয়াঁ বিছানা একটু গুটিয়ে নিতেই আমি একটু বসতে জায়গা পেলাম। তারপরেই প্রশ্ন হোলো, যাবেগা কহাঁ? আমিও দিল্লী যাবো শুনে তাঁর মুখ থেকে,—বৈঠিয়ে না, মজেমে বৈঠিয়ে, এই কথাটা বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেশী, মজেমে বসার আর সুবিধা হোলো না, কারণ যেটুকু বিছানা গুটিয়ে তিনি আমায় বসতে জায়গা দিয়েছিলেন তার মধ্যে আর যেমনই করে হোক না কেন, মজেমে বসে যাওয়া চলে না। এটা তিনি দেখেও আর দেখলেন না।

যার ভাগে আমি পড়লাম সে বেঞ্চিখানা ভরেই তাঁর বিছানা পাতা ছিল। তাঁর কাঁচাপাকা দাড়ির ছোট ছোট চুলের উপর ছিল একটি গোল সাদা জালের মত কাপড়ের টুপী, আর গায়ে আপাদপ্রশস্ত সাদা ময়লা আলখাল্লা। শরীর প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, হাতে একটি মালা। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি সৌখিন, গায়ে সূক্ষ্ম মসলিনের অজানুলম্বিত জামা, ভিতরে জালের গেঞ্জি আর চুড়িদার পায়জামা। দিল্লীর এক জোড়া লপেটা পায়ের কাছেই রাখা। বয়স প্রায় চল্লিশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।—সৌখিন জামার পরিচয় আরও একটু আছে।

দিল্লীওয়াল সৌখিন ব্যক্তি বসে আছেন

গলায় অতি সূক্ষ্ম সুচের কাজ-করা বেলদার হাঁসুলী, আর দুই কাঁধে ও পিঠে সূক্ষ্ম ঐ ভাবের কাজ-করা পান। খস্ আতরের গন্ধ ভুরভুর করছে আশপাশে,—মেজাজ সরিফ ব্যক্তি। কথায় কথায় পরিচয় দিলেন, দিল্লী শহরের খানদানি লোক তাঁরা। এখন কোন মাদ্রাসার শিক্ষক; হাফিজি অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর বেশভূষার পরিপাট্য এবং বৈশিষ্ট্য লখ্‌নৌকে মনে করিয়ে দেয়। জানতাম সৌখিন দিল্লীওয়ালারাও সখের ব্যাপারে লখ্‌নৌয়ের অনুসরণ করেন।

যাই হোক গাড়ি ছাড়বার সময়ে ভীড় এমনই জমে উঠলো, যাকে বলে প্যাকড্, ঠিক তাই। বসেছে যতগুলি, দাঁড়িয়েছে তার অর্ধেকেরও বেশী। কিন্তু তার মধ্যে এই দিল্লীওয়ালা দু'জন বেশ নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে-বসে আরামে চলেছেন। আমার প্রতি একটু অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, যার ফলে একত্রে বসে কথা কইতে কইতে যাওয়া যাচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, দিল্লী সরকারের আমলদারীতে কোন দিকে তরক্কি হচ্ছে, সরকারী সব কিছুই তাজ্জব ব্যবস্থা, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথাই। এমনি নানা কথার পর—দিল্লী শহরের সুখ-সুবিধার কথার শেষে, হামামে স্নানের কথায় এসে পড়া গেল। এ সম্বন্ধে মিয়াঁ সাহেব বললেন, দিল্লীতে বড়-দরগার কাছেই ওখানকার বড়-হামাম। শেষ দিকে আমায় বন্ধুভাবেই প্রতিশ্রুতি দিলেন, যদি আমি স্নান করতে চাই, তা'হলে তিনি ঐ বড়-হামামে তার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর সেখানে স্নান করলে আমার শরীর নীরোগ হয়ে যাবে এবং একমাস আর স্নান করবার দরকার মনে হবে না।

লোকটি মেহেরবান্ অর্থাৎ দয়ালু তো বটেই,—পরন্তু গহ্বগান্ এবং কদরদান্‌ও বটে, তাঁরও পরিচয় পেলাম যখন আমার পরিচয়ে চিত্রকর জানতে পেরে বোললেন, দিল্লীতে অনেক বড় বড় আমীরদের দরবারে তাঁর যাতায়াত আছে, সেখানে তিনি আমায় তাদের সঙ্গে

দেখাশুনা এবং কিছু কাজকর্মও যোগাড় করে দিতে পারবেন। মিয়াঁর মুরুব্বি ভাবটি চমৎকার, সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত।

এই ভাবে দিনটা কাটলো। ক্রমে সন্ধ্যা হোলো। বৈকাল থেকে হাজারিবাগ রোড ছাড়াবার পর পাহাড়ের রাজ্যে পড়া গেল। পরেশনাথের দৃশ্য কি সুন্দর তা সবাই জানে; এই লাইনে যেমন, কর্ড লাইনেও তেমনি মধুপুর, জেসিডি, শিমূলতলা হয়ে ঝাঝা পর্যন্ত ঐ দৃশ্য; আবার লুপ্ লাইনেও জামালপুর পর্যন্ত দৃশ্যের তুলনা নেই। যাই হোক, এখন কোডারমা, গজহাণ্ডি, ও তার মধ্যের সুড়ঙ্গগুলি পেরিয়ে রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ গাড়ীখানা গয়া ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো।

এখানে ইঞ্জিন বদল হয়, কাজেই অনেকক্ষণ, বোধ হয় পঁচিশ মিনিট কিম্বা আধ ঘণ্টা থামবার কথা। দেখলাম, আমাদের কামরায় দরজার কাছে যারা আছে তারা কাকেও উঠতে দেবে না বোলে বেশ জোর করে দরজা ভাল রকম চেপে রইলো। ভিতরে যারা বসেছিল, তারা একটু হাত পা ছড়াবার জন্য ছটফট্ করছিল, কিন্তু জায়গা ছাড়বার দিকে কারো কোনরূপ ইচ্ছা দেখা গেল না। যারা আগে থেকে জায়গা পেয়েছিল, তারা সবাই একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে নিশ্চিৎ দখলের বিশ্বাসে নাক ডাকাবার যোগাড় করলে। আমার পাশে ও সামানে দুই দিল্লীওয়ালাই সবার ওপর আরাম ভোগ করছিলেন, কারণ গয়া ষ্টেশনে গাড়ীটা দাঁড়াবার আগেই তারা শুয়ে পড়লেন, আর তখন—আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলেন না। আমি বসে বসে ভাবছি—সারা রাত এই ভাবে যেতে হবে, নাকি—দুই বেঞ্চের মাঝে একটু বিছানাটা বিছিয়ে নিই?—আমাদের এ গাড়ীতে আর একজনও বাঙ্গালী নেই—কাকেও দেখিনি, কাজেই আমি যেন একলাই, আর অসহায়ও বটে।

কাকেও উঠতে নামতে দেখলাম না প্রথম দিকে, হাত বাড়িয়ে জানলা দিয়েই কেনা-বেচার কাজ চলছিল,—তারপর সময়ও কেটে গেল অনেকটা, ইঞ্জিন বদলেরও কাজটা হয়ে গেল, হালকা একটু ধাক্কা দিয়েই যেই একটু পিছিয়ে এসে স্থির হয়েছে গাড়ীখানা,—ভাবছি এইবার ছাড়বে, আর দেরি নেই,—এমন সময় একটা দম্‌কা ঝড়ের মত একদল যাত্রী গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। যারা দরজার কাছে চেপে বসেছিল, তারা কিছুতেই ঠেকাতে পারলে না। আমার বুকের ভিতর গুর গুর করে উঠলো সেই দল দেখে। সবার আগে হোঁৎকা হোঁৎকা জন তিনেক মরদ—পিছনে কুলীর মাথায় মালপত্র; তারপরেই মেয়েছেলের দল পিল পিল করে ঢুকলো।

বেশভূষায় কিছু বুঝা গেল না, কারণ মেয়েদের মধ্যে বুড়ি, প্রৌঢ়া ছাড়া সবাই

ওভারকোট গায়ে। বুড়িদের গরম কাপড়ে ঢাকা সর্ব-শরীর। প্রথমে বুঝতেই পারলাম না তাঁরা কোন দেশের মানুষ। সেটা অবশ্য বুঝা গেল তখনই, যখন কুলীর ভাড়া মিটাতে তাঁদের ভাষা বেরুল। এরা পশ্চিমের হিন্দুস্থানী নয়, মুসলমান নয়, বোম্বাইওয়ালা নয়—সত্যই আশ্চর্য হয়ে, বিস্ফারিত নয়নে দেখলাম এবং বুঝলাম এঁরা খাঁটি বাঙ্গালী। তারপর যখন শুনলাম, 'অ ইন্দু তোর হাতে লেগেছে নাকি,—তোরঙ্গটা কোথায় নামালি, হাঁরে অ কুলি' ইত্যাদি, তখন আর সন্দেহমাত্র রইল না। এ দলে যাট বছরের বুড়ী থেকে প্রৌঢ়া কিশোরী বালিকা শিশু পর্যন্ত সকল রকমই আছে। আরও দেখলাম শেষে, মেয়েই প্রায় সব, একটি মাত্র ছোক্‌রা এদের অবিভাবক,—তার নাম নীহার কিম্বা সৌরীন, ঠিক মনে নেই। এখন, সকলকার ওঠা হয়েছে দেখে সেই প্রথমে যে তিনজন জোয়ান মরদ উঠে এদের পথ করে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা নেমে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে প্রথমে দরজাটি বেশ করে বন্ধ করে দিলেন, তারপর মহা উৎসাহে জেঠাইমাকে ডেকে বললেন,—কেমন জেঠাইমা! দেখুন,—বলেছিলুম, যতই ভীড় থাক তুলে দেবোই,—এখন হয়েছে ত'? এখন নীহারই আপনাদের কাশীতে পৌছে দেবে সঙ্গে করে। আমরা দায়ে খালাস।

বলা বাহুল্য, জেঠাইমা অনেক মিষ্টি কথা, অনেক আশীর্বাদ করে ভাইপোদের বিদায় দিয়ে নিজেদের ব্যবস্থায় মন দিলেন। এদিকে নীহার বা সৌরীনের হ'ল বিপদ। ছেলেমানুষ সে ততটা নয়, যতটা অপ্রস্তুত এই সব বিষয়ে। সে যে রোগা বা দুর্বল তাও নয়, সাধারণ স্বাস্থ্যবান যেমন হয় সেই রকম। বয়স প্রায় কুড়ি হবে, দেখতে সুশ্রীও বটে, কিন্তু আরাম-প্রিয় প্রকৃতি তার মুখে যেন মাখানো। সে দাঁড়িয়ে যেন অবাক হয়ে চারদিক দেখলে, তারপর অনুযোগের সুরে মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করে বললে,—দেখেছিস ইন্দু! এদের আক্কেলটা,—জায়গা জুড়ে গড়া গড়া শুয়ে আছে, যেন আর কারো বসবার অধিকার নেই। তারপর আপাদ-মস্তক মুড়ি দেওয়া একজনের কাছে গিয়ে মিনতির সুরে বললে, এই, উঠতো ভাই থোড়া, জানানা লোককো বৈঠনেকো জায়গা দেও—দেখতা নেই, সবাই খাড়া হ্যায়। এই যুক্তিযুক্ত অনুযোগ যে সমাজে ফলপ্রসূ হোতো এটা যে সে সমাজ নয়, এ-কথাটা বুঝতে নীহারবাবুর কিছুক্ষণ গেল। তা সত্বেও, সে উঠো ভাই, উঠোনা ইত্যাদি বোলে অসহায় দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে চেয়ে, তাদের এই কথাই বুঝাতে চাইলে যে—এরা উঠছেনা এখন আমি কি করবো।

কেই বা কার কথা শোনে, ভাই বললেই এখানে কেউ ভাই হয়ে ওঠে না। এ কথাটা এক্ষেত্রে সবাই জানে। কেউ উঠলো না দেখে আমাদের নীহারবাবু একেবারে হতাশ

হয়ে হয়তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তেন, কিন্তু কোথায় বসবেন সে জায়গা কোথা? ওধারে আট দশটি জানানা লোক চারদিকেই চেয়ে দেখছেন, কোথাও কোন ফাঁক আছে কিনা।

আমাদের দেশে মেয়েদেরই যথার্থ অভিজ্ঞতা আছে। বর্তমান দেশ, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে তারাই যথার্থ ওয়াকিফহাল বলে, তাদের মধ্যে যিনি জেঠাইমা, তিনি নীহারের দিকে চেয়ে বললেন, হাঁরে নীহার, ও রকম করে বললে কি ওরা উঠবে, একটু জোর করে ওদের তুলতে হবে যে।—না ওঠালে চলবে কেন?

কয়েকটি ছোট মেয়েছেলেকে তোরঙ্গ, বাক্স যে কয়েকটা ছিল তার উপর বসিয়ে, এবার একটু একটিভ্ হয়ে নিজেদের জন্য স্থান-সংগ্রহের কাজে লাগলো নীহার। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে, এই দলের মধ্যে মাথায় বোধ হয় সবার ছোট, সুন্দর ফুটফুটে, কোন স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রী হবে, তার কপালে একটি বেশ বড়ো কালো টিপ্ জলজ্বল করছে, ওভারকোট পরা,—তেরো কিংবা চৌদ্দ বছরের সেই মেয়েটি নীহারের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করছিল, অথচ তার হাত ছুটি কাজেই ছিল, মালপত্রের মধ্যে। দেখলাম, নীহারের সঙ্গে তার মুখের একটা সৌসাদৃশ রয়েছে। হঠাৎ সে একবার নীহারের দিকে চেয়ে দাদা বোলে ডাকলে, তারপর সেই আগাগোড়া মুড়ি দেওয়া লোকটার দিকে যেন কি দেখিয়ে দিলে। নীহারের পৌরুষ এবার যেন বেশ খানিকটা জেগে উঠলো। সে এবার জোর করেই—'উঠো' 'উঠো' বোলে লোকটিকে তুলে দিলে, আর যেই সে উঠলো, অমনি নীহার দাঁড়িয়ে গেল সেই বেঞ্চের উপর। ঠিক তার ওপিঠে আমাদের দিল্লী সহযাত্রীর একজন, সেই প্রৌঢ় মিয়াঁ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে আছেন। কিন্তু তিনি জেগেই আছেন। নীহার এখন সাহস পেয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলে, 'উঠো জি, উঠো' বোলে ওঠাবার চেষ্টা করাতেই, সেই মিয়াঁ ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে অল্পক্ষণেই চারদিক একবার দেখে কিংকর্তব্য স্থির করে নিলেন। তারপর সতেজে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে উঠে, ডান হাতটা ঘুষি পাকিয়ে, বক্তৃতার ঢংএ যখন উচ্চৈস্বরে চীৎকার আরম্ভ করলেন, তখন দেখা গেল তাঁর সামনের একটা দাঁত নেই।—এই, কোন বেওকুফ্, বেতমিজ, হামকো উঠো, উঠো করতা হৈ। ম্যায় কলকাত্তাসে পুরা মাস্থল দেকর আপনা যায়গাহা মে বৈঠতে শোতে আয়তা হৈ, আপনা যায়গাহা মে শোতে শোতে দিল্লী তক্ যায়গা, কোইকো উঠানো কে একতিয়ার নহি।···

সে দাড়িওয়ালা খাস মূর্তি দেখেই নীহার গেল দমে; মুড়ি দেওয়া ছিল ব'লে অনুমান করতে পারেনি, যে ভিতরে কি পদার্থ আছে। এখন গলার স্বরটি যথাসম্ভব নরম আর যথার্থ মিনতি করেই বললে, এত্না গোস্সা করতা কাহে ভাই, বিচার করকে দেখোতো এতনা আদমী খাড়া হ্যায়,—একটু জায়গা যদি না ছোড়েগা তো বৈঠেগা কাঁহা, যায়েগা কাঁহা, আপহি বাৎলাও?

মিনতির সুরে নরম হাওয়াটা মিয়াঁর ধাতে ছিল না, এটা কাপুরুষদের অস্ত্র; সুতরাং আরও উত্তেজিতভাবে নীহারের মুখের কাছে হাত নেড়ে তিনি বললেন, কাঁহা যায়েগা হামরা ক্যা মালুম, যাহা খুশি যাও, চুলাহামে যাও, জাহান্নামমে যাও।···

কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে এসে নীহারের মুখে পড়ছিল, বেচারা হাত দিয়ে মুছে নিয়ে বেঞ্চি থেকে নেমে এলো আস্তে আস্তে।

এই ভাবে যখন বেশ একটা শোরগোল পাকিয়ে উঠেছে, তখন ইন্দু, নীহারের সেই ভগিনীটি করলে কি, তীব্রদৃষ্টিতে মিয়াঁর দিকে একবার দেখে, হাতের কাজটাকে ফেলে দিয়ে গট্ গট্ করে এসে তার সামনা-সামনি বেঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়ালো, তারপর—এই তোম্ গালি দিয়া কাহে—হামলোক কাঁহা যায়গা?—তোম কেয়া বোলা—ফির ঔর একবার বোলো তো?···

তেজীয়ান বীর বালিকার এ চ্যালেঞ্জ সে গ্রাহ্য করবে কেন,—তখনও সেই রকমই জোর গলায়—হাঁ, হাঁ, কেঁও নহি বোলেগা, শও দফে বোলেগা, হাজারো দফে বোলেগা,—চুলাহামে যাও তোমলোক, জাহন্নামমে যাও, যাঁহা খুশি যাও, হামারা ক্যা?—যেন হাঁফ ছাড়লে লোকটা।

'তোমলোক জাহান্নামমে যাও, যাঁহা খুশি যাও, হামারা ক্যা?'

ইন্দু সঙ্গে সঙ্গেই,—এয়সা বাত্ ঔর মুসে মৎ নিকালো, বোলে, বাঁ হাতে তার দাড়িটা মুঠোতে ধরে সজোরে ডান হাতে এক চড় কসিয়ে দিলে তার গালে। অভাবনীয় দ্রুত-গতিতে কাজটা হয়ে গেল—শব্দটাও আমরা সবাই শুনলাম। তারপর, মুখ সামালকে বাৎ করো, বোলতে বোলতে ইন্দু নেমে গট্ গট্ করে নিজেদের মধ্যে এসে গেল। ঠিক ঐ সময়েই গাড়িটা প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে গিয়ে মোশান দিয়েছে।

আমরা গাড়ীসুদ্ধ সবাই

স্তম্ভিত। মিয়াঁও প্রথমটা অবাক, তারপর সেই রকমই চীৎকারে যেন ফেটে পড়লো,—তওবা তওবা, ই ক্যাসা লেড়কী—হামারা হুয়াঁ হোতে তো ফরুণ কতল কর দেতে—ইত্যাদি ইত্যাদি। হৈ হৈ কাণ্ড, যারা শুয়েছিল সবাই উঠে বসেছে তখন।

এতক্ষণ আমার হাফিজি মুরুব্বি আপাদমস্তক, সর্বাঙ্গ ঢেকে পড়েছিলেন, তিনিও এইবার উঠলেন। প্রথমেই তাঁর সঙ্গীর হাত ধরে,—বৈঠ যাইয়ে, বৈঠ যাইয়ে, বোলে তাকে বসিয়ে দিলেন, তারপর নীহারের দিকে চেয়ে, আপলোক সব বৈঠ যাইয়ে, বোলে তাঁদের দু'খানা বেঞ্চের বাকী সব জায়গা থেকে বিছানা গুটিয়ে নিলেন—তখন সবাই এসে বসলো।

জেঠাইমা তখন আস্তে আস্তে বোলছেন, আজ কি কাণ্ডটা করলি বলতো ইন্দু—ঘরেও যেমন বাইরেও তেমনি! ধন্যি মেয়ে বাবা, এই নাকে কানে খত্,—যদি তোকে সঙ্গে নিয়ে আর কোথাও যাই!

ইন্দু চুপ করে শুনলে কথাগুলি, তারপর ফিক্ করে একটু হেসে,—তেমনি আস্তে আস্তেই বললে,—তা বোলে গালাগাল সহ্য করতে হবে?

হতই নাক ভুল

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকা যদি খোকাটি না হ'য়ে—
হ'ত বনের ফুল।
খোকা বলেই নিতেম মোরা তারে—
হতই নাক ভুল।—
মায়ের কোলে কভু হ'ত খোকা,
বনে কভু হ'ত ফুলের খোকা।
—সাঁঝের তারার আলোয় দিত ভ'রে
নীল গগনের কূল।
ঘরের খোকাই—সোনার খোকা যে সে
হতই না তা ভুল।—
দিনের শেষে সোনার আলো হয়ে
ছড়িয়ে যেত মাঠে।
সাঁজের বাঁশীর সুরেই উঠত বেজে—
গাঁয়ের বাটে বাটে।
—বিহান সাঁঝের খেয়া পারাপারে—
খেলা কতই করত নদীর পারে।
দুষ্টু-হাওয়া হয়ে ঢুকত ঘরে—
উড়িয়ে মায়ের চুল।
—খোকা বলেই চিন্‌তেন মা তারে—
হতই নাক ভুল।
বিষ্টি হ'য়ে ঝরত বাদল বেলায়
কাজল বনে বনে।
শরৎ-ভোরে বাজিয়ে যেত বাঁশী
সবুজ মাঠের কোণে।
হেমন্তে তার সোনার মাঠে মাঠে—
বাজিয়ে বাঁশী সোনার দুপুর কাটে।
ফাগুন-ভোরে পেতাম তারে ফিরে—
কনক চাঁপার ফুল।
—খোকা বলেই চিন্‌ত সবাই তারে—
হতই নাক ভুল।—

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গলির মোড়ের মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দু'আনার কিছু কিনে খাবে কিনা অমল একবার ভাবল। কিন্তু দু'আনায় যা পাওয়া যাবে তাতে পেট ভরা তো ভালো, পেটের ক্ষিদে আরও বাড়বে। তার দরকার কি, বরং দু'আনার পয়সা জমা থাকলে একসময় কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া বেলাও হয়েছে অনেক, দেরি করার আর সময় নেই।

গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়ল অমল। এই বেলেঘাটা মেইন রোড দিয়ে আরো প্রায় মিনিট দশেক হাঁটলে তবে স্কুল। ছুটতে ছুটতে একজন বুড়ো মত লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, একটা ট্যাকসীর সামনে পড়ে তার পাঞ্জাবী ড্রাইভারের গাল খেয়ে অমল নিউ বেলেঘাটা হাই স্কুলের সামনে এসে দাঁড়াল। বড় ঘড়িটায় তখন সোয়া এগারটা বাজে। ইস কত বেলা হয়ে গেছে! একটু ইতস্তত: ক'রে স্কুলের বারান্দা পার হয়ে দক্ষিণ দিকের 'Class VIII B' মার্কা দেওয়া ঘরটার সামনে অমল থেমে পড়ল।

শৈলেনবাবু ইংরেজী গ্রামার পড়াচ্ছেন। চক খড়ি দিয়ে বোর্ডে লিখে লিখে কি যেন বোঝাচ্ছেন ছেলেদের। আস্তে আস্তে অমল ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, শৈলেনবাবুর চোখে পড়ে গেল। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বললেন, 'No, no, dont come. I wont allow you—'

অমল বলল, 'স্যার আমার কথা একটু শুনুন। আজ রেশন আনতে বড় দেরি হয়ে গেল। সোমবার কিনা, বড় ভিড় ছিল দোকানে—'

শৈলেনবাবু বললেন, 'তোমার সোমবার ও যা মঙ্গলবারও তাই, একটা না একটা লেগেই আছে। টাস্ক করবে না, পড়া পারবে না, দেরিতে আসবে, পিছনের বেঞ্চে বসে আড্ডা দিয়ে অন্য ছেলেদের পড়ার ক্ষতি করবে। গুণের তো তোমার আর সীমা নেই। তা যখন

নেই তখন আমার ক্লাসে এসেও আর দরকার নেই তোমার। বাইরে থেকে আরও একটু ঘুরেটুরে হাওয়া খেয়ে এস। এ ঘণ্টা যাক, পরের ঘণ্টায় ঢুকো।'

অমল আর একবার অনুনয়ের স্বরে বলল, 'স্যার আর কোন দিন দেরি হবে না আমার।'

শৈলেনবাবু ব্যঙ্গ ক'রে হাসলেন, 'এই নিয়ে কথাটা কতদিন হোল। আজকের দিনটা বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তা'হলে ঠিক শিক্ষা হবে।' বলে তিনি ফের পড়ানোয় মন দিলেন।

অমল একমুহূর্ত সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জায় অপমানে দুটো কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। এর আগে তো মাষ্টারমশাই কতদিন কান মলে দিয়েছেন কিন্তু তাতেও এত জ্বালা হয়নি। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটা অদ্ভুত আক্রোশ জেগে উঠল অমলের। মনে হোল সমস্ত ভেঙেচুরে চুরমার ক'রে দেয়। ইঁট ছুঁড়ে মারে শৈলেনবাবুর মাথায়। কিন্তু কিছুই হোল না, কিছুই করল না অমল। স্কুলের কম্পাউণ্ড ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। সব চেয়ে বেশি রাগ হতে লাগল মায়ের ওপর। মা-ই তার এই সমস্ত অপমানের মূল। দেরি হয়েছে বলে সে তো স্কুলে আসতই না। মা কেন তাকে জোর ক'রে ঠেলে পাঠাল। কেন তাকে এমন ক'রে ওই টাক-মাথা শৈলেন মাষ্টারকে দিয়ে অপমান করাল মা। মার ওপর অমলের বিন্দুমাত্র মমতা নেই, দাদারা তাকে সব সময় গাল-মন্দ করে, বকে, মা কিছুই বলতে পারে না। কেবল দাদাদের খাতির করে, কেবল তাদেরই ভয় ক'রে চলে। এক-আধটু বিরুদ্ধে যা বলে সব আড়ালে-আবডালে। সামনা-সামনি কিচ্ছু বলতে পারে না। কারণ দাদারা রোজগার করে, টাকা এনে দেয়। সেই টাকায় সংসার চলে, সকলের খাওয়া-পরা চলে। আর সেই জন্যই যত স্নেহ ভালোবাসা, যত দরদ যত পক্ষপাতিত্ব মার দাদাদের ওপর। কিন্তু বড় হয়ে অমলও কি টাকা রোজগার করবে না। ইচ্ছা করলে এখনো তো করতে পারে। মাঝে মাঝে তাই ইচ্ছা হয় অমলের। কোন মিল ফ্যাকটরীতে ঢুকে প'ড়ে টাকা রোজগার ক'রে আনে। কতদিন সে কথা বলেওছে মাকে আর দাদাদের। সে কথা অবশ্য কেউ কানে তোলেনি। বড়দা নির্মল উল্টো রাগ ক'রে বলেছে, 'হ্যাঁ এখন তাইতো তোর ইচ্ছা। আমাদের পয়সায় তো আর বেশি বাবুগিরি চলে না। নিজে রোজগার না করলে আর সে সাধ মিটবে কি ক'রে।' কমল বলেছিল, 'কেন, সাধ কোন্‌টা না মিটছে শুনি। সেলুনে চুল ছাঁটা, মাসে দু'তিনবার সিনেমা দেখা, সবইতো হচ্ছে। হচ্ছে না কেবল পড়াশুনো। বই নিয়ে ভুলেও যদি বসে একবার। পাড়ার যত সব বদ ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। বদ ছেলে মানে, শম্ভু।

শম্ভুকে শুধু মেজদা কেন বাড়ির কেউ, পাড়ার কেউ দেখতে পারে না। অমলের চেয়ে বয়সে বছর দুই বড়ই হবে শম্ভু। বাবা মা আত্মীয়স্বজন বলতে দুনিয়ায় তার কেউ নেই। আছে

শুধু মনিব। পাড়ারই 'লক্ষ্মী-ভাণ্ডার' মুদীর দোকানে কাজ করে শম্ভু। মাসে দশ টাকা মাইনে পায়। আর খোরাক। অমলদের কাছে প্রায়ই দুঃখ জানায় শম্ভু, 'খোরাকটা ওই নামেই দেয় হরিদাস কুণ্ডু। দু'বেলা খেতে যা দেয় তা মানুষের খাদ্য নয়। আর তার বদলে গিন্নীর ছেলে রাখা থেকে স্নুরু ক'রে সব কাজ করতে হয় তাকে।'

তা ঠিক। শম্ভু ওদের রেশন আনে, বাজার করে, ঘরদোর ঝাঁট দেয়, ঝি কাজে না এলে বাসন মাজে, জল তোলে। কিন্তু এত কাজ করেও বিলাসিতা বাবুগিরি করবার বেশ সময় পায় শম্ভু। সেলুনে গিয়ে দশ আনা ছ'আনা চুল ছাঁটে। সিগারেট খায়। ফর্সা জামা কাপড় পরে সিনেমায় গিয়ে উঁচু ক্লাসের টিকেট কেনে। বেছে বেছে যত সব খারাপ বাজে ছবি দেখে। শম্ভুর দোষের সীমা নেই।

আশ্চর্য তবু এই শম্ভু অমলকে ভালোবাসে। তার সুখ-দুঃখ বোঝে। তাকে নিজের পয়সায় সিনেমা দেখায়, সিগারেট খেতে সাধাসাধি করে। অমলের মাঝে মাঝে মনে হয় সম্ভুর সঙ্গে একটা দিকে কোথায় যেন তার ভারী মিল আছে। শম্ভুর পাঁচজন না থেকেও যা আর অমলের পাঁচজন থেকেও সেই দশা। বিশেষ কোন তারতম্য নেই।

শম্ভুর কথা মনে পড়তে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য 'লক্ষ্মী-ভাণ্ডারের' দিকেই যাচ্ছিল অমল, কিন্তু বেশিদূর যেতে হোল না। খানিকটা এগুতেই চারু কেবিনের সামনে দেখা হয়ে গেল। শম্ভু এদিকেই আসছে। সে একা নয়, তার সঙ্গে বিজুও আছে। তার হাতে দু'খানা বই আর একটা বাঁধানো খাতা। বিজন সেকণ্ড ক্লাসের ছাত্র। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। অমলের মতই বছর চৌদ্দ তার বয়স।

বিজুকে দেখে অমল বলল, 'কিরে স্কুল থেকে পালিয়ে এলি নাকি। না স্কুলে ঢুকিসই নি একেবারে। আড্ডা মারছিস।' বিজু বলল, 'আমি না হয় আড্ডা মারছি, আর তুইই বা এমন কোন গুড বয়। তুইও তো স্কুল পালিয়ে বেরিয়ে এসেছিস।'

নিজের দুঃখের কথা অপমানের কথা। বন্ধুদের তখনই বলল না; শুধু বলল, 'হুঁ। পালাব না, কি করব।'

বিজু বলল, 'আমি কিন্তু তোর মত আজ স্কুল পালাই নি। স্কুলে যেতেই পারিনি আমি। যাওয়ার জন্যই বেরিয়েছিলাম মাঝখানে এই কাণ্ড।'

অমল বলল, 'তোর তো কাণ্ড লেগেই আছে।'

তারপর শম্ভুর দিকে মুখ ফেরাল অমল, 'এত সকাল সকাল দোকান বন্ধ ক'রে এলি যে? আমি তো দোকানেই যাচ্ছিলাম তোর সঙ্গে দেখা করতে।'

বিজু বলল, 'দোকানে আর ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে না। শম্ভুর চাকরির দফা আজ রফা হয়ে গেছে।'

অমল বলল, 'সে কিরে! ব্যাপার কি?'

শম্ভু কোন কথা বলল না। বিজুই তার হয়ে জবাব দিল, 'ও নাকি কাজে গাফিলতি করে, পয়সা চুরি ক'রে সিনেমা দেখে। কুণ্ডু ওকে আজ ঘাড় ধ'রে দোকান থেকে বার ক'রে দিয়েছে।'

শম্ভু বলল, 'মাইরি বলছি আমি ওর এক পয়সাও চুরি করি নি। মিছামিছি—'

অমল বলল, 'তা দিলই বা। অমন কতদিনই তো বের করে দিয়েছে। আবার শেষে নিজেই ডেকে নেবে।'

শম্ভু বলল, 'তুই তাই বুঝি ভেবেছিস আমাকে? আমি কখনো আর ও মুখো হব না। এই শেষ। কলকাতা শহরেও আর থাকছিনে আমি। এই শেষ।'

অমল বলল, 'থাকবিনে তো যাবি কোথায়?'

শম্ভু বলল, 'যাওয়ার জায়গার অভাব আছে নাকি। যেদিকে চোখ যায় চলে যাব।'

হঠাৎ অমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তাই চল। আমিও তোর সঙ্গে যাব ভাই।'

বিজু পাশের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে বলল, 'যেখানেই যাস, আমাকে ফেলে যাস নি। আমাকেও সঙ্গে নিস তোরা।'

শম্ভু বলল, 'তুই তো বড়লোকের ছেলে। তুই যাবি কোন দুঃখে।'

বিজু বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘোড়ার ডিমের বড়লোক। তোরা ওপরেই অমন বড়লোক বড়লোক দেখিস। ভিতরটা সব ফাঁকা। সত্যি বলছি তোদের, আমার এক-বিন্দুও আর মন টিঁকছে না এখানে। পড়াশুনোও কিছু ভালো লাগছে না। শুধু ইচ্ছা করছে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াই জগৎটাকে। কলকাতা শহর তো নয় একটা খাঁচা। আর আমাদের বাড়ি সেই খাঁচার মধ্যে খাঁচা। কেবল এটা কোরো না, ওটা কোরো না; এখানে যেয়ো না, ওখানে যেয়ো না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ভাই। হাপ ধ'রে যাচ্ছে। আমি কোথাও পালাতে পারলে বাঁচি।'

শম্ভুর চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল, 'সত্যি?'

বিজু বলল, 'সত্যি ছাড়া কি। আমি তো তোদের অনেকদিন বলেছি। চল কোথাও চলে যাই। তোরাই আমার কথা কানে নিসনি। আজ তোদের সুমতি হয়েছে। তোরা যদি যাস আমি নিশ্চয়ই যাব। তোরা না গেলেও যাব।'

গলি পেরিয়ে তারা ছোট একটা মাঠের মধ্যে পড়ল। জন মানব নেই। রোদ ঝাঁ ঝাঁ

করছে। একটা নারকেল গাছের তলায় সরে এসে বিজু সিগারেট ধরাল। একটা দিল শম্ভুর হাতে। আর একটা অমলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে ধরা।'

অমল মাথা নেড়ে বলল, 'না ভাই। তোরা খাচ্ছিস খা।'

বিজু হেসে উঠল, 'আর Good boy, তুমি বুঝি চিরকাল এমনি গুড বয় হয়েই থাকবে ভেবেছ?—ধরা।'

শম্ভুও বলল, 'ধরা না রে।'

ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে অমলের। ধোঁয়া খেয়ে কি পেট ভরবে। দেখা যাক ভরে কিনা। বন্ধুর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে আস্তে আস্তে একটা টান দিল অমল। আর সঙ্গে সঙ্গে কেসে উঠেই ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটাকে।

শম্ভু আর বিজু হেসে উঠল।

মুখ মুছবার জন্য ঝুলো পকেট থেকে রুমালটি বের করল অমল। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা যেন ঝন্ ক'রে মাটিতে পড়ল।

বিজু আর শম্ভু একসঙ্গে বলে উঠল, 'ওটা কিরে?'

দো আনিটা কুড়িয়ে পকেটে রাখতে রাখতে অমল বলল, 'ও কিছু না।'　　　　(ক্রমশঃ)

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে

বর্ধমানের কাছে বাতাবি বলে ছোট গ্রাম—সেই গ্রামে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশনে ডক্টর ডফের কাছে লালবিহারীর শিক্ষা। স্কুলে-কলেজে লালবিহারীর প্রতিভা অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইংরেজী এবং বাংলা দু'ভাষাতেই তাঁর ব্যুৎপত্তি দেখে তখনকার যুগে তাঁকে খৃষ্টধর্ম প্রচারের ভার দেওয়া হয়,—এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা শহরের এক গীর্জার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি দু'খানি ইংরেজী পত্রিকা—ইণ্ডিয়ান রিফর্মার এবং ফ্রাইডে রিভিউ পরিচালনা ক'রে গেছেন বেশ দক্ষতার সহিত। ধর্মে খৃষ্টান হলেও বাঙলা দেশ ও বাঙালীর সুখদুঃখ তাঁর মন থেকে বিদূরিত হয়নি—বাঙালার কৃষি-জীবনের সম্বন্ধে তিনি ইংরেজীতে একখানি উপন্যাস লিখে গেছেন—উপন্যাসের নাম 'গোবিন্দ সামন্ত'। উপন্যাসের ভাষা এবং রচনা-রীতি 'ক্লাসিক'-ইংরেজী-সাহিত্য বলে গণ্য হয়েছে। বাঙলার রূপকথা লিখে তিনিই প্রথম ছাপার অক্ষর অমর করে গেঁথে গেছেন। লেখা ইংরেজীতে এবং সে গল্প-সংগ্রহের নাম Folktales of Bengal. এ দু'খানি গ্রন্থ বিশিষ্ট ইংরেজ সমাজে বহু প্রশংসা লাভ করেছে। দু'খানি বই-ই প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্য পাঠ্য।

গোকুল ও আলু

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

"আহা, আহা, চেঁচান্ কেন
অত জোরে জোরে ?
অত চেঁচায় কারা জানেন ?
নেহাত ইতরে।
এমন কাণ্ড কি ঘটেছে ?
কি মস্ত ব্যাপার ?
যার জন্যে হাটের হাওয়া
করব তোলপাড় ?
ধরুন, যদি স'রে পড়তাম,
কত অর্থ মোট
যেত আপনার ? যার জন্যে
চোপার এত চোট !
শুনে মানুষ দৌড়ে এসে
জম্‌ল চারিদিকে—
বড়ো বেজায় ক'রে তুললেন
তুচ্ছ ব্যাপারটিকে !
দেখুন, ওরা দাঁত মেলেছে—
অসামান্য দাঁত,
বত্রিশটি বড়ো বড়ো—
কুদৃশ্য নেহাত্।
হাসছে ওরা বোকার মতন
ভারী মজা পেয়ে,
কি দেখ্‌ছে অমন ক'রে
আমার পানে চেয়ে !

আমি কি ছার নাচের বাঁদর
আছি ঘাগরা প'রে ?
দেখ্‌তে আমি সঙের মতন ?
লজ্জায় যাই মরে'।
দেখুন, দেখুন, ফোক্‌লা বেকুব
দাঁত নেইকো বলে'
হাঁ করেছে কতখানি—
যেন খোলা থ'লে !
এত কাণ্ড কিসের জন্যে ?
কেন হাসাহাসি ?
আপনি দায়ী—চেঁচিয়ে কথা
বল্‌ছেন রাশিরাশি।
দু'টি আলু ঝুড়ি থেকে
ফেলেছিলাম জেবে—
কাহার জিনিস নিচ্ছি সেটা
কিচ্ছু নাহি ভেবে।
অন্যমনা থাকি আমি
নানান্ ঝঞ্ঝাটে—
অন্যমনাই ছিলাম যখন
এলাম আমি হাটে।
অন্যমনা এই মানুষটা
ভ্রমবশতঃ
আল্‌গোছে দুই আলু নেছে—
তাতেই কথা অত !

ভুল হয় না আপনাদেরও ?
মুনি ঋষির হয়—
মহা মহা ভুল করেছেন
অনেক মহাশয়।
ভাবুকের আর কাজের লোকের
ভুল ভ্রান্তি ঘটেই—
খেয়াল মেজাজ বেঠিক্ বলে'
অভাবীর ত' বটেই।
আনন্দে যে আত্মহারা
তারও ঘটে ভুল,
বিয়ের আগে দাড়ি চাঁচতে
কামিয়ে ফেলে চুল।
ভুলক্রমে যা' নিয়েছিলাম
ফেরত ত' তা' দিছি—
দু'টি আলু; তবু হল্লা
করলেন মিছিমিছি!
আমার মতন ভুলো মনটা
হ'লে আপ্‌নাদের
পরের গরু ছাগল মহিষ
টেনে নিতেন ঢের।

আলু ত' খুব তুচ্ছ জিনিস—
ছ'আনা সের দর,
দু'টোর কি দাম বলুন দেখি
হিসেব করার পর!—
এক পয়সাও নয়, তবু
এম্‌নি ব্যবহার!
যেন নিচ্ছি কেড়ে' লুঠে'
ভাণ্ডার আপনার।
আচ্ছা, তবে আসি এখন—
নমস্কার করি;
মনে রাখ্‌বেন, তাহাই করি
যাহা করান্ হরি।
গোকুল দত্ত আমার নাম,
নদীর পারে থাকি—
আর এক যাত্রায় বল্‌ব কথা
যা' রইলো বাকি।"
রুষ্টচক্ষে সাগর পানে
চেয়ে একটিবার
চ'লে গেল গোকুল দত্ত
শক্ত ক'রে ঘাড়।

থেমিষ্টোক্লেশের আমলে এথেন্সে লোক-সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার, থেমিষ্টোক্লেশ এই বিশ হাজার লোকের প্রত্যেকের নাম জানতেন।

*	*	*

প্রাচীন ইরানে বাদশা ছিলেন সাইরাশ। তাঁর ছিল বিরাট বাহিনী, এবং সাইরাশও থেমিষ্টোক্লেশের মত বাদশা-বাহিনীর প্রত্যেকটি সেনার নাম জানতেন।

মদনমহলের গুপ্তধন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নেশাখোর আছে রকম রকম। কারুর মদের নেশা, কারুর তামাকের নেশা এবং কারুর বা নস্যের নেশা। এক এক দল লোক এক এক রকম নেশা করতে চায়।

কিন্তু আর এক নেশা আছে, যা পেয়ে বসে সবাইকেই। তা হচ্ছে গুপ্তধনের নেশা। সাধুই বল আর অসাধুই বল, গুপ্তধন লাভ করবার লোভ আছে সকলেরই। একে বলা চলে, সার্বজনীন নেশা।

এই মুহূর্তেই সারা পৃথিবীর দিকে দিকে কত লোক যে গুপ্তধনের লোভে ছুটোছুটি করছে, তা কেউ গুণে ব'লে উঠতে পারবে না। কেউ খুঁজছে দুর্গম স্থানে সোনার খনি, কেউ খুঁজছে বোম্বেটেদের লুকিয়ে-রাখা রত্ন ভাণ্ডারের ঠিকানা, কেউ খুঁজছে সাগরের অতলে তলিয়ে-যাওয়া জাহাজের ধনভাণ্ডার।

যকের ধন তো রূপকথারই সামিল। কিন্তু ইতিহাসও এমন অনেক গুপ্তধনের গল্প বলে, যাদের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আজ তোমাদের কাছে সেইরকম এক গুপ্তধনের কথা বলব।

জব্বলপুরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এইখান থেকেই নর্মদা নদীর বিখ্যাত মর্মর-শৈলে যেতে হয়। এবং বীরবালা রাণী দুর্গাবতী এই অঞ্চলেরই মেয়ে। তাঁর গল্প জানো তো? বাদসাহ আকবরকেও তিনি গ্রাহ্য করেন নি, মোগলদের বিরুদ্ধে অসম সাহসে নিজেই করেছিলেন সৈন্য চালনা। শত্রু-নিক্ষিপ্ত একটা তীর বিদ্ধ করে তাঁর চক্ষু এবং আর একটা বিদ্ধ করে তাঁর গণ্ডদেশ। তাই দেখে তাঁর সৈন্যরা ভীত ও হতাশ হয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে। তিনি উৎসাহ দিয়ে তাদের ফিরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন বন্দী হবার ভয়ে স্বহস্তে বক্ষে অস্ত্রাঘাত ক'রে তিনি রণস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। আজও স্থানীয় লোক-গাথায় পল্লীতে পল্লীতে এই মহিমময়ী নারীর বীরত্বকাহিনী পরিকীর্তিত হয় এবং ইতিহাসও তাঁর নাম অমর ক'রে রেখেছে।

গর্হা নামে এখানে একটি প্রাচীন পল্লীগ্রাম আছে, তাকে জব্বলপুরের সহরতলি বলাও চলে। রাণী দুর্গাবতী যে জাতের মেয়ে, সেই জাতের এক রাজা আগে এখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম মদন সিংহ। অনুমান ১১০০ খৃষ্টাব্দে গর্হার দক্ষিণ দিকে তিনি এক অপূর্ব প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তা "মদনমহল" নামে বিখ্যাত।

সেই প্রসাদ আজও বিদ্যমান। "মদনমহলে"র অবস্থানও অসাধারণ। সেকালকার রাজপুত

রাজারা পাহাড়ের উপরে বাদলমহল নামে একরকম প্রাসাদ নির্মাণ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদয়পুরের মহারাজার প্রাসাদের নাম করা যায়—তার অবস্থান দুই হাজার পাদ উঁচু শৈলশিখরে। মদনমহলও এই শ্রেণীর প্রাসাদ। নির্মাণ করা হয়েছে প্রকাণ্ড একটি গণ্ডশৈলের উপরে।

স্থানটি নির্জন ও নিরালা। অনতিদূরেই আছে নাগপুরে যাবার রাস্তা। প্রাসাদের ছাদে উঠে দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়—যেন চিত্রার্পিতের মত নগর, গ্রাম, নদী, পর্বত, অরণ্যানী। এখন আর ওখানে কেউ বাস করে না বটে, কিন্তু আজও অনেকে বন-ভোজন বা অবসরযাপন করতে এদিকে এসে মদনমহল না দেখে ফিরে যায় না। এই প্রাসাদ গড়বার সময়ে বাস্তুকারকে অবলম্বন করতে হয়েছে অসামান্য কৌশল। এইখানে মুক্ত নীলাকাশের তলায় অচল শৈলের উপরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে মদনমহল পাঠ করেছে প্রায় হাজার বৎসরব্যাপী ভারতবর্ষের ইতিহাস—নিষ্ঠুর কাল আজও তার অস্তিত্ব লোপ করতে পারে নি।

মদন সিংহ নাকি কুবেরের মত ধনাধিপতি ছিলেন। তিনি পরলোকগমন করবার পর তাঁর কন্যা পিতার বিপুল বিত্ত ও সিংহাসনের অধিকারিণী হন। লোকপ্রবাদে নূতন রাণীর সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথাই শোনা যায়।

রাণী ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী, তাঁর দিকে তাকালে আর চোখ ফিরানো যেত না। পৃথিবীর মানুষ তেমন রূপ দেখেনি।

কিন্তু কেবল রূপ নয়, ভোজবিদ্যাতেও তাঁর দখল ছিল বাঙালী রাজা মাণিকচাঁদের রাণী মদনাবন্তী বা ময়নমতীর মত। তিনি অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানতেন, হয় কে পারতেন নয় করতে।

রাণীর রূপ আর ঐশ্বর্যের লোভে নানা দেশের রাজার পর রাজা তাঁর কাছে পাঠালেন বিবাহের প্রস্তাব, কিন্তু দূতের পর দূত এল এবং দূতের পর দূত ফিরে গেল হতাশ হয়ে, কারণ রাণীর অটল পণ, তিনি বিবাহ করবেন না।

অবশেষে উত্তর ভারতের এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ক্ষেপে গিয়ে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে অধিকার করতে এলেন রাজ্যসুদ্ধ রাণীকেও। কিন্তু রাণীর আশ্চর্য মন্ত্রশক্তির কথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি।

শত্রুরা রাজধানীতে এসে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কার সঙ্গে তারা লড়াই করবে—এ যে জনশূন্য প্রদেশ, চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কেবল অসংখ্য ছোট-বড়-মাঝারি শৈলখণ্ড! রাণী অপূর্ব মন্ত্রবলে নিজের রাজধানীর প্রত্যেক মানুষ ও পশুকে পরিণত করেছেন শৈলখণ্ডে। পাথরের সঙ্গে তো আর লড়াই করা চলে না, আক্রমণকারী রাজা আবার মুখ চুন ক'রে নিজের

দেশে ফিরে গেলেন। তারপর সেই সমস্ত শিলাখণ্ড থেকে আবার জীবন্ত মানুষ ও পশু আত্মপ্রকাশ করল কিনা, লোকপ্রবাদ থেকে সে কথা জানতে পারা যায় না।

প্রবাদের কথা শিকেয় তুলে রাখা যাক্। আসল ব্যাপারটা সকলে যা অনুমান করেন, তা হচ্ছে এই: রাণী যখন বুঝলেন তাঁর পক্ষে পরাক্রান্ত রাজাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব, তখন সদলবলে রাজধানী ছেড়ে চ'লে গেলেন তিনি অজ্ঞাতবাসে এবং যাবার সময়ে নিজের বিপুল বিত্তের অধিকাংশ লুকিয়ে রেখে গেলেন মদনমহলের কোন গুপ্তস্থানে।

সেই গুপ্তস্থান আবিষ্কার করবার জন্যে আজ পর্যন্ত লোকের মাথাব্যাথার সীমা নেই। মদনমহল প্রাসাদ এখন সরকারের অধীনে সুরক্ষিত। আগে আগে লোকে শাবল ও কোদাল প্রভৃতি নিয়ে প্রাসাদের এখানে ওখানে মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন অন্বেষণ করত, কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। তবু আজও অনেকে গোপনে অনুসন্ধান-কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। রাণীর ধনভাণ্ডারে ছিল নাকি তাল তাল সোনা, সেই স্তূপ বহন ক'রে কেউ তো আর তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারে না, নিশ্চয়ই তা মাটির ভিতরে কোথাও পুঁতে রাখা হয়েছে—স্থানীয় লোকের এইরকম বিশ্বাস।

সম্প্রতি ঐ বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে আর এক কারণে। মদনমহল প্রাসাদ থেকে খানিক তফাতেই নর্মদা নদী। কিছুকাল আগে সেখানে নাগপুরে যাবার রাজপথ প্রস্তুত করা হচ্ছিল। সেই সময়ে কুলিরা রাস্তা খুঁড়তে খুঁড়তে সত্য সত্যই আবিষ্কার করেছিল দু'খানা সোনার ইট!

এতদিন গুপ্তধন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে তাদের প্রাণ!
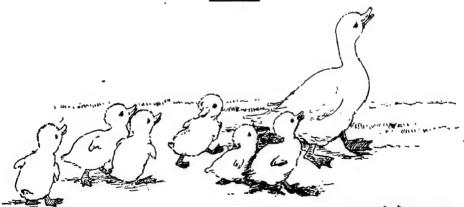
এই ছবিটি দেখে দু'লাইনের একটি কবিতা লেখো। যার কবিতা সবচেয়ে ভাল হবে, সে পাঁচ টাকা পুরস্কার পাবে। পুরস্কার দু'জনের মধ্যে ভাগ ক'রেও দেওয়া যেতে পারে। শ্রাবণ মাসে ফলাফল বেরুবে। ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে কবিতা পাঠাতে হবে।

বৈশাখের দুপুরে ফেরিওয়ালা হেঁকে চ'লে যেতো আমাদের পুরনো পাড়ার সরু পথ দিয়ে। আমার বাল্যকালের চক্ষে ওই পথটাকেই মনে হোতো কত দীর্ঘ,—যেন ও-পথটা হারিয়ে গেছে কোনো তেপান্তরে গিয়ে। পথটা নির্জন—সেই ছায়াচ্ছন্ন নির্জন পথে বয়ে যেতো যেন তন্দ্রাজড়ানো স্নিগ্ধ হাওয়া। সেই হাওয়ায় ভেসে আসতো দূর আকাশ থেকে চিলের ডাক, ভেসে আসতো বহুদূর থেকে ইঞ্জিনের বাঁশীর সুর। ঘর থেকে বাইরে চ'লে যাওয়ার জন্য কে যেন আমাকে স্থির থাকতে দিত না।

কিন্তু কোথায় যাবো? আছে কি কোনো জানা পথ? আছে কি সে পথের কোনো নির্দেশ। ওই দীর্ঘ গলি-পথ উত্তর দিকে বেরিয়ে খৃষ্টানদের গির্জা পেরিয়ে চ'লে গেছে গোয়াবাগানের দিকে, আর দক্ষিণের দিকে গিয়েছে কাঁসারিপাড়া আর ঠনঠনে ছাড়িয়ে পটলডাঙ্গার দিকে। তারপর—তারপর আর আমার কল্পনা ছোটেনা। আমার পথ-হারানো মন ঘরের খুঁটিটা আঁকড়ে ধ'রে যেন থরথর ক'রে কাঁপতো।

এমন সময় ডাকপিওন এসে আমার নামে একখানা পোষ্টকার্ড হাতে দিয়ে গেল। চিঠি? আমার নামে? সমস্ত শরীরের ভিতরে বিদ্যুতের একটা আঘাত যেন প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল। আমার জীবনে সেই প্রথম চিঠি পাওয়া। মহাশূন্যলোকের অস্থির এক পাখী যেন বিশাল সুদূরের সংবাদ নিয়ে আমার হাতে এসে উড়ে বসলো। আনন্দে অথবা কান্নায় আমার গলা বুজে এসেছিল।

চিঠি লিখেছে বলাই শিবপুর থেকে। গরমের ছুটিতে স্কুল বন্ধ, তাই সে গিয়েছে মামার-বাড়ী। আমি নাকি তা'র একমাত্র বন্ধু, আমাকে না দেখে সে আর তিষ্ঠতে পারছে না। ওখানে সে ফুটবল খেলে, আর এই সেদিন দুটো গোলা পায়রা পুষেছে। একদিন লুকিয়ে সে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

এক পয়সা দামের সরু পোষ্টকার্ড, ছাপাগুলো একটু বেগুনী রংয়ের,—ডানপাশে পঞ্চম জর্জের চেহারা। সেই চিঠি ছিল আমার মন্ত্র, সেই চিঠি ছিল অবারিত মুক্তির প্রথম ছাড়পত্র। আরো কিছু ছিল সেই চিঠিতে—ছিল আমার ভ্রমণের সঙ্কেত। ঘরের থেকে বাহির, সে বাহির অনেক বড়। বিধি-নিষেধের বাইরে যে-জীবন—সে-জীবনের আস্বাদ আমার দরকার ছিল। স্নেহ-মোহ-বন্ধনের অতীত যে মহাজীবনের ডাক—তার অচ্ছেদ্য আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যেতো নিমতলা ঘাটের একপ্রান্তে অশথতলার ছায়ায়,—যেখানে প্রাচীন অশ্বত্থের একটা ডাল ঝুলে পড়েছে গঙ্গার জলে,—স্রোতের তাড়নায় সেই ডালের পাতাগুলি কাঁপতো থরথর করে। থাকতো আশেপাশে মাঝিমাল্লা, এসে পৌছতো কত দেশের কত মহাজনী নৌকা; ষ্টীমারের সাইরেন বেজে যেতো মাঝগঙ্গায়,—খেয়া-পারাপার কত হয়ে গেছে পাল তুলে দিয়ে। আমার মন প্রত্যেকটি নৌকা ধ'রে ধ'রে চলা-ফেরা করতো এপার থেকে ওপার।

একদিন বলাই বললে, চল্ মানিকতলার খাল পেরিয়ে যাবো বাঘমারির দিকে। কিন্তু সাবধান, ওদিকে ডাকাতের ভয়,—সন্ধ্যার পর আলো জ্বলেনা। ওই পথ দিয়ে গেলে পায়রাটুনি, তারপর উল্টোডিঙ্গি,—সেখানে মাথার উপর দিয়ে রেলগাড়ী যায়। পথ হারালে কিন্তু আর কোনোদিন বাড়ী ফেরা যাবে না।

মাঠ দেখেছিস কখনো? কখনো দেখেছিস ধানের ক্ষেত? দেখেছিস আম জামের বাগান? তাল আর তেঁতুলের বন?

গলা কাঁপতো জবাব দিতে। বলতুম, না।

আমার দাদামশায়ের ধানক্ষেত আছে হাওড়া জেলায়। যাবি একদিন সেখানে? সেখানে কিন্তু বাঘের ভয়! বনে শিয়াল ডাকে! ডাক শুনেছিস্ শেয়ালের?

এবারেও বলতুম, না।

বলাই বলতো এমন বোকা তুই? তোর কিচ্ছু হবে না!

বলাইয়ের চোখে মুখে যেন বিশ্বপৃথিবীর অভিজ্ঞতা,—যেন সে জ্ঞানের ভাণ্ডার। আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাতুম সমস্ত হৃদয় দিয়ে। সমবয়সী হলেও সে যেন আমার চেয়ে হাজার বছরের বড়।

বড় হয়ে কলকাতায় ঘুরতে হবে তা জানিস? অনেক বড় কলকাতা মনে রাখিস। চৌরঙ্গী দেখেছিস? দেখেছিস বাগবাজার?

সত্যি দেখা হয়নি কলকাতা! আজো কি সব পথ ঘুরেছি, সব গলি মাড়িয়েছি? প্রত্যেকটি আঁকাবাঁকা পথ হোলো এক একটি চেতনার মতো। কত রহস্যে নিবিড়, কত ছোট ছোট জীবনের কাহিনী।

ভোরের মধুর বাতাস উঠেছে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। বসন্তের পাতা-ঝরা প্রায় শেষ হয়ে এলো পথের দুই পাশে। পাখীরা ঘুম ভেঙে উঠেছে, কিন্তু রোদ ওঠেনি তখনও। দীর্ঘ বিস্তৃত পথ উত্তর দিকে যেন অজানা রহস্যের দিকে চ'লে গেছে। দুই পাশে তখনও রয়েছে প্রান্তরের ভগ্নাংশ, তখনও ওখানে হাল বলদ নিয়ে চাষীদের দেখা পাওয়া যেতো। পথটা পায়ে হাঁটা। তখনও যানবাহনের রেওয়াজ হয়নি। কিন্তু আর যাবো কতদূরে? অন্ধ আকর্ষণ আর কতদূরে টানবে এমন ক'রে? সুতরাং নিয়তির হাত ছাড়িয়ে যেন এক সময় পালিয়ে আসতুম।

শ্যামবাজারের মোড়ে তখনও আধুনিক সভ্যতা গ'ড়ে ওঠেনি। দু'একটি চিড়ে-মুড়কীর দোকান, আর অবাঙ্গালী ফেরিওয়ালাদের এক একটি কেন্দ্র। পথের দু'ধারে খোলার খাপরা, সেখানকার বস্তির মেয়ে-পুরুষরা আসে বড় রাস্তার ধারে জল নিতে। দেশবন্ধু পার্কের দিকটা ছিল জলামাঠ, মাঠের প্রান্তে উল্টোডিঙ্গির খাল—সেদিকে যেতে ভয় করতো দিনের বেলা। নাবালক দলের অসমসাহসিক অভিযান হোতো ওই দিকে। শ্যামবাজারের পশ্চিম দিকটায় এলে তবে সভ্যজগতের দেখা পাওয়া যেতো।

বলাই বললে, বালীগঞ্জে যাবি একদিন?

বললুম, সে কোন্ দিকে?

বিজ্ঞের হাসি হেসে সে বললে, কলকাতা কিন্তু সেখানেই শেষ। তারপর সুন্দরবন।

তেলের আলো জলতো মনোহরপুকুরের পথে! দু'ধারে দুর্গম বনময় জঙ্গল জলা। কোথাও কোথাও মুড়ি আর ছোলা-ভাজার দোকান। কালীঘাট পর্যন্ত আসা যেতো সাহস ক'রে। দক্ষিণ দিকটা জলাময় অন্ধকার বন। এধারে ওধারে ছোট ছোট গ্রাম্য বস্তি। মহানির্বাণ মঠ পর্যন্ত এসে মনোহরপুকুরের সরু পথ কোন্‌দিকে যেন হারিয়ে গেছে। বলাই বলতো, আর নয় কিন্তু, আর কিছু আমি চিনিনে।

ইচ্ছা হোতো আরো যাই। যাই সুন্দরবনের দিকে। যাই সেই হিংস্র অরণ্যলোকে, যাই গঙ্গাসাগরে,—যাই সেখানে—যেখানে আজো কেউ যায়নি। কিন্তু বেলা প'ড়ে এলো—মনোহরপুকুরের বনের গাছপালার মাথায় পড়ন্ত রোদ চিকচিক করছে। অবেলার দিকে অজানা পথে পা বাড়াতে আর সাহস হয়না। এখনও হাঁটতে হবে দু'ঘণ্টা তবে বাড়ী পৌঁছতে পারবো।

নতুন বালীগঞ্জের পত্তন তখনও হয়নি, তখন রাসবিহারী এভেন্যু কল্পনার অতীত। দুর্গম বনময় গ্রাম, এলোমেলো পথ, সেই পথ ধ'রে যেতো পুরনো ছ্যাকড়াগাড়ী—সেই গাড়ী বালীগঞ্জ ষ্টেশন থেকে পালাপার্বণে যাত্রীদের নিয়ে পৌছে দিত কালীঘাটে। সেই পথ ধ'রে সোজা চ'লে আসা কালীঘাটে, কালীঘাট ছাড়িয়ে ভবানীপুরে এসে পৌছতে পারলে তবেই দুর্ভাবনাটা যায়। এক সময়ে পথ ফুরিয়ে যেতো, কিন্তু পথের নেশা কাটতো না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষে ছবি এঁকে যেতুম মনে মনে। সমস্ত চেতনাটার উপরে অসংখ্য পথের দাগ, সেই দাগ ধ'রে আমার কল্পনা ছুটে যেতো—যার কোনো আদি অন্ত নেই।

মামা একদিন বাড়ী ফিসে এসে বললেন, এবারে আর সাতশো রাক্কুসীর ঘরে হাঁড়ি চড়বে না—ব'লে রেখে দিলুম।

দিদিমা বললেন, অলক্ষণের কথা শোনো! বলি কেন, কি হয়েছে শুনি?

মামা চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, কলিযুগের শেষ হবে এবার। বড়বাজারে নব-গ্রহের যজ্ঞ বসেছে, খবর কি কিছু রাখো? মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প। তোমাদের পাখীর বাসা ভাঙ্গবে এবার।

বাসা ভাঙ্গলেই তোর মন ঠাণ্ডা হয়, কেমন? আজ ক'ছিলিম টেনে এসেছিস, শুনি?

মামা এবার চেঁচিয়ে বললেন, যুদ্ধ বেধেছে, খবর রাখো?

দিদিমা বললেন, কোথায় যুদ্ধ?

মুখ বেঁকিয়ে মামা বললেন, ইউরোপে—তোমার বাপের বাড়ীতে! ইউরোপ কোথায় জানো?

দিদিমা মুখ তুলে চেয়ে রইলেন। মামা বললেন, এ যুদ্ধে আর কাউকে বাঁচতে হবে না! সব আমি শুনে এলুম গোবর্ধনের দোকান থেকে। ছেলেপুলে যদি রাস্তায় বেরোয়, আমি বাঁচাতে পারবো না। হেদোর মোড়ে সব সেপাই ব'সে গেছে। টুঁ শব্দটি করছে কি একেবারে দ্বীপান্তরে চালান দেবে।

মামা আরো ব'লে দিলেন, এ যুদ্ধে ইংরেজ যদি হারে তবে বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। দেশে অরাজকতা আর প্রলয়। আর যদি জেতে, তবে দেখে নিয়ো তোমার জামাইয়ের মতন আমিও রায় বাহাদুর টাইটেল্ পেয়ে যাবো।

মামা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সে-রাত্রে আমার চক্ষে ঘুম রইলো না। ইউরোপ শব্দটা আমাকে পেয়ে বসেছিল। শিশুপাঠ্য ভূগোলে ইউরোপের মানচিত্রটা থাকে বাঁ দিকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন কল্পনায় আমি তখন

বেরিয়ে পড়েছি ভারতবর্ষের থেকে। চলেছি আফগান ইরাণ পেরিয়ে, চলেছি আরব আর ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে—চলেছি সাত সমুদ্র তেরো নদী উত্তীর্ণ হয়ে। চলেছি দূর থেকে দূরে। আমার চোখে ঘুম নেই।

বলাই—আমার সহপাঠী—তার হাত থেকে সেই আমার প্রথম চিঠি পাওয়া। সেই চিঠি এনেছিল পথের সংবাদ, পথ হারাবার নেশা, পথ ভুলে যাবার মোহ। ঘরে যারা মানুষ, ঘর তাদেরকে বেঁধে রাখে। ঘরে সুখ আছে, মুক্তির আনন্দ নেই। সেই কালে কলকাতা ছিল অনেক বড়—যেন তার আদি-অন্ত নেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মহানগর হয়ে এসেছে ছোট। কথা কইতে কইতে শহর ফুরিয়ে যায়।

বলাই বলতো, এ-পথে হাঁটা হোলো, ও-পথটা বাকি রইলো—এ হলে চলবে না। সব রাস্তা, সব গলি পেরিয়ে যাওয়া চাই।

ভূগোলের শিক্ষক বলতেন, ট্রেনে যদি বিলেত যাওয়া হয়, তবে কোন পথে?

মামা বলতেন, বল্ দেখি পগেয়াপটি কোন্ দিকে? কোন্ দিকে জানবাজার?

বলতে পারতুম না, অবাক হবে থাকতুম। কতটুকু পথ জানি, এটি বড় কথা নয়। কতখানি পথ অপরিচিত রয়ে গেল সেইটিই আসল কথা। ক্ষুধা জেগে ওঠে মনে মনে,—রেলপথে ট্রেনের চাকার নীচে দিয়ে ক্ষুধার্ত মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে, খরস্রোতা গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে চলে, আকাশ-পথের উড্ডীন পাখীর ডানার তলায় তলায় ছুটে যায়। মন যায় দুর্গম অরণ্য-লোকে, দুরারোহ পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়, ঝড় আর ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ অন্ধকার সমুদ্রের বিভীষিকায়। এই সুবিশাল প্রাচীন ভারতের সর্বত্র পিপাসার্ত মন প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়ায়।

কিন্তু বলাইয়ের সেই প্রথম চিঠিই হোলো মূলমন্ত্র—প্রথম প্রেরণা।

জলে থেকে জল তেষ্টা!

মাছেরা কি জল খায়?

এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে: খায় বইকি—নিশ্চয়ই খায়! তেষ্টা পেলে ঠিক সাধারণ জীবের মত না হলেও, প্রত্যেক খাদ্যের সঙ্গেই তারা খানিকটা ক'রে জল খেয়ে থাকে, এবং আমাদের শরীরের মত তাদের শরীরেও জল-বায়ুর প্রয়োজন আছে।

অনেকের ধারণা ছিল যে, মিষ্টি জলের মাছেরা জল খায় না, জল খায় কেবল নোনা জলের মাছেরাই, কারণ তাদের দেহে প্রচুর নুন পাওয়া যায় এবং তারা খেতেও নোন্‌তা। কিন্তু এ তথ্য যে ঠিক নয় তা আমেরিকান জীবতত্ত্ববিদ্ প্রঃ এ্যালি ও পীটার ফ্রাঙ্ক প্রমাণ করে দিয়েছেন।

(পুর্ব-প্রকাশিতের পর)

'রাজী' কথাটা মুখে তো সে বললে, কিন্তু বলা যত সহজ, কাজে করা কি তেমন? এওতো একরকমের ভণ্ডামি। বাবার কাছে ছোটবেলা থেকে সে যত উপদেশ শুনেছে—তার মধ্যে প্রধান হলো "সর্বদা সত্য আচরণ করবে—"

জীবনে কখনও তার বাবা মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। কলেজে বাবার থাকতো দু'টো দোয়াত। একটাতে কলেজের দেওয়া কালি আর একটা নিজের পয়সায় কেনা দোয়াত-কালি। কলেজের কাজে কলেজের কালি-কলম, আর নিজের কোনও ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র লিখতেন নিজের কেনা কালিতে।

প্রথম প্রথম রাতুলের কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকতো। একদিন সে জিগ্যেস করেছিল।

বাবা বলেছিলেন—মনে-প্রাণে সত্য হতে হবে—সত্যং শিবম্ সুন্দরম্—যা' সত্য তাই শিব তাই সুন্দর—সুন্দরের এ-ছাড়া আর কোনও অর্থ হয় না রে খোকা—

রাতুল জিগ্যেস করেছিল—তা'হলে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য বুঝবো কী করে বাবা?

—ওর একটা মাত্র পরীক্ষা আছে, সেটা হচ্ছে—যে-কাজ পরের কাছে বলতে তোমার লজ্জা হবে—বুঝবে সে-কাজ অন্যায়···সত্য কাজে কখনও লজ্জা হয় না—

সেই বাবার ছেলে হয়ে রাতুল আজ চরম মিথ্যাচারের আশ্রয় নেবে। সে কি টাকার লোভে। না হয় তার টাকার লোভ নেই, কিন্তু এ-ছাড়া তার গতি-ই বা কি? বিশাল পৃথিবীর এক প্রান্তে বিনা-প্রতিদানে কে তাকে আশ্রয় দেবে। তার আত্মগোপন করা ছাড়া আর কিছু উপায় আছে কি! যেখানেই সে আশ্রয় চাইতে যাবে তারা তার সত্য পরিচয় জানতে চাইবে। একটা টিউশ্যানি পেতে গেলেও তার নাম ধাম পরিচয় জানাতে হবে।

যাক্ গে এ-সব কথা। যখন সে কথা দিয়েছে, তা'কে তা রাখতেই হবে।

ভালোই হলো। রাতুলের একদিন মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, আজ এই এডেন বন্দরে 'কেস নম্বর ৪৯'-এরও মৃত্যু হলো—এর পর যতদিন সে বেঁচে থাকবে, লোকে তা'কে হরিদাস বলেই জানুক। এ তার মিথ্যাচার নয়, এ তার জন্মান্তর। এডেন-এর মরু-শৈলে এসে তার জন্মান্তর ঘটলো যেন।

ভবতোষবাবু···দোকানে যাবার আগে একবার দেখা করে গেল।

—তোমার খাবার ব্যবস্থা করেছি এখেনে—তুমি খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো ভাই—আমি দুপুরবেলা খেতে আসবো তখন কথা হবে—আর যদি বেড়াতে বেড়াতে একবার দোকানে আসোতো চপ্, কাটলেট্ খাওয়াবো'খন—

—চলুন আমিও যাই—একটু খোলা হাওয়ায়···

কোথায় কোন দিকে বেড়াবে সে। চারদিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে রাতুল। কাল রাত্রে রাতুল এখানে এসে নেবেছে—এখানকার কিছুই দেখিনি।

ভবতোষবাবু বললে—কোথায় আর বেড়াবে ভাই—এ মরুভূমির দেশ, একটা সবুজ ঘাস পর্যন্ত দেখতে পাবে না কোথাও—নইলে জলটুকু পর্যন্ত এখানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়—

খানিকদূর গিয়ে ভবতোষবাবু আবার বললে—প্রথম যখন দুই বন্ধুতে এলাম এদেশে—জাহাজ থেকে তো নামলাম ভাই—শেষে কী যে হলো, সারা গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল, গরমের চোটে রাতে ঘুম নেই—দিনের বেলা ঘরের বাইরে বেরুতে পারিনে—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায় এক গ্লাস জল খেতে পাইনে—ভাবলাম দূর ছাই পালাব এ-দেশ ছেড়ে···শেষে···

দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ভবতোষবাবু বললে—ওই যে দেখছ "জেবেল ইহ্সানের" পাহাড়—ওই পাহাড়ের তলায় আরবদের একটা বস্তীতে গিয়ে উঠলুম দু'জনে—কিন্তু পাহাড় না পাহাড়—একটা ঘাস পর্যন্ত যেখানে বাঁচে না, সেখানে কি মানুষ বাঁচে। তবু হরিদাস বললে, এখানেই থাকবো—বাঙলা দেশকে যখন ছেড়ে এসেছি তখন আর বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দেব না—নিজের জন্মভূমি, নিজের গাঁ, নিজের দেশই যখন ঠাঁই দিলে না আমাদের, তখন সব দেশই আমাদের দেশ—এখানে যখন এত মানুষই বাস করছে, আমরাই বা থাকতে পারবো না কেন—আমরাও তো মানুষ—

দু'জনেই হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। উটের সারি চলেছে রাস্তায়। অদ্ভুত জন্তু। কী কদাকার শরীর—কিন্তু ও ছাড়া আর নির্ভরই বা কী। নীল সমুদ্রের জাহাজের মত ধূসর মরুভূমির ধূসর মানোয়ার। পিঠের ওপর শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে চলেছে কালো কালো সোমালিরা।

ভবতোষবাবু এবার থমকে দাঁড়াল। বললে—এবার আমি আসি ভাই—আমি যাবো বাঁ দিকে—ঘুরে এসো ঠিক আমার দোকানে—

রাতুলও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। বললে—আচ্ছা আপনারা দু'জনে দেশ ছেড়ে এলেন কেন তাই কেবল ভাবছি···

হঠাৎ যেন কেমন উদাস হয়ে গেল ভবতোষবাবু। সেই ভোরবেলা এডেন-এর ধূলিরুক্ষ পাহাড়ি রাস্তার পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ভবতোষবাবু একবার খানিকক্ষণের জন্মে চোখ বুজলো। তারপর চোখ দু'টো খুলে আস্তে আস্তে বললে—শেষকালে এই সময়ে দেশের কথা মনে পড়িয়ে দিলে ভাই—কাজটা ভালো করলে না—

সামনে 'ষ্টীমার পয়েণ্টে'র দিকে 'মা-আলা' রোড। সেই দিকেই চলতে লাগলো ভবতোষবাবু। যেন স্বপ্নের ঘোর লেগেছে তার চোখে। বললে···বাবা মরে গেল—কিছুদিন পরে ভাত খেতে বসে দেখি শুধু ভাতই খাচ্ছি, তরকারি নেই। একদিন বাড়ী ফিরেছি দেরি করে, শুনলাম ভাত ফুরিয়ে গেছে···তখন কি জানি যে সংসারের আমি আর কেউ নই—

ভবতোষবাবু যেন নিজের মনেই কথা বলতে লাগলো : হঠাৎ ভাই একদিন চোখ তুলে চাইলাম—দেখলাম সব বদ্‌লে গেছে—রান্নাঘর হয়েছে তিনটে···আমার সংসার থাকলে চারটে রান্নাঘরই হতো···দেখলাম বাড়ীর মধ্যে পাঁচিল উঠে গেছে তিনটে···চার ভাই আমরা, আমিই সব চেয়ে ছোট···বড় তিন ভাই-এর বিয়ে আগেই হয়ে গেছে···আর হরিদাস? পৃথিবীতে ওর যারা আপন জন তারা কবে ছেড়ে চলে গেছে মনেও নেই কারো···মানুষ হলো যাদের বাড়ীতে, তারা ওর কেউ-ই নয় বলতে গেলে—শুধু শৈলর জন্মে ওর মনটা মাঝে মাঝে কেমন করতো···তা' যা'হোক্···যেই একদিন বললাম—পালিয়ে যাবি হরিদাস—অম্‌নি রাজী, বরাবরই ওর নিরুদ্দেশের দিকে ঝোঁকটা ছিল কিনা···

গল্প বলতে বলতে হঠৎ থেমে ঘুরে দাঁড়াল ভবতোষবাবু।

বললে—থাক্‌গে এ-সব বাজে কথা···এ-সব মনে না পড়াই ভালো রে—

রাতুল দেখলে, ভবতোষবাবুর চোখ দু'টো ছল্‌ছল্ করে উঠেছে।

তারপর আর কিছু না ব'লে হঠাৎ নিজের দোকানের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলে ভবতোষবাবু।

চলে যাবার আগে বললে—গরীব হওয়ার জ্বালাটা জীবনে বড় হাড়ে-হাড়েই বুঝেছি ভাই—তাইতো তোমাকে হরিদাস সাজতে বলা, নইলে আর কিসের···

হাঁটতে হাঁটতে রাতুল সোজা চলে এবং ষ্টীমার পয়েণ্টের দিকে। একলা।

ভেতরের বন্দর থেকে একখানা আরবী বজরা ধীরে ধীরে বাহির সমুদ্রের দিকে চলেছে। আর ওদিকে জলের গা-ঘেঁষে একজন সোমালি মাল্লা নমাজ পড়তে বসেছে। কালো সমুদ্রের জল সূর্যের আলো লেগে একটু একটু চিক্‌চিক্ করে—প্রায়ান্ধকার সমুদ্রের বুকে দূরে হয়ত একটা উড়ন্ত মাছ জল থেকে দশ বারো ফুট লাফিয়ে উঠে আবার জলে পড়ে গেল···তার পেছনে কিছু দূরে আবার আর একটা···তার পেছনে আবার একটা।···জেটির গা-ঘেঁষে একটা নৌকো আস্তে আস্তে ছেড়েছে। কোথায় বুঝি কোন্ দ্বীপের উদ্দেশে পাড়ি দেবে। মাল্লারা তালে তালে দাঁড় বাইছে আর চীৎকার করে বলছে—'ইয়াহুদী ও আল্লা'···'ইয়াহুদী ও আল্লা'···! সকালের ঝিরঝিরে বাতাসে সমুদ্রের বুকে মৃদু ঢেউ দেখা দেয়। একটা জাহাজ হয়ত তখন আরো দূরে দক্ষিণে চলে গিয়ে ভোরের অন্ধকারে কৃষ্ণবিন্দুর মত মিলিয়ে যায়।

ওপাশে মুখ ফিরিয়ে দেখলে রাতুল। চওড়া রাস্তাটার দিকে। এর মধ্যে রাস্তায় লোক চলাচল সুরু হয়ে গেছে। তেজী রদ্দুর ওঠবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে ওরা। উটের নাকের দড়ি ধরে নিয়ে আরবরা সব নিজের কাজে চলেছে। তাদের ঝোলা আলখাল্লার নানা জায়গায় ছোরা ছুরি ঝুলছে—রূপোর বাঁটওয়ালা ছোরা ছুরি। তাদের পেছনে চলেছে আর একজন। দেখে মনে হয় ওদের চেয়ে বুঝি এ অনেক বড়লোক, পরণে লম্বা রেশমী জেব্বা। গায়ে সোনালী জরির কাজ করা ভেলভেটের ওয়েষ্ট কোট। আর রাস্তা ঘেঁষে চলেছে বস্তী—দেখে বোধ হয় জেলেদের বস্তী···

হঠাৎ···হঠাৎ যেন অবাক হয়ে গেল রাতুল।

উল্টো দিক থেকে কে আসছে! যেন চেনা চেনা মুখটা না! অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ন করে দিয়ে দেখতে লাগলো রাতুল। তারপর মূর্তিটা সামনে আসতেই চীৎকার করে উঠেছে—ভোম্বল, ভোম্বল তুই? ভোম্বলদাস সামনে এগিয়ে এল। অত সকালেই চীনেবাদাম চিবুচ্ছে। পকেট থেকে দু'টো চিনেবাদাম বার করে এগিয়ে দিয়ে বললে—খুব ছেলে যাহোক বটে তুই! নে খা···

রাতুল ভোম্বলের দু'টো কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—ভোম্বল তুই যাস্‌নি?

কাল সমস্ত রাত ধরে যেন ভূমিকম্প হয়েছে—আর আজ যেন তা এতক্ষণে থামলো। অকূল সমুদ্রে দিক-হারা জাহাজ যেন এতক্ষণে তীরে ভিড়লো। রাতুল এবার নিশ্চিন্ত, নির্ভয়।

—তা'হলে তুই চলে যাসনি ভোম্বল—

—আচ্ছা তো ছেলে যাহোক তুই—মাংস ভাত রেখে বসে রইলাম—ক্ষিদে কি আসে?

মনে করলাম রাগ করেছে ঠিক আমার ওপর—বাঙালীর ছেলে অন্য মুরোদ তো নেই, কেবল রাগতেই জানে। আটটা বাজলো, ন'টা বাজলো, দশটা বাজলো, প্রথমে জেটির পইঠেতে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর যখন সিঁড়ি তুলে নিলে, জাহাজের রেলিং ধরে অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবতে লাগলাম—কী হলো ছেলেটার কী হতে পারে ছেলেটার—আর যে খুঁজতে বেরুবো তার উপায় নেই—গেট্ বন্ধ হয়ে গেছে···রাতে কি ঘুম আসে তোর জন্যে ; অচেনা অজানা জায়গা, কাউকে চিনিস না জানিস না—কোথায় শুবি, কী খাবি ভেবে ভেবে···হ্যাঁরে সারা রাত কোথায় কাটালি···কী খেলি···কিন্তু তুই ন'টার সময় এলি নাই বা কেন ?···ওঃ মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে তোর···খাওয়াবেই বা কে, ভোম্বল দাস তো আর গণ্ডা গণ্ডা নেই দুনিয়ায়, আর ওদিকে পকেটও তো তোর গড়ের মাঠ জানি—

রাতুল বললে—রেডিও শুনতে শুনতে রাত দশটা বেজে গেল খেয়াল ছিল না···ভাবলাম জাহাজ ছেড়ে গেছে—কিন্তু সে যা'হোক, তুই যাসনি কেন ভোম্বল বল্ তো—

আরে আমাদের জাহাজ যে এদিকে খারাপ হয়ে গিয়েছিল—রাত ন'টার সময় ছাড়বার কথা, হঠাৎ কী হলো বয়লারে না কিসে, জাহাজ আর নড়ে না, সমস্ত রাত ধরে সেই সারানো হচ্ছে···এখন শুনছি নাকি ঠিক হয়েছে—বেলা দশটায় বুঝি ছাড়বার কথা—তা' সারা রাত তোর জন্যে ভেবে ভেবে সকালবেলা বেরুলাম দেখতে ছেলেটা কোথায় গেল···মরলো না বাঁচলো—তা চ' তাকে ঢুকিয়ে দিই ভেতরে—

রাতুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে। তা'হলে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় তার যাওয়া হলো। বললে—দাঁড়া আমি একবার ভবতোষবাবুকে খবর দিয়ে আসি—এখুনি যাবো আর আসবো—

ভোম্বল জিগ্যেস করলে—ভবতোষবাবু কে ?

—এসে বলবো'খন—

'মা-আলা' রোড ধরে আবার রাতুল চললো। রাস্তায় তখন লোকের আনাগোনা বেড়েছে। অনেক উটের সারি আর ভিড় পেরিয়ে রাতুল এসে পৌঁছুল দোকানের সামনে। ভবতোষবাবু তখন নিজের হাতে উনুনে হাওয়া দিচ্ছে।

—এসেছ ? ভালোই করেছ—বোস ভাই, বোস—চা খাও—

—না, বসতে আসিনি ভবতোষবাবু, আমি চল্লাম—রাতুল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

ভবতোষবাবু পাখা হতে নিয়েই উঠে এল। বললে—সে কি ? কোথায় চল্লে ?

—আমাদের জাহাজ কাল রাত্রে নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল—এখনও জেটিতে রয়েছে—দশটায় ছাড়বে—আমি যাই ভবতোষবাবু—

—যাবে সত্যি ?···তা'হলে ?···গলাটা যেন কেমন করুণ হয়ে এল ভবতোষবাবুর।

আবার বললে—তোমাকে আর আটকে রাখবো কী করে ভাই—তা' যা'হোক আমাদের কথাবার্তা কাউকে বলো না—আর,—আর একটা কথা—

আড়ালে টেনে নিয়ে এসে ভবতোষবাবু চুপি চুপি বললে—কথা তোমায় দেওয়া রইল ভাই—জাহাজের চাকরিতে কত আর পাচ্ছ—যখনি আসবে তুমি তখনি তোমায় নিয়ে যাবো বর্মায়—ছ'জনে যাবো—একবার টাকাটা হাতে পেয়ে গেলে তখন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকো না···ভাই, গরীব হওয়ার জ্বালাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিছি কিনা—তাই, নইলে কিসের আর···

রাতুল চুপ ক'রে রইল।

ভবতোষবাবু আর একবার বললে—তা'হলে ওই কথাই রইল ভাই—যখনি তুমি আসবে তখুনি···তুমিই ভাই আমার একমাত্র ভরসা···তা' নিরাশ আমি হবো না ভাই···অতগুলো টাকা···তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো কিন্তু···তা বেশী যেন দেরি করো না তা'বলে—ভবতোষবাবুর চোখ ছুটো কান্নায় ছল্ ছল্ করতে লাগলো। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আকাশের বুক চিরে তারে দেখলাম
সকালের সোনা দিয়ে লেখা তার নাম;
বাতাসেতে ঢেউ তুলে সে যে গান গায়:
বলো ত' এমন সুর পেয়েছ কোথায় ?
তারে বললাম!
—"যেখানে রোদের পাখা ভেসে ভেসে
আসে
গাঢ় ঘুম, ভেঙে যায় ভোরের বাতাসে
গুহা হ'তে লাফ দিয়ে ছোটে নির্ঝর
সেইখানে এ-কথার পাবে উত্তর।"
: কত এর দাম ?
—"যখন হিমের রাতে ফোটেনাক কুঁড়ি
থুক্ থুক্ করে কশে থুথ্‌ড়ে বুড়ী—
তবু তার বুকে আছে যেটুকু আগুন
তাতে যত ফুল ধরে, দাম ততগুণ;
আমি হারলাম।"

তোমাদের লেখা

[তোমাদের যে সমস্ত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ছবি, ফটো ও আলপনা আমাদের হাতে আছে, তার নামগুলি প্রথমে এখানে আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করব, তারপর এরই ভেতর থেকে মনোনীত হবে প্রকাশযোগ্য লেখাগুলি এবং প্রতিযোগিতার পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। সম্ভবতঃ দু'তিন মাসেই এই নাম প্রকাশের কাজ শেষ হবে। এই নাম প্রকাশের একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ, বহু রচনা বহুদিন থেকেই আমাদের দপ্তরে জমা হয়ে আছে এবং তার মধ্যে অনেকগুলি আবার গত বছর থেকেই মনোনীত হয়ে আছে; অতএব এখন আমাদের জানা দরকার যে এই রচনাগুলির মধ্যে অন্য কোথাও কোনটি প্রকাশিত হয়েছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন রচনা আমাদের হাতে না এসে থাকে বা কোন কারণে হারিয়ে থাকে, তা'হলেও এই নাম প্রকাশের ফলে তা ধরা পড়বে, এবং কপি থাকলে সেই লেখা পুনরায় তোমরা আমাদের পাঠাতে পারবে। বৈশাখ পর্যন্ত যে সব লেখা আমাদের হাতে এসেছে এর মধ্যে কেবলমাত্র সেইগুলিরই নাম প্রকাশিত হবে।]

রূপান্তর—মহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়; ব্যায়াম—সুলতা লাহিড়ী; মহারাজা রামচন্দ্র—বাণী সিংহ; পদ্মার গ্রাস—শ্রীঅশোককুমার সরকার; লেখক হওয়ার বিপদ, শপথ—শ্রীঅরুণা রুদ্র; শরতের জাগরণ—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ; একটি নদীর আত্মকথা—কুমারী সর্বাণী বসু; বসন্তের ডাক—শ্রীপ্রসেনজিৎ সিং; মাভৈঃ, বাণী, পরিচয়, অপরিপূর্ণ—সুব্রত রায়; বর্ষা—শ্রীমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়; বিশ্বাস করো আর নাই করো—শ্রীঅমল মিত্র; পূজার ছুটিতে চেরাপুঞ্জি—শ্রীরজত চন্দ্র; বরণ ক'রে নে, পরীর গীতি, স্মরণীয় দিন,—শ্রীঅনিমা সান্যাল; কংপকপি থেকে কোহিমা (অপ্রকাশিত অংশ)—কুমারী দিপালী সেনগুপ্তা; সম্পাদক হওয়ার বিপদ—শ্রীঅশোক সান্যাল; ছোট্ট বন্ধু—শ্রীপ্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়; তর্কের পরিণাম—শ্রীঅজিত ঘোষ; ভূত হওয়ার সুখ—শ্রীনমিতা ও সুশান্ত গুপ্ত; শহরে ছেলে—শ্রীবনবিহারী ঘোষ; ভাবীকাল—শ্রীতুষারকান্তি সিংহ; স্মরণীয় অনুভূতি, একটি বিষাদ-গাথা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়; মাতৃহারা ভাইবোন—শ্রীইন্দ্রাণী দাস; গান্ধী তোমায় নমস্কার—শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়; একটি বীরপুরুষের কাহিনী—শ্রীশচী বন্দ্যোপাধ্যায়; বাঘমারীর পথে—লুৎফর রহমান; একটি করুণ কাহিনী—শ্রীঅর্ঘকুমার সেন; আমাদের কেষ্টা—শ্রীপ্রতিমা গাঙ্গুলী; আবেদন—শ্রীঅঞ্জলি ব্যানার্জী; পাছে লোকে কিছু বলে—শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী; শ্যামলা জননী—শ্রীসুখেন্দুমোহন দাস; নিবেদন—শ্রীরামচন্দ্র আচারী; দুই দিক—শ্রীরত্না রায়; বরষার দিন—শ্রীনৃপেন্দ্রবিজয় সিংহ; বিপদ—শ্রীপার্থ বসু; পেটুকরামের স্বপ্ন, জন্মদিনে—শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়; অভিশাপ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার; স্মৃতিলেখা—শ্রীশশীভূষণ আইচ; রূপকথার রাজকুমার—শ্রীদুলালচন্দ্র দাস, সরোজিনী নাইডু—শ্রীসুলতা লাহিড়ী;

মনোহর ঝঙ্কার—শ্রীতাপসকুমার বসু; একটি বটবৃক্ষের আত্মকথা—শ্রীহৃচন্দ্রা মল্লিক; অশরীরী—শ্রীমঞ্জুলিকা লাহিড়ী; অনৈতিহাসিক—শ্রীবনবিহারী দত্ত: পাঁপরওয়ালা—শ্রীদীপক ভট্টাচার্য; একটি মজার গল্প—শ্রীমীরা বিশ্বাস; অভিযান, রবিতীর্থে—শ্রীশিবদাস শেঠ; বিশ্বাস—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। (ক্রমশঃ)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বাঙলা যখন ঘুমিয়ে ছিল, বাঙলার সাহিত্যে যখন নব-প্রেরণার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন যিনি পথের আলো দেখিয়েছিলেন, তিনি ভারতমাতা তথা বিশ্বমাতার কৃতি সন্তান শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠবে, তিনিতো ইহোলোক ত্যাগ করেছেন, তবে তাঁর নামের আগে "শ্রী" কেন? তার উত্তরে বলব: মহামানবের কি মৃত্যু আছে? তাঁদের নশ্বর দেহটা পৃথিবী থেকে চলে যায় বটে, কিন্তু তাঁদের কীর্তিকলাপগুলি যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকে। যেমন:—শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা বহুদিন চলে গেছেন, কিন্তু আজও আমরা প্রতি কাজেই তাঁদের স্মরণ করি। তাই বলবো মহামানবদের মৃত্যু নেই—তাঁরা চিরজীবী!

বাঙলা এবং বাঙালীর দুর্দশা দেখে তিনি বাঙলা মাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

"সাতকোটী সন্তানেরে
　　হে মুগ্ধা জননী!
রেখেচ বাঙালী করে
　　মানুষ করনি॥"

বঙ্গজননী বোধ হয় তাঁর কথা শুনেছিলেন। তাই সুরু হ'ল বাঙার উন্নতি। এই উন্নতির আশা নিয়ে তিনি ২২শে ডিসেম্বর ১৯০১ খৃঃ 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রম' স্থাপন করেছিলেন—শিল্প, সাহিত্য, কৃষ্টি ইত্যাদির উন্নতির চেষ্টায়। তাঁর মধ্যে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ছিল না, তিনি সমগ্র বিশ্বের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সমগ্র বিশ্বের কথা চিন্তা করে তিনি ১৯২১ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর "বিশ্বভারতী" স্থাপন করেন।

বিগত বছরের "এশিয়ান কনফারেন্স" দেখে কবিগুরুর কথাই বেশী করে মনে হয়েছিল। ১৯২৪ খৃঃ অর্থাৎ—গত বছর থেকে ২৫ বছর আগে সুদূর চীন দেশে ব'সে তিনি এই "এশিয়ান কন্ফারেন্স"-এর কল্পনা করেছিলেন। এই "কন্ফারেন্স"-এর উদ্দেশ্য ছিল—এশিয়ার ঐক্য, শক্তি, কৃষি ইত্যাদির পুনরুদ্ধার করে এশিয়াকে স্বাধীকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

তিনি সাহিত্যের মধ্যে এক অপূর্ব ভাবধারা এনে দিয়েছিলেন বলেই ১৯১৩ খৃঃ বিশ্ববিখ্যাত "নোবেল পুরস্কার" লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র বঙ্গমাতার সুসন্তান রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেন।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের মধ্যেও এক অপূর্ব সুরের ধারা ও মাধুর্য এনে দিয়েছেন—যার মধ্যে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। যতই

দিন যাচ্ছে, মানুষ যেন নূতন করে তাঁর সঙ্গীত ও কবি-প্রতিভার পরিচয় পাচ্ছে। যতই দিন যাবে মানুষ ততই তাঁর প্রতিভার আরও নূতন নূতন পরিচয় পাবে।

প্রকৃতির ভাবধারার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ও প্রকৃতিকে প্রাণ ভ'রে ভালবাসতে তাঁর মত কোন কবিই পারেন নি। পাশ্চাত্য কবি শেলী, কিটস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতিকে ভালবাসার এমন সাড়া পাওয়া যায়নি। কবি নিজের কথায় বলে গেছেন :—

'তৃণে পুলকিত যে মাটির ধারা
লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা, কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে!

* * * *

এ-সাত মহলা ভবনে আমার
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁটাতে গিঁটাতে॥'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে থেকে চলে-গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অসীম জ্ঞানের আলো—যা চিরদিন বাঙলা, তথা বিশ্বকে আলোকিত করবে।

শ্রীঅঞ্জলি ভট্টাচার্য

'বনেরি ছায়ায় মনেরি সাথী'
ফটো: শ্রীসুব্রতা বসু

বাদল এল ভাই

সবুজ গভীর বনখানি ঐ
যেথায় গিয়ে মেশে
আজ সকালে বাদল এল
গ্রীষ্মাবকাশ শেষে।
নীল আকাশের আঁচলখানি
জলদরাশি ঢেকে
বিজলী যায় এঁকে বেঁকে
লেখনখানি এঁকে।
কালোয় ভরা মেঘের রাশি
নামায় বাদল বান
গাছে গাছে, পাতায় পাতায়
জাগছে নবীন প্রাণ।
নতুন হয়ে উঠল সবে
বর্ষা আগমনে
বিদায় নিল গ্রীষ্ম আজি
অন্য কোনখানে॥

শ্রীনমিতা চক্রবর্তী

খেলাধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হকি লীগ ঃ

কলকাতার মাঠে প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলায় গত বছরের লীগবিজয়ী কাষ্টমস, রানার্স-আপ মোহনবাগান এবং ভবানীপুর দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লায় খুব জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিলো। কাষ্টমস ২০টা খেলায় ৩৩ পয়েণ্ট করে। অপরদিকে মোহনবাগান ও ভবানীপুর ২০টা খেলায় করে ৩৫ পয়েণ্ট। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ণয়ের জন্যে তখন দু'দলকেই খেলতে হয়। মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত ভবানীপুরকে ১—০ গোলে হারিয়ে এ বছরের লীগ পায়। ইতিপূর্বে ১৯৩৫ সালে মোহনবাগান লীগ পেয়েছে।

বাইটন কাপ ঃ

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফ্‌ট ২—১ গোলে লাহোরের বাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে।

গত দু'বছরের বাইটন কাপ বিজয়ী এবং এ বছরের বোম্বাইয়ের আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল বিজয়ী টাটা স্পোর্টস ক্লাব এ বছরের বাইটন কাপের প্রথম খেলাতেই মধ্য ভারত পুলিশদলের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ০—১ গোলে হেরে যায়। সেমি ফাইনালে মোহনবাগান দল হার স্বীকার করে ১—২ গোলে হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফ্‌ট দলের কাছে এবং অপর দিকের সেমি ফাইন্যালে ভবানীপুর দলকে ২—০ গোলে বাটা স্পোর্টস হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠে। ভবানীপুরের নাম করা তিনজন খেলোয়াড় আহত থাকায় খেলায় নামেন নি। অপর দিকে মোহনবাগান গোলরক্ষকের ভুলে একটা অপ্রত্যাশিত গোল খায়।

ডি এন গুঁই কাপ ঃ

বাইটন কাপের সেমি-ফাইনালে পরাজিত :মোহনবাগান বনাম ভবানীপুর দলের খেলায় মোহনবাগান ৫—০ গোলে ভবানীপুরকে হারিয়ে এই কাপ পেয়েছে।

সর্ব এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ

দিল্লীর জাতীয় ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সর্ব এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এ বছরের ভারতীয় ক্রীড়া মহলে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রতিযোগিতা ভারতীয় খেলাধূলার ইতিহাসে এক

নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ভারতবর্ষের আমন্ত্রণে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দশটি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জাপান প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারলো কিন্তু পাকিস্থান যোগদান করলো না। এটাও সব থেকে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রতিযোগিতায় মোট ১১টি দেশ যোগদান করে। তাদের নাম যথাক্রমে জাপান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান, নেপাল, সিংহল, ইরাণ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং সিঙ্গাপুর। ৪ঠা মার্চ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ভারতবর্ষের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়েছিলো ৫ই মার্চ থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত।

ব্যক্তিগত ক্রীড়ানুষ্ঠানে (Individual Event) জাপান বেশী কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান পায়। দলগত ক্রীড়ানুষ্ঠানে (Team Event) ভারতবর্ষ বেশী বিষয়ে জয়লাভ ক'রে প্রথম স্থান পায়। জাপান পায় দ্বিতীয়। বাঙ্গালী প্রতিনিধিরা নিম্নলিখিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে সাফল্য লাভ ক'রে ভারতবর্ষকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্মান অর্জন করতে সহযোগিতা করেছে।

৫০,০০০ মিটার ভ্রমণে—২য় স্থান—বি, দাস। ১,০০০ মিটার সাইকেল রেসে—৩য় স্থান—এন, সি, বসাক। ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে—১ম স্থান—সচীন নাগ। ১০০ মিটার ব্যাক্-ষ্ট্রোক সাঁতারে—৩য় স্থান—কান্তি সাহা। ৪০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল সাঁতারে—৩য় স্থান—বিমল চন্দ্র। স্প্রিং বোর্ড, ডাইভিংয়ে—২য় স্থান—আশু দত্ত।

'Mr. Asia' সম্মানে—১ম স্থান—পরিমল রায়।

এ-ছাড়া ফুটবল এবং ওয়াটার পোলো টীমে একাধিক বাঙ্গালী খেলোয়াড় খেলে ফাইনালে ভারতবর্ষকে জয়ী করেছে। ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে শচীন নাগ প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ভারতবর্ষকে প্রথম স্বর্ণ পদক পাইয়ে দেন।

সর্ব এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ এবং দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপের জন্য পৃথক ভাবে কোন দেশকে পুরস্কার দেওয়া হয় নি। এরূপ পুরস্কার দেওয়ার রীতি পৃথিবীর অলিম্পিক গেমসেও নেই।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের সাফল্য বিচার ক'রে নীচে একটি বে-সরকারী তালিকা প্রস্তুত ক'রে দেখানো হয়েছে কোন দেশ কত পয়েণ্ট পেয়েছে।

ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তির সংখ্যা

		স্বর্ণপদক	রৌপ্যপদক	ব্রোঞ্জপদক	পয়েন্ট
১ম	জাপান	২০	১৮	১৪	১৬৮
২য়	ভারতবর্ষ	১২	১৩	১৭	১১৬

দলগত অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তির সংখ্যা

১ম	ভারতবর্ষ	৩	৩	২	৫২
২য়	জাপান	৩	২	১	৪৪

ভারতবর্ষের পক্ষে স্বর্ণপদক

নিম্নলিখিত ১৫টি অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ স্বর্ণপদক লাভ করেছে

	অনুষ্ঠান	বিজয়ী	সময় এবং দূরত্ব
১।	১০০ মিটার দৌড় :	(১ম) লেভী পিণ্টো	সময়—১০.৮ সেঃ
২।	২০০ মিটার দৌড় :	(১ম) লেভী পিণ্টো	সময়—২২ সেঃ
৩।	৮০০ মিটার দৌড় :	(১ম) রঞ্জিৎ সিং	সময়—১ মিঃ ৫৯.৩ সেঃ
৪।	১,৫০০ মিটার দৌড় :	(১ম) নিক্কা সিং	সময়—৪ মিঃ ৪১.১ সেঃ
৫।	১০,০০০ মিটার ভ্রমণ :	(১ম) মহাবীর প্রসাদ	সময়—৫২ মিঃ ৩১.৪ সেঃ
৬।	৫০,০০০ মিটার ভ্রমণ :	(১ম) ভগতোয়ার সিং	সময় ৫ ঘঃ ৪৪ মিঃ ৭.৪ সেঃ
৭।	ম্যারাথন রেস :	(১ম) ছোটা সিং	সময়—২ ঘঃ ৪২ মিঃ ৫৮.৬ সেঃ
৮।	১,৬০০ মিটার রীলে :	(১ম) ভারতবর্ষ	সময়—৩ মিঃ ২৪.২ সেঃ
৯।	ডিস্‌কাস থ্রো :	(১ম) মাখন সিং	দূরত্ব—১৩০ ফিট ১০¾ ইঃ
১০।	লৌহ বল নিক্ষেপ :	(১ম) মদন লাল	দূরত্ব—৪৫ ফিট ২½ ইঃ
১১।	১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল সাঁতার :	(১ম) শচীন নাগ	সময়—১ মিঃ ৪.৭৫ সেঃ
১২।	ডাইভিং (স্প্রিং-বোর্ড)	(১ম) কে পি থাক্কার	৩৭১.২৫
১৩।	„ (ফিক্সড-বোর্ড)	(১ম) কে পি থাক্কার	৩৬২.০৫

১৪। ওয়াটার পোলো : ফাইনালে ভারতবর্ষ ৬—৪ গোলে সিঙ্গাপুরকে হারায়।

১৫। ফুটবল : ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে ইরানকে পরাজিত করে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের টুকিটাকি

ডাক্তারের ফী

পৃথিবীর মধ্যে ডাক্তারিতে সব চেয়ে বেশী ফী পেয়ে রেকর্ড ব্রেক্ করেছিলেন ফরাসী সার্জন জাঁ পেঁতা। জার্মানীতে স্যাক্সনির ইলেক্টর, অগষ্টাস্ দি ষ্ট্রংয়ের পায়ের ক্ষত অস্ত্রোপচার করে তিনি ফী পেয়েছিলেন ১০,০০০ হাজার টেলার, (Thaler, জার্মানীর রৌপ্য-মুদ্রা ; দাম তিন শিলিং-এর মত) পথ খরচের জন্য ১,০০০ টেলার, একটি হীরের আংটি, ১,২০০ টেলারের একটি বার্ষিক ভাতা এবং সেই সঙ্গে আরো বহু মূল্যবান উপঢৌকন। এক সঙ্গে এই সমস্ত জিনিসের দাম হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ যাট হাজার টাকার মত। এই অস্ত্রোপচারে সময় লেগেছিল মাত্র ১১ মিনিট।

পৃথিবীর মাছ

সমুদ্র, নদী-নালা, পুকুর, হ্রদ প্রভৃতি নিয়ে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪০,০০০ হাজার রকমের মাছ আছে বলে এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেছে। এই কাজের জন্য বিভিন্ন দেশে পরিষদ আছে এবং তাঁরা এক সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

বড় হ'লে ছোট হয়

পৃথিবীতে এমন অনেক ছোটখাটো প্রাণী আছে যারা আকারে শিশুকালে যেমন থাকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে অনেক ছোট হয়ে যায়। আমেরিকার জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী গবেষণা ক'রে দেখিয়েছেন—সাউথ আমেরিকায় এক অদ্ভুত ধরণের ব্যাঙ আছে, তারা বাল্যকালে প্রায় লম্বায় দশ ইঞ্চি থাকে বটে, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আকার কমে দুই থেকে আড়াই ইঞ্চিতে এসে দাঁড়ায়।

ফ্লোরিসেণ্ট আলো

আজকাল এখানে-সেখানে, দোকানে লম্বা টিউবের মধ্যে যে আলো তোমরা জ্বলতে দেখ, তার নাম ফ্লোরিসেণ্ট বাতি। সাধারণ ইলেট্রিক্ বাল্বের মত তার যদিও ভেতরে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু সেগুলি ইলেকট্রিকেই জ্বলে। এর ভেতরে কি আছে জানো? এর ভেতরে আছে ফস্‌ফরাসের অজস্র গুঁড়ো। এই ধরনের দু'ফুট লম্বা একটি ফ্লোরেসেণ্ট আলোর মধ্যে প্রায় আধ-গ্রাম ওজনের ফস্‌ফরাস থাকে।

চুল ছাঁটা

চুল কাটলেই চুল তাড়াতাড়ি বাড়বে অনেকের এমনি ধারণা আছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর চুল বাড়া-কমা নির্ভর করে। ভালো স্বাস্থ্য যাদের তাদের চুল খারাপ স্বাস্থ্যের লোকের চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে। অনেকের আবার এও ধারণা যে, চুল ডগার দিক থেকে বাড়ে, কিন্তু সেটাও ঠিক নয়। চুল বাড়ে গোড়ার দিক থেকে—যেমন হাতের পায়ের নোক বেড়ে থাকে। সাধারণতঃ এক একটি চুলের জীবন পাঁচ ছ'বছর, তারপর সেটির বাড় নষ্ট হয় এবং তার পাশ থেকে অন্য চুল গজায় ; ক্রমশঃ সে চুলটি আস্তে আস্তে পড়ে যায়।

আলোচনা বৈঠক ও বিতর্ক সভা

সভাপতির মন্তব্য

'ছাত্রদের সব ছায়াচিত্র দেখা কি ভালো?' এই বিতর্কে তোমরা যারা যোগদান করেছ, তাদের সবাইকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেকের রচনার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আমায় অভিভূত করেছে। তোমাদের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে এর মধ্যে।

স্থানাভাবে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় সকলের রচনা মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নি—এর জন্য তোমরা দুঃখিত হও না। পূর্ণিমা দেবী, রত্না রায়, শিবদাস শেঠ, মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী, শুভেন্দুমোহন দাস, কাকলী সেন, দীপালী সেনগুপ্ত প্রভৃতি অনেকের লেখা ছাপাবার জন্য মনোনীত হয়ে থাকা সত্ত্বেও ছাপা সম্ভব হয় নি। এদের সুচিন্তিত আলোচনাগুলি পাঠ করলে অনেকেই খুশি হ'ত।

এই বিতর্ক-সভায় মোটামুঠি বেশীরভাগই তোমরা ছাত্রদের সব ছায়াচিত্র দেখা যে ভালো নয়, সেই দিকেই ঝোঁক দিয়েছ, অর্থাৎ অমলকুমার যে যুক্তির সমর্থনে প্রথম এই আলোচনা আরম্ভ করে, সেই দিকেই মতবাদ হয়েছে বেশী। কিন্তু তা'হলেও, বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও কম নয়। সুব্রতা বসু, বেলা বসু, সোমনাথ চক্রবর্তী ও প্রেমময় বসুর বিরুদ্ধ-মতবাদও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। বাণী সিংহ ও গৌরী মজুমদার এরা একটু নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রকারন্তরে শঙ্করজীবন, সুব্রত, পার্থকুমার, তাপসকুমার ও ছায়া দলুই-এর মত অমলকুমারেরই সমর্থক হয়ে উঠেছে।

মোটের উপর এই বিতর্ক-সভায় বহুর মতকে সমর্থন করলে দেখা যায় যে, ছাত্রদের সব ছায়াছবি না দেখারই সমর্থক তারা এবং এটা খুবই আশার কথা। শুধু আশার কথা নয়, সুস্থ সবল মনের পরিচয় মেলে এর মধ্যে। আমি নিজেও এই মত সমর্থন করি। কারণ, সঙ্গ দোষের মত অসৎ গ্রন্থ এবং কুদৃশ্য বাল্যে ও কিশোর বয়সে মানুষের মনের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আশা করি এ-বিষয়টির গুরুত্ব তোমরা সকলেই অনুভব করবে।

নতুন বই

সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন

আমার বাংলা—শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। ঈগল পাব্‌লিশার্স, ১১-বি, চৌরঙ্গী টেরাস্, কলিকাতা। মূল্য: ২৲

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ একদিন হঠাৎ যেমন তাঁকে খ্যাতিবান করে তুলেছিল, আজ এই ভ্রমণ-কাহিনীও তেমনি বাংলার লোকের কাছে তাঁর আর এক নতুন পরিচয় দেবে। এই ভ্রমণ-কাহিনী লিখে তিনি যে শুধু তাঁরই নতুন শক্তির পরিচয় দিলেন তা নয়, বাংলার পরিচয়ও তাঁর কাছ থেকে পেলুম আমরা নতুন ক'রে। পল্লী জীবনের দুঃখে-দৈন্যে ভরা, অভাব-অভিযোগে ভরা—তিলে তিলে বেঁচে-মরা মানুষের জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে এই বইয়ের মধ্যে। কিন্তু এমন লেখার স্বাদ অনেকটাই যেন ব্যহত হয়েছে ছাপা ও কাগজের অসহযোগিতায়। এবং আকারের তুলনায় মূল্যও অনেক অধিক হয়েছে বলে সাধারণের হাতে পৌঁছনার পক্ষে অসুবিধা হবে।

ছুটির সানাই (মাসিক পত্রিকা)—কাটুম কুটুম সম্পাদিত। ৫নং চৌরঙ্গী টেরাস্, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য: ৩৲

ডিমাই সাইজে খুব ছোটদের নতুন মাসিক পত্র। পাতায় পাতায় রঙিন ছবি আছে, ধাঁধা আছে, গল্প আছে, কবিতা আছে—আছে সবই, কিন্তু কাঁচা হাতের ছাপ আছে বলে এত থেকেও সবটাই জোলো হয়ে গেছে—মনকে স্পর্শ করে না। তবু এ-প্রচেষ্টা ভালো।

প্রাপ্তি স্বীকার—ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রকাশিত 'বাঙালীর পাঁজী' আমরা পেয়েছি। বাংলা এবং বাঙালীদের সম্বন্ধে অনেক খবর এই বইয়ে আছে, সেইজন্য বইটি খুব দরকারী হয়ে উঠেছে। বইটির আকার, ছাপা এবং কাগজ সুন্দর।

নতুন ধরনের ধাঁধা

(১) একজনের ওজন হচ্ছে এক মন ত্রিশ সের; আর তার সঙ্গে আছে তিনটে আপেল। আপেল তিনটির ওজন মোট দেড় সের—আধসের করে প্রত্যেকটার। তাকে পার হতে হবে একটা সেতু; আর, সেই সেতুটার আবার এক মন একত্রিশ সেরের বেশী ভার সয় না। এদিকে আপেল-টাপেল সব নিয়ে সর্বসাকুল্যে নিজে সে একমন সাড়ে একত্রিশ সের ভারী। একটি আপেলও সে জলাঞ্জলি দিতে নারাজ। তিনটে আপেল সঙ্গে নিয়ে কি করে সে ঐ সেতু পার হতে পারে? তিনটে আপেলই সে সাথে নিয়ে যাবে, একেবারেই, অথচ সেতুটাও এক মন একত্রিশ সেরের এক ছটাক বেশী ভার বইতে অক্ষম। আপেলের ঝোঁক না ছেড়ে এবং সেতুটার ঝুঁকিও না বাড়িয়ে কি করে সে পেরুবে বলতে পারো?

(২) কোনো জঙ্গলের ভেতর কদ্দুর অব্দি যাওয়া যায়—তোমার ধারণায়?

(৩) 'তিবঙ্গতাপ্ররিশীনকোমময়সমীরে'। এই জবড়জং শব্দগুলি আসলে এক প্রসিদ্ধ কবির বিখ্যাত কোনো কবিতার একটি লাইন। এটি কম্পোজ্ করার সময়ে আমাদের কম্পোজিটরের ভাঁড়ারে একটি হরফের ঘাটতি পড়েছিলো—ফলে পদটির থেকে সেই অক্ষরটি বাদ পড়ে গেছে—একবার নয়, এই বি-পদ সাত সাত বার। সেই হারানো অক্ষরটি খুঁজে বার করে যথাযথ স্থানে বসিয়ে বিপন্ন কবিতার লাইনটিকে সম্পূর্ণ করতে পারো কি? পুরো লাইনটা কী দাঁড়াবে—তা'হলে?

(৪) 'এটি কথা কয়'—এই কথা কয়টিকে একটি কথায় বানানো যায়?

(৫) পাশের এই ছবিটির মধ্যে ছ'টি নামজাদা জানোয়ার আছে। খুঁজে পেতে বের করতে পারো তাদের?

আজব চিড়িয়াখানা

উত্তর

(১) তিনটে আপেল দু'হাতে নিয়ে লুফতে লুফতে যাবে সে। ফলে, একটা আপেল তার সব সময়েই আকাশে থাকবে।

(২) জঙ্গলের মধ্যে অর্ধেক অব্দি তুমি যেতে পারো। কেন না, তার পরেই তো তুমি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ছো!

(৩) 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।' —কবি জয়দেব বিরচিত গীত-গোবিন্দের একটি বিখ্যাত লাইন।

(৪) একটি কথায়।

(৫) বাইসন্, জিরাফ, উটপাখী, মেরু-ভল্লুক, পেঙ্গুইন্, বেঁজি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

গত বৈশাখ মাস থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে, আগামী ভাদ্র মাসে শেষ হবে। যে কোন লোক এই প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠিয়ে পুরস্কার পেতে পারেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ফটো গৃহীত হবে।

আষাঢ়—১৩৫৮

৩২শ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

কুমকুম্

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

❋

কোথায় বা শ্যামবাজার আর
কোথায় খিদিরপুর।
বাসের পরে বাস্ চোলেছে,
চোল্‌ছে অবিশ্রান্ত—
তিনেতে আর তেত্রিশে
প্রান্ত থেকে প্রান্ত!
গোপাল নগর রোডের মোড়ে
আমরা সবাই থাকি,
ছোটো ছোটো ঘরগুলি সব
গায়েতে মাখামাখি!

ভোরে উঠে হেঁটে হেঁটে
ইস্‌কুলেতে যায়,
নোতুন বই ও নোতুন জামা
নোতুন জুতো পায়।
টুকুস্‌ টুকুস্‌ কোরে হাঁটে
ব্যাগ্‌ নিয়ে কুম্‌কুম্‌,
ঘুম্‌ ভেঙেছে কাঁচা যে তাই
চোখ্‌ ছুটি ঘুম্‌ঘুম্‌।
অনেক দূরে ইস্‌কুল আর
অনেক দূরে বাড়ী,
ফেরার পথে পা চলে না,
ডাক্‌বে না কি গাড়ী?
আদর কোরে কোলে নিয়ে
গালেতে দেয় চুম্‌,
মা বলে তার কানে কানে
'লক্ষ্মীটি কুম্‌কুম্‌'।
অনেক সুখে আমার বুকে
ঘনিয়ে ওঠে ব্যথা,
মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া
ছেলে বেলার কথা।
যতোই বয়স হোক্‌না দেহে
ততোই শিশু মনে,
বুড়ো-শিশুর মনের কথা
কেউ তো নাহি শোনে।
আমার মতোন বড়ো হোলে
বুঝ্‌বে আমার কথা,
কিন্তু তখোন থাক্‌বে না কেউ
বুঝ্‌তে তোমার কথা।

কাশীর উত্তরদিকে ছিল প্রাচীন কোশল রাজ্য। এই কোশলে নলকপান গ্রামের পাশে নলপান সরোবর। সরোবরটার নিকটেই কেতকবন। বুদ্ধদেব তখন ছিলেন এই কেতকবনে। একদিন ভোরবেলা বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষুরা নলপান সরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করলেন। সরোবরের পাড়ে শরের জঙ্গল হয়েছিল। স্নান সেরে উঠে কয়েকটা শর হাতে হাতে তাঁরা ভেঙ্গে নিয়ে গেলেন। সে শরগুলোতে একটাও গাঁট ছিল না—ছিল একটা করে লম্বা বিঁধ। এমন নল তো দেখা যায় না! ভিক্ষুরা আশ্চর্য হয়ে প্রভু বুদ্ধকে এই অদ্ভুত নলের কথা জানালেন। বুদ্ধ শুনে তাঁর শিষ্যদের ঐ নলের পূর্ব বৃত্তান্তের গল্প বললেন।—

পুরাকালে নলকপান গ্রাম আর নলপান সরোবর ঘিরে চারদিকে গভীর অরণ্য ছিল। এ অরণ্যে আশি হাজার বানর বাস করত। অতীত জন্মে বুদ্ধের শিষ্যরাই ছিল এই আশি হাজার বানর। বুদ্ধ তখন নিজেও জন্মেছিলেন বানর হয়ে, আর তিনিই এই বানরদের দলপতি ছিলেন। বুদ্ধের আগের জন্মের নাম বোধিসত্ব। বানর বোধিসত্ত্বের গায়ের রং ছিল দেখতে ঘোর লাল। গাছের হাজার হাজার সবুজ পাতার মাঝখানে মাত্র একটা টকটকে জবা যেমন চোখের ওপর জল্‌জল্‌ করে, আবীরের মতো লালরঙের বানরটি তেমনি আশি হাজার বানরের ভিড়ের মধ্যে থেকেও জল্‌জল্‌ করত।

অন্য বানরেরা তাদের দলপতি বোধিসত্ত্বকে ভালবাসত, আর তাঁর সব কথাই মান্য করত ভালমন্দ বিচার না ক'রে। আশি হাজার বানর ঝাঁক বেঁধে অরণ্যে ঘুরে বেড়ালে দূর থেকে দেখাত কালো একটা মেঘের মতো। আর জলের ওপর পাতার ওপর দিয়ে মড়্‌মড়্‌ ক'রে আশি হাজার বানরের একসঙ্গে চলার শব্দ দূর থেকে শোনাত একটানা মেঘেরই

গর্জনের মতো। এই বানরের মেঘ সশব্দে এগিয়ে আসছে দেখলে, কাকপাখি থেকে বাঘ-ভালুক পর্যন্ত সব ভয়ে পথ ছেড়ে যে যেখানে পারত পালিয়ে যেত। তা সত্ত্বেও দলের সকলের জন্য দলপতি বোধিসত্ত্বের মনে ভাবনা আর উদ্বেগ থাকত সর্বক্ষণ।

একদিন গরমকাল, দুপুর বেলা, রোদে কাঠ ফেটে যাচ্ছে। গরম লু বইছে আগুনের হল্কার মতো। সকালবেলা বানরগুলো বেরিয়েছিল, এত গরমের মধ্যেও দুপুরে তারা ফিরে এল না। তাদের খুঁজতে বেরিয়ে বনে বনে ঘুরে বোধিসত্ত্ব নিজেই খুব ক্লান্ত আর তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু চারদিকে চেয়ে কোথাও জলের একটা অস্পষ্ট রেখাও তাঁর চোখে পড়ল না। তারপর অনেক খুঁজতে খুঁজতে এক নতুন জঙ্গলে দূরে একটা যেন সরোবর দেখা গেল। গাছের ওপর দিয়ে দিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে বোধিসত্ত্ব দেখলেন, সত্যাই একটা দিব্য সরোবর। সেই প্রকাণ্ড জলাশয়টার তীরে গিয়ে তিনি দেখলেন, জলের ধারে ধারে সেখানে সবগুলো বানরই সরোবরটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আধমরার মতো বসে আছে। বোধিসত্ত্বের আর বুঝতে বাকি রইল না বানরেরা কেন সকালবেলা বেরিয়ে আর ফিরে যেতে পারে নি।

বোধিসত্ত্ব বল্লেন,"তোমরা তৃষ্ণায় আধমরা হয়ে গেছ, কিন্তু জলপান করছ না কেন? তোমরা ফিরে না যাওয়ায় আমি কত কি বিপদের কথা ভাবছিলুম।"

বানররা বললে, "প্রভু, তুমি যে বারণ করেছ মনোহর হলেও কোন নতুন গাছের ফল খেতে, আর কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ হলেও কোন অজানা পুকুরের জল ছুঁতে।" একথা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, "আমি খুবই খুশি হলুম তোমাদের কথায়, কিন্তু আর একটু হলেই যে তোমরা এই কানায় কানায় জলভরা, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ সরোবরের তীরেই তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে।"

বোধিসত্ত্ব এই বলে সরোবরের চারদিক দিয়ে একবার ঘুরে এসে বললেন, "তোমরা ভাল করেছ এই সরোবরের জল না ছুঁয়ে।"

বানরদের সামনে অত জল, বুকে তাদের অত তৃষ্ণা—প্রভু অথচ জল স্পর্শ করতে অনুমতি দিলেন না। হতাশায় বানররা ঝিমিয়ে পড়ল। তারা এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল জলের দিকে। এখন তাদের চোখের পাতা ভারি হয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে বোধিসত্ত্বের মুখ ভাবনায় অন্ধকার হয়ে গেছে। তিনি গালে হাত দিয়ে ভাবছেন কি করে সকলের প্রাণ রক্ষা হবে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, সরোবরের পাড়ে জায়গায় জায়গায় নলবনের ঝাড়। এগুলো দেখে আশার আলোয় বোধিসত্ত্বের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

এমন সময়ে হঠাৎ সেই সরোবরে এক জলদেবতা উঠলেন, চার হাত, মাথায় মুকুট, গলায় পদ্মের মালা! বললেন, "বানররা, তোমরা এস, এ সরোবরের জল পান করো। অভাগারা জলের সামনে তৃষ্ণায় ছটফট করছ। তৃষ্ণায় প্রাণ যাচ্ছে, তবু নির্বোধেরা মনগড়া ভয়ে জল ছুঁতে পারছ না।" কথা বললে জলদেবতার দাঁতগুলো দেখালো যেন একছড়া মুক্তোর সাদা মালার মতো।

বানরেরা অবাক্ হয়ে সেই জলদেবতাকে দেখলে। তারা ভাবল, বোধিসত্ত্ব এবার এখুনি তাদের জল পান করবার অনুমতি দেবেন। এমন সুন্দর সরোবর কখনও খারাপ হয়। বানরগুলো জলের আশায় মনে মনে একেবারে নেচে উঠল। ওদিকে বোধিসত্ত্ব কিন্তু সেই জলদেবতাকে বললেন, "তুই ভণ্ড, কপট রাক্ষস। দেবতার ছদ্মবেশ ধরেছিস। তোর ছলনায় ভুলে অনেকে তোর পেটে প্রাণ দিয়েছে। জিভে তোর জল এলেও তুই আমাদের খাওয়ার আশা ছেড়েদে। সরোবরের কাদায় জীবজন্তুদের জলে নেমে যাওয়ার এই যে পায়ের দাগগুলো, তাদের উঠে আসার পায়ের দাগ গেল কোথায়, বলতে পারিস ?"

ধরা পড়ে গিয়ে জলদেবতার সুন্দর মূর্তিটা মুহূর্তে কদাকার এক প্রকাণ্ড জল রাক্ষসের মূর্তিতে বদলে গেল। মাথায় ঝাঁটার কাটির মতো চুল, বাঘের দাঁতের মতো দাঁত, চার পা, পায়ের নখগুলো বাজপাখির নখের মতো, গলায় হাড়ের মালা। তার পেটটা নীল, হাত আর পায়ের রঙ রক্তের মতো। রাক্ষসটার চেহারা দেখে বানররা ভয়ে তৃষ্ণা ভুলে গেল। তাদের দেহে কোথা থেকে আবার শক্তি ফিরে এল, সোজা হয়ে তারা উঠে বসল। বোধিসত্ত্ব সেখানে না থাকলে আশি হাজার বানর সেই বিরাট প্রকাণ্ড চারপেয়ে রাক্ষসটার সামনে থেকে ছুটে পালাত।

জলরাক্ষস বললে, "ছোট ছোট পাখি থেকে বড় বড় মোষ পর্যন্ত এ জলে যারা নামে, তারা আর উঠে যায় না। বানর আমার বড় প্রিয় খাদ্য। তোমাদেরও তো জলে না নেমে আর উপায় নেই। রাক্ষসের পেটে যাওয়ার চেয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরার কষ্ট যে অনেক বেশি।"

বোধিসত্ত্ব বললেন, "ক্ষুধার্ত রাক্ষসের পেটেও আমরা যাব না, অথচ আমরা জল পান করবই। তোর জলে আমরা নামব না, তবু আমরা সকলে তোরই জল পান ক'রে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করব।"

বোধিসত্ত্ব সরোবরতীরের শরবন থেকে একটা নল ভেঙ্গে নিলেন। তারপর বাঁশির মতো ধরে নলে ফুঁ দিয়ে বললেন, "আমি যদি জন্ম জন্ম পরের উপকারে জন্য জীবনধারণ করে থাকি, তাহলে এই নলের গাঁটগুলা মিলিয়ে গিয়ে আগাগোড়া একছিদ্র হোক।

একথা বলতে বলতেই সে-নলের গাঁটগুলো মিলিয়ে গেল, আর তার মধ্যেকার ছেঁদাটা আগাগোড়া একটানা হয়ে গেল।

তারপর বোধিসত্ব একটা একটা ক'রে অনেকগুলো নল নিয়ে সেগুলোর বিঁধ একটানা করে নিলেন। এমনিভাবে একটি একটি ক'রে আশিহাজার নল একছিদ্র করতে অনেক সময় লাগবে দেখে বোধিসত্ব সেই সরোবরটার চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরে বললেন, "এখানে যত নল আছে সব গাঁটশূন্য আর একছিদ্র হোক।" সঙ্গে সঙ্গে সরোবর তীরের সব নল গাঁটহীন আর একছিদ্র হয়ে গেল।

আশি হাজার বানর, এখন সকলের হাতে একটা ক'রে নল। তারা সরোবরটা ঘিরে বসে আছে। রাক্ষসটা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তা চেয়ে দেখলে। লোকে যেমন করে পদ্মনাল মুখে দিয়ে জল চুষে নেয়, বোধিসত্ব নলমুখে তেমনি ক'রে দূর থেকে সরোবরের জল চুষে নিয়ে পান করতে লাগলেন। এবার রাক্ষসটার চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। তারপর বোধিসত্বের দেখাদেখি বানররা পাড়ে বসে নলে ক'রে জলপান করতে আরম্ভ করলে।

প্রথমটা রাক্ষসটার ডানদিকে একসঙ্গে অনেকগুলো সর্-সর্, সর্-সর্ ক'রে শব্দ উঠল। রাক্ষসটা ডানদিকে ঘাড় ফেরাতে না ফেরাতে বাঁদিকে ঠিক একই রকম শব্দ হ'ল। তাড়াতাড়ি বাঁদিকে ফিরতেই পেছন দিকেও ঐ রকম শব্দ শোনা গেল। রাক্ষসটা তাড়াতাড়ি পেছনে চেয়েছে। তখন একসঙ্গে চারিদিক থেকে অসংখ্য সর্-সর্, সর্-সর্, সর্-সর্ করে বানরদের জলখাওয়ার শব্দ হচ্ছে। রাক্ষটার চোখ থেকে এখন আগেকার বিস্ময়ের ভাব কেটে গেছে। এমন মজা আর কখনও সে দেখে নি,—ঘুরে ঘুরে তাই সে চারিদিকে দেখেছে। এখন চোখে মুখে তার শুধু খুশি আর কৌতুক। পাড়ে বসে আশি হাজার বানর একসঙ্গে কেমন গড়গড়ার নলটানার মতো শব্দ ক'রে ক'রে জল টানছে! মানুষের মতো ডানহাত দিয়ে তারা নল ধরে রেখেছে মুখে। রাক্ষসটার মনে হতে লাগল, ল্যাজ নয়, কি আশ্চর্য, আর একটা ক'রে গড়গড়ার নল যেন পাকিয়ে পাকিয়ে পড়ে রয়েছে প্রত্যেকটা বানরের পিঠের সঙ্গে লাগানো।

যেসব বানরের আগে জল খাওয়া হয়ে গেল, তারা নলগুলো রাক্ষটার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে গাছের ডালে ডালে লাফালাফি আরম্ভ ক'রে দিলে। এতে জলরাক্ষসটা আবার চটে উঠল। চোখ লাল ক'রে দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় ক'রে জলরাক্ষস গালাগালি দিলে, "পাজি বাঁদর।" তারপর জল রাক্ষস জলে মিলিয়ে গেল।

এদিকে বোধিসত্বের কথা তো আর কখনো মিথ্যা হতে পারে না—নলপান সরোবরের পাড়ের শরগুলো চিরকালের মতো গাঁটশূন্য আর একছিদ্র হয়ে গেছে। যে সব নলের এখন গাঁট নেই আর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত বিঁধ, সেগুলো সবই নলপান সরোবর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে।

তারা কোথায় যায় ?

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

পশুপাখী নিয়ে আমরা বাস করি। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ছাড়াও বানর, বেঁজী, টিকটিকি, শিয়াল—এমন কি, সাপ বাঘ পর্যন্ত আমাদের প্রতিবেশী। তা'ছাড়া কত রকমের পাখী যে আমাদের ঘরে-বাইরে বাস করে তার অবধি নেই। কিন্তু এইসব জীব-জন্তু, পশু-পাখীকে মৃত অবস্থায় আমরা খুব কমই দেখতে পাই! এরা কোথায় যায়? এত বানর গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু মৃত বানর আমরা ক্বচিৎ দেখতে পাই কেন? এত কুকুর-বিড়াল কোথায় গিয়ে মরে? এত ঝাঁকে ঝাঁকে কাক বক চড়ুই শালিক কোথায় গিয়ে তাদের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে?

ভাববার কথা। বন্য জন্তু বনেই মরে, কাজেই মনুষ্য-আবাসে তাদের দেখবার কথা নয়; কিন্তু বনেও ত' মানুষ যায়, কৈ সেখানে শেয়াল-খরগোস কি বেঁজীর কটা মৃতদেহ দেখা যায়?

কুকুর-বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে কোনও দুর্গম এবং নির্জন জায়গা বেছে নেয়—তার কারণ কি?

কোন কিছুতে আড়ম্বর প্রকাশ, হৈ চৈ, আনন্দ-উৎসব জীবনী-শক্তির পরিচয়। সেইজন্য জীবন-প্রদীপ যখন নির্বাপিত হ'তে চায়,—পৃথিবীর আলো, বর্ণ-বৈচিত্র্য যখন নিষ্প্রভ হয়ে দেখা দেয়, কণ্ঠের বাণী যখন স্তব্ধ হ'য়ে আসে—তখন সেই মৃত্যু-পথ যাত্রীর, মর্তের এই কল কোলাহল আর ভাল লাগে না। অতি বড় শক্তিমানকেও সেদিন মৃত্যু-বেদিকার পাশে কাপুরুষ ও দুর্বলের মত হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয়!

হিন্দুশাস্ত্রে বোধহয় এইজন্যই বিধান দিয়েছে: পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ—অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের পর যখন তোমার যৌবনের উদ্দামতা আর থাকবে না, তোমার শক্তি আসবে কমে, তখন বনবাসই তোমার শ্রেয়ঃ। পশু-পাখীরাও এই জন্য অন্তিমকালে কোলাহল হীন দুর্গম স্থান বেছে নেয়, আর কেউ এসে যাতে তাদের বিরক্ত করতে না পারে।

সকল প্রাণীই মরবার আগে একটু শান্তি চায়। নির্জন পাহাড়ের উপর, নির্জন বনে, অথবা নির্জন কোনও জলাশয়ের কাছে দুর্গম জায়গায় এই জন্য কখনও কখনও মৃত পশু-পাখীর কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও প্রাণীতত্ত্ববিৎ ডাঃ হাক্সলি বলেছেন, পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো আগ্নেয় পাহাড়ের একেবারে মুখের কাছে একবার একটা চিতাবাঘের কঙ্কাল দেখা গিয়েছিল।

বন্য হরিণের, বানরের, বন্য মহিষের এবং পার্বত্য ছাগলের কঙ্কালও অনেক ভ্রমণকারীই নির্জন পাহাড়ের অনেক উচ্চে দেখতে পেয়েছেন। এমন জায়গায় এই সব মৃতের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া গিয়েছে, যেখানে জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় কোন প্রাণীই বিচরণ করে না!
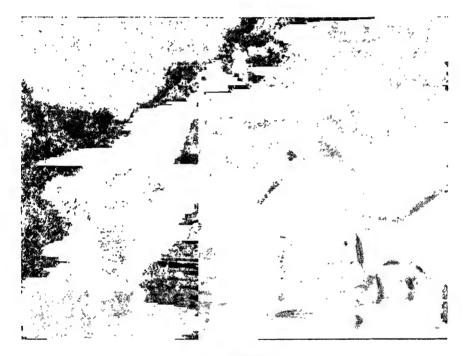
শেষের প্রতিক্ষায়

মালয়দেশে একবার একজন শিকারী একটি হাতকে মারাত্মকভাবে বন্দুকের গুলি করেছিল। হাতীটি গুরুতররূপে আহত হ'য়ে পালিয়ে যায়। শিকারী কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানত যে, হাতীটি নিশ্চয়ই কোথায়ও গিয়ে মরে পড়ে থাকবে। সে তার খোঁজ করতে লাগল। পাঁচ-ছ দিন পরে শিকারী দেখতে পেল, হাতীটি একটা নির্জন জলাশয়ের কাদার মধ্যে প'ড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করে আছে!

পঙ্গুইন পাখীর নাম শুনেছ তোমরা। এরা দলবেঁধে 'গঙ্গাযাত্রা' করে! অর্থাৎ কাক-বক-শকুনী প্রভৃতি পাখীরা যেমন মৃত্যুর আগে একা একা অতি সঙ্গোপনে নির্জন ও দুর্গম জায়গায়

গিয়ে মরে পড়ে থাকে, পেঙ্গুইন তা' করে না। এদের যারা যারা রোগাক্রান্ত ও দুর্বল,—যারা বুঝতে পারে শেষ দিনের আর দেরি নেই, তারা দল বেঁধে একসঙ্গে কোনও পাহাড়ের দুর্গম ও নির্জন জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়! এদের এই ব্যবস্থাটা ঠিক আমাদের বৃদ্ধদের শেষ অবস্থায় 'গঙ্গাযাত্রার' মত আর কি!

মৃত্যুর জন্য এরা প্রতীক্ষা করছে

একবার দক্ষিণ জর্জিয়ায় একদল পরিব্রাজক একটা পাহাড়ের হ্রদের চারদিকে অনেক দুর্বল ও বৃদ্ধ পেঙ্গুইনকে বসে থাকতে দেখতে পান। পরিব্রাজক দল ঐ হ্রদের কাছে গিয়ে দেখলেন, জলের মধ্যে শত শত মৃত পেঙ্গুইন পড়ে আছে! এই বরফে ঢাকা জায়গায় কতদিন থেকে পড়ে থাকলেও তাদের মৃতদেহের কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নি!

প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন, সমুদ্রের ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করতে পারবে না ব'লেই মৃত্যুর কিছু আগে বৃদ্ধ বা রুগ্ন পেঙ্গুইন দল কোনও উঁচু এবং নির্জন জায়গায় গিয়ে শেষ দিনের অপেক্ষায় বসে থাকে।

প্রশ্ন ও উত্তর

বছরে সব চেয়ে বড় দিন ও ছোট দিন কবে ?—২২শে জুন ও ২১শে ডিসেম্বর।

ডিমের কোন অংশ থেকে বাচ্চা হয় ?—শাদা অংশ।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে কোন মেরু বেশী ঠাণ্ডা ?—দক্ষিণ মেরু।

সব চেয়ে কি দ্রুত জিনিষ তুমি নিজে করতে পারো ?—চোখের পাতা ফেলা—ফেলতে মাত্র $\frac{1}{40}$ সেকেণ্ড লাগে।

পাখীর কি দাঁত আছে ?—না।

[কৌতুক-কাহিনী]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বড়লোকের বাড়ীর ছেলে খোকন।

মুখের কথা খসাতে-না-খসাতে চাওয়া-জিনিস পাওয়া যায়।

কি চাই খোকন? কাঠের ঘোড়া? তুলোর খরগোস?—সেলুলয়েডের পুতুল?

ঘাড় নাড়বার আগেই তিন চাকর তিন দিকে ছোটে জিনিস কিনে আন্‌তে!

বাড়ীর বউ-ঠাকুমার এমনি ঢালোয়া আদেশ দেওয়া আছে।

পরপর সাত ছেলে মরে শিবরাত্তিরের সল্‌তে এই খোকন। তাকে কখনো যেন চোখের জল ফেল্‌তে না হয়।

আবদার তার রাখ্‌তে হবে বৈকি! সুতরাং বাড়ীর ঝি-চাকরেরা সব সময় তটস্থ থাকে। কখন খোকন ভ্যঁা করে কেঁদে ওঠে, কখন তাদের জবাব হয়ে যায়। এ বাড়ীতে চাকরি পাওয়া যেমন ভাগ্যের কথা তেমনি পান থেকে চুন খস্‌লেই আবার চাকরি যায়। সুতরাং ঝি-চাকরের দল যে পলকে প্রলয় দেখবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

ক্রমে খোকন বড়ো হয়।

সবাই শুধোয়—কি চাই খোকন?

—চকোলেট? ডালমুট?

এরোপ্লেন? চাবি দেয়া রেলগাড়ী?

খোকন একবার হুঁ বল্লেই হয়।

অনেক সময় খোকন ঘাড় ফিরিয়ে থাকে, কারো কথারই জবাব দেবার ইচ্ছে যেন তার নেই। এমনও দেখা গেছে যে, খোকনের নাম করে ঝি-চাকরের ট্যাঁক ভারী হয়ে উঠেছে! অথচ সামান্য একটা কাগজের ঠোঙার শব্দ শুনে খোকন আনন্দে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হেসে ঝিয়ের কোলে গড়িয়ে পড়ছে! মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদে আর বাড়ীর সক্কলকার আন্তরিক আবেদনে খোকন আরো বড় হয়। এইবার পাত্‌তাড়ি নিয়ে তাকে পাঠশালায় যেতে হবে।

কিন্তু বট্‌ঠাকুমার বড় ভয়!

সাতটা নয়, আটটা নয়, শিবরাত্তিরের একমাত্র সল্‌তে, সে পাঠশালায় পড়তে গিয়ে যদি হাত মচ্‌কে কিম্বা ঠাং ভেঙে আসে! দরকার নেই বাপু! তার চাইতে থাক্ আমাদের খোকন বোকা মুখ্যু হয়ে, তবু মা ষষ্ঠীর দয়ায় মায়ের কোল জুড়ে বেঁচে থাক্।

আর এই বয়সে পড়বার এত কি ঠ্যাকা বাপু? খোকনকে ত' আর দশটা-পাঁচটা কেরানীগিরি করতে অফিসে ছুটতে হবে না! পায়ের ওপর পা রেখে যাতে বসে খেতে পারে তেমন ব্যবস্থা বাপ-জ্যাটা-খুড়োরা করে যাবে। কিচ্ছু ভাব্‌না নেই!

বট্‌ঠাকুমা আপন মনে বকেন আর মালা জপ করেন। তাঁর কথার বিরুদ্ধে কথা কয় গোটা বাড়ীতে এমন কেউ নেই!

খোকনের পাঠশালায় ভর্তি হওয়া বাড়ীর কর্ত্রী বট্‌ঠাকুমার জরুরী আদেশজারীতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং খোকন আগের মতোই সারা বাড়ী ছাড়া-ছাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো।

কখনো সে রান্নাঘরে গিয়ে উপদ্রব করে, কখনো বারান্দায়-রাখা পাতা বাহারের গাছগুলি আপন খুশী মতো ছিঁড়ে ফেলে, কখনো টেবিলের ওপরকার ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে বাজার সরকারের সঙ্গে রসিকতা করে—এইভাবে তার দিনগুলি হেলায় ফেলায় কেটে যায়।

খোকনের খবরদারী করবার জন্যে যে সব চাকর নিযুক্ত আছে তাদের প্রাণ নিয়ে একেবারে টানাটানি। ওরা মনে মনে আঁচ করে রেখেছিল যে, খোকনবাবু পাঠশালায় গেলে দিব্যি দুপুরবেলা লম্বা ঘুম লাগাবে; ওই সময়টায় ওদের আর কোনো কাজই থাক্‌বে না। কিন্তু বট্‌ঠাকুমার ব্যবস্থায় ওরা সবাই হাড়ে হাড়ে চটে গেল। শুধু তাই নয়, রাগ করে বট্‌ঠাকুমার গঙ্গাজল নদী থেকে বয়ে নিয়ে আস্‌বার মেহনত কমিয়ে গলির মোড় থেকে কলের জল ধরে তারই মধ্যে কাদা গোলা মিশিয়ে দিতে লাগল।

একদিন খোকনের কাকাবাবুর চোখে পড়ে যেতে তিনি সবগুলিকে দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। বট্‌ঠাকুমা সব কথা শুনে বল্লেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—কাশীধামে চল্লাম আমি।

তিনি বাড়ীর গোমস্তাকে সঙ্গে নিয়ে এক শুভদিন দেখে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার চরণে আশ্রয় নেবার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। ছেলেদের কোনো আপত্তিতেই কান দিলেন না।

এদিকে খোকনের দিকে দৃষ্টি দেবার তখন আর কেউ নেই! সারাদিন শুধু টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সে। একদিন বল্লে, আমি ছাগল পুষ্‌বো।

সঙ্গে সঙ্গে ছাগল কিনে নিয়ে আসা হ'ল। আর সেই সঙ্গে যত রাজ্যের কাঁঠালপাতা আর শাক-সব্জী। ছাগল কতক খায় আর কতক ছড়ায়...! সারা বাড়ী নোংরা করে তুল্লে একদিনেই।

খোকনের বাবা বল্লেন, ছাগলটাকে দূর করে তাড়িয়ে দাও, নইলে আমাদেরই সবাইকে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে। খোকন তখন কাকাদের কাছে আবদার ধরলে যে, সে ব্যাঙ্‌ পুষ্‌বে...তাকে গোটা কয়েক ব্যাঙ দিতে হবে। একমাত্র ভাইপোর আবদার, কাকারা কি আর চুপ করে বসে থাকৃতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে গেল এক সুন্দর চৌবাচ্চা। তার ভেতর থাকবে—সোনা রঙের ব্যাঙ। কাকারা অনেক খুঁজে পেতে হক্ সায়েবের বাজার থেকে ব্যাঙ কিনে নিয়ে এলো।

ব্যাঙ কি খায় এই কথা জান্‌বার জন্যে খোকন কাকিমাদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুল্লো। তাঁরা কোনো জন্মে ব্যাঙ পোষার কাহিনী শোনেন নি, তাই লাইব্রেরী থেকে কীট-পতঙ্গের বই আনিয়ে রাত জেগে ক্রমাগত পড়তে লাগ্‌লেন। খোকনের আবদার রাখতে হবে ত'!

এরই মধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটল যে, খোকনের পাঠশালায় ভর্তি না হবার সমস্ত যুক্তি গেল ভেসে। খোকনের বাবা একদিন বিকেলের দিকে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, চাকরদের ঘরের বারান্দার একটি কোণে বসে খোকন ওদের ফেলে দেয়া বিড়ির টুক্‌রোগুলো মহানন্দে ঠোঁটে লাগিয়ে টান্‌ছে এবং কাল্পনিক ধোঁয়া আকাশপথে উড়িয়ে দিয়ে মহা আত্মপ্রসাদ লাভ করছে!

ব্যাপারটা দেখেই তাঁর সমস্ত রক্ত একেবারে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে উঠ্‌ল এবং তিনি খোকনের মায়ের কাছে জানিয়ে দিলেন যে, পরের দিন তিনি নিজে গিয়ে ওকে একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আস্‌বেন।

শুনে খোকনের মা-ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল যে, বাড়ীসুদ্ধু সকলের অতি বেশী আদরে ওর পরকালটা একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে।

ইস্কুলে ভর্তি হয়ে কিন্তু খোকনের বেশ ভালোই লাগ্‌লো। এতগুলো ছেলেকে সে এক সঙ্গে কখনো দেখেনি। তাদের বাড়ীতে ত' ছোটছেলের মধ্যে সেই সবে-ধন-নীলমণি! কাজেই আনন্দে আটখানা হবার কারণ আছে বৈকি!

কিন্তু মুস্কিল বাধলো মাষ্টারমশাই যখন পড়াগুলো জিজ্ঞেস করেন। পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে কোন্ ছোট্ট দেশের রাজধানীর নাম কাটমুণ্ডু সে কথা তার জেনে কি ভাগ্যি বাড়বে এবং না বল্‌তে পারলেই বা সে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াবে কেন এ প্রশ্নের মীমাংসা সে কিছুতেই করতে পারেনি।

কিন্তু টিফিনের ঘণ্টায় যখন একদল ছেলের সঙ্গে হুল্লোড় করবার সুযোগ পায় এবং কোনো বাধানিষেধের বেড়া ওর পথ আট্‌কে দাঁড়ায় না, তখন খোকনের মনে হয় ইস্কুলের চাইতে ভালো জায়গা গোটা পৃথিবীতে আর দুটি নেই!

ওদিকে বাড়ীতে খোকনের খাওয়ার বাছ-বিচার কেবল বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। কোন্‌টা খেলে কখন ওর ভাল লাগ্‌বে, সেই কথা ভেবে কাকা-কাকিমার দল হিমসিম! হক্ সায়েবের বাজারের ডালমুট্, কফি হাউসের 'কাজু বাদাম,' পরাণ ঘোষের 'গজা', মুখরোচকের 'দৈ', যদু ময়রার 'রসগোল্লা', সুইট হোমের 'আবার খাবো' সন্দেশ সব থরে-থরে সাজানো থাকে কাকিমাদের 'মিট-সেফে'। যখন যেটি মনে হবে মুখের কথা খসাতে-না-খসাতে মুখের সাম্‌নে এনে ওরা হাজির করেন। কিন্তু খোকন কোনটা একটুখানি মুখে দিয়ে, কোনটা আধখানা খেয়ে, কোনটার শুধু গন্ধ শুঁকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাড়ীর চাকর-চাকরাণীদের তখন পোয়াবারো।

পূজোর ছুটির ঠিক আগেই ইস্কুলের শিক্ষকরা ঠিক করেছেন নিচু ক্লাসের ছেলেদের গ্রাম দেখিয়ে নিয়ে আস্‌বেন। এজন্যে শহরতলীর কোনো একটি গ্রাম তারা বাছাই করে নিয়েছেন। গ্রামের লোকে কিভাবে কুটীর তৈরী করে বাস করে, কিভাবে তারা ক্ষেতে চাষ করে, পুকুরে মাছ ধরে, ঘরামীরা কেমন ভাবে মাটির ঘর তৈরী করে, কুমোর কেমন হাতের কৌশলে নানারকম খেল্‌না আর হাঁড়ি-কুঁড়ি-কুঁজো বানায়, ছুঁতোর কিভাবে র‍্যাঁদা চালায়, গ্রামের হাটবাজার কিভাবে বসে—সব কিছু হাতে-কলমে ছোটদের দেখিয়ে আন্‌বেন এই তাঁদের ইচ্ছে।

খোকনও সেই দলে জুটে গেল। প্রথমে বাসে করে গেল তারা গ্রামের মধ্যে। সারাদিন ধরে শিক্ষকদের সঙ্গে গোটা গ্রামটা ওরা ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। যা দেখে তাতেই ওরা অবাক হয়ে যায়! খোকনের ত' চোখ দুটো সব সময়ই বড় বড় হয়ে আছে।

শহরের বাইরে যে এত বিস্ময় জমা হয়ে ছিল সেকথা ও স্বপ্নেও ধারণা করতে পারে নি।

যা দেখে তাতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিতে থাকে।

ঘুরে ঘুরে সমস্তটা দিনের পর ওরা যখন গ্রামের এক প্রান্তে মাঠের ধারে একটা বট গাছের তলায় গিয়ে হাজির হ'ল—অতি কাছেই নদীর হাওয়া ওদের সকলকার দেহমন একেবারে স্নিগ্ধ করে দিলে। ভাব্‌লে, এখান থেকে আর যদি ফিরে যেতে না হয় ত' সারাজীবন এই গাছের তলাতেই সবাই কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু খোকনের হঠাৎ মনে হ'ল—পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে কি যেন জ্বল্‌ছে।

হুঁ! এরই নাম হচ্ছে খিদে। এদ্দিন বাড়ীতে না চাইতেই খাবার পেয়ে খিদে বস্তুটি যে কি, সেকথা খোকন ভালো করে বুঝে উঠ্‌তে পারে নি। আজ সেটা বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে! কবে, কখন কোথায় কি খাবার সে না খেয়ে ফেলে দিয়েছে তারই তালিকা সে মনে মনে তৈরী করতে লাগ্‌লো।

হঠাৎ সঙ্গের এক মাষ্টার মশাই হাঁক দিয়ে বল্লেন, আজ আমি তোমাদের আলুকাব্‌লী খাওয়াবো। এতদিন তোমরা বাজারের বিচ্ছিরি আলুকাব্‌লী আর নোংরা তেঁতুল গোলা জল খেয়ে এসেছ; আজ আমি নিজে তোমাদের খাওয়াবো সেই আলুকাব্‌লী। সব সার দিয়ে গাছের তলায় বসে যাও।

সবাইকার সঙ্গে খোকনও সার দিয়ে বসে গেল। মাষ্টারমশাই ঝুড়ি থেকে আলুসেদ্ধ বের করে চাক্‌া চাক্‌া করে কাটলেন, নুন আর লঙ্কার গুড়ো মেশালেন, কাব্‌লি মটর সেদ্ধ দিলেন, আর সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন টোমাটো আর শশার কুঁচি।

শালপাতার ঠোঙায় সবাই খেতে লাগ্‌লো। খোকনের ভাগ যখন হাতে এলো তখন তার কেবলি মনে হতে লাগলো এমন মুখরোচক খাবার সে জীবনে কখনো খায়নি!

বাড়ী ফিরে গিয়ে এক একটা লাফে তিনটি করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সে যখন তার কাকিমাদের কাছে আলুকাব্‌লী খাওয়ার কথা বললে, তখন তাঁরা হাঁ হয়ে সবাই ওর মজাদার গল্প গিল্‌তে লাগ্‌লেন। খোকন হো-হো করে হেসে উঠে বল্লে, তোমাদের জিব দিয়ে লালা গড়াচ্ছে বুঝি? কিন্তু একটি টুক্‌রোও তার আর পাচ্ছনা—সব আমরা ফুরিয়ে ফেলেছি!

খোকনের চোখে-মুখে তখন গর্বের হাসি উথ্‌লে উঠেছে!

বেনেপুকুরের খুড়ো

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাটলিওলার ছিল 'ক্যাসিয়ার' বেনেপুকুরের খুড়ো,
টাকার হিসেব রেখে রেখে টাক, বয়সে নয়কো বুড়ো।
ছুটি ছিলো মেলা পাওনা।
খুড়ি বলে, "কেন, নাওনা ?
এবার যদি না কাশী নিয়ে যাও, আমি চলে যাবো গুঁড়ো।"
তাইতেই খুড়ো ছুটি চেয়েছিল বাড়ী থেকে খেয়ে হুড়ো।

ম্যানেজার বলে, "খুব ভাল কথা, কিসে যাবে তুমি রেলে ?
'কলিসন্' হ'লে জানোতো কি হয়, কিম্বা উল্‌টে গেলে ?"
খুড়ো বলে, "ঠিক তাইতো,
হামেসা কাগজে পাইতো ;
অকালে প্রাণটা হারাতে চাই না, টাকাকড়ি বাড়ী ফেলে।"
ম্যানেজার বলে, "বিমানেতে যাও, যেওনাকো খুড়ো রেলে।"

হেড্‌ক্লার্ক বলে, "একটা কি জানো, বিমানে তো খুড়ো যাবে ;
খুবই আরাম, কিন্তু যখন আকাশেতে লাট্ খাবে ?
কে আর তাকে বা রুখ্‌বে।
পাহাড়েতে মাথা ঠুক্‌বে ;
জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে মরু বা সাগরে গোঁৎ খেয়ে প'ড়ে যাবে।
এরোপ্লেনে নয়, ষ্টীমারেই যাও, নির্ভয়ে যেতে পাবে।"

ফিস্‌ফিস্ ক'রে 'টাইপিষ্ট' তাকে কানে কানে গিয়ে বলে—
"ষ্টীমার মানেটা বুঝেছো তো খুড়ো, জলেতে সাঁত্‌রে চলে।
যদি বয়লার ফাটে,
ভিড়বে কি আর ঘাটে!
খাবি খেতে খেতে ভুস্ ক'রে ডুবে যাবে গঙ্গার জলে!
গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ধ'রে মোটারেতে তুমি নিরাপদে যাও চ'লে।"

"অমন কাজটি ক'রো না, ও খুড়ো," বল্‌লে 'ডেস্‌প্যাচার'—
"য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয় যদি পথে বেঁচে ফিরবে কি আর?
গুছিয়ে গরুর গাড়ী,
দুইজনে দাও পাড়ি,
গুটি গুটি ক'রে ঠিক চ'লে যাবে, কিছুতেই নেই মার।
কোনো 'কলিসন্' 'য়্যাকসিডেণ্ট' বা ইতিহাস নেই তার।"

হাবুডুবু খেয়ে চিন্তায় শেষে 'ধুৎত্তোর' বলে খুড়ো—
"কী যে বল্‌ছিস্, তোদের কথার নাই কিছু মাথা-মুড়ো।
আমি যাবো বেনারাস।
তোরা বুঝি তাই চাস্?
পয়সা ওড়াবো, অত বোকা নই, হ'তে পারি আধ্‌বুড়ো।
পাওনা ছুটিটা কাটিয়ে আস্‌বো শ্বশুরবাড়ীতে, শুঁড়ো।"

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নিজের ঘরে নিত্যানন্দ সেন বসে বসে লিখছিলেন। নতুন বইখানার মালমশলা সব তৈরী। সমস্ত বইখানা এবার আগাগোড়া ঘষামাজা করবেন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর জানালা দিয়ে নিত্যানন্দ সেন একবার বাইরে চেয়ে দেখলেন। পশ্চিম দিকের আকাশটা লাল হয়ে এসেছে। রক্তের মত লাল। সাত বছর আগে আকাশের আরো অনেকখানি অংশ দেখা যেত। এখন গলির ওদিকটায় কয়েকটা বড় বড় বাড়ি হয়েছে। তখন ওখানে মাঠ ছিল। বিকেলবেলা ওই মাঠে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলতো রাতুল। আর জানালা দিয়ে দেখতেন তিনি। খোকা ছিল একাই একশ। সমস্ত খেলোয়াড়দের হারিয়ে দিয়ে জয়মাল্যটা ছিল খোকারই বরাবরের প্রাপ্য। যেখানেই তিনি যান মনটা তাঁর পড়ে থাকতো খোকার দিকে। কোথায় কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে। কার মাথা ফাটিয়ে দেয়। কার কী ক্ষতি করে—গুণগার দিতে তো হবে তাঁকেই। আর তাছাড়া খোকারই বা কী দোষ। প্রায় সারাদিন তিনি থাকতেন কলেজে। খোকাকে দেখাশোনা করবার ভার গোবিন্দর ওপর। গোবিন্দকেই বা খোকা মানবে কেন! কী খেলো, কী না খেলো, কী পড়লো, ঘুমোল কি না, সারাদিন শুধু হয় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দুপুর রদ্দুরে খেলা করে বেড়াল—সমস্ত খুঁটিনাটির খবর নিতেন কলেজ থেকে ফিরে।

—গোবিন্দ ও গোবিন্দ—

বাড়ীর একেবারে শেষ মহলে হয়ত গোবিন্দ তখন উনুনে আগুন দিচ্ছে। বাড়ীময় ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে। বাবুর গলার আওয়াজ শুনেই দৌড়ে এসেছে।

হাতে একগাদা মোটা মোটা বই। কাঁধে সিল্কের চাদর। হাত থেকে বইগুলো নিলে গোবিন্দ। গলার চাদরটাও প্রফেসার দিলেন গোবিন্দকে।

—খোকাকে দেখছিনে যে—খেলতে গেছে বুঝি—

—না, খেলে তো অনেকক্ষণ ফিরেছে—ওপরে পড়ার ঘরে দেখেছিলাম—

প্রফেসার আগে আগে, গোবিন্দ পেছন পেছন। সিঁড়ির ওপরেই ডানদিকে ফিরে একটা মস্ত বড় হলঘর। প্রায় দু'খানা ঘরের সমান। যখন রাতুলের মা বেঁচে ছিলেন, তখন ওই ঘরে খোকাকে নিয়ে তিনি থাকতেন। বাবা থাকতেন পাশের ছোট ঘরটিতে তাঁর নিজের লেখাপড়া, বই খাতা নিয়ে। তখন কচিৎ নিজের ঘর থেকে বাইরে বেরুতেন। মাকে আর মনে পড়বার কথা নয়। এত ছোট বয়েসে মারা গেলেন তিনি। প্রফেসারের এখনও মনে আছে সেইদিনটার কথা। অল্প অল্প শীতের রাত; ডাক্তার রাত তিনটের সময় মুখ ঘুরিয়ে নিলে। দার্শনিক প্রফেসার বাইরের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেছিলেন—শেষ রাত্রের ঘোলাটে আকাশ থেকে একটা বড় তারা দপ্ দপ্ করে জলতে জলতে খ'সে পড়ে গেল। ছাদের আর গাছপালার ঢেউ-এর ওপর সে-তারাটা এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা পাওয়া গেল না। আর খোকা তখন ওই বড় ঘরখানার পশ্চিমে আর একটা খাটে শুয়ে স্বপ্নের ঘোরে হাসছে। প্রফেসার সেই দুর্যোগের মধ্যেই রাতুলকে একবার দেখতে গেলেন। দু'বছরের শিশুর মুখে চোখে কোনও বিকার নেই। নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে শুয়ে শুয়ে খোকা ঘুমুচ্ছে—আর ঘুমের মধ্যেই যেন ছেড়ে-আসা-স্বর্গের স্বপ্ন দেখে হাসছে। খোকার জন্মের পর থেকেই ওর জীবনের সুরুতে যে দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছিল তার পরিণতি যে এমন করুণভাবে হবে তা' দার্শনিক প্রফেসারের বোঝা উচিত ছিল। একবার জিগ্যেস করেছিলেন—খোকা, তোমার জন্যে যে বড় কষ্ট হয় আমার—

অন্ধকার ঘরে গোল একটা টেবিলের সামনে বসে অনেকবার প্রফেসার এই প্রশ্ন করেছিলেন—খোকা তোমাকে না দেখে যে আমার বড় কষ্ট হয় —

—আমারও কষ্ট হয় বাবা, খোকার উত্তর স্পষ্ট লেখা পড়েছিল কাগজের ওপর।

—তবে তোমার আসতে এত দেরি হয় কেন। আজকাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যে তুমি আসো।...আমার জন্যে কি সত্যিই তোমার মন কেমন করে ?

অন্ধকার রাত্রের দ্বিপ্রহরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেনের একটি খিল-বন্ধ ঘরের ভেতরে বসে রাতের পর রাত এমনি প্রশ্নোত্তর চলে।

—তোমার আসতে কষ্ট হয় কি খোকা ?

—আজ খুব ভালো লাগছে —

—ওখানে গিয়ে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?

—মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে—

—যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বোমার আঘাত লেগে পড়ে গিয়েছিলে, তোমার খুব যন্ত্রণা হয়েছিল, না খোকা—আহা তুমি কতই না কষ্ট পেয়েছিলে!

—এখানে এসে আর তো কোনও কষ্ট নেই বাবা, বড় শান্তি এখানে—

খোকা শান্তিতে আছে জেনে বড় স্বস্তি পান নিত্যানন্দ সেন। এই রকম দিনের পর দিন পিতা-পুত্রের কথা চলতে থাকে। আর নতুন বইটাতে তারই বিবরণ দেন বিশদ করে। এমনি করে স্যার অলিভার লজের ছেলে রেমণ্ড একদিন মারা যায়, আর স্যার অলিভার তাকে নিয়ে বই লেখেন—"The Survival of Man"। রাতুলকে নিয়েও নিত্যানন্দ সেন অনেকগুলো বই লিখেছেন। ছেলের মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বাস্তব জগৎ থেকে একরকম বিদায় নিয়েছেন বলা চলে। কিন্তু তবু সমাজ সংসার একেবারে ত্যাগ করতে পারেন না। বক্তৃতা শুনতে চায় লোকেরা। হাজার হাজার লোকের সামনে তাঁকে তাঁর নতুন তত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে হয়—বলতে হয় রেডিওতে। খবরের কাগজের লোকেরা এসে তাঁর ফোটো নিয়ে যায়। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিলেন নির্জন গৃহকোণে আত্মচিন্তা নিয়ে দিন কাটাবেন—কিন্তু উল্টো হয়েছে ফল। কত দূর দূর থেকে আসে নিমন্ত্রণ। কত সুদূর থেকে আসে চিঠিপত্র। কত অজানা-অচেনা লোকের অনুরোধ-উপরোধ। পৃথিবীর কত লোক তাঁরই মত আত্মীয়-বিয়োগ-বিধুর—তাঁর কাছ থেকে শুনতে চায় তাদের পরমাত্মীয়দের কথা। মৃত্যুর পর তারা কেমন আছে। তারা আমাদের কথা ভাবে কিনা। পৃথিবীর সব কথা মনে পড়ে কিনা। সান্ত্বনা চায় তাঁর কাছে। তাঁর বই কেনে। পড়ে। আর চিঠিপত্রে কৃতজ্ঞতা জানায় তাঁকে। আমরা কতটুকু জানি, কতটুকু বুঝি, কতটুকু দেখি। আমাদের জানা, বোঝা আর দেখার বাইরে যে-অনন্ত অপার রহস্যময় জগৎ অন্ধকারে ঢাকা রয়েছে, তা'কে দেখতে, জানতে, বুঝতে হবে। একদিন প্রাচীন ঋষিরা কেনোপনিষদে লিখে গেছেন—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম বিজানতাম ॥"

কতদিন কতছলে নিত্যানন্দ সেন রাতুলকে এই উপদেশ দিয়েছেন। সত্যকে জানবার চেষ্টা করতে হবে। সত্য আচরণ করতে হবে। পৃথিবীর আর সব মায়া—সব ছলনা। কেবল সত্যই শ্রেয়। সৎ-চিৎ-আনন্দ। সেই সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করো। তোমার ঐকান্তিকতা দিয়ে—সাধনা দিয়ে—যোগ দিয়ে। রাতুলের মৃত্যুর পর নিত্যানন্দ সেনের একটা পরম লাভ হয়েছে। তিনি সেই পরম পুরুষের সন্ধান পেয়েছেন। রাতুলের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সেই সচ্চিদানন্দ তাঁর অন্তর্লোকে যেন উদ্ভাসিত হতে চলেছে।

এক একদিন কোনও সভায় বক্তৃতা দিতে দিতে তাঁর মনে হয় সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে, এই শহর, জনতা, এই পার্থিব আবেষ্টনী ছেড়ে তিনি বুঝি অনেক উর্ধ্বে অন্য এক লোকে চলে গেছেন। কখন তারা হাততালি দেয়, ফুলের মালা গলায় দেয়, পায়ের ধুলো নেয়, অটোগ্রাফ নেয়, গাড়ী করে বাড়ী পৌছে দেয় কিছুই টের পান না। রাতুল তাঁকে তাঁর দর্শন-জগতের আর এক স্তরে নিয়ে গেছে। ওরা নানা উপাধি দিয়েছে। সম্মান আর যশ আসছে অযাচিত ভাবে পৃথিবীর সমস্ত দিক থেকে। নিমন্ত্রণ আসে কত দূর-দূর দেশে যাবার। এই কটা বছরে কত দেশে গিয়ে কত লোক দেখে এলেন। ছেপে বেরুবার পর রাতারাতি তাঁর বই বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। চলে যায়—জাপানে, সিঙ্গাপুরে, চীনে, কোরিয়ায়, মেক্সিকো আর পেরুতে। কত অসংখ্য ভাষায় তার অনুবাদ। অর্থের আর যশের প্রাচুর্যে জীবন তাঁর সৌভাগ্য-মণ্ডিত।

অন্ধকার রাত্রে চক্রের মাঝে প্রশ্ন করেন প্রফেসর—

—খোকা, তোমার আবর্তমানে আমি যে অচল হয়ে পড়েছি—আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল—

—না বাবা, তোমার যে অনেক কাজ রয়েছে এখনও, এখন তোমার সময় হয়নি —

—কী নিয়ে বাঁচবো—

—তোমার অনেক কাজ যে বাবা, যে সাধনা তুমি সুরু করেছ তার যে শেষ করতে হবে। পৃথিবীর মানুষ নাস্তিক হয়ে উঠেছে—জড়বাদী হয়ে উঠেছে তাদের ভুল তুমি শুধরে দেবে—

নিত্যানন্দ সেন ভাবেন খোকা এত কথা শিখলো কোথায়। হয়ত মৃত্যুর ওপারে আত্মার জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যার প্রসার ঘটে। কত অদ্ভুত এই পৃথিবী আর সৃষ্টির রহস্য। আলমারী থেকে মোটা একখানা বই টেনে নিয়ে পড়েন। ওখানা মেটারলিঙ্কের লেখা। আর একখানা বার করেন। কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। যদিই স্বীকার করা যায় যে সমস্তর পেছনে মন ও বুদ্ধি আছে, তবে যার দেহ নেই তারও কি মন ও বুদ্ধি থাকতে হবে। কিন্তু তার তো কোনও প্রমাণ কোথাও নেই। প্রফেসার হঠাৎ হতাশ হয়ে পড়লেন। আমাদের এই রক্ত-মাংসের শরীর যাদের—আমাদেরই অস্তিত্ব যে আছে তারই কি কোনও প্রমাণ আছে? মায়াবাদীদের মতে এই জীবনটা স্বপ্ন ছাড়া তো আর কিছু নয়। তাই বুঝি স্যার অলিভার লজ বলেছেন আমাদের এই বেঁচে থাকা যদি সত্যি হয়, তা'হলে মৃত্যুর পরপারে আমাদের ছায়া-শরীরের অস্তিত্বও সত্যি।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নিত্যানন্দ সেন এমনি ভেবে ভেবে শেষকালে এক

অপরূপলোকে গিয়ে শান্তি পান। সেখানে কেবল তিনি আর তাঁর মৃতপুত্র রাতুল। তিনি রাতুলকে যেন চোখের সামনে দেখতে পান। তার সঙ্গে কথা বলেন। রাতুলের উষ্ণ নিঃশ্বাস তিনি যেন নিজের শরীরে অনুভব করেন—এত ঘনিষ্ঠ, এত নিবিড় হয়ে রাতুল তাঁর কাছে থাকে।

সকালবেলা অল্প অল্প বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারপর দুপুরবেলা রোদ উঠেছিল। জানালার পাশে বসে বই পড়তে পড়তে নিত্যানন্দ সেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যে সাতটায় শহরের একটা বড় 'হলে' তাঁর বক্তৃতার কথা আছে আজ। সেই সব কথাই এতক্ষণ ভাবছিলেন।

হঠাৎ গোবিন্দ ঘরে ঢুকলো—বাবু—বাবু—

চমকে উঠলেন নিত্যানন্দ। অতদিনের চাকর। এ-বাড়ীতে খোকার জন্মের আগে থেকে আছে। আজ কিন্তু তার চেহারা দেখে যেন চিনতে পারা গেল না।

গোবিন্দ হাঁফাচ্ছিল। যেন কোন কথা তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরুবে না।

শুধু বললে—বাবু, আমাদের খোকাবাবু—

খোকাবাবু! কোন্ খোকাবাবু! কাদের খোকাবাবু!

—খোকাবাবুকে দেখলুম—আমাদের খোকাবাবু!—গোবিন্দর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। গোবিন্দর পৃথিবীতে কে আর আছে! খোকাকে কি ও-ও কম ভালবাসতো! খোকা চলে যাবার পর কতদিন কেঁদেছে ও! ছোট বেলা থেকে একরকম ওই তো মানুষ করেছে!

গোবিন্দ আবার বললে—আমাদের খোকাকে দেখলুম—কালীঘাটে—

নিত্যানন্দ সেন প্রথমে তেমন গা করেন নি। গোবিন্দটা বরাবরই একটা সাদাসিধে ধরনের মানুষ। খানিকটা বোকাসোকা। কী বলতে কী বলে ফেলে।

গোবিন্দ বললে—বাবু, খোকাবাবু আমার কথা মোটেই শুনলে না—কিছুতেই বাড়ী এল না—এত ডাকলুম, এত সাধলুম, পায়ে ধরলুম পর্যন্ত—

—কী বাজে কথা বলছিস্ গোবিন্দ। নিত্যানন্দ বিরক্ত হলেন।

—কিন্তু বাবু, আমার যে দেখে পর্যন্ত মনটা কেমন করছে—ও আমাদের খোকাবাবু না হয়ে যায় না। মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে পায়ের পাতাটা পর্যন্ত যে চিনি আমি, কোলে-পিঠে করে আমি খোকাকে মানুষ করেছি আর আমার ভুল হবে—

নিত্যানন্দ সেন এতক্ষণে ভালো করে মুখ তুললেন।

—কাকে দেখেছিস্ তুই?—রাতুলকে?—কোথায়?

—আজ্ঞে, কালীঘাটে!

—কালীঘাটে কেন গেলি তুই হঠাৎ, কালীঘাটে তোর কীসের দরকার পড়লো—যত সব জোচ্চোর বদমাইস লোকের আড্ডা ওখানে, বোকা মানুষ পেয়ে দেবে কোনদিন ঠকিয়ে!—

—কিন্তু খোকাবাবুকে যে নিজের কোলে মানুষ করেছি বাবু—তাকে চিনতে ভুল হবে আমার ?

নিত্যানন্দ সেন আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

—যা, যা—মাথা খারাপ হয়েছে তোর বুড়ো বয়সে—তোর সঙ্গে বাজে কথা বলবার সময় নেই আমার—কী দেখতে কী দেখেছিস, কী শুনতে কী শুনেছিস, তোর চোখ খারাপ হয়েছে গোবিন্দ, একটা চশমা কিনে দিতে হবে তোকে—

গোবিন্দ বসে পড়লো হঠাৎ মেঝের ওপর। নিত্যানন্দর পায়ের কাছে। তার চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করছে। বললে—বাবু আপনি একবার চলুন আজ্ঞে, ও আমাদের খোকাবাবু না হয়ে যায় না—

—যাকে-তাকে অমন খোকাবাবু বলে ভুল করিসনে গোবিন্দ,—এই নিয়ে কতবার হলো বলতো তোর—

—এবার আর ভুল নয় বাবু, গেরুয়া পরলে কী হবে আমি ঠিক চিনেছি, ও আর কেউ নয়, আপনি নিজে একবার চলুন বাবু, আপনি গেলে খোকাবাবু না করতে পারবে না। আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বললে না বাবু—

—তোর মত পাগলের সঙ্গে কেউ কথা বলে ?

—না বাবু, গেরুয়া পরে একেবারে পুরোপুরি সাধু সেজেছে আজ্ঞে। চুপচাপ কালীঘাটের মন্দিরের সামনে বড় চাতালটায় চোখ বুজে বসে আছে—কারুর সঙ্গে কথা নেই। সামনে দিয়ে যেতেই দেখে থমকে দাঁড়ালুম—খোকাবাবু না ? বলতেই চোখ দু'টো খুললো, তারপর আমাকে এক পলক দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজলো, কিন্তু আমি ছাড়বো কেন—পায়ের কাছে বসে পড়লুম—আবার ডাকলুম, খোকাবাবু! তখন আবার চোখ চাইলে। এবার আর সন্দেহ রইল না বাবু—হাত দুটো চেপে ধরলাম—আর কি ছাড়ি ? তখন আমার ব্যাপার দেখে বেশ চারদিকে লোক জমে গেছে। আমি বললাম, এ আমাদের খোকাবাবু। খোকাবাবু হঠাৎ আমার হাতটা এক ঝট্‌কায় ছাড়িয়ে নিয়ে এমন কট্‌মট্ করে চাইলে আমার দিকে, যে কি বলবো বাবু! তখন আমি বললুম, খোকাবাবু, কেন তুমি কাঁদাচ্ছ!…শুনে খোকাবাবু মুখ ঘুরিয়ে নিলে—আর আমার দিকে একবারও চাইলে না। আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো…আমি হাউ হাউ করে সেইখানে বসেই কেঁদে ফেললুম—

—তারপর ?

—তারপর এই সেখান থেকে দৌড়ে আসছি। আপনি একবার চলুন বাবু।

নিত্যানন্দ সেন বললেন—তোর মাথা খারাপ হয়েছে গোবিন্দ, মাথা খারাপ হয়েছে। যা বললি আর কখনও বলিসনে কাউকে, পাগল ভাববে—

মনে মনে হাসলেন নিত্যানন্দ সেন। তা'হলে রোজ তাঁর এই মৃত আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা, এই বক্তৃতা, পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাতদের অভিনন্দন, তারপর তাঁর এই বই লেখা, এই খ্যাতি, এই উপাধিগুলো, তাঁর বিদ্যে বুদ্ধি—সবার ওপর স্যার অলিভার লজ্, কোনান ডয়েল ওরা সবাই মিথ্যাবাদী! তাঁর অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই কিছু নয়। পাগল আর কাকে বলে!—অশিক্ষিত পাগল একটা গোবিন্দ!

আবার নিজের কাজ করতেই ব্যস্ত ছিলেন নিত্যানন্দ সেন।

বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠলো। ক্ষিতীনবাবু এসেছেন।

—ওপরে নিয়ে এসো। নিত্যানন্দ সেন বললেন।

ক্ষিতীনবাবুও প্রফেসার। লজিকের। তিনি হঠাৎ এ-সময় কেন এলেন?

—কি মনে করে ভাই?

—তোমার রাতুলকে দেখলাম—ক্ষিতীনবাবুও যেন অবাক হয়েছেন। ক্ষিতীনবাবুর মুখে-চোখে এক অস্বাভাবিক উদ্বেগ আতঙ্কের চিহ্ন। তিনি যেন দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসেছেন এতখানি রাস্তা—সারা শরীর তাঁর অসহায়-রোমাঞ্চে কাঁপছে।

নিত্যনন্দ সেন জিগ্যেস করলেন—কাকে দেখলে? রাতুলকে?

—হ্যাঁ, কালীঘাটের মন্দিরে, গেরুয়া-পরা চেহারা দেখেই চিনলাম—মন্দিরের দিকে রোজ সন্ধ্যেবেলা যাই জানো তো। হঠাৎ রাতুলের চেহারাটা দেখে চোখ দু'টোকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না—এ কেমন করে হলো, নিজের মনকেই জিগ্যেস করলাম—

—বলো কি—সত্যি?

নিত্যানন্দ সেনের মুখখানা যেন হঠাৎ কালো হয়ে উঠলো। (ক্রমশঃ)

যন্ত্রযোগে কুশ্রীকে সুশ্রী করা

চ্যাপটা কান, বোঁচা খাঁদা নাক প্রভৃতি দেহের গঠনে যে নানা বিকৃতি—এ বিকৃতি খোদার ইচ্ছায় বলে আমরা চুপচাপ থাকি,—কিন্তু মার্কিনরা খোদার উপর খোদকারি করেছেন। সাস্থের সর্ববৈকল্য সর্বকুগঠন তাঁরা নানা যন্ত্র সাহায্যে সুন্দর শোভন করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন, তবে এই বিকৃতি-মোচনে ব্যয় আছে বেশ—ব্যয়ের পরিমাণ একশো থেকে তিনশো পাউণ্ড।

ছাড়াছাড়ি

শ্রীপরেশকান্ত গাঙ্গুলী

কেহ ছাড়া কেহ নয়, সমাজের বন্ধন.
কোল ছাড়া হ'লে পরে শিশু লয় ক্রন্দন।
গরুগুলি ছাড়া পেয়ে ছুটে গেল গোহালে—
শিশুরা বিছানা ছাড়ে রাত্রিটি পোহালে ;
বেলা যেই ছেড়ে এল, ছেড়ে গেল বর্ষা ;
হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল, মনে হ'ল ভরসা।
ধীরে ধীরে সূতো ছাড়ে ঘুঁড়ি ওঠে উঁচুতে ;
ছাড়া ছাড়া কাজ তার পারে না'ক গুছুতে।
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, পেট ছাড়ে ভোজনে
দামেতে ছেড়েছে বটে, কেটে নেবে ওজনে।
ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা, কি বিষম ফন্দী
রোজা এলে ভূত ছাড়ে, এঁকে দেয় গণ্ডী।
বাজে কথা ছেড়ে দাও—মন দাও কার্যে
ট্যাক ছাড়—কাজ পাবে—দিনকাল তার যে !—
ছেড়ে কথা কইবোনা ডরিনিকো মাত্র
ভিন্ দেশে যেতে হ'লে চাই ছাড়পত্র।
লক্ষ্মীছাড়ার পানে ফিরে কেউ চান্না—
ছু'চোখের জল ছেড়ে—ডাক ছেড়ে কান্না।
পথ ছাড়, যেতে দাও—প'ড়ে আছে রাস্তা
ছাড়াছাড়ি কেন হ'ল বুঝেছ কি আজ তা ?

সোনার মৌচাক

বাণীকুমার

পুরাকালে অবন্তী নদীর কূলে এক অপূর্ব নগরী ছিল—উজ্জয়িনী। শ্রীসৌন্দর্য আর বিদ্যার জন্যে এই নগরীর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই উজ্জয়নীর রাজা ছিলেন বিক্রমাদিত্য। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল সোনা-মণি-মাণিক্য দিয়ে সাজানো···দিনে-রাতে ঝক্‌ঝক্‌ করতো। তাঁর সৈন্য-সামন্ত, দাস-দাসী, অনুচরের সীমা-সংখ্যা ছিল না। বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁর কাছে সকলে হার মান্‌তো। দয়ায় ধর্মে তাঁর দেশ থেকে অভাব-অভিযোগ দূরে পালিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ-বিক্রমে তাঁর তলোয়ারকে অন্য রাজারা নমস্কার কর্‌তেন। প্রজা-পালনে তাঁর দৃষ্টি গরীবের কুঁড়েতে পর্যন্ত গিয়ে পৌছতো। নীতি-জ্ঞানে তাঁর আদর্শ মেনে নিতো সকলে। কবির-গাথায়, ভাটের গানে আর লোকের মুখে মুখে তিনি নিত্য জেগে থাক্‌তেন যশের মুকুট প'রে। দেশে দেশে তাঁর এমনি নাম র'টে গিয়েছিল যে: জ্ঞানী-ধনী রাজা-প্রজা তাঁর উপদেশ পাবার আশাতে রাজসভায় এসে ভিড় কর্‌তেন—নানা দিক্‌ থেকে। এ সমস্ত ছাড়—তাঁর একটি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের ভাষাসুদ্ধ তিনি বুঝ্‌তে পারতেন।

একদিন গ্রীষ্মের বৈকাল···মহারাজ বিক্রমাদিত্য ব'সে আছেন এক গিরিমল্লিকা-তলায় তাঁর প্রমোদ-বনে, দুই পাশে দুই যবন-সুন্দরী চন্দন-পাখায় তাঁকে হাওয়া কর্‌ছে। এই সময়ে হঠাৎ একটা মৌমাছি মধুর খোঁজে গুণ্‌গুণ্‌ কর্‌তে কর্‌তে সেখানে উড়ে এলো। মেয়ে দু'টি মৌমাছিটিকে তাড়িয়ে দেবার আগেই—সে রাজার নাকের ডগায় ঝপ ক'রে বসেই কুট্‌ ক'রে হুল্‌ ফুটিয়ে দিয়ে উড়ে গেল। দাসীরা রাজ-কোপের ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মহারাজের পায়ের নীচে গিয়ে পড়্‌লো। রাজা যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। বাগানের সমস্ত পশু-পক্ষী আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লো। পাত্র-মিত্র সকলে ছুটে এলো। সকলেই তটস্থ। পাত্র-মিত্র, দাস-দাসী, সভাসদ, রক্ষী, অশ্বপাল, দ্বারপাল, এমনকি যে কিশোরীটি রোজ সকালে তাঁর সিংহাসন পরিষ্কার করতো—সেই অবন্তীসুন্দরীকে অবধি রাজা হুকুম দিলেন: "আমাকে যে দুষ্টু মৌমাছিটা হুল্‌ ফোটাতে সাহস করেছে—তাকে এখুনি খুঁজে ধ'রে আনা চাই।" হুলস্থুল কাণ্ড! সকলে দিকে দিকে, বনে বনে, গাছে গাছে, ফুলে-ফলে তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ কর্‌লে, কিন্তু ছোট মৌমাছিটি যে কোথায় উড়ে পালিয়ে গেছে—তা'র আর কোনো সন্ধান মিল্‌লো না। তখন মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঘোষণা ক'রে দিলেন: "রাজ্যের সমস্ত মৌমাছি তিন দণ্ডের মধ্যে রাজবাড়ীতে এসে

পৌঁছে যাক্—তা'হলে যে আমার নাকে হুল্ ফুটিয়েছে—সেই দোষীকে আমি ধর্‌তে পারি, নইলে দেশে যত মৌচাক আছে সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেওয়া হবে।"

এই খবর না শুনে মৌমাছির দল মধু-খাওয়া ভুলে গিয়ে পিন্‌পিন্ ক'রে কাঁদ্‌তে লেগে গেল। 'মৌমাছি-কুল ধ্বংস হবে'—এই ভাবনায় যখন সকলে আকুল, তখন মৌমাছি-রাণীর কাছ থেকে দূতের মুখে ডাক এলো যে: রাজ্যের মৌমাছিরা যেন মহানিম-বনে এসে একটু পরেই জড়ো হয়। যে যেখানে ছিল—মৌমাছির দল পোঁ পোঁ রব তুলে ছুট্‌লো মহানিম-বনে।...সকলে জুটতে মৌমাছি-রাণী ফুন্‌ফুন্ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—"মৌমাছিদের ভেতর কে এমন অপোগণ্ড আছে—যে ফুল ভুলে রাজার নাকে গিয়ে বস্‌তে ভরসা করে? শুধু তাই নয়—মধু পায় নি ব'লে দুষ্টুমি ক'রে রাজার নাক কাম্‌ড়ে দিয়ে পালিয়ে আসে—কে সে?"

কেউ উত্তর দিলে না। রাণী তখন খুব রেগে গিয়ে বল্‌লে, "যে দোষ করেচে—তা'কে ধরা দিতে হবেই। একের দোষে সমস্ত মৌমাছি তো মর্‌তে পারে না! চলো রাজবাড়ীতে, নইলে নিস্তার নেই।"

সঙ্গে সঙ্গ সারা আকাশ-বাতাস লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উড়ন্ত পাখনার ভোঁ ভোঁ শব্দে ভ'রে গেল, কেন না সমস্ত মৌমাছি তখন প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি উড়ে চলেছে রাজবাড়ীর দিকে।

রাজসভার সাম্‌নে মস্তবড় চত্বর...সেখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সভাসদ্‌দের নিয়ে বসেছেন সিংহাসনে। কিছুক্ষণ পরে সকলে আকাশে চেয়ে দেখ্‌লে—যেন কালো মেঘের দল ভেসে আস্‌ছে। দূর থেকে আস্‌তে লাগ্‌লো একটানা আওয়াজ—ভন্ ভন্ ভন্ ভন্। ক্রমশঃ সেই শব্দ ভীষণ হ'য়ে কাছে এগিয়ে এলো—সকলের কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম। মাটিতে পড়্‌লো বিরাট্ একটা ছায়া। সকলে আশ্চর্য হ'য়ে গেল যে—মৌমাছিরাও রাজার হুকুম অমান্য কর্‌তে সাহস করে নি। পালে পালে এসেছে মৌমাছি...তা'রা তর্কাতর্কি কর্‌তে কর্‌তে এতো উঁচু আওয়াজ তুল্‌ছিল যে—বাড়ীগুলো পর্যন্ত কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো—যেন ভূমিকম্প হয়েছে।

রাজা তাঁর রাজদণ্ড মাটিতে ঠুকে এক অদ্ভুত গলা ক'রে মৌমাছিদের থাম্‌তে আজ্ঞা দিলেন। তখুনি সব নিস্তব্ধ...গাছের পাতা পড়্‌লে শোনা যায়। সকলে তো অবাক্! পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গও এক কথায় মহারাজের হুকুম মেনে নেয়! কিন্তু রাজা নানা দিক দেশ ঘুরে অনেক বিদ্যা শিখেছিলেন। তিনি যে সমস্ত জীব-জন্তুর আওয়াজ ধ'রে তাদের ভাষা বুঝ্‌তে পার্‌তেন, আর তাদের বোঝাবার মত ভাষা বলতে পারতেন; এই গোপন বিদ্যার কথা কাউকে তিনি কোনদিন জান্‌তে দেন নি। তাই সকলের মনে হোলো মৌমাছিদের এ-রকম দাবে রাখা—মহা আশ্চর্য কাণ্ড।

মৌমাছিরা তখন একেবারে চুপ ক'রে গেছে···কেবল দলের সব চেয়ে ছোট মৌমাছিটির হিক্-হিক্ ক'রে হিক্কা উঠ্‌ছিল, কেননা তা'র মা রাজবাড়ীতে আস্‌বার আগে তাড়াহুড়ো ক'রে তা'কে অনেকখানি মৌ-খাইয়ে দেয়।

রাজা এবার কথা কইলেন—যেন বাজ হেঁকে উঠ্‌লো: "তোদের ভেতর কার এতোবড় আস্পর্ধা যে আমার নাকে হুল্ ফুটিয়ে দিস! যে-মৌমাছিটি এই দোষ করেছে—সে এখুনি বেরিয়ে এসে আমার কাছে দোষ স্বীকার করুক্!"

রাজার বাজ-খাঁই গলায় মৌমাছির দল এতো ভয় পেয়ে গেল যে—তাদের সরু সরু দু'টো ঠ্যাঙে একবার ঠোকাঠুকি লাগে আর পাখাগুলো ওঠা-পড়া করে। তা'রা নিজেরা বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো: "ভন্-ভন্···এ-কি দুষ্টুমি! যে দোষী—তা'কে নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়া উচিত।"···

রাজা হুঙ্কার ক'রে উঠ্‌লেন: "চুপ কর্!"

যেমনি এই শোনা—অমনি সমস্ত মৌমাছি চম্‌কে গিয়ে হাওয়ায় থুড়িলাফ খেয়ে পিছন দিকে উল্‌টে-পাল্‌টে পড়্‌লো, কেউ কেউ ডিগবাজি খেয়ে মাথা ঘুরে আরো পিছুতে হ'টে গেল।

কি হয়—কি হয়···মৌমাছিকুল বুঝি শেষ হয়···একি উড়ো আপদ! একটা দোষীর জন্যে সকলের কি দুর্ভোগ!

তখন সকলের চেয়ে ছোট মৌমাচিটি গুটি-গুটি এগিয়ে এলো, নিজের ভুলের জন্যে লজ্জায় মরমে ম'রে গিয়ে আস্তে আস্তে রাজার সুগন্ধ উড়নিতে বসে টেনে টেনে নিঃশ্বেস ফেল্‌তে লাগ্‌লো—যেন কাঁদো-কাঁদো ভাব। ছোট মৌমাছিটি পিন্‌পিন্ ক'রে টানা-নিঃশ্বেসের সঙ্গে বল্‌লে: "মহারাজ, আমিই···(ফুঁ ফুঁ) আপনাকে কাম্‌ড়েচি।"

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কাছে আস্‌তে সাহস করে একটা পোকার মতো খুদে মৌমাছি! এ যেন কানে শুনেও তাঁর বিশ্বাস হোলো না। তিনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন: "তুই! হ্যাঁরে পুচ্‌কে মৌমাছি—তুই? যদি সত্যি হয়—এমন কাজ তুই করলি কেন?"

ছোট মৌমাছিটা পিঁ পিঁ ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছ'টা পা-দুম্‌ড়ে রাজার পায়ের তলায় গিয়ে পড়্‌লো। মিন্ মিন্ ক'রে বল্‌লে: "ও মহারাজ, আমায় মাপ করুন। আর কখনো এ-ভুল কর্‌বো না। এর আগে আমি কোনোদিন মধু খুঁজতে বার হইনি। আমি একেবারে ছোট্টটি, আমার বুদ্ধি মোঠেই পাকেনি, তাই তো এই বিষম ভুল ক'রে ফেলেচি। মা আমাকে মধু আন্‌তে পাঠাবার সময় বলেছিল, পদ্মমধু খুব মিষ্টি, লালপদ্মের মধু আরো ভালো। আমি এম্‌নি বোকা যে—লালপদ্ম মনে ক'রে মধুর লোভে আপনার নাকে বসেছিলুম। আমায় যদি এবারের মতন ছেড়ে দেন—মহারাজ, আমি কথা দিচ্ছি আপনার এ উপকার

আমি কখনো ভুলবো না। আপনি এতো বড় যে আমার মতো ছোটকে মারলেও মারতে পারেন, রাখলেও রাখতে পারেন। আপনার দয়ায় যদি আমার প্রাণ বাঁচে—তা'হলে আপনারো উপকার ক'রে এর শোধ দোবো।"

রাজা তো ছোট মৌমাছিটির কথায় হো হো ক'রে হেসে উঠলেন…তাঁর মতো মহারাজাধিরাজের উপকার করতে চায় একটা সামান্য পতঙ্গ! সভাসদরা হেসে গড়িয়ে পড়লো, যে যেখানে ছিল—তাদের হাসি আর থামে না। এ কথা রাজার যত মনে পড়ে—ততই তাঁর কাছে আজগবী ব'লে বোধ হয়, আর ততই তিনি হাসেন। এমনি হাসতে হাসতে তাঁর সমস্ত রাগ প'ড়ে গেল। শেষকালে ছোট মৌমাছিটিকে তিনি ক্ষমা ক'রে ছেড়ে দিলেন। মৌমাছিটি খুব খুশী-মনে আবার তার মৌচাক-ঘরে উড়ে গেল। মৌমাছিরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। গুণ্ গুণ্ রাবে রাজার গুণ গাইতে গাইতে যে যার ঘরে ফিরলো!…

এই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্য ছাড়িয়ে পাহাড়-নদনদী পেরিয়ে এক রাজ্য ছিল—নাম ভোজদেশ। এই দেশের রাজা ছিলেন ভোজরাজ। রাজা ভোজের এক কন্যা ছিলেন পরম রূপবতী ভানুমতী। তিনি যেমন সকল গুণে গুণী ছিলেন, কন্যাকেও তেমনি মনের মতো গুণবতী ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ভানুমতীর বড় বিদ্যার অভিমান ছিল। তাঁর যোগ্য বর পৃথিবীতে কেউ নেই এই ছিল তাঁর ধারণা। এদিকে মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে—ভোজরাজের মহাচিন্তা! দিকে দিকে দূত যায় আসে, ভালো ভালো পাত্রের খবর মিলতে থাকে, তবু ভানুমতীর মন কিছুতেই সুইতে চায় না। এই সমস্ত দেখে-শুনে রাজকন্যা পণ ক'রে বসলেন যে, বিদ্যায় জ্ঞানে আর বুদ্ধিতে যিনি তাঁর চেয়ে সেরা, তাঁর গলাতেই তিনি মালা দেবেন। শেষে রাজা ভোজ মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে এক স্বয়ংবর-সভা ডাকলেন। দেশে দেশে রাজাদের কাছে গেল নিমন্ত্রণ। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তো আগেই ডাক পেলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ংবরে নিজে না গিয়ে তাঁর এক সেয়ানা মন্ত্রীকে পাঠালেন।

কিছুদিন পরে উজ্জয়িনীতে মন্ত্রী ফিরে এলেন। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। মন্ত্রী ভানুমতীর রূপ-গুণের খুব সুখ্যাতি ক'রে পরে বললেন: "মহারাজ, ভোজ-রাজকুমারীর বিদ্যা আর জ্ঞানের কাছে সমস্ত রাজা হার মেনে হেঁটমাথায় ফিরে গেছেন! শুধু তাই নয় রাজকন্যা সকলের চোখে ভোজবিদ্যা বা ইন্দ্রজালের ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে তাঁদের বোকা বানিয়ে বিদায় করেছেন। আর দম্ভ ক'রে বলেছেন যে—সব রাজারি বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় তো পাওয়া গেল, এখন বাকি আছেন কেবল মহারাজ বিক্রমাদিত্য। তিনি জ্ঞানীগুণী—এ রকম তো শোনা যায়…তিনি কত বড় জ্ঞানী—তাই দেখতে সাধ হয়।"

এই কথায় বিক্রমাদিত্যের ভুরু কুঁচ্‌কে উঠলো। তিনি রক্ষীসেনাদের সাজ্‌তে হুকুম দিলেন, আর মন্ত্রী-সভাসদ্‌দের ডেকে বল্‌লেন: "রূপে-গুণে যে-ভোজরাজকন্যার তুলনা নেই—তাঁকে আমি দেখতে চাই, আর দেখ্‌তে চাই—এই পণ্ডিতমানিনী ভানুমতী সত্যিই জ্ঞান বুদ্ধি ধরেন কিনা!"

তিনি দল-বল নিয়ে ভোজদেশের রাজধানী ধারানগরীতে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর আদরের কোনো ত্রুটী হোলো না। রাজকন্যা ভানুমতী এই সংবাদ পেয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের চোখে ধাঁধা লাগাবার জন্যে তিনশো পঁয়ষট্টি রকম সাজপোষাকের ব্যবস্থা ক'রে রাখ্‌লেন। আর মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন হাজার সখীর হাতে নানা উপহার, অদ্ভুত অদ্ভুত দামী জিনিস—একটি আস্ত প্রবালে তৈরী মুক্তো ও হীরে বসানো পানপাত্র, আর অনেক দুর্লভ রত্ন। মহারাজ সমস্তই হাসিমুখে নিয়ে রাজকন্যা ভানুমতীর জন্যে প্রধান সখীর হাতে একটি ফল দিয়ে বল্‌লেন: "ভোজরাজকুমারী আমাকে যত মণি-রত্ন আর উপহার দিয়েছেন—তা'র বদলে এই অতি-সাধারণ ফলটি আমি উপহার দিলুম। কিন্তু এর দাম তাঁর দেওয়া সমস্ত জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী। দেখি এর গুণ তিনি বোঝেন কিনা!"

প্রধান সখী হেসে বল্‌লেন: "মহারাজ, দোষ নেবেন না; আপনি নিজহাতে দিচ্ছেন ব'লে হয়তো এই ফলের অনেক গুণ। রাজকুমারী মহারাজের এই অমূল্য উপহার অবশ্য মাথায় পেতে নেবেন।"

অন্য সখীরা মুখ টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লো। মহারাজের অনুচরেরা গেল চ'টে···মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে কৌতুক! কিন্তু মহারাজ সখীর কথায় বরং খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন। তিনি সহজভাবেই বল্‌লেন, "আমার এই সামান্য উপহারই রাজকুমারীর কাছে পৌছে দিয়ো, আর বোলো—এই ফলটি তিনি খেতে ইচ্ছে করেন ত' খেতে পারেন, বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করেন ত' দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দু'জনের সাক্ষাতে এইটুকু প্রমাণ কর্‌তে হ'বে যে—কোন্ দিক্ থেকে এই ফলের দাম এই সব দামী মণিরত্ন-উপহারের চেয়ে অনেক গুণে বেশী। এটা বিদ্যার কথা, তোমরা বুঝ্‌বে না।

সখীরা ফিরে গিয়ে রাজকুমারীর হাতে রাজার দেওয়া ফলটি তুলে দিলে। রাজকুমারী চেষ্টা ক'রেও এর রহস্য ধর্‌তে পার্‌লেন না, শেষকালে ভাব্‌লেন: নিশ্চয় মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁকে ঠকাবার জন্যে কথার প্যাঁচে ফেলেছেন। রাজকুমারীও ঠকবার পাত্রী নন্, তিনিও প্যাঁচের ওপর প্যাঁচ কস্‌বার ফন্দি আঁট্‌তে মন দিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিশ্চিন্ত মনে ব'সে আছেন সুগন্ধ ধূপের ধোঁয়ায় ভরপূর মনোরম

ঘরে। এমন সময়ে তাঁর কাছে রাজকন্যা ভানুমতীর এক দূতী এসে একটি পত্র দিলে। তা'তে লেখা আছে :

"পরাক্রমে মিত্র যাঁর নাম,
ডাকে তাঁরে মিত্র যার মতি,
তিনে এক মিলা যেই ধাম—
আসুন সেখানে প্রজাপতি।"...

রাজা চিঠিটি পড়ে দূতীকে বল্লেন: "আচ্ছা, তুমি যাও। প্রজাপতি রাজকুমারীর ইচ্ছা-পূরণ করবেন ঠিক সময়ে।"

ভানুমতীর এই চিঠির হেঁয়ালি বুঝ্তে তাঁর মোটেই দেরি হয় নি। তাঁর এক মন্ত্রীর হাতে চিঠিটি দিয়ে তিনি এর অর্থ জিগ্যেস করলেন। মন্ত্রী কিছুক্ষণ মাথা ঘামিয়ে নানারকম অর্থ করতে লাগ্লেন—যে সব অর্থের কোনো মানেই হয় না। তখন রাজা নিজেই এর রহস্য উদ্ঘাটন করলেন। একটু হেসে বল্লেন: "এটি হ'চ্ছে নিমন্ত্রণ-পত্র। পরাক্রমে অর্থাৎ বিক্রমে, মিত্র মানে বিক্রমাদিত্য, আর মিত্র যার মতি—মানে সূর্য বা ভানু যার মতি অর্থাৎ ভানুমতী; তিনে অর্থাৎ জল, এক অর্থাৎ স্থল—এর মানে জলস্থল-পুরী, আর এখানে প্রজাপতি মানে রাজা। এই চিঠি লিখে রাজকন্যা আমাকে ঠকাতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি ঠিক সময়েই হাজির হবো।"

এরপর বিক্রমাদিত্য ও ভানুমতীর সাক্ষাতের সময় এলো। জলস্থলী নামে এক পুরীতে ভানুমতী অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন। এই পুরীটি আশ্চর্য-পুরী। একটা মস্ত বড় চত্বর পার হ'য়ে তবে রাজকুমারীর কাছে পৌঁছুতে পারা যায়। চত্বরটি জলে-স্থলে মিলিয়ে এমনভাবে তৈরী যে কোথায় জল কোথায় স্থল বোঝবার উপায় নেই। সমস্ত চত্বরটি দেখ্লে মনে হয়—স্ফটিক পাথরের তৈরী। চত্বরের মাঝে মাঝে রয়েছে জলকুণ্ড—ভাস্ছে পদ্ম, আর পাশাপাশি স্ফটিকের ওপর এমন সমস্ত প্রবালের পদ্ম-তোলা আছে যে—সেই সমস্ত জায়গাকেও জল ব'লে ভুল হবে। তাছাড়া চত্বরের এধারে-ওধারে টানা স্ফটিকের পাঁচিল, এই পাঁচিলেই ঢোকবার দরজা। কিন্তু এমনভাবে সাজানো যে কোন্খানে কপাট আর কোথায়-বা শক্ত দেওয়াল, বোঝে কার সাধ্য! মহারাজ বিক্রমাদিত্য গুপ্ত দূতী পাঠিয়ে এ-সমস্ত খবর আগে থেকেই জান্তে পারেন। এই দূতী লুকিয়ে এসে ঢোকবার কপাটের মাথায় মাথায় গজমোতি কৌশল ক'রে এঁটে দিয়ে যায়। মহারাজ সেই চিহ্ন দেখে মাঝখানের দোর ঠেলে চত্বরে ঢুক্লেন। তারপর—কেমন ক'রে চত্বরটি সোজা পার হ'য়ে যাবেন, সেটি তিনি ভেবেই রেখেছিলেন। তাঁর গলায় ছিল শতনরী মুক্তোর হার, হঠাৎ যেন ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়্লো চত্বরের ওপরে। কতকগুলো

মুক্তো গড়িয়ে গড়িয়ে জলকুণ্ডে টুপ্‌টুপ্‌ ক'রে প'ড়ে যেতে লাগ্‌লো, কতক বা স্ফটিকের মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো। রাজা সেই মুক্তোগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে যেতে চত্বরের শেষে এসে পৌঁছে গেলেন। ভানুমতী তখন আশ্চর্য হ'য়ে তাঁকে সম্মান ক'রে ডেকে এনে বসালেন এক রত্ন-আসনে।

ভানুমতীর রূপের ছটায় সমস্ত বাড়ীটি ঝল্‌মল্‌ করছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। এমন সময়ে ভানুমতী রাজাকে বল্‌লেন, "মহারাজ, আমার পণের কথা আপনি নিশ্চই শুনেছেন। যিনি আমায় হারিয়ে এই পণ জিত্‌তে পার্‌বেন—সেই বিজয়ীকে আমি স্বামী ব'লে বরণ কর্‌বো।"

রাজা প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। ভানুমতী কঠিন প্রশ্ন আরম্ভ কর্‌লেন: কত উদ্ভট শ্লোকের মানে, কত ধাঁধা, কত সমস্যার কথা। রাজা একে একে সব উত্তর দিয়ে গেলেন। তখন ভানুমতী জিগ্যেস কর্‌লেন:

"শরৎকালের মেঘ—হঠাৎ আসে হঠাৎ চ'লে যায়,
কি আছে যা' এ-সংসারে—অমনি সে মিলায়?"

রাজা সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লেন:

"ধন-সম্পদ্‌ আসে বটে মেঘের মতো উড়ে,
শরৎ-মেঘের মতই আবার যায় সে চ'লে দূরে।"

ভানুমতী। মানুষ কাহার দাস?

বিক্রমাদিত্য। অর্থের সে দাস যে বারোমাস।

ভানুমতী। অর্থ কাহার দাস?

বিক্রমাদিত্য। কাহারো নয়, অর্থ বাঁধে ফাঁস।

ভানুমতী। 'দাও-দাও' রব তোলে শুধু কাহারা?

বিক্রমাদিত্য। অতিথি বালক রাজা আর নিজ দারা;
আছে কিংবা নাই—এরা না করে বিচার,
'দেহি-দেহি' বুলি শুধু হাঁকে বারবার।

ভানুমতী। স্বরূপ কি সব দেবতার?

বিক্রমাদিত্য'। অতিথি সে—ভুল নাহি তা'র।

ভানুমতী। কবিতা আর সুন্দরী স্ত্রী কোন্‌খ'নে হয় আপনার?

বিক্রমাদিত্য। আপন মনে আসে যবে, জোর করিলে পাওয়া ভার।

ভানুমতী। কোন দুই দেবতা শ্বশুরবাড়ী রন্ ?

বিক্রমাদিত্য। মহাদেব শিব আর দেব নারায়ণ।

ভানুমতী। কেমনে তা' হয় ?

বিক্রমাদিত্য। পার্বতীর পিতা হিমালয়,—
সেথায় কৈলাসে বাস করেন শঙ্কর।
লক্ষ্মীর সাগরে জন্ম হয়,
বিষ্ণু যে থাকেন সেই সমুদ্র-উপর।

ভানুমতী রাজা বিক্রমাদিত্যকে কোনোমতেই ঠকাতে না পেরে এবার তাঁর সেরা বিদ্যা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে বস্‌লেন। হঠাৎ যেন সেখানকার আকাশ-বাতাস বদ্‌লে গেল। রাজাকে তখন ভানুমতী সাম্‌নে চেয়ে দেখ্‌তে বল্‌লেন। রাজা দেখেন: একটা বড় বালির নদী—সেই বালু-নদীতে তর-তর ক'রে বেয়ে চলেছে পাথরের নৌকো। ঘাট-মাঝি সেজে তাতে বসে আছে এক দৈত্য। সেই দৈত্য তার নৌকোয় যাদের তুলে নিচ্চে—তাদের নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে কি যেন জিগ্যেস করে—কেউ কোনো কথা বল্‌তে পারে না, দৈত্য অমনি তাদের নদীতে ডুবিয়ে মারে, আর যার যা' আছে লুঠ ক'রে নেয়।

ভানুমতী ব'লে উঠ্‌লেন: "ঐ দেখে কি বুঝ্‌ছেন—মহারাজ ?"

বিক্রমাদিত্য বল্‌লেন: "ভোজবাজি।"

ভানুমতী আবার বল্‌লেন: "এর অর্থ কি ?"

বিক্রমাদিত্য বল্‌লেন: "বালু-নদী হচ্ছে এই সংসার-মরুভূমি, পাথরের নৌকো হচ্ছে মানুষের কঠিন জীবন, মাঝিটা হচ্ছে আশার ছলনা, আর যাত্রীগুলো হচ্ছে ভুলের বোঝা।"

ভানুমতী রাজার মুখের দিকে একবার চেয়ে ফের জিগ্যেস কর্‌লেন: ঐ যে মাঝিটাকে দেখ্‌বেন, ও যাত্রীদের শুধোচ্ছে—ওর চেয়ে পাপিষ্ঠ কে ? কেউই উত্তর দিতে পারে নি ব'লে মর্‌ছে। আপনি বল্‌তে পারেন ?"

বিক্রমাদিত্য অল্প একটু হেসে বল্‌লেন: "পারি বৈকি, রাজকন্যা!—যে আশা দিয়ে তা' পূরণ করে না, কেউ যদি দান করে—তাকে যে বাধা দেয়, আর যে নিজে দিয়ে আবার কেড়ে নেয় এদের সকলেই ঐ দৈত্যটার চেয়ে পাপিষ্ঠ।"

ভানুমতী আর কথা না ক'য়ে শূন্যে লতার দোলায় দুলিয়ে দিলেন তাঁর সখীদের, গাছের ডালে ডালে শূন্য খাঁচা ঝুল্‌তে লাগ্‌লো, সেই সমস্ত খাঁচা থেকে শুক-শারীর হরেকরকম বোল শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভানুমতীর ইসারায় পুষ্পবৃষ্টি শুরু হোলো। রাজা বুঝি তাতে চাপা

পড়েন, এক মন্তরে আকাশে তারা-চাঁদের হোলো সৃষ্টি। তারাগুলো যেন উল্কার মতো ছুটে আস্‌তে লাগ্‌লো রাজার দিকে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারদিকে লাগ্‌লো আগুন—জলে আগুন, স্থলে আগুন। রাজা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুঃসাহসী, সমস্ত ভয়-ভাবনা মন থেকে দূর ক'রে দিয়ে কি উপায়ে ভানুমতীর ইন্দ্রজাল বিফল করা যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগ্‌লেন। তখুনি তাঁর স্মরণ হোলো—তিনি তো মায়া-মোচন 'শিঙ্গা-মন্ত্র' জানেন! আর দেরি না ক'রে তিনি মন্ত্রটি আওড়ে নিলেন, তারপরে তাঁর গলার হারে ধুক্‌ধুকির মতো একটি শিঙ্গা যা' সব সময়েই ঝুল্‌তো সেটি মুখে তুলে বাজিয়ে দিলেন। নিমেষের মধ্যে ভানুমতীর সমস্ত মায়ার খেলা, ভেল্কীবাজি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ভানুমতী এতেও না দ'মে রাজাকে ঠাট্টার সুরে বল্‌লেন, "মহারাজ, আমাকে আপনি যে শ্রীফলটি উপহার দিয়েছেন আমার উপহারের চেয়ে নাকি অনেক দামী। কিন্তু আপনি এই তুচ্ছ একটা ফল দিয়ে আমাকে তুচ্ছ করেছেন। আপনার ঐ শ্রীফল—দেখুন।"

রাজা দেখ্‌লেন থরে থরে শ্রীফল সাজানো রয়েছে। ভানুমতী গম্ভীরভাবে রাজাকে শুনিয়ে দিলেন যে: রাজা যদি তাঁর কথা সত্য প্রমাণ করতে না পারেন, তা'হলে যতগুলি ফল আছে তত কোটি সোনার মুদ্রা তাঁকে এখানেই গুণে দিতে হবে, নইলে তাঁকে বারো বৎসর রাজকন্যার দাস হ'য়ে থেকে এই দেনা শোধ করতে হবে।...রাজা হেসে বল্‌লেন: "আমি রাজী। কিন্তু যদি এর দাম প্রমাণ করতে পারি?"

ভানুমতী থম্‌কে গিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লেন: "আপনাকে আমি ঐ মূল্য ধ'রে দেবো, না পারি, আপনার দাসী হবো।"

রাজা তখন ভানুমতীর প্রত্যেক ফলটিকে ভাঙ্‌তে বল্‌লেন। কিন্তু সে-সমস্ত ফলে কেবল শাঁস ছাড়া আর কিছুই নেই। শেষে ভানুমতী মহা-উৎসাহে রাজার দেওয়া ফলটি ভেঙে ফেল্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়্‌লো এক অপূর্ব-রত্ন, তা'র প্রভায় সেই জায়গাটা আলোয় আলো হ'য়ে গেল। রাজার ইচ্ছায় এক মণিকারকে ডাকা হোলো। মণিকার এসে রত্নটি অনেকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বল্‌লে যে, এই রত্ন সহজে পাওয়া যায় না, এর দাম তিন কোটি সোনার মুদ্রার চেয়েও বেশী। রাজকন্যারি বিশ্বাসী মণিকার, মিথ্যা বল্‌বার ভরসা তার নেই। রাজকন্যার মুখ শুকিয়ে গেল। রাজা তাই দেখে বল্‌লেন: "আমি তোমায় মুক্তি দিলুম।"

রাজকন্যা ভানুমতীর মনে ঘা' লাগলো। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি বল্‌লেন: "মহারাজ—একদণ্ড পরে আমাদের আবার দেখা হবে, তখন হার জিতের শেষ নিষ্পত্তি। এখন আপনি বিশ্রাম করুন।"...এই ব'লে ভানুমতী সেখান থেকে চ'লে গেলেন। এবার তিনি পড়েছেন ভীষণ সমস্যায়, অনেক মাথা খাটিয়ে শেষকালে এক ফন্দি বার কর্‌লেন।

ঠিক একদণ্ড পরেই ভানুমতী হাস্‌তে হাস্‌তে এসে উপস্থিত। সঙ্গে তাঁর বারোজন সখী, প্রতিজনের হাতে এক একটি পদ্মফুল। রাজাকে ডেকে তিনি বল্‌লেন: "মহারাজ, এই বারোটি পদ্মফুলের মধ্যে কেবল একটি আসল এগারোটি নকল। আসল ফুলটি আমার হাতে এনে তুলে দিন্।"

রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে হেসে ভাব্‌লেন, "বারবার হেরে গিয়ে রাজকন্যার নিশ্চয় মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। একি আবার একটা সমস্যা?"

কিন্তু ফুলগুলির দিকে দৃষ্টি ফেল্‌তেই রাজার চক্ষুস্থির! বারোটি পদ্মই যেন সত্যিকারের! কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল তিনি কেমন ক'রে চিন্‌বেন? রাজা মহাগোলে পড়্‌লেন। মনে করলেন ফুলগুলির গন্ধ শুঁকে আসলটিকে তিনি চিনে নেবেন। ভানুমতী কিন্তু কোনো খুঁৎ রাখেন নি। আসল পদ্ম চেনা গেল না। এবার নিশ্চয় হার মান্‌তে হবে এই ভেবে রাজা বড় দমে গেলেন। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো, কেননা এই হবে তাঁর প্রথম হার। তিনি অগত্যা স্বীকার করতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে তাঁব কানে এলো একটা গুণ্ গুণ্ শব্দ। চোখের ওপর তিনি দেখ্‌তে পেলেন সেই ছোট্ট মৌমাছিটিকে। ছোট্ট মৌমাছিটি রাজার কানে কানে মিন্ মিন্ ক'রে বল্‌লে: "মহারাজ, আপনি দেশ থেকে যে-সমস্ত পদ্ম এনে জীইয়ে রেখে দিয়েছিলেন তা'র একটার ভেতর আমি রাত্রিবেলায় বন্ধ হয়েছিলুম, সেই সঙ্গেই আমি চ'লে এসেছি। সেই পদ্মের মালা আপনার গলায়, ঐ মালাতেই আমি গোড়া থেকেই লুকিয়ে ব'সে থেকে মধু খাই। ভালোই হয়েছে। আমি উড়ে গিয়ে যে-ফুলটিতে বস্‌বো, জান্‌বেন—সেইটেই আসল পদ্ম।"

যেমনি বলা অমনি কাজ। রাজা সেই সত্যিকারের পদ্মটি হাতে তুলে নিয়ে ভানুমতীর খোঁপায় গুঁজে দিলেন। ভানুমতী আর স্থির থাকতে পার্‌লেন না। রাজার পায়ে প্রণাম ক'রে রাজকন্যা নিজের গলা থেকে বরণমালা খুলে পরিয়ে দিলেন রাজার গলায়। ভোজদেশে ও উজ্জয়িণীতে উৎসব চল্‌তে লাগ্‌লো।

রাজা বিক্রমাদিত্য ভোজরাজকুমারী ভানুমতীকে লাভ ক'রে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন। কিন্তু রাজা সেই ছোট মৌমাছিটিকে ভুলে গেলেন না। তিনি তাঁর বাগানের একটি ফুলগাছে তা'র জন্যে 'সোনার মৌচাক' তৈরী ক'রে দিলেন। ছোট মৌমাছিটি সেই মৌচাকে ফোঁটা ফোঁটা মধু এনে জমা করে, আর প্রতিদিন সকালে রাজা ও রাণীর মুখে মধু যুগিয়ে থাকে। এমনি ক'রে আনন্দে-সুখে দিনগুলি তার মধুময় হ'য়ে উঠ্‌লো।

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায়

গান নিশ্চয় তোমাদের সবার ভালো লাগে; কিন্তু গানের বিষয় কিছু জানো কি? নাচ-গান আর বাজ্না—এই তিনটে মিলিয়ে আমাদের দেশের সঙ্গীতশাস্ত্র বহুদিন হতে গড়ে উঠেছে! অবশ্য এই তিনটিরই প্রকাশ চর্চায়—তবু এ-সম্বন্ধে সবার জ্ঞান না থাকলে কিছুতেই পুরাপুরি রস নিতে পারবে না!

সংস্কৃত ভাষায় এই সঙ্গীতবিদ্যায় অনেক বড়ো বড়ো বই লেখা হয়েছিল। এই সব শাস্ত্রকারদের বিধান হতেই আমাদের সঙ্গীতবিজ্ঞান পূর্ণ রূপ লাভ করে। নারদ, কল্লিনাথ, সারঙ্গদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ছিলেন এই শাস্ত্রের বিধানকর্তা!

গল্প আছে, আমাদের দেশের সঙ্গীতের জন্ম ভগবানের মুখ থেকে! আমাদের গানের ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণীর মধ্যে পাঁচটির শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘরাগের জন্ম শিবের মুখে আর একটির নটনারায়ণের জন্ম দুর্গার মুখ হতে! অবশ্য আজকের দিনে সেই রাগ-রাগিণীর আর বিশেষ প্রচলন নেই। তাদের নিয়ে আজ নতুন করে ভাগ করা হয়েছে 'ঠাটে'।

মোটামুটি গানের দুটো ভাগ আছে—একটা classical বা শাস্ত্রীয় গান, আরেকটা লৌকিক গান। classic বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হচ্ছে—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা প্রভৃতি। বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, এইসব লৌকিক গান।

আমরা আজকাল যে classic গানের পরিচয় পাই, তা ঠিক হিন্দু-সঙ্গীত নয়, তার সৃষ্টি মুসলমান দরবারে। তার আগে যে গান ছিল, তার নাম 'মার্গ-সঙ্গীত'—এই গানের ধারার বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না।

গানের আদি যে জিনিস, তা হচ্ছে সপ্তস্বর—এইগুলির সৃষ্টি হয়েছে নাকি জীবজন্তুর স্বর থেকে। ভরত ঋষির মতে এই সাতটা স্বর সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-জন্মেছে যথাক্রমে ময়ূরের, ষাঁড়ের, ছাগলের, বকের, কোকিলের, ঘোড়ার এবং হাতীর ডাক হতে! এইগুলির শুদ্ধ রূপ হচ্ছে—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিখাদ। প্রাচীনকালে বেদের সামগান গাওয়া হতো যে ভাবে, তা থেকেই এই রকম স্বরের উৎপত্তি হয়েছে।

গানের আরও ছোট ছোট স্বরকে বলে 'শ্রুতি'। আরও একটি গানের বড় কথা 'সপ্তক' অর্থাৎ স্বরভেদ—এই তিনটির নাম উদারা (মন্দ্র) মুদারা (মধ্য) এবং তারা (তার)।

তারপর এলো দরবারের আমল—মুসলমান সুলতানদের দরবারে ঠাঁই পেলেন ওস্তাদরা, তাঁরা গানে নূতন ঢঙ্ আন্‌লেন। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত গানের ভঙ্গীকে নিয়ে তাঁরা 'দরবারী সঙ্গীত' সৃষ্টি করলেন। গোয়ালিয়রের এক ধরনের গানকে তাঁরা সুসংস্কৃত করে তৈরী করলেন 'ধ্রুপদ' গান। ধ্রুপদ গান যখন ইচ্ছামত কায়দা করে গাওয়া হলো—তখন তার নাম দেওয়া হলো 'খেয়াল'। পাঞ্জাবের উটচালকদের গানের ভঙ্গীকে নিয়ে গোলামনবী সৃষ্টি করলেন 'টপ্পা' গান। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে তৈরী হলো 'ঠুংরি' গান।

আলাউদ্দিনের রাজসভার গায়ক 'আমীর খসরু' কাওয়ালি ও খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন। আকবরের সভা-কবি 'তানসেন' ধ্রুপদ গানের উন্নতি করলেন। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজসভার সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ এই দরবারী গানের আরও উন্নতি করেন।

তবে এই সমস্তই উত্তর ভারতের গান বা হিন্দুস্থানী গান। দক্ষিণ-ভারতীয় গান বা কর্ণাটি গানে ধরনধারণ কিন্তু ভিন্ন প্রকার। সেই দেশের সবচেয়ে বড় গায়ক হলেন 'ত্যাগরাজ' —কর্ণাটি গানে ধ্রুপদের নাম কীর্তন ও খেয়ালের নাম 'কৃতি'।

এই হলো ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ; কিন্তু এই হলো ওস্তাদের গান। সাধারণ লোকের সঙ্গে এই গানের যোগ ছিল না। প্রাণের যোগ আছে লোক-সঙ্গীতে—এইগুলির বড় কথা বিজ্ঞান নয়, মনের ভাবটাই এখানে আসল কথা।

বাংলা দেশের 'কীর্তন' ছিল প্রাণের গান, এই কীর্তনে বিজ্ঞান এবং শিল্পের উভয়ের মিল হয়েছিল। কীর্তনের সুন্দর ভঙ্গিটি বাংলা দেশের নিজস্ব। 'বাউল' গানও বাংলায় নিজস্ব, এই বাউল গানগুলির মধ্যে অনেক জটিল ইঙ্গিতও থাকে। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলার এই গ্রাম্য বাউল অপরূপ রূপ নিয়েছে !

কীর্তন গানকে কেন্দ্র করে একদিন বাংলায় সুরের নব-আন্দোলন এসেছিল। শ্রীচৈতন্য দেবকে এই কীর্তনের জন্মদাতা বলা হয়। কীর্তন—বাংলা দেশের ভজন গান। হিন্দীতে সুরদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির ভজন গানের সঙ্গে অবশ্য আমাদের এই কীর্তনের কোনই মিল নেই—কারণ কীর্তন গান হচ্ছে মহাজনগণের পদাবলী, তাঁদের কাব্য-সাধনা।

বাংলা দেশে আরও এক শ্রেণীর ভজনগান আছে ; যার নাম 'রামপ্রসাদী'। এই গানের মধ্যে যে কত গভীর তত্ত্ব আছে, তা কি বলব !

বাংলা দেশে কোনদিনই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ গানের আদর হয় নি। আমাদের গান চিরকালই 'কাব্যের গান'। এটায় বড় কথা সুর নয়, সুন্দর সুললিত কবিতা। কবিরা গান করলে যা হয় আর কি।

বাংলা দেশে হিন্দুস্থানী সুর প্রথম আনেন, 'রামনিধি গুপ্ত'। তিনি পশ্চিম থেকে টপ্পা গান শিখে এসে বাংলায় সেই ভঙ্গির গান সৃষ্টি করেন। তাঁর গানের নাম, 'নিধুবাবুর টপ্পা'। এই হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের অনুকরণে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে অনেক ব্রাহ্মসঙ্গীত রচিত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রাগসঙ্গীত এই ব্রাহ্মসঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দুস্থানী গানের ধারা থেকে অবশ্য আমরা ক্রমেই দূরে চলে এসেছি। ক্রমে আরও দূরে চলেও যাবো। রাগ-সঙ্গীতের কাঠামোয় বাংলা গান রচনা করেছেন অতুলপ্রসাদ সেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সুরকে সুন্দর অনুকরণ করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের গানের তো কথাই নেই—যেখানে যে সুরের আভাস তিনি পেয়েছিলেন, সবই আমাদের নিজের করে সাজিয়ে উপহার দিয়েছেন! রজনীকান্ত সেনের গান আমরা সবই ভুলে গেছি।

এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গান ধ্রুপদ এবং টপ্পার রীতিতে রচিত, দ্বিজেন্দ্রলালের গান খেয়াল এবং অতুলপ্রসাদের গান ঠুংরির ভঙ্গিতে গাওয়া হয়। এই কবিরা সবাই হিন্দুস্থানী সুরও যেমন অবলম্ব করেছেন, বাংলার নিজের সুর—কীর্তন-বাউলও তেমনি গ্রহণ করেছিলেন।

তারপর এলো ফিল্মের গানের যুগ—গানের আর কোন মূল্যই থাক্‌ল না! গানের পক্ষে বড় অংশ কথার নয়, সুরই গানের আসল, এই সুরকে কমিয়ে কবিতা অধিক ব্যবহার কর্‌লে সুরের অমর্যাদা করা হয়। গানের আরও একটা সহায় আছে—'তাল'। কবিতার ছন্দকে গানেতাল বলে; এই তালকে আজকাল ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে!

অবশেষে অতুলপ্রাসাদের মতো বলি—

'দগ্ধ যবে চিত্ত হবে
এ মরু-সংসারে
স্নিগ্ধ করো মধুর সুরধারে।
তোমার যে সুরে ছন্দে
পাখীরা গাহে আনন্দে,
শিষ্য করি আমারে
সে সঙ্গীত শিখাও ॥'

জিনিসের দাম

১৮০৫ সালে চালের দাম ছিল আট আনা থেকে এক টাকা মণ। গম ছিল টাকায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সের। দুধ টাকায় ত্রিশ থেকে ছত্রিশ সের। মুর্গী টাকায় ত্রিশটা। একটি পাঁঠা চার আনা। এ হিসাব পাওয়া গেছে তখনকার এক ইংরেজ অফিসারের লেখা থেকে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বন্ধুদের আড্ডা ছেড়ে অমল যখন বাসায় ফিরল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সদর দরজার কড়া নাড়তে মা-ই এসে ফের দোর খুলে দিলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। অমলের সঙ্গে কোন কথা না বলে ভিতরের দিকে চলে গেলেন রেণুকা। এর চেয়ে মা যদি খুব রাগ করতেন, গালাগাল করতেন, তাও যেন সহ্য হোত অমলের। কিন্তু তিনি যেন নিঃশব্দে তাকে জানিয়ে গেলেন, 'তুমি এতই তুচ্ছ, ছেলে হবার এতই অযোগ্য যে মা-ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করেন।'

তাঁর এই অস্বাভাবিক নীরবতায় অমলের মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল।

কিন্তু মা নীরব থাকলেই যে বাড়ির আর সবাই চুপচাপ থাকবে তা নয়। একটু বাদেই তা টের পেল অমল। বারান্দায় ছোট একটা টুলের ওপর বসে কি একটা বই পড়ছিল বড়দা নির্মল। অমল তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে যেতেই নির্মল বই বন্ধ করে কড়া আর গম্ভীর গলায় বলল, 'দাঁড়া।'

মেজদাকে তেমন গ্রাহ্য না করলেও, বড়দাকে ভারী ভয় করে অমল। কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

নির্মল বলল, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

অমল আমতা আমতা ক'রে বলল, 'স্কুলের ছুটির পর—' নির্মল ধমক দিয়ে উঠল, 'পাজী মিথ্যাবাদী কোথাকার। স্কুলের ছুটির সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক? তুই তো স্কুলে যাসনি আজ। বোধ হয় কোন দিনই যাসনে!'

ধরা পড়ে অমল এবার সত্য কথা বলবার চেষ্টা করল, 'না বড়দা, রোজই যাই। আজও

গিয়েছিলাম, কিন্তু—' নির্মল ফের ধমকে উঠল. 'মিথ্যা কথা আমার একদম সহ্য হয় না। গিয়ে ছিলি তুই ? ভেবেছিস মার মত সকলের চোখেই ধাপ্পা দেওয়া যায়। পৃথিবীতে সবাই বোকা আর একমাত্র চালাক হচ্ছিস তুই, না ? ভেবেছিস আমরা কিছুই জানতে পারিনি ?'

ঠাকুরমা এককোণে বসে মালা জপ করছিলেন, বললেন, 'আহাহা নির্মল এখন ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। হাত মুখটুক ধুয়ে আসুক, খাবারটাবার কিছু খাক। তারপর যা বলবার বলিস।'

নির্মল বলল, 'হুঁ। তোমরা এই রকম আস্কারা দিয়ে দিয়েই তো ওর মাথাটি খেয়েছ। তুমি আর মা—'

বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট একটু রান্নার জায়গা। বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। সেই ছোট্ট জায়গাটুকুতে বসে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে রেণুকা রাত্রির রান্না শেষ করছিলেন। বড় ছেলের কথায় রাগ ক'রে উঠে এলেন, 'কেন বাপু আমাকে তোমরা মিছামিছি দোষারোপ করছ। কি করেছি আমি তোমাদের। আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওকে আমি কোন্ সিংহাসনে তুলেছি শুনি ?'

নির্মল কোন জবাব না দিয়ে হ্যারিকেনের আলোয় ফের বই খুলল।

রেণুকা এবার অমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। তুই সকলের ঘাড়ের ওপর বসে বসে এমন ক'রে খাবি আর আমার হাড় জ্বালাবি। যা বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। এখানে তোর স্থান নেই। অমনিতেই তো মনে কত শাস্তি আমার, তারপর রাতদিন তোর জন্যে আমি আর মানুষের খোঁটা শুনতে পারব না। কিছুতেই পারব না। যতদিন পেরেছি পেরেছি, আর না!'

অমলের ঠাকুরমা মালা জপ করতে করতে ফের আর একবার বললেন, 'বউমা, তুমি আবার কেন এলে এর মধ্যে। যাও, তুমি যা করছিলে তাই কর গিয়ে। তোমার উনুনের ওপরকার তরকারি বুঝি পুড়ে গেল, গন্ধ বেরুচ্ছে।'

কিন্তু রেণুকা শাশুড়ীর কথা কানেও তুললেন না। পুড়ুক। রাগে দুঃখে তাঁর সমস্ত অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। আর একটা তরকারি তো তরকারি!

রেণুকা এবার অমলের আরো সামনে এগিয়ে এলেন, 'বল লক্ষ্মীছাড়া কোথায় ছিলি। আমি তোকে বই খাতা দিয়ে স্কুলে পাঠালাম আর তুই কিনা—' অমল এবারও ক্ষীণ-প্রতিবাদ করল : 'বাঃ রে আমিতো স্কুলে—'

পাশের ঘর থেকে কমল বেরিয়ে এসে রান্নার জায়গার সামনে নিজেই একটা পিঁড়ি পেতে

বসে বলল, 'ভাত বেড়ে দাও মা। আমার সময় হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে আর তর্কাতর্কি ক'রে লাভ কি। ও তো তোমাদের কাছে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। যা বলে তাই সত্যি !'

রেণুকা এগিয়ে এসে এবার তাঁর হলুদমাখা হাতে অমলের কান টেনে ধরলেন, 'নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। আমার সামনে মিথ্যেকথা বলতে তোর লজ্জা করে না? আমি টিফিনের সময় অনেক সাধ্যি-সাধনা করে কমলকে খাবার দিয়ে পাঠাইনি তোর স্কুলে? সে গিয়ে সব জেনে আসেনি?'

অমল মাথা নিচু ক'রে রইল। মেজদা যদি সব জেনে এসে থাকে দেরিতে যাওয়ার জন্য ক্লাস টিচার তাকে ভিতরে ঢুকতে দেননি, এওতো জানার কথা। কিন্তু সে কথা নিশ্চয়ই মেজদা এসে বলেনি। সে কথা এখন যদি অমল বলে তা নিশ্চয়ই কেউ আর বিশ্বাস করবে না।

নির্মল মার দিকে তাকিয়ে শ্লেষ করে হাসল, 'আবার খাবার দিয়ে পাঠিয়েছিলে? খাইয়ে খাইয়েই তো ওর এত তেজ বাড়িয়েছ। উচিৎ কি জানো? দু'একদিন না-খাইয়ে রাখা। তা'হলে ঠিক মজাটি টের পায়। ওর কোন্ এয়ার বন্ধুর বাড়িতে একবেলা জোটে আমি তা দেখি!'

রেণুকা বললেন, 'আমিও তাই দেখব। যেখানে তোর জোটে সেখানে তুই চলে যা। এ বাড়িতে আর তোর ভাত নেই। আমি যদি নিজের হাতে রান্না করে কোনদিন তোর সামনে ভাত বেড়ে দেই ত', বাপের বেটি নই আমি। এই তোকে আমি বলে রাখলুম।'

ছেলের কান ছেড়ে দিয়ে রেণুকা উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে উনুনের সামনে ছোট পিঁড়িতে গিয়ে বসলেন।

ইলা বউদি মেজদাকে ভাত বেড়ে দিলে। অমলের বড় জল পিপাসা পেয়েছে। ইচ্ছা হোল এক গ্লাস জল চায় তার কাছে। কিন্তু চাইল না। না এ বাড়িতে জলস্পর্শ করবারও প্রবৃত্তি তার নেই।

কোন কথা না বলে সোজা ঘরে ঢুকে গেল অমল। ঢুকে তক্তাপোষের ওপর বই-খাতাগুলিকে সশব্দে ফেলে দিল।

নির্মল বাইরে থেকে চীৎকার করে উঠল, 'এই শূয়োর বইগুলি পয়সা দিয়ে কিনতে হয়েছে। অমনিতে আসেনি। পড়তে না চাস, পড়াশুনোয় মন না যায় তোকে তো হাজার দিন বলেছি ছেড়েদে। আমাদের রক্ত জল-করা পয়সার এমন ক'রে অপব্যয় করিসনে।'

ঘরের এককোণে অমল গুম মেরে বসে রইল। কেবল পয়সা আর পয়সা। কথায় কথায় সকলের মুখে কেবল পয়সা আর ভাতের খোঁটা। একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে

হয়। অমল দেখবে পয়সা সেও রোজগার করতে পারে। লেখাপড়া শিখে দাদারা যা করছে, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি রোজগার করতে পারে অমল। সেই ক্ষমতাটি একবার এদের দেখিয়ে দেওয়ার ভারী ইচ্ছা করতে লাগল অমলের। ইচ্ছা থাকলেই নাকি উপায় হয়। ইচ্ছা অমলের মনে যথেষ্ট। এবার উপায় চাই। যে কোন ভাবেই হোক উপায় খুঁজে বের করা চাই তার।

মেজদা খাওয়াদাওয়া সেরে নাইট ডিউটিতে বেরিয়ে গেল। এবার বাকি আর সবাইর খাওয়ার ডাক পড়ল। অনর্থক তেল পুড়িয়ে লাভ নেই। রাত আটটার মধ্যেই এ বাড়ীর সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে যায়।

নির্মল গিয়ে খেতে বসে বলল, 'কই সে নবাব এল না।'

রেণুকা কোন জবাব দিলেন না।

ইলা বলল, 'তুমিইতো তাকে খেতে দিতে নিষেধ করেছ। যাও ডেকে নিয়ে এসো।'

নির্মল বলল, 'হ্যাঁ, যত দোষ তো আমারই, এ-সংসারে সবাইতো আছ কেবল নিজের দায়িত্ব এড়াতে. নিজের দোষ অস্বীকার করতে।'

ইলা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, 'নিজের দোষ তুমি বুঝি খুব স্বীকার করছ।'

নির্মল বলল, 'হয়েছে হয়েছে, এবার ডেকে নিয়ে এসো।' ইলা অমলের সামনে এসে ওর হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'এসো, খাবে এসো।'

অমল মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'যাও এখান থেকে, বিরক্ত কোরোনা আমাকে।'

ইলা তবু অনেকক্ষণ সাধাসাধি করল, 'অমন রাগ করে নাকি, এসো, লক্ষ্মীটি।'

অমল বউদির হাত ঠেলে ফেলে বলল, 'না, রাগ কেবল তোমাদেরই আছে। আর কারো তো রক্তমাংসের দেহ না। তাদের রাগ দুঃখ ও হ'তে নেই, মান-অপমান বোধও থাকতে নেই।'

ইলা হাসি চাপবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'ওরে বাবা! কেবল রাগ দুঃখ নয়, মান-অপমান বোধ পর্যন্ত হয়েছে।'

বউদির হাসি দেখে গা জ্বলে গেল অমলের। কারণ ভিতরে ভিতরে তার পেটও জ্বলে যাচ্ছিল। সেই জ্বলন্ত ক্ষুধায় আর রাগে বাড়ি-ফাঠান চীৎকার ক'রে উঠল অমল। যাও যাও বলছি। যাও এঘর থেকে বেরিয়ে। যা দু'চোখে দেখতে পারিনে তাই, আমার সঙ্গে ন্যাকামি করতে এসেছেন।'

নির্মল বাইরে থেকে স্ত্রীকে ডাকল, 'তুমি চলে এসো। কে কার সঙ্গে ন্যাকামি করে-না-করে তার শিক্ষা আমি কাল ওকে দেব। অভদ্র ইতরের মত মুখ হয়েছে। দিনে দিনে স্বভাব ও হচ্ছে তেমনি, গুণ্ডা বদমাইসের মত। এ বাড়িতে ওকে আর রাখাই চলবে না মা।' (ক্রমশঃ)

তোমাদের লেখা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আগমনী—শ্রীঅঞ্জলি ভট্টাচার্য; পরিচিত বন্ধু, —শ্রীসুলতা লাহিড়ী; চিঠি—শ্রীবিভা ঘোষ; জীবন-খাতার একটি পাতা—শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠি; দর্পচূর্ণ, পণ্ড—শ্রীমিহিরকুমার দেব; প্রকৃতির ঝাড়ুদার, কবন্ধ—শ্রীশিবদাস শেঠ; নিয়তি (অসমাপ্ত)-শ্রীসুচন্দ্রা মল্লিক; অঘোর পণ্ডিত—শ্রীজয়শ্রী লাহিড়ী; গল্পলেখা, একটি চিঠি—শ্রীবীণা চৌধুরী; আমার ছোট বন্ধু গোপাল—শ্রীঝরণা সেন; কবিরত্ন কিটিদি—শ্রীনমিতা ও সুশান্ত গুপ্ত; একটু হাস—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়; দাদাঠাকুর—শ্রীসুজিতকুমার সেন; সন্ধ্যা—শ্রীকিরণপ্রদীপ মিত্র; উষা—শ্রীরত্না রায়; চৌকাঠের ওপারে—শ্রীপিণাকী ঘোষ; দানব—শ্রীমঞ্জুলী চক্রবর্তী; প্রতিশোধ—শ্রীজগন্নাথ মুখার্জী; রূপকথা—শ্রীবীণা পালিত; দেশপ্রমিক—শ্রীপ্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়; একটুখানি হাস—শ্রীপ্রতিমা গাঙ্গুলী; বাঘ—শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়; দোলনার গান, আগমনী—শ্রীদীপালি সেনগুপ্ত: আদর্শবাদী সুভাষচন্দ্র—শ্রীশুভ্রাংশুকুমার ঘোষ; সত্যি কথা—শ্রীমাধুরী দাস; পৃথিবীতে বসে স্বর্গের চিন্তা—শ্রীপ্রত্যয় রক্ষিত; অতৃপ্ত-বাসনা—শ্রীপ্রদ্যুম্নকুমার মিত্র; খুড়োর দর্পচূর্ণ—শ্রীআদিত্য বর্গমিত্র; নব-বৈশাখ—শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ; ফুলের ভাষা—কুমারী সর্বাণী বসু; রূপান্তর—শ্রীমহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়; মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র—শ্রীবাণী সিংহ; পদ্মার গ্রাস—শ্রীঅশোককুমার সরকার; হারানো দিনের কথা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়; গলা-সাধা—শ্রীনমিতা গুপ্তা; আঁধারের দেশে—শ্রীবাদলকুমার সাঁত্রা; অব্যক্ত—শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী; কা ডুরাবন্—শ্রীরজত চন্দ; সপ্তর্ষিমণ্ডল—শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য; মৌচাক—শ্রীসুধন্যকুমার গুহ; একটি চিঠি—কুমারী দেবীরাণী দাস; গরিলা—শ্রীনমিতা চক্রবর্তী; অসমাপ্ত দেবালয়, প্রণাম তোমার পায়—শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়। (ক্রমশঃ)

জীবন-সূর্য

সূর্য রোজ উঠ্‌ছে আবার রোজই অস্ত যাচ্ছে—এ নিয়ে যে কিছু চিন্তা করা তা আর কে করে? কিন্তু অনেকদিন আগে একজন সূর্যের এই ওঠা-নামা নিয়েই নিজেকে কেমন শান্তিতে রেখেছিলেন সেই গল্পটাই আজ বোল্‌ব:

একটি বেশ সমৃদ্ধ দেশের রাজার একজন অত্যন্ত বিশ্বাসী, বিচক্ষণ ও সাধু-চরিত্রের মন্ত্রী ছিলেন। ভাল হলেই ভালবাসা পাওয়া যায়—তাই মন্ত্রী রাজা বা প্রজা সকলের কাছ

থেকেই পেয়েছিলেন প্রচুর ভালবাসা। বিপদে-আপদে এই মন্ত্রীরই মন্ত্রণা ও ব্যবস্থাগুণে দেশ ও দশ রক্ষা পেয়ে আস্‌ছিল। এমন মানুষকে কে না ভালবাস্‌বে। তবু দুষ্টু লোকের অভাব নেই—মন্ত্রীর সমৃদ্ধি দেখে হিংসুক লোকেরা জল্‌তে লাগ্‌ল। তারা চেষ্টা কোর্‌ল রাজার চোখে মন্ত্রীকে যাতে বিষবৎ করে দেওয়া যায়। কিন্তু শক্ত ভিত কি আর দু'এক ধাক্কাতেই ভেঙ্গে পড়ে? দুষ্টু লোকেরা বুঝ্‌ল মন্ত্রীর ওপর রাজার যে ভালবাসা তিল তিল করে আর ভাল জিনিসের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে সে ভালবাসার মূলচ্ছেদ করা সম্ভবপর নয়, তাই তারা রইল অপেক্ষায়।

এদিকে মন্ত্রী একদিন গেছেন স্নান কোরতে,—সমুদ্রে স্নান কোরতে কোরতে তিনি অন্যমনস্কভাবে চিন্তা কোরছেন, এমন সময় তাঁর হাত থেকে হীরের আংটিটি খুলে পড়ে জলে ভাসতে লাগলো। দেখে তো মন্ত্রী অবাক হ'য়ে গেলেন। তারপর তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ভাগ্য আমার খুবই সুপ্রসন্ন—রাজা আমাকে কত সু-নজরে দেখেন, দেশের লোকের কাছ থেকে আমি প্রাণঢালা ভালবাসা পেয়েছি, প্রচুর ধন-সম্পত্তি আমি সঞ্চয় করেছি, পারিবারিক শান্তি আমার অটুট আছে আর আমার ভাগ্যের জোর এত বেশী হয়েছে যে, হীরের আংটি হাত থেকে পড়ে গিয়েও জলে ভাস্‌ছে—আমার জীবনে সৌভাগ্য সূর্য উঠ্‌তে উঠ্‌তে যখন মধ্য-গগনে গিয়ে উঠেছে, তখন এইবার পড়ে অস্তগামী হবে। কথাটা মনে হতেই মন্ত্রী সাবধান হ'তে সুরু করে দিলেন। ধন-সম্পত্তি, পরিবার ও সন্তানদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেললেন; তারপর অদৃষ্টের দিকে তাকিয়ে দিন গুণ্‌তে লাগ্‌লেন।

দুষ্টু লোকেরাও ততদিনে রাজার মন ভাঙ্গানোতে সফলকাম হ'তে পেরেছে। তাদের প্ররোচনায় এক মিথ্যা সন্দেহে রাজা মন্ত্রীকে মাটির নিচে একটা কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। সেখানে মন্ত্রীর অতি কষ্টে দিন কাটতে লাগলো। মাটির নিচে স্যাঁত-স্যাঁতে আর অন্ধকার ঘর। আরশোলা, ইঁদুরে ভর্তি। দু'বেলা খেতে পান না, যা পান তাও একেবারে অখাদ্য—এমনি করে বেশ কয়েকটা বছর গেল। মন্ত্রী দুঃখ করেন না মোটেই। শুধু ভাবেন, অস্তাগামী সূর্যের আলো কম্‌তে কম্‌তে অন্ধকারই আসে, কিন্তু সূর্য আবার ওঠে ঠিক। এমনি সময়ে একবার মন্ত্রী তিনদিন খাদ্য বা পানীয় কিছুই পাননি—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে তিনি নির্জীবের মত পড়ে আছেন, আরশোলারা মনের সুখে তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমন যে সহিষ্ণু আর চিন্তাশীল মানুষ, তিনিও যেন ভেঙ্গে পড়েছেন—ঠিক সেই সময়ে কপাট খুলে দ্বাররক্ষক তাঁর হাতে দিয়ে গেল এক টুকরো রুটি। মন্ত্রী সেটি হাতে নিয়েই বুঝতে

পারলেন তা অনেকদিনের বাসি রুটি। যা-হোক ক্ষিদের যন্ত্রণায় তিনি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিলেন, সেটা দিয়ে অন্ততঃ ক্ষিদের নিবৃত্তি হবে। কিন্তু তাও হোল না ; কতগুলো ইঁদুর কিচিরমিচির কোরতে কোরতে এসে রুটিখানা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। মন্ত্রী কিন্তু এতেও হতাশ হলেন না—একটু হেসে তিনি শুধু বোল্‌লেন, 'আজ বুঝতে পারলাম আমার দুর্ভাগ্য যখন চরম সীমায় ঠেকেছে, এবং আমার সৌভাগ্য সূর্য যা অস্ত গিছল তা এইবার পুনরায় উদিত হবে!'

এতদিনে রাজা ও দেশের লোক বুঝতে পেরেছে এই মন্ত্রীর অভাবে দেশে কী বিশৃঙ্খলাই এসেছে। কলকব্জার একটি কব্জা ঢিলা হ'য়ে গেলে যেমন সমস্ত কলটিই অচল হ'য়ে পড়ে, মন্ত্রী-বিহনে দেশের সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে—এমন কি, সেই হিংসুক লোকেরাও এ সত্য উপলব্ধি কোরতে পারল। বিনাদোষে মন্ত্রী কত কষ্টই পেলেন ভেবে লজ্জিত রাজা মন্ত্রীকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিলেন, দেশের সমস্ত লোক এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। তারপর?—তারপর আর কি' মন্ত্রীর তো সবই ছিল, সূর্য নতুন করে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—মধ্য-গগনে না ওঠা পর্যন্ত তো নিশ্চিন্ত জীবন তিনি চালিয়ে যেতে পারবেন!

শ্রীকাঞ্চন মিত্র

বিজ্ঞান

পুরানো ব্যাটারী কি করে ভাল করতে হয় জানো? প্রথমে ব্যাটারী উপরে যে কালো গালার মত জিনিসটা থাকে সেখানে একটা ছোট ফুটো তৈরী করে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখ, তারপর একটু গালা দিয়ে সেই ছোট গর্তটা বন্ধ করে ফেলো। এইভাবে তোমরা অনেক ব্যাটারী জমা করে একসঙ্গে ঠিক মত করতে পারলে তোমাদের বাড়ীর সবাইকে চম্‌কে দিতে পারবে।

শ্রীসুলতা লাহিড়ী

হৃদয়-আলোক

রাত্রে ফোটে হাজার তারা আকাশ-তলে,
দিনে শুধু একটি রবি সেথায় জ্বলে।
কিন্তু যখন রবি নামে অস্তাচলে,
জগত ধীরে যায় যে ঢেকে আঁধার-তলে।

তেমনি আছে হাজার মন মোদের মাঝে,
তবু মোদের একটি শুধু হৃদয় রাজে।
কিন্তু যদি নিভে যায় হৃদয়-আলো,
জীবন-মাঝে নেমে আসে আঁধার কালো।

কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা

বর্ষা এলো

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে আকাশ মেঘে ভরা,
কালো রংয়ের ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকেছে ধরা।
যুঁই, কেতকী, দোপাটি, বেল দোলে বাদল
হাওয়ায়,
হেসে খুশে এ-উহারে জড়িয়ে নিতে চায়।
ভিজে বাতাস আনছে বয়ে কদম ফুলের বাস,
শুকনো মাঠে বাদল ধারায় জাগলো সবুজ ঘাস।
টোকা মাথায় লাঙ্গল কাঁধে মাঠেতে যায় চাষী,
মুখে তাহার উপছে ওঠে মিঠি খুশীর হাসি।
ছোট্ট পুকুর কানায় কানায় উঠলো জলে ভ'রে,
কালো জলে পদ্মগুলি ফুটছে থরে থরে।
শ্যাওলা-পড়া ঘাটের সিঁড়ি যায়না দেখা আর,
বৃষ্টি-জলে ডুবে গেছে এধার ওধার তার।

গামছা মাথায় কলসী কাঁখে কাদের বাড়ীর মেয়ে,
জল ভরতে ঘাটে এল বৃষ্টি-ধারায় নেয়ে;
বকুল গাছে ভিজছে বসে দুটো চড়াইপাখী,
মাঝে মাঝে করুণ স্বরে উঠছে তারা ডাকি।
দুষ্টু ছেলে বাবলু, রতন, বুণ্টু, মণি, ননে,
কাঁচা ডাঁশা পেয়ারা ফল খুঁজছে বনে বনে;
কাগজ দিয়ে নৌকো গড়ে সাজিয়ে ফুলে ফলে,
দুটো ছেলে ভাসাচ্ছে ঐ কাজলাদিঘীর জলে।
শুকনো মরা ঘাসপাতা সব সবুজ হয়ে ওঠে,
বৃষ্টিধারার স্পর্শ পেয়ে কদম কেয়া ফোটে।
চারিদিকে ঝলমলানো সবুজ শ্যামল শোভা,
বর্ষাঋতু সবার চোখে তাইতো মনোলোভা।

শ্রীরেব সিংহ

মজার ছবি উল্টে দেখ

কুমারী ঝরণা চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রা

সুদর্শন

স্মৃতি-ভ্রংশ
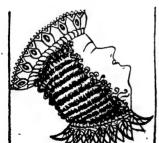
এক মার্কিন সেনা গত যুদ্ধে নেমেছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় ছ'মাস ছিলেন হাসপাতালে—দারুণ জখম হয়ে। তারপর যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরেন। দেশে ছিলেন স্ত্রী—শাশুড়ীর কাছে। সেনা-ভদ্রলোকটিকে সেখানে পাঠানো হলো—বাড়ী গিয়ে তিনি স্ত্রী বা শাশুড়ী কাউকেই চিনতে পারেন না। বিবাহ হয়েছিল একথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের নাম পর্যন্ত মনে নেই। তাঁর নামের কার্ড দেখানো হলো—দেখে তিনি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, এ লোকটিকে আমি চিনি না। চিকিৎসকের দল বহু ব্যবস্থাতেও তাঁর লুপ্ত-স্মৃতি ফেরাতে পারেন নি। নতুন করে তাঁর পুরানো-নাম তাঁকে শেখানো হয়েছে, এবং বিবাহের অভিনয় অনুষ্ঠান করে আবার তাঁকে সংসারী করা হয়েছে। অতীত-জীবনের সব কথা তাঁর মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে—বহু চিকিৎসাতেও অতীতকে তাঁর মনে আর ফিরিয়ে আনতে পারা যায় নি। এমনি আর একটি ঘটনার কথা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে লিখিত আছে। নেপোলিয়োর ফৌজদলে ছিলেন এক সেনা। আহত হয়ে তিনি হাসপাতালে ছিলেন তিনমাস—তারপর সেরে বাড়ী ফিরলে তাঁকে বিশ্বাস করানো যায়নি যে, তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর নাম ধরে কেউ ডাকলে তিনি জবাব দিতেন—সে তো যুদ্ধে মারা গেছে।

——

দোতলা ট্রাম

কলকাতা-শহরে পথে বেরুবার কথা মনে হলে দুনিয়া অন্ধকার দেখতে হয়। বাসে ট্রামে কোনো সময়েই বসবার জায়গা মেলে না, দাঁড়াবার জায়গারও অভাব। এ দুর্দশা ঘটেছিল লণ্ডনেও প্রায় বিশ বছর আগে। সেই সময় দোতলা বাসের প্রচলন ছিল। ট্রাম গাড়ীতে আমাদের মতো গুড়ের নাগরী বোঝাই করার লোভ নানা কারণে ট্রাম কোম্পানীকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। তখন সেখানকার এক কোম্পানী করেন দোতলা ট্রামের প্রবর্তন। দোতলা করবার সময় ট্রামগুলিকে ইস্পাত দিয়ে আগাগোড়া ঘিরে বেঁধে মজবুত করা হয়েছে—এর ফলে পথিকদের কোন কষ্ট আর নেই। আর আমদের এখানে পয়সা নেবে—কিন্তু যার জন্য পয়সা নেওয়া, অর্থাৎ যাত্রীদের স্বচ্ছন্দভাবে বহন—সেদিকের নেই নাম গন্ধ!

——

হিসাব-নিকাশ

আমাদের দেশে কথা আছে,—নেই কাজ তো খই ভাজ! খই-ভাজার সখ ক'জনের থাকে? বিলাতে বেশ মগজওয়ালা মানুষজনও নানা রকম হিসাব-নিকাশ করেন—খই ভাজেন না। সমুদ্দুরের ঢেউ গোণা—মানুষের মাথায় কত চুল, তার হিসাব কষা—এ-সবেও অনেকের সখ আছে, এবং সে সখ মেটাতে তাঁরা সময় ও শক্তি ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন না। সাম্প্রতি এক পণ্ডিত—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হিসাব কষে বলেছেন—আমাদের মধ্যে যাঁদের বয়স ষাট বছর উত্তীর্ণ হয়েছে—এবং সুস্থ সবল কর্মী মানুষ যিনি—ছেলেবেলা থেকে ষাট বছর বয়স অবধি ভাত—ডাল—ব্যঞ্জন—লুচি পুরি মিষ্টান্ন প্রভৃতি যে-খাদ্য খেয়েছেন, ওজন করলে সে-ওজন দাঁড়াবে প্রায় বারো টন—শুধু মাছের পরিমাণ হবে পাঁচ টন। আর জল, দুধ প্রভৃতি তরল পানীয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৯৬০০ গ্যালন। সৌখীনরা পঞ্চাশ বছরে যে সিগারেট পোড়ান—হিসাব কষলে তার দাম দাঁড়াবে মোট চার-পাঁচ হাজার টাকা! দেখবে নাকি মিলিয়ে হিসাব?

——

মধুচক্র

বৈশাখ মাস থেকে যে পদ্ধতিতে কাজ করবার কথা বলেছিলাম, কয়েকটি বিশেষ কারণে তা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই মাস থেকে সেইমত কাজ করার চেষ্টা করছি—আশা করি তোমরা আমায় এখন থেকে নিয়মিত সাহায্য করবে।

তোমরা ইতোমধ্যেই খবর পেয়েছ স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম ও প্রধান শিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ ৭৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত জীবনী কোলকাতার প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকাই বার করেছে। তাঁর এই ৭৩ বৎসর সুদীর্ঘ জীবনের কোন ঘটনাই আমরা সাধারণ বাঙ্গালীরা জানিনা, তবে যাঁদের ভাগ্য অত্যন্ত ভালো, তাঁদের পক্ষেই তাঁর দর্শনলাভ করা সম্ভব হয়েছিল—প্রায় তাদের মুখেই শুনতে পাই যে, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন, কিন্তু তাঁর অমায়িক ব্যক্তিত্ব ও উদার সহানভূতি সকলের চিত্তকে সহজে আকৃষ্ট করেছিল। সম্মান, খ্যাতি ও যশের সর্বোচ্চ শিখরে বসেও তিনি তাঁর প্রত্যাহিক জীবনকে অত্যন্ত কৃচ্ছতাপূর্ণ ও অনাড়ম্বর করে রেখেছিলেন।...১৯১৫ সালে হিমালয়ের গভীর অরণ্য-প্রদেশে তিনি শ্যামলাতাল নামক স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ধর্মপোদেশগুলি "পরমার্থ প্রসঙ্গ" নামে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীতে প্রকাশিত হয়েছে।.. তাঁর পুত আত্মার প্রতি আমরা স্পর্শহীন প্রণাম জানাচ্ছি।

এবারে তোমাদের মজার লেখা দিচ্ছি। এর জবাবটি তোমরা ঠিক হিসেব করে পাঠিও—যাতে করে যারা জবাব দেবে তাদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়।...এটি পাঠিয়েছে শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী (কোলকাতা)।

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি,
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা,—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল, হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দু'বেলা সেই এ-সংসারের চলতি ছবি দেখা
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার ইস্‌টেশনে একা।

তোমাদের একটা সুসংবাদ জানাচ্ছি। মৌচাকের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমায় জানিয়েছেন যে, মজার খেলার জবাব সবচেয়ে বেশী যে দিতে পারবে তিনি তাকে ১০৲ দশ টাকার বই উপহার দেবেন। ১৩৫৮ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত ছটা মজার খেলা বেরুবে।

মধুদি'র উত্তর—বিভা (লক্ষ্ণৌ)—তোমার দীর্ঘ চিঠি পেলাম। মৌচাক ভিঃ পিতে হয়তো এতদিন চলে গেছে—যদি না গিয়ে থাকে তা'হলে সম্পাদক মশাই-এর নামে একটা চিঠি লিখো। রত্না রায়ের ঠিকানাও ঐ সঙ্গে চেয়ে পাঠিও। **সুলতা লাহিড়ী** (কোলকাতা)—তুমি নৃপেনবাবুকে 'বন্ধুর চিঠি' লিখতে অনুরোধ করেছ, তা আমি সম্পাদক মশাইকে জানিয়ে

দিয়েছি। বিয়ের খবর সত্যি কি মিথ্যা বা প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানিনা—তাই সঠিকভাবে জানাতে পারলাম না। লেখাগুলি সম্পাদকীয় দপ্তরে দেওয়া হয়েছে। **মঞ্জুলা ঘোষ** (লক্ষ্ণৌ)—তুমি বুঝি বিভার বন্ধু? তাই বলো। তিনমাস ছুটি তো ফুরিয়ে এলো—এবার তো খবর বেরোবে—নিশ্চয় ভলো খবর শুনবো। কেমন করে তিনমাস কাটলো পরীক্ষার পর—একটু লেখো না দেখি। **দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (কৃষ্ণনগর)—লেখার সময় অত তাড়া কিসের? চিঠি লেখাটা একটা আর্ট; যত সুন্দর করে ভালোভাবে লিখতে পারো—ততই ভালো ও উন্নতি হবে। তোমার উত্তর ঠিক হয়েছে। **নমিতা** ও **সুশান্ত গুপ্ত** (কোলকাতা)—তোমাদের লেখা সম্বন্ধে সম্পাদক মশাইকে লিখে খোঁজ নিও। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার কবিতায় লেখা চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম—চমৎকার লেখা ও আঁকা। আমার প্রীতি ও শুভকামনা তোমাদের জন্য সব সময় আছে। **জয়ন্ত বসু** (লক্ষ্ণৌ)—এবার দেখি লক্ষ্ণৌর ডাক ভারী! ভাল আছ তো? **বন্দনা দাস** (বালুরঘাট)—তুমি নতুন করে সভ্য হবে? বেশতো একটা চিঠি সম্পাদক মশাইকে লিখো বা যে ভাবে টাকা পাঠাবে লিখেছ, সে ভাবেও পাঠাতে পারো। **পরেশ** ও **বীরেন** (তেজপুর)—মৌচাকের গ্রাহক হওয়ার মানেই মধুচক্রে যোগদান করা—অতএব সে জন্যে কিছু চিন্তা কোর না। তোমরা নিয়মিত মৌচাকের উৎসাহী গ্রাহক এবং পাঠক হও এটাই আমার কাম্য। **সুব্রত ত্রিপাঠী** (মেদিনীপুর)—তোমার চিঠি অনেকদিন বাদে পেয়ে ভালো লাগল। তোমার তোলা ছবিটিও পেলাম; অন্যটি যথাস্থানে পৌঁছে দিলাম। আমার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছ সেটা প্রশ্নেই থেকে যাক—উত্তর পেয়ে গেলে কৌতূহল কমে যাবে। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার মজার খেলাটি আবার পাঠিও—আমি সম্ভবতঃ হারিয়ে ফেলেছি। তোমার ধাঁধা ও কবিতা-প্রতিযোগিতার কবিতাটা পাঠিয়ে দিলাম। তোমার অভিমান-ভরা চিঠির জবাব আরো বড় করে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেন দিলাম না জানো? তোমার চিঠি উত্তর না দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। যদি কোন চিঠি আমার হাতে না পৌঁছয়, আমি কি করবো বলো? **শুক্লা সরকার** (ওয়ালটেয়ার)—না না, তুমি ভুল বুঝেছ। মৌচাকের গ্রাহক হলেই মধুচক্রে যোগদান করতে পারবে। ঐ আট আনাটা আমরা অন্য কাজে ব্যয় করার জন্যে মধুচক্রের ভাই-বোনেদের কাছ থেকে নিয়ে থাকি। মজার খেলার জবাব আসছে মাসে জানতে পারবে। **অরুণ চক্রবর্তী** (কোলকাতা)—তোমার মজার খেলাটি এবারে প্রকাশিত হোল, এ জন্য ধন্যবাদ চাও নাকি? তোমাদের যাদের চিঠি পেয়েছি—**বুলু চক্রবর্তী** (কলকাতা) —**পিণ্টু মজুমদার** (লক্ষ্ণৌ)—**অলক সেন** (কোলকাতা)—**গোপাল পাল** (কলকাতা)—**মিতা রায়** (কলকাতা)—**ব্রততী মুখোপাধ্যায়** (কলকাতা)—**প্রণতি রায়চৌধুরী** (কলকাতা)।

আচ্ছা আজ এইখানেই। আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। ইতি—

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

গত বৈশাখ মাস থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে, আগামী ১৫ই ভাদ্র শেষ হবে। যে কোন লোক এই প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠিয়ে পুরস্কার পেতে পারেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ফটো গৃহীত হবে।

শ্রাবণ—১৩৫৮

৩২শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

পদ্মমালা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

*

গাঁয়ের নামটি পদ্মমালা, চারদিকে তার বিল ;
মাছের লোভে উড়্ছে কত মাছরাঙা আর চিল ;
পাঁপড়ি মেলে দুল্ছে জলে হাজার শতদল ;
পদ্মবনে করছে খেলা বুনো হাঁসের দল ;
কালো জলের ধারে ধারে 'বোরো' ধানের শিষ ;
ঢেউ খেলিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় নাচে অহর্নিশ ;
স্বচ্ছজলে সাঁত্‌রে চলে ডানপিটে সব ছেলে ;
সকালবেলায় জাল ফেলে যায় গাঁয়ের যত জেলে ;
মাঠের পরে মাঠ গিয়েছে দিক্‌চক্রবালে ;
লেজ দুলিয়ে ফিঙে ডাকে বাব্‌লা গাছের ডালে ;
ঊর্ধ্বে বিরাট আকাশখানা সোনার রোদে ভরা ;
ঠিক যেন এক মস্ত বড়ো উপুড়-করা কড়া।

পদ্মমালার সবুজ মাঠে গো-মহিষের ভীড় ;
ঘরে ঘরে মেলে সেথায় দুগ্ধ-ছানা-ক্ষীর ;
গাঁয়ের চাষী মাঠে মাঠে ফলায় সোনার ধান ;
দুপুরবেলা ঘরে ঘরে চরকা করে গান ;
খট্‌খটিয়ে চল্‌ছে মাকু, ঘর্‌ঘরিয়ে যাঁতা,
পদ্মমালায় পদ্মাসনার আসনখানি পাতা ;
কেউ কাহারও সাথে সেথায় ঝগড়া করেনাকো ;
প্রাণের সাথে প্রাণ মিলিয়ে জাগে প্রীতির সাঁকো।

* * *

হায়রে কোথায় হারিয়ে গেলো পদ্মমালা গ্রাম !
নাই সে শোভা, আছে কেবল পুরানো সেই নাম।
মজে-যাওয়া বিলটিতে আজ গোরু-বাছুর চরে ;
ঘরে ঘরে মানুষ প'ড়ে হাড়-কাঁপানো জ্বরে ;
শিল্প গেছে রসাতলে, শিল্পী কলের কুলি।
চুলির কাঁধে ভিক্ষাঝুলি কে দিলো রে তুলি।
চরকা যেথায় চল্‌তো সেথা ঝগড়া শুধু চলে,
লক্ষ্মীদেবীর আসন গেল তলিয়ে অগাধ জলে ;
মালার কুসুম শুকিয়ে গেছে, পদ্ম গেছে ঝ'রে ;
পদ্মমালার নামটি আছে, প্রাণটি গেছে ম'রে।

কলিকাতার রাস্তা ঃ বারানসী ঘোষ স্ট্রীট—বারানসী ঘোষ ছিলেন সনামধন্য স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ শান্তিরাম সিংহের জামাই। তিনি ছিলেন কলকাতার কালেক্টরের দেওয়ান। বারানসীর ভাই বলরাম ঘোষও ছিলেন চন্দননগরের গভর্ণর ডুপ্লের দেওয়ান। বলরামের নামেও রাস্তা আছে, শ্যামবাজারে—বলরাম ঘোষ স্ট্রীট।

বনে-জঙ্গলের খবর এবার বিশেষ করে তোমাদের জন্যে দিচ্ছি। তোমাদের রঙীন মনের হালকা গতির সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য কি আর আছে আমার ? তোমাদের মন চলে আকাশে ভেসে, ফানুসের মত ; কত রং বেরং-এর চমক্ ধরে তাতে ! তোমরা চাও পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে পরীর রাজ্যে ক্ষীরনদীর পাশে রূপার গাছে বসা সোনার টিয়াকে, যেখানে কুঁচবরণ রাজকন্যা তার মেঘবরণ চুল এলিয়ে, তাকে একটা একটা হীরের আঙুর খাওয়াচ্ছেন, সেই কাহিনী শুনতে। আর নয়ত সোনার হরিণ পাবার লোভে, একলা পেয়ে, সীতাকে চুরি করে নিয়ে পালাবার সময় জটায়ু পাখী রাবণকে বাধা দিতে গিয়ে কি করে বীরের মত যুদ্ধে মরে যায়,—সেই সব গল্প শুনতে। এদের কাছে যদি বলতে যাই কি করে হরিণ যে পথ দিয়ে ঝরণার জল খেতে যায় সেই পথের ধারে ওত পেতে বাঘ লুকিয়ে থাকে, আর হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে হরিণের ঘাড় মটকে তার তাজা রক্ত পান করে, অথবা প্রবীণ অজগর সাপ খিদের চোটে অনেক দিনের ঘুম থেকে জেগে উঠে শুখ্নো পাতার মধ্যে লুলিয়ে মিসে থাকে, আর শূয়োরের বাচ্চা যখন তার পাশ দিয়ে কচুর মূল খুঁজতে খুঁজতে চলে আসে, কি করে তাকে জড়িয়ে ধরে হাড় গুঁড়িয়ে মেরে ধীরে ধীরে আস্ত গিলে, হাড় মাংস সমেত হজম করে বসে !—বিকট এসব ছবি তোমাদের সামনে তুলে ধরলে বনের খবর জানবার কোনও আগ্রহ আর কি হবে ?

আমাদের ছোটবেলায়, রোজ সন্ধ্যায়, ঠাকুরমার কাছে যেমন শুনতাম রূপকথার গল্প, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, তেমনি ঠাকুরদাদা মহাশয়দের কাছে শুনতাম হাতী ধরার গল্প, আর বাঘ ভালুক কি ভাবে তাঁরা বল্লমের ঘায়ে বধ করতেন তার সব রোমাঞ্চকর কাহিনী। রাত্রিতে এই সব রূপকথার গল্প আর বনে-পাহাড়ের কাহিনী ঘুমের মধ্যে ধরা দিত "আষাঢ়ে স্বপ্নের" রূপ নিয়ে। আমাদের ছোটবেলার জীবন গড়ে উঠেছে গ্রামের সহজ আবহাওয়ায়—গ্রাম, শহরের আগুনের হলকায় তখন এমনভাবে ঝলসে যায়নি—গ্রাম তখন ছিল তাজা। মানুষের মনে আনন্দের সহজ উৎস তখনও ছিল মুক্ত। অমন আনন্দের পরিবেশে আশপাশের প্রকৃতির সঙ্গে জানাশোনা করে নেওয়াটাই ছিল আমাদের জ্ঞান-বিকাশের প্রথম সোপান। তাই "বুলবুলিতে ধান খেয়েছের" আজগুবি, কিম্বা "হস্তী শাবক শুঁড় দিয়া মাতৃ-দুগ্ধ পান

করে" এর অলীকত্ব ধরতে কোনও অসুবিধা হ'ত না। ফলে, ছাপান সবই যে সত্য নয় তা ছোট বয়সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে বুঝে নিতে পেরেছিলাম।

ছেলেবেলার কথা বেশ মনে আছে। বর্ষা শেষ হ'ল, আর কত রকমারি মাছ লোকজন টাল করে এনে ফেলত শরতের রোদে ঝলমল আঙিনার মাঝে। নদী থেকে ধরে আনা মাছ তখনও লাফাচ্ছে—কি রং, আর কি-ই বা তাদের রূপের বাহার! নামই বা কত রকমারি—লাচ, চিলনা, দারি, পুঠা, তরুজা, নানীদ, কাউনীয়া, ইংলা, বাচা, কালীয়া, মহাশোল, রুই, কাৎলা, শিলোন—আরও কত কি? শীতের সময় ধান কাটা সারা হলে কত রকমারি বাঁশের খাঁচায় পুরে আনত রং বেরং-এর সব পাখী। মধ্যে মধ্যে খড়ে-ঢাকা বিচিত্র খাঁচায় নিয়ে আসত "কয়ার" (marsh parrtidge)। এসব পাখী কোথায় থাকে, কি করে এদের ধরে আনে, এসব জানবার কি ইচ্ছাই হ'ত! রং চড়িয়ে যখন কেউ এসব কাহিনী আমাদের বলত, তখন তা শুনে ভারী মজা লাগত—কেবলি ভাবতাম, কবে আমরা এসব নিজের চোখে গিয়ে দেখতে পাবো?

একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে—জগমোহন আমাদের বাড়ীর পিছনে, নদীর ধারে বুলবুলি শিকার দেখাবে বলে নিয়ে চলল। সঙ্গে নিল একটা নারকোলের মালার মধ্যে জল ঢেলে তাতে এক ডেলা বটের আঠা—দেখতে গলান মেটে রং-এর রবারের মত—হাতখানেক লম্বা কয়েকটা সরু বাঁশের কাঠি, এক শিশি সরষের তেল, এবং একটা মাছ রাখার চুপ্‌ড়ী। জগমোহন আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের পরম বন্ধু লোক—গাছের ফল পাকলে তার সাহায্যে সেটা সংগ্রহ করি, পাখীর বাচ্চা বড় হলে তাকে উপযুক্ত সময় নামিয়ে এনে খাঁচায় পোরা—গাছ, ফল, পাখী এসবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার যোগ্যতা ছিল তার অসাধারণ। ছাড়া বাড়ীর পিছনের পুকুরে পুঁটি আর ট্যাংরা মাছ ধরার শিক্ষালাভ এত তার কাছেই সর্বপ্রথমে হয়। সে আমাদের সকলের মন জয় করেছিল, বন-জঙ্গল সম্বন্ধে নানা রকম সম্ভব এবং অসম্ভব গল্প বলে। তার কাছে প্রথম পাখী ধরার অভিজ্ঞতা লাভ করতে চলেছি। সেদিন ছিল কার্তিক মাসের এক সকাল—সবেমাত্র গাছের নীহার সব শুকিয়ে এসেছে, রোদের তাপে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কালো আর শাদা বুলবুলি মাঝে মাঝে দু'একটা সবুজ হরোয়া কিম্বা সক্কড় খোড়া, অথবা দুই চারটে ছোট ছোট নাম-না-জানা রং বেরং-এর পাখী এ-গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে, তারপর আর এক গাছে, হল্লা করে ঘুরে ঘুরে পাকা ফল কিম্বা ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে। একটা গাছ লাল ফলে ভরে আছে—গোছা গোছা সাজান ফল দূর থেকে ফুল বলেই মনে হচ্ছিল। বুলবুলির

দল এইগুলিই ভিড় করে খাচ্ছিল।—তাছাড়া "দাঁতই ফল", "আইভয়ের গোটা", "মামার লাডু", "বানিয়া জান", "সেওড়ার বীচি" প্রভৃতি কত ফলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল—যার পাকা ফল বুল্‌বুলির ঝাঁক খুঁজে খুঁজে বার করে খাচ্ছিল। এর মধ্যেও হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি। একটা গাছে "চয়রা বয়রার" পরগাছা ঝেঁকে অকালে কমলা রং-এর ফুল ফুটেছে, মধু-খোর সব পাখী তারই দিকে ঝুঁকেছে। ছোট পাখী আর প্রজাপতির ঝাঁক মিলে রং-এর ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল—বাহারে ফুলে-ঢাকা সবুজ গাছটা ঘিরে। মগডালে বসে রোদে গা-ভাসিয়ে একটা হরোয়া কত সুরেই যে গান গেয়ে চলেছিল।

আমাদের একটা সুবিধামত ঝোপের ছায়ায় বসিয়ে জগমোহন বাঁশের কাঠিগুলিতে আঠা জড়িয়ে নিলে। তারপর এক একটা কাঠি ভিন্ন ভিন্ন গাছে এমনভাবে রাখল যাতে পাকা ফল খেতে এসে বুল্‌বুলি তাতে বসে। বুল্‌বুলি ধরাই উদ্দেশ্য তাই মধু-খোর পাখী যাতে খামোকা এসে না আটকে পড়ে সেইভাবে কাঠি পেতে জগমোহন আমাদের পাশে এসে জায়গা নিলে। হঠাৎ এক কাণ্ড হ'ল। সামনের "আইভর" গাছটায় যে ঝুঁটি উঁচু বুল্‌বুলি জোড়া এসে বসেছিল, তার মধ্যে বড়টা যেই ফল খাবার লোভে ডালের মাথায় বসতে যাবে, অমনি এ তার কি হ'ল? তার পা যে ডাল থেকে আর খুলতে পারছে না—যতই প্রাণপণ চেষ্টায় ডানা ঝাপটাতে লাগল, ততই আঠায় তার ডানা আর লেজ জড়িয়ে এক করুণ দশা হ'ল! সঙ্গের পাখী ভয়ার্ত শব্দ করে যখন অন্য সব বুল্‌বুলির ঝাঁককে সতর্ক করল, তখন পাখীর ঝাঁক তুমুল কাকলী করতে করতে দূরের গাছের দিকে উড়ে চলে গেল। জগমোহন হাতের তলায় তেল মাখিয়ে দৌড়ে গিয়ে পাখীটাকে আঠার বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে, চুপ্‌ড়ীর মধ্যে পুরে, চুপ্‌ড়ীর মুখ গামছা দিয়ে এঁটে বেঁধে দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আরও দু'তিনটে পাখী ধরে সে বলল, "রোদ বেড়ে উঠেছে, আঠা গলে ঢিলে হয়ে গেছে, এখন এতে পাখী ভাল করে আটকাবেনা,—আটকালেও পালকে এমন ভাবে আঠা জড়িয়ে যাবে যে, পাখী তাতে নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই আজকের মত শিকার খতম।" অল্প সময়ের মধ্যেই জগমোহন সব কাঠি নিয়ে এসে তা থেকে আঠা খুলে রাখল জলভরা মালাতে। চুপ্‌ড়ীর মধ্যে বন্দী পাখী ক'টা মুক্তির পথ খুঁজে পাবার জন্য ঝটপট্ করছে—মুখ-বাঁধা চুপড়ী তখন ছেলেদের হাতে হাতে ফিরছে। আমরা যখন আনন্দের কোলাহলে হৈ হৈ করে বাড়ী ফিরলাম, আমাদের শিকারে সাফল্যের কথা বাড়ীময় রাষ্ট্র হতে মোটেই সময় লাগল না। কিন্তু সেদিনকার সেই যে প্রথম শিকারের নেশা মাথায় ঢুকল, আজ মাথার চুলে পাক ধরেছে, পৃথিবীর উপর দিয়ে কত পরিবর্তনের বিপর্যয়কারী ঝড় বয়ে গেল, ব্যক্তিগত জীবন তাতে কতই মোচড় খেল, কিন্তু তবুও বন-জঙ্গলের ডাকে পাগল-করা নেশা আজও কাটিয়ে উঠতে পারলাম কই!

সত্যিকার বনের ডাক প্রথম যেদিন মনের উপর গভীর রেখাপাত করে গেছে সেদিনের একটি কথা বলেই আজকের কাহিনী শেষ করব। গাড়ো পাহাড় থেকে আমাদের বাড়ী মাত্র তিন মাইল দূরে। যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আমার জন্ম তা'তে, তখনকার দিনে, গ্রামের বাইরে মাঠে কদাচিৎ হাতী চড়ে বেড়াবার সুযোগ পেতাম। সেই অবসরে মেঘে ঢাকা নীল পাহাড়ের ঢেউয়ের সামনে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ, তারও আগে মাঠে এসে মিসেছে বড় বড় গাছে ঢাকা ছোট সব পাহাড়ের সার,—এ-সব স্পষ্ট দেখতে পেতাম। এই পাহাড়ের ঢেউ মনের মধ্যে তখন কি রূপ নিয়ে দেখা দিত আজ তা সব ঠিক মনে পড়ে না। তবে আমাদের শৈশবের এবং বাল্যের অনেক কল্পনাই যে এই পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই। অবছা-স্মৃতিতে যা ধরা পড়ে তা'তে মনে হয়, ছেলেবেলায় ভাবতাম, ওটা বহু অদ্ভুত জানোয়ার-ভর্তি ভয়ঙ্কর জায়গা হলেও, সেখানে নদীর ধারে পাথর বিছান জায়গায় ময়ুর এসে নাচে, গাছে গাছে হাজারো রকম রং বেরং-এর পাখী এসে ব'সে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় গান গায়, আর পরগাছার ফুল যখন ফোটে তখন নানা রং-এর প্রজাপতির ঝাঁক তার চারদিক ঘুরে মধু খায়—বালুর চরে হরিণের দল জ্যোৎস্না রাতে খেলে বেড়ায়, আর পরীরাজ্যের ছেলেমেয়েরা চাঁদনী রাতে এসে সোমেশ্বরীর কাঁচের মত জলে স্নান করে, সাঁতার কাটে আর বালির চরে উঠে হরিণ শিশুর গলা জড়িয়ে ধরে খেলা করে! কিন্তু বড় না হলে পাহাড়ে যাওয়া যায় না। বীর শিকারীরা সেখানে বাঘ ভালুক মারে, হাতী ধরে। ছোটদের পক্ষে পাহাড়ে যাওয়া নিষেধ। গারো ছেলেরা প্রায়ই পাহাড় থেকে ধরে এনে দিত শ্যামা, দামা, হরোয়া, সোনাকানি ময়না, ভিমরাজ, মেরগঞ্জ, গোলাপচসম, লটকন, মদ্না, শিকু, টিয়া, রাজধনেশ প্রভৃতি পাখী, আর মাঝে মাঝে দুই একটা উলুক, খরগোসের ছানা অথবা হরিণের বাচ্চা। তখন কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পাহাড়ই হয়ে উঠত পরম আকর্ষণের কেন্দ্র। কত সময় মনে হ'ত হাজং আর গারো ছেলেরা ত' ঐ পাহাড়েই ঘুরে বেড়ায়, তাদের ত' কই কোনও ভয় করে না। তবে আমরা কেন সেখানে তাদের সঙ্গে যাই না?

পাহাড়ের খুব কাছে কখনও যাইনি। তাই প্রথম যেদিন সত্যিই পাহাড় ছুঁয়ে এলাম সেদিনকার কথা আজও বেশ মনে পড়ে। তারই কথা লিখছি।

পৌষ মাস। গারো পাহাড়ের নীচের মাঠে সোনার ধান সব পেকে গিয়েছে, প্রায় ক্ষেতেই ধানকাটা সারা হয়েছে। বাবা কাকা মহাশয়দের সঙ্গে হাতী চড়ে যাচ্ছি, আমাদের "ভারুই শিকার" দেখানর ব্যবস্থা হয়েছে। এখন তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ 'ভারুই' আবার কি জিনিসরে বাবা? একথা জানার কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই, তোমাদের

মধ্যে যারা "ভারুই" কোনদিন দেখনি, তাদের কাছে এর পরিচয় দেওয়া দরকার। "ভারুই" একরকম পাখী। সংস্কৃত ভাষায় এদের নাম "লাব"। কলকাতায় এরা "বটের" নামে পরিচিত। প্রদেশ ভেদে এদের চেহারার কিছু তাফাৎ দেখা গেলেও, ভারতবর্ষের সর্বত্রই জঙ্গল আর পাহাড়ের কাছে শীতকালে প্রায় ধানক্ষেতেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় প্রায় ৫½" থেকে ৮½" ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। যারা তিতির দেখেছ তাদের এই পাখী চেনাতে হলে বলব, এরা দেখতে অনেকটা তিতিরের বাচ্চার মত। যারা তিতির দেখনি তাদের কাছে সহজে বোঝাতে হলে বলব, বটের দেখতে অনেকটা লেজ-ছাঁটাই ঘুঘুর বাচ্চার মত। নিরীহগোছের চেহারা। উই, ধান, ঘাসের বীজ, ছোট ফড়িং এইসব এরা খায়। এদের মধ্যে এক শ্রেণী খট্‌খটে জায়গায় থাকে, আর কতক একটু স্যাঁৎ-সেঁতে জায়গায় থাকতে ভালবাসে। স্নান করে শুক্‌নো বালিতে—মাটির উপর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে পালায়। ওড়বার শক্তি কম। পালাবার সময় খুব উঁচু দিয়ে অনেক দূর পাল্লায় যেতে পারে না, খানিক দূর সোজা গিয়েই ঝুপ্‌ করে বনের ঝোপে ঢুকে পড়ে। প্রথম ওড়ে প্রায় পায়ের নিচে থেকেই। গর্তে লুকিয়ে গেলে খুঁজে বার করা কঠিন। বসন্তের শেষে পাহাড়ে কিম্বা উঁচু শুক্‌নো জায়গায় ঘন ঝোপের মধ্যে ডিম পাড়ে—বাচ্চা তোলে। এদের মাংস খুব সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর। কলকাতায় হগ্‌ সাহেবের বাজারে বারোমাস কিনতে পাওয়া যায়—পশ্চিম থেকে খাঁচায় ভর্তি চালান হয়ে আসে। সৌখিন লোকেরা অনেক দাম দিয়ে কিনে খায়। পশ্চিমে তিতির পুষে যেমন লড়াই দেখান হয়, তেমনি বটেরও লড়াই দেখানর জন্যে কেউ কেউ পোষে। সব চেয়ে বড় জাতীয় পুষ্ট ভারুই ওজনে সাড়ে চার আউন্স পর্যন্ত হয়—আর সব চেয়ে ছোট জাতীয় ভারুই-এর ওজন হয় দেড় আউন্স। শীতের সময় যেমন কতক পাখী বরফের দেশ থেকে চলে আসে এদেশে, তেমনি কয়েক রকম ভারুইও এ দেশে শীত কাটিয়ে বসন্তের শেষে চলে যায়—হাজার হাজার মাইল দূরে, সেই বরফের দেশে, কত পর্বত আর নদী-নালা পার হয়ে। তখন তাদের ওড়বার এত শক্তি কি করে হয় তা ভাবলে আবাক লাগে।

সুসঙ্গ অঞ্চলে তিন রকমের বটের পাওয়া যায়: "বাতেক", "লাউয়া" ও "পানীয়া লাউয়া"। বাতেক্ দেখতে অতি চমৎকার, কিন্তু আকৃতিতে ছোট। ধাড়ী মদ্দার রং ছাই-ছাই হালকা নীলাভ, বুকের তলায় খয়েরী, পেটের দিকটা কালো, চোখ ও কানের কাছে শাদা, গলায় একটা কালো কণ্ঠি, উড়বার বড় পালক কয়টার রং খয়েরী, ঠ্যাং কমলা রং। লাউয়া গুলোর রং হালকা খয়েরী, চোখের দিকটা শাদা, গলায় ফিকে খয়েরী কণ্ঠি, মদ্দা ও মাদীর রং

প্রায় একই। "পানীয়া লাউয়া"র—ঠোঁট অপেক্ষাকৃত বড়, চোখ কিছু উগ্র, রং খয়েরী, সারা গায়ে কালো খয়েরী দাগ। এদেরও মদ্দা-মাদীর রং প্রায় একই। এই ত' গেল এদের সাধারণ পরিচয়। এখন আসল কথায় ফেরা যাক।

আমরা উত্তর দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই মনে হ'ল নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড় ক্রমশঃ যেন কাছে এগিয়ে আসছে। আমরা যে হাতীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিলাম, তার ঠাকুরমাকে আমাদেরই ঠাকুরদাদা সামনের গারো পাহাড় থেকে এক খেদায় ধরে এনেছিলেন। এ মনে করতে তখন বড়ই মজা লাগছিল। পাহাড়ের এত কাছে সেই আমরা প্রথম এসেছি—আনন্দের দোলায় শরীর মন যেন উপচে পড়ছে। মনে হচ্ছিল বনে ঢুকলেই বাঘ, মোষ, হরিণ আরও কতকি দেখতে পাবো। এমনও ভেবে খুব উত্তেজনা বোধ করছিলাম, হঠাৎ যদি একটা বাঘ কিম্বা হাতী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়, তা'হলে তখনি তাকে গেল বছরের অষ্টমীর মেলায় কেনা কেপদার বড় বন্দুক, যা' আমি পকেটে পুরে সঙ্গে করে এনেছিলাম, তার একগুলিতে সাবাড় করে দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেব। অবশ্য বড়দের সঙ্গে প্রত্যেক হাতীতে একটা করে বন্দুক ছিল—তাতে গুলি পোরা ছিল না, আর সেগুলি তখনও ছিল মাহুতের হাতে। সামনের পাহাড়ে কি থাকতে পারে জানবার আগ্রহে বড়দের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে একেবারে হয়রান করে তুলেছিলাম—তাও কি মনের মধ্যে যে সব কথা হিজ্‌বিজ্‌ করে এসে জমায়েত হচ্ছিল তার সব জবাব পাচ্ছিলাম? তাই প্রশ্নের আর শেষ ছিল না।

হাজংগ্রামের সমুখে এসে পৌচেছি, ছোট টীলা প্রায় তিনশ' গজের মধ্যেই এসে গিয়েছে। মাঠের মধ্যে হাজং, গারো এবং আর সব রাখাল ছেলেরা গরুর পাল ছেড়ে দিয়ে নূতন-কাটা ধানক্ষেতের ঘাস খাওয়াচ্ছিল—আর জায়গায় জায়গায় চার-পাঁচ জন ছেলে মিলে ছুটে গিয়ে কি যেন ধরবার চেষ্টা করছিল—পাখীটা "নাড়া" বন থেকে উড়তেই ছেলেরা তার পিছে ধাওয়া করল। সেটা খানিক দূর উড়েই ঝুপ করে যে নাড়া বনে ঢুকলো, সেখানে নিড়িয়ে নিড়িয়ে ছেলের দল তাকে খুঁজছিল। হঠাৎ খুব উৎসাহের সঙ্গে একটা পাখী মুঠোর মধ্যে তুলে ধরে একজন ছেলে বললে, "ময়বাতেগ্‌রা পাছে"। এই বলে আর একটা ছেলের হাতে যে খাঁচাটা ছিল তার মধ্যে যেই সেটাকে পুরতে যাবে, অমনি আর একটা পাখী তার পায়ের তল থেকেই নাড়া বনের উপর দিয়ে সোজা উড়ে গিয়ে একটু দূরে খড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। তুমুল উৎসাহে ছেলের দল বলতে বলতে ছুটল: "আর এগ্‌রা বাতেক্ ওলাছে-ওলাছে!" আর যেখানে পাখীটা গিয়ে নাড়ার ঝোপে ঢুকেছে সে জায়গাটা ঘিরে উপুড় হয়ে খুঁজতে লাগল। তখনও বুঝতে পারিনি এ কি ব্যাপার চলেছে। বাবা যখন ছেলেটার হাতের খাঁচা-ভর্তি

ছোট ভারুই দেখালেন, তখন বুঝতে বাকি রইল না যে ছেলেদের এত উৎসাহ কেন? আমরাও বোধ হয় এই ভাবে ভারুই শিকার করতে পারব ভেবে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলাম।

আমরা এখানে আসার আগেই দু'জন মাঝি খেওজাল, অর্থাৎ cast net নিয়ে উপস্থিত ছিল; আরও দু'চারজন লোক এসেছিল, তাদের হাতে ছিল খাঁচা। এরা এ সব খাঁচা হাজং ছেলেদের কাছ থেকেই কিনে যোগাড় করেছিল। দুপুর রোদে মাঠে গরুরপাল ছেড়ে দিয়ে রাখাল ছেলেরা উইয়ের ঢিপির উপর বাঁশের ছাতা পুঁতে তার নিচে ব'সে শোলা, শক্ত ঘাস, আর বাঁসের কাঠি দিয়ে রকমারি খাঁচা তৈরী করে—এ সব দেখার মত। এ ছাড়া মাছ ধরার খালুই, মাছ রাখার চুপড়ী, নানারকমের ঝুড়ি প্রভৃতিও বোনে। বাড়ী থেকে পাঠান লোকজন অনেক গারো হাজং ছেলের দল এনে জড় করে রেখেছিল। ধান কাটা প্রায় শেষ হয়ে আসায় মাঠে গরুরপালের অভাব নেই।

এবার আমাদের দলের শিকারের পালা সুরু হ'ল। রাখাল ছেলেরা মিলে একপাল গরু নিয়ে সদ্য-কাটা একটা ধানক্ষেতে তুলে দিতেই পাঁচ ছ'টা ভারুই ফুর্‌ফুর্ করে উড়েই খানিক দূরে "নাড়া" বনে এ-দিক সে-দিকে ঝুপ্ ঝাপ্ করে পড়েই কোথায় অদৃশ্য হ'ল। জেলেরা দু'জন, ভারুই যেখানে গিয়ে পড়েছে, সেই দিকে ছুটে গিয়ে জাল ছড়িয়ে ফেলে ঘিরে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ছ'টা ছেলে এক একটা জালের নিচে ঢুকে বনের মধ্যে খুঁজতে লাগল—হঠাৎ একটা ছেলের হাতের কাছ থেকে একটা ভারুই বেরিয়ে যেই উড়তে যাবে অমনি তার গলা আটকে গেল জালের মধ্যে—ছেলেটা অনায়াসে তাকে ধরে এনে পুরলো খাঁচার মধ্যে। এদিকে আর একটা জালে ধরা পড়লো দুটো ভারুই। সবগুলিই খাঁচায় বন্দী হ'ল। তিনটেই "বাতেক্"—দুটো মদ্দা আর একটা মাদী। এদিকে গরুরপাল নিয়ে রাখাল ছেলেদের বিড়ম্বনার শেষ নেই, নূতন তাজা ঘাসের লোভে তারা ক্ষেপে উঠেছে, কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না—অথচ গরু ঠিকভাবে না চালাতে পারলে ভারুই আগেই উড়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে যাবে। তাই যতক্ষণ না জেলেরা জাল ঠিক করে নিল, ততক্ষণ রাখাল ছেলেদের গরু সামাল দেওয়া এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াল—বিশেষ করে পাকা ধানের ক্ষেত থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখতে বেচারারা নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। এর মধ্যেই দু'একটা পাখী কারুর পায়ের নিচ থেকে উড়ে আবার বেরিয়ে পড়তেই জেলেরা ছুটল তার পিছু—সঙ্গে গেল হুল্লোড় করে ছেলের দল। আবার জাল ছোঁড়া, আবার ভারুই ধরা আর খাঁচায় পোরা। দেখতে দেখতে এক খাঁচা ভর্তি পাখী হয়ে গেল। এর মধ্যে চার-ছ'টা লউয়া ভারুইও ধরা হয়েছিল।

এবার আমাদের হাতী থেকে নামিয়ে দেওয়া হ'ল—ছোটকাকা মহাশয়

আমাদের দলে জুটে গিয়েছেন, কি আনন্দেই মেতে ছিলাম। আমরাও গারো হাজং ছেলেদের সঙ্গে নাড়া বনে ছুটেছি—কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত পা কিছুতেই গরুর ক্ষুরের ঘায় মাটিতে শুকনো সব গর্ত এড়িয়ে যেতে না পারায় ক্রমাগত হোঁচট খাচ্ছি—আর ঘাসের ধারে হাত পা ছ'ড়ে রক্ত বেরুচ্ছে—কিন্তু কিছুতেই উৎসাহের হ্রাস নেই। আনন্দের এই সহজ পরিবেশের মধ্যে কখন যে হাতী-চড়া পোষাকে-ঢাকা আমাদের আর কৌপীন-সার, ধূলোর পাউডারে সর্বাঙ্গ ঢাকা হাজং গারো ছেলেদের মধ্যে ব্যবধানের বাঁধ ভেঙে গেছে তা বুঝতেই পারিনি—সেদিন কেউ আমাদের এসম্বন্ধে সচেতন করে দেবার কোনও চেষ্টাই করেনি। প্রথমে যারা আমাদের দেখে ভীতি ও কৌতুক-মিশ্রিত দ্বিধা-জড়িত দৃষ্টিতে দূর থেকে এড়িয়ে চলছিল এবং আমরাও যাদেক মনে মনে তফাৎ করে রাখছিলাম—কখন যে এই আনন্দের খেলার অবাধ মিশ্রণে সব জড়তা কাটিয়ে সকলে কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল তা টেরই পাইনি! যে ছোট মিষ্টি ছেলেটি অনায়াসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ভারুইয়ের পিছনে ছুটল তাকে আমার প্রিয় বন্ধু এবং একই পর্যায়ের খেলার সাথী ভেবে নিতে এতটুকুও সঙ্কোচ হয়নি আমার। সেদিনকার সেই অকুণ্ঠিত অনুভূতি স্পষ্টভাবে জীবনস্মৃতিতে আজও জাগে—অনাবিল আনন্দের ছোঁয়াচে মানুষের সব কুণ্ঠা, সব অহমিকার দীনতা ঘুঁচে যায়!

এদিকে ভারুই ধরা সমানে চলেছে। হঠাৎ একবার একটা পাখী উড়ে যাবার সময় কোথা থেকে একটা বাজ ছোঁ-মেরে পাখীটাকে নিয়ে টীলার একটা গাছের ডালে বসে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। এর পরে আরও দুই তিনটে পাখীকে যখন এভাবে ধরে নিয়ে গেল, তখন কাকা মহাশয়দের মধ্যে একজন উড়ন্ত বাজটাকে ভারুই সমেত গুলি করে মাটিতে ফেললেন, তা দেখে আমরা ত' অবাক! এর পর আরও একটা বাজ এভাবে মারা হয়েছিল। বাড়ীর বাইরে বন্দুকের গুলিতে শিকার করতে দেখা এই প্রথম; সুতরাং এ ঘটনা অবিস্মরণীয়। পরবর্তী জীবনে উড়ন্ত পাখী শিকারের প্রেরণা বোধ হয় এ থেকেই পেয়েছিলাম। সেদিন বাজ পাখী মারতে দেখে মনে একটুও কষ্ট বোধ হয়নি, এবং এই ভেবে ভাল লাগছিল যে, বাজ যেমন দুষ্ট পাখী তার উপযুক্ত সাজাই হয়েছে। কিন্তু সেদিনকার আর একটা ব্যাপার মনে এমন দুঃখবোধ জাগিয়েছিল যে, তা আজও ভুলতে পারিনি। জালের নিচে থেকে পাখী ধরতে গিয়ে দুটো পাখী মানুষের পায়ের তলায় একেবারে চেপটে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে গেছে দেখলাম। এই করুণ বীভৎস দৃশ্য মনটাকে ভীষণভাবে বিষিয়ে দিয়েছিল। এর পর দুই খাঁচা যখন ভর্তি হ'ল, তখন সেদিনকার মত ভারুই-শিকার শেষ হ'ল।

ভারুই ধরা শেষ হলে ছেলেরা জিলিপী আর চিড়ে গুড় নিয়ে খুশি মনে লাফাতে লাফাতে কেউ বাড়ী ফিরলো, আর কেউ গরুরপাল সংগ্রহ করে ঘর-মুখে রওনা দিল। হঠাৎ এক রাখাল ছেলে নাড়া বন দিয়ে গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে উঠল: "হাপ, হাপ"! হাতী তাড়াতাড়ি সেখানে নিয়ে যেতেই বাবা গুলি করলেন, একটা ঝোপের মধ্যে। হাতের লাঠিটা দিয়ে রাখাল ছেলে ঝোপের মধ্যে থেকে বের করে আনল গায়ে চাকা চাকা প্রায় দুই-হাত লম্বা একটা সাপ। এ নাকি "চক্রবোড়া" বিষধর সাপ। আমরা খানিক আগেই ত' এসব জায়গায় ভারুইয়ের পিছে তাড়া করেছি! এ কথা ভেবেই কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল।

পশ্চিমের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে, বাড়ী-ফেরা গরুর পালের পায়ে-ওড়া ধুলো আর শীতের কুয়াশায় সূর্যের মুখ ঢেকে এমন গোলাপী রং-এর ওড়না মেলে দিল যে, চারদিকের মাঠ, গাছ আর পাহাড়ের ওপর তার আভার কোমল ছোঁয়াচ লেগে আমাদের মন যেন কেমন একটা আরামের আবেশে ভরে উঠেছিল। লাল আলোর ছটা নীল পাহাড়ের ঢেউয়ের ওপর পড়ে মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল কি অপূর্ব বর্ণজাল সৃষ্টি করেছিল। আমি বিশ্বাস করি প্রকৃতির এমনি একটা শক্তি আছে যে, এর ছোঁয়ায় প্রত্যেক অনুভূতিশীল মন (তা বয়সের কোনও অপেক্ষা রাখেনা) স্পন্দিত না হয়ে থাকতে পারে না। হাতীর পিঠে চড়ে যখন ছোট টীলার উপর থেকে অদূরের সোমেশ্বরী, আকাশ-ছোঁয়া সুদূরপ্রসারী মাঠ, আর পিছনে ঘেরাও-করা পাহাড়ের অপূর্ব শোভা দেখলাম, তখন এ সৌন্দর্যের মোহন পরশে মনে এক নূতন আনন্দের উৎস খুলে গেল। সেদিনকার এ ছবি মনের মধ্যে কি যে গভীর রেখাপাত করে গেছে তা আমিই জানি! চারদিকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে হাজারো রকমের পাখী সব উড়ে এসে বসছে, আর তাদের নানা কলরবে বনানী কি যে শব্দমুখর হয়ে উঠেছিল তা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ এক নূতন অভিজ্ঞতা। বাবার কাছে জানলাম, সূর্য ওঠার সঙ্গে যে সব পাখী দূরদূরান্তরে আহারের খোঁজে চলে গিয়েছিল, তারাই রাতের আশ্রয়ের জন্য এ সব ঝোপঝাপে এসে ঢুকেছে। এ সব জায়গা তারপরও কখনও পুরনো হয় নি। কতবার দেখেছি—এখনও দেশের কথা মনে হলে এই পাহাড়তলীর সেই সেদিনের প্রথম দেখা সন্ধ্যার আমেজ মনকে পেয়ে বসে।

সেই সন্ধ্যায় যখন বাড়ী ফিরলাম, হৃদয় তখন আনন্দে ভরপুর। সেদিনের কথা মনে জাগলে এখনও সেই স্বপ্নলোকের নেশায় চিত্ত অস্থির হয়ে পড়ে।

এঁকে দেখাও
এঁকে, ওঁকে সবাইকে

গত বৈশাখ সংখ্যার মৌচাকে 'এলোপাতাড়ি ছবি' ও 'সোজা লাইনের কারসাজি' নাম দিয়ে ছুটি ছবি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের মধ্যে নমুনা হিসাবে কয়েকখানি ক'রে ছবি ছাপা হয়েছিল এবং সেই নমুনা দেখে তোমাদের ছবি আঁকতে আহ্বান জানান হয়েছিল।

এই আহ্বানে তোমরা অনেকেই সাড়া দিয়েছ সত্যি, কিন্তু একথা ছুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, এই পাঠানো ছবিগুলির মধ্যে বেশীরভাগই আশানুরূপ হয়নি, এবং কতকগুলি খুবই খারাপ হয়েছে। তবু সেইগুলির মধ্যেই কয়েকটি আমরা এখানে প্রকাশ করলাম। বাকী যাদের ছবি প্রকাশিত হ'ল না, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, কোন-না-কোন অংশে তাদের আঁকা ছবিগুলি এই ছবিগুলির
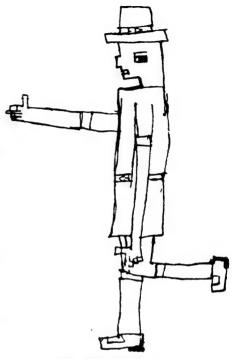
সোজা লাইনে আঁকা ছবি
কুমারী স্বাগতা বসু

'এল' আর 'ও'-তে আঁকা ছবি
কুমারী স্বাগতা বসু
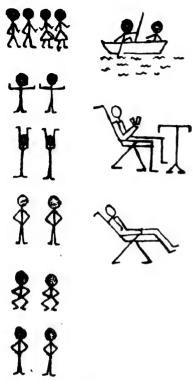
এঁকে দেখাও
এঁকে, ওঁকে সবাইকে

'ও' আর 'এল'-এ আঁকা ছবি
শ্রীশিলাদিত্য চৌধুরী

মত হয়নি বা এদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ হয়েছে। অনেকে আবার ভুল ক'রে পেন্সিলে ছবি এঁকে পাঠিয়েছে, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের প্রত্যেকেরই এটা জেনে রাখা দরকার যে, পেন্সিলে আঁকা ছবির ব্লক ভাল হয় না। তাছাড়া ছবি আঁকার জন্য কাগজ ও কালি আলাদা হওয়া দরকার। একটু মোটা কাগজ এবং একটু গাঢ় কাল কালির প্রয়োজন এর জন্যে। চাইনিজ ইংক্ নামক কালি এ-ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল কাজ দেয়।

এখানে আর এক কথা বলে রাখি। এ সম্পর্কে আর কোন ছবি গৃহীত হবে না, অতএব কেউ যেন ভুল ক'রে আর কোন ছবি পাঠিও না বা পাঠান ছবিগুলি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করো না।
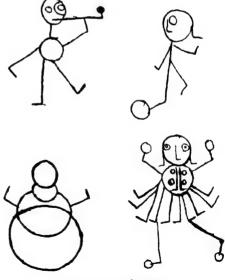
'ও' আর 'এল'-এ আঁকা ছবি
শ্রীনমিতা চক্রবর্তী

তৃণ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

নহ তুমি তৃণ, নহ নগণ্য, সেবাই তোমার ব্রত।
ধরণীরে তুমি রেখেছ আগুলি' আপন মেয়ের মত।
শ্যাম কলেবর ধূলায় লুটায়,—সে ধূলা অঙ্গে মাখি'
আদিকাল হ'তে রেখেছ তাহারে আপন বক্ষে ঢাকি'।
নহিলে কত-না জীব-জন্তু ও প্রাকৃত অত্যাচার—
করিত সতত ক্ষত-বিক্ষত অনাবৃত দেহ তা'র।
রুদ্র অনল গ্রীষ্মে যখন বিশ্ব দহন করে,
তুমিই তখন বাঁচাও তাহারে নিজে পুড়ি অকাতরে।
সেবা তব ব্রত, মহাপ্রাণ তুমি, কে বলে তোমায় ক্ষুদ্র ?
উদ্ভিদ মাঝে যদিও তুমি গো অপাঙ্‌ক্তেয় ও শূদ্র।
তোমারি স্বজাতি, তোমারি সে জ্ঞাতি পেয়েছে শ্রেষ্ঠ মান ;
নিজ শিরোপরে ধরেন তাহারে নিখিলের ভগবান।
তোমারি বংশে, বংশ-গরবে গরীয়ান এক বীর—
সরল সুঠাম মুক্ত পরাণ—গর্বোন্নত শির।
নাহি অভিমান, অপমান জ্ঞান, নিম্নে পড়িয়া থাক'।
সর্ব-জীবের পদধূলি তুমি নিজের মাথায় মাখ'।
বিতরিছ তুমি ভেষজ, অন্ন সারা বিশ্বের লাগি'।
জীব-কল্যাণে অন্তর তব—সতত রয়েছে জাগি'।
বিশ্ব-জগতে নহ তুমি নহ তুচ্ছ অবজ্ঞেয়।
তুমি মহাপ্রাণ, দেবতা সমান, নহ নহ তুমি হেয়।
তোমার মহান্ জীবনাদর্শ চিরদিন যেন স্মরি।
তুমি উপাস্য—তুমি নমস্য—তোমারে প্রণাম করি।

কলিকাতার রাস্তা : দুর্গাচরণ পিতুরি লেন—দুর্গাচরণ ছিলেন সেকালের খুব ধনী কনট্রাক্টার। এই যে ফোর্ট উইলিয়াম আছে কলকাতায়, এর নির্মাণ কার্যের ভার দুর্গাচরণের উপর দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীবিমল দত্ত

রবিবার বিকালের দিকে কলেজ ষ্ট্রীটে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়াতে যাওয়া মানে পুরানো বইয়ের সন্ধানে যাওয়া। এটি আমার ছেলেবেলার বদ্অভ্যাস। ওখান থেকে সস্তায় কত ভাল বই-ই যে কিনেছি তার ইয়ত্তা নেই। বাড়ীতে একটা মাঝারি লাইব্রেরী হয়ে গেছে। সেজন্য বাড়ীর সকলেই আমার উপর বিরক্ত। ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি নিজেদেরই স্থান সঙ্কুলান হয় না, তার উপর আবার গাদা গাদা বই! তাও আবার চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে বই নয়, অধিকাংশই মলাট-ছেঁড়া, রং-জ্বলা, পোকায়-কাটা, ধূলায়-ধূসর। লম্বা, বেঁটে, চৌকো, মোটা...হরেক সাইজ। সাজিয়ে রাখা দুষ্কর। এগুলো আমি কাউকে পড়তে দিই না, ছুঁতে দিই না। সেজন্য সকলের আরো রাগ। পড়তে দিই না—পড়তে নিয়ে গিয়ে ফেরৎ দেয় না বলে বা ছেঁড়া বই আরো ছিঁড়ে ফেলে বলে। ছুঁতে দিই না—তারা বই গুছিয়ে রাখ্‌তে পারে না। দরকারের সময় আমি তাদের পাই না, সেই জন্য। এই বইগুলোই যেন আমার সংসার। এগুলো নাড়া-চাড়া, গোছানো, ধূলোঝড়া—এখান থেকে সরিয়ে ওখানে রাখা, রোদে দেওয়া—এই আমার একটি কাজ।

দিন নেই, রাত নেই—বই মুখে করে বসে থাকি—সকলে সেজন্যে বেজায় বিরক্ত। আমি জার করতে গেলে ঠকে আসি, কোন ঠিকানায় আমাকে পাঠালে ভুল ট্রামে উঠে বিস্তর হয়রানির পর ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসি বা ট্রামে বাসে বসে বই পড়ার নেশায় ঠিকানা ছাড়িয়ে দূরে গিয়ে ডবল পয়সা খরচ করে মরি। কোথাও নেমন্তন্ন খেতে হলে আমার মাথায় বাজ পড়ে। বাড়ীতে কেউ এলে আমি রীতিমত তিরিক্ষে হয়ে উঠি। বাড়ীর কোন

ছেলেপুলেকে আমার কাছে পড়াতে বসালে আমি নাকি এত বাজে গল্প করি যে, পড়ুয়াটির মাথা খেয়ে ফেল্‌তে সামান্য মাত্র বাকী রাখি।

এইত আমার অবস্থা। তবুও বই কিনি। লুকিয়ে কিনি। রবিবার কিপলিং-এর 'ব্যারাক রুম ব্যালাড্‌স্‌' একখানা ভাল সংস্করণ মাত্র এক টাকা ছ'আনার সংগ্রহ করলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এর ধার থেকে। বইটা আমার পড়া, কিন্তু নিজের এককপি না হ'লে কি চলে ? হাতের মুঠোয় ছুনিয়ার দৌলত নিয়ে বাড়ী এলাম।

পড়তে পড়তে রাত হ'য়ে গেল। শেষের দিকে কয়েকটা পাতা পোকায় কাটা দেখে, ডি-ডি-টি স্প্রে করে, আবার খানিক পড়লাম। সুন্দর লাগছিল।...

হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়াল এক অদ্ভুত মূর্তি। তার মুখখানা মানুষের মুখের মত নয়, কিরকম থ্যাবড়া-ন্যাবড়া, বোঁচা-বোঁচা। মাথায় কাগজের হ্যাট্‌, মুখে চুরট, চোখে মাইনাস সেভেন্‌ চশমা।

চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি চাই ? এখানে কেন ?"

মূর্তিটা বল্লে, "আদবকায়দাও জানোনা বুঝি ? রাতদিন পড়লে এমনই হয়; লোকাচার ভুলে যায়।"

—"তার মানে ?"

—"মানে আবার বলে দিতে হবে নাকি ? আমি এলাম তোমার সঙ্গে পরিচয় করতে, তুমি প্রথমে বসতে বল্‌বে; তারপর সৌজন্য দেখিয়ে মিষ্টি মিষ্টি লজেঞ্জুষের মত মুখ করে বল্‌বে—'মশাই, কোথা থেকে আস্‌ছেন ? আমার কি সৌভাগ্য—' ব'লে একমুখ হেসে ছ'হাত কচলাতে থাক্‌বে। এই সব ব্যাপারকে বলে 'এটিকেট্‌'। একবার একখানা বই দেখেছিলাম 'A guide to correct etiquette,' তা'তে এমনি সব কথা আছে। কিন্তু বইটার তেমন কাট্‌তি হ'ল না। শেষটায় আমি একাই তিন হাজার বই কাটিয়ে দিলাম।" এই বলে মূর্তিটা এক ডাঁই বইয়ের উপর বসে পড়লো।

—"ও! আপনি বুঝি বইওলা ?"

—"ছ্যৎ! বইওলা হ'তে যাব কেন ? আমি তোমারই জাত-ভাই।"

—"আপনার নাম ?"

—"মিষ্টার কীট্‌।"

—"কি বল্লেন ? কীট্‌স্‌ ? নাইটিঙ্গেল সম্বন্ধে যিনি একটা ode লিখেছিলেন। অল্প বয়সে থাইসিসে মারা যান ?"

—"যদিও তিনিও একজন আমাদেরই জাত-ভাই ছিলেন। বড্ড বই পড়তে ভালবাসতেন। Chapman-এর Homer পড়ে তিনি এমন আত্মহারা হ'য়ে যান যে, সে সম্বন্ধে একটা চমৎকার কবিতা লিখে ফেলেন। ভাল বই পড়লে অমনি আবেগে মন দু'লে ওঠে। যাক্‌গে, আমি কীট্‌স নই গ্রন্থকীট, বুঝলে ?"

—"গ্রন্থকীট ? বই কাটা পোকা ? যে পোকা আমার 'ব্যারাক রুম ব্যালাড্‌সের' শেষ কয়টা পাতা কেটে দিয়েছে ?"

—"গ্রন্থকীট কি শুধু পোকাকেই বলে নাকি ? তোমার মত রাতদিন যারা বই নিয়ে পড়ে থাকে আর কিপলিং পড়তে পড়তে ঘুমোয় তাদেরও যে গ্রন্থকীট বলে।"

—"কখ্‌খ্‌নো ঘুমোই নি ! কে বল্‌লে আমি ঘুমোচ্ছিলাম ? আমি চিন্তা করছিলাম।"

—"ঘুমানো আর চিন্তা করা একই কথা।"

—"একই কথা মানে ? আপনি ত' সাঙ্ঘাতিক লোক !"

"উঁহুঁ, আমি সাঙ্ঘাতিক পোক। সম্প্রতি আপনার মাথায় প্রবেশ করব।"

সভয়ে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করতে যাই—"মাথায় ঢুকবেন কি ? ও আবার কি রকম আব্দার ?" কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বার হ'ল না।

গ্রন্থকীট তার কাগজের টুপিসুদ্ধ মাথা আমার কানের মধ্যে সজোরে প্রবেশ করিয়ে দিলে। আমার মাথার মধ্যে ওলোট্‌-পালোট্‌, গা-হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্‌, জ্ঞান ক্রমশঃ লোপ।

জ্ঞান হ'লে দেখি আমি এক অজানা অদ্ভুত রাজ্যে এসেছি। এ দেশের পথঘাট, বাড়ীঘর, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সবই কেমন অদ্ভুত। রোদ নেই, একটা আলোর আমেজ সারা দেশটায় ছড়িয়ে রয়েছে।

আমার পাশে রাস্তা দিয়ে একজন লোক হন্‌ হন্‌ করে চলে গেলেন। লোকটির চেহারা আর পোষাক ঠিক টমাস্‌ ব্যাবিংটন মেকলের মত। তাঁর হাতে একখানা খোলা বই, সেই বই পড়তে পড়তে তিনি পথ হাঁট্‌ছেন। আমি পিছনে পিছনে, "হ্যালো মিষ্টার—" বলে দৌড়ালাম, কিন্তু তাঁর নাগাল ধরতে পারলাম না। বইয়ের পাতায় তাঁর মনটা এমন নিবিষ্ট যে আমার ডাক বোধ হয় তাঁর কানেই গেল না।

পাশ থেকে কে যেন বলে উঠ্‌ল, "টমাস্‌ ব্যাবিংটন মেকলে। পড়ার অভ্যাসটা ঠিক আছে। পথ হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বই পড়া ওঁর অনেকদিনের অভ্যাস। ওঁর মত দ্রুত কেউ হাঁট্‌তেও পারে না, পড়তেও পারে না।"

ফিরে দেখি সেই গ্রন্থকীট—বেজায় রাগ হ'ল। বল্‌লাম, "তবে না আমার মাথার মধ্যে ঢুকতে গিয়েছিলে ?"

"গিয়েছিলাম ত'! কিন্তু সেখানে দেখি পোকার আণ্ডিল। তাই বেরিয়ে এলুম! দেশটা কেমন লাগ্‌ছে ?"

বিদেশে-বিভুঁয়ে সঙ্গী-সাথী নেই। গ্রন্থকীট যখন অযাচিত এসেছে চটানো ভাল নয়, বিবেচনা করে বললাম, "ভাল, কিন্তু এ কোন্ দেশ ? কেমন করে এলাম এখানে ?"

"ক্রমশঃ সব জানবে। চলো, দেশটা বেড়িয়ে আসি—"

একটু যেতেই দেখি মাঠের উপর বুক পেতে শুয়ে একজন মধ্যবয়সী মেমসাহেব বই পড়ছেন। বইয়ের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান নেই। দূরে জঙ্গলে পাখী ডাকৃছে, ঘাসের উপর দিয়ে ফড়িং লাফিয়ে চল্‌ছে। নীল পাহাড়ের গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের উপর বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুর দিকে তার নজর নেই। শুধু বইয়ের কালো কালো অক্ষরের মধ্যে তিনি ডুবে গেছেন।

গ্রন্থকীট বল্‌লে, "উনি ডরোথি ওয়ার্ডস্বার্থ। উইলিয়াম ওয়ার্ডস্বার্থ বলে যে বিখ্যাত কবি তাঁর ভগিনী। অমনিভাবে খোলা মাঠে উনি বই পড়তে ভালবাসেন। ওঁর দাদা এখনও আসেন নি। হয়ত 'লুসি' সম্বন্ধে কবিতা লিখ্‌ছেন, কিম্বা আরাম-কেদারায় শুয়ে ডেফোডিল্ ফুলের সৌন্দর্যের রোমন্থন করছেন। একটু বাদে তিনি এলে ওঁরা দু'জনে বেড়াতে যাবেন। পাখী, ফুল, গাছ, পাহাড় সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে কত আলোচনা হয় বেড়াতে বেড়াতে। বাড়ীতে ফিরে ডরোথি সেগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখেন।"

"মেকলে, ওয়ার্ডস্বার্থ—ওঁরা এখানে এলেন কি করে ? ওঁরা ত' বেঁচে নেই!"

"সত্যি কথা। এটা বই-পড়ুয়াদের স্বর্গ। গ্রন্থকীট যাঁরা, তাঁরা সৃষ্টিছাড়া জীব। দুনিয়ায় কারো সঙ্গে চালচলনে মিল হয় না। তাই মরবার পর তাঁদের এই দেশে পাঠান হয়। এখানে কেউ তাঁদের বিরক্ত করে না—তাঁরা মনের আনন্দে ইচ্ছা মত বই পড়ে সময় কাটান। ঐ দেখ, গাছের উপর বসে মেয়েটি কি কর্‌ছে—"

তাকিয়ে দেখ্‌লাম একটা মোটা ডালের উপর ব'সে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পাতার আড়ালে গা-ঢেকে একজন মেমসাহেব বই পড়ছেন। ভারী অদ্ভুত ঠেক্‌ল। বল্‌লাম, "উনি বুঝি বই পড়বার আর জায়গা খুঁজে পেলেন না ?

"ঠিক তাই। জায়গা হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের উপর চড়ে বই পড়ার মত মজা

আর কিছুতেই নেই। নির্জন স্থান, কেউ ওঁকে দেখতে পায় না, উনি সকলকে দেখতে পান। উনি হচ্ছেন মিসেস্ হীম্যান্‌স্। গাছে বসে বই পড়া ওঁর একটা বাতিক ছিল।”

—“তা'হলে আমার মত বাতিকও কারো কারো ছিল?”

—“বিস্তর বিস্তর। নেপোলিয়ন যুদ্ধ বিরতির ফাঁকে ফাঁকে গাড়ীর মধ্যে বসে বসে বই পড়তেন, আর বইটা শেষ হলেই জানলা গলিয়ে ফেলে দিতেন। আজকাল রেলওয়ে সিরিজ হয়েছে, এরোপ্লেনে বসে পড়বার জন্যেও হালকা হালকা কাগজে ছাপা সস্তার বই হয়েছে। পড়া শেষ হ'লে ফেলে গেলেও বিশেষ লোকসান নেই।”

বেড়াতে বেড়াতে একটা পাড়ায় এসে হাজির হলাম আমরা। গ্রন্থকীট আমাকে একটা বাড়ী দেখিয়ে বল্‌লেন, “ঐ বাড়ীতে হরিনাথ দে থাকেন। তিনি এখন প্রাচীন চীনভাষা নিয়ে গবেষণা কর্‌ছেন। আর ওঁর পাশে ঐ যে লাল রঙের বাড়ী, ওটাতে থাকেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। উনি ভারী জবর পড়ুয়া ছিলেন। পৃথিবীতে থাকতে পড়ে পড়ে ওঁর চোখের ব্যারাম হয়। উনি মারা যাবার পর রবীন্দ্রনাথ একটা শোক-কবিতা লিখেছিলেন, তাতে একটা পঙ্‌ক্তি আছে, “আজি বাধা কিগো ঘুচিল চোখের? সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত স্বপনলোকের —ইত্যাদি।” এখানে এসে ওঁর চোখ একেবারে ভাল হয়ে গেছে। ঐ দেখ দক্ষিণের জানলার ধারে বসে হেঁট হয়ে উনি পড়াশুনা করছেন।”

“তার পরের বাড়ীতে কি লাইব্রেরী? বিস্তর বইয়ের র‍্যাক আর আলমারি দেখা যাচ্ছে।”

“না, ওটা ‘রবার্ট সাদে’র বাড়ী। সেই যে যিনি লিখেছিলেন, ‘My days among the dead are passed’—প্রাচীন লেখকদের লেখা পড়ে তাঁর দিন কাটে। তাঁরাই ওঁর প্রকৃত বন্ধু,—সুখে-সুখী, দুঃখে-দুঃখী। উনি এখানেও রাতদিন বই পড়ছেন।”

“সকলেই বুঝি এখানকার স্থায়ী অধিবাসী?”

“প্রায় সকলে। মাঝে মাঝে আসেন, এমন লোকও আছে। তাঁদের মধ্যে প্রধান জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি যন্ত্রপাতি, আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে রবি ঠাকুরের বই পড়তে ভালবাসেন। রবি ঠাকুরের আশ্রমে মাঝে মাঝে আসেন।”

“এখানেও কি রবি ঠাকুরের আশ্রম আছে নাকি?”

“আরে তাঁর আশ্রমই ত' এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। যেখানে সপ্তাহে একদিন আমবাগানের ছায়ায় সকলে মিলিত হন। হোমার, ভার্জিল, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, শেক্সপীয়ার, দান্তে সবাই এক জায়গায় বসে সৎসাহিত্যের আলোচনা করেন। ছোট-বড় কেউ বাদ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের এখানকার আশ্রমের নাম, ‘জ্যোতিনিকেতন’। এখানকার নদীতে নৌকা চড়ে বেড়াতে বেড়াতে তিনি বই পড়েন।”

—"রবীন্দ্রনাথকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

—"উপায় নেই বন্ধু। যে কোন লোকের সে অধিকার নেই। মৃত্যুর পরে তুমি এখানে এসে চেষ্টা করে দেখো।"

এমন সময় দেখা গেল উটের পিঠে চড়ে একজন লোক আস্‌ছেন। দেখতে ঠিক আরব-বাসীর মত। হাতে তাঁর একটা খোলা বই।

গ্রন্থকীট বল্লে, "উনি কর্ণেল লরেন্স। উটে চড়ে আরব দেশ ভ্রমণ করার সময়—উনি বই পড়ে সময় কাটাতেন—ঐ দেখ, ঘোড়ায় চড়ে আরেকজন পড়ুয়া আস্‌ছেন, উনি হচ্ছেন জন্ ওয়েস্‌লি—অশ্বারোহণে যাবার সময় উনি বই পড়েন। এসব অভ্যাস আর তন্ময়তায় ঘটে। এও একরকম সাধনা। চার্লস্ ল্যাম্বের নাম শুনেছ বোধ হয়। তিনি আর তাঁর বোন্ মেরি, দু'জনে শেক্সপীয়ারের নাটকগুলিকে সুন্দর সংক্ষিপ্ত শিশুপাঠ্য গল্পের আকারে বার করেন। ইনি খাবারের টেবিলে বসে খেতে খেতে বই পড়তেন। একবার কোল্‌রিজ বলে এক কবির কাছ থেকে মিলটনের একখানা বই পড়তে নিয়ে তিনি তরকারির দাগ লাগিয়ে ফেলেন। সেজন্যে কোলরিজকে চিঠি লিখে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।"

—"শুনেছি রবার্ট লুই ষ্টিভেন্‌সন্‌ও খুব বই পড়তে ভালবাসতেন। সস্তা সংস্করণের বই পড়ার কি আনন্দ তিনি উপভোগ করেছেন, সে সম্বন্ধে ভারী চমৎকার একটা প্রবন্ধ আছে এক পেনীর বই শাদা কাগজের মলাট্ আর দুই পেন্সের বই রঙীন—প্রবন্ধটা ভারী চমৎকার।"

"ডাক্তার জনসন্ ছিলেন মস্ত পড়ুয়া। তাঁর বন্ধু ছিলেন বস্‌ওয়েল্। বন্ধুটির গোড়া হতেই ধারণা ছিল যে, ডাক্তার জন্‌সন্ একজন মস্ত লোক হবেন। তাই বসওয়েল্ সারাজীবন জন্‌সনের সাথে সাথে ঘুরে তাঁর কথাবার্তা, জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা টুকে টুকে রাখতেন। তাঁর লেখা 'Life of Johnson' ইংরেজী সাহিত্যের একটি বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ। এই জন্‌সন বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। কি করে বই পড়ার ঝোক চাপ্‌ল সে ভারী মজার গল্প। তাঁর বাবার বইয়ের দোকান ছিল। তাঁর ভাই একবার কয়েকটা আপেল এনে কোথায় লুকিয়ে রাখে। জনসন সেই আপেলের খোঁজে বইয়ের দোকানে উপস্থিত হন। বইয়ের তাকের পিছনে আপেল রাখা হয়েছে মনে করে বই সরিয়ে দেখ্‌বার সময় নানা রকমের বই তাঁর মনকে টানে। আপেল খাওয়ার নেশা ছুটে, বই পড়ার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। বই পড়াও এক রকম ভোজ। অপেলটা দৈহিক ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য আর বই হচ্ছে মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য। সেই থেকে জন্‌সন্ বই পেলেই পড়েন। স্থান, কাল, পাত্র নেই, বইয়ের বাছ-বিচার নেই। বই পেলেই পড়া চাই। বই পড়া সম্বন্ধে তিনি ভারী

চমৎকার একটা কথা বলেছেন। কথাটা অবশ্য তাঁর নিজের নয়। যা হোক্, কথাটা এই : "কতকগুলো কেবল চেখে দেখলেই হ'ল, কতকগুলো তাড়াতাড়ি গব্‌গব্ করে গিলে খেতে হয়, আর কতকগুলো বই একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে খেতে হয়, হজম করতে হয়—একবার শেষ হলে দু'বার তিনবার বার বার পড়তে হয়।"

গ্রন্থকীটের কথাগুলো আমার ভারী ভাল লাগ্‌ছিল। তার উপর আমার যে রাগ তা কমে এসেছিল। বললাম, "তোমার পড়াশুনো ত' খুব।"

"খুব না হাতী! ক'টা বই-ই বা পড়েছি! ক'টা ভাষাই বা জানি! আমার ইচ্ছে বারে বারে গ্রন্থকীট হয়ে জন্মে দুনিয়ার সব ভাষায় লেখা সব বই পড়ি—" গ্রন্থকীট কেমন উন্মনা হয়ে পড়ে।

আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। একটা বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হবামাত্র একজন লোক দরজা খুলে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা কারা? বই পড়ছ না ত' তোমরা? এদেশে সবাই বই পড়ে, তোমরা কি রঙ্গ দেখ্‌তে এসেছ?"

আমি বল্‌লাম, "আমরাও বই পড়ি; ইনি একজন গ্রন্থকীট'—

—"বটে? তবে এই নাও বই, পড়—"ব'লে দু'খানা বই দু'জনের হাতে গুঁজে দিলে। তারপর আরো বই এনে বল্‌লে—"এই নাও, এই নাও, এই নাও—আমাদের দু'জনের হাত ভরে গেল। আর বই ধরতে পারছি না তবুও লোকটা বই এগিয়ে দিচ্ছে—"এই নাও, এই নাও এই নাও—আমাদের হাত থেকে বই মাটিতে পড়ে যেতে লাগ্‌ল। তাই দেখে লোকটি বই ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাদের মারতে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ বই যেন আমাদের দু'জনকে ঢেকে ফেল্‌লে—নিঃশ্বাস নেবার জন্য আমি হাত পা ছুঁড়ে—মাথা উঁচু করবার চেষ্টা করছি······শুন্‌লাম মেজ মামার গলার স্বর : "এই—এই—উঠে পড়, উঠে পড়। বিশবার বলেছি অমনি করে বই রাখিস্ নি। বইয়ের গাদা চাপা পড়বে। সে কথায় কান দিস্ না। কাণ্ড দেখে হাড় পিত্তি জ্বালা করে। আরেকটু হলে যে মরতিস্ হতভাগা!"

য়্যাঁ! তা'হলে আমি আমার ঘরেই বইয়ের স্তূপের তলায়। বইগুলো বুঝি আমার উপরেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেছে! ভারী ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ত'!

গ্রন্থকীট কোথায় গেল? আহা! গ্রন্থকীটদের স্বর্গ কি সুন্দর! ভাবতে ভাবতে, বকুনি খেতে খেতে বই গুছোতে লাগলাম।

লেডী অবলা বসু

শ্রীমতী চারুবালা মিত্র

লেডী অবলা বসু

শ্রদ্ধেয়া লেডী অবলা বসুর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মনীষী জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী। নারী-জগতে তাঁর দান অতুলনীয়। তিনি দেশের ও সমাজের নানারকম কাজের ভেতর দিয়ে ৮৬ বৎসর বয়স পরিপূর্ণ করে সম্প্রতি দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি সার্থক করে গিয়েছেন তাঁর নিরলস কর্মকুশলতা দিয়ে।

তাঁর খুব নিকটে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, সেজন্য তাঁর মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি দেখেছিলাম সেগুলি আজ তোমাদের কাছে বলব। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যা সকলকে তার কাছে আকর্ষণ করত এবং শ্রদ্ধায় সকলে মাথা নত করত। তাঁর আর একটি গুণ ছিল, তিনি খুব সুন্দর কথা বলতেন। বালক বৃদ্ধ জ্ঞানী মূর্খ প্রত্যেকের সঙ্গেই ঠিক তাদের উপযুক্ত করে কথাবার্তা বলে যেতেন—অন্যের কথাও সদরদে শুনতে ভালবাসতেন। ছোট বড় সকলের প্রতিই তাঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক ও মিষ্টি। তাঁর অধীনে যারা কাজ করেছে, তিনি কখনও তাদের হুকুম করেন নি বা ছোট বলে মনে করেন নি। চাকরবাকরের প্রতিও তাঁর খুব দয়া ছিল। তাদের কখনও জোরে, কঠিন বা রূঢ় কথা বলতেন না, তাদের সুখ-সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তারা তাদের খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, বিছানা যার যা প্রয়োজন না চাইতেই পেত তাঁর কাছ থেকে। তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিল তাঁর মধুর সম্পর্ক। তাদের যত্ন করে খাওয়াতেন, আবার কত সময় তাদের কত উপহারও পাঠাতেন।

তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল চিঠি লেখা। প্রতিদিন দরকারী আদরকারী কত চিঠিই তাঁকে লিখতে হ'ত। কোন দিন চিঠি লেখায় আলস্য তাঁর দেখিনি। কেউ কোন চিঠি লিখলে তৎক্ষণাৎ তার জবাব দিতেন। যতই কাজ থাক চিঠি লেখা বা উত্তর দেওয়া মানুষের যে একটি প্রধান কর্তব্য তা তিনি কখনও ভুলতেন না।

তাঁর দিনের কাজ সুরু হ'ত ভোর পাঁচটায়। প্রথমেই স্নান করে উপাসনায় বসতেন, এবং ব্রহ্ম-সঙ্গীতের গানগুলি করে খুব আনন্দ পেতেন। সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে করতে ভালবাসতেন তিনি। ঘরকন্নার ছোটখাট কাজ—তরকারী কোটা, পান সাজা থেকে আরম্ভ করে তাঁর স্বামীর সমস্ত কাজ নিজের হাতে করে দিতেন। নিজে বাজার না করলে তাঁর তৃপ্তি হ'ত না। প্রতিদিন নিউমার্কেটে বা কলেজ ষ্ট্রীটে নিজে বাজার করতে যেতেন। দার্জিলিঙে প্রায় দুই মাইল হেটে গিয়ে বাজার করে আবার এই পাহাড় ভেঙে বারোটার মধ্যে স্বামীর খাবার সময় ফিরে আসতেন। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সঙ্গে তিনি সংসারটি চালাতেন। প্রতিদিনের হিসাব নিজে লিখতেন।

অত্যন্ত সৌন্দর্য-প্রিয় ছিলেন লেডী বসু। প্রত্যেকটি ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন ও প্রতি ঘরে কারুকার্যখচিত ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে দিতেন। তাঁর বসবার ঘরটি ভারতীয় প্রথায়, ভারতীয় বিখ্যাত আর্টিষ্টদের আঁকা ছবি ও ফ্রেস্কো-পেণ্টিং দিয়ে সাজান ছিল। তিনি যদিও বহুবার স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকা গিয়েছেন এবং বহুদিন সেখানে বাস করেছেন বটে, কিন্তু একটুও বিদেশী ভাবাপন্ন হন নি। অর্থাৎ তাদের যা কিছু ভাল নিয়েছেন, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গিয়েছেন। মনে-প্রাণে তিনি স্বদেশানুরাগিণী ও স্বদেশহিতৈষিনী ছিলেন। প্রথম স্বদেশী যুগে তিনি বিদেশী চিনি বিষবৎ ত্যাগ করেছিলেন এবং বহু বৎসর চিনি স্পর্শ করেন নি। বিলাতী কাপড় বা বিলাতী জিনিস তিনি কখনও ব্যবহার করেন নি। একদিন তাঁর সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়ে একটি বিলাতী জামার কাপড় কিনেছিলাম দেখে বলেছিলেন, "বিলাতী কাপড় কিনলে কেন ?"

স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন অবলা বসু। বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্রের সফলতার মুলেও ছিলেন তিনি। দেশে-বিদেশে সর্বদা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থেকে তিনি স্বামীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন। দেশের বড় বড় লোক যেমনঃ রবীন্দ্রনাথ, সিষ্টার নিবেদিতা, মহাত্মাজী, সরোজিনী নাইডু, প্রফেসর মোলিস প্রভৃতি বহু মনীষীর সমাগম হ'ত তাঁর গৃহে। লেডী বসু নিজে এঁদের প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতেন এবং আতিথেয়তার ভার সম্পূর্ণ নিজের হাতে গ্রহণ করতেন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাতে সুষ্টুরূপে চল্‌তে

পারে এবং এ কার্যে যাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না সৃষ্টি হয়, সেজন্য সাংসারিক এবং পারিবারিক যা কিছু ব্যাপার সব নিজেই তিনি চালিয়ে যেতেন, এসব নিয়ে তাঁকে কখনো বিব্রত হতে দিতেন না। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ও তার বাগানের কাজকর্মও তিনি দেখাশুনা করতেন। ওখানকার কর্মীদের তিনি নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন এবং সর্বদা তাদের আদর-যত্ন করে খাওয়াতেন।

স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি কোথাও যান নি। তাঁর ছোট ছোট সমস্ত কাজ তিনি নিজের হাতে করতেন। এবং তাঁর নিজের এত বিভিন্ন কাজের মধ্যেও স্বামীর প্রতি কর্তব্যে কোন ত্রুটী কোনদিন হয় নি। জগদীশচন্দ্র মধ্য-বয়সে ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত হন। লেডী বসু অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁর খাবারের ব্যবস্থা এমন করে করতেন, যাতে তাঁর শরীর ভাল থাকে এবং অসুখ বৃদ্ধি না পায়।

লেডী বসু অত্যন্ত অবস্থাপন্ন লোকের কন্যা ছিলেন এবং পিতৃগৃহে অতি সুখে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। যখন তাঁর বিবাহ হয় তখন জগদীশচন্দ্রের মাহিনা মাত্র ১৫০৲ টাকা। ঐ টাকায় তাঁকে বৃহৎ পরিবার পোষণ করতে হ'ত। তাতে তিনি একটুও বিচলিত হন নি। হাসিমুখে স্বামী ও আত্মীয়স্বজনের সেবাযত্ন করতেন। সংসারের যাবতীয় কাজ, শাশুড়ীর জন্য রান্নাবান্না সব নিজের হাতে করতেই তিনি ভালবাসতেন। একদিন তিনি বলেছিলেন, "অন্য কোন কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে করতাম না, শুধু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে কোন উপহার দিতে পারতাম না বলে দুঃখ হ'ত।"

তাঁর নিজের কোন সন্তান ছিল না, কিন্তু ভাগ্নে-ভাগ্নীদের তিনি নিজের সন্তানের মতই মানুষ করেছিলেন। সর্বদা তাদের আব্দার ও অত্যাচার সহ্য করতেন। পরিবারের সকলে তাঁকে মায়ের মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত, এবং নিজেদের সুখঃদুখের সব কথা এসে বলত তাঁর কাছে। স্বামী বিবেকানন্দ একটি কথায় তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়ে গেছেন—"সতী, সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গেহিণী।'

প্রথম জীবনে লেডী বসুর কর্মের সুরু হয় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে। পরে পিতা দুর্গামোহন দাস ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্থাপিত এই স্কুলের সম্পূর্ণ ভার নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বহুদিন এই স্কুলটি তিনি চালিয়েছিলেন। নিজে ও ভাইদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে স্কুল সংলগ্ন বিল্ডিংটি তৈরী করেন এবং পিতা দুর্গামোহন দাসের নামে উৎসর্গ করেন। বিল্ডিংটির নাম রাখা হয় দুর্গামোহন ভবন। কি কঠিন পরিশ্রমই না তিনি করতেন এই স্কুলের উন্নতির জন্য! লেডী বসুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা দেশকে ভালবাসতে শিখবে।

আজ তাঁরই যত্নে, চেষ্টায় ও আদর্শে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় কলিকাতার একটি শ্রেষ্ঠ

বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এই স্কুল করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। যাতে দেশের মেয়েরা শহরে ও গ্রামে একটু জ্ঞানের আলোক পায়, সেজন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন নারী-শিক্ষা সমিতি ১৯১৯ সালে। প্রথমে তিনি কলিকাতায় অবৈতনিক একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেন, পরে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে তাঁর আদর্শে ৫৯টি স্কুল স্থাপিত হয়। এপর্যন্ত এই সব গ্রাম থেকে ২০০০০ মেয়ে শিক্ষালাভ করে বেরিয়েছে। তারপর ১৯২২ সালে তিনি স্থাপন করেন বিধবাদের জন্য "বিদ্যাসাগর বাণীভবন"—এটি তাঁর একটি অক্ষয়কীর্তি।

এই ধরনের আরো কতকগুলি প্রতিষ্ঠান করেও তার মন সুস্থির ছিল না। মহাত্মাজীর আদর্শে গ্রামে গ্রামে মেয়েরা নিজ হাতে সুতা কাটবে ও তাঁতে কাপড় বুনবে এটা তাঁর বহুদিনকার একটা বাসনা ছিল। লেডী বসু তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ করলেন দমদমে 'Women's Cooperative Industrial Home' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান খুলে। এখানে সুতা কাটা ও তাঁত বোনা শেখান হয়। বর্তমানে কামারহাটীর 'উদয় ভিলা' নামক বাগান-বাড়ীতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হয়েছে।

বাংলা দেশের মেয়েদের মধ্যে পূর্বে যে সব শিল্পকাজ ছিল, তার পুনরুদ্ধারের জন্য ও মেয়েদের মধ্যে যাতে শিল্পকলার উন্নতি হয় সেজন্য প্রতি বৎসর একটি শিল্প-প্রদর্শনী তিনি করতেন বাণীভবনের মাঠে। এখানে বাংলা দেশের সব শহর, গ্রাম ও বহু স্কুল থেকে সুন্দর সুন্দর হাতের কাজের জিনিস এসেছে ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি পুরস্কার দিয়েছেন।

লেডী বসু সর্বদা বলতেন নারীর ধর্ম হচ্ছে সেবা। মেয়েদের বেশী করে নার্সিং শেখা উচিত। সেজন্য যখন দুঃস্থা অসহায় নারীরা তাঁর কাছে আসত স্বাবলম্বী হবার জন্য, তখন তিনি তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে নার্সিং শেখবার জন্য ব্যবস্থা করে দিতেন।

এই ত' গেল তাঁর কর্মময় জীবনের কথা। এখন তাঁর চরিত্রের যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ ছিল যার জন্য তিনি এত কাজ করে যেতে পেরেছেন, সেইগুলি বলব। প্রথমেই মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায় দেখে। তাঁকে কখনও কোন বিপদে উতলা হ'তে দেখিনি। এতগুলি প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে প্রতিদিন তাঁকে দাড়াতে হ'ত বহু বাধা ও অসুবিধার সামনে। কিন্তু কোনদিন তার জন্য বিরক্ত, নিরুৎসাহ, অন্যের উপর দোষারোপ বা রাগ করতে দেখিনি। যত পরিশ্রম হোক, যত পর্বতপ্রমাণ বাধা বা ঝঞ্ঝাট আসুক না কেন, যে কাজ আরম্ভ করেছেন তা কখনও ছেড়ে দিতেন না—অত্যন্ত সহজ ও শান্তভাবে কঠিন বাধাগুলিকে অতিক্রম করতেন। মানুষের এত ধৈর্য কি ক'রে যে সম্ভব এক এক সময় তাই ভাবতাম আমরা।

কতরকম লোকের সঙ্গেই তাঁকে আসতে হয়েছে, কিন্তু ছোটবড় সকলের সঙ্গেই তাঁর কি

অমায়িক ব্যবহার ছিল! কখনও কাউকে কঠিন কথা বলতে শুনিনি আমরা। তাঁর প্রতিষ্ঠানে যে সব মেয়েরা কাজ করত, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর প্রাণের যোগ ছিল, সর্বদা তাদের ডেকে তিনি প্রতিষ্ঠান-পরিচালনা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং প্রত্যেককে নিজের সন্তানের মত ভালবাসতেন।

যে কোন লোক, যে কোন মেয়ে তাঁর কাছে এসেছে, প্রত্যেকের সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেখা করেছেন এবং প্রত্যেকের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। কত দুঃস্থা তাঁর দয়ার কথা শুনে রোজ এসে তাঁর কাছে ভিড় করত; প্রত্যেকের কথা মন দিয়ে তিনি শুনতেন এবং তাদের কোন রকম সুব্যবস্থা করে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। যতক্ষণ না কিছু করতে পারতেন, মনে মনে খুবই অস্থির হতেন।

বছর চারেক আগে একটি ভদ্রঘরের মেয়ে তাঁর কাছে এসে কেঁদে পড়ল। সে বলল যে, তার ৩।৪টি সন্তান আছে, স্বামী ডাক্তার কিন্তু কিছুই করেন না; কোন রকমে নিজের পায়ে না দাড়াতে পারলে সন্তানগুলি না খেয়ে মরবে। তিনি মেয়েটিকে বললেন, "আচ্ছা তুমি এখন যাও, দিন সাতেক পরে খবর দেব।" মেয়েটিকে দেখে পর্যন্ত তার প্রাণ অস্থির হতে লাগল। এক নাম-করা ডাক্তারের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে পরের দিন তাকে তিনি ডেকে পাঠিয়ে নার্সিং শিখতে এক নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়েটি আজ নার্সিং শিখে স্বাবলম্বী হয়েছে। এরকম যে কত নিরাশ্রয় অসহায় মেয়ে তাঁর কাছে এসে মানুষ হয়ে গেছে তার সংখ্যা নেই। কয়েক বৎসর আগে একটি ভদ্রলোক দু'টি ভদ্রঘরের মেয়েকে এনে তাঁর কাছে হাজির করে বলে, "মেয়ে দু'টি একেবারে অনাথা, আপনি যদি এদের ভার না নেন তা'হলে এরা কোথায় যাবে তার ঠিক নেই।" তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়ে দু'টির সম্পূর্ণ ভার নিলেন, এবং মেয়ে দু'টিকে বোর্ডিং-এ রেখে দিয়ে নিজের মেয়ের মত মানুষ করতে লাগলেন।

দেশের মেয়েদের যাতে মঙ্গল হয়, তারা যাতে সুগৃহিণী হ'তে পারে এবং দেশের ও দশের জন্য কিছু করতে পারে—সেজন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। মেয়েদের মধ্যে প্রাণ-শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশকে বড় করব, এটাই ছিল তাঁর সাধনা।

স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায় লেডী বসুর এক জন্মদিনে একখানি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানি হচ্ছে: "তোমার জীবনখানি সৌন্দর্যে-মাধুর্যে, গুণে, গৌরবে এবং কল্যাণ-কর্মে ভরিয়া রাখিয়াছ। তোমার জন্য আজ আর বেশী কি প্রার্থনা করিব? তুমি সুদীর্ঘকাল যাহা পাইয়াছ, আরও পাও; যাহা দিয়াছ, তাহা আরও সকলকে দাও; যাহা করিতেছ তাহা আরও কর।

তোমার শুভ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর ইহাই বার বার কামনা করিতেছি। আবার প্রার্থনা করিতেছি তোমার জীবন সুখে-স্বাস্থ্যে এবং পুণ্যকর্মে সুন্দরতর ও কল্যাণতর হউক।"

সত্যিই তিনি তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে গিয়েছেন।

শত শত দুঃস্থা অসহায় অবলা নারী আজ প্রাণ পেয়েছে—নতুন জীবন পেয়ে ধন্য হয়েছে।

তাঁরই সাহায্যে শিক্ষায় আজ যারা পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাদের লেখা চিঠি থেকে দু'একটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি : "সংসারের ঘূর্ণিবাত্যায় পরমুখাপেক্ষী দুঃখময় লাঞ্ছিত বৈধব্যজীবনে মা আমাদের কথঞ্চিৎ চেতনা দান ক'রে স্বাবলম্বনের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। মার উপদেশ মস্তকে বহন করে, তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মাতৃত্বের পূর্ণতা বিকাশে দেশ ও দশের সেবা করে যেন এ ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারি।"...

করুণা সেন বাণী-ভবনের প্রাক্তন ছাত্রী লিখেছিলেন : "লেডী বসু তাঁর ৮৬ বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত ভরিয়ে রেখেছিলেন মহৎ কর্মদ্বারা। সার্থক হয়েছে তার জন্ম, সার্থক হয়েছে তার জীবন, তিনি অমর হয়ে থাকবেন চিরদিন আমাদের মধ্যে।"...

তিনি নিজে যে কাজ আরম্ভ করে রেখে গেছেন, আমরা সকলে মিলে সেগুলি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেই তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করবে।

মজার অঙ্ক

শ্রীঅশোককুমার ঘোষ

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ এই নয়টি সংখ্যাকে প্রতি লাইনে তিনটি করে তিন লাইনে এমন করে সাজান যে, ২য় লাইনের ৩৮৪ প্রথম লাইনের ১৯২-এর দ্বিগুণ ও তৃতীয় লাইনের ৫৭৬ প্রথম লাইনের ১৯২ এর তিন গুণ হয়।

১	৯	২
৩	৮	৪
৫	৭	৬

এখন প্রশ্ন : তোমরা কি কেউ আর কোন ভাবে এই নয়টি সংখ্যাকে সাজাতে পার, যাতে ঠিক এই ব্যাপার ঘটে? ক'রকম ভাবে এটা করতে পার দেখ।

উত্তর শেষের দিকে দেখ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সকাল বারোটার সময় জাহাজ এসে থামলো খিদিরপুরের ডকে। মহাসমুদ্র পার হয়ে এসে ঢুকলো বন্দরে। এখানে কিছুদিন থাকতে হবে। মহারাজ আজ সকাল সকাল রান্না-বান্না সেরে ফেলেছে। এতগুলো লোকের রান্না। কেউ ভাত, কেউ রুটি, কেউ ডাল, কেউ কারি, কেউ রোষ্ট্!

মহারাজ বলেছে—আজকে মাংসোয় দিয়েছি ক'ষে ঝাল—দেখি তোর গুদামবাবু কতটাকা ফাইন্ করে—

ভোম্বল মাংস চাখ্‌তে চাখ্‌তে বললে—কিন্তু বেড়ে হয়েছে মহারাজ—অনেকদিন খাইনি এমন মাংস—

—আর একটু নিবি ভোম্বল—বিড়িটা ঠোঁটে চেপে, হাতায় করে দিলে আর একটু মহারাজ।

—আহা বেশ হয়েছে খেতে সত্যি—

মহারাজ বললে—গেল মাসে ওই গুদামবাবুর রিপোর্টে আমার আট আনা ফাইন হয়েছে—এবার দেখি কতটাকা ফাইন্ করে—ব'লে মাংসর হাড়িতে লম্বা খুন্তিটা দিয়ে খটাখট্ শব্দ করতে লাগলো।

—কিন্তু সেদিন দেখলুম—

মহারাজ বললে—কিন্তু সেদিন দেখলুম তুই গুদামবাবুর সঙ্গে মেসিন-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করছিস্···তোর দু'টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে বলে বুঝি ভারী খোশামোদ—

ওকে তুই চিনলিনে ভোম্বল···আমি ওর চাকরি খাবো তবে ছাড়বো। এই আমি পৈতে ছুঁয়ে বলছি তোকে, দেখে নিস্—

মাংসর হাড়িটা নাবিয়ে, ডালটা চাপিয়ে দিলে মহারাজ। তারপর ফস্ ক'রে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলতে লাগলো—আমি আজ নতুন রাঁধুনি নই, ডানকান্ সাহেব যখন ক্যাপ্টেন ছিল, তখন একদিন কী খেয়াল হলো বুঝলি ভাই—ফাউল কারিটা রাঁধলুম বেশ জুত করে—শীতকাল সেটা, বড়দিনের বাজার, নতুন বছরের পয়লা—ওদিকে ঝম্ ঝম্ করে বিষ্টি পড়ছে, সন্ধ্যে সাতটার সময় রান্না শেষ করেছি, আটটার সময় খেতে বসেছে সাহেব—খেয়ে এমন তারিফ করলে, ফলাহারীকে জিগ্যেস করিস—বৈজুও জানে, ডানকান্ সাহেব ভাই এমন তারিফ করলে—সঙ্গে সঙ্গে আমার পঁচিশ টাকা মাইনেই বাড়িয়ে দিলে—সে-সব ছিল মানুষ—সে-কালও নেই—সে-মানুষও নেই—

ফুটন্ত ডালের কড়ায় গোটা পঁচিশেক পাকা লঙ্কা পটাপট্ ফেলে দিয়ে মহারাজ বললে—আরে গুদামবাবু বলে ওঁরা নাকি খাটুলির জমিদার বংশের লোক—তাই যদি হবে, তবে এটুকু ঝাল খেয়ে পেট ছেড়ে দেয়—তা'হলে কিসের তুই জমিদার-বাচ্চা, কী বল্ ভোম্বল—

তারপর একটু থেমে মহারাজ আবার বলতে থাকে—এক একবার ভাবি যে কিছু বলবো না—যা' বলছে বলুক গে—পাগলে কী-ই না বলে···কিন্তু বলে কিনা আমি নাকি বার্মার রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতাম—ওই নাকি সাহেবকে বলে এখানে চাকরি করে দিয়েছে—আরে আমাদের হলো তিন পুরুষের রান্নার ব্যবসা—ঠাকুর্দা ছিল লাট্সাহেবের হেড-কুক্—তারপর বাপ ছিল 'ওকামারু' জাহাজের হেড্ বাবুর্চি—তিরিশ বছর চাকরি করে পেন্সন্ নিয়ে···

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো।

বজ্রপাত ঠিক নয়, গুদামবাবু ঘরে ঢুকলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের মুখখানা ভয়ে ভক্তিতে একেবারে বিগলিত হয়ে উঠলো।

দু'টো এঁটো-হাত জোড় করে নমস্কার করে বললে—আসুন, কিছু বলবেন আমাকে স্যার—?

গুদামবাবু গম্ভীর গলায় বললে—বারোটার আগে খানা চাই আমার—দেরি করলে চলবে না—জাহাজ খিদিরপুরে পৌঁছবার পর আমি আর নিঃশ্বেস ফেলবার সময় পর্যন্ত পাবো না—

—যে-আজ্ঞে হুজুর—যে-আজ্ঞে—

এক মিনিট আগেকার মহারাজ যেন এ নয়। গুদামবাবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে যেন এক ভেল্কি খেলা হয়ে গেল।

—তা'হলে মনে থাকে যেন ওই কথা—

—যে-আজ্ঞে হুজুর—যে-আজ্ঞে—

—ঝক্‌মারি হয়েছে গুদামের কাজ করা—বলতে বলতে গুদামবাবু যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গুদামবাবু বেরিয়ে যেতেই মহারাজ উঁকি মেরে একবার ভাল করে দেখে নিলে। তারপর আরো গোটাকতক লঙ্কা পটাপট্ ডালের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বললে—দেখলি তো ভোম্বল, দেখলি তো তুই—তেজটা দেখলি তো—দেখে নিস্, আমি ও-তেজ ভাঙবো ওর—আমি যেন গরু-ছাগলের সামিলরে—এক এক সময় যখন খুব রাগ হয়, ভাবি, যদি সত্যযুগ হতো এই পৈতে ছুঁয়ে এমন শাপ দিতাম যেন সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত আর আমি সেই ছাই নিয়ে দিতাম উনুনের ভেতর ফেলে—

* * *

জাহাজ থেকে নেবে ভোম্বল চার পয়সার চিনে বাদাম কিনলে। বললে—খা-খারে—

ডকের বাইরে এসে ভোম্বল বললে—এ ক'দিন তোর খুব কষ্ট হলো—কিছু মনে করিস নে, রাগ করে কখন কী বলেছি—জানিস তো কখনও মায়ের ভালবাসা পাইনি, লাটুগুণ্ডার কাছে থাকলে এদ্দিন কেবল গুণ্ডামিই শিখতুম—কিন্তু সে থাকগে—যদি কখনও আমার কথা মনে পড়ে, ভাবিস্ আমি একটা ভবঘুরে পাগল, আমার কোনও মতির ঠিক নেই···যদি কোনও দিন বড় হতে পারি, হয়ত খবরের কাগজে আমার নাম দেখবি—আমার ম্যাজিক দেখবার জন্যে হয়ত হাজার হাজার লোক ভিড় করবে···সেদিন যদি কখও আসে তখন আমার সঙ্গে দেখা করিস্, তার আগে নয় ভাই—

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে ট্রাম রাস্তায় এসে পড়েছে। অসংখ্য বাস, ট্রাম, রিক্সা, মানুষের স্রোত। রাতুল ভালো করে চেয়ে দেখতে লাগলো। কত বছর পরে আবার কলকাতায় এল। আগে ট্রামে বাসে রাস্তায় তো এত মানুষ ছিল না। খিদিরপুরে সে আগেও দু'একবার এসেছে। এ-সব চেনা জায়গা। মনে হলো—এত দেশ এত মানুষ সে দেখে এল এত জায়গা ঘুরে, কিন্তু কোথাও এত ভালো লাগেনি তার। এরা সবাই, এই রাস্তা, বাড়ী, ধুলো, বালি সব যেন তার বড় প্রিয়। এরা তার দেশের মানুষ। কাছের মানুষ। মনের মানুষ। বিকেল হয়েছে; অফিসের ছুটির পর বাসে ট্রামে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। ছুটি হয়েছে ডকের কুলিদের। কয়লা মাখা, ময়লা, পোষাক পরা পুরুষ আর মেয়ে কুলি। দু'পাশের ফুটপাথে সারি সারি চলেছে নিজের নিজের আস্তানার দিকে। যা' কিছু দেখছে রাতুল সমস্ত ভালো লাগে। ভালো লাগে পায়ের তলায় দেশের মাটির ছোঁয়া। ভালো লাগে গঙ্গার হাওয়া আর এই মানুষ ও লোকে।

ভোম্বল বললে—কী ভাবছিস বল্‌তো—

কিছু তো ভাবছিনা—রাতুল বললে।

তারপর হঠাৎ কোমল হয়ে এল ভোম্বলের গলার স্বর। বললে—হ্যারে, আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হচ্ছে না—? ব'লে নিজেই ভোম্বল হো হো করে হেসে উঠলো।

রাতুল জিগ্যেস করলে—হাসলি যে—

—না, থাক্—সে তুই বুঝবি নে—তুই তা'হলে যা এখন, বাড়ী যা—বাসে ওঠ্—ভোম্বল রাতুলের পিঠে হাত দিয়ে বিদায় দেবার ভঙ্গী করলে।

—তুই ও চল্ না—আমার সঙ্গে—রাতুল বললে।

—আমি? আমাকে নিয়ে যাবি তোদের বাড়ী—?

—বাবা তোকে দেখলে খুব খুসী হবেন—

—বাড়িতে তোর আর কে আছে? মা নেই?

—না, মাকে আমি দেখিনি—

—তোরও মা নেই—তবে তোরা তো খুব বড়লোক, না?

—তা' জানি না—

—তোকে দেখে মনে হয় খুব বড়লোক তোরা, তুই ঠিক আমাদের দুঃখু বুঝবিনে—আমি যাবো না তোদের বাড়ী, যদি কোনদিন নিজে বড়লোক হতে পারি তবেই তোর সঙ্গে মিশবো তখন—

রাতুল হাসলো। বললে—বড়লোকরা কি খুব খারাপ—?

—বড়লোকরা গরীবদের বড় ছোট মনে করে—তুই যখন বড় হবি বুঝবি—বড়লোকরা মনে করে যাদের টাকা নেই তাদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মন, কিছুই নেই বুঝি—

—তুই এত কথা কী করে জানলি ভোম্বল—

—কত লোকের কাছে কত রকম কাজ করেছি, কত লোকের বাড়ীতে বাসন মেজেছি, রান্না করেছি, ঘর ঝাঁট দিয়েছি, সব কথা তোর শুনে দরকার নেই, শুনলে বুঝতেও পারবি না হয়ত—আমাদের দুঃখ কেবল আমরাই বুঝি আর ভগবান থাকলে ভগবানও বোঝে—

—আমার বুঝে দরকার নেই ও-সব—তুই চল্ আমাদের বাড়ী—

ট্রামে উঠে পড়লো দু'জনে।

খানিকক্ষণ পরে ভোম্বল বললে—তোকে দেখে বাড়ীতে সবাই অবাক হয়ে যাবে, না?—

—অবাক হবার আছে আর কে? বাবা তো এখন বাড়ী নেই—থাকবার মধ্যে আছে কেবল গোবিন্দ—বহুদিনের চাকর আমাদের—

বাসের ভেতর দাঁড়ীয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া। ছাদের রড্ ধ'রে টলা। কণ্ডাক্টার এসে চারদিকের লোকের কাছ থেকে টিকিট চাইছে। কোথা দিয়ে কোথায় চলেছে দেখা যায় না। বাড়ীতে যখন পৌছুবে রাতুল, গোবিন্দ তখন হয়ত উনুনে আগুন দিয়েছে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিতে আসবে। ভাববে হয়ত বাবু এসেছে। কিন্তু যখন দেখবে খোকাবাবুকে, খুব অবাক হয়ে যাবে। বিশ্বাস করবে না হয়ত। যাকে মারা গেছে বলে জানে, তার আবির্ভাব হঠাৎ চম্‌কে দেওয়ারই কথা। তারপর চা করে আনবে। কাঁদবে হয়ত কিছুক্ষণ। আনন্দের কান্নাই সেটা। কিন্তু গোবিন্দ যদি বাড়ীতে না থাকে। কিম্বা যদি সে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে বহুদিন আগে! যুদ্ধের মধ্যে কত কিছু বদলে গেছে। কিছুই বিচিত্র নয়। হয়ত অন্য এক চাকর এসেছে তাদের বাড়ীতে। নতুন মুখ। সে চিনতে পারবে না রাতুলকে। বলবে—কে আপনি, কাকে চান—হয়ত ভেতরে ঢুকতে দিতে চাইবে না প্রথমে। রাতুল নিজের নাম বললেও বিশ্বাস করবে না। রাতুল—বাবুর ছেলে তো যুদ্ধে মারা গেছে বহুদিন হলো! জোচ্চুরি করবার জায়গা পাওনি! বাবু বাড়ীতে নেই। ও-সব চলবে না। বাবু আসুক—তিনি এলে যা হয় তিনি করবেন। অচেনা কাউকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই। আর নেহাতই যদি বসতে হয় তো বাইরের ঘরে বসো না। বাবু যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ। তিনি না বললে বাড়ীর ভেতরে কী করে ঢুকতে দেবো।

—সর্বনাশ! ভোম্বল আঁৎকে উঠেছে হঠাৎ—

—কী হলো? রাতুল জিগ্যেস করলে।

—আমার মানিব্যাগ?

নিজের সব ক'টা পকেট হাতড়াতে লাগলো ভোম্বল। কোথাও নেই। গেল কোথায়। এই তো সবে মাত্র দু'মাসের মাইনে নিয়ে পথে বেরিয়েছিল। প্রায় শ' দেড়েক টাকা রয়েছে তা'তে। গেল নাকি 'পিক্-পকেট' হয়ে। ভাগ্যিস কিছু খুচরো পয়সা ছিল আলাদা।

কণ্ডাক্টার এসে টিকিট চাইলে!

রাতুল বললে—আমার কাছে তো একটা কানাকড়িও নেই—

ভোম্বল বললে—তোদের বাড়ী যাওয়া হলো না রে—

—কেন—

—আমার মানিব্যাগের খোঁজে যেতে হবে মেছোবাজারে—

—সে কি আর পাওয়া যাবে—? রাতুল হতাশার ভঙ্গী করলে।

—নিশ্চয় পাওয়া যাবে—যাবে কোথায় আর—আড্ডায় গেলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে—

—কোন্ আড্ডায় ? রাতুল জিগ্যেস করলে।

—লাটু গুণ্ডার আড্ডায়—মেছোবাজারে—সব চোরই মাল তো আগে আড্ডায় জমা হবে··· যা থাকে কপালে, চল্—বেশী দেরি হলে হয়ত মাল ভাগ হয়ে যেতে পারে—

রাতুল বললে—আমিও যাবো—?

—চল্ না, বেশী দেরি হবে না, যাবো আর আসবো—

—কিন্তু এতদিন পরে লাটু গুণ্ডা যদি দেখতে পায় তোকে—যদি ধরে আটকে রাখে, আর আসতে না দেয়—

ভোম্বল সাহসে ভর করে বুক চিতিয়ে বললে—দেখাই যাক না, দেড়শো টাকা একেবারে উবে যাবে—আমার গায়ের রক্ত জল করা টাকা যে রে—

*　　　　*　　　　*

পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে ট্যাক্সি। আশু মুখার্জি রোড ধরে ট্রাম বাসের ভিড় ঠেলে ট্যাক্সি গিয়ে পড়লো হাজরা রোডের মোড়ে। তারপর ডান দিক দিয়ে চললো সোজা হাজরা রোড ধরে। ট্যাক্সি ছুটছে আর চারটে চাকা গতির বেগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরছে।

গোবিন্দ বসেছে ড্রাইভারের পাশে।

পেছনের সীট-এ বসেছে নিত্যানন্দ সেন আর ক্ষিতীশবাবু।

সন্ধ্যে সাতটায় শহরের একটা 'হল'-এ সভা আছে তাঁর। একবার হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন। এখনও কয়েক ঘণ্টা হাতে আছে। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরুচ্ছে না কারো। একটা অভ্রভেদী আতঙ্ক আর আনন্দ মেশানো কৌতূহল ছুটন্ত মটরের ভেতরকার আবহাওয়ায় থম্ থম্ করছে—　　　　(ক্রমশঃ)

কবিতা প্রতিযোগিতা

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি ছবি দেখে দু'লাইনের কবিতা লেখার যে প্রতিযোগিতা আমরা আহ্বান করেছিলাম, তার পুরস্কার এই মাসে ঘোষণা করার কথা ছিল, কিন্তু সমস্ত কবিতাগুলি আমরা এখনো পড়ে উঠিতে পারিনি বলে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার আগামী মাসে ঘোষণা করা হবে। এ সম্বন্ধে আমরা প্রায় আড়াই হাজার কবিতা পেয়েছি।

দুর্ঘটনা ঘটবে না

সংগ্রাহক

ছেলেটি অবাক বিস্ময়ে কি ভাবে দুর্ঘটনা ঘটে নিজের চোখে তা দেখছে। মডেলের সাহায্যে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য কি করতে হবে এবং কি হবে না এখানে সে শিক্ষা পাচ্ছে

ভারতবর্ষের শহরে আজ দুর্ঘটনার অন্ত নেই! নানা অবস্থার মধ্যে প'ড়ে—হয় চালকের দোষে, না হয় পথিকের দোষে, পথে-ঘাটে দিন দু' দশটা অঘটন ঘটছেই—ছেলে-বুড়ো কেউ-ই রেহাই পাচ্ছে না এর হাত থেকে। একটু অন্যমনস্কতা, অসাবধানতায় একটি যে জীবন নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, তা গাড়ির চালক ও পথ-চলা পথিক কেউই কি বোঝে? এই বোধ যাতে বাড়ে, চালক ও চলনদার পথিক উভয়েই যাতে এ বিষয়ে সতর্ক হয়, সে সম্বন্ধে পৃথিবীর সব দেশেই আজ একটা ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে।

বৃটেনে বর্তমান বৎসরকে রাস্তায় শিষ্টাচার প্রদর্শনের বৎসর বা 'Road Courtesy year বলা হয়েছে। সে জন্য এ বৎসর বিশেষ করে ২রা জুন থেকে ৯ই জুন পর্যন্ত 'রোড কার্টসি সপ্তাহে দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো হয়। এই প্রচারের উদ্দেশ্য হ'ল দেশের দুর্ঘটনাজনিত বাৎসরিক ২,০৫,০০০ হতাহতের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে ফেলা।

দেশব্যাপী এই প্রকার কার্যের প্রেরণা যোগাচ্ছে বৃটেনের রাষ্ট্রীয় দুর্ঘটনা নিরোধ সমিতি। প্রতিষ্ঠানটি যেমন ভারী ভারী গাড়ির চালকদের প্রতিনিয়ত সতর্ক করে দিচ্ছে, তেমনই স্কুলের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদেরও রাস্তা-পারাপারের পদ্ধতি সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা দিচ্ছে।

সমিতি মেজর জেনারেল বি. কে. ইয়ং-এর পরিচালনাধীনে লণ্ডন হেডকোয়ার্টার্স থেকে

স্থানীয় কমিটি মারফত অবিরাম প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৩০ বৎসরব্যাপী প্রতিষ্ঠানটি বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় নিরাপদ গাড়ি চালনার জন্য পদক এবং প্রশংসাপত্র বিতরণ করেছে এবং ২৫ বৎসর একাদিক্রমে গাড়ি চালনায় কৃতিত্ব দেখানোর জন্য ইতোমধ্যে ৫৬০ জন চালককে ব্রোঞ্জের ক্রস্ উপহার দিয়েছে।

লণ্ডনে হাইড পার্ক কর্ণারের কাছে প্রতিষ্ঠানটির বাড়িতে নিরাপদ পথ-চলা সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রদর্শনী আছে। পৃথিবীর নানা জায়গার বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থ—চালক এবং পথচারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের মডেল সাহায্যে রাস্তা-পারাপার এবং গাড়ি-চলাচল সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সমিতি পথ-চলা সম্বন্ধে যেমন সতর্ক হতে উপদেশ দেয়, তেমনই প্রত্যেক মেম্বার নিজের নিজের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করে। প্রতি বৎসর বৃটেনে প্রায় ৮০০০ শিশু দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে। এ সম্পর্কে মেয়েদের সংগঠনগুলিও সমিতিকে যথাসাধ্য সাহায্য করছে। স্থানীয় 'হোম সেফ্‌টি কমিটি' এ সম্পর্কে প্রচারকার্যের ভার নিয়েছে। তারা এমন কি প্রয়োজনমত গৃহ-নির্মাতাদের গৃহ-নির্মাণকালেও ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সচেতন করতে তুলছেন।

হাইড পার্ক কর্ণারের প্রদর্শনীতে মডেল গাড়ি ও রাস্তাঘাটের সাহায্যে ছেলেমেয়েদের পথ-ঘাট পেরুনো, চলা ও দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার উপায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে

সমিতি শ্রমশিল্পে কার্যরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও পূর্ণ সজাগ। এ জন্য স্বতন্ত্র কর্মীদল আছে। প্রতি বৎসর এ সম্পর্কে বৎসরিক জাতীয় শ্রমশিল্প নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ বৎসর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে স্কারবারোয়।

[স্থানাভাবে এ মাসে লেখা ও লেখকদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। আগামী মাসে যথারীতি তা প্রকাশিত হবে। এখানে আর একটি কথা তোমাদের বলে রাখতে চাই যে, তোমরা লেখার সঙ্গে, অর্থাৎ যে কাগজে লেখাটি আছে, সেখানে অনেকেই নাম ঠিকানা দাও না, এতে আমাদের ভীষণ অসুবিধা হয়। চিঠিতে ঠিকানা দিলেও, লেখার শেষে কেউই নাম ঠিকানা দিতে ভুলো না।]

কোহিমা

প্রায় ৪।৫ বছর পূর্বে আমরা কোহিমায় ছিলাম। কোহিমা নাগা পাহাড়ের রাজধানী। এটি অতি নির্জন ও ক্ষুদ্র শহর, আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন সেখানে মুষ্টিমেয় বাঙালী বাস করতেন। কোহিমার ৮৮ মাইল দূরে, দক্ষিণ দিকে মণিপুর বা ইম্ফল, এবং ৪৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডিমাপুর অবস্থিত।

ভোরের আলো

হাতে আঁকা] [শ্রীইরা চৌধুরী

নাগা পাহাড়ের অধিবাসী নাগাদের মধ্যেও লোথা, সেমা, অঙ্গামী, কাঁচা নাগা প্রভৃতি নানারূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। এই সকল বিভিন্ন জাতীয় নাগাদের ভাষাও বিভিন্ন। নাগারা গ্রামকে বলে বস্তী। এক এক বস্তীতে এক এক শ্রেণী বাস করে। কোহিমার নাগারা অঙ্গামী জাতীয়। কোহিমা বস্তী শহরের নিকটেই,—শহরের বাজারের উপর টিলায় অবস্থিত। নাগারা খুব কর্মী, বলিষ্ঠ ও হিংস্র। তাহাদের খাদ্য ভাত, মাংস, মদ্য, ডাল ও নানারূপ লতাপাতা। নাগাদের কোন নির্দিষ্ট ধর্ম নেই। তারা ভূতে বিশ্বাস করে, এবং ভূতপ্রেত ইত্যাদির পূজা করে। অনেক নাগাই আজকাল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তাদের অক্ষর ইংরেজী। কোহিমার নাগারা মাংসকে মঙ্গু ও মদকে মধু বলে। নাগাদের চোখ ছোট, নাক চেপ্টা ও পা মোটা। তাদের জীবনযাপন-প্রণালী খুব সরল। তারা বল্লম দিয়ে হরিণ শিকার করে এবং তার মাংস চুলার

উপর ঝুলিয়ে রেখে দেয় এবং পরে উহাই খায়। তারা ভাত পচাইয়া মদ্য প্রস্তুত করে। মদ্য খাওয়ার জন্য এরা বাঁশের চোঙা এবং মাংস খাওয়ার জন্য নানারূপ কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করে থাকে। তারা কাষ্ঠশিল্পে বেশ উন্নত। তাদের গৃহ কাষ্ঠ-নির্মিত। সদরের দরজার উপর তারা নানা-প্রকারের মূর্তি, ছবি প্রভৃতি খোদাই করে। এইরূপ কারুকার্যময় ঘরগুলি দেখতে বেশ সুন্দর। নাগাদের তৈরী সকল কাষ্ঠদ্রব্যই একটা আস্ত কাষ্ঠখণ্ড থেকে তৈরী। নাগারা হাতীর দাঁত দিয়ে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করে। হস্তীদন্তের লাঠি, সিঁদুর কৌটা, চুড়ি, হার ও নানারূপ গহনা বানায়। ওরা কাঠ দিয়ে টবিল, নানা আকারের নানা রূপ পাত্র প্রভৃতি এবং বাঁশ দিয়ে থাঙ্, ঝাঁপি প্রভৃতি তৈরী করে। ওদের তৈরী দা, জাঠি প্রভৃতিও দেখতে খুব সুদৃশ্য। ওরা বয়নশিল্পেও বেশ উন্নত। ওদের নাচের পোষাকও খুব সুন্দর। উল দিয়ে ফুল-লতা-পাতা তুলে, কড়ি বসিয়ে এদের নাচের পোষাক তৈরী হয়। নিজ নিজ কাপড় এরা নিজেরাই বুনে নেয়।

নাগাদের বড় পুজা বৎসরে একটি। ওদের 'গেনা'র সময় আমরা একবার কোহিমা বস্তীতে গিছলাম। তাদের প্রত্যেক বস্তীতেই পুজার জন্য একটা বড় ঘর থাকে। 'গেনা'র (পূজার) সময় ঐ ঘরে নানা প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে কয়েকজন লোক অদ্ভুত
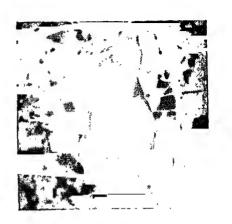
কাকাতুয়া
ফটো: শ্রীপ্রত্যয় রক্ষিত

সাজে সজ্জিত হয়ে, হাতে দা, বল্লম, প্রভৃতি নিয়ে বসে থাকে। ঐ ঘরে আগুন জ্বালান হয় ও আগুনের সামনে কাষ্ঠপাত্রে ডাল, মাংস প্রভৃতি খাদ্য রাখা হয়। অনেক সময় বর্ষাকালে ল্যাণ্ডস্লীপ হবার জন্য এরা 'গেনা' করে। এদের বিবাহ প্রণালীও অদ্ভুত। বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে মুর্গী, মদ্য প্রভৃতি দেয়, বস্তীতে ভোজ হয় ও তারপর বর-কনেকে তিনদিনের জন্য একটা বাড়ীতে বন্ধ করে রাখা হয়। তারপরে পুজা ও খাওয়া হয়। তাদের কারো ঘরে শিশু জন্মালে সে বস্তীর অন্যান্য নাগাদের খাওয়ায়।

আমি কোহিমা বস্তীতে দু'বার গিয়েছি। বস্তীতে যেতে হলে এক আধ মাইল হাঁটতে হয়। বস্তীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে মিশনরী

স্কুল ছিল। ঐ পর্যন্ত ইচ্ছা করলে মোটর নিয়ে যাওয়া যেত। বস্তীতে ঢুকতে হলে একটা প্রকাণ্ড কাঠের দরজা পার হতে হয়। ঐ দরজাটায় সুন্দর সুন্দর কারুকার্য করা ছিল। সন্ধ্যার পর ঐ দরজা বন্ধ থাকত। বিদেশী ফটক পার হয়ে গ্রামে প্রবেশ করলে তার সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যেত। বস্তীর চারদিক সুরক্ষিত এবং মধ্যস্থলে একটা উচু জায়গায় বাঁশের উচু মাচান ছিল। ঐ মাচানে উঠলে চতুর্দিক দেখা যায়। আমরা বস্তী দেখে কয়েকজন নাগার ঘরে গিয়েছিলাম। তাদের ঘরের দরজা বড় বড় কাঠের টুকরা দিয়া তৈরী ও দরজার গায়ে নানাপ্রকার মূর্তি খোদাই করা। ঘরে জানলা প্রায় নেই বললেই হয়, সেজন্য ঘরগুলি বড় অন্ধকার। প্রত্যেক গৃহস্থের মুর্গী, শূকর প্রভৃতি আছে। প্রত্যেক গৃহস্থের উঠানের একপাশে একটা পাথর-ঘেরা জায়গা দেখলাম ; শুনলাম গৃহকর্তা মরলে তাকে ঐ স্থানে গোর দেওয়া হয়। নাগরা অনেক সময় পাথরপূজা করে। একস্থানে অনেকগুলি বড় বড় পাথর দেখলাম। যেসব পাথর পূজা করা হয় তার মধ্যে একটি পাথর খুব আশ্চর্যজনকভাবে ফাটা দেখলাম। নাগারা বলল, ওর উপর বাজ পড়ে এরকমভাবে ফেটেছে।

কোহিমা শহরে দর্শনীয় বিশেষ কিছুই নেই। সেখানে শিলং প্রভৃতি অন্যান্য পাহাড়ে জায়গার মত বড় জলপ্রপাতও নেই। কিন্তু সেখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় চমৎকার।

আমাদের বাংলো থেকে কিছু দূরে মণিপুরের রাস্তা দেখা যেত। প্রতিদিন ঐ রাস্তা দিয়া বহু গাড়ী যাতায়াত করত। পাহাড়ের কোলে আকাবাঁকা রাস্তার উপর দিয়ে যখন সারি সারি গাড়ী যেত, তখন দূর হতে সেই দৃশ্য অপরূপ দেখাত। এই সব পাহাড়ে রাস্তায় গাড়ী যাতায়াত করার সময় নির্দিষ্ট ছিল এবং মধ্যে মধ্যে গেট ছিল। গেটের দু'পাশে সব গাড়ী জমা হবার পর যথাসময়ে গেট খুলে দেওয়া হ'ত এবং উভয় দিকের গাড়ী নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলে যেত। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় গেট বন্ধ থাকত। যাতে পাহাড়ে রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। কোহিমাতে একটি গেট ছিল।

শহর থেকে একমাইল দূরে, আমাদের বাড়ীর কাছে একটা টিলা ছিল। ঐ টিলাটির নাম হ'ল "কুকী টিলা"। ঐ টিলাটির উপর অনেক প্রকারের গাছ ছিল। ঐ টিলার প্রায় মধ্যস্থলে একটি ঘর এবং ঐ ঘরের চতুর্দিকে নানাপ্রকারের ফল ও ফুলের গাছ। এই টিলাটি খুব সুন্দর, দেখবার উপযুক্ত। ইংরেজের সঙ্গে যখন কুকীদের যুদ্ধ বাধে তখন এই টিলার উপর তাঁবু ফেলে, এই টিলা থেকে ইংরেজরা কুকীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। সেইজন্যই এর নাম "কুকী টিলা"। শহরের দেড় মাইল, দুই মাইল দূরে ওয়াটার ওয়ার্কস। পাহাড়ের গায়ে ঝরণার বাঁধ বেঁধে দু'টি বড় বড় চৌবাচ্চায় জল জমান হ'ত ও সেখান থেকে সর্বত্র জল সরবরাহ হ'ত। ঐ ঝরণাটি পরে নিচে নাববার সময় একস্থানে উহার উপর দিয়া মণিপুরের রাস্তা গিয়েছে। অনেকদিন বিকালে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেই অপূর্বস্থানে গিয়েছি। বড় বড় পাথরের উপর জল যেন চঞ্চলা কিশোরীর মত ছুটে চলেছে। জলের

সঙ্গে পাথরের সংঘর্ষে শাদা শাদা ফেনা উঠছে। একদিন আমরা পুলের নীচে ঝরণার একেবারে কাছে গিয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্যের ফটো তুলেছিলাম। কোহিমার রাস্তাটি খুবই পরিচ্ছন্ন। রাস্তার একপাশে গভীর খাত, ঐ খাতের মধ্যে নাগারা চাষ করে। তাদের ক্ষেত থাকে থাকে সাজান। ওপর থেকে সেই জল-ভরা ক্ষেত দেখতে খুব সুন্দর লাগত। একপাশে বৃক্ষাবৃত পাহাড়, মধ্যে মধ্যে স্রোতস্বিনী; আর তার মধ্যে দিয়া পরিষ্কার রাস্তা এঁকেবেঁকে গিয়েছে। প্রত্যেকদিন বিকালে আমরা অনেকক্ষণ সেই রাস্তায় বেড়াতাম। বিকালবেলা সমস্ত বনভূমি পাখীর কূজনে মুখরিত হয়ে উঠত। আমাদের বাংলোর-উপরে টিলায় পাহাড়ের মধ্যে একটা জলাভূমি ছিল। প্রতিবৎসর ঐস্থানে দুর্গা-প্রতিমার বিসর্জন হ'ত। ঐ জলাশয়ের জল কখনো শুকাত না। টিলার নিচে ছিল একটা শিবমন্দির। মন্দিরের কাছেই একটা ছোট্ট গুহার মধ্যে অনেক জল থাকত। ঐ গুহা থেকে একটি ক্ষুদ্র জলধারা ব'য়ে গিয়েছে। ঐ মন্দিরের চারপাশে নেপালীরা বাস করত। তারা ঐ জলধারাটিকে গঙ্গা বলে অভিহিত করত।

কোহিমায় একটি নাগা হাই স্কুল, একটি মিশন স্কুল, চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত একটি বাঙালী স্কুল ও একটি টেক্‌নিকেল স্কুল আছে। সে সময় সেখানে একটি ক্লাবও ছিল। প্রতিবৎসর ক্লাবে বাঙালীদের উদ্যোগে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী-পূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি হ'ত। দুর্গাপূজার সময় থিয়েটারও হ'ত। মধ্যে মধ্যে মণিপুরী নাচের দল পূজার সময় নাচত। কোহিমায় একটি সেনানিবেস আছে। তারাও দুর্গাপূজা করত। ওখানে একটি পার্ক আছে, ঐ পার্কের মধ্যে এক জায়গায় একটা পাথরের উপর এক জোড়া পায়ের ছাপ ছিল। ঐ পায়ের ছাপের সঙ্গে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা জড়িত আছে। কোন এক সময়ে নাকি মণিপুরের রাজা কাছাড়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাছাড়-রাজ তিনি প্রকৃত মণিপুর-রাজ কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায়, মণিপুর-রাজ একটা পাথর দেখিয়ে বলেন যে, "যদি আমি সত্যকার মণিপুর-রাজ হই তবে যেন এই পাথরের উপর "গোবিন্দজীর" পায়ের ছাপ পড়ে।" সত্যি সত্যিই পরিশেষে সকলে সবিস্ময়ে দেখেন যে, পাথরের উপর দুটি পায়ের ছাপ পড়েছে। সেই থেকে পাথরটি সযত্নে ঐস্থানে রক্ষিত আছে।

কোহিমায় মাছ বেশী পাওয়া যেত না। মধ্যে মধ্যে মণিপুর ও ডিমাপুরের চালানী মাছ ওখানে আসত। কোহিমায় খুব হরিণের মাংস পাওয়া যেত। আলুও পাওয়া যেত। প্রচুর পরিমাণে বাঁধাকপি মিলিত প্রায় বারোমাসই।

কোহিমা বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। সেখানে শীত খুব বেশী। কিন্তু গ্রীষ্মের সময় কোহিমা খুব আরামপ্রদ জায়গা। কিন্তু শীতের সময় শীতে বেশ কষ্ট পেতে হ'ত। মধ্যে মধ্যে বরফ পড়ত। বর্ষাকালে ও বৃষ্টি হ'ত খুব। বৃষ্টির ফলে অনেক সময়ই রাস্তার উপর পাহাড় ধ্বসে পড়ত এবং রাস্তা ভেঙে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যেত। এরূপ স্লীপের দৃশ্যও দেখতে মন্দ লাগত না।

নানাদিক থেকে কোহিমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। কোহিমার কথা এখনও ছবির মত মনে হয়। সেখানের স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়ে আঁকা থাকবে।

শ্রীগৌরী দত্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অমল কান খাড়া করে রইল। আশা ছিল ঠাকুরমা কি মা এর প্রতিবাদ করবে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। তা'হলে সকলের মনের ইচ্ছাই তাই। সকলেরই ইচ্ছা সে এ বাড়িতে না থাকুক। সে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাক। যাবে না, কিছুতেই সে যাবে না। দেখা যাক কার সাধ্য তাকে এখান থেকে বের করে। যদিও ভাড়াটে বাড়ি মাসে মাসে বড়দা আর মেজদাই ভাড়া দেয়, কিন্তু তাই বলে তার কি একেবারেই দখল নেই? ঘরের দখল না থাক, ঘরের জিনিসপত্রের দখল সে ছাড়বে না। বিজনের দাদা উকিল। দেশের অনেক আইন-কানুন বিজনের জানা। বিজু বলে তার বাবার কেনা সব জিনিসে ভাগ পাবে অমল। যদি যেতে হয় সেই ভাগ আদায় ক'রে তবে সে যাবে। তার আগে এক পাও নড়বে না এখান থেকে। কার সাধ্য তাকে তাড়ায়।

রাত বাড়তে লাগল। নিজেরা খেতে বসবার আগে ইলা আর একবার সেধে গেল অমলকে। ঠাকুরমাও একবার বললেন, 'যা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। আর গোঁয়ার্তুমি করিসনে। সবাই তোর ভালোর জন্যেই বলে।'

দরকার নেই আর ভালোর জন্যে বলার। সবাইকে সে চিনে নিয়েছে। কেউ তার আত্মীয় নয়, আপন নয়। শত্রুর মত তারও কেউ নেই! তবু অমল ভাবল মা বুঝি একবার আসবে। এসে বলবে, 'যাও আমার পিণ্ডি গিলে এসো। চোদ্দপুরুষ উদ্ধার ক'রে দিয়ে এসো আমার।' মিষ্টি ভাষায় নয়, আদর সোহাগ জানিয়ে নয়, রাগ ক'রে মুখ ঝামটা মেরেই মা তাকে অন্য দিনের মত খেতে ডাকবে, আর অমলও রাগ ক'রে দু' চারটে কড়া কথা বলে নিতান্ত

অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন নিয়ে খেতে বসবে, কিন্তু তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মা তাকে ডাকতে এল না। বউদিকে নিয়ে নিজে খেতে বসল। খাওয়া সেরে আঁচিয়ে এসে দু'জনে পান খেল। পাশের ঘরে বউদি ফিরে গেল। মা মেঝের এক কোণে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে শুধু একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'মা, মাগো'! অমল লক্ষ্য করল তার জন্য বিছানাটি পর্যন্ত আজ কেউ পেতে দিল না। এ বাড়িতে তার ভাত নেই, শোয়ার জায়গা নেই, কিচ্ছু নেই, কেউ নেই তার কেউ নেই! বুক ফেটে অমলের কান্না আসতে লাগল, কিন্তু না সে কাঁদবে না। কারো জন্যে কাঁদবে না। তাছাড়া কাঁদাটা কাপুরুষতা। সে যে কাপুরুষ নয়, সবাইকে তা দেখিয়ে ছাড়বে। আজই সে ছেড়ে যাবে বাড়ি।

রাত বাড়তে লাগল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত পাড়াটা নিঃসাড় নিঃশব্দ হয়ে এল। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে করতে মা কিছুক্ষণ হোল ঘুমিয়ে রয়েছে। বারান্দা থেকে ঠাকুরমার নাক ডাকার শব্দ আসছে। দাদা বউদিদের ঘরের আলো অনেকক্ষণ নিবে গেছে। তাদের কথাবার্তাও আর শোনা যায় না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।

যাওয়ার এই সুযোগ। পা টিপে টিপে তক্তাপোশ থেকে নেমে পড়ল অমল। কিন্তু কোথায় যাবে—খালি হাতে কতদূর যাওয়া যায়। আজ দুপুরে নারকেল গাছের তলায় বসে সিগারেট টানতে টানতে শম্ভুও এই কথাই জিজ্ঞেস করেছিল। সবাই মিলে ঠিক করেছিল প্রত্যেকেই কিছু কিছু টাকা পয়সা জোগাড় ক'রে তবে যাবে। ধারে কাছে নয়, একেবারে ভারতের বাইরে চলে যাবে তারা। সুযোগ আর সুদিনের অপেক্ষায় থাকাতে হবে তার জন্য।

কিন্তু অমল আর অপেক্ষা করবে না। সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। সেই সুদিনকে সে আজই ডেকে নিয়ে আসবে। টাকা? টাকার জন্যে ভাবনা নেই শম্ভু আর বিজনের। টাকা সে একলাই জোগাড় করবে। আজই জোগাড় করবে।

উঁচু তক্তাপোশের তলায় মায়ের ট্রাঙ্কের মধ্যেই সংসারের সব টাকা থাকে তা অমল জানে। কোন কৌটোর মধ্যে চাবির তোড়া লুকোনো তাও তার অজানা নেই। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে সেই চাবির তোড়া সংগ্রহ করল অমল। প্রথম দু'টো চাবিতে ট্রাঙ্ক খুলল না। কিন্তু তৃতীয় চাবিতে খুলে গেল। পশ্চিমের খোলা জানলার ভিতর দিয়ে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সব দেখা যাচ্ছে। দেখা না গেলেও কোন অসুবিধা ছিল না। অমল হাতড়ে হাতড়ে টাকার কৌটোটা বের করল। মাসের শেষ। মাত্র খানতিনেক দশ টাকার নোট আছে তার মধ্যে। আর খুচরো। সেগুলি রেখে নোট তিনখানা নিজের পকেটে ভরল অমল। কিন্তু এতে কি

হবে! আরো চাই। যতদূর চোখ যায় ততদূর যেতে হলে আরো চাই। ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর একটা জিনিস হাতে ঠেকল অমলের। চেপটা মত আর একটা কৌটো। খুলল তার মুখ। কিছু খুচরো ভাঙাচোরা সোনা আর একছড়া হার। একবার হাত দিয়েই হাত ফিরিয়ে আনল অমল। বুকের ভিতরে ঢিপ ঢিপ করছে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে মরিয়া হয়ে হারছড়া তুলে নিল অমল। ছ'ভরি ওজনের হার। মার মুখে আগেই শুনেছিল। কিন্তু পকেটটা যেন আরো বেশি ভারী ভারী লাগতে লাগল। যেন ছ'ভরি নয়, দু'মণ ওজনের সীসে তার পকেটে ঢুকেছে। এত ভারী লাগছে কেন? আর কি আছে পকেটে! ঝুলো পকেটে হাত ঢুকাল অমল। সেই দু'আনিখানা না, দয়া করে দেওয়া কারো দু'আনি-চারআনি সে চায় না। সে যা চায় তা সে নিয়েছে। কারো দু'আনিতে তার আর দরকার নেই!

ঘর থেকে বেরুবার আগে দু'আনিটা রেণুকার মাদুরের ওপর অমল ফেলে দিয়ে গেল।

বাড়ির বাইরে এসে অমলের পা কাঁপতে লাগল। ঢিপ ঢিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে। একবার ভাবল ফিরে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোল কোথায় ফিরবে? বাড়ি? বাড়ি মানে তো দাদাদের গালিগালাজ মারপিট আর সকাল-সন্ধ্যা মার বকুনি। সেখানে ফিরে গিয়ে লাভ কি। তাছাড়া যদি এতক্ষণে কেউ জেগে উঠে থাকে, জানাজানি হয়ে গিয়ে থাকে তা'হলে সবাই কি তাকে আস্ত রাখবে? না মার খাওয়ার জন্য বাড়ি ফিরে যাবে না অমল, তার চেয়ে বরং যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে।

কিন্তু চোখ যেন খুব বেশিদূর গেল না। সামনে আবছা অন্ধকার। এখনো ভোর হ'তে বেশ খানিকটা দেরি আছে। লোকজন রাস্তায় বের হয়নি। ট্রাম বাস চলতে সুরু করেনি। কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল অমলের। কত নিঃঝুম গভীর রাতে এই রাস্তা দিয়ে একা একা চলা-ফেরা করেছে অমল, মন তো এমন করেনি। কিন্তু খানিকটা পথ এগুতেই গলির মোড়ের 'চারু কেবিন' চোখে পড়ল অমলের। মনে পড়ল শম্ভুর কথা। 'লক্ষ্মী ভাণ্ডারের' সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ ক'রে কালই চারু কেবিনে চলে এসেছে অমল। যতদিন অন্য কোথাও কাজকর্ম না জোটে চায়ের দোকানের মালিক রমাপদ দাস শম্ভুকে সেখানে থাকতে অনুমতি দিয়েছে। খোরাকী খরচ অবশ্য শম্ভুর নিজেকেই চালাতে হবে।

(ক্রমশঃ)

নতুন ধরনের ধাঁধা

রেজকির ফেরে

১। দোকানে গিয়ে একজন লোক সাড়ে তিন আনা দামের জিনিস কিনলো। দাম দিতে দিলো একটা আধুলি। দোকানী তাকে ফেরত দিলো দুটো রেজ্‌কি—একটা কিন্তু তার সিকি নয়। তা'হলে তার রেজকি দুটো কী, বলো দেখি ?

হরফ নিরুদ্দেশ

২। নিচের অক্ষরগুলিকে একটি সম্পূর্ণ এবং সার্থক ইংরেজী বাক্যে খাড়া করতে পারা যায় ? পারো কিনা দেখোতো। তা করতে হলে একটি অক্ষরকে, এবং সেই একই অক্ষরকে তেরোবার তোমায় ব্যবহার করতে হবে।

OYREAREDAERWRAERSTOU
TTHEEERIN

ছাপাখানার কাণ্ড

৩। তলায় চারটি বিখ্যাত প্রবাদবাক্য, বাক্যের অতীত হয়ে রয়েছে। কারণ আর কিছুই না, আমাদের সেই খেয়ালী কম্পোজিটার, স্বরবর্ণগুলি বিল্‌কুল্‌ বাদ দিয়ে এই অপরূপ ব্যঞ্জন তিনি বানিয়েছেন। কেবল তাই নয়, দু'টি কথার মাঝখানের ফাঁকটুকুও কোথাও রাখেন নি। ভদ্রলোককে ফাঁকি দিয়ে এই বাক্যগুলিকে কি তোমরা কেউ উদ্ধার করতে পারো ?

(ক) পটখলপঠসয়

(খ) যকদথতনরতরচলনবঁক

(গ) অধকসন্ন্যাসতগজননষ্ট

(ঘ) গঁয়যগভখপয়ন

দুই আর দুই-এ কত ?

(৪) একটা ভারী শক্ত বুদ্ধির আঁক : আচ্ছা, দুয়ে দুয়ে যোগ করলে সর্বদাই কি চার হবে ? তার বেশি কি আর কিছুই হতে পারে না কখনো ? মাথা ঘামিয়ে দেখ তো, হয় কিনা !

বিছানা বানাও

(৫) মধ্যের এই ইংরেজী অক্ষরগুলি জুড়ে একটা বিছানা বানাতে হবে। দেখ দিকি, পারো কিনা। বিছানার এক ধারে একটা টেবিল থাকবে, আরেক ধারে থাকবে একখানা চেয়ার।

পরপৃষ্ঠায় সবগুলির জবাব আছে। আগে চেষ্টা করে দেখো পারো কিনা, তারপরে জবাব দেখবে।

পুরাতন কথা

ইংরেজ আপ্যায়ন

আমাদের দেশে পূজা-পার্বণে বা বিয়ে অনুষ্ঠানে সাহেব-সুবোকে নিমন্ত্রণ করে আনার প্রথা প্রবর্তন করেন রাজা নবকৃষ্ণ এবং রাজা সুখময় রায়। তাদের আদর-আপ্যায়িত করবার জন্য বিলেতী খানা এবং নাচ-গানে খুব সমারহ হতো। রাজা সুখময় গান-বাজনার ব্যাপারে আরে ভালো ব্যবস্থা করতেন—হিন্দুস্থানী গৎ-এর সঙ্গে বিলেতী গৎ মিশিয়ে, মিশ্র গৎ রচনা করিয়ে, সাহেব-মেম অতিথিদের শুনিয়ে পরিতৃপ্ত করতেন। ধনীরা চালচলনে ইংরেজদের নকল সুরু করেন—সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা বিলেতী পোষাক ধরেছেন ১৮৮০ সাল থেকে। শীতকালে গরম-কাপড়ের অপেরা-কোট পরা ছিল তথনকার (১৮৮০-১৮৯২) ফ্যাশন। তারপর হলো চেষ্টারফীল্ড কোট এবং ওভার কোটের প্রবর্তন।

গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বহুবাজারে প্রথম প্রতিষ্ঠা। রিগো নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক ছিলেন এ স্কুলের তখন প্রধান শিক্ষক। তখন এ স্কুলের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট স্কুলটির ভার গ্রহণ করে, এবং স্কুলের প্রথম নাম হয়, সোসাইটি ফর দী প্রোমোশন অব, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল আর্টস।

ধাঁধার উত্তর

(১) একটা সিকি, একটা ডবল পয়সা। (একটা তার সিকি নয়, তা ঠিকই, কিন্তু অন্যটা সিকি।)

(২) Poppy prepared paper wrappers to put the pepper in.

(৩) (ক) পেটে খেলে পিঠে সয়।

(খ) যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

(গ) অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

(ঘ) গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

(৪) হয় বইকি। দুয়ে দুয়ে মিলে বাইশ হতে পারে। দুয়ে দুয়ে আবার দুধও হয়।

(৫)

মজার অঙ্কের উত্তর

২	১	৯
৪	৩	৮
৩	৫	৭

২	৭	৩
৫	৪	৬
৭	১	৯

৩	২	৭
৬	৫	৪
৯	৮	১

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ কে আর মাত্র এই তিন ভাবে সাজান সম্ভব।

বিচিত্রা

সুদর্শন

জন্মের পূর্বে অভিষেক

চতুর্থ শতাব্দীতে ইরাণের ঘটনা। রাজার যখন মৃত্যু হলো, রাণী হরমুজ তখন গর্ভবতী। গর্ভে ছেলে হবে, কি মেয়ে হবে, কেউ বলতে পারে না। রাজার জ্ঞাতিভাই শসান তখন সিংহাসন নেবার উদ্যোগ করলেন। ঘরোয়া বিবাদ এবং অশান্তি হলো আসন্ন। সে দুর্ভোগ যাতে না ঘটে, মৌলভী আর মোল্লার দল তার জন্যে করলেন কি,—তাঁরা বললেন, গণনায় তাঁরা দেখেছেন, রাণীর গর্ভে পুত্র জন্মাবে। তখনি আয়োজন হলো রাণীর গর্ভের সেই শিশুর অভিষেকের। দরবারে সোনার পালঙ্কে রাণী শুলেন—আমীর ওমরাও, উজীর প্রভৃতি সকলে দরবারে হাজির—পীর আর মোল্লারা তখন রাজ-মুকুট নিয়ে রাণীর পেটের উপরে রাখলেন এবং যা কিছু আচার অনুষ্ঠান যথারীতি হলো সম্পাদিত। তিনমাস পরে রাণীর গর্ভে হলো পুত্রের জন্ম—নতুন করে তাঁর অভিষেক হলো না আর এবং এই পুত্রই সাপর নামে পরে ইরাণে রাজত্ব করেন।

রোম রাজ্য বিক্রয়

পার্টিনাক্সের মৃত্যুর পর (১৯৩ খৃঃ) প্রীটোরিয়ান গার্ড-দল সারা রোম রাজ্য নিলামে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করেছিল। সে নিলামে ধনী-সদাগর ডিডিয়াস সানাভিয়াস জুলিয়ানাশ মার্কাশ, পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা মূল্য দিয়ে রোম-রাজ্য কিনেছিলেন। নিলাম-বিক্রীর তারিখ ২৮ মার্চ ১৯৩ খৃষ্টাব্দ। গ্রেট-বৃটেনে রোম-রাজ্যের পরিচালকবর্গ এ খবর পেয়ে তখনি ফিরলেন রোমে এবং জেনারেল সেপটিমাস সেভেরাশের অধিনায়কতায় ডিডিয়াসকে সিংহসন-চ্যুত এবং বন্দী করা হয়—তারপর হয় ডিডিয়াসের প্রাণদণ্ড! এ ঘটনা ঘটে ১৯৩ খৃষ্টাব্দের ২ জুন তারিখ। এর পরে সেপটিমাস হন রোমের সম্রাট।

চির-বর্ষার দেশ

দক্ষিণ-আমেরিকায় আছে পারাগুয়ে প্রদেশ। পারাগুয়েতে এক নদী আছে পারানা—প্রকাণ্ড নদী—ব্রেজিলের সীমানার কাছে এই নদী একুশটি শাখা বিস্তার করে দিকে দিকে বয়ে চলেছে। এই নদীর পাশাপাশি বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বারোমাস পড়ছে বৃষ্টি—বিরামহীন—বোধ হয় সৃষ্টির আরম্ভ থেকে। বৈজ্ঞানিকেরা এর কারণ জানতে পেরেছেন। পারাগুয়েতে আছে গুয়াইরা ফল্‌স—এতবড় প্রপাত দুনিয়ার কোথাও নেই! এই প্রপাতে দিনরাত জল পড়ছে অজস্র পরিমাণে, আর সেখানে সর্বক্ষণ বইছে জোর বাতাস একমুখী হয়ে—সে বাতাসে প্রপাতের ঝরা-জলের অনেকখানি মেঘ হয়ে জমছে—পরক্ষণে বাতাসের বেগে সে মেঘ ফেঁসে বৃষ্টির ধারা ঝরছে! প্রপাতের জল আর বাতাসের একমুখী বহার বিরাম নেই—কাজেই সেখানে বৃষ্টিরও বিরাম নেই!

মাতাল-পুরী

নিউ ইয়র্কের প্রাচীন নাম হলো মানহাত্তান। অর্থাৎ আদিম ইণ্ডিয়ানী "মান্না-হা-তা" একথার মানে হলো—মাতালের আড্ডা! এ নাম কি করে হলো তার একটু মজার ইতিহাস আছে। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স থেকে এখানে এসে নামেন—আবিষ্কারক-পর্যটক জিয়োভানি ভেরাৎসানো। তখন নিউ ইয়র্ক এমন সৌখীন মার্কিন জাতের লীলাভূমি ছিল না—দেশী ইণ্ডিয়ান জাতরা সেখানে করতো বসবাস। জিয়োভানি সঙ্গে এনেছিলেন মদ। দেশী লোকদের খুশী করতে তিনি সেই মদ করেন তাদের মুক্ত হস্তে পরিবেশন। মদ খেয়ে তারা আনন্দে মশগুল মাতোয়ারা! সেই থেকে তারা দেশের নাম দিয়েছে—মান্না-হা-তা। নিউ ইয়র্ক নাম মার্কিনীদের এখানে বসতি-স্থাপনের সময় ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার পর।

ফটো প্রতিযোগিতা

ফটো প্রতিযোগিতায় এ পর্যন্ত যাঁদের তোলা ও পাঠানো ছবি ছাপা হয়েছে, তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিচে মুদ্রিত হ'ল। নম্বর ও নাম দেখে মিলিয়ে নিন। ১৫ই ভাদ্রের পর আর কোন ছবি গৃহীত হবে না।

(১) দীপা মুখোপাধ্যায়, ৮বি দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা (২) কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ১২১ এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা (৩) সমর চৌধুরী, ৭৪বি, সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা, (৪) ঠিকানা দেওয়া ছিল না (৫) পান্না সেন, পি ৮।এ, বি, কে পাল এভিনিউ, কলিকাতা, (৬) বেলা বসু, বলেনপাড়া, পোঃ দুমকা, সাঁওতাল পরগণা, (৭) অনিমা সান্যাল, রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি (৮) ঠিকানা হারিয়ে গেছে, জানালে ভাল হয় (৯) সুব্রত রায়, ৯২ রসা রোড, কলিকাতা (১০) দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ২৮ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা (১১) কিঙ্কিণী রায় চৌধুরী, ৯ মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা (১২) সুমিত্রা সেন, ভবানীপুর, কলিকাতা (১৩) ঠিকানা হারিয়ে গেছে, জানালে ভাল হয় (১৪) মীরা দত্ত, মহিষাদল, মেদিনীপুর (১৫) শঙ্করজীবন সেনগুপ্ত, লালামুখ টী ষ্টেট, লালামুখ, কাছাড় (১৬) চিত্রা রায়, ২১ কালীঘাট রোড, কলিকাতা (১৭) ছায়া বসু, ১২ যতীনদাস রোড, কলিকাতা (১৮) মঞ্জুলা ঘোষ, বারিপোদা, ময়ূরভঞ্জ (১৯) বাণী রায়, ২১ কালীঘাট রোড, কলিকাতা (২০) মুকুল বিশ্বাস, পোঃ ময়ূরভঞ্জ গ্লাস ওয়ার্কস, ভায়া টাটানগর, বি, এন, আর (২১) ছায়া বসু, ১২ যতীন দাস রোড, কলিকাতা (২২) বুদ্ধদেব বসু, ডিহিরী নেতাজী সঙ্ঘ, সাহাবাদ, বিহার (২৩) রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২ বি আনন্দ ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা।

যাঁদের ছবি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার পর ঠিকানা হারিয়ে গেছে, তাঁরা ছবির নম্বর দেখে ঠিকানাটা আর একবার জানালে ভাল হয়।

নতুন বই

সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন

হিতোপদেশের গল্প—শ্রীরাজশেখর বসু। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য: ১৸৹

হিতোপদেশের গল্প ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের মূল লেখক বিষ্ণুশর্মার এই গল্পগুলি হাজার বছরেরও বেশি পূর্বে পৃথিবীর নানা দেশে প্রচারলাভ করেছিল। জীবজন্তুর কথোপোকথনের ভেতর দিয়ে যে শিক্ষা-সম্পদ মূল লেখক বিতরণ করে গেছেন তা চিরকাল শুধু ছেলেমেয়েদের নয়, সকল বয়সের মানুষকেই আনন্দ দেবে—জ্ঞান দেবে।

পরশুরাম, অর্থাৎ সুপণ্ডিত সাহিত্যরসিক রাজশেখর বসু এই গল্পগুলি তাঁর নিজস্ব সরস ভাষার সম্পদে উজ্জ্বলতর প্রাণময় করে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। "মৌচাকে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালেই সকলে তাঁর এই লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ তাঁদের উপযুক্ত রুচি অনুযায়ী ছবি, কাগজ ও ছাপায় বইটিকে সুন্দর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এ বই পড়া উচিত।

ছোটদের গোর্কির 'মা'—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক ভাবানুবাদ। দে ব্রাদার্স এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা। মূল্য: ১৷৹

রুশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক গোর্কির 'মা' (Mother) বিশ্বসাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ বই। যেমন অপূর্ব ও বিচিত্র এই গ্রন্থ, আবার তেমনি অপূর্ব এবং বিচিত্র ছিলেন এই উপন্যাসের গ্রন্থকার।

বিষয়বস্তুতে এবং বিশ্লেষণে গোর্কির 'মা' (Mother) বইখানি কেবল পরিণত বয়স্কদের পক্ষেই উপযোগী। কিশোরদের জন্য উপযোগী ক'রে এই বই-এর ভাবানুবাদ করা যায় কিনা সে-বিষয়ে আমাদের বরাবরই সন্দেহ ছিল। এমন কি, এইরকম একটি ভাবানুবাদ অসম্ভব বলেই আমাদের বিশ্বাস ছিল। তাই, যখন সমালোচনার জন্য খগেনবাবুর 'ভাবানুবাদ'টি হাতে এল, তখন অতিমাত্রায় উল্লসিত হই নি। খগেনবাবুর লেখা 'ছোটদের গোর্কির "মা"' প'ড়ে কিন্তু আমাদের মত বদলে গেছে। খগেনবাবু প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

মধুচক্র

তোমাদের জন্যে লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়লো বাইশে শ্রাবণের কথা। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, কি ভাবে এই দিনটা পালনের কথা অমি প্রতি বছর স্মরণ করিয়ে দিই। অনাড়ম্বর ও পবিত্রভাবে এই দিনটীকে স্মরণ করা দরকার। সকাল থেকে রাতের মধ্যে একটা সময় করে নেবে এবং সেই সময়টুকু শুধু এইজন্যই ব্যয় করবে। তখন অন্য কিছু তাতে স্থান পাবে না। গৃহমার্জনার পর ধূপ দীপ ধূনায় ঘরটীকে পবিত্র করে তুলো এবং কবির ছবিতে চন্দন পুষ্পমাল্য দিও। কবির প্রিয় ফুল রজনীগন্ধা, সম্ভব হলে রজনীগন্ধার ঝাড় বা একটী মালা তাঁর প্রতিকৃতির কাছে দিও—তবে যদি এই সংগ্রহের জন্য বিশেষ অসুবিধা থাকে তা'হলে তা করতে যেও না, যারা আছ দূরে, পল্লীগ্রামে—তারা হাতে করে বন থেকে, বাগান থেকে যে ফুল সংগ্রহ করবে তাতে অচনার আরো গৌরব বাড়বে বই কমবে না। সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন ও আন্তরিকভাবে এই যে স্মরণ করা—এর তুলনা কোথায়? সেই ধূপ-ধূনা ও দীপের আলোকে চন্দনে মাল্যে ভূষিত কবির প্রতিকৃতির সম্মুখে বসে তাঁর প্রিয় সঙ্গীতগুলি ও কবিতাগুলি পাঠ করো, অর্থাৎ দিনান্তের কিছুটা সময় তাঁকে স্মরণ ও মনন কোরো। একাধারে এরূপ সর্বগুণের সমন্বয় একটি মানুষের মধ্যে দেখা যায় না—আমাদের রবি-কবি তাই ছিলেন পৃথিবীর পরমাশ্চর্য! দেশ-বিদেশ থেকে জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতরা এসে তাঁকে তাই অভ্যর্থনা করেছে, তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে প্রতিভার কাছে মাথা নত করেছে। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের লেখা কবিতা, গান, ছড়া—যদি পাঠ করো, অর্থাৎ সত্যিকারের পাঠ করা যাকে বলে, তা যদি করো—তা'হলে জীবনের অর্ধেক কেটে যাবে তার মাধুর্য ও মহিমা উপলব্ধি করতে। তোমরা ছোট থেকে তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হও এটা কিন্তু আমরা চাই। সহজপাঠ ও শিশু থেকে সুরু করবে যত বড় হবে ততই দেখবে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা বেড়ে চলবে।

যাক—এসো ২২শে শ্রাবণকে স্মরণ করি শ্রদ্ধায়। মনে রেখো কবি মৃত্যুকে শোক হিসাবে গ্রহণ করতেন না—তাই তাঁর মৃত্যুর পর কেউ শোক করবে তা তিনি চাননি। তিনি বলেছিলেন—

> বাঁশী যখন থামবে এসে
> নিভবে দীপের শিখা
> তখন যেন কবির তরে—
> ভীড় না জমে সভার গৃহে
> হয় না যেন উচ্চৈঃস্বরে
> শোকের সমারোহ।

তাই এটা শোক নয়। একটা বিশেষ দিনে তাঁকে বেশী করে আন্তরিকভাবে স্মরণ করা।

২২শে শ্রাবণের মর্ত্যের আন্তরিক স্পর্শহীন শ্রদ্ধা প্রণতি কবির চরণে পৌছুক।

মধুদির উত্তর—রঞ্জনা বসু (যাদবপুর কলোনী)—তোমার চিঠিটি যথাস্থানে পৌছিয়ে দিলাম। তোমরে অন্য প্রশ্নের জবাবে সোজা জবাব দেওয়া উচিত হবে না—চেষ্টা কর আন্দাজে

বুঝবার। **ধীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য** (নলবাড়ী)—স্কুলের ছাত্র হিসাবে এখন ও বইটি পড়া অনুচিত—তবে স্কুলের পড়া ছাড়াও বাইরের বই যত পড়বে তত জ্ঞান বাড়বে—চেষ্টা কোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস বইয়ের মধ্যে নিজের পড়বার আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখতে। তোমার মা যা বলেছেন সেটা ঠিক। **গৌরদেব মুখোপাধ্যায়** (বাঁকুড়া)—তোমার চিঠির ভাষা দেখে মনে হোল তুমি যে ক্লাসে পড় লিখেছ সেটা মোটেই সত্যি নয়—আমার আসরে মৌ ভাই-বোনেদের প্রবেশের অবাধ অধিকার আছে। **নেতাজী সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ** (সাহাবাদ)—হ্যাঁ তোমরাও মজার লেখা পাঠাতে পারো, ঐ পত্রিকাটির ঠিকানা আমার জানা নেই। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার অভিমান এখনও গেল না দেখছি—গত মাসে দু'বার চিঠির জবাব দিয়েছি। লেখা যা প্রকাশের জন্যে পাঠাবে পাতার দু'পিঠে কখনই লিখবে না। তোমার কবিতায় লেখা চিঠিটা ও আলপনা পেলাম। মধুচক্রের সভ্যা করবার জন্যে এখন আর আমরা টাকা পয়সা সংগ্রহ করছি না—যে কোন সভ্য সভ্যা মধুচক্রের সভ্য সভ্যা হবে। **তুষারকান্তি ঘোষ** (মাধিপুরা)—তোমার অনুযোগ অভিযোগ শুনলাম—খেলাধুলা সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ করে এই ফুটবল মরশুমের সময় এমন কোন কাগজ নেই করে না—সেইজন্য মাঝে মাঝে ঐটি মৌচাকে প্রকাশ করা হয়। তোমার মজার লেখা দু'টি পেয়েছি। **মনওয়ারা খাতুন** (ডিব্রুগড়)—তোমার পরীক্ষার ফল ভালো হবে এ বিশ্বাস আমার আছে—ভালো ভালো বই জোগাড় করে পড়বার চেষ্টা করো—তা'হলে তোমার অফুরন্ত সময় কাটিতে পারে। যে সব সংখ্যাগুলি পাওনি সম্পাদক মশায়কে জানিও, যদি থাকে তো পাবে। **চিত্রা সেন** (ভবানীপুর)—মধুচক্রের জন্যে আমরা মৌচাকের সভ্য সভ্যার কাছে ॥০ করে চাদা নিতাম বিশেষ কোন অনুষ্ঠান করবার জন্যে, কিন্তু এখন আমরা ঐ চাঁদা-সংগ্রহ স্থগিত রেখেছি। **শঙ্কর চক্রবর্তী** (কৃষ্ণনগর)—তুমি ওখানে চিঠি লিখলে আমি নিশ্চয় পাবো। যাদের চিঠি পেয়েছি—**নমিতা চক্রবর্তী** (কৃষ্ণনগর)—**সুনন্দা সেনগুপ্ত** (হুগলী)—**তপতী রাহা** (বহরমপুর)—**পিণ্টু মজুমদার** (লখনউ)—**মিতা দেব** (শোভাবাজার)—**মঞ্জু সেন** (বালীগঞ্জ)।

বৈশাখ মাসের মজার খেলার জবাবঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাতি "ক্ষীরের পুতুল" থেকে নেওয়া হয়েছে। যাদের জবাব ঠিক হয়েছে— **মৈত্রেয়ী দত্ত, তপতী** ও **ভারতী নন্দী** (বহরমপুর)—**প্রণতি রায়চৌধুরী** (কোলকাতা)—**মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়** (দমদম) —**পিণ্টু মজুমদার** (লখনউ)—**রণজিৎ ঘোষ** (বউবাজার)—**জন মুখোপাধ্যায়** (কোলকাতা)—**অজন্তা চক্রবর্তী** (শ্যামবাজার)—**টুনটুন** ও **রেবা মজুমদার** (কোলকাতা) **অরূপ** ও **আলপনা রায়** (শিয়ালদহ)—**অলকনন্দা বসু** (ভবানীপুর)—**প্রতিমা, নন্দিতা, সুমিতা, যূথিকা সরকার** (বউবাজার)।

আচ্ছা আজ এইখানেই। আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। ইতি—

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

গত বৈশাখ মাস থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে, আগামী ১৫ই ভাদ্র শেষ হবে। যে কোন লোক এই প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠিয়ে পুরস্কার পেতে পারেন। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ফটো গৃহীত হবে।

চিত্র পরিচয়

(২৪ থেকে ৩৩নং ছবি)

উপর সারিতে

২৪। শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য, c/o, শ্রীআনন্দগোপাল ভট্টাচার্য, কমানডান্ট, আমরাদা রিলিফ ক্যাম্প, ময়ূরভঞ্জ। ২৫। শ্রীদীলিপকুমার চক্রবর্তী, ২৮ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। ২৬। শ্রীঅরুণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৫ এ, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা ২৯।

মধ্যের সারিতে

২৭। রেখা ও অশোক দত্ত, c/o, ডাঃ এস, কে, দত্ত, এগজিবিসন রোড, পাটনা। ২৮। শ্রীদীলিপকুমার সান্যাল, ৩৩ রসা রোড, কলিকাতা। ২৯। শ্রীগৌতম মিত্র, c/o শ্রীকৌশিক মিত্র ১২।৮, আওরংজেব রোড, নিউ দিল্লী ২।

নিচের সারিতে

৩০। শ্রীতপতী রাহা, বহরমপুর (পশ্চিম বঙ্গ) ৩১। ডাঃ এন, সরকার, আর, কে, চ্যাটার্জী রোড, কসবা, কলিকাতা। ৩২। শ্রীতপেন্দ্রনাথ সেন, ১৩৫ কুঠিঘাট রোড, কলিকাতা। ৩৩। কুমারী মায়া সেন, ৮৩ এ, কৃষ্ণনগর, সাদরা, দিল্লী।

ভাদ্র—১৩৫৮

৩২শ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

তন্দ্রাপরী
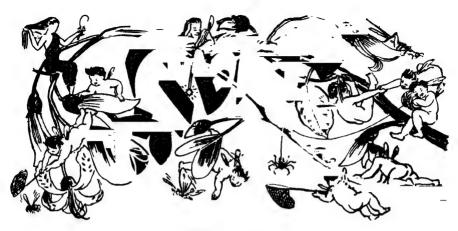
শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

✱

দেখা হ'ল অন্ধকারে ঝাপ্‌সা-আলোর মাঝে—
ঝোপের ধারে ঝাউয়ের তলে এসে,
দম্‌কা হাওয়ার মাঝে সেদিন আলো-আঁধার সাঁঝে
তাহার দেখা পেলাম অবশেষে।

দেখা হ'ল তন্দ্রাপুরীর তন্দ্রাপরীর সাথে—
ধূসর-সাঁঝে প্রান্তরেরি ধারে,
সন্ধ্যা যেন ঝিমিয়ে আছে প্রথম প্রহর রাতে—
ফুলের বনে, ঝোপের চারিধারে।

তন্দ্রপরী একলা এসে বেড়ায় একা একা—
মূর্চ্ছা এসে ঝরে পড়ে তায়।
আব্‌ছা-আলোয় তাহার সাথে হঠাৎ হ'ল দেখা,
তন্দ্রা চোখে কেবল নামে হায়।

দেখ্‌লে তাহার মধুর সে রূপ ভুল্‌তে কি কেউ পারে ?
হাওয়ায় ওড়া ঝাপ্‌সা কাপড় অঙ্গে,—
বাতাস-গড়া ওড়্‌না গায়ে বেড়ায় চারিধারে,—
হঠাৎ দেখা ঘুমের পরীর সঙ্গে !

তন্দ্রাপরীর নিচোল যেন সাঁঝের আলোয় গড়া—
আবছা-আলোয় দেখতে পেলাম ঠিক্‌ !
আঁখি-যুগল ঢুলঢুলে তার তন্দ্রামায়ায় ভরা—
ঝাপ্‌সা চোখে দেখ্‌নু অনিমিখ !

কুহক-ভরা মুখখানি তার কুহেলিকায় ভরে,
পান্নাঝুরির সব্‌জে সে হার চুলে—
নিশ্বাসে তার হেনার সুবাস, চেতন নিল হরে ;
তারে ঘিরে' রইল সুবাস ফুলে !

হাল্‌কা দেহে আল্‌গা পায়ে একলা ঘোরে ফিরে,
রঙীন ঠোঁটে মধুর হাসি বাঁকা,—
পাত্‌লা বাতাস হিমের সাথে বহে চলে ধীরে—
আবছা স্বপন ঝাপ্‌সা হ'ল আঁকা !

চোখ ঢুলিয়ে তন্দ্রাপরীর সাথে হ'ল দেখা—
মাঠের মাঝে একান্ত নির্জনে !
মূর্চ্ছা হেনে তন্দ্রাপরী ফির্‌ছে একা একা—
ঘুমের দেশে হিমের হাওয়ার সনে ॥

আদিকালের কথা

শ্রীজ্ঞানাঙ্কুর চক্রবর্তী

আমাদের এই শ্যামা পৃথিবী—আর আমরা মানুষ সে পৃথিবীতে আজ আধিপত্য বিস্তার করেছি,—জলে-স্থলে মানুষের আজ অমোঘ প্রতাপ! অথচ কত হাজার-হাজার বছর আগে এই মানুষ আমরাই ছিলুম অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া! আমাদের না ছিল বাড়ী-ঘর, না ক্ষেত-খামার, না বাগান-পুকুর, না এতটুকু সম্পত্তি! পৃথিবীর বুকে তখন না ছিল গ্রাম বা শহর, পথ-ঘাটের চিহ্নও ছিল না! পৃথিবীর বুকে ছিল ঘন বন-পাহাড়-পর্বত, দুর্লঙ্ঘ্য নদ-নদী-সাগর! বনে ছিল হিংস্র পশু, কত রকমের পক্ষী,—নুড়িপাথর, গাছের ডাল-পালা ছিল মানুষের আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র! সে অস্ত্রে পশুপক্ষীর আক্রমণ থেকে মানুষ যেমন আত্মরক্ষা করতো, তেমনি ঐ-অস্ত্রে পশুপক্ষী মেরে তাদের মাংস খেয়ে প্রাণধারণ করতো। এই পশুপক্ষীর মাংসই ছিল মানুষের একমাত্র খাদ্য। এক কথায় মানুষ তখন ঠিক্ এই মানুষ ছিল না—সে ছিল ইতর পশুর চেয়ে একটু উঁচু শ্রেণীর জীব!

তারপর বর্ষে-বর্ষে জন্মসূত্রে মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগলো—সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-সমস্যা বাড়লো। শিকার-সামগ্রী নিয়ে পরস্পরে সংঘর্ষ বাধিতে লাগলো। এ-সংঘর্ষে সকলেই বিপন্ন—তাই আত্মরক্ষা এবং নিরাপদ শান্তির আশায় মানুষ দল গ'ড়ে দলগত সীমারেখা নির্দিষ্ট ক'রে সেই সীমারেখার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগলো!

এই সময়ে মানুষের কথার ভাণ্ডার খুব সঙ্কীর্ণ ছিল। দিনে-দিনে মানুষ নানা দিকে অভাব এবং অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলো—সে অভাব-অস্বাচ্ছন্দ্য মোচনের উপায় নির্ধারণে মানুষ সর্বক্ষণ সচেষ্ট—তার ফলে মানুষ শিখলো চাষ-বাস, তৃণ শস্য ফসল বুনতে এবং সব ফসল সঞ্চয় ক'রে রাখতে। নিত্য মাংস ভোজন—সে মাংস মানুষের অরুচি ধরেছিল—স্বাদ-বৈচিত্র্যের লোভে উদ্ভিদে হলো রুচি—পশুপালনের উপকারিতাও মানুষ ক্রমে বুঝতে পারলো—বুঝে গো-মেষ-মহিষ বরাহাদি পালনে তার হলো অনুরাগ, এবং প্রয়োজন মত মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে লাগলো।

এ হলো (বেশীরভাগ ঐতিহাসিকের মতে) প্রায় দশ বারো হাজার বছর আগেকার কথা। আগে মানুষ ছিল স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব—কিন্তু সকলেই যদি আত্মসর্বস্ব হয়, তা'হলে কারো পক্ষে জীবন নিরাপদ হতে পারে না! আমি আজ বাগান তৈরী করে সে-বাগানে নানাজাতের ফল—ক্ষেত চ'ষে সে-ক্ষেতে নানা রকম ফসল ফলালুম—আমার বাগানের ফল আর ক্ষেতের ফসল দেখে তোমার হলো লোভ, তুমি এলে তা লুঠ করতে—ফলে মারামারি কাটাকাটি! তুমি না

হয় জিত্‌লে, জিতে আমার ফল-ফসল করলে কবলিত,—কিন্তু তুমি তা নিরাপদে ভোগ করবে কি, "মৌচাকের" সম্পাদক মশাই (অবশ্য সেকালে যদি "মৌচাক" থাকতো এবং "মৌচাক" অফিসে না থেকে এমনি আবহাওয়ার মধ্যে যদি "মৌচাকের" সম্পাদক মশাই বাস করতেন) তোমার কাছ থেকে ও-লুঠের সামগ্রী গায়ের জোরে কেড়ে নিলেন! কাজেই কারো পক্ষে নিরাপদ-নির্ঝঞ্ঝাটে ফল বা ফসল ভোগ করার উপায় ছিল না! এমন অবস্থায় মানুষে মানুষে হলো রফার ব্যবস্থা, "আমার", "তোমার" বোধে একজন অপরের সামগ্রীতে হাত দেবে না,—এই ব্যবস্থা! এ ব্যবস্থাকে কায়েমী করতে মানুষ শিখলো ঘর-বাড়ী তৈরী ক'রে সেই ঘর-বাড়ীতে বাস এবং ফল-ফসল রক্ষা। দলগুলি হলো সমাজ বা সঙ্ঘ। পূর্বে শিকার করে খাদ্য-সংগ্রহ করতে হতো—যখন চাইবো, তখনি শিকার মিলতে পারে না, শিকার মিললে তারপর খাওয়া—এজন্য আহারের জন্য মানুষের নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না। এখন ফলমূল আর ফসল খাদ্য ঘরে মজুত থাকে বলে, মানুষের আহারের সময় হলো নিরূপিত এবং সুনির্দিষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের দাম এবং মানুষের সমাজে শ্রমের নানা বিভাগ নির্দিষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত হলো।

পশুপক্ষীর সমাজে মৌমাছি, কাঠবিড়ালী, বীভার,—এমন কি কুকুরও খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখে, সেই মান্ধাতার যুগ থেকেই তাদের সমাজে এ-ব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু আদ্যিকালের মানুষ জানতো না, সঞ্চয় কাকে বলে! বহু বৎসরের অভিজ্ঞতায় মানুষ শিখেছে সঞ্চয়ী হতে।

বাড়ী-ঘরে খানিকটা নিরাপদ শান্তিতে বাস করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাজে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। তার আগে মানুষের কাজে এতটুকু শৃঙ্খলা ছিল না,—একান্ত প্রয়োজন বা মনে খেয়াল প্রবল হলে মানুষ কাজ করতো। অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতো,—যখন যেমন অস্ত্রের প্রয়োজন বোধ হতো। সবচেয়ে বিপদ হতো আগুন জ্বালতে হলে। পাথরে-পাথরে ঠুকে—শুকনো ডাল-পাতা সংযোগে আগুন জ্বালা হতো। বার-বার এমনিভাবে আগুন জ্বালায় পরিশ্রম অল্প হতো না—এজন্য আগুন একবার জ্বালা হলে সে আগুনকে জ্বালিয়ে অনির্বাণ রাখার জন্য মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো—এবং সে চেষ্টা সফল হলো।

শ্রম বা গতরে খাটার কাজ আদিযুগে করতো মেয়েরাই। সে যুগে মেয়েদের উপর পুরুষের এতটুকু শ্রদ্ধা বা মমতা ছিল না। পুরুষের খেয়াল হলো, হাওড়া থেকে (তখন অবশ্য হাওড়ার চিহ্নও ছিল না) আস্তানা তুলে বর্ধমানে আস্তানা পাতবো! ব্যস্, মেয়েদের সাধ্য ছিল না যে বলবে, কেন? হাওড়ায় তো বেশ আছি! পুরুষের খেয়ালে হতো কাজ। যেমন খেয়াল হলো চলো বর্ধমান, অমনি ডেরা-ডাণ্ডা তোলা,—মালপত্র ব'য়ে চললো মেয়েরা—পুরুষ শুধু অস্ত্র হাতে সঙ্গে সঙ্গে চললো!

মানুষের সমাজে এই যে চাষবাসের প্রচলন, এটি ঘটেছে মেয়েদের দৌলতে। ফল খাওয়া হলে ফলের বীজগুলি কুড়িয়ে জড়ো করে রাখতো মেয়েরা—এ বীজগুলি ছিল মেয়েদের খেলার সামগ্রী। মাটিতে বীজগুলি ফেলে রাখা হতো—এবং মাটিতে ফেলে রাখা বীজগুলি থেকে যখন প্রথমে অঙ্কুর হতো এবং সে অঙ্কুর থেকে তৃণপত্রোদ্গাম হয়েছিল, তখন মানুষের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এমনিভাবেই হয় মনুষ্যসমাজে বাগ-বাগিচার সৃষ্টি—সখের জন্য নয়—খাদ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে।

এমনিভাবেই দিন যায় রাত্রি আসে—রাত্রির পর আবার নূতন দিন, এবং এই দিন আর রাত্রির যাতায়াতে আসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে গাছপালা শুকিয়ে যায়, বর্ষার ধারায় বন্যার স্রোতে মাটি যায় জলের তলায় তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে, আবার বর্ষা-অন্তে সে জল স'রে গেলে মাটি জেগে ওঠে। এই জেগে-ওঠা মাটির যেন নবীন রূপ, নবীন শক্তি; সে মাটিতে তৃণশস্য গজিয়ে ওঠে প্রচুর অজস্রভাবে। এ সব দেখে-দেখে মানুষ অনেক কিছু শিখলো। মানুষ শিখলো ঐ নীচু জমি—বর্ষার জলে যে জমি ডোবে আবার বর্ষার পর জেগে ওঠে—ঐ জমিই হলো ফসলের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী—এবং এ অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উঁচু জমিতে জল সিঞ্চন করে সে জমিকেও শস্যাদি রোপণের উপযোগী করে তুললো। এ ব্যবস্থায় খাল কেটে মানুষ শিখলো সর্বত্র জল-সরবরাহ বা irrigation-এর বিদ্যা-কৌশল।

কিন্তু আজ পৃথিবীর বুকে এই যে সভ্যতা জ্ঞান এবং বুদ্ধি-বিকাশে যে-সভ্যতা ক্রমেই বাড়ছে—নানা স্বাচ্ছন্দ্যে সুখে মানুষকে পরিতৃপ্ত করছে—শুধু ঐ চাষের উপরে নির্ভর রেখে এ-সভ্যতা গড়ে ওঠেনি—গড়ে উঠতে পারে না। একজন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক বলেছেন—Cultivation it not civilization, চাষবাসের কাজে নৈপুণ্যলাভ হলেই সভ্যতার সৃষ্টি হয় না। ধান-যব-গম চাষের ভাঁড়ারে সর্বপ্রথম সম্পদ এবং এই চাষের বিদ্যা মানুষ আয়ত্ত করেছিল—বারো-চোদ্দ হাজার বছর আগে।

চাষবাসের প্রচলন এবং প্রসার হবার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে বছরের পর বছর নিয়মিতভাবে চাষ-আবাদ করতে করতে মানুষ সেই নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে নিজের অধিকার কায়েমী করলো—এবং এই কায়েমী ভূমি হলো মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি। সম্পত্তি যখন হলো, তখন এই সম্পত্তিরক্ষার জন্য মানুষকে তৎপর হতে হলো—এবং এমনি করেই হলো নর-সমাজে মহল্লা, পল্লী, তালুক প্রভৃতির সৃষ্টি!

নির্দিষ্ট ঘরে বাস; নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে চাষ আবাদ; সেই সঙ্গে চাষের জমির উন্নতি-সাধন, স্নান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা। গৃহপালিত পশুপক্ষীর লালনপালন—এসবের উপযোগিতা

বুঝে মানুষ অনিশ্চিত যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করে ক্রমে গৃহবাসী হলো। গৃহবাসী হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী জিনিসপত্র অনায়াস-লভ্য ক'রে তুলতে হাট-বাজার, গ্রাম-নগর, পথ-ঘাট প্রভৃতি নির্মিত হলো। এমনি করেই এশিয়া এবং য়ুরোপখণ্ডে নানা প্রদেশ, নানা সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হলো। প্রতি প্রদেশ এবং প্রতি সাম্রাজ্যের মানুষ নিজের নিজের দেশ ও সাম্রাজ্যকে সুন্দর, সুখময়, সুশৃঙ্খল এবং সমৃদ্ধ করে তুলতে মনোযোগী হলো। তার ফলে বনজঙ্গল কাটা—শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য লোকবল বাড়ানো—সাম্রাজ্য বিস্তার-বাসনা, মানুষকে নবজীবনে উৎসাহিত ক'রে তুললো। এখনকার পৃথিবীর যে-মূর্তি আমরা দেখছি—এ মূর্তি গড়ে তোলবার স্বপ্ন মানুষ দেখেছিল—এই সময়ে প্রায় চার পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে—সেই সাম্রাজ্যকে শস্যসমৃদ্ধ ক'রে, লোকবলে সবল ক'রে।

সে কাহিনী রূপকথার চেয়েও মনোজ্ঞ—সে কাহিনী আর একদিন বলবো।

এটাও একটা দাওয়া

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

*

ছারপোকাতে কামড়ে দিল চমকে গেল পিলে ;
ভালই হ'ত অনেক যদি আস্ত খেত গিলে।
ঘুমের ঘোরে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল বেগে—
কুট্ কুট্ কুট্—বিষম জ্বালা, আঁৎকে উঠি জেগে।
ধর-ধর-ধর পালিয়ে গেল, যায়না ছোটা পিছু ;
শিবতলাতে ধর্ণা দিয়ে ওষুধ পেনু কিছু।
চাও যদি কেউ ছারের ওষুধ—শিশি ধুয়ে এনো,
খাট-পালঙের ছারপোকারা মরবে এতে জেনো।
কেমন ক'রে প্রয়োগ হবে, বিধান মত দিও ;
কাগজখানা পড়ছি আমি, তোমরা লিখে নিও।
বলছি শোন : খলের মাঝে একটুখানি নিয়ে,
সাবধানেতে একটি ফোঁটা তুলবে আঙ্গুল দিয়ে।
আর একজনে বাঁ-হাত দিয়ে ছারপোকারে ধরে,
ছুঁচ দিয়ে তার দখিন হাতে হাঁ-করাবে জোরে।

একটি ফোঁটা গড়িয়ে দেবে, গিল্‌লে পরেই ঢোঁক,
সত্যি কথা, বিষেই তাহার মরবে ছারের পোক।
হয়না এতে ? বলছ কি গো ? হাসছ কেন, একি !
আরও আছে, কাগজখানা ভাল করেই দেখি।
কি বলছ ? মরবে নাকো ? বলছ নেবে পরে !
ভাগ বলে দেই, লিখে নে'যাও, তৈরী ক'রো ঘরে
ভাগের জিনিস বিশেষ নহে, মিলবে ঘাটে-পথে,
ঘরে বসেই তৈরী হবে কবিরাজী মতে।
বন-বাদাড়ে দেখতে পাবে যত রকম পাতা,
তারই খানিক আনবে তুলে, হোকনা বুনো যা-তা'।
পিষবে খলে, রস নেবে তার, রাখবে ভ'রে শিশি,
ছারপোকাদের ওষুধ হবে, কাটবে সুখে নিশি।
বলছ বটে মারতে কেন হাঙ্গামেতে যাওয়া ;
টিপলে মরে জানি, তবে, এটাও একটা দাওয়া !

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল

শরৎচন্দ্র হলেন উপন্যাস-রাজ্যের মায়াবী মণিকার। উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হোল মানুষ ও তার মন। সেই মানুষ এবং তার অন্তরকে জানার জন্য শরৎচন্দ্র আপ্রাণ সাধনা করেছিলেন। জীবনভর সেই সাধনাই তিনি করে গেছেন।

মানুষের মেলায় গিয়ে চিনতে হবে মানুষকে। চেনা মানেই তো তার অন্তরকে চেনা, যে অন্তরের মধ্যে পাশাপাশি রয়েছে সুখ ও দুঃখ, ভালবাসা ও ঈর্ষা, আনন্দ ও বিরাগ এবং আরও কত বিচিত্র অনুভূতি।

কোন্ জাদুমন্ত্র শরৎচন্দ্রের জানা ছিল যার দ্বারা মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল এত নিবিড়? ছিল নিশ্চয়ই কোন জাদুমন্ত্র যার প্রভাবে ধনী আর দরিদ্র, বড় আর ছোট, শহরের লোক আর গ্রামের মানুষকে তিনি চেনার মতন চিনেছিলেন, এসেছিলেন তাদের অন্তরের অত্যন্ত কাছাকাছি।

তাঁর সম্বল ছিল প্রেম, প্রীতি ও সহানুভূতি, যা দিয়ে তিনি সব মানুষকে আপন করেছিলেন, দূরকে করেছিলেন নিকট। আর দূরের মানুষ যখন কাছের মানুষ হয়, তখনই তো এক হৃদয়ের সঙ্গে আরেক হৃদয়ের জানাজানি, মনের সঙ্গে মনের মিলন, মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব।

আর ছিল তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

মানুষকে যেমনভাবে তিনি দেখেছেন, ঠিক তেমনিভাবেই তদের তিনি এঁকেছেন। মানুষের দোষগুণ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সমান দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর শিল্পজনোচিত এবং আশ্চর্য লেখার গুণে তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি মানুষের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

যারা নিঃস্ব, যারা রিক্ত, তারা তাঁর কাছ থেকে পেত প্রাণঢালা ভালবাসা। যাদের দিকে কেউ তাকায় না, কেউ খোঁজ নেয় না যাদের, তাদের তিনি ছিলেন আত্মীয়, আপনার জন।

কোন মানুষকেই তিনি ঘৃণা করতেন না, কারণ, তিনি জানতেন যে, কোন খারাপ মানুষই একেবারে মন্দ নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে, অসৎ মানুষকেও যদি সুযোগ দেওয়া যায় ভাল হওয়ার, যদি সোনার কাঠি ছোঁয়ানো যায় তার প্রাণে, তবে, সে-ও পরিবর্তিত হোতে পারে,—বদলে যেতে পারে তার জীবনের ধারা।

তিনি নিজে জীবনে অনেক দুঃখ, কষ্ট পেয়েছিলেন। তাই তিনি বুঝতেন দুঃখীর দুঃখ, দরিদ্রের মনোবেদনা। দরিদ্রের বেদনা তাঁর কোমল প্রাণে কাঁটার মতো বিঁধত। তাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের কাহিনীকে তিনি অবিনশ্বর রূপ দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে, তাঁর প্রাণের সমস্তটুকু দরদ ও মমতা দিয়ে।

শরৎচন্দ্রের অমর গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ হয়ে থাকবে।

১৩৪৪, ২রা মাঘ বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাক ও কামরাঙা

(সংগ্রহ)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক কামরাঙা গাছে একটি কামরাঙা পেকে টুকটুক করছে, দেখে কাকের বড়ো লোভ হ'ল। কামরাঙাটি খাবে বলে সে গিয়ে বসল গাছের ডালে। কামরাঙা কাকের মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে, "ভাই কাক, আমাকে খাবে খাও, কিন্তু তোমার ঠোঁটে নোংরা জিনিস লেগে আছে, ও ঠোঁট আমার গায়ে ছুঁইয়ো না। আগে গঙ্গার জলে ঠোঁটটি ধুয়ে এস, তারপর যত ইচ্ছে খেয়ো।" অগত্যা কাক আর কি করে, গঙ্গায় গেল ঠোঁট ধুতে। কাক যেই না জলে ঠোঁট ডুবোতে গেছে, অমনি মা গঙ্গা জলের মধ্যে থেকে বলে উঠলেন, "হাঁ হাঁ, করো কি, করো কি? তোমার ঐ নোংরা ঠোঁট আমার জলে ডুবোচ্ছ কেন?" কাক বললে, "কি করব মা, ঠোঁট না ধুলে কামরাঙা আমাকে খেতে দেবে না। ধোব ঠুঁটি, খাব সেই কামরাঙাটি।"

মা গঙ্গা বললেন, "তা বেশ, কুমোরবাড়ী থেকে টাটি (ভাঁড়) নিয়ে এস, জল তুলে ডাঙায় ব'সে যত খুশি ধোও। আমি কিচ্ছু বলব না।"

অগত্যা কাক গেল কুমোরবাড়ী। বললে, "কুমোর ভায়া, কুমোর ভায়া, একটা টাটি দেবে। তুলব জল, ধোব ঠুঁটি, খাব সেই কামরাঙাটি।" কুমোর বললে, "টাটি তো গড়তে পারি, মাটি কোথায় পাই? হরিণকে বলো, সে শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ে দিক। মাটি খুঁড়ে দিলেই আমি টাটি তৈরি ক'রে দেব।"

অগত্যা কাক গেল হরিণের কাছে। বললে, "হরিণ ভায়া, হরিণ ভায়া, তোমার শিং দিয়ে আমায় একটু মাটি খুঁড়ে দাও না। দেব কুমোরে, গড়বে টাটি, তুলব জল, ধোব ঠুঁটি, খাব সেই কামরাঙাটি।" হরিণ বললে, "আমি হলুম জ্যান্ত হরিণ। আমার শিং দিয়ে কতটুকু মাটি উঠবে? তার চেয়ে কুকুরকে বলো আমাকে মেরে ফেলে শিং দুটো খুলে দিতে। সেই শিং দিয়ে অনেক মাটি খোঁড়া চলবে।"

অগত্যা কাক গেল কুকুরের কাছে। বললে, "কুত্তোভায়া, কুত্তোভায়া, হরিণকে মেরে দেবে? নেবো শিং, খুঁড়ব মাটি, দেব কুমোরে, গড়বে টাটি, তুলব জল, ধোব ঠুঁটি, খাব সেই কামরাঙাটি।" কুকুর বললে, "হরিণ তো মারতে পারি, কিন্তু না খেয়ে খেয়ে গায়ে শক্তি নেই। কপিলে গরুর দুধ খাওয়াতে পার তো হরিণ মেরে দিই।" অগত্যা কাক গেল কপিলা গাই-এর কাছে। বললে, "কপিলেদিদি, কপিলেদিদি, একটু দুধ দেবে? খাবে কুত্তো, মারবে হরিণ, নেব শিং, খুঁড়ব মাটি, দেব কুমোরে, গড়বে টাটি, তুলব জল, ধোব ঠুঁটি, খাব সেই

কামরাঙাটি।" কপিলা বললে, "দুধ দিতে তো আপত্তি নেই বাছা, কিন্তু পেটে ঘাস নেই, দুধ আসবে কোথা থেকে? দু'টি ঘাস এনে দিতে পারো তো দুধ দিই।"

অগত্যা কাক গেল ঘেসেড়ার বাড়ী। বললে, ঘেসেড়াভাই, ঘেসেড়াভাই, দু'টি ঘাস দাও না। খাবে কপিলে, দেবে দুধ, খাবে কুত্তো, মারবে হরিণ, নেব শিং, খুঁড়ব মাটি, দেব কুমোরে, গড়বে টাটি, তুলব জল, ধোব ঠুঁটি, তবে খাব সেই কামরাঙাটি।" ঘেসেড়া বললে, "ঘাস তো দিতে পারি, কিন্তু আমার কাস্তে গেছে হারিয়ে। একটা কাস্তে যদি কামারবাড়ী থেকে গড়িয়ে আনতে পারো, তা'হলে ঘাস কাটতে আর কতক্ষণ?"

অগত্যা কাক কামারবাড়ী গেল। বললে, "কামারভাই, একটা কাস্তে গ'ড়ে দাও তো। নেবে ঘেসেড়া, কাটবে ঘাস, খাবে কপিলে, দেবে দুধ, খাবে কুত্তো, মারবে হরিণ, নেব শিং, খুঁড়ব মাটি, দেব কুমোরে, গড়বে টাটি, তুলব জল, ধোব ঠুঁটি, তবে খাব সেই কামরাঙাটি।" কামার বললে, "কাস্তে গ'ড়ে দেওয়া আর কি এমন শক্ত কথা? তবে আগুন নিবে গেছে, গেরস্তদের বৌ-এর কাছ থেকে যদি একটু আগুন এনে দাও তা'হলে কাস্তে গড়তে পারি।" অগত্যা কাক গেল গেরস্তদের বৌ-এর কাছে। বললে, "ও বৌ, দিবি আগুন, নেবে কামার, গড়বে কাস্তে, নেবে ঘেসেড়া, কাটবে ঘাস, খাবে কপিলে, দেবে দুধ, খাবে কুত্তো, মারবে হরিণ, নেব শিং, খুঁড়বে মাটি, দেব কুমোরে, গড়বে টাটি, তুলব জল, ধোব ঠুঁটি, তবে খাব সেই কামরাঙাটি।" গেরস্তদের বৌ হেসে বললে, "আগুন নিবি সে আর বেশী কথা কি? তা, কিসে ক'রে নিবি? পাত্তর আনিস নি তো?" কাক বললে, "তাই তো কিসে ক'রে নিই!"

উনুনে গনগন ক'রে আগুন জ্বলছে, গেরস্তদের বৌ একটা মস্ত হাতায় করে তাই থেকে কতকগুলো জ্বলন্ত কাঠকয়লা তুলে এনে বললে, "অত বড়ো বড়ো ডানা রয়েছে কি করতে? ডানা পেতে আগুন নে।" বোকা কাক ডানা পেতে আগুন নিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ ক'রে আগুন ধরে গেল সর্বাঙ্গে। কাক পুড়েঝুড়ে মরে গেল, কামরাঙা খাওয়া তার আর হ'ল না!

কলকাতার রাস্তার নাম

ডক্টর দুর্গাচরণ ব্যানার্জী রোড

স্বদেশপ্রাণ—ন্যাশনালিজমের স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ছিলেন ডক্টর দুর্গাচরণ। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ হাতযশ ছিল—পশার ছিল।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

এঁর বাড়ী ছিল বেহালায়। তালুকদার ছিলেন। এঁর পৌত্র হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন কলিকাতা স্মল কজ্ কোর্টের প্রথম বাঙালী জজ।

একদিনের কাণ্ড

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বেশ কিছুকাল আগেকার কথা। ঠিক তারিখ মনে নেই—তবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার তিন চার বৎসর পরে। ফুটবলের "শীল্ডের" খেলা—"ফাইন্যাল" কি "সেমি-ফাইন্যাল"। খেলা হবে "ক্যালকাটার" সঙ্গে "মোহনবাগানের"। সকলেই জানে, তখনকার দিনে এই দুই দলের খেলা দেখবার জন্যে অসম্ভব জনসমাগম হ'ত গড়ের মাঠে।

আমরা চার বন্ধু খেলা দেখতে গিয়েছি—মানে, "মৌচাক" সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার, সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্র রায় ও আমি। বহু কষ্টে মল্লযুদ্ধ করতে করতে ভিড় ঠেলে কোনরকমে আমরা তো ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়লুম। গ্যালারির টিকিট কেনা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্যালারির কোথাও তিলধারণের ঠাঁই নেই। গ্যালারি এবং খেলার মাঠের মাঝখানকার ফাঁকও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিপুল জনতায়। চেয়ে দেখি, ক্যালকাটা ক্লাবের সভ্যদের চেয়ারের সামনে তখনও কিছু কিছু খালি জমি রয়েছে। দৌড় মেরে সেইদিকে গিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসন ধরাসনের উপরে ব'সে পড়লুম। তিন-চার মিনিট পরে সেখানেও আর পা গলাবার জায়গা রইল না।

কিন্তু সেখানেও আবার এক নতুন আপদ। মাটির উপরে যে সব দর্শক ব'সে আছে তারা যদি একটু উঁচু হয়ে ওঠে, অমনি পিছনের চেয়ারে উপবিষ্ট গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরা বিনাবাক্যব্যয়ে সপাসপ্ ছড়ি চালায়।

সে-সব কী দিনই গিয়েছে! তারা রাজার জাতি, এই দেমাকে ডগমগ হয়ে শ্বেতাঙ্গরা আমাদের কুকুর বিড়ালের চেয়েও অধম ব'লে মনে করত। কলকাতার পথে পথে যখন-তখন ধলোদের কাছ থেকে কালোরা উপহার লাভ করত কিল, চড় ও বুটের গুঁতো এবং সেইসঙ্গে আমাদের উপরি পাওনা ছিল নোংরা ভাষায় অজস্র গালাগালি।

জনৈক জনবুল-নন্দনের সখের লাঠিখেলা প্রায়ই দেখতে পেতুম বেণ্টিক ষ্ট্রীটে। চেহারা ছিল তার ষণ্ডামর্কের মত। আপন আপন জুতার দোকানে ব'সে চীনেম্যানরা কাজ করত। সাহেবটা প্রায় প্রত্যেক দোকানের দরজার কাছ থেকে নাগালের ভিতরে যাকে পেত, তারই উপরে সশব্দে লাঠি চালিয়ে হাসতে হাসতে অগ্রসর হয়ে যেত। চীনেম্যানদের কেউ বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে ব'সে থাকত এবং কেউ বা তেরিয়া হয়ে বাইরে ছুটে এসে দূর থেকেই যেন ঘুষি ছুঁড়ে সাহেবটাকে মারবার চেষ্টা করত। সাহেব কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করত না—সে জানত তার পিছনে আছে রাজশক্তি।

দেখেছি এমনি কত দৃশ্যই, আজ যা দেখা অসম্ভব। রাজশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে শ্বেতাঙ্গরা হঠাৎ বৈষ্ণবের মত অহিংসক হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি আজও তাদের নিরীহ ব'লে মনে করি না, কারণ তাদের প্রবাদেই বলে, 'চিতাবাঘ কোনদিনই তার গায়ের চামড়া বদলাতে পারে না'। তবে তারা বুদ্ধিমান জীব বটে। আজ তারা জানে, 'নেটিভ'কে ঘুষি মারলেই সে সুদে-আসলে তা ফিরিয়ে দিতে ইতস্ততঃ করবে না। কিন্তু যাক্ ও-সব কথা।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু তখনও নানা গেটের ভিতর দিয়ে আসছে জনস্রোতের পর জনস্রোত। তারপর সব স্রোত একাকার হয়ে অবশেষে জনতাসাগর যেন খেলার মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে উপচে পড়বার উপক্রম করলে।

বেশ খেলা চলছিল এবং এটুকু মনে আছে, ভালো খেলছিল মোহনবাগানই। তারপর কি যে হ'ল ঠিক স্মরণ নেই, তবে জনতা ভেঙে পড়ল বোধ হয় খেলার মাঠের ভিতরেই। সঙ্গে সঙ্গে রেফারি খেলা বন্ধ ক'রে দিলেন।

আর যায় কোথা, দর্শকরা ক্ষেপে গিয়ে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠল! ছুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, হইহই চীৎকার! ব্লটিংয়ের উপরে উপচে-পড়া কালির মত কালো কালো মাথাগুলো সমস্ত খেলার মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। যে গৌরাঙ্গের দল এতক্ষণ নেটিভদের পিঠে মাথায় ছড়ি চালিয়ে বীরত্বপ্রকাশ করছিলেন, তাঁরাও সুড়-সুড় ক'রে স'রে পড়তে লাগলেন নিরাপদ ব্যবধানে। আমরাও সেখানে আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। তারপর ইডেন গার্ডেনের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে ফিরে দেখি, কয়েকটা গ্যালারিতে কারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এবং লক্ লক্ ক'রে শূন্যে ছোবল মারছে ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখাগুলো!

ইডেন গার্ডেনের ভিতরে এসে পড়লুম। ট্রামে উঠব হাইকোর্টের সামনে গিয়ে। প্রেমাঙ্কুর আমাদের আগে আগে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বাগানের কৃত্রিম নদীর সাঁকোর কাছে এসে পড়েছি, হঠাৎ শোনা গেল প্রেমাঙ্কুরের চীৎকার! তিনি আমাদের নাম ধ'রে ডাকছেন আর্তস্বরে!

হ'ল কি? প্রেমাঙ্কুর সাঁতার জানতেন না, ব'লে প্রাণপণে জলের ধার মাড়াতে চাইতেন না, পা ফস্কে সাঁকো টপ্‌কে জলে হাবুডুবু খাচ্ছেন নাকি?

ছুটে একটু এগিয়ে গিয়েই সবিস্ময়ে দেখি, সম্পূর্ণ উল্টো কাণ্ড! প্রেমাঙ্কুর নিরেট মাটির উপরেই অবস্থান করছেন বটে, তবে বাহালতবিয়তে নয়। কারণ তিনি এক পশ্চিমা পাহারাওয়ালার কবলগত।

ব্যাপারটা অসামান্য নয়। ইডেন গার্ডেনের এ জায়গায় "Cmmit no nuisence"

ব'লে কিছু লেখ নেই বটে, কিন্তু প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য হয়ে কেউ যদি এখানে ঐ অন্যায়টি ক'রে ফেলে, তবে তা বেআইনি বলেই গণ্য হবে। প্রেমাঙ্কুর দায়ে প'ড়ে যথেষ্ট সতর্ক না হয়ে সেই অন্যায়টি ক'রে ফেলে এক পাহারওয়ালার হস্তগত হয়েছেন।

একে খেলার মাঠের ব্যাপারে মেজাজ তিক্ত ও রুক্ষ হয়েছিল, তারপর বন্ধুর এই বিপদ দেখে পাহারাওয়ালাটার উপরে আমরা বিষম ক্ষাপ্পা হয়ে উঠলুম, এবং রেগে তেড়ে গেলুম তার দিকে। সে তখন প্রেমাঙ্কুরকে ত্যাগ ক'রে ফিরে দাঁড়াল। চারু আর আমি ধাক্কা মারতে মারতে লালপাগড়ীটাকে টেনে আনলুম সাঁকোর উপরে।

চারু তাকে সাঁকোর ধারে ঠেলে নিয়ে গিয়ে বললেন, আজ তোকে জলের ভেতরে ফেলে না দিয়ে কিছুতেই ছাড়ব না!

তখন খেলার মাঠ ভেঙে উত্তেজিত দর্শকরা গোলমাল করতে করতে বাগানের ভিতরে এসে পড়েছে। পাহারাওয়ালা বেশ বুঝে নিলে, তারাও ঘটনাস্থলে এসে আমাদের সঙ্গেই যোগদান করবে। সে আর কোন উচ্চবাচ্য না ক'রে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর ফিরে এদিকে তাকাই, ওদিকে তাকাই, কিন্তু কোনদিকেই আর প্রেমাঙ্কুরকে দেখতে পাই না। বারকয়েক তার নাম ধ'রে ডাকাডাকি করা হ'ল, কোন সাড়া নেই। বুঝলুম, ছাড়া পেয়েই তিনি পিটটান দিয়েছেন।

তখন আমরা গুটি গুটি বাগানের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনেই পেলুম একখানা শ্যামবাজারের ট্রাম। তার কাছে যেতেই দেখলুম, একটা জানলার ধারে ব'সে প্রেমাঙ্কুর সন্তর্পণে উঁকিঝুঁকি মারছেন।

বললুম, "আচ্ছা লোক যা হোক্! তোমার জন্যেই আমরা আর একটু হ'লেই বিপদে পড়তুম, আর তুমি কিনা অনায়াসেই আমাদের ফেলে পালিয়ে এসেছ!"

প্রেমাঙ্কুর পরম শান্ত কণ্ঠে বললেন, "আমাকে ধ'রে নিয়ে গেলে আমার বড় জোর পাঁচ টাকা জরিমানা হ'ত। কিন্তু পাহারাওয়ালাটাকে তোমরা জলে ফেলে দিয়ে আমার ফাঁসি যাবারই ব্যবস্থা করছিলে, কাজেই আমাকে বাধ্য হয়ে স'রে পড়তে হ'ল।"

যাক্, প্রেমাঙ্কুরকেও জরিমানা দিতে বা ফাঁসি যেতে হ'ল না এবং জলে নিক্ষেপ করতে হ'ল না পাহারাওয়ালাকেও। তারা দু'জনেই বুদ্ধিমানের মত পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে ভোলে নি। অতএব শেষ পর্যন্ত—'মধুরেণ সমাপয়েৎ'!

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জানলাহীন ছোট ঘরের মধ্যে অত্যন্ত গরম হওয়ায় রোয়াকে একটা মাদুর আর বালিশ পেতে শম্ভু অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, অমল উবু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর মাথা ধরে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে লাগল, 'এই শম্ভু,—শম্ভু!' গলার স্বর যেন আর বেরোয় না অমলের। কিন্তু একটু বাদেই শম্ভু জেগে উঠে পাশ ফিরে চোখ মেলল, তারপর বন্ধুকে দেখে বলল, 'কি রে!' অমল বলল, 'যাবি তো আয়।'

শম্ভু বিস্মিত হবে বলল, 'সে কি, কোথায় যাব।'

অমল তখন ফিস ফিস করে সব কথা জানাল। শম্ভু বলল, 'কিন্তু রমাপদদা' যে দোকানে তালা বন্ধ করে গেছে। দোকানের মধ্যে আমার স্যুটকেস জিনিসপত্র সবই যে রয়ে গেল।'

অমল বললে, 'ভারী তো তোর একটা পুরনো ভাঙা স্যুটকেস, ওর মায়া ছেড়ে দে। পথে নতুন স্যুটকেস তোকে কিনে দেব।'

কিন্তু শম্ভু তবু একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। যে দেশ-ছেড়ে সর্বত্যাগী হতে যাচ্ছে তার পক্ষে ও পুরনো অল্পদামী টিনের একটা স্যুটকেসের মায়া ত্যাগ করা নিতান্ত সহজসাধ্য হোল না। অমলের কাছে শম্ভুর ভাঙা স্যুটকেসের কোন দাম থাকতে না পারে, কিন্তু শম্ভুর কাছে জিনিসটা তো অত তুচ্ছ নয়। কত বার পুরনো মনিবের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে নতুন মনিবের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে শম্ভু, হকের মাইনে ছেড়ে আসতে হয়েছে, কিন্তু পুরনো স্যুটকেসটি কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি। বালিশের অভাবে ওই স্যুটকেসে মাথা রেখে কত রোয়াকে, সিঁড়ির নিচে ঘুমিয়ে রাত ভোর করে দিয়েছে শম্ভু। মনিব-গিন্নীদের দেওয়া ওয়াড়হীন ধুলো বালি চিটে-পড়া বালিশের চেয়ে নিজের এই স্যুটকেস-রূপী উপাধানটিকে অনেক

নরম অনেক আরামজনক বলে মনে হয়েছে শম্ভুর। ঘনিষ্ঠ বন্ধু পথের সঙ্গী অমল আজ সেই সুটকেসকে তুচ্ছজ্ঞানে ফেলে যেতে বলছে। ভাবতে কেমন যেন কষ্ট লাগল শম্ভুর। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'একটু দেরি করলে রমাপদদা' কিন্তু এসে পড়ত।' অমল রাগ ক'রে উঠল, 'তা'হলে তুই তোর রমাপদদা'র আসায় থাক, আমি চললুম।—কত লাখ টাকার রাজ-পোষাক তোর আছে শুনি যে আমার এই সুটকেসে ধরত না?' ব'লে সত্যিই অমল দু'একপা এগিয়ে গেল। শম্ভু আর দেরি করল না। পুরনো হাফ-শার্টটা ছিল বালিশের তলায়। বের করে নিয়ে গায়ে দিল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল বিড়ি, দেশলাই আর খুচরো সাড়ে ছ'আনার পয়সা ঠিকই আছে। একটা বিড়ি ধরিয়ে শম্ভু অমলের পিছনে পিছনে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'শোন্, বিজুকে একবার খবর দিবিনে।' অমল বলল, 'না, কাউকে আর খবরটবর দিয়ে দরকার নেই। কারও দরকার নেই আমার, আমি একাই যাব।' শম্ভু বলল, 'দূর তাই কি হয়, যাই তো তিনজনেই যাব, না গেলে কেউ যাব না।—চল দেখি, বিজু কি বলে।'

রাস্তার দিকে একতলার ঘরটাতেই বিজু ঘুমোয়। প্রথমে ওর মা বাবা ওকে বাইরের ঘরে থাকতে দিতে রাজী হননি। কিন্তু ভিতরের দিকে থাকলে অনেক অসুবিধে, গোলমালে পড়াশুনোর ব্যাঘাত হয় এই সব অজুহাতে বাইরের দিকের একটি ছোট ঘরে বিজু তার খাট টেবিল সরিয়ে এনেছে। এ ঘরে থেকে বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় সুবিধা বেশি।

অমল দূরে দাঁড়িয়ে রইল। শম্ভু এগিয়ে এসে বিজুর খোলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। নেটের মশারির মধ্যে আরামে ঘুমচ্ছে বিজন। খাটের ওপর মোটা গদি, তার ওপর চিকন পাটি বিছানো। ওপরে ফ্যান ঘুরছে, মাথার নিচে নরম জোড়া বালিশ, আর একটা মোটা পাশ বালিশের ওপর হাঁটু তুলে দিয়ে পরম আরামে বিজু ঘুমিয়ে রয়েছে। দেখে দেখে শম্ভুর হঠাৎ মনে হোল ওকে জাগানো বৃথা, ডাকা বৃথা। এই সৌখীন বড়লোকের ছেলেটি আসলে তাদের সঙ্গী নয়,—হয়তো কেউই নয়। কিন্তু ওকে ছেড়ে ফিরে যেতেও মন সরল না শম্ভুর। ওকে দলে টানতেই হবে; ছলে হোক, বলে হোক, বিজুকে পথে বের করে আনতেই হবে শম্ভুদের। ঘর ছাড়বার, দেশ ছাড়বার স্বপ্ন তো ওই দেখিয়েছে তাদের। এখন তারা শুধু কষ্ট ভোগ করবে, বেয়াড়া বকাটে ছেলে বলে দুর্নাম কিনবে, আর বিজু ভালো ছেলে হয়ে ভালো খাবে, ভালো পরবে, আরামে ঘুমুবে তা কিছুতেই হ'তে দেবেনা শম্ভু, নিজেরা যদি যায় বিজুকেও টেনে নেবে।

একটু ডাকাডাকির পরেই বিজুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি, সেদিনের মত বেড়াতে বেরিয়েছিলি নাকি? মর্নিং ওয়াক্? শুম্ভু বলল, 'হ্যাঁ যাবি তো আয়।'

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল বিজু, 'নিশ্চয়ই যাব।' গেঞ্জি গায়েই ছিল, আলনা থেকে সোনার বোতাম পরানো আদ্দির জামাটা গায়ে চড়িয়ে দোর খুলে বেরিয়ে এসে বলল, 'চল, কোন্ দিকে যাবি।'

শম্ভু একবার ভাবল সব খুলে বলে বিজুকে। তারপর মনে হোল ও যদি ভয় পায়, ও যদি রাজী না হয়ে হইচই করে। তার চেয়ে এখন কথাটা গোপন রেখে পরে ফাঁস করাই ভালো। শম্ভু বলল, 'আয় ঘুরে আসি একটু।'

প্রথম বাস চলেছে বেলেঘাটা মেইন রোড দিয়ে। হাত তুলে চলন্ত বাসটা থামিয়ে শম্ভু তাতে উঠে পড়ল। পিছনে পিছনে উঠল অমল আর বিজু। প্রায় ফাঁকা, পিছনের লম্বা বেঞ্চটায় বন্ধুদের পাশে বসে বিজু এবার জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি বলতো, মতলব কি তোদের, অমল তুই এই সাত-সকালে একটা স্যুটকেস নিয়েই বা আবার বেরিয়েছিস কেন?' অমল শম্ভুর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল। শম্ভু বলল, 'পরে বলব।'

বলল, 'একেবারে হাওড়া ষ্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে।' 'আমরা চলে যাচ্ছি। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি, না এখান থেকে ফিরে যাবি ভেবে দেখ্!'

এবার বুক ঢিপ ঢিপ করবার পালা বিজনের। এক মুহূর্ত নির্বাক আর রুদ্ধশ্বাস হয়ে থেকে বলল, 'কী বলছিস তোরা, আমি যে'—

শম্ভু হেসে বলল, 'বুঝেছি যা ফিরে যা, দু'খানা টিকেটই কেটে নে অমল, তার বেশি দরকার নেই।

বিজু এগিয়ে এসে বলল, 'না তিনখানাই কাট। কিন্তু টাকা?'

অমল সগর্বে বলল, 'টাকার জন্য কারো ভাবনা নেই। টাকা আমি এনেছি।'

এতদিন রেষ্টুরেণ্টের খরচ, সিনেমার খরচ, চা সিগারেটের খরচ, সব নিজের পকেট থেকে দরাজ হাতে জুগিয়েছে বিজন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরীব বন্ধুদের দিকে অনুকম্পার চোখে তাকাতে ছাড়েনি। দু'চার আনা যদি অমল দিতে চেয়েছে, বিজু হেসে তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'থাক থাক ও তুই রেখে দে।'

কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। আজ বড়লোকের ছেলে বিজু পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে পথে বেরিয়েছে। ওদের সমস্ত ব্যয়, সমস্ত ভারবহন করবার দায়িত্ব আজ তার ওপর। আত্মপ্রসাদে বুক ফুলে উঠল অমলের। বুক পকেট আগে থেকেই ফোলা ছিল। তিনখানা দশটাকার নোট বের করে শম্ভুর হাতে দিয়ে বলল, 'নে।'

শম্ভু বলল, 'কোথাকার টিকেট কাটাব,—কোথায় যাবি।'

অমল বলল, 'যতদূর যাওয়া যায়।'

বিজু উল্লসিত হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস।'　　　　(ক্রমশঃ)

সাত ভাই চম্পা

রঞ্জিতভাই

*

সাত ভাই চম্পা—
সাত ভাই চম্পা !
সে যে এক দেশ আছে সমুদ্র প্রান্তে
ঝলোমলো আলকের বন্যা :

গহন বনের ধারে
গভীর সাগর পারে
যুগ যুগ ঘুমে আছে পাতালের প্রান্তে
মণিকার কোন্ রাজকন্যা ?

সেই সব দেশে গেলে
মাঠ বন পাছে ফেলে
রক্ত-কমল বন, পলাশের রঙেতে রক্তিম
শুনবে যে-ফুলেদের কান্না—

কুহকের দেশে তারা
ফুল হয়ে আছে যারা,
তাদের রঙিন দেহে সূর্যের রিমঝিম :
রঙের জহর চুনি পান্না !

অচীন পাখিরা এসে
অচীনপুরের দেশে
কখন হারায়ে যাবে কোন্ এক সন্ধ্যায়
কোথায় প্রাসাদপুরী শূন্য ?

ভোরের অনেক আগে
অলোর পরশ জাগে
পক্ষীরাজের ডানা আকাশের দোল্‌নায়
মেলে দেয় আনন্দে ধন্য।

অনুম্পা নদীর পার
কোথায় সে আছে তার
কাজললতার দেশ দিগন্ত যেখানে
জানে নাকো কেউ তার ঠিকানা—

রঙিন পাখিরা আছে
নীল সরোবর কাছে
সোনার প্রদীপ জ্বলে উজ্জ্বল সেখানে
কোথায় হারায় তার সীমানা।

পার হয়ে সব দেশ
যেথা তার নাই শেষ
চলে যাবে নির্ভীক সাত ভাই চম্পা—
শুনবে সে কত রূপকাহিনী,

সোনালী রঙের মেলা
নীল সায়রের খেলা,
ফুলের পরীরা আসে নিয়ে অনুকম্পা—
তারা সব স্বপ্নের কাহিনী !

চলো যাই সেইখানে
যেথায় আলোক আনে
যুগান্ত-ঘুম ভাঙা সবুজের কল্পনা,
আনন্দ জীবনের স্বপ্ন—

সোনা মেঘ জেলে দিয়ে
সমুদ্র পার হয়ে
কোথায় ভোরের রঙে আকাশের জল্পনা
নাই মানা কিছু ভয় বিঘ্ন !

সাত ভাই চম্পা,
সাত ভাই চম্পা !
সেই সব দেশ আজ ডাকছে কি স্বপ্নেই
যেথা নাই বঞ্চনা বক্র ?

এসো আজ ভেসে যাই
স্বপনের রোশ্‌নাই,
কল্পনা-সায়রের মাঝে কোন মানা সেই—
মৌমাছি রচে মধুচক্র !

এক উৎসবের দিনে—রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত—তাঁকে এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে

শান্তিনিকেতন

শ্রীসুব্রত কর

আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র; এখানেই থাকি। ভারতের বিখ্যাত শিক্ষা-তীর্থ এই শান্তিনিকেতন। সারা ভারতের নানা স্থান থেকে নানা জাতের ভারতীয় ছেলেরা এখানে এসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পণ্ডিতরা এসে এখানে শিক্ষা দেন। এক অপূর্ব শান্ত ও শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে আমরা এখানে মুক্ত মন নিয়ে কি ভাবে আনন্দ-উৎসবের ভেতর দিয়ে শিক্ষালাভ করি সেই কথাই এখানে কিছু কিছু বলবার চেষ্টা করব।

শান্তিনিকেতনে আমরা সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিই। তারপর খেয়ে দেয়ে, সকলে একসঙ্গে বই বগলদাবা করে আসন ঝুলিয়ে ইস্কুলে যাই। ঘণ্টার তালে তালে সব কাজ হয়। হোষ্টেলের ছেলেরা অনেক দুর দেশ থেকে এখানে আসে। বাপ মা তাদের কোল-ছাড়া ক'রে পাঠিয়ে দেন। খাওয়ার সময় হ'লে গুরুপল্লীতে বাসায় আমাদের মা খেতে ডাক দেন—ওঠার সময় মা স্মরণ করিয়ে দেন সকাল হয়েছে। হোষ্টেলের ছেলেদের সঙ্গে ত' আর মা নেই! কে স্মরণ করিয়ে দেবে? ঘণ্টাই ওদের জানিয়ে দেয় সকাল হয়েছে; খাওয়ার সময় হয়েছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। শিশু-বিভাগের ও ডরমিটরীর ছেলেরা তখন সারি বেঁধে দাড়ায়। ঘণ্টা শেষ হলেই সবাই রান্নাঘর অভিমুখে রওনা দেয়। জলখাবার খেয়ে সকলে গ্রন্থাগারের সম্মুখে জড় হয়। তারপর শ্রেণী হিসাবে সকলে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইন হয়ে দাঁড়ায়। ছোট-বড়, ছাত্র-শিক্ষক সকলেই এসে তখন বৈতালিকে যোগ দেয়। সকলেই চুপ। সারা আশ্রমই সেই সময় নিস্তব্ধ থাকে। অতগুলি লোক এক জায়গায় চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখলে মনে হয় সারি সারি সব যেন পুতুল,—রূপারকাঠির ছোঁয়ায় যেন ঘুমিয়ে পড়েছে! অনেক লোকের মেলা। ঘণ্টাই হচ্ছে আশ্রমের সোনারকাঠি। জীবন চলে তারি তালে। পাঁচ মিনিট

কবির বাসগৃহ "পুনশ্চ"
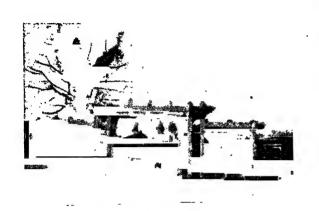
কবির বাসগৃহ—"শ্যামলী" প্রাঙ্গণ

দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘণ্টা পড়লেই ছাত্র-ছাত্রীরা বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করে। গ্রন্থাগারের বারান্দায় দাঁড়ায় গান করার দল। মন্ত্র শেষ হলেই আরম্ভ হয় গান। গান শেষ হলে যে যার কাজে চলে যায়। আমরা যাই ক্লাসে। গাছতলায় ক্লাস। আসন পেতে সবাই বসি। অন্য স্কুলের মত কাঠের বেঞ্চিও নেই, বন্ধ ঘরও নেই। বাইরের অনেকের কাছে এটা নিশ্চয়ই গল্পের মত লাগবে! কিন্তু এ যে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গাছতলায় ক্লাস করায় মনটা শান্তিপূর্ণ থাকে। মাথাও থাকে ঠাণ্ডা। মনটা একদম এক জায়গাতেই বন্ধ থাকে না। একই জায়গায় রোজ বসতে ভাল লাগে না। তাই প্রত্যেক ঘণ্টায় জায়গা অদল-বদল হয়। এতে মনে হয় সত্যি যেন আমরা আরেকটা ক্লাসে ঢুকলাম। আবার আরেকটা পাঠ্য-বিষয়ে মনটা পুরোদমে বসে। আগে কি হয়েছে না হয়েছে সেটা আর মনেই থাকে না। শিক্ষককে "স্যার" বলাটা এখানকার রীতি নয়। মাষ্টারমশাই প্রত্যেক ছেলেকেই চেনেন। তাঁদের ভাইয়ের মত নাম ধরে ডাকেন। আদর করেন। ছাত্ররাও মাষ্টার-মশাইদের যে শুধু গুরু মনে করে ভয় করে তা নয়। দাদাকে যে ভাবে লোকে ভালবাসে, সম্মান করে, সেই রকম মাষ্টারমশাইদেরও সবাই এখানে করে থাকে। তাই সকলের নামের শেষে 'দাদা' শব্দটি যোগ ক'রে মাষ্টারমশাই-দের কিংবা যে কোন লোককে এখানে সম্বোধন করা হয়। এই দাদা শব্দটিই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আত্মীয়তা স্থাপন
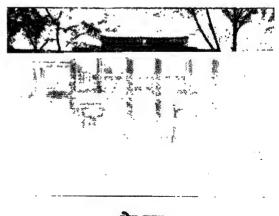
চীন-ভবন

করে দিয়েছে এখানে। সাড়ে দশটায় সকালের স্কুলের ছুটি হয়। তখন যে-যার বাসায় গিয়ে খেয়ে বিশ্রাম করে, আবার আড়াইটার সময় স্কুলে যেতে হয়। তিনটি পিরিয়ড্ ক্লাস হয়। এখানে বিকেলবেলায় ছেলে-মেয়েদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হয়ে থাকে। পুঁথিগত বিদ্যা ছেলেদের অকর্মণ্য করে রাখে, তাই ছাত্রেরা এখানে শুধু যে বই পড়েই খালাস, তা নয়। ছেলেদের
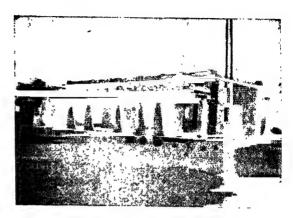
আরোগ্য-ভবন
(হাসপাতাল ইন্‌ডোর)

কার্পেণ্টারি, ড্রইং, মডেলিং, বাগান করা ও মেয়েদের সেলাই ও চামড়ার ব্যাগ করা বুনিয়াদি পদ্ধতিতে শিক্ষলাভ করতে হয়। সাড়ে চারটেতে স্কুলের পড়ার পালা শেষ। তারপর হোষ্টেলের ছেলেদের নিজের নিজের ঘর ঝাঁট দিতে হয়। পাঁচ থেকে দশ বছরের ছেলেদের থাকবার ঘর হচ্ছে সন্তোষালয় বা শিশু-বিভাগ। আশ্রমে সন্তোষ মজুমদার ব'লে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। সরল ছিলেন শিশুদের মতই। সকলের সঙ্গেই হেসে ভালবেসে কথা বলতেন। অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই স্মৃতি-রক্ষার্থে এই কুটীর নির্মাণ করা হয়েছিল। বারো থেকে পনরো বছরের ছেলেদের এখানে থাকবার তিনটি ঘর আছে। সত্য-কুটীর, সতীশ-কুটীর, আর মোহিত-কুটীর। এর প্রত্যেকটি ঘরের নামকরণ আগের এক-একজন লোকের স্মৃতি-রক্ষার্থে করা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই এক-একজন আশ্রমের আদর্শ লোক ছিলেন। এরপর বিকেলে জলখাবার খেয়ে সবাই মাঠে আমরা একত্র হই। খেলার সুবন্দোবস্তের জন্য জেনারেল

সঙ্গীত-ভবন

কলাভবন
মিউজিয়ম-"নন্দন"

লাইন হয়। এতে এক এক টিমের ক্যাপটেন থাকে। তারাই খেলার সব ব্যবস্থা করে। এই সময় সকলের উৎসাহ ও উদ্যম পুরামাত্রায় প্রকাশ পায়। সকল প্রকারের খেলাই হয়ে থাকে এখানে। সকলে খেলা-শেষে বাড়ি ফেরে। এরপর সন্ধ্যায় উপাসনার ঘণ্টা পড়ে। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে সবাই, তারপর দাঁড়িয়ে বৈদিকমন্ত্র পাঠ করে। তারপর আবার আরম্ভ হয় পড়াশুনা। রাত সাড়ে আটটায় পড়ে খাবার ঘণ্টা। ন'টায় শোবার ঘণ্টা। মোটমাট এখানে এই ত' হ'ল আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী। এর মাঝে মাঝে চলে কত আনন্দ-উৎসব। রোজই একটা-না-একটা কিছু অনুষ্ঠান হয়। নাচ, গান, জলসা, সভা ইত্যাদি। স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে তিনটি সাহিত্য-বিভাগ আছে। আদ্য-বিভাগ, মধ্য-বিভাগ, ও শিশু-বিভাগ। একটি ক'রে সভা তিনটি বিভাগর থেকে প্রতিমাসে হবেই। নবম বর্গ থেকে পঞ্চম বর্গের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিশু-বিভাগ গঠিত। চতুর্থ বর্গ ও তৃতীয় .বর্গ নিয়ে মধ্য-বিভাগ গঠিত ও দ্বিতীয় এবং প্রথম বর্গের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গঠিত আদ্য-বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে একজন সম্পাদক ও আর একজন সম্পাদিকা থাকে। তারাই সবার কাছ থেকে লেখা জোগাড় করে। কেউ ভ্রমণ-কাহিনী, কেউ গল্প, কেউ প্রবন্ধ কিংবা কেউ স্বরচিত কবিতা দেয়। সভাপতির দ্বারা সভাগুলি নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। এছাড়া বড় বড় উৎসবও হয়। দোল

গ্রন্থন-ভবন
(পাবলিশিং ডিপার্টমেণ্ট)

এখানকার একটি বড় উৎসব। সবাই বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে আম্রকুঞ্জে এসে জড় হয়। মিছিল ক'রে নাচতে নাচতে মেয়ের দল প্রাঙ্গণে ঢোকে। পিছনে থাকে গানের দল। বহু লোক আসে। মেয়েদের প্রত্যেকের পরনে থাকে বাসন্তী রঙের কাপড়। হাতে কারো শঙ্খ, কারো থাকে থালায় ভরা আবির। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মশায়ের বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণের পর আরম্ভ হয় গান, আবৃত্তি ও নাচ। অনুষ্ঠান শেষ হলেই আবির নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। মাঝখানে রাখা হয় আবিরের থালা। বাইরের মত পিচকারিতে রঙ না দিয়ে চলে শুধু আবিরের খেলা। সকলে আবিরের রঙে লাল হয়ে যায়। গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে নমস্কার করি। এই রকম দোল ছাড়া আরো বহু উৎসব আছে। সংখ্যায় সে সব একদম অফুরন্ত বললেই হয়! আশ্রম সম্মিলনী এর মধ্যে আর একটি বিশেষ উৎসব। এই সম্মিলনী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। এর উদ্দেশ্য ছিল বালক-বালিকাদের নিজের হাতে নিজেদের নিমন্ত্রণ করার অভ্যাস সৃষ্টি। তিনি শিক্ষা বলতে বুঝতেন—মানুষকে তার নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা।

মধ্যে মধ্যে বেড়াতে যাওয়ার কথাটা ত' বলেই নি—সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার সেটা। কোনো কোনোদিন মেঘলা আকাশে বাদলের পূর্বাভাস দেখা দিলেই ছুটি নিয়ে দু'তিন ক্লাস একসঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ি আমরা; সঙ্গে থাকেন একজন মাষ্টারমশাই। রেল লাইনের ধার ধরে কতদূর চলে যাই, কত সুন্দর অপূর্ব প্রাকৃতিক সব দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কত ফুল গাছ, কুল গাছ, ডোবা, পুকুর, ঝোপ-ঝাড় আর ধূ ধূ করা রাঙা মাটির মাঠ! যেতে যেতে কত গান, হাসি, গল্প তামাসা চলে। সঙ্গে সঙ্গে পকেটে ঠেসে ঠেসে এত এত কুল বোঝাই করি। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন কোনো গাছের ছায়ায় বা নদীর ধারে বসে সবাই মিলে 'রুমাল-চোর', 'এক্‌টিং' প্রভৃতি খেলা খেলি। কেউ কেউ আবার সেই নদীতে হয়ত স্নানও করে। কিছুক্ষণ পরে আবার গন্তব্যস্থলে রওনা দিই আমরা। এইরকম প্রায়ই মেঘলা দিনে কোন-না-কোন দল বেড়াতে যায়। মেঘলা দিনে আশপাশে যখন ময়ূর আনন্দে পেখম ধরে নাচে, শান্তিনিকেতনে ছেলেরা তখন ক্লাসে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ঝিমনো দিনকে আমরাই সতেজ করে তুলি। ছ'টা ঋতু বিচিত্র খেলা খেলে যায় এই আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। চোখের উপর দেখতে পাই প্রকৃতির রঙ রোজই কিছু না কিছু বদলাচ্ছে। কোনদিন হয়ত দেখলাম শালগাছগুলির একটিও পাতা নেই, শুকিয়ে সব ঝ'রে নিচে পড়ে আছে। পাতা-কুড়ানি মেয়েরা কেবল বস্তা ভ'রে ভ'রে শুকনো পাতাই নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কয়েক মাস পরেই আবার দেখি অন্য দৃশ্য! দেখি, কচি পাতায় সমস্ত শাখা ভর্তি হয়ে গেছে, আর সেই শাখায় ধরেছে অজস্র ফুল; অবিরাম পাখীগুলি ডেকে চলেছে তারই মধ্যে। পাতাকুড়ানীদের আর দেখা নেই। তারা তখন যদিই বা আসে, প্রকৃতিই তাদের তাঁর বন-সৌন্দর্যে ভুলিয়ে দেন। হয়তো তাদেরও আর পাতা কুড়োবার কথা মনেই থাকে না। তাকিয়ে থাকি আমরা ফুলে ফলেভরা সব গাছের দিকে। ছয়টি ঋতুকে বরণ করে

নেবার জন্য উৎসব হয়। বসন্তোৎসবের কথা বলেছি। আরো আছে,—যেমন শারদোৎসব, নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে চলে চড়িভাতি! কোপাই নদীর তীরে গোয়ালপাড়া গ্রাম মাইল দু'এক হবে। আমরা সেখানে চলে যাই। স্কুলের প্রায় সব ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকগণ এতে যোগ দেন। কোপাই নদীটি ছোট্ট। কুলু কুলু ক'রে ব'য়ে চলেছে। হাঁটু অবধি জল। এই পাহাড়ে নদী বর্ষার সময় কিন্তু ভয়ানক আকার ধারণ করে, তাতে বান ডাকে। অনেক সময় গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে দেয়। বর্ষাকাল ছাড়া স্বভাবতই এই নদীর জলটা স্বচ্ছ; টলমল করে যেন আয়নার মত। মুখ দেখা যায়। নদীর তীরেই আম-বাগান। তার আশপাশে ছোট ছোট বাড়ি। এক একটি যেন শান্তির নীড়। ছায়ায়-ভরা আম বাগানেও মধ্যে মধ্যে আমাদের চড়িভাতি হয়। কবি বলেছেন: মানুষ আগে অসভ্য ছিল। তাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। গুহায় গুহায় বাস করত। বনে বনে ঘুরত। পশু মেরে কাঁচা কাঁচাই, অবেলাতে, অনিয়মেতে, হইচই করে খেত। আমরা তাদের উত্তর-পুরুষ। আমাদের সঙ্গে তাদের রক্তের যোগ একটু আছে। তাই মাঝে মাঝে রক্তে টান লাগে। সেইজন্য আমরাও মাঝে মাঝে বনে গিয়ে হইচই করে অবেলাতে চড়িভাতি করি। এই চড়িভাতিতে খুবই আনন্দ হয়। কেউ রান্নার জোগাড় করছে, কেউ গাছে হেলান দিয়ে বই পড়ছে, আবার কেউ কেউ নানা রকম খেলা খেলছে। এখানে মাষ্টার ছাত্র সবাই একসঙ্গে বসে গল্প করেন। খেলাধূলাও করেন। বেলা বারোটার সময় খাওয়া হয়। বিকেল চারটের সময় সবাই আবার বাড়ির দিকে রওনা দিই। সবার মুখে তখন আর তেমন হাসি দেখা যায় না। সমস্ত আনন্দ শেষ ক'রে দিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত মনে চুপচাপ চলে আসি। সাত-ই পৌষের মেলায় পয়সা খরচ ক'রে ফেলার মতই সেদিনকার সমস্ত অনন্দটুকু নিঃশেষ ক'রে ম্লান মুখে ফিরে যাই। পরদিন আবার আরম্ভ হয় ক্লাস। এমনি করেই এখানে কাটে আমাদের বাল্য-জীবনের, শিক্ষাশ্রমের, দিনগুলি।

এক কথায় অপূর্ব শান্তি, শিক্ষা ও আনন্দের নিকেতন আমাদের এই শান্তিনিকেতন।

এখানের আরও বহু আকর্ষণ আছে, মায়া আছে,—মায়ের স্নেহ, পিতার কর্তব্য, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যেন এখানের আবহাওয়ায়। তাই এখানের শিক্ষা বোঝা ব'লে মনে হয় না, ভার বলে ভয় হয় না। শান্তিনিকেতন ছেড়ে কোথাও গেলে কয়েকদিন পরেই যতক্ষণ না আবার এখানে ফিরে আসি ততক্ষণ মন যেন কেমন ছটফট্ করে। আর চোখের উপর আশ্রমের এই ছবিগুলি ভেসে ওঠে—মনে হয়:

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে—যে যায়না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে,
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে—যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে এক মন॥
আমাদের শান্তিনিকেতন॥"

হ্যারী হুডিনি

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৬ সালের হাড়-হিম-করা এক শীতের সকাল।

ডেট্রয়েট নদীর জল জমাট-বাঁধা বরফে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বেল-দ্বীপের উঁচু সেতুটার উপর এত লোকের ভীড় কেন?

হাতে পুলিসের হাত-কড়া লাগানো স্নানের পরিচ্ছদে সজ্জিত একটা লোককে দেখা গেল সেতুটার একবারে ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরেই অপেক্ষমান উৎসুক জনতা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলে, লোকটা অত উঁচু থেকে সোজা বরফের উপর লাফিয়ে পড়ল আর একটা গর্তের মধ্যে দিয়ে বরফের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পলায়ন-কুশলী (escape-artist) হ্যারী হুডিনি এর আগেও অনেক জায়গায় এই রকম খেলা দেখিয়ে অনেক অর্থ এবং খ্যাতি অর্জন করেছে। সাধারণতঃ মিনিট তিনেক তার বরফের অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকবার কথা। কিন্তু আজ তার এ কী হ'ল?

রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সবাই গভীর উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা নিয়ে ঘড়ীর কাঁটার দিকে চেয়ে। তিন মিনিট…চার মিনিট…পাঁচ মিনিটও কেটে গেল—হুডিনি আর বরফের নিচে থেকে উঠল না! পুলিস বরফের গর্তের মধ্যে কিছু দেখা যায় কিনা তারই অনুসন্ধান করতে লাগল। সংবাদিকরাও যে যার খবরের কাগজের আপিসে ছুটল এই সংবাদ পরিবেশন করতে যে, অপূর্ব মায়াবী হুডিনি আজ তার জীবনের চরম ও সর্বশেষ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে।

আট মিনিটের পর একজন ডুবুরীকে যখন হুডিনির মৃত বা সংজ্ঞাহীন দেহ অনুসন্ধানের জন্যে বরফের নিচে নামাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে সমবেত দর্শকবৃন্দ বিপুল হর্ষধ্বনি করে উঠল। দেখা গেল হ্যারী হুডিনি বরফস্তূপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে হাসিমুখেই।

নদীর জল যখন জমে বরফ হয়ে যায়, তখন সেই বরফ খানিকটা খুঁড়লে আবার তার নীচে জল দেখতে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই যে, কেবল উপরিভাগের কয়েক ফুট জলই বরফে রূপান্তরিত হতে পারে—ভেতরকার জলের বা স্রোতের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

সেদিন হুডিনির হিসাবে একটু ভুল হয়ে গিছল। তিন মিনিট ডুবে থাকার পর মাথা তুলতে গিয়ে যখন সে বরফে ধাক্কা খেল, তখন বুঝতে পারল যে, আন্তঃপ্রবাহের টানে সে গর্তের মুখ থেকে খানিকটা সরে এসেছে। এই অবস্থায় অন্য অনেকে হয়ত কেবল ভয়েই মারা পড়ত। কিন্তু হুডিনির ছিল অসাধারণ মনোবল আর পেশী নিয়ন্ত্রণের অত্যদ্ভুত ক্ষমতা!

সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও সে আবিষ্কার করলে যে, বরফ আর জলের মধ্যে যেটুকু খাঁজ বা ব্যবধান বিদ্যমান, তারই মধ্যে থেকে সে তার শ্বাস-কার্য সম্পাদনের জন্যে পর্যাপ্ত বাতাস সংগ্রহ করে নিতে পারবে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যে। এইভাবে আত্মবিশ্বাস অটুট রেখে এবং শক্তিশালী পেশীর সাহায্যে সাঁতার কেটে অল্পক্ষণের মধ্যেই হুডিনি তার মুক্তির দ্বার পুনরাবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল।

যাদুকর হিসাবে হুডিনির প্রসিদ্ধি থাকলেও, 'পলায়ন-বিদ্যায়' পৃথিবীতে সম্ভবতঃ তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। যে কোন বন্ধ স্থান বা অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবার অসামান্য ক্ষমতা দেখে লোকে তাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করত। মাটির নিচে দু'ফুট গভীর গর্তে হুডিনিকে রেখে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে কিংবা একটা প্যাকিং বাক্সে তাকে শুইয়ে ডালাটা বেশ মজবুত ক'রে পেরেক দিয়ে বন্ধ করে বাক্সসুদ্ধ তাকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেও দেখা গেছে, কোনবারই হুডিনি নিজেকে মুক্ত করতে অপারগ হয় নি।

ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে—"Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage"—যার অর্থ হ'ল—

পাষাণ প্রাচীরে নাহি হয় কারাগার,
লোহার গরাদে খাঁচা হয় নাকো তার।

এটা শুধু হুডিনির সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যেতে পারত। নিউ ইয়র্ক, সানফ্রান্সিস্কো, সিকাগো, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মস্কো এবং অন্যান্য বহু নগরীর দুর্ভেদ্য কারাগারের নির্জন সেলে সে স্বেচ্ছায় বহুবার নিজেকে আবদ্ধ হতে দিয়েছে। তার পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে, প্ল্যাষ্টার দিয়ে মুখ বন্ধ করে, হস্তপদ শৃঙ্খলিত করে, নির্জন সেলের লৌহ-গরাদের সঙ্গে তাকে বহুবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে সেলের বাইরে বেরিয়ে এসেছে পূর্ণ সজ্জিত হয়ে।

"পুলিস ও কারাধ্যক্ষগণ হুডিনিকে নিয়ে বড় সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, হুডিনি যদি সত্যিকারের অপরাধী হ'ত এবং অসৎ উপায়ে রাজৈশ্বর্য সংগ্রহের চেষ্টা করত, তা'হলেও তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'ত না—পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে সে অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু হুডিনির উদ্দেশ্য ছিল মহৎ—লোককে কৌতুক ও আনন্দ বিতরণ করেই সে খুশি হ'ত। লোকে যখন তার উপরে অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করত, তখন সে দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করত। দুষ্ট লোকে কিভাবে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও সারল্যের সুযোগ নিয়ে আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক শক্তির ভাণ ক'রে লোককে ঠকিয়ে অর্থোপার্জন করতে পারে তা স্পষ্ট

ক'রে বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল হুডিনির অভিপ্রায়। পেশী নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অদ্ভুত উপায়ে সে তার দেহের মধ্যে এমন এক যন্ত্র লুকিয়ে রাখত, যার সাহায্যে হাত-কড়া বা যে-কোন মজবুত তালাও অনায়াসে খুলে ফেলা যেত। এ ছাড়া নানাস্থানে নানাভাবে তার অনুচরবৃন্দ বহাল থাকত, যারা আত্মপরিচয় গোপন রেখে নানারকমে তার পলায়নে বা ম্যাজিকের খেলায় সাহায্য করত। সর্বোপরি সে ছিল পদার্থবিজ্ঞানে ও মনস্তত্ত্বে সুপণ্ডিত—যাদুবিদ্যার ক্রীড়া প্রদর্শনে বিজ্ঞানের এই দু'টি শাখার জ্ঞানের সে যথেষ্ট সাহায্য নিত ও নানাক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করত।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল এ্যাপ্‌ল্‌টন উইসকনসিনে এরিক উইস-এর জন্ম হয়। বাল্যকালেই এক ভ্রাম্যমান যাদুকরের কাছ থেকে কয়েকটি ম্যাজিক শিখে নেবার সুযোগ তার ঘটে যায়। উত্তরকালে এই এরিক উইসই হ্যারী হুডিনি নাম নিয়ে তার যাদুকর জীবন সুরু করে এবং অল্পকালের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। অবশেষে তার যাদুকর জীবনের অবসান ঘটে সেই দিন,—যেদিন নিউ ইয়র্কের হিপ্পোড্রোম থিয়েটারে সর্বসমক্ষে একটি পাঁচ টনের হাতীকে সে অদৃশ্য করে দেয়।

তিমির গর্ভে মানুষ

অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তিমি অর্থাৎ whale-এর গর্ভে গিয়ে একজন মানুষ কি করে বেঁচে ছিল তারই বৃত্তান্ত। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "ষ্টার অব্‌ দি ইষ্ট" নামক একখানি তিমি-ধরা জাহাজ যায় ফকল্যাণ্ড দ্বীপে তিমি ধরতে। জাহাজের সঙ্গে দু'খানা নৌকো ছিল, ল্যাংবোট হিসাবে। তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র এবং তিমি-শিকারীর বেশ একটা বড় দলও ছিল সেই জাহাজে। জাহাজ গিয়ে একদিন নোঙর করে থাকবার পর, এক তিমির দর্শন মিললো। প্রকাণ্ড সেটা। তা'কে দেখা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে ওত-পাতা শিকারীরা শড়কী-বল্লমের খোঁচা মারে—ঘা খেয়ে তিমি মারে ল্যাজের ঝাপটা। সেই ঝাপটায় একখানা নৌকো গেল উল্টে—নৌকোয় ক'জন শিকারী ছিল, মাঝি ছিল—তারা পড়লো জলে। জলে পড়ে একজন তখনি ডুবে গেল। জেমস্‌ বার্টলি বলে এক ভদ্রলোক ভাসছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তিনিও হলেন অদৃশ্য। ওদিকে শিকারীর দল সমুদ্রের জল তখন করছে তোলপাড়, তিমিকে মারবার জন্য। তিন ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর তিমি ঘায়েল হলো। তখন তাকে জাহাজে তোলার ব্যবস্থা আরম্ভ হ'ল। সত্যি করে তিমির দেহ এমনি অতিকায় যে, গোটা দেহ-সমেত তাকে জাহাজে তোলা এক বিরাট ব্যাপার! শিকারীরা করল কি, সেটাকে জাহাজের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে তার গায়ে মারতে লাগলো বড় বড় কুড়ুল, কাটারী আর খাঁড়ার ঘা। বেলা দুটো থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত অস্ত্র চালিয়ে লোকজন হিমসিম, তবু তিমির দেহকে কায়দা করা গেল না। পরের দিন ভোর হতে আবার অস্ত্রাঘাত সুরু হ'ল। দু-চার ঘা দেবার পর সকলে দেখে, তিমি তো মরেছে কিন্তু তার পেটে জীবন্ত প্রাণীর ছটফটানি। সকলে ভাবলো, তিমির বাচ্চা। তারপর সাবধানে অস্ত্র চালিয়ে পেট হলো চেরা—তখন পেট থেকে বের হলেন সেই ভদ্রলোক—জেমস্‌ বার্টলি। প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্‌ করছে, কিন্তু নিস্পন্দ, অচেতন। ডেকে শুইয়ে চিকিৎসা-পরিচর্যায় ভদ্রলোকের জ্ঞান হলো; কিন্তু উন্মাদ পাগল। ক্যাপ্টেনের কেবিনে যেয়ে তাঁর চিকিৎসা চললো—দু-হপ্তা পরে ভদ্রলোক ধাতস্থ হলেন। আরো এক হপ্তা পরে তিনি আবার মানুষের মতো হলেন। তিনি বলেছিলেন,—ভয়ানক গরম একটা জায়গায় তিনি বন্দী—এইটুকু মাত্র তাঁর উপলব্ধি ছিল। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না। এ বৃত্তান্ত একজন বৈজ্ঞানিক আগাগোড়া রেকর্ড করে রেখেছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিমি সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাই থেকেই আমরা সঙ্কলন করে দিলুম এ বৃত্তান্ত।

ভুতুড়ে আংটি

—যাদুকর যতীন সাহা

যাদুকর যখন নিজের জিনিস দিয়ে খেলা না দেখিয়ে দর্শকগণের কাছ থেকে কোন জিনিস চেয়ে নিয়ে খেলা দেখান, তখন সেই খেলা দেখে দর্শকগণ আরও অবাক্ হয়ে যান। তার কারণ দর্শকদের জিনিস ম্যাজিক দেখাবার উপযোগী করে তৈরী করা নয় এবং তাতে কোন কৌশলও করা নেই; অতএব যাদুকর যত বেশী অপরের জিনিস চেয়ে নিয়ে খেলা দেখাবেন, তত বেশী যে বাহবা পাবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একবার আমি আসাম মেলে ভ্রমণ করবার সময় একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সমস্ত যাত্রীদের অবাক্ করে দিয়েছিলাম পর পর ছ'টি ধারকরা জিনিসে খেলা দেখিয়ে। যাত্রিদের কাছে আমি এমন ভাব প্রকাশ করেছিলুম যেন খেলা দেখাবার মতন কোন জিনিসই আমার কাছে নেই। সবই তাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেলা দেখাচ্ছি। কিন্তু যারা ম্যাজিক জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এটা জানেন যে, যতই ধার করা জিনিসে খেলা দেখান হোক্ না কেন, কোন কোন স্থলে যাদুকর দর্শকদের অগোচরে এমনভাবে তার নিজের দু'চারটি জিনিসের সাহায্য নিচ্ছেন যে, দর্শকগণ সে সব জিনিস দেখা দূরের কথা, ভাবতেও পারেন না। সাধারণতঃ টাকা, ঘড়ি, আংটি, রুমাল, ফিঁতে, দড়ি তাস, ইত্যাদি ধার করে অনেক মজার মজার অবাক্-করা খেলা দেখান চলে। এমনি একটা অত্যাশ্চর্য মজার খেলা আজ তোমাদের আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। পর পর এ-জাতীয় আরও কয়েকটি খেলা শিখিয়ে দেবার ইচ্ছা রইল। এবারকার খেলাটির নাম, **"ভুতুড়ে আংটি"**।

যে কোন দর্শকের কাছ থেকে আমি একটি আংটি চেয়ে নিই। একটি শূন্য কাঁচের গ্লাস দর্শকদের পরীক্ষার পর তাতে অপর একটি গ্লাস থেকে এক গ্লাস দুধ বা চা ঢালি। চা বা দুধ-পূর্ণ গ্লাসটি দর্শকদের আরও কাছে তুলে ধরে বাঁ হাতে সেই ধার করা আংটিটি সকলকে দেখিয়ে চা বা দুধ-পূর্ণ সেই গ্লাসটির ভেতর ফেলি। তারপর গ্লাসটি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে অপর শূন্য গ্লাসটি হাতে করে এগিয়ে আসি। দর্শকদের ভেরত কাউকে অনুরোধ জানাই,—দয়া করে কেউ কি ঐ দুধ-পূর্ণ বা চা-পূর্ণ গ্লাসটি এনে আমার এই

শূন্য গ্লাসে ঢেলে, তলা থেকে আংটিটি তুলে আমায় দেবেন? বলা বাহুল্য তৎক্ষণাৎ একজন উৎসাহী দর্শক উঠে কাজটি করেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি আর গ্লাসের তলায় আংটিটি খুঁজে পান না! আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, নিশ্চয়ই দুধের সঙ্গে গড়িয়ে এসে ওটি এই গ্লাসের ভেতর পড়েছে। আচ্ছা এবার খুব সাবধানে এ-গ্লাস থেকে ও-গ্লাসে আবার দুধটুকু ঢালুন; নিশ্চয়ই আংটি তলায় পড়ে থাক্‌বে। দেখবেন, গড়িয়ে অন্য কোথাও পড়ে না যেন। পুনরায় এ-গ্লাস থেকে ও-গ্লাসে দুধ অতি সন্তর্পণে ঢালা হ'ল বটে, কিন্তু এবারও আংটি নেই! তবে আংটিটা গেল কোথায়? একখানা রুমাল দিয়ে বলি, দুধটুকু ছেঁকে নিন, অপর গ্লাসে, নিশ্চয়ই আংটি ধরা পড়বে। কিন্তু কি আশ্চর্য এত করেও আংটি আর পাওয়া যায় না! আংটি উধাও হয়েছে! এই সময় আংটির মালিক বলে বসলেন, ওসব চালাকি চল্‌বে না মশাই—আমার আংটি আমায় ফিরিয়ে দিন, এখনি!"

টেবিলের উপর একটি পাউরুটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে আমি বললুম, ঐ দেখুন আংটি চা খেয়ে আবার পাউরুটি খেতে গিয়ে ওর ভেতর ঢুকে বসে আছে—বেরুবার পথ পাচ্ছে না। দর্শকগণ হেসে আমায় উপহাস করে অনেক কিছু বল্‌লেন। আমি কিন্তু ততক্ষণে পাউরুটিটি সবার কাছে এনে ছুরি দিয়ে কেটে দু'টুকরো করে ফেললুম। সবাই অবাক্—সত্যিই ত'! ঐ ত' পাউরুটির ভেতরে আংটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! আংটিটি বের করে তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে বলি, "এইটিই কি আপনার আংটি নয়?" তিনি সাগ্রহে বলেন, "হ্যাঁ এইটিই।" অমনি চারদিক থেকে ঘন ঘন হাততালি বেজে ওঠে।

এবার দেখ কত সহজে আংটিটি সরিয়ে ফেলা যায়, অথচ কেউই তা বুঝতে পারে না। এর জন্যে সামান্য একটি জিনিসের সাহায্য, এবং অল্প একটু অভ্যাসের প্রয়োজন। পাশের ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে ঠিক ঐ রকম 'দ'য়ের মত করে এক টুক্‌রো পাতলা টিন ভাঁজ করে নাও। তারপরের ছবিতে যেমন গ্লাসের ভেতর সেটি বসিয়ে দেখান হয়েছে, ঐভাবে গ্লাসে বসাও। এখন উপর থেকে গ্লাসের ঠিক মাঝখানে একটি আংটি ফেলে দিলে দেখবে, আংটিটি পাতলা টিনে তৈরী হুকের সঙ্গে আট্‌কে যাবে এবং গ্লাসের তলায় না পড়ে টিনের পাতে ঝুলে থাকবে। এবার গ্লাসে দুধ বা চা ঢেলে দেখ হুক বা আংটি এবং টিনের পাত কিছুই দেখা যাবে না। 'দ'য়ের মত ঐ পাত্‌লা

টিনের হুকটি ডান হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে গোড়ার দিকটা একটু চেপে রেখে, দর্শকদের দিকে হাতের উপর দিকটা রেখে গ্লাসটি ধরতে হবে। ফলে দেখবে হাতের আড়ালে গ্লাসের ভেতর হুকটি সুন্দর ভাবে বসে গেছে। এইভাবে গ্লাসটি ধরে দর্শকদের কাছে এগিয়ে আস্‌বে, এবং বাঁ-হাতে ক'রে অপর গ্লাসটি থেকে চা বা দুধ ডান-হাতে ধরা গ্লাসে ঢেলে দেবে। পরে বাঁ-হাতে করে ধার-করা আংটিটি তুলে ধরে ধীরে ধীরে ঠিক গ্লাসের মাঝখানে চা বা দুধের মধ্যে ফেলে দেবে, সবাই যেন দেখতে পায়। তারপর গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখবার সময় টিনের পাতে তৈরী 'দ'টি ডান-হাতের আড়ালে তুলে নেবে, দেখবে তাতে আংটিটি ঝুলে রয়েছে। চট্‌পট্‌ সেটি টিনের পাত সমেত টেবিলের অন্যান্য জিনিসের পেছনে ফেলে দিয়ে শূন্য গ্লাসটি হাতে করে দর্শকদের সামনে এসে দাঁড়াবে, এবং সেই ফাঁকে তোমার সহকারী সেটি কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। দর্শকদের কাউকে তখন চা বা দুধ-পূর্ণ গ্লাসটি টেবিল থেকে আন্‌তে অনুরোধ জানাবে এবং এ-গ্লাস ও-গ্লাসে দুধ ঢালা-ঢালি করতে থাক্‌বে। ততক্ষণে তোমার সহকারী একটি পাউরুটির ভেতর আংটি পুরে টবিলে রেখে যাবে। বাকীটুকু খুবই সহজ। এখন পাউরুটির ভেতর আংটি কি ভাবে প্রবেশ করিয়ে দেবে বলে দিচ্ছি। পাউরুটির তলার দিকে মাঝখানে প্রথম ছুরির ডগা বসিয়ে দেবে। তারপর ছুরি বের ক'রে সেই ফাটলের মুখে আংটিটি বসিয়ে দিয়ে ছুরির ডগা দিয়ে চাপ দেবে, তা'হলেই দেখবে ক্রমশঃ আংটিটি পাউরুটির ভেতর প্রবেশ করছে। এই ভাবে ঠেলে ঠিক পাউরুটির মাঝখানে সেটিকে প্রবেশ করিয়ে দেবে। পরে আঙুলের চাপে কাটা দাগটি মিলিয়ে দেবে।

সুন্দরভাবে খেলাটি দেখাতে পারলে খুবই যে বাহবা পাবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই! আজ এখানেই শেষ করি, এর পর আবার ধার-করা জিনিসের অপর খেলা শেখাবার জন্য চেষ্টা করব।*

* যাদুকর যতীন সাহার নামের সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয় পরিচয় আছে। তাঁর লেখা মধ্যে মধ্যে তোমরা ত' পড়ই, তাছাড়া 'মৌচাকে'র গত ম্যাজিক-সংখ্যায় তাঁর জীবনী ও ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিখ্যাত ম্যাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন এবং কয়েকটির বিশেষ সদস্য হিসাবে গণ্য হয়েছেন। ভারতীয় ম্যাজিসিয়ানদের নাম পৃথিবীর চারিদিকে এঁদের মত গুণীজনদের দ্বারা যতই ছড়িয়ে পড়ে ততই ভারতের গৌরব। শীঘ্রই যাদুকর সাহা কলিকাতার একটি নামকরা প্রেক্ষাগৃহে তাঁর যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করছেন। মৌঃ সঃ

ফুটবল মাঠে পণ্ডিতমশাই

শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু

ছেলেদের ফুটবল মরশুমের সেরা খেলা আজ—বয়েজ চ্যালেঞ্জ শিল্ডের ফাইনাল খেলা। ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণপাড়া হাইস্কুল আর লালবাগ হাইস্কুল। গত বছরের ফাইনালে ভালো খেলেও দক্ষিণপাড়া প্রায় জেতা গেম্‌টা হেরে যায়। বরাবর এক গোলে জিতে এসে শেষ মুহূর্তে কিনা তাদের গোলকিপার ছু-ছুটো গোল দিলে গলিয়ে—তার, ওর নামকি, জোড়াঠ্যাঙের মাঝখান দিয়ে!

খেলার পর দক্ষিণপাড়ার ক্যাপ্টেন রমেন তাদের গোলকিপার নটবরকে লক্ষ্য করে বলেছিল—"ঢের্-বহুত গোলকি দেখেছি বাবা—অমন থার্ডক্লাস একটা খুঁজেও দেখাতে পারবি নি! বলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বাবু অজন্তা স্টাইলে পোজ মারছেন!" ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিল—"আহা! অমন করে বলছিস কেন? ও ত' আর ইচ্ছে ক'রে গোল ছাড়ে নি।" উত্তরে রমেন বলেছিল—"যা যা! আমাকে আর শেখাতে আসিস নি। বলি ওই যে শিব-তাণ্ডব পোজখানা, সেটাও অনিচ্ছা ক'রে নাকি? আর সত্যি কথা বলতে গেলে, তোদের জন্যেই ত' এমন হ'ল। টিম বাছবার সময়ে গোলকিপার বাছা হবে—তোরা সবাই চ্যাঁচাতে লাগলি—নটবরের স্টাইলের কাছে আর কাউকে দাঁড়াতে হয় না। নটবর unanimous। বলেই সবাই দিলি হাত তুলে। এখন নে—স্টাইলের সঙ্গে ছুটো গোল গুলে ধুয়ে খা!"

রমেনকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। বেচারা জান কবুল ক'রে খেলেছিল। যে-গোলটা দক্ষিণপাড়া দিয়েছিল, সেটা রমেনেরই বিশেষ চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। গোল দেবার পর বল যখনই রমেনদের গোলের দিকে গেছে, রমেন তার রাইট-ইন পোজিসন থেকে পেছনে হ'টো গিয়ে তাদের রাইট হাফব্যাক না হয় সেণ্টার হাফব্যাককে সাহায্য করেছে। এত ক'রে, আর একটা গোলে বরাবর এগিয়ে থেকে এসে, খেলা শেষ হবার ঠিক আগেই ছু-ছুটো বাজে গোল খেলে কার না রাগ হয়? সেই রাগের বশেই রমেন ওই রকম বলেছিল, নইলে নটবরের সঙ্গে রমেনের কোনও ঝগড়া ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারের পর ছুজনের মধ্যে আগেকার মতন আর ভাব রইল না।

এ-বছরের খেলোয়াড় নির্বাচন হ'য়ে গেলে পর টীমে নটবরের নাম না দেখতে পেয়ে, নটবরের বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"কিরে নটু! টীমে তোর

নাম দেখতে পেলাম না যে?" নটু একটু হেসে বলেছিল—"তা জানিস না বুঝি? এবারে আমাদের একজন ইণ্টারন্যাশনাল গোলকিপার এসেছে যে! এ গোল থেকে বল মারবে ও গোল যাবে ফুঁটো হ'য়ে—ফরোয়ার্ডদের আর খেলতেই হবে না। হেঁ হেঁ, আশ্চর্য হ'য়ে গেলি নাকি?" বন্ধুরা বললে—"তাই নাকি! আমরা তবে রামবাগকেই চিয়ার আপ (cheer up) করব। রমেনের বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি! ভারী ত' ক্যাপ্টেন হয়েছেন, তাই ব'লে মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি! দেখে নেব আমরা!"

* * * * *

খেলার মাঠে খুবই ভীড় হয়েছে। অন্যান্য বছর হেড মাষ্টার, সেকেণ্ড মাষ্টার আর ড্রিল মাষ্টার ছাড়া, মাষ্টারদের মধ্যে আর কেউ বড় একটা খেলার মাঠে আসেন নি। এবারে হেড মাষ্টারমশায়ের বিশেষ অনুরোধে প্রায় সব মাষ্টারই এসেছেন খেলা দেখতে। এমন কি, পণ্ডিতমশাই, যিনি ফুটবল খেলাটাকে ষণ্ডামি-গুণ্ডামিরই সামিল ধ'রে থাকেন তিনিও হেড মাষ্টার মশায়ের অনুরোধ এড়াতে পারেন নি। মাঠে এসেই তিনি রমেনকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা রমেন্দ্র, আমাকে একটু ব'লে দাও ত' বাবা—খেলার হার-জিতটা কেমন ক'রে টের পাব।" যে ফুটবল খেলার কিছুই জানে না, এমন লোককে রমেন দু'কথায় কি বোঝাবে? সে বললে—"মাঠের দু'দিকে দুটো ক'রে খুঁটি পোঁতা আছে দেখছেন? দুটো খাড়া, আর একটা কড়িকাঠের মতন—খুঁটি দুটোর মাথা ছুঁয়ে? ওই ঘরটার ভেতর দিয়ে বল ঢুকলেই যারা ঘরটাকে সামলাচ্ছে তারা গোল খেলে। এই রকম ক'রে যারা বেশী গোল খাবে তাদের হার হবে।" পণ্ডিত মশাই চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বললেন—"তাই নাকি? তবে ত' তোমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে ক'রে তোমাদের খুঁটি দুটোর ভেতর দিয়ে বলটা কিছুতেই না গলতে পায়। আর তা'হলে তোমার বিপক্ষদল তোমাদেরকে আর পরাজিত করতে পারবে না।—কি বল বাবা রমেন্দ্র?" রমেন বললে—"আজ্ঞে, শুধু তাই নয়, বিপক্ষ দলের খুঁটির ভেতর দিয়ে বল চালিয়ে দিতে হবে আমাদের—নইলে খেলা জিতব কি করে?" পণ্ডিতমশাই বললেন—"তা ত' বটেই। ঠিক বলেছ বাবা রমেন্দ্র; সুন্দর বলেছ। এই আমাকে যেমন বললে, তোমার অন্যান্য খেলোয়াড়দেরকে ঠিক তেমনি ক'রে বুঝিয়ে বলে দাও ত' বাবা। খেলা আমাদের জিততেই হবে, বুঝলে?" "যে আজ্ঞা" ব'লে রমেন পাশ কাটিয়ে গেল।

তখনও খেলা আরম্ভ হ'তে কিছু বাকী। পণ্ডিতমশাই তাঁর লাঠিগাছটি নিয়ে সারা মাঠটা একবার ঘুরে দেখতে লাগলেন। একটা গোলের পেছনে দেখলেন, তাঁর স্কুলের সব

ছাত্রেরা জড়ো হয়ে আছে। তাদের দেখেই ব'লে উঠলেন—"কি হে! তোমরা সব এখানে একত্র হ'য়ে আছ?" ছেলের দল বললে—"আজ্ঞে, আমাদের ইস্কুল যখন গোল দেবে এখান থেকে ভাল দেখতে পাব, আর তখন আমরা সবাই মিলে বাহবা দেব।" পণ্ডিতমশাই বললেন—"বেশ বেশ।" তারপর মাঠের অপর দিকটায় পৌঁছে দেখতে পেলেন, লালবাগ স্কুলের ছেলেরা সব জড়ো হয়ে আছে, আর তাদের মধ্যেই দেখতে পেলেন, নটু, হারু, দীপেন, নরেন আর মধুকে—যারা সব তাঁরই স্কুলের ছাত্র। তাদেরকে দেখে পণ্ডিতমশাই একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললেন—"কি হে! তোমরা সব এখানে? তোমাদের দলকে ত' দেখে এলাম, সবাই ওদিকটায় ব'সে আছে।" নরেন, মধু, এরা সব ব'লে উঠল—"আমরা ঘাঁটি আগলাচ্ছি। বল কাছাকাছি এসেছে কি আমরা আমাদের হরিচরণকে (দক্ষিণপাড়ার গোলকিপার) হুঁশিয়ার ক'রে দেব—দেখি, কি ক'রে লালবাগ গোল দেয়।" বলেই মুখ আড়াল ক'রে হাসতে লাগল। "এ ত' ভারী ভালো মতলব এঁটেছ তোমরা, দেখছি!—বেশ, বেশ।" বললেন পণ্ডিতমশাই।

এদিকে খেলা আরম্ভ হয়েছে। পণ্ডিতমশাই হঠাৎ দেখতে পেলেন, লালবাগের একজন ফরোয়ার্ড বল নিয়ে এগিয়ে আসছে, আর তার পেছন পেছন দক্ষিণপাড়ার হাফ্‌ব্যাক্ পল্টু ছুটছে। তারপর দেখলেন, লালবাগের ফরোয়ার্ডটা বলটাকে উঁচু ক'রে দক্ষিণপাড়ার গোলের দিকে মারলে। বলটা উঁচু হ'য়ে গোলের দিকে আসছে, হরিচরণ সেটাকে ধরবে, এমন সময় নটুর দল 'টেক্ কেয়ার হরিচরণ টেক্ কেয়ার' ব'লে এক সঙ্গে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল। বলটা ধরা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার ছিল না, কিন্তু ঠিক পেছন থেকেই আচম্‌কা ওই রকম একটা চীৎকার শুনে হরিচরণ কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলটা একেবারেই ফস্কালে। নেহাৎ ভাগ্য ভালো বলতে হবে, সামান্যর জন্য গোল হ'ল না। নটুর দল আবার চ্যাঁচালো—"বা ভাই! well saved!" একে ত' বলটা ফস্কেছে, তার ওপর নিজেদের দলের কাছে এই ব্যঙ্গোক্তি শুনে হরিচরণ মিনতির স্বরে নটু-হারুদের বললে—"কেন অমন ক'রে চ্যাঁচাচ্ছিস?"

পণ্ডিতমশাই এই সব কথাবার্তা চলেছে দেখে এগিয়ে এসে নটুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হে, ব্যাপার কি?" নটু বললে—"এই দেখুন না স্যার! এখুনি ত' একটা গোল খেয়েছিল আর কি! তাই বলতে গেলাম, একটু সাবধান হ'—তা বাবু রেগে কাঁই।" পণ্ডিতমশাই ফুটবলের কিছুই জানেন না, তবে এটা দেখেছিলেন যে, বলটা হরিচরণ ধরতে পারে নি। শুনতেও পেয়েছিলেন, অন্যেরা মন্তব্য করছে—যাঃ, খুব বেঁচে গেছে! তিনি ভাবলেন, হরিচরণের এই রকম অসাবধান হওয়া মোটেই উচিত হয় নি। আর নটু-হারু এরা হরিচরণের ভালোর জন্যই তা'কে সাবধান করেছে। তিনি হরিকে বললেন—"কি হে?

বলটি বিনা বাধায় গোলে গিয়ে ঢুকল

উচিত কথা বলছে, তা'তে অত উষ্মা কেন? এখনি ত' সর্বনাশ করেছিলে, আবার রাগ দেখাচ্ছ!" এর পর হরিচরণের মনের অবস্থা যা হ'ল তা আর বলবার নয়। যে বলটা এগিয়ে ধরতে হবে, সেটার বেলায় হয় দাঁড়িয়ে থাকে নয়ত চার পা পেছিয়ে যায়। যেটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পাওয়া যায়, সেটার বেলায় লাফিয়ে যায় এগিয়ে। ফলে বলটা আর ধরা হয় না। দক্ষিণপাড়ার ব্যাক, হাফব্যাক, ফরোয়ার্ড সবাই ত' অবাক। এদিকে নটুর দল হরিচরণকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। সুবিধা বুঝে লালবাগের ফরোয়ার্ডরা দূর থেকেই উঁচু ক'রে মারছে। একটা বল উঁচু হ'য়ে দক্ষিণপাড়ার একটা ব্যাকের পেছনে এসে পড়ব পড়ব হয়েছে; হরিচরণ যদি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে তবে বলটা বুকের কাছে অনায়াসে ধরতে পারে। নটুর দল সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল—"Careful! Careful! save the goal!" সঙ্গে সঙ্গে লালবাগের ছাত্রেরা "গোল! গোল!" ব'লে চ্যাচাতে লাগল। দক্ষিণপাড়ার রাইট ব্যাক পেছন ফিরে হরিচরণকে উদ্দেশ ক'রে বললে—"take it!" হরিচরণ করলে কি, দিগবিদিক শূন্য হ'য়ে একটা লাফ মেরে এগিয়ে গেল। তার ফল হ'ল এই—বলটি বিনা বাধায় হরিচরণের মাথার উপর দিয়ে গোলে গিয়ে ঢুকল!

ভয়ানক একটা গোলমাল শুরু হ'য়ে গেল। লালবাগের দল—'গোল! গোল'! ব'লে

চ্যাচাচ্ছে—একটা রীতিমত হট্টগোল চলতে লাগল। তার উপর পণ্ডিতমশাই এসে বলতে লাগলেন—"ধিক্! বারংবার তোমাকে সাবধান ক'রে দেওয়া সত্বেও কর্তব্যে তোমার অবহেলা! এ অমার্জনীয়!" হরিচরণ তখন একটা ইঁদুরের গর্ত পেলে বেঁচে যায়, এমন অবস্থা। ভাগ্যে তখনি হাফ্-টাইমের সিটি পড়ল! দক্ষিণপাড়ার খেলোয়াড়রা হরিচরণকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলে যে, নটুর দল তাকে বিশেষভাবে উত্যক্ত করছে। পণ্ডিতমশাইয়ের উপদেশগুলিও তাকে বিশেষ সাহায্য করছে না। তখন রমেন, সমরেশ, বিষ্টু, শিবু, এরা সবাই মিলে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলে যে, পণ্ডিতমশাইকে যেমন করেই হোক লালবাগের গোলের পেছনে আনতে হবে, নইলে হরিচরণের দফা রফা; সোজা বল এসেছে কি গোল হয়েছে!

রমেন, সমরেশ, এরা কয়েকজন মিলে পণ্ডিতমশাইকে গিয়ে বললে—"পণ্ডিতমশাই, আপনি এবার লালবাগের গোলটার পেছন থেকে খেলাটা দেখুন। তার মানে, এতক্ষণ যে-গোলটার পেছনে ছিলেন সেখানেই থেকে যান।" পণ্ডিতমশাই উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন—"সে কি হে রমেন! তবেই হয়েছে আর কি! হরিচরণকে দেখেছ ত'; এত সাবধান করছি—তাতেই কি করলে, দেখেছ ত'! আমি অনন্যকর্মা হ'য়ে শুধু তাকে নিয়েই প'ড়ে আছি।" রমেনরা বললে—আজ্ঞে, তা ত' বটেই, কিন্তু এদিকে হয়েছে কি, একটা গোল ত' খেয়ে ব'সে আছি। কম্‌সে-কম দুটো গোল আমাদের দিতে হবে, তবে আমরা জিতব। আমরা যদি গোল দিতে না পারি, তা'হলে ওই একটা গোলেই আমাদের হার হয়ে যাবে। আপনি যদি লালবাগের গোলটার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের ফরোয়ার্ডদের উৎসাহ দিতে থাকেন, তবে যদি আমরা কিছু করতে পারি। এ ছাড়া আর ত' উপায় দেখছি না; গেমটা হারই হ'য়ে গেল, যা দেখছি!" পণ্ডিতমশাই ব্যাকুল হ'য়ে বলে উঠলেন—সে কি কথা! এ আর এমন কি! আমি তোমাদের কথামতো লালবাগের গোলের পেছনেই থাকব। কিন্তু ওই হরিচরণের ওপর দৃষ্টি রেখো তোমরা—আমি রইলাম তোমাদের ফরোয়ার্ডদের নিয়ে।

নটুর দল চলেছে, হরিচরণের পেছনে থেকে গোলমাল করবে ব'লে। তাই না দেখে সমরেশ গিয়ে তাদেরকে বললে—"এই নটু! রামের বিভীষণ না হ'য়ে রামবাগের বিভীষণ হয়েছ! ভালো চাও ত' যেখানে ব'সে এতক্ষণ খেলা দেখেছ, সেখানে যাও—নইলে খেলার পর তোমাদের একটিরও গায়ে হাড় আস্ত থাকবে না, ব'লে দিচ্ছি!" নটুর দল সুড় সুড় ক'রে ফিরে গেল তাদের আগেকার জায়গায়।

সেকেণ্ড হাফ্ আরম্ভ হতেই দক্ষিণপাড়ার ছেলেরা নতুন উৎসাহে খেলা শুরু করলে। রমেন বল পেলেই রামবাগের লেফ্‌ট হাফ্-ব্যাককে তাপ্পি মেরে পাশ কাটিয়ে

কে কোথায় আছে একবার দেখে নেয়। ওই অবস্থায় রামবাগের সেণ্টার-হাফ্-ব্যাক এসে রমেনের কাছ থেকে বলটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। পেছন পেছন লেফ্ট ব্যাকও একটু এগিয়ে আসে। রমেনও তাই চায়। আর একটা তাপ্পি মেরে দ্বিতীয় হাফ্-ব্যাককে পাশ কাটিয়ে সোজা লেফ্ট ব্যাকের দিকে এগুতে থাকে—ভাবটা এমন দেখায়, যেন ব্যাকের ডান পাশ দিয়ে সে বেরিয়ে যাবে। লেফ্ট ব্যাক তাই না দেখে তার ডান দিক সামলাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে—আর, সেই সুযোগে, রমেন বলটিকে সোজা ঠেলে দেয় তাদের রাইট-আউট হরেনের দিকে। খোলা ময়দানে বলটি পেয়ে হরেন ১০-১২ পা এগিয়ে তাগ ক'রে সেণ্টার করে দেয়। ততক্ষণে রামবাগের গোলের সামনে দক্ষিণপাড়ার সমরেশ, শিবু, কেষ্ট এসে পৌঁছে গেছে—একটা তুমুল কাণ্ড বেধে যায় সেখানে।

এদিকে দক্ষিণপাড়ার কোনও ফরোয়ার্ডের কাছে বল এলেই পণ্ডিতমশাই চ্যাঁচাতে থাকেন। শিবু একবার বলটা নিয়ে রামবাগের গোলের দিকে আসছে, তাই না দেখে পণ্ডিতমশাই ব্যাকুল হ'য়ে বলতে লাগলেন—"ও বাবা শিবু, নিয়ে এস বাবা বলটা!...এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক গোলের পেছনেই।...তুমি সোজা চ'লে এস আমার দিকে!...এই যে বাবা, লক্ষী বাবা—দাও, দাও, এবার দাও ত' চালিয়ে এই খুঁটি দুটোর মধ্যিখান দিয়ে!...এঃ! একি করলে?...বলটা আবার ওদের দিকে দিলে কেন?...নাঃ, সব মাটি করে দিলে!"...

খেলা এইরকম ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ হরেনের একটা সেণ্টার উঁচু হ'য়ে এসে পড়বি ত' পড় একেবারে রামবাগের লেফ্ট-ব্যাকের প্রায় মাথার উপর। লেফ্ট-ব্যাক চেষ্টা করলে বলটাকে কায়দায় আনতে—কিন্তু পারলে না; বলটা তার মাথায় প'ড়ে উঁচু হ'য়ে বাঁক নিলে রামবাগের গোলের দিকে। ফাঁক বুঝে সমরেশ ছুটে গিয়ে মাথা ঘুরিয়ে একটা হেড্ দিলে; বলটা গোলের এককোণ দিয়ে ঢুকে গেল। রামবাগের গোলকিপার কিছুই করতে পারলে না। দক্ষিণপাড়া হাই স্কুলের যত ছাত্র ছিল তারা সকলে মিলে মহা উল্লাসে চ্যাঁচাতে লাগল। পণ্ডিতমশাই আনন্দে আটখানা হয়ে বলতে লাগলেন—"সাধু! সাধু! সোনারটুকরো ছেলে আমাদের সমরেশ; আমার কথাটা রেখেছে!" কিন্তু তাঁর কথা তখন কে শোনে? কোলাহলে তাঁর গলা চাপা প'ড়ে গেল।

গোল খেয়ে রামবাগ দক্ষিণপাড়াকে বেশ কিছুক্ষণ চেপে ধরলে। একটা কোণাচে শট্ হরিচরণ ঝাঁপিয়ে শুয়ে প'ড়ে কোনও রকমে দিলে করনার ক'রে। মাঠসুদ্ধ লোক তারিফ করতে লাগল—'Brilliant save! sure goal বাঁচিয়েছে!' হরিচরণের ওই রকম ঝাঁপিয়ে পড়ার বহর দেখে পণ্ডিতমশাই ত' ভেবেই আকুল—"আহা! গেল বুঝি ছোকরা

মরেই। হাড়গোড় বোধকরি আর একটিও আস্ত নেই!" তারপর যখন দেখলেন, হরিচরণ উঠে দাঁড়িয়েছে তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ব'লে উঠলেন—"আঃ! প্রাণপণ ক'রে খেলছে আমাদের হরিচরণ—ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন!" পণ্ডিতমশায়ের এতটা প্রশংসা নটু সহ্য করতে পারলে না। সে বললে—"ওটা কি আর হ'য়ে বাঁচিয়েছে; ওটা স্যার আন্দাজে হ'য়ে গেছে!" পণ্ডিতমশাই ভয়ানক চ'টে গেলেন। বললেন—"বলো কি হে? স্পষ্ট দেখলেম, সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের হরিচরণ, প্রাণ তুচ্ছ ক'রে—আর তুমি বলছ আন্দাজে হ'য়ে গেছে!" দক্ষিণপাড়া হাই-স্কুলের যত ছাত্র ওইখানে ব'সে খেলা দেখছিলি, সবাই নটুকে বকতে লাগল—"যা যাঃ, আন্দাজওয়ালা! গত বছর ইস্কুলটি ত' ডুবিয়েছিলি; এবারে টীমে পড়েন নি ব'লে বাবু হিংসেয় ফেটে মরছেন! ফের একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কি দেব অ্যায়সা গাঁট্টাফাই ক'য়ে!" নটু বেগতিক দেখে চুপ ক'রে গেল।

রামবাগের সেণ্টার ফরোয়ার্ড একটা বল নিয়ে দক্ষিণপাড়ার সেণ্টার-হাফ্ তারাপদকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তারাপদ হঠাৎ পা'টা বাড়িয়ে দিয়ে বলটা কেড়ে নিলে। তারপর কে কোথায় আছে এক নজরে দেখবার জন্য যেমনি তাকিয়েছে, অমনি দেখতে পেলে, রমেন তাকে ইঙ্গিত করছে—বলটা রমেনের দিকে ঠেলে দেবার জন্য। তারাপদ বলটা রমেনকে দিয়েছে আর রমেন রামবাগের লেফ্‌ট হাফ্-ব্যাককে পাশ কাটিয়েছে—এ ব্যাপারটা হ'য়ে গেল নিমেষেরই মধ্যে। এদিকে রামবাগের সেণ্টার-হাফ্ এসে রমেনের পথরোধ করলে। রমেন তখন একটা নতুন চাল চাললে। করলে কি, পায়ের গোড়ালি দিয়ে বলটা দিলে পেছনের দিকে চালিয়ে। পেছনে একটু তফাতেই ছিল তারাপদ, সে একটা লাফ মেরে বলটা ধরলে —ততক্ষণে রমেন রামবাগের সেণ্টার হাফ্ ব্যাককে ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ইঙ্গিত বুঝে তারাপদ একটা থ্রু-পাশ দিলে রমেনের দিকে। রমেন বলটা ধ'রে রামবাগের লেফ্‌ট-ব্যাকের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর দিলে সমরেশকে পাস ক'রে। সমরেশ বলটা পেয়েই রামবাগের রাইট আর লেফ্‌ট ব্যাকের মাঝখান দিয়ে একটা থ্রু-পাস ঠেলে দিলে। ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে রমেন বলটাকে আবার ধরলে; আর ধরেই সোজা চলল রামবাগের গোলের দিকে। এই অবস্থা দেখে দক্ষিণপাড়ার ছাত্ররা সমস্বরে চীৎকার করতে লাগল—"shoot! shoot!" গোল থেকে যখন ১৫।১৬ হাত তফাত, তখন রমেন একবার রামবাগের গোলকিপারকে দেখে নিলে। গোলকিপার তখনও ঠিক ক'রে উঠতে পারে নি, চার্জ করবে কি না। গোলকিপারও চার্জ করতে যাবে এমন সময়ে রমেন বাঁ পা'য়ে বলটা মারলে গোলের বাঁদিকের কোণ টিপ করে। একবার হুমড়ি খেয়ে গোলকিপার চেষ্টা করলে বলটা ধরতে, কিন্তু বলটা

তার নাগালে পেলে না। বাঁ-দিকের খুঁটি ঘেঁষে বলটা গোলে ঢুকছে, এমন সময়ে রামবাগের লেফ্‌ট ব্যাক পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে রমেনকে মারলে এক ভীষণ ধাক্কা! আচমকা ধাক্কা সামলাতে না পেরে রমেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল—বলটা কিন্তু তার আগেই গোলে ঢুকে গেছে।

"Foul! Foul! Penalty!" ব'লে চারদিকে সবাই চীৎকার করতে লাগল। রমেন মাটিতে পড়েই আছে, আর ওঠে না দেখে কয়েকজন ছেলে ছুটে চ'লে গেল তার কাছে—সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমশাইও গেলেন। একটা ভিড় জমে গেল। রেফারী খেলোয়াড় ছাড়া আর সবাইকে খেলার মাঠের বাইরে যাবার জন্য বলতে লাগলেন। কেউ বা গেল, কেউ বা গেল না। পণ্ডিতমশাই রমেনের গায়ে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন—"এ কি হ'ল! এ কি হ'ল!"

রমেনেকে ধরাধরি করে খেলার মাঠের বাইরে আনা হ'ল। পণ্ডিতমশাই রমেনের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলতে লাগলেন—"রমেন! বাবা রমেন! ওঃ! কি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে···পেছন থেকে কাপুরুষের মতন!···পশু! পশু!!"···এদিকে রেফারী 'পেনালটি' চীৎকারে কান না দিয়ে, হুইসল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, `গোলই হয়েছে। রামবাগের লেফ্‌ট ব্যাককে তিরস্কার করতেও ছাড়লেন না তিনি। দক্ষিণপাড়ার হেডমাষ্টার এবং অন্যান্য মাষ্টারেরা রমেনের কি হয়েছে দেখবার জন্য এসে পড়লেন। রমেন তখন উঠে বসেছে, আর সবাইয়ের প্রশ্নের জবাবে বলছে—"কিছু হয়নি আমার, মাথাটা একটু ঘুরে গিয়ে থাকবে—ও কিছু না।" হেডমাষ্টার এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রমেন, এখন কেমন বোধ করছ?" "কিছু হয়নি স্যার" বলেই রমেন উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ে রেফারী একটা অফ্‌সাইডের জায়গা বাৎলাবার জন্য রামবাগের গোলের কাছে এসেছিলেন। রমেন চেঁচিয়ে তাঁকে বললে—"আমি আবার খেলতে নাবছি।" রেফারী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই ছুটতে ছুটতে মাঠে গিয়ে ঢুকলো রমেন। চারদিকে হাততালি পড়তে লাগল।

তারপর শুরু হ'ল এক নতুন কায়দায় খেলা! দক্ষিণপাড়ার খেলোয়াড়েরা বল পেলেই লম্বা শট্‌ ক'রে রামবাগের গোলের দিকে পাঠিয়ে দেয়, নয়ত বা সাইড লাইন দিয়ে আউট ক'রে দেয়—উদ্দেশ্য, বাকী সময়টুকু আউট ক'রে ক'রেই কাটিয়ে দেওয়া; আর দিলেও তাই। কয়েক মিনিট পরেই 'খেলা-শেষ'-এর বাঁশী বেজে উঠল। আনন্দ-ধ্বনি আর হাততালির মধ্যে রমেন দক্ষিণপাড়ার হ'য়ে শিল্ড নিলে। তারপর বিজয়োল্লাসের পালা: Three cheers for দক্ষিণপাড়া হাইস্কুল hip, hip, hurrah! Three cheers for রামবাগ হাই স্কুল, ইত্যাদি। দক্ষিণপাড়ার হেডমাষ্টার একটু এগিয়ে এসে তাঁর খেলোয়াড় ছাত্রদের উপর এক নজর চোখ বুলিয়ে বললেন—"এবার আমি একজনের জন্য cheer দিতে তোমাদের সকলকে অনুরোধ করব—"Three cheers for পণ্ডিতমশাই!" ছেলেরা আকাশ ফাটিয়ে "Hip hip, hurrah!" বলে তিনবার জয়ধ্বনি করলে। পণ্ডিতমশাই গদগদ স্বরে বারবার বলতে লাগলেন—"আমি তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করছি বাবা। তোমাদের জয় হোক! তোমাদের জয় হোক!" তাঁর মুখে হাসি, চোখে জল।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কালীঘাট রোডের মোড়ে এসে ট্যাক্সিটা বাঁ-দিকে ঘুরল। এবার সোজা রাস্তা। তারপরেই কালীর মন্দির বাঁ-দিকে। আর পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিট পরেই দেখতে পাওয়া যাবে খোকাবাবুকে। ছোটবেলায় যখন হয়েছিল, গোবিন্দই কোলে করে মানুষ করে একরকম। গিন্নীমা সেই যে বিছানা নিলেন আর উঠলেন না। এক হাতে রান্না, এক হাতে বাজার করা আর এক হাতেই ছেলে মানুষ করা। সব কাজ এই গোবিন্দই করে এসেছে। ছোটবেলায় কী দুষ্টুই ছিল খোকাবাবু। দুপুরবেলা সদর দরজার পাশে ঘুমোচ্ছে গোবিন্দ। গরমের দুপুর। বাবু কলেজে চলে গেছেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেনের ছোট সরু গলিটা দিয়ে আইসক্রীমওয়ালা আসতো। খোকাবাবু আস্তে আস্তে টিপি টিপি পায়ে নাবতো রাস্তায় যাবার জন্যে। হঠাৎ যেন গোবিন্দর ঘুম ভেঙে গেছে—

—কে—কে—

খোকাবাবু গোবিন্দকে দেখেই পালিয়ে গেছে ওপরে। যত সব ছাই-ভস্ম—ওই সব খেয়েই তো পেটের ব্যামো হয়। বাবুকে কতদিন বলেছে গোবিন্দ খোকাবাবুর হাতে পয়সা না দিতে।

—কেন ওইটুকু ছেলের হাতে পয়সা দেন বাবু? ফিরিওয়ালা যত নষ্টের গোড়া—এত বাড়ী আছে পাড়ায় কিন্তু ঠিক এই বাড়ীর সামনে এসেই হাঁকাবে: চাই চিনেবাদাম, চাই ডালপুরী —ঘুগ্‌নিদানা—নকলদানা—জলকচুরি—ওদের মরণ হয় না গা!

ছোটবেলায় পড়তেই কি বসতো খোকাবাবু! ওই বাবুর ভয় দেখিয়ে পাড়া থেকে খুঁজে নিয়ে আসা। ওদিকে মাষ্টারবাবু বসে আছে তো বসেই আছে। গিন্নীমা মরার আগে

কিছুই বলে যেতে পারেন নি। শেষের দিকে কতদিন তো কথাই বন্ধ ছিল। তা' সত্যি তো দেখছেন তিনি। তার হাতেই একরকম তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কতদিন আর নজরে নজরে রাখা যায়। বড় হলে ছেলেরা কি আর বাবার কথাই শোনে! বাবু তো জানতে পারেনি। তারপর প্রথম ক'দিন কী কষ্টেই না কেটেছে। গলা দিয়ে ভাত নামতো না বাবুর। ভাতের থালার সামনে বসে চুপ করে কী সব মাথা-মুণ্ডু ভাবছেন। ভাত তেমনি পড়ে আছে। পাশের বাড়ীর বেরালটা এসে মাছটা টপ্ করে তুলে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে গোবিন্দ খেতে দিয়ে নিজে রান্নাঘরের হুড়কোটা টেনে দিয়ে সামনে বসে খাওয়াতো—

—ওটা শুক্তো—তেতো—আর ওই বড় বাটিতে ডাল—আর ওটা পটল ভাজা—

—দুইটা দিয়ে ও-কটা ভাত খেয়ে নিন বাবু, ও কটা ফেললে চলবে না—

—গিন্নীমা চলে যাবার পর থেকে আপনার আর খাওয়ার যুত হচ্ছে না—সেদিন ক্ষিতীনবাবুর মা'র কাছ গিয়ে ওই শুক্তো রান্না শিখে এসেছি—

—কাল কড়ায়ের ডাল কিনে এনেছি—বড়ি দেব ভাবছি—বড়ি ভাজা খেতে আপনি ভালবাসতেন—একা ডাল বাছা, ভিজোন, বাটা তারপর বড়ি দেওয়া—শুধু কি তাই, সবকাজ ফেলে রেখে রদ্দুরে বড়ি পাহারা দেওয়া—নইলে কাকের জ্বালায় কিছু কি থাকবে—

বাবু বলতেন—এত রান্না করিস কা'র জন্যে গোবিন্দ—মিছি মিছি খাটুনি—আমাকে দুটো ভাত আর আলুভাতে দিবি—

জামা কাপড় একে একে ছিঁড়ে যায়। আর নতুন করানো হয় না, একদিন দোকান থেকে দর্জি ডেকে নিয়ে এসেছে গোবিন্দ।

বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বললে—বেশ ভালো করে মাপ নাও বাপু—সাতদিনের মধ্যে দিতে হবে—খারাপ হলে কি অপছন্দ হলে দাম কাটা যাবে বলে রাখছি—

বাবু কলেজ যাওয়া বন্ধ করলেন শেষে। কোথাও বেরোন না। সারা দিন সারা রাত ওই ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে থাকেন। দরজা ঠেলে ডেকে ডেকে খাওয়াতে হয়। দুপুরে আধঘণ্টা আর রাত্রে আধঘণ্টা শুধু খাওয়ার সময় দেখা হতো বাবুর সঙ্গে; টেবিলের ওপর বসে খেতে খেতে বই পড়তেন। কী খাচ্ছেন সেদিকে মাথা ঘামাতেন না। আর বসে বসে চিঠি লিখতেন গাদা গাদা—সেই চিঠির গাদা গোবিন্দ ফেলে দিয়ে আসতো ডাক বাক্সে। কলেজ গেল, বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়া গেল—ওই সারা দিন কেবল ঘরের মধ্যে বসে কী যে করতেন ভগবান জানেন। চেহারা শুকিয়ে এই দড়ির মত হয়ে গেল! এমনি চললো বছর কয়েক। অতবড় যুদ্ধ গেল, বোমা পড়লো কলকাতায়, দুর্ভিক্ষ হলো, কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেল, জন-মনিষ্যি নেই

পাড়ায়, ব্ল্যাক-আউট হলো—কোনও দিকে খেয়াল নেই, দুপুর আর রাত্তিরবেলা বাবুকে খাইয়ে বেরিয়ে আসতো গোবিন্দ। তারপর কোনও কাজ নেই। ওই দরছার পাশটিতে শুয়ে আকাশ-পাতাল এলোপাতাড়ি ভাবতো। সময় আর কাটতে চাইতো না। দু'টি মাত্র প্রাণী—তা'র জন্যে সংসারে আর কতটুকুই বা কাজ।

এমনি করে কত বছর কাটাবার পর, ঘর থেকে বেরুলেন তিনি। কিন্তু কলেজে আর গেলেন না। বললেন—চাকরি আর করবো না রে গোবিন্দ—আর কার জন্যেই বা করবো—একটা লোকের কোনও রকমে চলে যাবে যা'হোক করে—

ঘর থেকে বেরুতে লাগলেন, বন্ধুবান্ধব আসতে লাগলো আবার বাড়ীতে। এখানে মিটিং হয়—ওখানে মিটিং হয়, দু'চার দিনের জন্যে মিটিং করতে যান কত দূর-দূর দেশে। পশ্চিমে যান, প্রয়াগে যান—আর গোবিন্দ থাকে সঙ্গে সঙ্গে—। কত বড় বড় লোকজন আসে মটর গাড়ী নিয়ে দেখা করতে। ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। খোকাবাবুর ছবিটা মানুষ সমান করে ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছেন। তারপর বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘর অন্ধকার করে, দরজা বন্ধ করে কী সব করেন কয়েকঘণ্টার জন্যে—গোবিন্দ কিছু বুঝতে পারে না। বোঝবার চেষ্টাও করে না।

—নেবে পড়, গোবিন্দ—নেবে পড়—এসে গেছি—

ক্ষিতীনবাবুর ডাকে গোবিন্দের জ্ঞান ফিরে এল। কালীর মন্দিরের সামনে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেছে। বাবু নেমে চলতে স্থরু করেছেন—ক্ষিতীনবাবুর পেছন পেছন। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকবে আবার তাঁরা ফিরবেন ওই ট্যাক্সিতেই।

পাথরের টালি বসান রাস্তা পেরিয়েই মন্দিরের উঠোন। ভিখিরীর পাল জুটেছে পেছনে পেছন।

—একটা ডবল্ পয়সা দিন বাবু—একটা ডবল্ পয়সা দিন বাবু···

তিরিশ চল্লিশটা ছেলেমেয়ে বুড়ি বুড়ো কাতর গলায় ভিক্ষে চায়—

গোবিন্দ বলে—তোরা যা' দিকিনি বাপু, জ্বালাসনে—আমরা তীথ করতে আসিনি—অা মলো, তবু পেছন পেছন আসে-কানে ঢুকছে না বুঝি—

ক্ষিতীনবাবু রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ মন্দিরে ভিড় একটু বেশী। তীর্থ-যাত্রীদের মেলা। মার মন্দিরের ওদিকটা লোকে লোকারণ্য। ডালীর দোকানের সামনে দিয়ে যাবার উপায় নেই। টানাটানি করে। তীর্থযাত্রী নয় দেখে চিনতে পারো না—এ কেমন পাণ্ডা মানুষ গো তোমরা! আমরা এসেছি কাজে—ছাড়ো—পথ ছাড়ো। আমরা ব'লে নিজেদের

জ্বালায় মরছি! খোকাবাবুকে পাই, যুৎ করে বাগিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, ঘর করুক, সুমতি হোক—মানত্ করাই আছে; ষোড়শোপচারে পূজো দেব। শুধু ডালা নয়। মায়ের দরজা ভোরবেলা খোলবার সময় যে-পেসাদ দেওয়া হয়—সেই ভোগ—তারপর আরো হবে অন্ন ভোগ। আমাদের বাবুর মত বাবু পাবে না তোমরা।

মার মন্দিরের দক্ষিণে বড় হলটায় মারবেল পাথরের মেঝের ওপর···

ক্ষিতীনবাবু দেখালেন—ওই দেখ—

নিত্যানন্দ সেন দেখলেন—

গোবিন্দ আগেও দেখেছিল—এবার আরও মনোযোগ দিয়ে চুপ করে দেখতে লাগলো···

সুদূর নক্ষত্রালোকের কোন্ অবাঙমানসগোচর রহস্য অনাদিকাল থেকে মানুষের কৌতূহলকে উত্তেজিত করে আসছে—কত মহাপুরুষ সে-রহস্যের যবনিকা ভেদ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় জীবনপাত করে গেছেন, মানুষের ইতিহাসে তার সাক্ষ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। তবু বর্তমান থেকে সুরু করে দূর, বহু দূর ভবিষ্যতের অজাত মানুষ যুগে যুগে সেই রহস্য উন্মোচনের চেষ্টায় প্রাণপণ পরিশ্রম করবে। এই-ই নাকি মানুষের মর্মান্তিক ললাট-লিখন। বিশ্ব নিয়ন্তার এই সৃষ্টির তিলার্ধ পরিমাণ সত্য কেউ আবিষ্কার করতে সমর্থ হবে না জেনেও—সাধনার বিরাম ঘটবে না। প্রাণপাত বন্ধ থাকবে না। এই কি তাঁর জীবনের পরিণাম! রাতুলের মৃত্যু দিয়ে যে-সত্য আবিষ্কারের গর্বে আত্মশ্লাঘার অন্ত ছিল না তাঁর, সেই রাতুল কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তাঁকে পরিহাস করতে এসেছে! তাঁর সমস্ত গর্ব ধুলিসাৎ করতে এসেছে! ছি—ছি—

গোবিন্দর ভেতরে ভেতরে দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হচ্ছিল। আর নিজেকে সে চেপে রাখতে পারলে না। দড়াম করে খোকাবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বললে—খোকাবাবু···আমাকে তুমি চিনতে পারছো না—আমি তোমার গোবিন্দ যে—কান্নায়, আনন্দে, উত্তেজনায় গোবিন্দর মুখ দিয়ে অর্ধেক কথা বেরুল না।

ক্ষিতীনবাবু বললেন—দেখ নিত্যানন্দ, মাথার চুলগুলো শুধু কামানো নইলে হুবহু এক—আমার তো তাই মনে হচ্ছে···

আরো কয়েক দল যাত্রী জড়ো হলো চারদিকে। বললে—কী হয়েছে মশাই?—

একজন একটু বেশী কৌতূহলী। এগিয়ে একেবারে গোবিন্দর কাছে চলে গেল—হ্যাঁ গা, কী হয়েছে গা?—

গোবিন্দ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো—ওগো ইনি আমাদের খোকাবাবু—পালিয়ে এসেছে বাড়ী থেকে—সাধু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন—তোমরা পাঁচজনে বুঝিয়ে বলো না এঁকে—ওগো খোকাবাবু বাবুর দিকে একবার চেয়ে দেখ—চোখ ফেরাও—যে তোমার জন্যে ভেবে উনি যে আধখানা হয়ে গেছেন—শুনছো ও খোকাবাবু—শুনছো—

ক্রমে আরো লোক জড়ো হলো।

—কী হয়েছে মশাই—?

—কার ছেলে—?

—পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে ?

কে কা'র উত্তর দেবে। ক্ষিতীনবাবু আর একবার চেয়ে দেখলেন নিত্যানন্দর দিকে। নিত্যানন্দ সেন প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে সমস্ত দেখছেন। অথচ কিছু যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তার সমস্ত সাধনা, সমস্ত সুখ্যাতি, বিদ্যা, বুদ্ধি সমস্ত আজ একদিকে—আর একদিকে এই পুনর্জন্মপ্রাপ্ত রাতুল! হঠাৎ নিজের শরীরটা যেন নিজের কাছেই বড় দুর্ভর মনে হলো।

চারদিকের ভিড় আর কৌতূহলাক্রান্ত জনতার প্রশ্নবাণ তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ক্ষিতীনবাবু বললেন—গোবিন্দ, একদিকে তুই ধর আর একদিকে আমি ধরছি—ও যখন কথা বলবে না—তখন ওকে গাড়ী করে বাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে নিরিবিলিতে সব জিগ্যেস করা যাবে—তুমি কী বলো নিত্যানন্দ—

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে বুঝি এসব মর্ত্যের কোলাহলের বহু উর্দ্ধে।

হঠাৎ বললে—কে তোমরা? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ—

গোবিন্দ বললে—দেখলেন বাবু, আমাদের খোকাবাবুকে কেউ নিশ্চয় মন্তর করেছে—নইলে অমন সোনার চাঁদ···আমাদের ফতেপুরের অষ্টবেহারীর ছেলে কামেখ্যায় গিয়ে এমনি বোবা কালা হয়ে গিয়েছিল—এ মন্তর—আর কিছু নয়—

দু'জনে দু'পাশে ধরে যখন রাতুলকে গাড়ীতে তোলা হলো, একজন লালপাগড়ী পুলিস জিগ্যেস করলে—কেয়া হুয়া—?

গোবিন্দ বললে—আমাদের ছেলে হুজুর—বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছিল—

ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। সবাই ওঠবার পর ট্যাক্সি আবার ছাড়লো।

গোবিন্দ বললে—এবার চলো ভবানীপুর শম্ভুনাথ পণ্ডিতের গলি—

মেছুয়াবাজারের মোড়ে বাস থেকে নেবে গলির মধ্যে ঢুকতে হয়। ভোম্বল আগে আগে চলেছে, পেছনে রাতুল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে বালক দত্ত লেন-এর মুখে এসে ভোম্বল বললে—তুই এখেনে দাঁড়া—আমি চুপি চুপি দেখে আসি লাটুগুণ্ডা আড্ডায় আছে কিনা—আমি না আসা পর্যন্ত চলে যাসনি, বুঝলি—

রাতুল সেইখানে একটা মনোহারী দোকানের সামনের রোয়াকে বসলো। পাশে এক ভদ্রলোক বসে বসে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পড়ছিল। রাতুল একখানা কাগজ নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলে। হঠাৎ নজর পড়লো ছোট একটি খবরের উপর। ছোট খবরই বটে—

"সভা-সমিতি"র কলমে লেখা রয়েছে—"আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় ডক্টর নিত্যানন্দ সেন "ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট" হলে "পরলোকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।" (ক্রমশঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নদী, শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, শ্রীকণিকা গুহ , বলতে পার ? নজরুল, শ্রীসুলতা লাহিড়ী ; আমোর প্রিয় খেলা, শ্রীবাণী সিংহ ; বাদলের গান, শ্রীনমিতা চক্রবর্তী ; ওগো সুন্দর শতদল ! শ্রীঅলক সরকার ; বর্ষা, কুমারী দেবীরাণী দাস, বলাকা, বাস্তুহারা ; শ্রীরমেন্দ্রনাথ অধিকারী ; বাসনা, কুমারী ঝরণা চট্টোপাধ্যায় ; একটি ছবি, ছন্দা সেনগুপ্তা ; পাহাড়ী নদী, শ্রীশীলা বল ; এটা কি আমার ভুল, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য : ছেলেবেলার কথা, শ্রীইরা চৌধুরী ; পথ-ভ্রষ্টা, শ্রীরাধেশ্যাম রায় ; একখানি চিঠি, শ্রীরঞ্জনী বোস ; আমাদের মৌচাক, কুমারী মৈত্রেয়ী দত্ত ; দরিদ্রের ইতিহাস, শ্রীজগবন্ধু ধনী ; আজগুবি দেশ, বাদল, খোকার সাধ, হাসান আলী সাহ ; মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ, শ্রীঅমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ; এবারের গ্রীষ্ম, শ্রীছায়া দলুই ; দুপুরবেলার কথা, শ্রীমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় ; বৃষ্টি, শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী ; ঘুঁড়ি, শ্রীপ্রতিভা গোস্বামী । (ক্রমশঃ)

বর্ষা

বর্ষা এল রাস্তা ঘাটে, বর্ষা এল ঘরে ঘরে ।
বৃষ্টি পড়ে টিপটিপিয়ে, ঠিক যেন ভাই মুক্তো ঝরে ।
বর্ষা এল পুকুরপাড়ে, বর্ষা এল বিলে, খালে,
বর্ষা এল শূন্য মাঠে, বর্ষা এল ক্ষেতের আলে ।
বৃষ্টি নামে গাছপালাতে, বৃষ্টি নামে বাড়ীর ছাতে,
ঐ ছেলেটা উঠছে গাছে, বৃষ্টি নামে তাহার মাথে ।
বৃষ্টি নামে ফুলবাগানে ফুলগুলো সব ভিজছে খালি,
তাদের সবে দেখতে গিয়ে মরছে ভিজে জগৎ মালী ।
জল পড়ে রে ইষ্টিসানে, রেলগাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে,
জল পড়ে রে ধোপার মাথায়, মংলু ধোপা কাপড় কাচে ।
কোথায় কত জল যে পড়ে, ঠিক কি আছে ? ঠিকানা নাই,
জল পড়ে রে আমার গায়ে, উঠে এবার ঘরতে যাই ।

শ্রীমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল

শ্রীঅরুণকুমার সেন ও শ্রীঅমিতাভ মিত্রকে ছবি দেখে দু'লাইনে কবিতা প্রতিযোগিতার জন্য দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে

বাঘে-মানুষে

আজ আমি "মৌচাকের" পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে একটি কাহিনী শোনাব। কাহিনীটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। প্রাণকৃষ্ণ শর্মা নামে বাবার এক বন্ধু আছেন। এঁর বাড়ী হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামে। পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইনি ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করে বাঙালী পল্টনের একজন সৈনিক হ'য়ে জার্মেনীর বিরুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায়

আলপনা
শ্রীমঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী

যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলনের তূর্য বাজিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করলেন, প্রাণকৃষ্ণবাবু তখন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তিনি কয়েকবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। একবার কারামুক্ত হ'য়ে তাঁর সখ হ'ল যে, তিনি সাইকেলে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবেন। যেমন ভাবা অমনি কাজ। তিনি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাঙলা দেশের নানা জেলা পার হ'য়ে তিনি ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে প্রবেশ করলেন। তখন দ্বিপ্রহর। পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে তিনি এক গৃহস্থের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এই গৃহকর্তা ছিলেন খুব সহৃদয় ভদ্রলোক; অতিথিবৎসল। স্থানীয় পোষ্ট অফিসে পোষ্টমাষ্টারি করেন। তিনি সাদরে প্রাণকৃষ্ণ-বাবুকে অভ্যর্থনা করলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে সমস্ত দুপুর বিশ্রাম করে বিকালের

হাতে-আঁকা
শ্রীঝরণা চট্টোপাধ্যায়

দিকে প্রাণকৃষ্ণবাবু পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের নিকট বিদায় নিতে গেলেন। পথে বাঘের ভয় ছিল। সেজন্য পোষ্টমাষ্টার মহাশয় তাঁকে বার বার যেতে বারণ করলেন। কিন্তু পথের নেশা প্রাণকৃষ্ণবাবুকে তখন পেয়ে বসেছে। তাঁকে নাছোড়বান্দা দেখে পোষ্টমাষ্টার মহাশয় ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিলেন।

প্রাণকৃষ্ণবাবু সাইকেল নিয়ে দুর্গানাম জপ ক'রে বেড়িয়ে পড়লেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত পোষ্টমাষ্টার মহাশয় নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু সাইকেল চালিয়ে চলেছেন।

একদিকে পাহাড় আর একদিকে জঙ্গল, মধ্যে সঙ্কীর্ণ চালুপথ। সূর্যের শেষ রশ্মি গাছের মাথায় পড়েছে। গাছে গাছে পাখী ডাকছে। প্রাণকৃষ্ণবাবু একাকী নির্জন পথে চলেছেন। একটি মোড় ঘুরতেই হঠাৎ দেখলেন, সামনে ৪০।৫০ হাত দূরে ভীষণাকৃতি একটি বাঘ বসে আছে। সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় ব্যাঘ্ররাজকে দেখে, প্রাণকৃষ্ণবাবুর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণকৃষ্ণর কানের পাশ দিয়ে বন্দুকের গুলি শন্ শন্ করে চলে গেছে, ডাইনে-বাঁয়ে বন্ধুদের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবুর মনে ভয় কখনও উঁকি মারেনি। কিন্তু আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে উড়িষ্যার এই জঙ্গলে ভীষণাকৃতি শার্দুলরাজকে দেখে যুদ্ধ-ফের্তা বীরের শরীরও ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এদিকে সমস্ত দিন উপবাসের পর না খুঁজতেই নাগালের মধ্যে একটি সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু এসে পড়ায় উল্লাসে বাঘের হিংস্র চোখ দুটো চক্ চক্ ক'রে উঠল। প্রাণকৃষ্ণবাবু দেখলেন, নামলেই বাঘ ঘাড়ে পড়বে। ভাব্‌বার আর সময় নাই। মরবই তো, তবু একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। এই ভেবে বাঘের দিকে পূর্ণবেগে সাইকেল চালিয়ে দিলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু এবং নিমেষের মধ্যে বাঘের ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন।

এই ব্যাপার দেখে বাঘ তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ভাবলো একি ব্যাপার! নিচে গোলাকৃতি দু'টো চাকা, আবার ওপরে একটা মানুষ সোজা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। মানুষ ত' কখনও বাঘের ঘাড়ে পড়ে না। বাঘই ত' মানুষের ঘাড়ে পড়ে। এ আবার কি অদ্ভুত জন্তুরে বাবা! এ ত' কখনও দেখিনি! ভাবতে ভাবতেই গাঁক করে এক হাঁক ছেড়ে বাঘ পাশের ঝোপে মারলো এক লাফ। ওদিকে প্রাণকৃষ্ণবাবু ত' সামনের এক শুক্‌নো নদীতে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লেন। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল্ বেঁকে গিয়েছিল। নদী থেকে উঠে হ্যাণ্ডেল্ ঠিক ক'রে তিনি সাইকেল চালিয়ে দিলেন। দু'মাইল চলার পর তিনি একটি ফাঁকা জায়গায় এসে দেখলেন, সেখানে

আলপনা

শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

কয়েকটি ছেলে খেলা করছে এবং সেখানে একটি স্কুলের মতন রয়েছে। সেখানে গিয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তাই দেখতে পেয়ে কয়েকটি ছেলে তাঁর কাছে ছুটে এল। তাদের সেবা-শুশ্রূষার ফলে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি সুস্থ হয়ে আবার ভ্রমণে বেরুলেন।

শ্রীদুর্জয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পুরাতন কথা

পাল-পার্বণে উৎসব

শেয়ালদার মোড়ে রাসের সময় আর রথের সময় যে মেলা বসে আজো, এ মেলার প্রথম প্রবর্তন করে যান রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র। তিনি থাকতেন শুঁড়োয়—প্রকাণ্ড বাড়ী বাগান তৈরী করিয়ে সেইখানে। রথ আর রাসের সময় তিনিই শেয়ালদার মোড়ে উৎসব ও মেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ উৎসব নেই, কিন্তু মেলা বসে আসছে একশো বছরের উপর থেকে।

চড়কেও খুব আমোদ হতো, উৎসব হতো। সেকালে চড়কের সময় বাণ ফোঁড়া হতো—অর্থাৎ বড় বড় বঁড়শী দিয়ে মানুষ গেঁথে তাঁদের চড়ক গাছে চড়িয়ে পাক দিয়ে ঘোরানো হতো। কাঁটা, বাঁশ, বঁটি প্রভৃতি ঝাঁপও হতো। পঞ্চাশ বছর আগেও টালিগঞ্জে কাঁটা-ঝাঁপ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। অনেকখানি জায়গায় কাঁটা গাছ কেটে এনে তাই দিয়ে গণ্ডীটানা জমি ভরাট করা হতো, তারপর গাজনের সন্যাসীরা উঁচু থেকে—জয় বাবা তারকনাথের—জয়-মহাদেব ব'লে সেই কাঁটার ঝাঁপ দিয়ে পড়তো। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আইনের বলে বাণ-ফোঁড়ার নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চড়কের সময় জেলেপাড়ার সঙ্—গত মহাযুদ্ধের পরেও ধুমধামে বেরুতে দেখেছি—এখন আর বেরোয় না। জেলেপাড়ার সঙ বেরুনো—এও প্রায় একশো বছর আগে থেকে চলিত ছিল—কী সমারোহ হতো—সেদিন কলেজ ষ্ট্রীট আর ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট—কেশব সেন ষ্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডে (পটলডাঙ্গা অঞ্চলে) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ী-ঘোড়া চলবার উপায় থাকতো না। মানুষ মানুষ আর মানুষ গিজগিজ করত—ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি কেউ বাদ নেই! সত্যিই দেখবার জিনিস ছিল এই সঙের মিছিল, জেলেপাড়ার সঙ-এ যে সব পালা বা ছড়া বেরুতো, সেগুলি লেখা হতো সাময়িক বিষয় নিয়ে।

হিন্দু কলেজ

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন আর প্রসার প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজের নাম আমরা শুনে আসছি। এই হিন্দু কলেজের সৃষ্টি হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে—ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙলা ভাষা শেখবার উদ্দেশ্যে। কলেজটি ছিল ডেলহাউসী স্কোয়ারের রাইটার্স বিল্ডিং-এর গৃহে। এই কলেজের কল্যাণে বাঙলার বহু মনীষী শিক্ষার বহু সুবিধা পেয়েছিলেন। কলেজ থেকে অনেক ভালো ভালো বই লেখা এবং প্রকাশিত হয়েছিল। "প্রতাপাদিত্য চরিত' গ্রন্থের লেখক রাম রাম বসু ছিলেন এই কলেজের একজন শিক্ষক।

জিনিসের দাম

১৮২২ সালের কথা। তখন জিনিসের দরদাম যে কিরকম ছিল, তা আজ ভাবলে আশ্চর্য লাগে—হাস্যকর মনে হয়। চালের দাম ছিল তখন আড়াই টাকা মণ। ভালো চিনি পাওয়া যেত মণ এক টাকায়। পাটনাই ছোলার মন এক টাকা এক আনা, আর একমণ তুলো পাওয়া যেত সাড়ে দশ টাকায়! কাজেই অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। অবশ্য তখন লোক-সংখ্যাও ছিল এখনকার চেয়ে অনেক কম।

ধাঁধার উত্তর

১। তেত্রিশ বাড়ী থেকে তিনটি ক'রে, ত্রিশ বাড়ী থেকে দুটি ক'রে, আর তেত্রিশ বাড়ী থেকে একটি ক'রে ছেলে ভর্তি হয়েছে!

আশ্চর্য হচ্ছো—কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই—তেত্রিশ বাড়ী থেকে একটি ভর্তি হলে মোট ৩৩ হলো; বাকী ৬৭; দুটি, তিনটি ক'রে ছেলে যে-সব বাড়ী থেকে গেছে—একটি ক'রে ছেলের সংখ্যা এ-হিসাবে ধরতে হবে তো!

২। তিন-তলা থেকে।

নতুন ধাঁধা

১। নতুন কলোনিতে একশো ঘর ভদ্র-লোকের বাস। সব ঘরেই ছেলে আছে—তাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য স্কুল হলো। স্কুলে ভর্তি হলো একশো ছেলে। কোনো বাড়ী থেকে স্কুলে ভর্তি হয়েছে একটি ছেলে, কোনো বাড়ী থেকে হয়েছে দু'টি, আর কোনো বাড়ী থেকে ভর্তি হয়েছে তিনটি ছেলে।

বলো তো, কতগুলো বাড়ী থেকে একটি ছেলে, কতগুলো থেকে দু'টি আর কতগুলো বাড়ী থেকে তিনটি ছেলে স্কুলে ভর্তি হয়েছে?

২। সাত-তলা বাড়ী। বাড়ীর সব-তলায় ঘর আছে, আর সাত-তলা জুড়ে ভাড়াটের বাস। নিচের তলা থেকে দোতলায় উঠতে ২৬টি সিঁড়ি ভাঙতে হয়; দোতলা থেকে তিন তলায় উঠতে ২০টি সিঁড়ি; তিন তলা থেকে চার তলায় উঠতে ১৮টি সিঁড়ি; চার তলা থেকে পাঁচ তলায় উঠতে ১৮টি; পাঁচ তলা থেকে ছ'তলায় উঠতে ১৬টি সিঁড়ি। সব নিচের তলা থেকে সাত তলায় উঠতে ১১০টি সিঁড়ি।

রামবাবু তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে ৫৬ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলেন, তারপর ১৮ সিঁড়ি নামলেন; নেমে আবার উঠলেন ২৬ সিঁড়ি—উঠে আবার ২৮ সিঁড়ি নামলেন। বলো তো কোন্ তলা থেকে তিনি ওঠা-নামা শুরু করেছিলেন?

উত্তর অন্যত্র দেখ।

নতুন বই

সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন

বেড়াল ঠাকুরঝি—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: ১।০

'বেড়াল ঠাকুরঝি' বাংলা শিশু-সাহিত্যের একটি বিশেষ গল্প-সংগ্রহ। বহুকাল পূর্বে যখন এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনই সকলে বইখানির প্রশংসা করেছিলেন। প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ নিজে একটি ছোট্ট ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন এই বইয়ে। রূপকথার মত এর প্রত্যেকটি গল্পই কথার সুন্দর ভঙ্গীমায় ও ভাষার সহজ সারল্যে ছেলেমেয়েদের মনকে অবশ্যই অধিকার করবে। বিভূতিভূষণ গুপ্তের এই বই প্রকাশ করে বিশ্বভারতী শিশু-সাহিত্যের সত্যিকার উপকার করলেন। বইয়ের ছাপা ও ছবিগুলি সুন্দর। প্রচ্ছদপটটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ছেলেমেয়েদের।

দি ব্ল্যাক টিউলিপ—অনুবাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, লেক রোড, কলিকাতা। মূল্য: ১॥০

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেকজাণ্ডার ডুমার এই উপন্যাসখানি বিখ্যাত। গ্রন্থখানি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষাতেও গ্রন্থখানি কিশোর-কিশোরীদের জন্য অনুবাদ করে ক্ষিতীন-বাবু অনুবাদ-সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করলেন। গ্রন্থখানি একবার পড়তে শুরু করলেই 'কালো টিউলিপ ফুলের আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী ভ্যান্ বার্লের মতো পাঠক-পাঠিকারা যে তাদের চারধারের জগৎ ভুলে গল্পের সুমধুর রসে মশগুল হবে তা বলতে দ্বিধা নেই।

সংবাদিকা

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড় এখনও বিজয়ী

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড় হিমালয় এখনও মানুষের কাছে জয়ী হয়ে আছে। এই পর্বতের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গে উঠবার বার বার চেষ্টা হিমালয় প্রতিহত করেছে। অচল অটল হিমালয় মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাকে দিয়েছে ব্যর্থ করে। এই বছর তাকে জয় করবার জন্যে আবার বিরাট একটা চেষ্টা হচ্ছে। ইউরোপের **Alpine Club** এবং বিলাতের **Royal Geographical Society** সমবেত ভাবে এবারে হিমালয়কে আক্রমণ করবে। এ পর্যন্ত প্রত্যেকবার হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে, কিন্তু এবার অভিযান আরম্ভ হবে দক্ষিণ দিক থেকে।

হিমালয়ের ২৯,০০২ ফিট্ শৃঙ্গে উঠতে গিয়ে অনেক আক্রমণকারীর প্রাণ গিয়েছে। ১৯২৪ সালে আরভিন ও মেলরী নামে দু'জন ইংরেজ ২৮,২৩৯ পর্যন্ত উঠে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। হিমালয়ের চির-তুষারস্তূপে তাঁরা সমাধিস্থ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। ১৯৩৩ সালে উইন হ্যারিস ও এল. ওয়েজার নামে আর দু'জন ইংরেজও ২৮,১০০ ফিট পর্যন্ত উঠে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন। ১৯৩৩ সালে **Houston-Everest expedition** দল এভারেষ্টের উপর দিয়ে এরোপ্লেনে উড়ে গিয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালে মরিস উইলসন নামে একজন ইংরেজ একেবারে একা এভারেষ্টের চূড়ায় উঠতে চেষ্টা করেন। তিনিও আর ফিরে আসতে পারেন নি।

শেষ প্রচেষ্টা হয় ১৯৩৮ সালে। ২৭,০০২ ফিট পর্যন্ত আক্রমণকারীরা সেবার উঠতে পেরেছিলেন। এইবারের চেষ্টায় মানুষ না হিমালয় জিতবে, তাই দেখবার জন্যে সবাই উৎসুক হয়ে আছে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যবোধ

আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালের সম্বন্ধে তোমরা মধ্যে মধ্যে মজার মজার ঘটনার কথা শুনে থাক। আজকে তোমাদের কাছে আর একটা মজার ঘটনার কথা বলছি। এই ঘটনা থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে, পণ্ডিত জহরলাল ভারতবর্ষে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হয়েছেন কেন।

এই মজার ঘটনা ঘটেছে দিল্লীতে। আমেরিকা থেকে একদল ছাত্র সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করার জন্যে বেরিয়ে, দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট হাউস দেখতে যাচ্ছিল। একজন প্রহরী এসে তাদের রুখে দেয়। ঠিক সেই সময় সেইখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আসার কথা—কাজেই পথ রুদ্ধ। ছাত্রেরা পুলিসকে অনুরোধ জানাল, সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছে তারা এখানে, সব কিছু দেখতে। কিন্তু প্রহরী নাছোড়বান্দা। এমন সময়ে একটি মোটরগাড়ী এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে হাসতে হাসতে তাদের সামনে এগিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। আমিই তোমাদের নিয়ে যাব—হেসে করমর্দন করে বল্লেন তিনি।

ছাত্রের দল পরে কথোপকথনের মধ্যে জানতে পারলো যে, ইনি আর কেউ নন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

বার্লিনে শিশুদের নিকট জহরলাল নেহেরুর উপহার

গত ২৬ জুলাই বার্লিনের শিশুদের হাতে 'শান্তি' নামে একটা বাচ্চা হাতী জহরলাল নেহেরু উপহার দিয়েছেন। ঐ দিন আনুষ্ঠানিকভাবে বার্লিনের মেয়র এই হাতী গ্রহণ করেছেন। প্রায় এক বৎসর আগে জার্মান শিশুরা বার্লিন চিড়িয়াখানার জন্যে নেহেরুর কাছে একটা হাতী পাবার জন্যে চিঠি লেখে। হাতীটা পাঠিয়ে দিয়ে জহরলাল জার্মান শিশুদের এই চিঠি লেখেন: 'প্রিয় শিশুগণ, কিছুদিন আগে একটা বাচ্চা হাতী পাঠাবার জন্যে তোমাদের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। ছোটদের কোন অনুরোধ আমার পক্ষে না-রাখা অসম্ভব। তোমাদের কাছে পাঠানো চলে এখন একটা হাতী সংগ্রহ করতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। এই বাচ্চা হাতীটি দক্ষিণ-ভারতের মালাবারের জঙ্গলে পাওয়া যায়। সে এখন জার্মানীতে। এটি তোমাদের কাছে ভারতের শিশুদের উপহার। সে তোমাদের কাছে ভারতের শিশুদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে যাবে। হাতী আমাদের দেশের একটি বিরাট ও শক্তিশালী জন্তু। তবু আমাদের কাছে সে শান্তির প্রতীক। হাতী অত্যন্ত শান্ত ও বুদ্ধিমান। একটি ছোট শিশুও তার সঙ্গে খেলা কোরতে পারে।

আশা করি 'শান্তি' বার্লিনের চিড়িয়াখানায় খুব আনন্দেই থাকবে। আরও আশা করি, যে দেশ হতে 'শান্তি' যাচ্ছে, তার কথা এবং যারা এটিকে তোমাদের কাছে উপহার পাঠাচ্ছে সেই শিশুদের কথা 'শান্তিই' মাঝে মাঝে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে।" ইতি—তোমাদের শুভার্থী—জওহরলাল নেহেরু।

চিড়িয়াখানার যে ঘরে 'শান্তিকে' রাখা হয়েছে, তার সম্মুখে এই চিঠির প্রতিলিপি ও বার্লিনের শিশুদের মূল চিঠি পাশাপাশি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

শিশু-সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে 'বিসর্জন' অভিনয়

শিশু-সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কয়েকদিন পূর্বে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের দ্বারা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নামক নাটকটি মহাসমারোহে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং স্কুল ভবনে অভিনীত হয়। এই অভিনয় সকলকেই মুগ্ধ করে। সাহিত্যিকরা যে সুঅভিনেতাও হতে পারেন, দর্শকরা তা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেন। এই উপলক্ষে 'মৌচাকে'র তরফ থেকে উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের জন্য শ্রীযোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীমতী মীরা রায়চৌধুরীকে চারখানি রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হয়।

মধুচক্র

আজ থেকে পাঁচ বৎসর আগে পনেরই আগষ্ট আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি—সেই দিনটিকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছিলাম ১৯৪৭ সালে। অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন আমাদের মনীষীরা দেখেছিলেন—তার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি নানান রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল, যে অবস্থার মধ্যে ভারত-বিভাগ মেনে নিয়েছিলাম, তাতে উভয় রাষ্ট্রের শান্তি ও মৈত্রী বিরাজ করবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও কিছুদিন আগেও একথা আমরা ভাবতে পারিনি যে ভারত-বিভাগের এই পরিণাম হবে। আজকে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মন-কষাকষির ভাব প্রবল হয়ে ১৫ই আগষ্টের পবিত্রতা কলুষিত হয়ে উঠছে। এই কি আমাদের কাম্য ছিল, না আমরা চেয়েছিলাম শান্তি ও মৈত্রী বিরাজ করুক ?···আজকের এই শুভদিনে কে দোষী আর কে দোষী নয়, তা বিচার করতে বসা আমাদের কাজ নয়।···এই পুণ্যদিনে যারা অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, আর সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি এই সঙ্কট মুহূর্তে প্রতিবেশী রাষ্ট্র দুটিকে তাদের ক্ষণিক ভ্রান্তিতে যে অপরাধ করেছে তার থেকে মুক্তিদান করুন। জয়তু ১৫ই আগষ্ট !

১৫ই আগষ্ট আরো একটি কারণে আমাদের কাছে চির অমর হয়ে থাকবে। এই পুণ্যদিনের ১৮৭২ সালে শ্রীঅরবিন্দ কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি ও তেজস্বীতায় যে খ্যাতি, গৌরব তিনি অর্জন করেছিলেন, তাতে তিনি অনায়াসে বিলাস বাসনায় তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু বরোদার কাজ ত্যাগ করে বাংলাদেশে ফিরে এসে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আলীপুরের বোমার মামলায় মুক্তিলাভ করে ১৯১০ সালে রাজনীতিক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সদূর পণ্ডিচেরী—সেইখানে যে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, তার সেবায় নিজেকে আমরণ নিয়োগ করেছিলেন। এই বৎসর সেইখানেই তিনি তাহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমরলোকে যাত্রা করেছেন।···তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের স্পর্শহীন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এই মাসে আরো একটি দিন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—সেটি হচ্ছে শিল্পাচার্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনটি। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র প্রথম বয়সে ইউরোপীয় শিল্পের প্রতি নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন প্রাচীন হিন্দু ও মুসলিম শিল্পের মধ্যে অনেক কিছু জানবার বিষয় আছে, তখন তিনি সেইদিকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিযুক্ত করলেন।

আজকে তাঁর এই পুণ্য জন্মদিন উপলক্ষে তার সুন্দর সজীব দীর্ঘায়ুর জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এবং এখন ভারতীয় শিল্পের অগ্রদূত ও পুরোধা হিসাবে যেন তিনি আমাদের চালিত করেন। জয়তু অবনীন্দ্রনাথ !

এবারের মজার খেলায় যেটি প্রকাশিত হচ্ছে এটি তোমাদের জন্যে বহরমপুর থেকে পাঠিয়েছে, মৈত্রেয়ী দত্ত। যত তাড়াতাড়ি পারো সবাই জবাব পাঠিও।

"সেই গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা সেলাই করা কাপড় পরিয়া

পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে। তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মতন নরম, চিক্কণ, সুখস্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে; তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ-কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘোর এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়। এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধার ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি—তাহার শিশুমন থৈ পায় না।"

চিঠির উত্তর—পার্থ বসু (ভবানীপুর)—তোমার অভিযোগ বিরাট। যে বিষয় আলোচার জন্যে তুমি লিখেছ—আসছে বারে এই বিভাগে তার একটা আলোচনা করার ইচ্ছা আমার আছে। সেনশাস্ত্রী মহাশয় অথবা শ্রীযুক্তা চৌধুরাণীর উভয়ের পক্ষে বর্তমানে কিছু লেখা একেবারেই অসম্ভব। তোমার কৃতিত্বের জন্যে তোমায় ধন্যবাদ। **রবি গুপ্ত** (বৌবাজার)—তোমার বিরাট চিঠি পেলাম। পরীক্ষার পর তুমি যে দিনগুলিকে হেলায় যেতে দাওনি শুনে সুখী হলাম। আশাকরি পরীক্ষার সংবাদ শুভ। **বনানী বসু** (?)—তোমার অভিযোগ সম্পাদক মশাইকে জানাচ্ছি—আর ঠিকানা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। **অরুণ সেনগুপ্ত** (হাওড়া)—যারা মৌচাকের সভ্য তারাই 'মজার খেলায়' যোগদান করতে পারবে। **দীপিকা গুহ** (বাঁকুড়া)—মৌচাকের যারা সভ্যা তারাই মধুচক্রের সভ্যা। **বাণী চক্রবর্তী** (আজমীড়)—তোমার কোন চিঠিই আমি এতদিন পাইনি। আট আনার ডাকটিকিট পাঠাবার কোন দরকার নেই। মৌচাকের 'মধুচক্রে' যারা যোগদান করে তারা সবাই মৌ ভাই আর বোন সেখানে কাকা কাকি বা পিসী ভাইঝির কোন সম্পর্ক নেই—সেইজন্যে আমি তোমারও মধুদি' আবার নীলিমা, উমা, সমরেন্দ্রেরও। **মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী** (বালুরঘাট)—হ্যাঁ, তোমার অনুমান সত্যি, "মজার খেলা" পাঠালে নিশ্চয় নেবো, তবে তা প্রকাশযোগ্য হলে তবে প্রকাশ করা হবে। তোমাদের উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ করুক এই আশা করি। **পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়** (গোবরডাঙ্গা)—তোমার উত্তরটি ঠিক হয়েছে, আষাঢ়ের ফলাফলে নামটি ভ্রমবশতঃ ছাপা হয়েছে। তোমার লেখনী-বন্ধুর নাম পাঠিও। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার দুটি চিঠিই পেয়েছি—এবার তোমার পাঠানো মজার খেলাটা যাচ্ছে। যিনি মাঝে মাঝে পরিচালনা করেন তিনি একই ব্যক্তি নন, সেইজন্যে নাম প্রকাশ করা হয় না। ১৩৫৪ সালে যা জানিয়েছিলাম, তারপরে কোলকাতার টেলিফোন অফিসে একটা বিরাট অগ্নিসংযোগ ঘটে গেছে এবং টেলিফোন নম্বর সমস্ত উল্টেপাল্টে গেছে—এখন আবার নতুন নম্বর হয়েছে।

যাদের চিঠি পেয়েছি—**সুমিতা ঘোষ** (কোলকাতা)—**প্রতুল চট্টোপাধ্যায়** (চক্রধরপুর)—**শুক্লা সরকার** (ওয়ালটেয়ার)—**কল্যাণী দত্ত** (সালকিয়া)—**অলক দাস** (তেজপুর)—**তপতী নন্দী, মালবিকা ও পূরবী রাহা** (বহরমপুর)।

আচ্ছা আজ এইখানেই। আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। ইতি—

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

১৫ই ভাদ্র আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় চিত্র-গ্রহণের দিন শেষ হয়ে গেছে। উপস্থিত আমাদের বিচার-বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ছবিগুলি আমরা মুদ্রিত করে যাব এবং যে ছবিগুলি অমনোনীত হবে সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে দেব,

আশ্বিন—১৩৫৮
৩২শ বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

খুকু ঘুমিয়ে আছে

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

*

খুকুর দুষ্টু মিটে গিয়ে
বনের কাছে—
দম্‌কা হাওয়া হয়ে ফুলে
দোদুলু নাচে।

পাখীর গানটি হয়ে তারা,
ঢাল্‌ছে নিতি সুরের ধারা,
নদীর কোলে ঢেউ ছুট্‌ছে—
ঢেউয়ের পাছে।
খুকু তখন মায়ের কোলে
ঘুমিয়ে আছে।

নিঝুম রাতের জ্যোছনাতে
ঘুরে ঘুরে—
খেল্‌ছে সোনা রুপোর খেলা
ভুবন জুড়ে।

ঘুমের মায়ার কাঠি হাতে—
নাম্‌ছে সবার আঁখি পাতে
সুজন লোকের সুদূর হতে
আদর যাচে—
খুকু তখন মায়ের কোলে
ঘুমিয়ে আছে।

মোমের পুতুল কাঠের হাতী
করছে খেলা,
রূপকথারা খেলাঘরে
বসায় মেলা।

ইঁদুর ঝিঁঝি দুষ্টু পুসি
কাঠবেড়ালি—সবাই খুশি,
নিতি সবাই খুকুরাণীর
আদর যাচে—
তবু খুকু মায়ের কোলে
ঘুমিয়ে আছে।

কৌতুক-কণা

১। মতিবাবুর কুকুরটি নিখোঁজ—আদরের কুকুর। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন: কুকুরের সন্ধান যে দেবে তাকে দেবেন পুরস্কার, ২০০৲ টাকা। তিন দিন পরে খবরের কাগজের অফিসে এলেন—কুকুরের সন্ধান মিললো কিনা জানতে। এলেন কাগজের ম্যানেজারের ঘরে। জবাব মিললো—ম্যানেজার নেই।

—ম্যানেজারের এ্যাসিষ্টাণ্ট ?

—তিনিও বেরিয়ে গেছেন।

—সাব্-এডিটার ?

—বেরিয়ে গেছেন।

—এডিটার ?

—এডিটারও বেরিয়ে গেছেন।

—কাগজের মালিক ?

—আজ্ঞে তিনিও বেরিয়ে গেছেন।

নিঃশ্বাস ফেলে মতিবাবু বললেন—সর্বনাশ! সকলে গেছেন বেরিয়ে। তা'হলে আমার নিরুদ্দেশ কুকুর ?—

জবাব মিললো—আজ্ঞে, আপনার ঐ কুকুরের সন্ধানেই তো সকলে বেরিয়েছেন—দু'শো টাকা পুরস্কার দেবেন বলেছেন কিনা!

২। একজন মোটা প্যাশেঞ্জার বাসের সিটে বসে আছেন; তাঁর পাশে একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে কোনোমতে কুঁকড়ে বসেছে। আর সব সিট ভরতি। দু'জন ভদ্রলোক উঠলেন বাসে—বসবার সিট নেই—তাঁরা রইলেন দাঁড়িয়ে। মোটা ভদ্রলোক তখন বললেন ছেলেটিকে—একালের ছেলে, সভ্যতা জানে না! ওঁরা রইলেন দাঁড়িয়ে—তোমার উচিত সিট ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ানো! ওঁদের মধ্যে একজন তা'হলে বসতে পারেন তো। ছেলেটি দিলে জবাব—তার চেয়ে আপনি উঠে দাঁড়ান না, আমরা তিনজনেই তা'হলে আরাম করে বসতে পারি!

৩। টাকা নিয়ে সতীশ কি করে বলোতো?

—কেন ?

—পরশু বললে, একটি পয়সাও ওর হাতে নেই; কালও এসে বললে ঐ কথা। আজও বললে—হাত একদম খালি!

—তোমার কাছ থেকে টাকা ধার চেয়েছিল বুঝি ?

—না···আমি আজ তিনদিন ধরে ওর কাছে কিছু ধার চাইছি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১। রণ্টু: জানো সণ্টু, একজন লোক দিনের মধ্যে বহুবার দাড়ি কামায়।

সণ্টু: তাই বুঝি? তা'হলে তার মুখের আর কিছু নেই বল ?

রণ্টু: না, এতে তার মুখের কোনই ক্ষতি হয় না। কারণ, সে একজন নাপিত।

২। নিয়োগ-কর্ত্তা: (বালক ভৃত্যকে) ওহে দেখো, তুমি মাত্র ১৫দিন আগে আমার আফিসে কাজ ক'রতে এসেছ, আর এরই মধ্যে তুমি চারখানি চেয়ার ভেঙেছ!

বালক ভৃত্য: আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তা, আপনি একজন বলিষ্ঠ বালকের জন্যেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আপন মনে আছে বোধ হয়?

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী রায়

রক্ত মশাল

* শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল *

দেশে মহামারী দেখা দিলে লোকে যেমন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দিন কাটায়, ঠিক তেমনি ভাবেই এ অঞ্চলের লোকের দিন কাটছিল ডাকাতের ভয়ে। এক মাসে সদরে তিনটে এবং গ্রামাঞ্চলে পাঁচ-সাতটা ডাকাতি হ'য়ে গেল। অথচ পুলিস কিছুই করতে পারছে না, ডাকাত দলের কোন সন্ধানই পাচ্ছে না। পুলিসের এবং সাধারণের ধারণা সব ক'টা ডাকাতিই একই ধরনের এবং একই দলের কাজ। গভীর রাত্রে, অন্ধকার আশ্রয় ক'রে কোথা হ'তে আট-দশজনের একটি দল একটা নির্দিষ্ট বাড়ীতে হানা দিয়ে লুটপাট ক'রে আবার অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়, কেউই তার হদিশ পায় না। সঙ্গে থাকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র—বন্দুক, রিভলভার, ছোরাছুরি। পেছনে তাড়া করলে তারা গুলি করতে দ্বিধা করে না। ফলে কয়েকজন লোক আহত হয়েছে, একজন পুলিস কনেষ্টবল নিহত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে জামুরিয়া কয়লাখনির ডাকাতি। কয়লাখনির তরুণ মালিক মাত্র মাসখানেক হ'ল সপরিবারে খনি পরিদর্শন করতে এসে এখানে বাস করছিলেন, খনির ওপর নিজের বাঙ্‌লোয়। মালিকের বাঙ্‌লো হতে আন্দাজ একশো গজ দূরে ম্যানেজারের বাঙ্‌লো—তারি পাশে কামারশালা, অপরদিকে বয়েলার-ইঞ্জিনিয়ারের বাঙ্‌লো, ডাক্তারের কোয়ার্টার। চারিদিকে অসংখ্য লোক। খাস মালিকের পাঁচ সাতটা দারোয়ান, তাছাড়া চাকর, বামুন, মোটর ড্রাইভার। এরি মধ্যে থেকে রাত বারোটায় ডাকাতি হয়ে গেল। প্রথমেই দু'জন সশস্ত্র লোক গিয়ে হানা দিল বিদ্যুৎ সরবরাহের পাওয়ার হাউসে। আলোকাকীর্ণ কয়লাখনি নিমেষে অন্ধকারে ডুবে গেল। অন্ধকারে ভুতুড়ে মূর্তির মত ডাকাতেরা হানা দিল, মালিকের শোবার ঘরে। মালিকের স্ত্রী

এলো বাধা দিতে, একজন তার বুকের ওপর একটা বন্দুকের নল উঁচিয়ে দাঁড়াল, আর একজন মালিকের কণ্ঠের ওপর চেপে ধরল একখানা লক্‌লকে ধারালো ছোরা।

টুঁ শব্দটি করলেই এরা আপনার কাজ করবে। চাপা গলায় একজন বললে। নিঃশব্দে তারা দাঁড়িয়ে রইল। দস্যুদল অবাধে লুণ্ঠন করতে লাগল। একটার পর একটা সুটকেশ ও বাক্স ভেঙে নগদ হাজার পাঁচ সাত টাকা হস্তগত ক'রে একজন মালিকের স্ত্রীকে আদেশ করলে, গয়নাগুলো গা থেকে খুলে দিতে। বেচারা ভাবলে হয়তো গয়না ক'খানা খুলে দিলেই তারা নিস্তার পাবে। কিন্তু তা হ'ল না, গয়নাগুলো হস্তগত ক'রে একজন মালিককে আদেশ করলে, এসো, আমাদের সঙ্গে—

শঙ্কাতুর অসহায় দৃষ্টি মেলে সে স্ত্রীর পানে তাকালে। স্ত্রী বেচারী দস্যুর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

—চোপ্‌! শব্দ করলে এখুনি এখানা তোমার স্বামীর হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করবে। দস্যুদের একজন একখানা ছোরা দেখালে। তারপর দস্যুরা মালিককে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

এই কয়লাখনির ডাকাতি চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে। ডাকাতরা লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে গেল একটা জলজ্যান্ত মানুষকে! এ যেন একটা অভিনব ব্যাপার। তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য থাকলে তো ঐখানেই করতে পারতো। তাকে ধরে নিয়ে গেল কেন? পুলিস পর্যন্ত ভেবে হিমশিম্ খেয়ে গেল। শহর থেকে পুলিস সাহেব এসেছে তদারক করতে, কলকাতা হ'তে সি, আই, ডি এসেছে স্থানীয় পুলিসকে সাহায্য করতে, চারিদিকে একটা সোরগোল প'ড়ে গেল। কেউ বলে, এরা কোন রাজনৈতিক দল, কেউ বলে, পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ডাকাত চাঁদার দল—পাঞ্জাব থেকে নেমে এসেছে। আবার কেউ বলে, এরা আরাকানের মগ দস্যু, আসাম পার হয়ে এসেছে।

কয়লাখনির মালিক অমরনাথ বয়সে তরুণ হলেও অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী। সম্প্রতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঠিকেদারী ক'রে অজস্র অর্থ উপার্জন করছে।

অমরনাথের সন্ধানে চারিদিকে লোক নিযুক্ত হলো। প্রাদেশিক পুলিসকে খবর দেওয়া হলো। অমরনাথের উদ্ধারের জন্য তার স্ত্রী মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলে।

অমরনাথকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাতের দল অন্ধকারে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে চল্‌ল। কোথাও দু'ধারে ধান জমির মধ্যে আল-পথ, কোথাও রুক্ষ মাঠ! অন্ধকার জমাট বেঁধে যেন মাঠের বুকে নেমে এসেছে। অন্ধকার আকাশের তলায় মাঠের অন্ধকার—দিগন্ত গেছে

সেই আঁধারে বিলীন হয়ে! কোথাও ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের ফাঁকে সংকীর্ণ বন-পথ। সেখানে আঁধার আরো জমাট, আরো রহস্যময়। অন্ধকারে ঘনকৃষ্ণ গাছগুলো প্রেতের ছায়ার মতো হিংস্র নির্মম দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে অমরনাথ মূর্চ্ছাহতের মত পথ চল্‌তে থাকে। সে বুঝতে পারে না এরা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—কেন নিয়ে যাচ্ছে। নিজের সমস্ত সত্ত্বা হারিয়ে, বলির পশুর মতো ঐ প্রেতমূর্তির মতো লোকগুলোর পিছনে কোথায় চলেছে সে। তার কথা বলবার শক্তি নেই, প্রশ্ন করবার সাহস নেই। সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী; সে একান্ত নিরুপায়, নিতান্ত অসহায়। এই পাশব অত্যাচারের বিরুদ্ধে চোখ তুলে দাঁড়াবার মত দেহ-মনে আর কোন শক্তিই নেই। একমাত্র ভরসা, পুলিস খবর পেয়ে যদি তাদের পিছু নেয়। নিজেকে তার অত্যন্ত অবসন্ন ও ক্লান্ত মনে হলো। শীতের হাওয়ায় ও আতঙ্কে তার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এলো।

সময়ের অনুভূতি নেই, দূরত্বের কোন সংজ্ঞা নেই, বিকারগ্রস্তের মত চলেছে তো চলেইছে। জঙ্গলাকীর্ণ পথের কণ্টকে দেহ ক্ষতবিক্ষত। নুড়ি, কাঁকরের আঘাতে নগ্ন পা কেটে রক্ত ঝরছে, তবু তাকে চল্‌তে হচ্ছে। কার অন্ধ-শক্তি যেন তাকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চলেছে। সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এম্‌নি তাকে চলতে হবে। গাছের মাথায় বাতাসের দম্‌কা আওয়াজে সে মাঝে মাঝে চম্‌কে ওঠে। তার চলার গতি স্তিমিত হ'য়ে এলেই সাম্‌নে হ'তে সজোরে কেউ টান দেয়, কিংবা পিছন হ'তে ধাক্কা দিয়ে বলে, কি বন্ধু ঘুমিয়ে গেলে নাকি? টাল সামলাতে না পেরে অমরনাথ উপুড় হ'য়ে ঘন ঝোঁপের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে। দস্যুদল তাকে টেনে তোলে। এম্‌নিভাবে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলে। যাতনায় তার শরীর ভেঙে পড়ে, মনে হয় ভেতরকার মানুষটা ধ্বসে ঝরে পড়ছে, তবু মুখে শব্দটি করবার উপায় নেই—এই তার নিয়তি!

একজন হাসতে হাসতে তাকে ঠাট্টা ক'রে বলে, এমন জোয়ান পুরুষ তুমি চলতে পারো না? আমরাও তো মানুষ!

আরেকজন বলে, চলো, তোমার সারাপথ হাঁটিয়ে নিয়ে যাবো না, নৌকোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে সত্যিই তারা একটা নদীর তীরে এসে পৌঁছল। ঘন শালবনের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে নদী বয়ে গেছে। নদী-তীরে অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। পরপারেও তরঙ্গায়িত শালবন নজরে পড়ে। কোথাও বসতির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অমরনাথ শুনেছিল, অজয়নদী তার কয়লাখনি হ'তে বেশী দূরে নয়। মনে হলো এই বোধ হয় অজয়নদী—এরই পরপারে বিহার সীমান্ত।

নদীর বালুচরে ব'সে অমরনাথের যেন চেতনা ফিরে এলো, তার মনে হলো সে বেঁচে আছে। দস্যুদল বিঁড়ি ধরিয়ে টান্‌তে লাগলো। অন্ধকারের বুক চিরে নদী এঁকে-বেঁকে বনান্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। অমরনাথ সেইদিকে চেয়ে রইল। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। নদীর তীরে যতদূর দেখা যায়, কোথাও একটা কুঁড়ে ঘর পর্যন্ত নেই। ঘুমন্ত পৃথিবী, নিঃসাড় অচেতন পৃথিবীর বুকে শুধু তারা ক'টি প্রাণীই জেগে আছে, আর সবাই ঘুমিয়ে। হঠাৎ দলের একজন একটা হুইসিল বাজালো, ফুটবল ম্যাচের রেফারির হুইসেল। ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে তীব্র আর্তনাদের মত সে স্বর নদী-জলে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পরপারের ঘনান্ধকারে দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল একটা তীব্র লাল আলো—সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিবে গিয়ে পরপারের অন্ধকারকে গাঢ় ক'রে তুল্‌লে। ঠিক যেন আতসবাজীর আলো!

অমরনাথ নিজের অজ্ঞাতে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—ও কি?

হেসে উঠে একজন উত্তর দিল—রক্তমশাল! এপারেও একজন হঠাৎ তেম্‌নি একটা আলো জেলে সঙ্কেত করলে। অমরনাথ বুঝ্‌তে পারলে না, কেমন ক'রে আলোটা জ্বাললে বা কেন জ্বাললে। কিছুক্ষণ পরেই অমরনাথ দেখতে পেলে, পরপারের অন্ধকারের ভেতর হ'তে একখানা নৌকো ভেসে আস্‌ছে। অন্ধকারের আব্‌ছায়ায় ছায়াছবির মত চোখের সামনে সব নাচ্‌ছে। সব যেন একাকার হ'য়ে গেছে—সব যেন ওলোটপালট হ'য়ে গেছে রাত্রের রহস্যময় অন্ধকারে!

নৌকোখানা এগিয়ে আস্‌ছে, তীরের কাছাকাছি আসতেই সকলে উঠে দাঁড়াল এবং একজন অমরনাথকে একটা তীব্র ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুল্‌লে। অমরনাথ দৈবাৎ বলে ফেললে, আমায় কেন নিয়ে যাচ্ছো, আমার কাছে তো কিছু নেই।

একজন ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিল, অনেক কিছু আছে বন্ধু, অনেক কিছু আছে। যুদ্ধের বাজারের রোজগার,—আমাদের কিছু বখ্‌রা দেবে না?

নৌকোর মাঝির সঙ্গে এদের কি কথা হলো, অমরনাথ কিছুই বুঝ্‌তে পারলে না। ক্লান্তির অবসাদে তার মাথাটা হাল্‌কা হ'য়ে গিয়েছে, দেহের সমস্ত শক্তি গেছে নিঃশেষ হ'য়ে, সে নির্জীবের মতো নিজেকে তাদের হাতে ছেড়ে দিল; তারা ধাক্কা দিয়ে তাকে টেনে নৌকোয় তুললে।

পাছে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই তারা তাকে মাঝখানে বসিয়ে দু'পাশে দু'জন তার হাত ধ'রে বসল। নদী পার হ'য়ে পরপারের তীর ধ'রে নৌকোখানা এগিয়ে চল্‌ল। তীরে ঘন জঙ্গল, লতাগুল্ম আর ঘাস। কল কল গুঞ্জন তুলে নদী-জল তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ছে।

চারিদিক নিঃঝুম—যেন ঘুমন্ত প্রেতলোক ! এ দেশের সঙ্গে যেন পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ নেই। তীর হ'তে বৃদ্ধ বনস্পতির শাখাগুলো কালিন্দী নদীর ওপর ঝুলে পড়েছে—বিরাট দৈত্যের প্রসারিত হাতের মত। তার মনে বিভীষিকা জাগে—তার মনের ঘোর কেটে যায়, সে শিউরে উঠে ভয়ে চোখ বোজে। তার মনে হয়, জীবনের পৃথিবী হ'তে এরা তাকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর জগতে। একটা আতঙ্কময় অনুভূতিতে তার শিরা উপশিরাগুলো টন্‌টন্ করতে থাকে।

নৌকো হ'তে নেমে আবার তারা তীরে উঠ্‌ল। তীরের ওপর বৃহৎ বনস্পতির সারি। পথ নেই, ঘন কণ্টকিত লতাগুল্মের ভেতর দিয়ে তারা অমরনাথকে টেনে নিয়ে চল্‌লো, কোথায় কে জানে! অসমতল, উঁচুনিচু জঙ্গল ভেদ ক'রে শেষে তারা একটা খোলা জমির ওপর এসে দাঁড়াল এবং আবার সেই সাঙ্কেতিক রক্ত মশাল জ্বালল। বনভূমি আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌তেই দেখা গেল সাম্‌নে একখানা বহু পুরনো ভাঙা বাড়ী। এদিকের আলো নিবে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর একটা ভাঙা জানালায় ঠিক্ তেম্‌নি চোখ-ঝলসানো লাল আলো জ্বলে উঠ্‌ল। অমরনাথকে নিয়ে তারা বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। আচ্ছন্নের মত অমরনাথ তাদের অনুসরণ করলে।

অন্ধকারে ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে অমরনাথকে নিয়ে তারা এগিয়ে গেল। তারপর অন্ধকারে কে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল অমরনাথ বুঝতে পারলে না। শুধু একজন তার হাত ধ'রে একটা ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে ভারী দরজাটা বন্ধ করে চাবি দিল।

দিশাহীন অন্ধকারে অমরনাথ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মাঝে কেমন একটা হাপসানি দুর্গন্ধ, কোথায় কি আছে কিছুই বোঝা গেল না। অমরনাথ আড়ষ্টের মত স্তব্ধ হ'য়ে দেওয়ালের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজল। চোখ ভারী হ'য়ে এল'—ঘুম মৃত্যুর মতই তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

ঘরের জানলা দুটোই ইঁট দিয়ে গাঁথা। যখন সে চোখ মেললে, তখন দরজার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো এসে ঘরের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। অমরনাথ ঘরখানা স্পষ্ট দেখে শিউরে উঠ্‌ল। ছাদের কড়ি বরগা দেখা যায় না, পুরু আল্‌কাতরার মত চামচিকে ঝুল্‌ছে। ঘরের মেঝের একপাশে স্তূপীকৃত ইঁট সুরকী। দেওয়ালের ফাটল বেয়ে নেমেছে গাছের শিকড়।

বাইরে দরজা খোলার শব্দে সচকিত হ'য়ে চাইতেই অমর দেখ্‌লে, গত রাত্রের এক পরিচিত সহচর এসে ঘরে ঢুকল।

অমরনাথ তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। একটা দালান পার হ'য়ে তারা একটা উঠনে এসে দাঁড়াল।

বাড়ীটা দেখেই মনে হলো, বহুকালের পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ী।

উঠোনের ওপাশের একটা অংশ বেশ পরিচ্ছন্ন। সেই দিকের একটা ঘরে অমরনাথকে লোকটা নিয়ে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেঝে, মেঝের একপাশে একখানা পুরনো বেঞ্চি, বেঞ্চির ওপর সতরঞ্চ পাতা। অমরনাথকে সেইখানে বসিয়ে লোকটা বেরিয়ে গেল। যাবার সময় লোকটা বল্‌লে, এইখানে বসো, সর্দার অস্‌ছেন—

—সর্দার ? উৎসুক দৃষ্টি মেলে অমরনাথ প্রশ্ন করলে।

—হাঁ। আমাদের রক্ত মশালের অধিনায়ক।

এলো কিন্তু একটি তরুণী মেয়ে। একখানা থালার ওপর খাবার আর এক পেয়ালা চা নিয়ে মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকল। অমরনাথ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললে, বসুন। চা খান।

বিস্ময়ে অমরনাথ মেয়েটির মুখের পানে তাকাল। এই কি সর্দার নাকি ? তার মনে হলো, হবেই বা! ডাকাতের দলের নাম যদি রক্ত মশাল হয়—তার সর্দার এই মেয়েটি হতেও পারে, বিচিত্র কি ?

মেয়েটি মুখ টিপে হাস্‌ছে।—খান্‌—চা'টা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে।

মিষ্টি কণ্ঠস্বর—দৃষ্টিতে দরদ মেশানো। হিন্দুস্থানী ঢঙে ছাপা শাড়ীখানিতে মেয়েটিকে বেশ মানিয়েছে। ডাকাতের সর্দার হবার মতো রুদ্র মূর্তি নয়!

অমরনাথ চোখ নামিয়ে নিলে।

মেয়েটি এবার বল্‌লে, খেয়ে নাও ভাই!

অমরনাথ চোখ তুলে তার পানে চাইতে গিয়েই কেমন যেন বিস্ময়ে কাঠ হ'য়ে গেল। —ও কে!

দরজার পাশে যে সুবেশ লোকটি এসে দাঁড়িয়েছে তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই অমরনাথ লাফিয়ে উঠল।

—দাদা ?—তুমি ?

লোকটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেই নিমেষে মিলিয়ে গেল। উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমি—বোস্‌—

মেয়েটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বল্‌লে, আর আমি তোমার, বৌদি!

এই অমরের নিরুদ্দিষ্ট বৈমাত্র ভাই পশুপতি। পশুপতি ডাকাতের সর্দার ? অমর বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হ'য়ে তার পানে চেয়ে রইল।

পনেরো বছর আগে, পশুপতির একমাত্র বোন্ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে আত্মহত্যা করে। পশুপতি কিন্তু বিশ্বাস করে না যে সে আত্মহত্যা করেছে, তার ধারণা তার ভগ্নীপতি তাকে পুড়িয়ে মেরেছে। রাগে অন্ধ হ'য়ে দৈবাৎ একদিন তার ভগ্নীপতিকে সে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে। তারপর হতেই সে ফেরার। এই দীর্ঘ পনেরো বছর তার কোন সন্ধানই মেলেনি। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সে এই দীর্ঘদিন নিশ্চিন্তে পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করছে।

কিন্তু এই কি তার পরিণতি! দস্যুবৃত্তি ক'রে বেঁচে থাকাই কি তার নিয়তি! অমরনাথ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে। পশুপতি স্থির হ'য়ে ব'সে আছে তার পানে চেয়ে। সুন্দর তার দেহের গঠন, ফর্শা রঙ্, চওড়া ছাতি, নিটোল পেশীবহুল বাহু। মুখে কঠোরতার চিহ্ন নেই, চোখ হ'তে প্রতিভা ঠিক্‌রে পড়ছে। পরনে টক্‌টকে লাল সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে একটা জালি গেঞ্জি। অমরনাথও তারপানে একাগ্রদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে।

পশুপতির মুখখানা দৈবাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। অমরের পানে চেয়ে বেশ সহজভাবেই সে বললে, অনেক টাকা রোজগার করেছিস্ তো, কিছু আমাদের রক্ত মশালকে দে না?

অমরনাথ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, রক্ত মশাল?

পশুপতি উত্তর দিলে, আমাদের সম্প্রদায়ের নাম—রক্ত মশাল।

—রক্ত মশালের উদ্দেশ্য?

পশুপতি নিঃশব্দে স্থির অবিচল দৃষ্টি দিয়ে অমরনাথের পানে চাইলে।

অমরনাথ ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, ডাকাতি করা?

পশুপতি রুক্ষস্বরে বললে, হ্যাঁ। গরীবের রক্তে মশাল জ্বালিয়ে যারা নিজের ঘর আলো করে, তাদের কাছ হতে কেড়ে নিয়ে, যাদের কিছু নেই তাদের বিলিয়ে দেওয়া।

অমরনাথ মুখখানা বিকৃত ক'রে চোখ নামিয়ে নিল।

পশুপতি বললে, লাখখানেক টাকা আমাদের দে—ব'লে পশুপতি ঘর হ'তে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অমরনাথ প্রশ্ন করলে, টাকা না দিলে আমায় নিয়ে কি করবে?

উচ্চহাসি হেসে পশুপতি ঘর হ'তে বেরিয়েই গেল। বৌদি কাছে এসে অমরনাথের একখানা হাত ধ'রে বললে, তা'হলে বৌদির কাছে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। এখন এসো, জামাকাপড়গুলো বদলে নাও।

বৌদির সযত্ন পরিবেশের মধ্যে অমরনাথের মনেই হয় না যে সে তাদের বন্দী। কেউ তাকে আর পাহারা দেয় না। পশুপতির ঘরে সে আশ্রয় পেয়েছে। বৌদি মাঝে মাঝে এসে

তাকে আদর-যত্নে অভিভূত ক'রে দেয়। সে আচ্ছন্নের মত এই রহস্যময়ী মেয়েটির পানে চেয়ে দেখে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অমরনাথ বাইরের ফাঁকা জমিতে বৌদির সঙ্গে গল্প করছিল, হঠাৎ দূরে মনে হলো নদী-তীরে রক্ত মশালের সঙ্কেত লাল আলো জ্বলে উঠ্‌লো। বৌদি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সেই দিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বনের মাথায় আবার একটা সেইরকম আলো, বাড়ীতেও ওপরের ভাঙা জানলায় একটা আলো জ্বলে উঠলো।

বৌদি বললে, বিপদের সংকেত, বোধ হয় পুলিস আমাদের সন্ধান পেয়েছে।

অমরনাথ জিগ্‌গেস করলে, দাদা?

সশস্ত্র পশুপতি এসে সামনে দাঁড়াল—উত্তেজনায় অস্থির, মুখে-চোখে উদ্বেগ। বললে, বৌদি রইল, ওর কাছে থেকো।

পশুপতি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অমরনাথ ও বৌদি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। বনের মাঝে নদীর তীরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। এক, দুই, তিন! ঘন ঘন শব্দ,—মনুষ্যকণ্ঠের আর্তধ্বনি!

বৌদি বললে, যুদ্ধ হচ্ছে। তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী এসেছে।

অমরনাথ প্রশ্ন করলে, কিন্তু দাদা?

বৌদি সগর্বে বললে, কোন ভয় নেই, ওকে কেউ ধরতে পারবে না।

ঐ যে—পুলিসবাহিনী এসে গেছে! হুঁসিয়ার! বলতে বলতে একদল সশস্ত্র পুলিস এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। একজন ব'লে উঠ্‌লো, অমরবাবু!

অমরনাথ দেখ্‌লে সামনে দাঁড়িয়ে থানার বড় দারোগা।

অমরনাথ বললে, বড়বাবু?

দারোগা অমরনাথের হাত ধরে প্রশ্ন করলে, এ কে?

মহিলাকে লক্ষ্য ক'রে দারোগা প্রশ্ন করলে। বৌদিকে কোন কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে অমরনাথ উত্তর দিল, উনিও একজন বন্দী—দুর্বৃত্তেরা ওঁকে লুট ক'রে এনেছিল।

দারোগা বললে, I see.

নদীর তীরে এসে অমরনাথ দেখ্‌লে ছোটখাটো একটি খণ্ডযুদ্ধ হ'য়ে গেছে। পাঁচজন পুলিস এবং তিনজন ডাকাত নিহত হয়েছে, দু'জন ধরা পড়েছে, বাকি সব পালিয়েছে। নিহতদের মধ্যে পশুপতিকে দেখে অমর পাথর হ'য়ে গেল।

পরে জানা গেল পশুপতি পুলিসের গুলিতে নিহত হয়নি,—নিজেই নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে।

বাতিগুলো জ্বেলে দাও, আলোক-জ্বালক

শ্রীভুমেন্দ্রনারায়ণ গুহরায়

*

বাতিগুলো জ্বেলে দাও, আলোক-জ্বালক।
পথে পথে মানুষেরা এখনো চলে,
আলো যদি না-ই থাকে,
চোখে আব্‌ছায়া ঢাকে,
কোথায় কি ক'রে তবে পা তারা ফেলে ?
কেউ বুঝি প'ড়ে গেলো নালার জলে,
অথবা হারালো কেউ ধুলার তলে।
আলো জ্বালো, ওগো প্রিয় আলোক-জ্বালক
রাতের মাথায় খসে আঁধার-পালক।

ঠাক্‌মা, জ্বালিয়ে দাও মোমের আলোক।
শুতে যাবে ছেলে-মেয়ে,—বিছানা পাতা;
কিছু আলো না-ই পেলে
ঠোকা খেয়ে থেমে গেলে
কোথায় বলো-না তারা পাত্‌বে মাথা ?
কেউ বুঝি সিঁড়িতেই লুটিয়ে র'লো ;
উনুনের পাশে নেই।—কি করে বলো ?
ঠাক্‌মা কি-ভালো! জ্বালো মোমের আলোক
পাখা মেলে রাত,—খসে আঁধার-পালক!

দেবতা গো, আলো দিক্ যতো তারালোক
পরীরা বেরিয়ে গেছে আকাশাভিসার,
চোখ-বোজা স্বর্গেতে
কি ক'রে যে খুঁজেপেতে
পার হবে পথ ছুঁয়ে আকাশ-কিনার ?
ভেজা, সোঁদা ছায়াপথে পিছলালো কি!
সংঘাত লাগে চাঁদে! তা নয়।—তো কি ?
দেবতা, দেবতা, প্রিয় জ্বালো তারালোক,
দেখো নাকি খসে কালো আঁধার-পালক!*

---

* এলিনর ফার্জন-এর লেখা থেকে অনূদিত। কবিতাটির মূল নাম : Light the lamps up, Lamplighter. কবিতাটির মধ্যে আলো জ্বালানোর আবেদন রয়েছে, আর তা কিশোর-কিশোরীদের জন্যই ; কারণ যে বই থেকে এটি সংগৃহীত হয়েছে, তা তাদের জন্যেই সঙ্কলিত। কবিতাটির আরম্ভেই বেঁকা-টাইপে লেখা আছে : For a Lamplighter, the Angle Gabriel, and Any Number of others'. প্রথমোক্ত তিনজনকে কবিতাটি সম্বোধিত হলেও, আর যে 'আদার্সদের' কথা বলা হয়েছে, তারা কারা ? এই 'আদার্সদের' উহ্য রেখে মনে হয় কবি বেশী করে তাদের কাছেই আবেদন জানিয়েছেন। এই 'আদার্সরা' যুগে যুগে আলো জ্বালিয়ে অন্ধকারকে অপসারণ করে। প্রবল সংঘর্ষ, সংঘাতকে অতিক্রম ক'রে, নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও নিজের কাজ করে যায় তারা। এই বড় কথাটিই এখানে আলোক-জ্বালকদের ভেতর দিয়ে ভাব-গভীর মিষ্টি ভাষায় প্রকাশ করেছেন কবি ফার্জন।

অরণ্য-জীবন

শ্রীঅশোককুমার বসু

শহরে যারা বাস করে জঙ্গলের সঙ্গে তাদের পরিচয় কম। জঙ্গলের জীবন সাধারণ দৃষ্টিতে শ্লথ, অলস, কিন্তু কখনো কখনো সেখানে আসে গতির তীব্রতা—বাঁচবার জন্য প্রতিযোগিতা। এমনি এক আরণ্য-জীবনের কথাই লিখছি—সেখানকার পরিবেশ আর দু'একটি ঘটনার কথা।

তখন থাকতাম সিংভূম জঙ্গলের ভেতর কুইড়া বলে একটা ছোট্ট গ্রামে। বিহার প্রদেশের ভেতর সবচেয়ে বড় জঙ্গল সিংভূম জেলাতেই আছে। কুইড়া গ্রামের প্রায় মাইলখানেক দূর থেকেই জঙ্গলের সীমা আরম্ভ। গভীর জঙ্গল···ক্রোশের পর ক্রোশ শুধু শাল, তমাল, আসন গাছের সারি। আর সে কী গাছ এক-একটা! তোমাদের মতো তিন চারজন ছেলে মিলেও এক একটা গাছের চারপাশে বেড় দিয়ে ধরতে পারবে না। গাছগুলো দেখলে মনে হয়, ওরা যেন ধাক্কাধাক্কি করে জায়গা নেবার চেষ্টা করছে, আর তারপর নিচে জায়গা না পেয়ে প্রাণপণে ওপরে ঠেলে উঠে আপনাদের মেলে ধরছে। সূর্যের আলো হ'ল গাছের প্রাণ। আলো না পেলে ওদের খাওয়াই বন্ধ। তাই সূর্যের আলো পাবার জন্যে ওরা ওদের পাতাগুলো জিবের মতো আকাশে মেলে বসে থাকে। আকাশে তো এমনি ঠাসাঠাসি, নিচে আবার আরও। বড় বড় বিশাল গাছ তো আছেই, আবার ছোট ছোট গাছের বাচ্চারা, মানে চারা গাছ—তারাও আছে লক্ষ লক্ষ। এরা বড় জোর দেড় মানুষ সমান উঁচু। সব সময় বড় গাছের ছায়ায় থাকে বলে খেতে পায় কম। তাই বড় গাছের আশপাশে ফাঁক খোঁজবার চেষ্টা করে এরা এবং সুবিধা পেলেই সেইখান দিয়ে নিজের কচি মাথাটা চালিয়ে দেয় একেবারে উঁচুতে। আর যদি কোন কারণে বড় গাছ একটা মারা পড়ে,—ঝড়ে পড়েই হ'ক আর কেউ কেটেই নিয়ে যাক, অমনি সেই খালি জায়গা নিয়ে ছোটদের ভেতর প্রতিযোগিতা চলে দখল করবার। সবাই চায় অপর সকলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে-নিজের দেহটা ওখানে মেলে ধরবে। সমস্ত দিন এরা সূর্যের আলোর সাহায্যে বাতাসের ভারী অংশটাকে খেয়ে ফেলে—তাই দিনের বেলায় বনের হাওয়া ভারী সুস্নিগ্ধ, হাল্কা আর উপকারী, কিন্তু রাত্তিরে ঠিক উল্টো। সমস্ত দিন খাবার পর রাত্তিরের অন্ধকারে সমস্ত গা দিয়ে ওরা একটা গরম ভারী হাওয়া ছাড়তে থাকে—আমরা যেমন নিঃশ্বাস ফেলি তেমনি। রাত্রে বনের বাতাস হয়ে ওঠে ভারী অস্বাস্থ্যকর। ওপরে কালো আকাশ, নিচে গাঢ় বনের মাটিতে কালো অন্ধকারের আরও কালো ছায়া। মনে হয় যেন বড় বড় তুলিতে আলকাতরা নিয়ে কেউ আগাগোড়া লেপে দিয়েছে। শুধু দূর আকাশে ছোট ছোট তারার দল এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে একবার চোক মেলে চাইছে, আবার ভয় পেয়ে চোক বুজছে। জঙ্গলে মানুষ থাকে না বলে মনে

করো না সে একেবারে নিঃশব্দ। চব্বিশ ঘণ্টা ঝিঁঝি পোকা ডাকছে—একটানা স্বরে—ঝিঁ—ঝিঁ—ঝিঁ—ঝিঁ! রাত্রিতে ঝিঁঝি ডাকের সঙ্গে জেগে ওঠে বন্যজন্তুর ডাক। হঠাৎ হয়তো কোথাও সম্বর হরিণ ডেকে উঠলো মোটরের হর্ণ দেওয়ার মতো। তারপর হয়তো হায়নার খ্যাক্‌খ্যাকে হাসির শব্দ। মাঝে মাঝে এ সব ডুবিয়ে বড় বাঘের গম্ভীর গর্জন। বাঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সব জন্তু হঠাৎ একসঙ্গে চুপ হয়ে যায়—ভয়ে। গাছের মাথায় পাখীর বাচ্চাগুলো শুধু একবার কাতরে ওঠে! এ ছাড়া আর এক নিঃশব্দ কুটিল মৃত্যু অন্ধকারের ভেতর গা মিশিয়ে মাটিতে বুক দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে বেড়ায়—সে হ'ল অজগর সাপ। বারো-চোদ্দ হাত লম্বা আর তোমরা দু'বেগত পাঁজিয়ে ধরলে যতখানি হয়, অতো মোটা। কোন জন্তু হয়তো নদীর ধারে জল খেতে এসেছে, বেচারী সবে জলে মুখ দিয়েছে, এমন সময় অজগর গিয়ে তার পেছনের পা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলে, আর সমস্ত দেহ দিয়ে জড়াতে লাগলো জন্তুটার বাকী অংশটাকে। সে কি জোরে জড়ানো! চাপের চোটে জন্তুটার সমস্ত দেহটা থেঁতলে পিষে নরম কাদার মতো হয়ে যায়, তারপর চলে আস্তে আস্তে জন্তুটাকে গেলার পালা!

ওদিকে বাঘ কোথাও হয়তো ওত পেতে বসে আছে। আসছে হরিণের একটা দল, ওদিক পানেই। কাছে যেই আসা, অমনি একটা চাপা গর্জন করে বাঘটা লাফিয়ে পড়ে একটা হরিণের ওপর। আর্ত শব্দ করে হরিণটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, বাকী হরিণগুলো ভয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে প্রাণপণে। আর বাঘটা মরা হরিণটার গলা ছিঁড়ে ফেলে তার নরম মাংসের ভেতর মুখ ডুবিয়ে রক্ত চোষে চোঁ চোঁ করে! এই হ'ল জঙ্গলের রূপ।

এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে একটা সরু রাস্তা কুইড়া থেকে বামিয়াবুরু, তারপর রুরুয়াং—তারপর কোথায় কে জানে! পথের দু'পাশে শুধু গাছ আর গাছ—এতটুকু ফাঁকা জায়গা কোথাও নেই, শুধু ওই পথটুকু ছাড়া। তাও দু'পাশ থেকে গাছের দল ঝুঁকে পড়ে দেখে পথ-চলতি-লোকের পানে চেয়ে, আর মাথা নেড়ে ইশারায় যেন মানা করে এ পথে আসতে। মাইল দেড়েক পরই পথ চলতে সুরু করে পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে। পথের একটা পাশে দেওয়ালের মত মাটি কাটা; তার ওপর আবার পাহাড় আর বন। অপর পাশে গভীর খাদ নেমে গেছে অনেক নিচে, তারপর আবার ওপাশে পাহাড়। খাদ কোথায় চওড়া বিশ হাত, কোথাও বা ত্রিশ হাত, আবার কোন কোন জায়গায় দু'পাশের পাহাড়ের ব্যবধান মাত্র পনেরো হাতের। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়—এত গভীর! দিনের বেলায়ও নিচে গভীর অন্ধকার, কোথাও বা ডালপালার ভেতর দিয়ে নিচে জল চিক্ চিক্ করছে দেখা যায়। এদিকে পাহাড়ের গায়ে নানা ফার্ণ গাছ। লোকের বাড়ীতেও অতো সুন্দর

বাহারী ফার্ণ পাওয়া শক্ত। মাইল পাঁচেক রাস্তা কেবল ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে পাহাড়ে:উঠেছে। এত খাড়াই যে কিছুক্ষণ চললে হাঁপ ধরে যায়। খুব ভাল মোটর না হলে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে; সাইকেলে চড়াও অসম্ভব—চেইন্ ছিঁড়ে যাবে। পাঁচ মাইলের পর আবার ঢালু—একেবারে গড়্ গড়্ করে পাক খেতে খেতে নেমে. বামিয়াবুরু বলে এক জায়গায় পৌঁচেছে। কুইড়া থেকে রুরুয়াং একুশ মাইল।

আমি আর আমার এক ভাগ্নে ফুলু একবার আসছিলাম রুরুয়াং থেকে একটা সাইকেলে। যেখানে উৎরাই বা সমতল পাই, সেখানেই আমি সাইকেল চালাই ওকে নিই ব্যাকে। চড়াইয়ে চলি সাইকেল ঠেলে। রুরুয়াং-এ দাদার এক বন্ধু আমাদের বারণ করেছিলেন সে সময় ফিরে যেতে। কারণ, জঙ্গলে অনেক আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—গাছপালা আর পাহাড়ের ছায়ার জন্য। কিন্তু বড় দরকারি কাজ ছিল কাজেই থেকে যেতে পারলাম না বা দাদাও বলতে পারলেন না থাকতে। কিছুদিন আগে ওখানকার কতকগুলো পাহাড়ী লোক একটা বড় বাঘিনীর বাচ্চা চুরি করেছিল। হিংস্র বাঘিনী রাগে পাগল হয়ে ভয়ানক উৎপাত করে বেড়াচ্ছিল চারিদিকে। বাচ্চা চুরি গেলে বাঘিনীর যা রাগ তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা করা যায় না। মানুষ বোধ হয় কামান নিয়ে সামনে দল বেঁধে দাঁড়ালেও, সে আক্রমণ করবে—এতই তার রাগ। আর রেগে ক্ষেপে যাওয়াই বা অন্যায় কি? খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়ে সে তখন কেবল বাচ্চা খুঁজে বেড়ায়, আর জীবজন্তু মানুষ দেখলেই টুকরো টুকরো করে ফেলে!

বেলা থাকতে থাকতেই আমরা বামিয়াবুরু পেরিয়ে এলাম।

বর্ষাকাল। এঁটোল মাটির রাস্তা। কাদা একবার সাইকেলের চাকায় লাগলে খানিক পরে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যে, একহাতও সাইকেল ঠেলে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আমরা সাধ্যমতো কাদা বাঁচিয়ে পাশের ঘাসের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে চলেছিলাম। এল শেষ চড়াই। ওদিকে সূর্যও পাহাড়ের আড়ালে লুকোল। আমরা খুব জোরে চলতে লাগলাম। আর মাইল দুয়েক চড়াই ঠেলতে পারলেই প্রায় তিনচার মাইল উৎরাই পাব—তারপর কুইড়া মাইল-খানেক। দু'জনে গল্প করতে করতে চলেছি। ফুলু আমার চেয়ে বছর দু'য়েকের ছোট, লম্বায় আমার প্রায় সমানই, তবে খুব রোগা। আমার বয়স তখন বছর আঠেরো। চলেছি—আর হাত পঞ্চাশ গেলেই যাত্রা শেষ হবে। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হাতে কোমরে ব্যথা ধরে গেছে। আমাদের ডান দিকে গভীর খাদ। বর্ষার জল পেয়ে নানান্ আগাছা কোন কোন জায়গায় এমনভাবে খাদের ওপর ছেয়ে আছে যে মনে হয় ওটা বুঝি মাটিই। কোথাও কোথাও বহু নিচের কোন গাছের মাথা রাস্তার ধারে খাদের ওপর পর্যন্ত উঠে এসে সেইখানে ডালপালা মেলে দিয়েছে,

আর তার ওপর ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে পরগাছা। এখানে ওখানে থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে। মাটি বলে ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু ভুল করে একটু ডাইনে সরলেই অনিবার্য মৃত্যু! তাই সাবধান মতো পাহাড়ের গা-ঘেঁষে চালাই ভালো। কিন্তু ওদিকটায় বড্ড কাদা থাকায় আমাদের খাদের দিক ঘেঁষেই চলতে হচ্ছিল। হঠাৎ ডান দিকে তাকিয়ে কি দেখে ফুলু একেবারে চমকে উঠলো, তারপর চাপাস্বরে আমাকে বল্লে, ছোট মামা—বা···ঘ!

সেদিকে তাকিয়ে আমিও চমকে উঠলাম। ওপাশের পাহাড়ে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘ। এক সেকেণ্ড, আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকেই বাঘটা তীরের মতো বেগে খানিকটা নেমে এল। বুঝলাম ও খাদ টপ্‌কে এপারে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল যে সেখানে খাদটা ছিল খুব চওড়া, বাঘের লাফ মারার ক্ষমতার বাইরে! বাঘ সেটা বুঝতে পারলে, এবং সে ছুটলো পিছন দিকে। ওদিকে খাদটা সরু হয়ে এসেছে—লাফ মেরে পার হওয়ার সুবিধা। ফুলুকে বললাম, দৌড়ই চল!

সাইকেল ঠেলে আমিও প্রাণপণে দৌড়লাম। ফুলু বললে, সাইকেল্‌টা ফেলে দিন না, ওটাকে নিয়ে যে দৌড়তে পারবেন না।

পাগল, ওই এখন ভরসা, ব'লে ছুটতে লাগলাম।

উঃ, মোটে পঞ্চাশ-ষাট হাত রাস্তা, কিন্তু মনে হতে লাগলো ক-তো দূর রাস্তা, যেন আর ফুরোয় না!

রাস্তাটা এখানে পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁচেছে। এখান থেকে চারিদিকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। পেছনে চেয়ে দেখি, পিছন দিকে অনেকটা দূরে এ-পাশের রাস্তা ধরে বাঘটা ইঞ্জিনের বেগে ওপরে উঠে আসছে। চড়ে বসলাম সাইকেলে। ফুলুকে বললাম, শীগগির পিছনে চড়তে। প্রথমবার চেষ্টা করে ও চড়তে পারলে না, উল্টে এমন একটা টাল দিলে আমাকে যে পড়তে পড়তে আমি বেঁচে গেলাম। দ্বিতীয়বার কোনক্রমে উঠলো বটে, কিন্তু পড়ে যাবার ভয়ে এমন জোরে আমার গলা আঁকড়ে ধরলো যে, দম বন্ধ হয় আর কি! রাস্তা এত ঢালু যে প্যাডেল না করেও ব্রেক দিয়ে নামতে হয়। অন্ততঃ আগে যখন এখান দিয়ে গেয়েছি তখন তাই করেছি। কিন্তু এখন সজোরে প্যাডেল করলাম। ঝড়ের মতো সাইকেল ছুটলো, প্রতি মুহূর্তে ভয় হতে লাগলো যে বাঁকের মুখে সাইকেল সামলাতে না পারলে—হুমড়ি খেয়ে হয়ত পড়বো খাদের ভেতর। তার ওপর আমাকে চলতে হচ্ছে রাস্তার ডান পাশ ধরে,—নয়তো কাদায় চাকা আটকে যাবে। এত অসুবিধার মধ্যে ফুলু মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে, এইবার পড়ে গেলাম ছোট মামা, পিনের ওপর আমার পা থাকছে না—

পিছলে যাচ্ছে! আমি বললাম, কেরিয়ারের ওপর আর একটা পায়ের জোর রাখ, আর আমাকে খুব শক্ত করে ধরে থাক। মাঝে মাঝে বলছি, পিছনে ফিরে দেখ, বাঘটা আসছে কিনা? ও বলে দেখতে পারবো না—পড়ে যাবো। হঠাৎ পাশের পাহাড়ের খানিকটা ঝোপ খুব দুলে উঠ্‌লো। আমার সন্দেহ হ'ল, বাঘটা পেছন থেকে দৌড়ে ধরতে পারবে না বুঝে, সোজাসুজি পাহাড় টপ্‌কে এগিয়ে এসে রাস্তার ওপর বুঝি বসে থাকবে! কিন্তু তা আর হয়নি। আমরা বোধ হয় পনেরো মিনিটের মধ্যে ৫ মাইল পথ পার হয়ে কুইড়া গ্রামে এসে পৌঁছে গেলাম।

অরণ্যের মধ্যে জীবকুলের এই ভয়াবহতা ও বৈচিত্র্য না থাকলেও যেমন এর রূপ পরিপূর্ণ নয়, তেমনি এই নিরীহ শান্ত স্নিগ্ধ বনরাজীর শোভা, রূপ ও সৌন্দর্যও যেন বহুলাংশে এইসব হিংস্র জীব জন্তুদের জন্যে ব্যাহত।

রূপের হাটে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বুকটি জোড়া রূপটি নিয়ে কল্পলোকের রাণী
ইঙ্গিতে আর সঙ্গীতে মোর মন নিয়েছে টানি'।
ডাক দিয়ে কী বলে:
নিরুদ্দেশের আশার সে কোন্ লহর যেন চলে!
উধাও ছুটে যাই,
কী যেন কি হারিয়েছি তা'র খোঁজ না মোটে পাই।

আকাশ-ভরা তারার মালায় রঙের আলো জ্বলে;
পূর্ণিমাতে চাঁদের কিরণ পড়ে হৃদয়-দলে।
টান যে বড়ো লাগে:
সুখের সাগর ছাপিয়ে বুকে বন্যা যেন জাগে!
কূল-কিনারা নাই,
কান্না-হাসির বোঝাই তরী অকারণে বাই।

কুঁড়ির বাঁধন খুলে বেলি মুখের পানে চায়;
স্বপ্ন-লোকের আভাষখানি আমার আমি পায়।
শিশির-ভেজা ঘাসে
হৃদয়-হরণ হাসির মেলা সকালবেলা ভাসে।
পাগল হোয়ে যাই:
এই অপরূপ রূপের হাটে হারিয়েছি সব ভাই॥

দুটি কুয়াশার সুর

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

×

স্টীমারের পিছনের দিকে নদীর স্রোত ছুটে চলেছে। ক্যাপটেন স্রোতের দিকে একবার তাকালেন। তারপর চেয়ারে বসে বাঁশীটি বার করে তাতে কয়েকটি ফুঁ দিলেন। নদীটির দুটি তীরে পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি উঠ্‌লো। এমনিভাবে প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেল। এমন সময় তীর থেকে আর একটি বাঁশীর সুর তাঁর কানে এল ভেসে। ক্যাপটেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যে লোকটি বাঁশী বাজাচ্ছিল তাকে উদ্দেশ করে কয়েকটি চোখা চোখা গাল দিলেন।

সেখানে গাছের তলায় কূলে একখানি ছইওলা পানসী বাঁধা। তার পাটাতনে শুয়ে ক্যাপটেনেরই সমবয়সী একটি গেঁয়ো লোক বাঁশীটি বাজাচ্ছিল। তার মাথায় লম্বা চুল, পোষাক ময়লা ও ছেঁড়া, মুখখানি রোদে পোড়া, শরীরটি লম্বা, রোগা।

ক্যাপটেন ওয়ালিনস্ তাকে ঘুষি দেখিয়ে বললেন, "এই ছোটলোকের বাচ্চা! এই ইঁদুর! তোকে না বারণ করেছি অমন কোরে আমায় ভ্যাঙচাস্ নি? আর বারণ করবো না কিন্তু। বাঁশীটা তুলে রাখ"—

কিন্তু লোকটি সমানে বাঁশীটি বাজিয়ে যেতে লাগ্‌লো এবং বাজানো শেষ করলো একটি সুমিষ্ট তীক্ষ্ণ ধ্বনি তুলে। তারপর শান্তভাবে উঠে বসে ক্যাপটেনকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললে, "তুমি যখনই এখান দিয়ে উজানে বা ভাটিতে যাও তখনই তোমায় বলেছি, আমি তোমাকে ভ্যাঙচাই না। আমি গান ভালোবাসি, তাই বাঁশী বাজাই।"

ক্যাপটেন শুষ্ক হাসি হাসতে হাসতে স্টীমারের একজন কর্মচারীকে বললেন, "ওর কথা শোন!—শুনলে ওর কথা?" তারপর লোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, "তুই গানের কি জানিস? আমাকে ভ্যাঙচানো ছেড়ে দে। নাহলে তোর মুখ একেবারে বন্ধ করে দেবো।"

লোকটি উত্তর দিল, "তুমি মুখ একটু সামলে থেকো।"

স্টীমারখানি তখন প্রায় তার ছোট নৌকাখানির একেবারে কাছ দিয়ে ধুক্ ধুক করতে করতে এগিয়ে চলেছিল।

লোকটি আবার বললে, লাইজ গ্যালাপকে গালাগাল দিয়ে কাউকে কাউকে পস্তাতে হয়েছে। আমি এই ছোট ছইওয়ালা নৌকো চালাই। তার কারণ, আমি এ কাজটি পছন্দ করি। এ নয় যে, বাধ্য হয়ে এ কাজ করি। তুমি হুঁশিয়ার থেকো। আমি তোমার সম্বন্ধে অনেককিছু জানি।

"আমি এই নদীতে কয়েক সপ্তাহের বেশি আসি নি। এর মধ্যেই তোমার ঐ মানুষ-মারা মালটানা ষ্টীমারখানার কথা জানতে পেরেছি। তোমাকে গাছের সঙ্গে ফাঁসিতে লটকানো উচিত ছিল। তোমার ষ্টীমারের তিনজন নিগ্রো খালাসিকে মেরে ফেলে তোমার কিছু হয় নি বলে মনে করেছো সকলকেই চোখ রাঙাবে? তা পারবে না—" ব'লে লোকটি শান্তভাবে বাঁশীটি মুখে তুলে হাল্কা সুর বাজাতে লাগ্‌লো।

ক্যাপটেন ওয়ালিনস্ গম্ভীরস্বরে খালাসীদের একটা হুকুম দিলেন। ষ্টীমারের চাকা আস্তে আস্তে নৌকোখানির একেবারে সামনে এসে পড়লো। তিনি আবার হুকুম দিলেন। ইনজিন-ঘরে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকা দু'খানি প্রচণ্ড শব্দে ঘুরতে লাগ্‌লো। নদীর জলে উঠলো ফেনা, আবর্ত্ত ও ঢেউ। নৌকোখানি তাতে ভীষণ দুলতে লাগ্‌লো।

ক্যাপটেন ওয়ালিন্‌স্ বলে উঠলেন, "শুনছেন মিঃ গ্যালাম, না, গ্যালন, কি আপনার নাম, আপনি না থামলে আপনাকে নতুন গান শুনিয়ে দেবো। আপনি কি জানেন, মিঃ গ্যালন? আপনি হচ্ছেন নদীর ধাঙড়! তার চেয়েও নিচে—" বলেই তিনি বাঁশীতে একটি সুর বাজিয়ে তাকে বিদ্রূপ করতে লাগলেন।

নৌকোখানি থেকে একটি রাইফেলের আওয়াজ হ'ল আর ক্যাপটেন ওয়ালিনসের গালের পাশ দিয়ে একটি গুলি চলে গেল। আর তার সঙ্গে যেন যাদুমন্ত্রে তাঁর বাঁশীটি পায়ের কাছে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল।

লোকটি গম্ভীরভাবে বলে উঠ্‌লো, "এই তোমায় নতুন সুর দিলাম। পরের বারে এই সুরে হবে মৃত্যু। আমাদের কেনটাকিতে, মানে আমি যেখানকার লোক, তোমার মতো বদমায়েসকে এই ভাবেই সায়েস্তা করি। লাইজ গ্যালাপ তোমাকে সাবধান করছে। গ্যালাপ! তুমি বলেছো, গ্যালন। গ্যালন নয়—কথাটা মনে রেখো।"

ক্যাপটেন হতভম্বের মতো হয়ে গেলেন। তারপরই সিঁড়ি দিয়ে হাল-ঘরে উঠে গিয়ে যে লোকটি হাল ধরে ছিল তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে, নিজেই হাল ধরে ঘুরিয়ে দিলেন। অমনি ষ্টীমারখানি ঘুরে সোজা গিয়ে ছইওয়ালা পানসিখানিকে মারলো ধাক্কা। নৌকাখানা মড়মড় করে ভেঙে জলে তলিয়ে গেল।

ক্যাপটেন হাল ছেড়ে দিয়ে রুক্ষ মুখে বললেন, "ষ্টীমারের মুখ বার নদীর দিকে ঘোরাও।"

ক্যাপটেন দরজার দিকে ফিরতেই ষ্টীমারের সেই কর্মচারীটি পাংশু মুখে ঘরে ঢুকে বললেন, "ক্যাপটেন, লোকটা যে ডুবছে। ওকে বাঁচাবেন না?"

ক্যাপটেন পকেট থেকে একটি নারকেলের বনবন বার করে মুখে পুরে চিবতে চিবতে

বললেন, "একটা ধাঙড়ের জন্যে সারাটা দিন নষ্ট করতে পারি না। তুমি তো জানই, এই লোহা-লক্কড় নিয়ে আমাকে শীগগির কিনিকিনেকের কারখানায় পৌছতে হবে।"

"ক্যাপটেন, আপনি বুঝতে পারছেন না, কি করছেন। এর মানে ফাঁসি। ও লোকটা নিগ্রো নয় যে, ওকে মেরে ফেললে কেউ কিছু বলবে না। ওর চামড়া শাদা। তাছাড়া ও সরকারী কর্মচারী। ও হারিকেন টোহেডে ষ্টীমারে আলো দেখায়। এর মানে ফাঁসি।

ক্যাপটেন বললেন, "ও শাদা হোক, কাল হোক্‌, আমার খুশি মতো ষ্টীমার চালাবো। তুমি আমার কথার ওপর কথা বলতে এস না। এ ব্যাপারটা কে দেখতে আস্‌ছে? এখানে তিন মাইলের মধ্যে জনমানব নেই। ওর পানসীখানা জলের টানে আমার ষ্টীমারের গায়ে এসে ধাক্কা লেগে ডুবে গেছে, সে কি আমার দোষ? ও পানসীর মাঝি মাত্র! ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে গভর্ণমেণ্ট আমায় ধন্যবাদ দেবে। তোমার নিজের চরকায় তেল দাও তো—"

কর্মচারীটি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "আপনি ফাঁসিতে ঝুলতে পারেন। সে আপনার খুশি। কিন্তু আমি ঝুলতে চাই না। ও যদি এখনও ডুবে গিয়ে না থাকে ওকে তুলবো—"

ক্যাপটেন দেখলেন, লোকটি নিচের ডেকে গিয়ে জুতো খুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তিনি ইন্‌জিন-ঘরে সংকেত পাঠালেন, "আস্তে চালাও।" এবং চঞ্চল জলধারায় যেখানে কর্মচারীটির মাথা মাঝে মাঝে ভেসে উঠছিল সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে দেখতে পেলেন সে গ্যালাপের অবসন্ন দেহটি নিয়ে জলের ওপর ভেসে উঠলো। ক্যাপটেন হাল-ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বললেন, "ওকে একটু শিক্ষা দাও। এইসব পানসী-ওয়ালাদের নির্মূল করবার জন্যে গভর্ণমেণ্টের দস্তুরমতো লোক লাগানো উচিত, যেমন করে সাপ আর মাছি ধ্বংস করা হয়। নৌকো নামিয়ে দাও—"

গ্যালাপকে ডেকে তুলে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। একটু পরে তার দেহে প্রাণ ফিরে এল। ক্যাপটেন তার দিকে তাকিয়ে একটি লাইফ-বেলটের গায়ে হেলান দিয়ে 'বনবন' চিবতে লাগলেন।

গ্যালাপ নদী-তীরের গাছপালার দিকে একবার তাকালো। তারপর তার উদ্ধারকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে, ক্যাপটেনের দিকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "তোমাকে খুন করবো। প্রথম সুযোগেই তোমায় শেষ করবো। তোমার মতো লোকের বেঁচে থাকার দরকার নেই।"

ক্যাপটেন নিগ্রো খালাসীটিকে বললেন, "তোমার মাথার ওপরে একগাছা দড়ি টাঙানো আছে, জেফ্। সেটা পেড়ে নিয়ে ঐ জঞ্জালটাকে টাঙিয়ে রাখো তো।" তারপর গ্যালাপকে বললেন, "এর পর আর কারো মুখ থেকে সাড়ে চুয়ান্ন ডলার দামের বাঁশীকে গুলি করবে না, বোধ হয়?"

গ্যালাপ উদ্ধতকণ্ঠে বললে, "তোমার মতো বাজিয়ের বাঁশী রাখবার কোন অধিকারই নেই। বাজনা শুনলেই বুঝতে পারি লোকটা কি রকম ওস্তাদ। সারা ক্লে কাউন্টিতে আমার মতো বাঁশী বাজাতে আর কেউই পারতো না। আমি একজন ওস্তাদের কাছে বাজনা শিখেছি। তুমি যখন বাজাও তখন মনে হয়, মরবার আগে খরগোশ ডাকছে।"

ক্যাপটেন বললেন, "কি! মজা দেখছি। জানো আমি ছেলেবেলা থেকে বাঁশী বাজাচ্ছি? বুঝলেন মিঃ গ্যালন, আমার নিগ্রো খালাসিরা আমায় বলে 'মৌমাছি'। ষ্টীমারের ক্যাপটেনের চাকরি নেবার আগে আমি ছিলাম কয়েদী-ক্যামপের সর্দার। নামটা আমাকে দেওয়া হয় তখন—" বলে তিনি পকেট থেকে একটা ছোট, সরু বাঁশের আগা বার করলেন। আগাটির একদিকে হুলের মতো লোহার চোখা চোখা কয়েকটি ত্রিভুজ আঁটা ছিল।

—"এই দেখুন মিঃ গ্যালন, আমার হুল। আপনার কথা যদি ফিরিয়ে না নেন তা'হলে এটা ফোটাবো। বলুন, আমি আপনার চেয়ে ভাল বাঁশী বাজাই।—বলুন?" বলেই ক্যাপটেন সেটা গ্যালাপের গায়ে ফুটিয়ে দিলেন। তারপর কাগজে হুল থেকে রক্ত মুছে পকেটে পুরে রেখে আবার বললেন, "যা বললাম, যতক্ষণ না তা বলছেন ততক্ষণ এটা ফোটাবো।"

গ্যালাপের মুখ কঠিন হয়ে উঠ্লো। সে বললে, "আমায় শেষ করে ফেল। কারণ, আমি বেঁচে থাকলে আমার হাত থেকে কেউই তোমায় বাঁচাতে পারবে না, কিছুতেই না। কিন্তু ভাবছি, হারিকেন হেডে বাতিঘরের কি দশা হবে? আমি ছাড়া আর কেউ তো ও কাজটি করবার নেই। আলো না থাকলে ঐ বাঁকের মুখে যে অনেক নৌকো ডুবি হবে।"

—"বাপু ওই বলে যে তুমি ছাড়া পাবে তা মনে করো না। মাসে দু'খানা নৌকোও এ পথে যাওয়া-আসা করে না। যতক্ষণ না বলছো, আমি তোমার চেয়ে ভাল বাঁশী বাজাই ততক্ষণ তোমার নিষ্কৃতি নেই। তোমার জেদ ভাঙছি। জেফ্ ওকে বাজরায় নিয়ে গিয়ে লোহা বয়াও। তবে মিঃ গ্যালনের শরীর আজ ভাল নেই, কাজেই ওঁর পায়ে লোহার গোলা বেঁধে আজ শুইয়ে রাখো। কাল কাজে লাগিও—"

ষ্টীমার জল কেটে উজানে চলেছে। সন্ধ্যার পর ক্যাপটেন সামনের ডেকে চেয়ারে বসে পাইপ টানছেন। এমন সময় জলে ঝপ্ করে শব্দ হ'ল। ক্যাপটেন উঠে রেলিং ধরে

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন, শব্দটা কিসের? কিন্তু সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতেই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

সেই নিগ্রো কর্মচারীটি ওপরে উঠে ছুটে তাঁর কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, "শেষ করেছি।"

ক্যাপটেন এক মুঠো মটরভাজা মুখে পুরে বললেন, "শেষ করেছো!—কি শেষ করেছো?"

—"যা চাইছিলেন, মানে সেই লোকটাকে মেরে ফেল্‌তে। ওকে নদীতে ফেলে দিয়েছি। শব্দ শোনেন নি?"

—"মানে লোকটা ডুবে মরেছে?"

—"আপনি তো লোকটাকে মেরে ফেলতেই চাইছিলেন। ওকে দুপুরে জল থেকে তোলবার পর থেকে আপনি ওর ওপর সেই রকমের ব্যবহারই তো করছিলেন—"

—"তুই আমার সমস্ত ফন্দি ভেস্তে দিলি? কে তোকে এ কাজ করতে বলেছিল? এখনই ওকে তুলে আন্। ও যদি মরে, তবে তোকেও মরতে হবে—" বলেই ক্যাপটেন তাকে ঘুষি মারলেন।

নিগ্রোটি ইন্‌জিন ঘরের দিকে ছুটলো; ক্যাপটেনও হাল-ঘরে ঢুকলেন। তৎক্ষণাৎ দুটি সন্ধানী আলোর তীব্র রশ্মি অন্ধকার নদীর বুকে কি যেন হাঁতড়াতে লাগলো। অবশেষে রশ্মি দুটি একটি জায়গায় স্থির হয়ে রইলো। সেখানে ছিল লাল ও কালো রঙের একটি জিনিস। গ্যালাপ গাছের একটি ভাসমান শাখা ধরে ভেসে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার পায়ে বাঁধা লোহার গোলাটি তাকে জলের তলায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এমন সময় সেই নিগ্রোটি গিয়ে তাকে একটি লাইফ-বেল্ট পরিয়ে দিল। সেই মুহূর্তে ষ্টীমারখানিও গিয়ে দু'জনকেই ওপরে তুলে নিল।

তাকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়াবার পরই সে চাঙ্গা হয়ে উঠেই বললে, "আমি কিছুতেই বলবো না। কিছুতেই বলবো না তুমি আমার চেয়ে ভাল বাজাও। তোমার বাজানো শুনলে গা-ঘিন্‌ঘিন্ করে। তুমি আবার আমাকে ডুবিয়ে মারতে পারো—"

ক্যাপটেন বললেন, "মনে করছো আমিই তোমাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম?"

—"তা না তো কি? তবে কি তুমি আমায় বাঁচিয়েছ?"

—"হুঁ।"

—"দেখছি তুমি একদম বদ নও। তোমার মধ্যে কিছু ভাল আছে।"

—"দেখ বাপু, তোমার ও পাদ্রিয়ানা রাখো। তোমাকে হঠাৎ ভালোবাসতে শুরু করেছি

বলে তোমায় বাঁচাই নি। যা তোমায় বলতে বলেছি, তুমি যতক্ষণ তা না বলছো ততক্ষণ তোমায় মরতে দিতে চাই না।"

—"যাইহোক, ধরেনিলুম তুমিই আমায় বাঁচিয়েছ ; এখন এখানে আমায় নামিয়ে দাও। আমি কোন রকমে হারিকেন হেডের বাঁকে গিয়ে পৌছবো। সেখানে আলো না দেখালে বিপদ হবে।"

"যতক্ষণ ও কথা না বলছো ততক্ষণ তোমায় ছাড়্‌বো না।"

—"আমি বলবো না ! আচ্ছা বেশ, এস দু'জনে বাঁশী বাজাই। খালাসিরা বিচার করে বলবে, আমাদের মধ্যে কে ভাল বাজায়। ভোট নেওয়া হোক। ওরা ভোটের বাক্সে ভোট দেবে।"

—"বেশ !"

—"কিন্তু আমার পায়ে লোহার গোলা বাঁধা। এ নিয়ে তো বাজাতে পারি না।"

—"জেফ্‌, শিকল আর গোলাটা খুলে দাও। চলো, ওদিককার কামরায়।"

ক্যাপটেন গ্যালাপকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন। খালাসিরাও গেল তাঁদের পিছন পিছন। দু'জনে দুটো পিপের ওপর বসলেন। একটি বিস্কুটের খালি টিন হ'ল, ব্যালট-বাক্স। খালাসিরা দাঁড়িয়ে বাঁশী শুনতে লাগ্‌লো।

আগে বাজালো গ্যালাপ। তারপর বাজালেন, ক্যাপটেন।

জেপ বললে "আর একটি সুর বাজান। একটিতে ঠিক বোঝা গেল না।"

আবার দু'জনে পর পর বাজালেন। খালাসিরা ব্যালট-বাক্সে ভোট দিল।

ভোটের কাগজগুলো নিয়ে গ্যালাপ গুণে বললে, "আমার পক্ষে পনেরোটা ভোট—এবার আমায় ছেড়ে দাও। আমি জিতেছি—"

"কখনো ছাড়বো না। আর তোরা কালো ভূতের দল, মিছে কথা লিখেছিস্‌! আমিই ওর চেয়ে ভাল বাজাই।" বলতে বলতে ক্যাপটেন ঘুষি পাকিয়ে তাদের মারতে গেলেন। গ্যালাপও সেই ফাঁকে কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে রেলিং টপ্‌কে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে প্রথমে ডুবে গেল, তারপরই ভেসে উঠলো। ষ্টীমার থেকে তিনবার গুলির আওয়াজ হ'ল।

গ্যালাপ কূলের দিকে সাঁতরে যেতে যেতে চীৎকার করে বল্‌লে, "বাঁশী বাজানোর চেয়ে তোমার হাতের টিপ আরও বিশ্রী।" কিন্তু তার হাতের এক জায়গা দিয়ে তখন রক্ত বার হচ্ছিল। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে সে তীরে উঠে দেখলো, ষ্টীমারখানি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সে মনে মনে বললে, তোমাকে ধরতে পারবোই।"

সেখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে ছিল, রেল স্টেশন। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে স্টেশনে পৌঁছেই সে দেখলো, একখানি মালগাড়ি হারিকেন হেডের দিকে যাচ্ছে। সে তারই ছাদে চড়ে বস্লো এবং প্রায় ভোরের দিকে হারিকেন হেডের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে নেমে পাহাড়ে পথ দিয়ে হারিকেন হেডে যখন পৌঁছলো তখন সকাল।

সে দেখলো বাতি-ঘরের আলোটি নিবে গেছে। আলোটি পরিষ্কার করে, আগুন জেলে নিজের পোষাক শুকিয়ে ভুট্টাক্ষেত থেকে দুটি ভুট্টা ভেঙে এনে তাই দিয়ে জলযোগ করলো। তার হাতের ক্ষতটি মারাত্মক গোছের কিছু হয়নি। ন্যাকড়া ছিঁড়ে ক্ষতটি বেঁধে নদীর ধারে গাছতলায় বসে বাঁশীটি বার করে বাজাতে লাগ্লো। তারপর সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা পড়ে এসেছে। সন্ধ্যাবেলায় লণ্ঠনটি নামিয়ে জেলে সে সেটিকে খুঁটির মাথায় টাঙিয়ে রাখলো না, নদীর ধার থেকে সিকি মাইল দূরে মাঠের মাঝখানে যে পাইন গাছটি ছিল তার গায়ে ঝুলিয়ে রাখলো। আলোটি গাছে কুয়াশার ভেতর লাল হয়ে জ্বলতে লাগলো।

তারপর নদীর ধারে এসে অন্ধকারে বিলীয়মান জলধারার ওপর দিয়ে দূর দিগন্তে তাকিয়ে মনে মনে বললে, "ষ্টীমারখানা রাত ন'টার সময় এখানে পৌঁছনো উচিত। অবশ্য ষ্টীমারে যে সব নিগ্রো খালাসি আছে, ওদের কারো কোন ক্ষতি করতে চাই না। ওদের মধ্যে জনকতক বেশ ভাল লোক।

সে নির্জন নদীর তীরে বসে তাকিয়ে রইলো। রাত্রির অন্ধকার ও কুয়াশা ক্রমে গাঢ় হতে লাগলো।

শেষে নদীর বাঁকে দেখা গেল ষ্টীমারের সবুজ লাল আলো। গ্যালাপ সাঁতরে গিয়ে একটা জলে-ডোবা গাছের ডালে চড়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। হারিকেন হেডের বাঁকে খুঁটির মাথায় যে আলোটি একদিন ক্যাপটেনকে পথের নির্দেশ দিয়ে এসেছে। আজও সেই আলো দেখে সে সোজা এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মড়্মড়্ শব্দ হ'ল, সেই সঙ্গে উঠলো লোকজনের চীৎকার। তারপরই দেখা গেল, অন্ধকারে ছোট ছোট আলো ও টর্চ। জলকল্লোল ও খালসীদের কোলাহলের ওপর দিয়ে শোনা গেল ক্যাপটেনের মোটা গলা। একটু পরেই খালাসিরা কাছি ধরে একে একে তীরে নামতে লাগ্লো ষ্টীমারখানিকে বাঁধবার জন্য। ডাঙায় টর্চ হাতে একজন খালাসী এদিক-ওদিক যাচ্ছে, আর ক্যাপটেন সামনের গলুই-এ দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মতো চীৎকার করছেন।

তবুও গ্যালাপ চুপ করে বসে রইলো। যখন তার ধারণা হ'ল, প্রায় সব খালাসী ষ্টীমার

থেকে নেমে গেছে, তখন সে নিঃশব্দে জলে নেমে সাঁতরে গিয়ে কালো হালটির ওপর দিয়ে ডেকে উঠে গেল। উঠে গিয়ে দেখ্‌লো, সেই নিগ্রো কর্মচারীটি যে তাকে বাঁচিয়েছিল, সে তার দিকে আসছে। সে তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়ালো, তারপর লোকটি তার বিপরীত দিকে চলে যেতেই সে এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে ক্যাপটেনের ওপর হঠাৎ লাফিয়ে পড়লো। তারপর তাকে পাটাতনের ওপর ফেলে তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে তার হাত দু'খানা শক্ত করে বেঁধে মুখের ভেতর রুমাল গুঁজে দিল।

তারপর ক্যাপটেনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "তুমি একটি নিরেট গাধা। লোককে ঠকিয়ে ঠকিয়ে ধারণা হয়েছে, এই বন্যা আর কুয়াশাকেও ঠকিয়ে চলে যাবে। তোমার ষ্টীমারখানাকে জলের তলায় পাঠিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তোমার খালাসীদের ডুবিয়ে মারতে ইচ্ছা হয় নি। তাছাড়া অন্য কারণও আছে।" ব'লে সে কোমর থেকে ধারালো কুড়ুলখানি খুলে নিয়ে ক্যাপটেনের চোখের সামনে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, "তোমাকে এখনই মেরে ফেলা উচিত। কিন্তু তুমি যে ভাবে আমার জেদ ভাঙতে চেয়েছিলে আমিও ঠিক সেই ভাবে তোমাদের জেদ ভাঙবো। বলো, আমি তোমার চেয়ে ভাল বাঁশী বাজাতে পারি। না' হলে এই কুড়ুল দিয়ে কাছি কেটে দেবো। আর তোমার ষ্টীমার গিয়ে সেই লোহার কারখানার নদীর ধারের লোহার কড়ির গাদায় গিয়ে ধাক্কা লেগে তলিয়ে যাবে। তাতে তোমারও দফারফা হবে!"

ঠিক এমনি সময় সেই নিগ্রোটি সেখানে এসে পড়লো।

গ্যালাপ তাকে কুড়ুল দেখিয়ে বললে, "সরে যাও।"

লোকটি ভয়ে দূরে সরে গেল।

ওয়ালিনসের মুখের রুমাল একটু আল্‌গা করে দিয়ে গ্যালাপ বললে, "যা বললাম, বলো।"

ওয়ালিনস্ বললে, "বলবো না।"

—"বলবে না?"

—"না।"

গ্যালাপ তিন কোপে কাছি কেটে ফেল্‌লো। ষ্টীমারখানা প্রবল স্রোতে ভেসে চল্‌লো। তারপর বললে, "মরবার আগে আর কিছু বলতে চাও?"

—"আমার বাঁশীটি এনে দাও।"

—"কোথায় আছে?"

—"ঐ চেয়ারে।"

গ্যালাপ হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে চেয়ার থেকে বঁশীটি এনে দিয়ে বললে, "বাজাতে চাও ?"

—"হুঁ ।"

সে এক হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বললে, "এক হাতেই বাজাও। তোমার ও হাতখানাকে বিশ্বাস নেই ।"

ওয়ালিনস্ একহাতে বাঁশীটি মুখে তুলে সেই বিদ্রূপের গান বাজলেন ।

গ্যালপের চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌লো, কুড়ুলখানি তুলেই আবার নামিয়ে সে বললে, "তুমি অতি বদ্‌লোক। কিন্তু সাহসী। তোমার মতো সাহসী লোককে মেরে ফেলবার অধিকার আমার নেই।" তারপর সেই নিগ্রো কর্মচারীটিকে বললে, "আমাকে একটা লাইফ-বেলট এনে দাও ।"

ওয়ালিনস্ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমার ষ্টীমারখানা ডুববে এ কিছুতেই হতে পারে না। কুয়াশা কেটে আস্‌ছে। কিন্তু এই স্রোতে আমি একা হালের চাকা ঘোরাতে পারবো না।"

—"বেশ। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি সাহসী।" বলে গ্যালাপ তাঁর সঙ্গে হাল-ঘরে উঠে গেল।

দু'জনে এক সঙ্গে হাল ঘুরিয়ে ষ্টীমারখানিকে আলগোচে কূলে লাগালো। সেই নিগ্রোটি নেমে গাছের সঙ্গে কাছি জড়িয়ে দিল।

গ্যালাপ বললে, "ক্লে কাউন্টির সবাই বলতো আমি সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারি। তুমিও বাজাতে পারো—আমার চেয়ে ভাল না হতে পারে। তবে আমারই মতো সুন্দর।"

ক্যাপটেন ওয়ালিনস্ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমি পারি না। তুমি আমার চেয়ে শতগুণে ভাল পার। হাজার গুণ ভাল পার। আমার কথার ওপর কথা বলো না।—সাবধান!"

গ্যালাপ সন্দিগ্ধহাস্যে বুকের ভেতর থেকে নিজের বাঁশীটি বার করে, তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "এস আমরা দু'জনে এক সুর বাজাই।*

---

* মার্কিন লেখক বেন লুসিয়েন বারমান থেকে

পেট্রোলিয়মের জন্মকথা

শ্রীবিজয়েন্দ্র চৌধুরী

বর্তমান যুগকে আমরা বিজ্ঞানের যুগ বলে মনে করি। বাস্তবিক এ-যুগে এমন সব বৈজ্ঞানিক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে যে, তাদের কথা শুনলেই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, আর চোখে দেখলে তো কথাই নেই! এখন বিজ্ঞানের-জ্ঞানের পরিধি যতই বেড়ে চলেছে, ততই সে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করছে। এই দেখ কিসের কথা বলতে গিয়ে কিসের কথা টেনে আনছি। হুঁ, বলছিলাম—পেট্রোলিয়মের জন্মকথা। প্রথমে তার অবিষ্কারের কথা বলি। 'ভূস্তরের গভীর অঞ্চলে একপ্রকার খনিজ তৈল পাওয়া যেতে পারে' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পাশ্চাত্য দেশের একদল ভূতত্ত্বের পণ্ডিত এর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বলাবাহুল্য তাঁদের সঙ্গে এই কাজের উপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ছিল। এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে অনুসন্ধান করতে করতে তাঁরা অবশেষে এক জায়গায় এসে থেমে গেলেন। সেখানকার মৃত্তিকা পরীক্ষা করে তাঁদের সেইসব যন্ত্রপাতীর সাহায্যে প্রকাণ্ড লোহার নল চালিয়ে দিলেন তাঁরা ভূপৃষ্ঠ ছিদ্র করে। দেখতে দেখতে সেই প্রকাণ্ড লোহার নল ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে এক সময় তৈলযুক্ত স্তরে গিয়ে পৌছাল। আর সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে ভস্ ভস্ করে একপ্রকার গ্যাস ও তৈল বের হয়ে আসতে লাগল। এই তৈলই হচ্ছে পেট্রোলিয়ম। তারপর যখন গ্যাসের বহির্মুখী চাপ কম পড়তে লাগল, তখন আবার পোট্রোলিয়ম ওঠাও ধীরে ধীরে কমতে স্থুরু করল। পণ্ডিতগণ তখন আবার পাম্প করে এই খনিজ তৈল বার করতে লাগলেন।

এখানে তোমরা জেনে রাখ এই পেট্রোলিয়ম এক একটি নলকূপ থেকে একাদিক্রমে প্রায় চার বৎসর ধরে উত্তোলন করতে পারা যায়। আজকাল অবশ্য এই খনিজ তৈল প্রতি মাসে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টন তোলা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের বলে, এবং তা যুগ যুগ ধরে মানব-সভ্যতার ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে।

তারপর শুনে যাও। সেই খনিজ তৈল ওঠার পর বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা স্থুরু করলেন তাদের পরীক্ষা। পরীক্ষায় দেখা গেল, ঐ তৈলের মধ্যে দুটি প্রধান উপাদান মিশ্রিত হয়ে আছে। অঙ্গার (carbon) ও উদজান (hydrogen)। আরো পরীক্ষার পর তাঁরা অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, অতি প্রাচীন কালে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ (ডায়াটস, শেওলা) এবং সামদ্রিক প্রাণী (মাছ, শামুক প্রভৃতি) অগভীর সমুদ্রগর্ভে পালল শিলার স্তরের নিচে চাপা পড়ে থাকায়, বাতাস থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বহু বহু যুগ ধরে এমন অবস্থায় থাকায় তাদের দেহ থেকে একপ্রকার তৈল নিঃসৃত হতে আরম্ভ করে, তার উপর ভূগর্ভের চাপে ও তাপে এবং ব্যাকটিরিয়ার (bacteria) কার্যের ফলে ঐ গন্ধযুক্ত তৈলাক্ত পদার্থ এক সময়ে পেট্রোলিয়মে পরিণত হয়ে যায়।

আর একজন বৈজ্ঞানিক অন্যপ্রকার সিদ্ধান্ত করলেন। তাঁরা নানাপ্রকার পরীক্ষা করে শেষে এই মত প্রচার করলেন যে, ভূগর্ভস্থিত ধাতু এবং অঙ্গার মিলিত হয়ে য়্যালুমিনিয়ম কার্বাইড্ সৃষ্টি হয়, পরে ঐ কার্বাইড্ জলের সংস্পর্শে এসে একপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন করে, ঐ গ্যাসকে বলে এসিটিলিন, এই এসিটিলিন আবার ভূগর্ভের প্রচণ্ড চাপে ও তাপের প্রভাবে এক সময় খনিজ তৈলে পরিণত হয়ে যায়।

এই রকম নানাপ্রকার মতভেদ পণ্ডিতদের মধ্যে আছে। সেই সব মতের কথা শুনলে তোমাদের ধৈর্য ধরে রাখা কঠিন হবে বিবেচনায় মাত্র দুটি মত প্রকাশ করে এখানেই আমি ক্ষ্যান্ত হলাম।

এখন শোন। ভূস্তরের গভীর অঞ্চল থেকে প্রথম যে খনিজ তৈল উঠ্‌ল তা অত্যন্ত ঘন ও ময়লা। এত ঘন ও ময়লা যে, তা কাজে ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ তাকে রাসায়নিক উপায়ে পাতনক্রিয়ার সাহায্যে পরিস্কার করলেন। আর তার ফলে তা থেকে বের হয়ে এল পেট্রোল (petrol) ও কেরোসিন (kerosin)।

এ দুটি জিনিস ছাড়াও বৈজ্ঞানিকগণ আরো একটি পিচ্ছিলতর তৈল (lubrikating) বার করলেন তা থেকে। এই পিচ্ছিলতর তৈল যন্ত্রাদির ঘর্ষণজাত ক্ষয় নিবারণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

তারপর আরো পাতনক্রিয়ার পর শেষে আর একটি মোমের মত কঠিন পদার্থ পড়ে থাকতে দেখা গেল তার মধ্যে। এই কঠিন পদার্থই হচ্ছে প্যারাফিন (paraffin)। এই প্যারাফিন বাতি তৈরী এবং কাঠের জিনিস পালিশ করা প্রভৃতির কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শুধু তাই নয় এই খনিজ তৈল আবিষ্কার হওয়ায়—মটর চালান, অনন্ত নীল আকাশের বুকে নানাপ্রকার এরোপ্লেন উড়ান মানুষের পক্ষে যত সহজ হয়েছে তার আর সীমা-পরিসীমা নেই। ভবিষ্যতে আরো কত উপকার পাওয়া যাবে এর থেকে তা কে বলতে পারে!

দাঁত-ভাঙ্গা

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

*

ছেলেটা পালিয়েছিল। কাউকে না বোলে রাতের অন্ধকারে বাড়ী থেকে টেনে দৌড়।—শুধু কি আর দৌড়ে? দৌড়ে আর কতদূর যাওয়া যায় বলো না।—রেলগাড়ীতে, নৌকোয়, ষ্টীমারে।

ভাড়ার পয়সাটা অবিশ্যি বাবার পকেট থেকেই জুটিয়ে নিয়েছিল। সেটাও ঐ রাতের অন্ধকারেই এবং কাউকে না বোলেই!

পালাবার কারণ?—তা' আছে বৈকি!—অকারণে কেউ পালায় নাকি বাড়ীর নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে?—পালিয়েছিল তার নামের জন্যে। হ্যাঁ, তার নিজের নামের জন্যে। দাঁত-ভাঙ্গা নামের জন্যেই তো।

তা'হলে ব্যাপারটা খুলেই বলি।—

ছেলেটি তার ইস্কুলের ট্রানস্লেশনের ক্লাসে "তাহারা স্কুলে গিয়াছে" ট্রানস্লেট্ করতে গিয়ে লিখেছিল,—They have went to school. তাই দেখে নতুন মাষ্টারমশাই ভীষণ হেসেছিলেন, এবং তার চেয়ে ভীষণ দিয়েছিলেন শাস্তি।

হ্যাভ্-হ্যাজের পরে যে কন্‌জুগেশনের 'শেষেরটা' বসাতে হয়, সেকথা তিপ্‌পান্নবার মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,—'Have gone' কথাটা ছুটির পর দেড় হাজারবার খাতায় লিখে, তাঁকে দেখিয়ে, তবে বাড়ী যেতে পাবে সে।

শাস্তিটা ভীষণ নয়?

এই ভীষণ শাস্তিটাকে আরো ভীষণতর করে দিলে বজ্জাৎ গোপ্‌লা আর বিপ্‌নেটা!—

বেচারা ছুটির পর ক্লাসের জানলার ধারে বোসে একমনে তার রাফ্‌খাতায় যখন 'Have gone' 'Have gone' লিখে চলেছে, তখন গোপ্‌লা আর বিপ্‌নেটা রাস্তা থেকে জানলার ধারে এসে কিনা তিন নম্বরের ফুটবলটা নিয়ে লোফালুফি সুরু কোরে দিলে দাঁত বের কোরে!—কেন রে বাপু,—তোদের বল্ খেলবার কি আর জায়গা ছিল না কোথাও?

উফ্!—তখন মনটা কি রকম হয় বলো দিকিনি?—কী ভীষণ কষ্ট যে হয়!

ছেলেটি জানলার কাছ থেকে সরে এসে একমনে লিখেই চললো ঘষঘষ কোরে,—Have gone, Have gone, Have gone.

শেষ আর হয় না। দেড় হাজার কি চাট্টিখানি কথা।—কেন পাঁচশো বার লিখতে

দিলেই কি চলতো না? পাঁচশো বার Have gone লিখলেই যথেষ্ট হোত নাকি?—আর কোনো দিন কি সে জীবনে ভুল কোরে Have went লিখতো নাকি?—নতুন মাষ্টারমশায়ের আবার সবেতেই যেন বাড়াবাড়ি।

Have gone, Have gone, Have gone—লিখেই চলেছে ছেলেটি। আর মাঝে মাঝে হিসেব কোরে দেখছে দেড় হাজার বার লেখা হ'ল কিনা।

হ'ল।—হ'ল দেড় হাজার।—Have gone, Hove gone, Have gone,—আরো তিনটে ফাউ দিলে ছেলেটি। নেহাৎ যদি ভুল হয়ে থাকে টোট্যালে।

কিন্তু স্যার এখনো আসছেন না কেন?—মাষ্টারমশাই?—তাঁকে না দেখিয়ে বাড়ী যাওয়া যাবে না যে। কিন্তু কতক্ষণই বা বসে থাকবে সে মাষ্টারমশায়ের জন্যে?

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষ কোরেও যখন স্যারের দেখা পাওয়া গেল না, তখন ছেলেটি দরোয়ানের কাছে তার সেই দেড় হাজার বার Have gone লেখা খাতাটা দিয়ে বললে,—দরোয়ানজী নতুন স্যার এলে এটা তাঁকে দিও। বোলো, আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরে বাড়ী চলে গেছি। দরোয়ানজী অত কথা মনে কোরে বলতে রাজী হয় না মোটেই। বলে,—তুম্ একঠো চিট্‌ঠি লিখ্‌ দেও খোঁকা।

বাধ্য হয়েই একটা চিঠি লিখতে হয় খোকাকে।—স্যারকে সম্বোধন কোরে লিখতে হয়,—স্যার Have gone লিখেছি দেড় হাজার বার, তারপর বাড়ী চলে গেছি।

চিঠিটা কিন্তু বাংলায় লিখতে কিছুতেই যেন মন সরে না ছেলেটির। দেড় হাজার বার Hove gone লিখে লিখে হাতের আঙুলগুলো যেন তার ইংরেজী অক্ষরের ছাঁদে নড়তে চাইছে কেবলই। ছেলেটি শেষ অবধি চিঠিটা ইংরেজীতেই লেখে,—

Sir, I have wrote "Have gone" one and half thousand times, and then I have went home.

চিঠিটা এবং খাতাটা দরোয়ানের কাছে দিয়ে ছেলেটি মনের আনন্দে বাড়ী ফেরে। সারা রাস্তা তার মাথায় Have gone-গুলো যেন কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে। দেড় হাজার তিনটে Have gone যেন নাচতে থাকে তার চোখের সামনে।—উফ্‌, আর কি সে কোনো দিন Have went লিখতে পারবে ট্রানস্লেশনের খাতায়? কখনই নয়!—নেভার, নেভার, নেভার!

পরদিন থার্ড পিরিয়ডে ট্রানস্লেশনের মাষ্টারমশাই এসে হাজির। হাতে তাঁর কালকের

সেই দেড় হাজার বার Have gone লেখা খাতাটা। ঘরে ঢুকেই খাতাটা চটাস্ কোরে টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলে আমাদের সেই ছেলেটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন,—ইডিয়ট!

দেড় হাজার বার Have gone লেখবার অব্যবহিত পরেই যে ছেলে I have wrote আর I have went home লিখতে পারে, তাকে 'ইডিয়ট' ছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারা যায় বলো?

কান ধরে দাঁড়াও বেঞ্চির ওপর,—হাঁক দিয়ে উঠলে মাষ্টারমশাই। তারপর কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বললেন—নাম কি তোমার?

ছেলেটি তার নাম বলবার আগেই ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে কেমন একটা চাপা-হাসির গুঞ্জন উঠল,—খুঁক্-খুঁক্, হাহা-হিহি, ফ্যাক্-ফ্যাক্।

ছেলেটি নাম আর বলে না। বলবে কি কোরে? নাম বলবার আগেই যেরকম হাসছে এরা, নাম বললে কি যে করবে, তাকি ওর জানতে বাকী আছে? নতুন মাষ্টারমশায়ের কাছে কী অপ্রস্তুতেই যে পড়তে হবে তখন, তা কী ওর অজানা? না বাপু, নাম ও কিছুতেই বলবে না।

কি হে?—কি জিজ্ঞেস করেছি কানে ঢুকেছে কি?—নতুন মাষ্টারমশাই খিঁচিয়ে ওঠেন।—নাম কি তোমার?

আজ্ঞে···

আবার খুঁক্-খুঁক্, হাহা-হিহি, ফিস্-ফাস্, গুজ্-গুজ।

আজ্ঞে···

বলবে কি না? আচ্ছা ব্যাদ্ড়া ছেলে তো। উত্তর দাও আমার প্রশ্নের।—মষ্টারমশাই গলা চড়িয়েছেন এবার সপ্তমে।

বলছি স্যার···

কাঁচুমাচু মুখে কান ধোরে দাঁড়িয়ে ছেলেটি তার সহপাঠিদের দিকে তাকায়।—সবায়ের মুখ থেকে হাসি যেন ফেটে বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। মুখগুলো যেন ফুলোনো রবারের বেলুন হয়ে আছে। ছেলেটি তার নামটা চেঁচিয়ে বললেই যেন একটা ছুঁচ একসঙ্গে সবগুলো বেলুন ফুটো কোরে দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির গ্যাসে ভরে যাবে সমস্ত ক্লাসঘরটা।

বলবে কিনা ?—বলবে কিনা তোমার নাম ?—মাষ্টারমশাই এবার উঠে দাঁড়িয়েছেন চেয়ার ছেড়ে।

বলছি স্যার···

যে-দু'হাতে সে কান ধরেছিল, সেই দু'হাতেরই দুটো আঙুল কায়দা কোরে নিজের দুটো কানের গর্তে পুরে দিলে ছেলেটি।—নাম বলবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা যখন হো-হো কোরে হেসে উঠবে, সে-হাসি ও কিছুতেই রাজী নয় শুনতে—তারপর ঠিক যেন মনুমেণ্টের ওপরতলা থেকে চোখকান বুজে লাফ্ মারছে, এমনি একটা ভাব নিয়ে ছেলেটি এক নিঃশ্বাসে বললে,—আমার নাম করঞ্জাক্ষ গড়াই।

বলেই কান থেকে হাত ছেড়ে নিজের মুখটা চেপে ধোরে ছেলেটি অস্ফুটস্বরে একবার যেন বললে,—উঃ!

ক্লাসঘর ততক্ষণে হো-হো শব্দে ভরে উঠেছে। সেই হোহো ছাপিয়ে গদাই নামে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে উঠলো,—দাঁত স্যার, দাঁত। একটা দাঁত পড়লো কোত্থেকে আমার জামার ওপর!

এক মুহূর্তে থেমে গেল হাসি।—দাঁত ?—কিসের দাঁত ?—কার দাঁত ?—কেন দাঁত ?—কোথায় দাঁত ?

এই যে স্যার, এই যে। আমার হাতে।

কিন্তু এলো কোত্থেকে এটা ?—দাঁতটাকে হাতে নিয়ে গদাই কড়িকাঠের দিকে তাকালো একবার। ঠিক তার মাথার ওপরেই কড়িকাঠে ঝুলছে একটি টিকটিকি মুখ নিচু কোরে। তবে কি ··· ?

কিন্তু টিকটিকির দাঁত অতবড় হবে কি কোরে ?—কার দাঁত ওটা—

আমার।—সমস্ত ক্লাসকে চম্‌কে দিয়ে করঞ্জাক্ষ গড়াই নিজের গাল টিপে ধোরে আড়ষ্টকণ্ঠে বললেন,—আমার দাঁত ওটা। নাম বলবার সময় হঠাৎ···

সঙ্গে সঙ্গে হাসি।—বিপুল অট্টহাস্যে ভরে উঠলো ক্লাসঘর। এমন কি নতুন মাষ্টারমশাইও হেসে উঠলেন হাহা কোরে। মিনিট দুই এই নিরবচ্ছিন্ন হাসি চলবার পর মাষ্টারমশাই একবার শুধু বললেন,—নাম বলতে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গে গেল তোমার ?

তারপরেই আবার হাসি।

হাসি থামিয়ে মাষ্টারমশাই আবার বললেন,—হ্যাঁ, দাঁত-ভাঙ্গা নামই বটে তোমার।—করঞ্জাক্ষ গড়াই!—নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে নিজের দাঁতটাই ভেঙ্গে গড়িয়ে গেল ?

আবার হাসি।

সেই বিপুল হাসির ভেতরে বেচারা করঞ্জাক্ষ কি যেন বলতে গেল, কিন্তু তার কথা শোনাই গেল না একতিল। করঞ্জাক্ষ রেগে এবং বেগে বেরিয়ে গেল সটান্ ক্লাসঘর ছেড়ে।

তারপর সোজা বাড়ী।

তারপর?—তারপর ঘেন্না ধোরে গেল তার নিজের ওপর, আর তার বাড়ীর ওপর। বাড়ীর লোকেরাই না অমন বিচ্ছিরি নামটা দিয়েছেন তার। অমন বিদিকিচ্ছিরি নাম যদি না দিতেন তাঁরা, তা'হলে…তা'হলে…না; ভাবতেই পারে না করঞ্জাক্ষ সেকথা।

কিন্তু তাই বোলে নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েই কি আর দাঁতটা ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল নাকি তার?—নড়ছিল তো ওটা তিন দিন থেকেই। স্থতো দিয়ে বেঁধে টেনেছে ও' দাঁতটা কতোবার তার ঠিক আছে? ঐ তো ট্রানস্লেশনের ক্লাসটা বসবার আগেও তো কতোবার বেচারা হাত দিয়ে নাড়িয়েছিল দাঁতটা। তারপর নিজের নামটা বলতে গিয়ে আচম্‌কা সেই নড়া-দাঁতটা যদি পড়েই গিয়ে থাকে, সেটা কি সত্যিই ওর নামের দোষ?—ওর নাম করঞ্জাক্ষ না হয়ে পেলবকুমার হলেও কি দাঁতটা পড়তো না তখন?—কিন্তু করঞ্জাক্ষ না হয়ে পেলবকুমার হলেও দাঁত যদিও পড়তো,—কিন্তু মাষ্টারমশাই তো বলতে পারতেন না যে, তার বিদিকিচ্ছিরি নামের জন্যেই পড়ে গেল দাঁতটা! কিংবা অমন ক্লাস ফাটিয়ে হাসতে পারতো না তো সবাই।

নাঃ, ঐ বিদিকিচ্ছিরি নামটাই যত নষ্টের মূল!

রাগে এবং দুঃখে রাতের অন্ধকারে করঞ্জাক্ষ তার বাবার আল্‌নায়-ঝোলানো জামার পকেটে হাত পুরে দিলে। তারপর হাতে যা উঠ্‌লো, তাই নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে দৌড় দিলে।

যাবার সময় লিখে গেল একটা চিঠি—বাবা ও মা, চললাম। ইস্কুলের খাতায় আমার নামটা বদ্‌লে যদি পেলবকুমার করতে পার কোনোদিন, তবেই আমি ফিরবো, নচেৎ আমায় খুঁজো না। মনে কোরো তোমাদের করঞ্জাক্ষ has went to forest.

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যে সাঁড়ে সাতটা! এখনও অনেক দেরি। রাতুল সেই জনমুখর গলির রোয়াকে বসেই সন্ধ্যার অন্ধকারে অধীর হয়ে উঠল। ভোম্বল এখনও আসছে না। এতক্ষণে কখন সে পৌঁছে যেত শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এ। কতদিনের বিচ্ছেদ। কতদিনের অদর্শনের পরে আজ আবার নতুন করে পাওয়া। শুধু পাওয়া নয়, ফিরে পাওয়া। প্রথমটা আর শেষটা যেন জীবন, আর মাঝখানটা যেন দুঃস্বপ্ন। ওই দুঃস্বপ্নের পর প্রথম ভোর হওয়া। প্রথম আবিষ্কার, প্রথম আবির্ভাব, প্রথম অভ্যুদয়! একটা চিঠি পর্যন্ত সে বাবাকে দেয়নি—অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আবাক করে দেবে তার বাবাকে, এই ছিল মতলব।

হঠাৎ ভোম্বল এল। হাসি-হাসি মুখ। বললে—পেয়ে গেছি মানিব্যাগ্—এই ছাখ্—

ভোম্বলের নাম লেখা ব্যাগটা। অনেকগুলো টাকা। চিনতে পারলে রাতুল।

ভোম্বল বললে—আর মিনিট পাঁচেক দেরি হলে আর পাওয়া যেত নারে—একেবারে পাকিস্তানে চলে যেত—নে চিনেবাদাম খা—

পকেট থেকে কয়েকটা দানা চিনেবাদাম বের করে দিলে রাতুলকে। ভোম্বল বললে—পাকিস্তানে চলে গেলে আর পাওয়া যেত না ভাই—বরাতটা ভালো ছিল তাই…

—পাকিস্তানে কেন? রাতুল জিজ্ঞেস করলে।

—লাটুগুণ্ডা যে পাকিস্তানে হেড্-আপিস করেছে এখন। ওখান থেকে এখানে চোরা-কারবার চালাচ্ছে, লতিফ বললে—লাটুগুণ্ডার এখন রমারম্ অবস্থা—গাড়ী কিনেছে, বাড়ী করেছে লাহোরে—আমদানী-রপ্তানী ভালো চলছে কিনা—তাছাড়া আজকাল পকেট-কাটায়

তেমন আর লাভ নেই, লোকে সব জামার ভেতর দিকে চোরা-পকেট করেছে···নোট জালের কারবারটা আর ওই চোরা আমদানী-রপ্তানীর ব্যাবসাটাতেই এখন বেশ লাভ—লতিফের সঙ্গে দেখা হলো—সে-ই সব বললে—

—লতিফ কে? রাতুল জিজ্ঞেস করলে।

—আরে লতিফ্ই যে এখন কলকাতার আপিসের কত্তা হয়েছে—অথচ আমি যখন দলে ছিলাম, আমার কাছেই লতিফের হাতেখড়ি—তখন ছিল ও আমার চ্যালা—এখন লাটুগুণ্ডার নেক্-নজরে পড়ে গিয়ে বিলকুল কপাল ফিরিয়ে ফেলেছে—চুলে টেড়ি, হাতে রিস্টওয়াচ, চার আঙুলে সোনার আংটি—আমাকে অনেক করে বললে—দলে ফিরে আয়—পাকিস্তানে-হিন্দুস্থানে চোরাকারবার চালাতে পারলে চারশো টাকা হাতখরচ আর খাই-খরচ মিলবে—আমি বললুম—দরকার নেই ভাই, ম্যাজিকটা যদি আর একটু রপ্ত করতে পারি,—এই ধর্ বেশী কিছুনা—যদি কাটা মুণ্ডু জোড়া দেওয়ার খেলাটাও শিখে নিতে পারি তো ওই চারশো টাকার মাথায় আমি লাথি মারবো—

তারপর খানিক থেমে বললে—আছে একজন, সাইগন-এ···বুড়ো মানুষ, চীনেম্যান, ভীষণ আফিং খায় বেটা, চারভরি আফিং জোগাড় করে গিয়েছিলাম দেখা করতে সাইগন-এ তার বাড়ীতে, আফিংটা কৌটোয় ভরেও নিলে, তারপর অনেক টাকা চেয়ে বসলো—কিন্তু গুণী লোক—তাই তো গুদামবাবু আর মহারাজের লাথি-ঝাঁটা খেয়েও ওইখানে পড়ে আছি, যা' ষাট-সত্তর পাই—জমিয়ে জমিয়ে যেদিন হাজারখানেক টাকা হবে—সেইদিন···

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে নিজের মনে কী যেন ভাবতে লাগলো ভোম্বল। বললে—তাছাড়া কোথায় পাকিস্তান-হিন্দুস্থান করে বেড়াবো, ধরা পড়লে দেবে লট্‌কে—তার চেয়ে এ-তবু একটা আশা নিয়ে বাঁচা···একদিন হয়ত মা'কে খুঁজে পাবো,—এই ভেসে ভেসে বেড়ানো আর ভাল লাগে না, মনে হয় মা যদি কেউ থাকতো আর খুব বকতো মারতো আমায়, যেন ভালো হতো—অনেকদিন ধরে মা'র বকুনি খেতে ইচ্ছে করে খালি—

চলতে চলতে আবার ওরা ট্রাম লাইনের ধারে এসে পড়েছে। হঠাৎ একটা দোকানের ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই ভোম্বল চম্‌কে উঠলো।

—আরে আজ যে আমার সাতটায় ডিউটিরে—আমি আজ তোদের বাড়ীতে যেতে পারবো না ভাই—আমি চললাম ওই বাসটায়—তুই যা তা'হলে—

ব'লে চলে যেতে যেতে হঠাৎ থামলো। বললে—ওরে দাঁড়া—

কাছে এসে বললে—তোর পকেট তো ঢুঁ-ঢুঁ—আচ্ছা হাঁদা তো তুই—বাড়ী যাবি কী ক'রে—এই নোটটা রাখ তোর কাছে—

দশ টাকার একটা আস্ত নোট রাতুলের দিকে এগিয়ে দিলে ভোম্বল। তারপর বললে—আর বোধ হয় তিন-চার দিন আছি এখানে, যদি সময় করে একবার আস্তে পারিস তো দেখা হলো, নইলে আর হলো না—কাল সকাল-সন্ধ্যেয় যখন ইচ্ছে আসিস না একবার, আর…আর কিছু নয়…মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই ভাই মিছেমিছি…

ব'লে একটা চলন্ত বাসে ঝাপিয়ে উঠে পড়লো ভোম্বল। এক মুহূর্ত রাতুল সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। জীবনের মাঝখানটা যদি কেবল দুঃস্বপ্নেই কেটে থাকে তো কাটুক। তাতেও বেশি দুঃখ করবার দরকার নেই। ভোম্বল এমন একটা ছেলে! ওর সঙ্গে যে-ক'টা দিন কাটলো—সে ক'টা দিনের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাক সারা জীবন। কোনও দিন রাতুলের নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করবার অপ্রিয় কৌতূহল প্রকাশ করলে না। এমন করে অচেনা-অজানাকে ভালবাসতে শেখালে ওকে কে! কোন্ ইস্কুলের শিক্ষা ওর, কে ওর মাষ্টার! মানুষের সংসারে কতটুকুই বা দেখেছে রাতুল। বেশী জানা, বেশী দেখার গর্ব ওর নেই, কিন্তু ওর মনে হলো সারা সংসারে এমন ছেলে বুঝি বড় দুর্লভ।

ট্রামে উঠে পড়লো রাতুল। এখনি সাড়ে সাতটার সময় 'ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউটে' বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সভায় বক্তৃতার শেষে বাবার সঙ্গে সে দেখা করবে। তার আগে নয়। বাবা খুব চম্‌কে উঠবে যা' হোক। নিশ্চয় চম্‌কে উঠবে। প্রথমে বলবে—কে, কে তুমি—

রাতুল বলবে—আমি রাতুল বাবা, আমি রাতুল—মরিনি আমি,—দেখ দিকিনি তোমরা সবাই মিলে আমাকে নিয়ে কী ভুলটাই করলে—কী মজাটাই না হলো—

—সে কী রে! রাতুল!! রাতুল!!!

সেই চলমান ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের এককোণে বসে রাতুলের চোখের সামনে যেন নিত্যানন্দ সেন-এর শরীরী আবির্ভাব হলো। বহুবছর আগে দেখা চেহারাটা যেন আজও অবিকল তেমনি। তেমনি সস্নেহ গাঢ় আলিঙ্গনের পরিতৃপ্তিতে অধ্যাপকের চোখ দু'টো বুজে এল। বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট বাপের বুকের ভেতর মুখ লুকোল রাতুল। আর তারপর দু'জনের মানস-দৃষ্টি থেকে বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ ত্রিভুবন বিশ্বসৃষ্টি-চরাচর বিলুপ্ত হয়ে গেল এক নিমিষে। রাতুলের মনে হলো—কেউ নেই পৃথিবীতে। দুঃখ-শোক-দুঃস্বপ্নময় পৃথিবী বুঝি হঠাৎ বড় প্রিয়-আবাস হয়ে উঠেছে। আবার সেই বিশাল বক্ষদেশের নিরাপদ-আশ্রয়ে, স্নেহ-নিবিড় পক্ষপুটে সে নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভাবনায় দিনগুলো কাটিয়ে দেবে!

—কলুটোলা, কলুটোলা—

—টং—টং—

চল্‌তি ট্রাম থেকে নেমে পড়েছে রাতুল। এখান থেকে কলেক স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে সর্ট-কাট্‌। কিন্তু ইন্‌স্টিটিউটের কাছে গিয়ে রাতুল একটু আবাক হয়ে গেল। বাইরে অনেক লোকজন জমে জটলা করছে। ভেতর থেকেও অনেক লোক বাইরে বেরিয়ে আসছে। কোথাও কোনও শৃঙ্খলা নেই। এ কী! মিটিং কী হলো! একজনকে জিজ্ঞেস করলে রাতুল—হ্যাঁ দাদা, ব্যাপার কি?

—কী জানি ভাই, গুজব তো অনেক রকমশুনছি—বলে সে-ভদ্রলোক একদিকে সরে পড়লেন।

বাইরের দেয়ালে তখনও সভার কয়েকটা প্ল্যাকার্ড আঁটা রয়েছে। গোলমাল, চীৎকার, হৈ-চই—কোলাহল-মুখর পরিবেশ।

রাতুল আর একজনকে জিগ্যেস করলে—হ্যাঁ দাদা, মিটিং কী হলো—? হবে না আজ?

—হবে না ভাই, হবে না; আজ শুধু নয় কোনওদিনই আর হবে না—

ব'লে ভদ্রলোক তেমনি চলে গেল ওদিকে, নিজের গন্তব্যস্থানে। ভিড় যেন ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসছে।

রাতুল আর একজনকে ওই একই প্রশ্ন করলে—মিটিং হবে না মশাই?

ভদ্রলোক একবার রাতুলের মুখের দিকে চাইলেন। এই বয়েসে পরলোক সম্বন্ধে কৌতূহল একটু ব্যতিক্রম বৈকি। বললেন কোথা থেকে আসছো ভাই?

রাতুল জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—না, তাই বলছি, যদি দূরে বাড়ী হয় তো এখুনি বাড়ী ফিরে যাও—ও মিটিং-ফিটিং শোনবার আশা ছাড়ো—যত রকমের বোগাস্‌ ব্যাপার সব কি এই বাঙলা দেশে—এমন ভেজালের দেশ তো আর ত্রিভুবনে কোথাও পাবেনা ভাই—

ওদিকে কয়েকজন আলোচনা করতে করতে চলেছে।

—ওহে এতদিন শুধু দুধ ঘি-র ব্যাপারেই ভেজাল চলছিল—এখন দেখছি বিদ্যে-বুদ্ধি-লেখাপড়া-ডিগ্রী-ডিপ্লোমার মধ্যেও ভেজাল—নাঃ আর কাউকেই বিশ্বাস নেই জগতে—সে যাই হোক্‌, বইগুলো কিন্তু বেচে বেশ কিছু টাকা-পয়সা করে নিয়েছে ভদ্দরলোক—এক-একটা বই-এর চার-পাঁচটা করে এডিসন্‌—সব ফক্কিকারী—

সমস্ত কথা-বার্তা-আলোচনা শুনে রাতুল কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। বাবা কি তবে মিটিং-এ আসেন নি। সবাই কি বাবাকে নিয়েই আলোচনা করছে! কে বোগাস্‌? কার

সব ফক্কিকারী? তার বাবার? প্রফেসর নিত্যানন্দ সেনের! যিনি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলেন নি! যিনি আপিসের দোয়াত-কলম-কালিতে নিজের ব্যক্তিগত একটা চিঠিও লেখেন নি কখনও! সত্যনিষ্ঠ, দার্শনিক, মহানুভব, সেই নির্লোভ, নিরাসক্ত পুরুষের কথাই এরা বলছে নাকি!

এবার আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলে না রাতুল।

জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, প্রফেসার নিত্যানন্দ সেন আজ আসেন নি মিটিং-এ?

একদল লোকের মধ্যে একজন বলে উঠলো—না ভাই আসেন নি—আর কোন্ মুখ নিয়েই বা আসবেন বলো—

—কেন—অভ্রভেদী কৌতূহল রাতুলের। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসবে।

—আরে ভাই, যে-ছেলেকে নিয়ে এত সব পরলোক-টরলোক আউড়েছেন—ডিগ্রি-ফিগ্রি আদায় করেছেন—ভলিউম্-ভলিউম্ বই লিখেছেন—আসলে সে-ছেলে কিনা মরেই নি—এতদিন পরে সেই ছেলে বাড়ী ফিরে এসেছে,—এখন এর পর লজ্জায় মুখ দেখাবে কী করে? নিজেও বোকা বনলো—আর সবগুলো ইউনিভার্সিটিকেও বোকা বানিয়ে দিয়েছে, ছি—ছি—বিশ্বাস না হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসো গে—

আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়, বাসে উঠে পড়লো রাতুল।

*　　　*　　　*　　　*

আধ ঘণ্টা পরে রাতুল বাস থেকে নেবে শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর বাড়ীর সামনে পৌছুল। পৌছে দেখলে—সেখানেও অনেক লোকের ভিড়। রাত্রের অন্ধকারে জটলা করছে বহুলোক বাড়ীর দরজার সামনে।　　　　(ক্রমশঃ)

চিত্র-পরিচয়

(৩৪ থেকে ৪৩ নং ছবি)

প্রথম সারিতে: ৩৪। শ্রীমান্ শ্যামাদাস গাঙ্গুলী, c/o বি. ডি. গাঙ্গুলী, বোট বাজার, মুঙ্গের; ৩৫। কমল, মুকুট, কুমার c/o শ্রীফণীন্দ্রমোহন গুপ্ত, পোঃ মেথলিগঞ্জ, কুচবিহার; ৩৬। শ্রীরমা সান্যাল, c/o শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সান্যাল, বর্ধমান; দ্বিতীয় সারিতে: ৩৭। বিভা ঘোষ, c/o শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিরপুর স্কোয়ার, লখনউ; ৩৮। শ্রীইরা চৌধুরী, ৪০।৬ সুবারবান স্কুল রোড, কলিকাতা ২৫; ৩৯। শ্রীনমিতা চক্রবর্তী c/o জেলা জজ' কৃষ্ণনগর, নদীয়া; তৃতীয় সারিতে: ৪০। মিঃ এ. কে. নিয়োগী, ৬বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩; ৪১। শ্রীভারতী সেনগুপ্ত, c/o এস. কে. সেনগুপ্ত, উমা বেওয়া লেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; চতুর্থ সারিতে: ৪২। শ্রীশুক্লা মুখার্জী, রামদাসপেট, নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ; ৪৩। শ্রীকৃষ্ণাঞ্জনা সান্যাল, ১০, সরোজিনী দেবী লেন, লখনউ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নিষ্ঠুর জমিদার, পূজনীয়, শ্রীগৌরগোপাল সরকার ; উৎসব-প্রান্তে, শ্রীরত্না রায় ; শুনি পদধ্বনি, শ্রীসদানন্দ কারক ; ক্ষুদ্র তাজ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল ; কল্পনা, ডিটেকটিভ, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ; লেপটা কি বলে ? শ্রীঅশোককুমার সরকার ;

ফটো : বেলুড় মঠ, শ্রীশিবদাস শেঠ, বিড়াল, শ্রীসোমেশ চট্টোপাধ্যায়। রাজহংস, কাটজুরি, শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

হাতে আঁকা ছবি : বর্ষায় বাংলা, বাঁশ বাগানে চাঁদা, পল্লীবধূ, শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী ; ধোপা, শ্রীবাসুদেব দাশগুপ্ত ; সাজী, শ্রীমঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী ; ভোরের আলো, শ্রীইরা চৌধুরী ; দেবী, শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ ; আদর, শ্রীঝরণা চট্টোপাধ্যায় ; আলপনা, শ্রীমুলতা লাহিড়ী। (ক্রমশঃ)

মজার চিঠি

ভাই 'কপালকুণ্ডলা'—

শুনে সত্যিই খুসী হলাম যে তোমরা সকলে 'আনন্দমঠ' দেখতে গিয়ে খুব আনন্দ করেছ। তোমার চিঠিতে অদ্ভুত খবর পেলাম যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী' হঠাৎ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাড়ীর গণ্ডী ভেদ করে ক্লাবের 'দেবী চৌধুরাণী' হয়ে উঠেছে। ক্লাবের বীর 'রাজসিংহ,' ও 'সীতারাম'ই নাকি তাকে প্ররোচিত করেছে। 'চন্দ্রশেখর'বাবু কি এতে আপত্তি করেন নি। 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে পড়লাম যে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলকে' কেন্দ্র করে নাকি একটি 'বিষবৃক্ষ' গড়ে উঠেছে, কিন্তু ব্যাপারটি ভাল বুঝলাম না, তুমি নিশ্চয়ই জানো। তোমাদের পাড়ার লোক তো, বিস্তারিত আমাকে জানিও। সেই 'যুগলাঙ্গুরীয়' পেয়েছ কি ? আর কি লিখব। 'রজনী' কেমন আছে ? তাকে আমার প্রীতি জানিও। তুমি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছ নিও। ইতি—

—'ইন্দিরা'
(শ্রীরঞ্জনা বোস)

বৃষ্টি !

—বৃষ্টি ! এলো ঐ বৃষ্টি।
চারিদিকে ছোটে জল
কলকল কলকল
ভেসে বুঝি যায় আজ সৃষ্টি !
বৃষ্টি !—এলো ঐ বৃষ্টি !

চারিধার আঁধিয়ার
মাঝে মাঝে গরজন,
শুনে সবে হুঁসিয়ার
থেকে থেকে কাঁপে মন।
বাহিরেতে কারো নেই দৃষ্টি।
বৃষ্টি!—এলো ঐ বৃষ্টি!
ভাঙে ডালপালা সব,
থেকে থেকে শুনি রব
পাখীদের।
দেখে শুনে মনে হয়
বুঝি আজ হবে লয়
ইহাদের—
ডোবায় ডাকিছে ভেক—মিষ্টি!
বৃষ্টি!—এলো ঐ বৃষ্টি!

শ্রীরমেন্দ্রনাথ অধিকারী

"অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের মেয়ে বুলবুল মাছেদের খাওয়াচ্ছে
ফটো: শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ

একখানি চিঠি

ভাই মৌচাক,

আমি তোমার গ্রাহিকা নই, কিন্তু বহুদিন থেকেই তুমি আমার পরিচিত। বিস্মৃত শৈশবের রঙ্গীন দিনগুলোর সাথে জড়ানো রয়েছে তোমার মধুময় স্বপ্ন,—অতীতের আলো-ছায়া ঘেরা কুহেলি-মেশা জ্যোৎস্নার মায়ার আবেশ। তারপর চলে গেছে কতদিন, ষড় ঋতুর আবর্তনে,—বৈশাখের রৌদ্ররুক্ষ রুদ্ররূপ থেকে বসন্তের পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকনম্ররূপের মাধুর্যে, পরিপূর্ণতায়। চলার পথের ধূলায় হারিয়ে গেছে কত বেদনায় ভরা অশ্রু, আনন্দে ভরা হাসি,—কত শৈশবসাথীর চরণচিহ্ন গেছে মুছে। কিন্তু তুমি সেদিন থেকেই রয়েছ আমার প্রিয়, মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানি গানের মতই মনের মাঝে তুমি রয়েছ মধুর হয়ে।

কবে তুমি মেলেছিলে আঁখি, অবাক্ বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলে চেয়েছিলে অজানা ধরণীর পানে! কোন্ বিহগ-কূজনমুখর প্রভাতে কোরকের পাপড়ি মেলার সাথেই মিলেছিলে নয়ন,—রাঙা অধরে ছিল সরল মধুর হাসি, শৈশবের সহজ স্বচ্ছতা ছিল তনুর রেখায়

রেখায়। জানি না কে তোমার নাম রেখেছিল —কিন্তু মধুময় তুমি সত্যিই, স্বরগ থেকে আসবার সময় সুধাটুকু ও দুটি ঠোঁটের হাসিত হরে এনেছিলে বুঝি—তাই না? সেদিন থেকেই আমার মায়ের খেলাঘরে তোমার নিত্য আনাগোনা,—তারপর কতদিন পরে এলাম আমি, মায়ের শৈশব-সঞ্চিত মৌচাকের মধু-পানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে। মনে পড়ে অপরাহ্নের স্নিগ্ধ আলেয়া-ভরা প্রকৃতি, দূর থেকে ভেসে আসছে খেলার সাথীদের আনন্দ-কলরোল, উন্মুক্ত প্রান্তারের মাঝে প্রজাপতির মত চঞ্চল চরণধ্বনি। কিন্তু আমি বসে আছি জানালার পাশে, খেলাঘরের পুতুলগুলো পড়ে রয়েছে অনাদৃত হয়ে, তন্ময় হয়ে গেছি মৌচাকের মাঝে। মা বার বার করে বলছেন খেলতে যেতে কিন্তু তা আমার কানেই ঢুকছে না আমি একমনে পান করে চলেছি মৌচাকের মৌ-ভাণ্ডার!

তারপরে চলে গেছে কতদিন—শৈশব গেছে হারিয়ে, কৈশোরও বুঝি যায় যায়—আসন্ন যৌবনের পদধ্বনি শুনছি প্রাণের মাঝে, তবু তুমি রইলে আমার চিরদিনের প্রিয়। হাসি-অশ্রু-ঘেরা বিচিত্র জীবন-বীণার তারে তারে জড়োনো তোমার স্মৃতি, সুর বাজাতে গেলেই বেজে ওঠে তোমার কথা। কল্পনায় দেখি, দেশে-দেশে, দূরে দূরে কত গ্রাহক-গ্রাহিকার উৎসুক কচি টুলটুলে মুখ, ডাকপিয়নের প্রত্যাশায় ব্যগ্র হয়ে চেয়ে রয়েছে তারা পথের পানে। এল পিয়ন, হাতে কাগজ-মোড়া বড় একটা প্যাকেট, সেটা দেখেই আশা-আশংকায় ভরা-মুখ হয়ে উঠল অসীম আনন্দে উজ্জ্বল—ভাই-বোনদের মাঝে লেগে গেল কাড়াকাড়ি, মায়ের স্নেহমিশ্রিত মধুর দৃষ্টি হয়ে উঠল অপূর্ব, মনে পড়ল তিনিও একদিন এমনি করেই 'মৌচাকের' আশায় দিন গুনতেন আর মাস শেষ হবার পর 'মৌচাক' আসতে একটি দিন দেরি হলে তাঁর মুখেও ঘনিয়ে আসতো বিষাদের কালো ছায়া।

মৌচাক ভাই, এমনি করেই তো তুমি প্রতিদিন দিয়ে আসছ সকলকে আনন্দ, তার মধ্যে আমাকে কি চেন? তোমার গলায় যে রাশি রাশি শুভ্র শতদলের দীর্ঘ মালা, তারি অগণ্য ফুলের মাঝে আমি একটি নগণ্য। তবু তোমায় প্রাণভরে ভালোবাসি, তোমার অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার মাঝে আমিও যে একজন, সে কথাটি তোমার না জানিয়ে পারলাম না।

আমায় মনে রাখবে তো ভাই? কামনা করি তুমি যেন দিনে-দিনে সৌন্দর্যে, মধুরতায়, গভীরতায় আরও অপরূপ হয়ে ওঠো—

ইতি—শ্রীবীণা পালিত

——

আগামী কার্তিক-সংখ্যা আমাদের পূজা-সংখ্যা হিসাবে পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যাকে সুন্দর করার জন্য আমরা নানান চেষ্টা করছি। বাংলা দেশের খ্যাতনামা বহু লেখক এই সংখ্যায় লিখবেন নানা ধরনের লেখা। বহু ছবি থাকবে এই সংখ্যায়।

মধুচক্র

দেখতে দেখতে পূজা তো এসে গেল, না? আমার এ চিঠি যখন তোমরা পাবে তখন তোমরা সবাই নানান কাজে ব্যস্ত—কেউ হয়তো পাড়ার পূজোর ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়েছ, কেউ হয়ত ঐ সময় প্রদর্শনী হবে যে-সব তাতে নানান জিনিস দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।… কিন্তু সত্যি কি আমরা এই পূজোয় নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পারবো? আজ চারিদিকের নানান সমস্যা আমাদের আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে।…যে সমস্যার বেড়াজালে পড়ে আমরা আজ নিজেদের নিঃসহায় অসহায় বলে বোধ করছি, সেখানে এই আনন্দকে কি আমরা সাদর আহ্বান জানাতে পারবো?…

আগামী ২রা অক্টোবর মানবতার পূজারী অহিংসার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্মদিন। তাঁর এই পুণ্য জন্মদিনে আমরা তাকে স্মরণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই যেন আমাদের কাজ না সেরে দিই।…তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যকে—যা তিনি সুরু করেছিলেন অথচ শেষ করতে পারেননি সেই অসম্পূর্ণ কাজ সারার জন্যে নিজেদের নিয়োগ করতে পারি।… তা'হলে তাঁর পুণ্যাত্মা অমরলোকে শান্তি পাবে। যদিও তার আদর্শের পথ অত্যন্ত বন্ধুর এবং সেই পথের যাত্রী হিসেবে কোন পথিকও না পেতে পারো, তবু বলি—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তো একলা চলরে।'

ভালো কথা এবারে একটা নতুন পূজা-বার্ষিকী বার হচ্ছে। তার নাম 'সাত-সমুদ্দুর'। তোমাদের জানাচ্ছি এই জন্যে যে—এতে অনেক শিশু-সাহিত্যিকদের রচনা থাকবে আর এ বইটি খুব কম ছাপা হচ্ছে। 'মৌচাক'অফিসে এ বইটি পাওয়া যাবে। তোমরা যারা কিনতে চাও 'মৌচাক' অফিসে চিঠি লিখতে পারো।…তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলছি বার্ষিকীটি এত অল্প ছাপা হচ্ছে যে আগে থেকে না জানালে পরে নাও পেতে পারো। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর পাবে এবারের মৌচাকের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়।

তোমাদের চিঠির জবাব—হৃদয়রঞ্জন রাণা (মেদিনীপুর)—যে মৌচাকের সভ্য হবে সেই মধুচক্রে যোগদান করতে পারবে।—আমাকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো—অবশ্য তোমাদের উপযোগী হওয়া চাই।…সমস্ত লেখাই সম্পাদক মশাইয়ের নামে পাঠাবে। **সুলতা লাহিড়ী** (—) 'শ্রী'তে রামায়ণ দেখে ভালো লেগেছে জেনে খুসী হলাম—যে ঠিকানাটি চেয়েছ তা ছাপানো সম্ভব নয়। **প্রতুলকুমার চট্টোপাধ্যায়** (চক্রধরপুর)—তোমার লেখা যথাস্থানে পৌছে দিলাম। স্বাস্থ্য-বিভাগ কথাটা বেশ সুন্দর, আর তা খোলাই সার হবে, তার কারণ পাড়ায় পাড়ায় অলিতে-গলিতে এত ব্যায়ামাগার আর আখড়া আছে যে তারপর ও-বিভাগটি খোলার কোন অর্থ হয় না। **শঙ্কর বসু** (দ্বারভাঙ্গা)—মধুচক্রে যে কেউ যোগদান করতে পারে; তবে মৌচাকের গ্রাহক হওয়া চাই। কবিতা পাঠিও যদি ছাপানোর মত হয় নিশ্চয় ছাপানো হবে। **ইরা চৌধুরী** (ভবানীপুর)—তোমার ঠিকানা পাঠানোর ব্যবস্থা করছি—মৌচাক তোমার ভালো লাগে জেনে আমারও কম আনন্দ হোল না। **মীরা দত্ত** (মহিষাদল)—তুমি যে ঠিকানা চেয়েছ তা কোলকাতায় এসে মৌচাক অফিসে খোঁজ

করলেই পাবে। **জীবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য** (নৈহাটী)—নিশ্চয় গ্রহণ করা হবে, তবে সেটা প্রকাশ করার ভার সম্পাদক মশাইয়ের বিচারের উপর ছেড়ে দিতে হবে। **সাগরিকা চট্টোপাধ্যায়** (বালীগঞ্জ)—ভাদ্র মাসে তোমার চিঠির জবাব কেন গেল না জানো? তোমার চিঠি আমি অনেক পরে পেয়েছি। **অশোককুমার বসু** (পুরুলিয়া)—মনের অস্থিরতা দূর করার সহজ উপায় কোন একটা বিশেষ জিনিসের চিন্তায় নিজেকে একমনে ভাসিয়ে দেওয়া। যে যেরকম ভাবে পারো, কেউ কেউ জপ করে—যদিও জানি সেটা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। শুদ্ধ ইংরেজী লেখার কোন বিশেষ পন্থা নেই, তবে এইটুকু বলতে পারি এখন থেকে সহজ অথচ সারবস্তু আছে এমন ইংরেজী বই পড়া। তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা একটু কঠিন—বয়সের সীমাটা আগে জানা দরকার। **গোবিন্দচরণ সেন** (হাওড়া)—তোমার চিঠি পড়ে বোধ হ'ল আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ; আমাকে একজন বেশ ভারিক্কি লোক ভেবেছ বোধ হয়। **ভারতী নন্দী** (ব্রাহ্মণবেড়িয়া)—তোমার ঠিকানা মৈত্রেয়ীকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। **বিভা ঘোষ** (লখনউ)—দেখো বিভা, কিছু ভেবে মন খারাপ করতে নেই—তাতে কোন লাভ নেই—সমস্ত রকম অবস্থাকেই মানিয়ে নেবার চেষ্টা করো—আমার জীবনেও ঠিক তোমার মত ঘটনা ঘটে গেছে—ভাগ্যকে দোষ না দিয়ে অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছি। **শিবদাস শেঠ** (শেওড়াফুলি)—খোঁজ নিয়ে দেখলাম—না, এ-পক্ষ থেকে কোন ভুল হয়নি। **মনওয়ারা খাতুন** (ডিব্রুগড়)—তোমার কৃতিত্বের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতি পদক্ষেপে যাতে এই রকম কৃতিত্ব দেখাতে পারো সেই আশাই করি। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার কবিতায় চিঠি পেলাম। লেখনী-বন্ধু পাঠানো ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতী নন্দীর ঠিকানা তোমায় পাঠাতে পারলাম না। যাদের চিঠি পেয়েছি—**সুব্রতশঙ্কর ভাদুড়ী** (কোলকাতা)—**মণিকা সরকার** (কাণপুর)—**তপতী রাহা, তপতী নন্দী** (বহরমপুর)—**মণিদীপা, অলকানন্দা বসু, সবিভা মুখোপাধ্যায়** (কোলকাতা)।

গতবারে মজার খেলার সব ক'টির ফলাফল ভুল ছাপা হয়েছিল—সেটি অনেকে অনুযোগ করেছ—হ্যাঁ সত্যিই সেটা ভুল ছাপা হয়েছে। এবার মজার খেলার অংশটুকু গ্রহণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'নবজাতক' গ্রন্থের ইস্টিসান নামে কবিতা থেকে। যাদের জবাব ঠিক হয়েছে :—**মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী** (বালুরঘাট)—**মীরা দত্ত** (মহিষাদল)—**সুলতা লাহিড়ী** (?)—**বিবেকজ্যোতি মৈত্র** (টালিগঞ্জ)—**ছায়া দলুই** (হাওড়া)—**অধীপকুমার অধিকারী** (হুগলী)—**আরতি সেনগুপ্তা** (সাঁওতাল পরগণা)—**পার্থ বসু** (ভবানীপুর) **মৈত্রেয়ী দত্ত, তপতী ও ভারতী নন্দী** (বহরমপুর)—**সৌরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী** (দ্বারভাঙ্গা) —**অনিমা সান্যাল** (জলপাইগুড়ি)—**অজন্তা চক্রবর্তী** (কোলকাতা) **রেবা ও কৃষ্ণা মজুমদার** (কলকাতা)—**কৃষ্ণপ্রীতি বসুমল্লিক** (কলকাতা)—**সন্তোষকুমার দে** (বালুরঘাট) —**মিতা দেব** (কলকাতা) **পিণ্টু মজুমদার** (লখনউ)।

আচ্ছা আজ এইখানেই শেষ করি। আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। ইতি—

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

১৫ই ভাদ্র এই প্রতিযোগিতার জন্য ছোটদের আলোকচিত্র গ্রহণের দিন শেষ হয়ে গেছে। আরও কয়েক মাস মনোনীত ছবিগুলি প্রকাশিত হবে এবং এদের মধ্যেই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

৩২শ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

পূজা

*

মাগো, লোকে বলে তুই মহিষমর্দ্দিনী, অসুরনাশিনী, দশ হাতে নাকি তোর দশ প্রহরণ ; তোকে ঘিরে আছে স্বর্গের সব দেব-দেবী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ আরো কত সব দেবতা।

লোকে বলে, তোর নাকি প্রচণ্ড রূপ, সারা আকাশ জুড়ে তোর এলোচুল ওড়ে, তোর পায়ের ভারে পৃথিবী কাঁপে, তোর হাতের অস্ত্রের ঝংকারে ত্রিভুবন ওঠে কেঁপে, তোর সিংহের গর্জনে নাকি মাগো, হিমালয় ফেটে ছুটে আসে স্রোতের ধারা···

মাগো, সেইরূপে নাকি তোকে রামচন্দ্র করেছে পূজা, করেছে পূজা কত রাজা সুরথ, আমি জানতে চাই না মা সে কথা···আমি চাই না মা দেখতে তোর সে রূপ···

আমি জানি মা, তুই ছোট্ট মেয়ে, পাষাণ-রাজার ঘরে আদুরী দুলালী, মেনকা মায়ের আঁচলের নিধি ; আমি জানি মা তুই বাঙ্গলী ঘরের কুমারী উমা, তুই মা আমার বাংলা মায়ের সোনার-পুতলি গৌরী মেয়ে···

আমার এই ছোট ঘরে, আমার এই ছোট বুকে, তুই মা তাই আজ আয়

তোর ঐ প্রচণ্ড রূপ মুছে ফেলে, কাজ নেই মা সঙ্গে আর কাউকে এনে, ঘুরে বেড়াক্ তোর সিংহী হিমালয়ের বনে বনে, তুই মা আয় ছোট্ট দু'টি রাঙা পায়ে নূপুর বাজিয়ে, শিউলি-ভরা বাংলার শিশিরে ভেজা বুনো পথকে তোর চলার খুশীতে ভরিয়ে তুলে; কাজ নেই মা তোর আকাশ-জোড়া দশ হাতে, আয় মা তুই ছোট্ট দু'টি মৃণাল-হাতে জগৎ-জুড়ানো স্পর্শ নিয়ে; কাজ নেই মা তোর দশ প্রহরণে, তোর কনক-চাঁপার দশ আঙুলেই জেগে উঠুক দশ দিক; দশ হাতেই যদি ধরবি অস্ত্র, কোন হাতে মা করবি অন্ন পরিবেশন? তাই মা আজ, ডাকছি তোরে, দু'টি কমল-মুঠো ভরে নিয়ে আয় মা প্রাণের অন্ন…

অসুর-নিধনের জন্যে যে ডাকে ডাকুক তোকে সমরাঙ্গণে, আমি আজ ডাকছি তোকে, তুই ফিরে আয় মা, তোর উটজাঙ্গণে, আপনার ঘরে…জননীরূপে নয়, কন্যারূপে মা আয় ফিরে মেনকা-মায়ের শূন্য বুকে…পাষাণপুরীতে ফিরে আয় পাষাণী-কন্যা, ফিরে আয় মায়ের অশ্রুজলে, পিতার রিক্ত বুকে…বাংলার ঘরে ঘরে প্রত্যেক মায়ের অশ্রুজলে, বাংলার ঘরে ঘরে প্রত্যেক বাপের ব্যথার পাষাণ-মৌনতায়, ফিরে আয় গৌরী, ফিরে আয় উমা…

তুই ফিরে এলে, তবে আবার আনন্দে মুখর হয়ে উঠবে এই মৌন পাষাণপুরী।

ফিরে আয় মা, আনন্দময়ী।

ব্যাঙের ছড়া

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

*

ব্যাঙ্ বলল, ব্যাঙাচ্চি
দাঁড়া তোদের ঠ্যাঙাচ্ছি।

বলল তখন ব্যাঙাচ্চি,
আমরা কি সার, ভ্যাঙাচ্ছি?
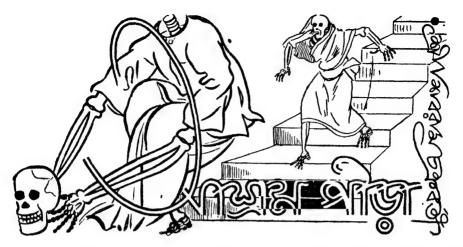
রাণী বিলাসমণি কান খাড়া করেই ছিলেন, এবার চোখের তারাও তুললেন। তুলে খাড়া করলেন নিজের কপালে এবং কর্তার ওপরে।

"ওগো শুনছো?" গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন—"শুনতে পাচ্ছো তুমি?"

"কী? শুনবো কী?" সার হরিশরণ গিন্নীর দিকে তাকাল।

"ঐ! শব্দ!—কিসের শব্দ ও? আধঘণ্টা ধরে আমি শুনছি।"

"ঐ ঠুক্‌ঠাক্‌, খট্‌খটানি?" সার হরিশরণ কথাটা কানেই তোলেন না—"ইঁদুরের দুরন্তপনা—তাছাড়া কী আবার? এই পোড়ো-বাড়ীতে কি কোনো মানুষ আসে?—কে এখানে মরতে আসবে?"

তা, পোড়ো না হলেও পুরনো বটে বাড়িটা। সেকেলে জমিদার বংশের সাবেক মহিমার কিছু কিছু চিহ্ন বহন করছে এখনো। সেই বনেদী পরিবারের শেষ প্রতিনিধি হরিশরণ এখনো এই প্রাচীন অট্টালিকার মায়া কাটাতে পারেন নি। প্রেতের মতন পড়ে রয়েছেন এখনো। বাড়ির আদ্ধেক প্রায় ধসে গেছে—অবুও যেদিকটা এখনো একটু থাকবার মতো, তারই দোতলার এক ধারে বৌকে নিয়ে তিনি বাস করেন।

এতদিন ধরে আছেন—দুটিতে মিলে সুখেই আছেন—কোনো উৎপাত কি ঝামেলা ঘটেনি একদিনও। এক মুহূর্তের জন্যও। বাড়ির সেই এক টেরেই রয়েছেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি কিছু টের পাননি। কেবল আজ ঘণ্টাখানেক হোলো, কী যেন হয়েছে! বিলাসমণি একটু উসখুস করছেন তখন থেকে। অশান্তির কী কারণ ঘটেছে তাঁর।

এতদিন পরে এই প্রথম গোলোযোগ। হাওয়ার মতন মৃদুমন্দ হলেও গোলমালই তো বলতে হয়। বিলাসমণি কান পাতেন আবার—"বেশ স্পষ্ট আমি শুনতে পাচ্ছি।"

"ও কিছু না, হাওয়া। ভাঙা জানালা খড়খড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে বইছে কিনা, তারই সোঁ সোঁ—সাঁই সাঁই।"

"না, হাওয়া নয়।" দৃঢ় প্রত্যয় বিলাসমণির।—"হাওয়ার আওয়াজ এ হতে পারে না।"

"তবে—তবে কি—কারো পায়ের আওয়াজ পাচ্ছো?"

"কে জানে! কে যে এখানে এসে আশ্রয় নিলো কি করে বলবো! বাদুড় হতে পারে, চাম্‌চিকে হতে পারে, কালপ্যাঁচাও হতে পারে।"

"হোক্ গে, ছুঁচো কিম্বা—"বাধা দিয়ে বলতে যান হরিশরণ—"ছুঁচোর মতন কেউ না হলেই হোলো! একটা ছুঁচো একবার আমার পায়ে কামড়েছিল তোমার মনে আছে?" ব্যাথাটা এখনো ছুঁচের মতন বিঁধে আছে তাঁর মনে।

"কিম্বা বেহ্মদত্যি হওয়াও বিচিত্র নয়। বাড়ির পাশেই তো বেলগাছ।" বিলাসমণি কথাটা শেষ করেন বেলতলায় গিয়ে।

"বেহ্মদত্যি? অসম্ভব।—এ তোমার কল্পনামাত্র।"

"তোমার মতন অতো কল্পনাশক্তি নেই আমার।"

"আল্‌গা দরজা হাওয়ার চোটে পড়ছে—আওয়াজ তারই। ছিঃ, এইটুকুতেই এত কাহিল হলে চলে?" হরিশরণ বলেন—"এতই যদি তোমার ভয়, তা'হলে তোমার মাকে এনে রাখলেই পারো।"

"আমার মা? তিনি আসবেন এখানে? বাগ্‌না পাড়া ছেড়ে—অমন তাঁর সাধের বাগানবাড়ি ফেলে—মরতে আসবেন এই প্রেতপুরিতে?"

"তা কেন আসবেন? থাকুন তিনি তাঁর আমবাগানে—গলায় দড়ি দিয়ে। যেমন ভাগ্যি করে এসেছেন।"

আম বাগানের আরাম হরিশরণের কাছে নিতান্ত নিচু-শ্রেণীর বলে মনে হয়।

"ভাগ্যির কথা যদি তুললেই তা'হলে আমাদের কথাও বলতে হয়। আমাদের বরাতটাও দেখো একবার।" বিলাসমণির খেদ করেন—"এই ত' বাড়ি! আড়াই ধার তার ধসে পড়েছে—একটা ধার খালি খাড়া আছে কোনো রকমে। এমন বাড়িতেও এখন উপদ্রব সুরু হোলো! হানাবাড়ি হয়ে উঠলো এর মধ্যেই। সত্যি বলবো? গত মঙ্গলবারের থেকেই আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। মঙ্গলবারে যেদিন অমাবস্যা পড়েছিল—সেদিন থেকেই।"

"আর পাঁজিও না।" হরিশরণ ঝাঁজিয়ে ওঠেন—"অমাবস্যা, তেরস্পর্শ, উত্তরে যোগিনী

—এসব নিয়ে এখনো কি কারবার চলবে আমাদের? ও সবে মাথা আর না ঘামালেও চলে। পাঁজির দিনক্ষণ যোগযাগ—তার সঙ্গে এখন আমাদের কী?"

"না বলছিলুম সেই কথা। সেই অমাবস্যার রাত্তিরেই আমার চোখে পড়লো সব প্রথম। আবছায়ার মতন কী যেন দেখতে পেলাম বাড়ির ছাঁচতলায়। ছায়া ছায়া কারা যেন! তারপর থেকে এই সব হুটপাট খুটখাট লেগেই রয়েছে। তুমি যেন নাজানার ভান করছো! কিন্তু মাঝে মাঝে পিলে চম্‌কানো গলায় কে যে খল্‌খল্‌ করে হাসছে; কি কানে আসছে না তোমার? পায়ের শব্দ—নিচের তলায় শুনতে পাচ্ছো না? এ-ঘর থেকে ও-ঘর, ও-ঘর থেকে সে-ঘর—ঘুর ঘুর করছে—ঘুরে বেড়াচ্ছে কারা, টের পাচ্ছোনা মোটেই? এ সব শুনেও যদি কালা সাজো, বুঝে চুপ করে মুখ বুজে থাকো—প্রতিকারের কোনো চেষ্টা না করো তা'হলে আর আমি কী বলবো!"

"পাগল!" হরিশরণ হাসতে পারেন না স্ত্রীর কথায়—না হেসেই উড়িয়ে দেন কথাটা।—"এ বাড়ীতে আমরা ছাড়া তৃতীয় প্রাণী আর কেউ নেই। কোনো জন-মনিষ্যি না!"

"জন-মনিষ্যির কথা আমি বলছি বুঝি? আমি বলছি দুর্জনের কথা—অমানুষদের কথা—যাদের নাম করতে নেই। ছায়া মাড়াতে নেই যাদের। তারা যদি এ বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয় তা'হলে তো আমাদের দফারফা। একদণ্ডও তিষ্ঠোতে দেবে না আমাদের।" এই বলে রাণী সাহেবা সভয়নেত্রে ঘাড় ফিরিয়ে কী যেন দেখলেন পিছন দিকে—কী যেন বা দেখতে চাইলেন। আবলুশ কাঠের কালো দরজার ভারী পাল্লা দুটো যেন খুলে যাবে হঠাৎ—যেকোনো মুহূর্তেই,—এখনই,—মনে হোলো তার। আর তার ভেতর দিয়ে উঁকি মারবে কোনো অপরিচিত মুখ, উন্মুখ চাউনি। এমনভাবেই যেন তিনি তাকালেন। "আমি মিথ্যে বলছি না—মিছে ভয় দেখাচ্ছি না। সত্যি আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। গা ছম্‌ছম্‌ করছে আমার—আজ ক'দিন থেকেই। কেন, কী জানি!"

"তোমার মাথায় পোকা আছে। তাছাড়া আর কিছু নয়।" ব'লে হরিশরণও কুচকুচে দরোজাটার দিকে তাকাল। আর, কী আশ্চর্য, এতদিনের বন্ধ দরজা যেন চাইতে না চাইতেই খুলে যায় হঠাৎ। হাওয়ার ঝাপটেই যেন।

"অ্যাঁ—একি!" চমক্‌ লাগে হরিশরণের। বোকার মতন চেয়ে থাকেন, ছায়ামূর্তির মত কী যেন তাঁর চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়—দোরগোড়ার ওধার দিয়ে। ব্লু-ব্ল্যাক্‌ কালির মতই গায়ের রঙ তার—খালি চোখ দুটো আঙ্গারের মতই জ্বল্‌জ্বলে। খোলা দরজাটার ভেতর

দিয়ে সেধারের বারান্দার অনেকখানি দেখা যায়। ছায়ামূর্তিটা এদিকে একটা যেন জলন্ত চাউনি হেনে মিলিয়ে যায়—সিঁড়ির ধারটাতেই!

"চোখের ভ্রম! আর কিছু নয়।" চোখ রগ্‌ড়ান সার হরিশরণ—নিজের চোখের এমন ধারা রগড় তাঁর ভালো লাগে না।

"দরজাটা খুলে গেল যে অমন ক'রে?" বিলাসমণিও আঁৎকে উঠেছেন।

"জোর হাওয়া দিয়েছে। ঝড় উঠেছে মনে হয়।" কর্তা মন্তব্য করেন—"সন্ধ্যের মুখেই ঝড়টা উঠলো এখন।"

"না না না—এ অসহ্য। এমনধারা আমি সইতে পারি না। পারবো না। অমন ন্যাকা সেজে থেকো না। তুমি এর একটা বিহিত করো।"

"চলো, দেখি গিয়ে।" ওঠেন সার হরিশরণ। অসার আলস্য ত্যাগ করে তাঁকে উঠতে হয়—বিলাসমণির কথায়। সদ্য-খোলা দরজা ভেদ করে তাঁরা এগোন—বারান্দা ধরে চলে যান তাঁরা—রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে—সিঁড়ি বরাবর।

হ্যাঁ, হাওয়া দিয়েছে সত্যিই। ঝোড়ো হাওয়ার মতই জোরালো। পুরনো বাড়ির ঝরঝরে হাড়-পাঁজরা মড় মড় করে উঠছে তার দাপটে। হাঁপানি রুগীর বুকের মতন সাঁই সাঁই লাগিয়েছে।

বিলাসমণি ভয় পেয়ে হরিশরণের কাছে ঘেঁষে আসেন। হাত চেপে ধরেন তাঁর। হাত ধরাধরি করে নামেন দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে। কয়েক ধাপ নেমেই—বিলাসমণি আঙুল বাড়িয়ে দেখান—বাড়ির নীচের তলার দিকটায় মস্ত হলটার মাঝামাঝি—ঐ—ও কী দৃশ্য? সারা দেহ তাঁর শিউরে ওঠে দেখতে না দেখতে।

"অদ্ভুত তো!" দেখে শুনে হরিশরণের চোখ কপালে ওঠে।

হলঘরটার মাঝামাঝি—পাতা পড়েছে সারি সারি। ঝাড়লণ্ঠনটা জ্বালানো হয়েছে। অনেক—অনেকদিনের পরে জ্বলছে এই ঝাড়টা। হলের এ-ধারে তোলা উনুনে হাঁড়ি চপেছে—পোলাওয়ের ভুরভুরে গন্ধে বাড়ি মাৎ। হলের ওপাশ থেকে আগন্তুক কাদের যেন কোলাহল শোনা যায়।

"এ কী! এ-সব কী!" হরিশরণের তাক্ লাগে। তিনি অবাক হন। তাঁর তোয়াক্কা না রেখে—তাঁর বাড়িতেই—কাদের এ অনধিকার প্রবেশ? হরিশরণ কি প্রহরীর শরণ নেবেন?

"বলছি না আমি তোমায় তখন থেকে? দেখলে তো এখন? তখন থেকেই কানে আসছে আমার। সাড়া পাচ্ছিলাম আমি। বুড়ো বয়সে তুমি না হয় কানে খাটো হয়েছো, আমি কিন্তু এখনো শুনতে পাই বেশ।"

কিন্তু চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হলেও, বিসংবাদ ভঞ্জনের থাকে। তখনো পোলাওয়ের হাঁড়িতে কাঠি দিচ্ছিলো একটা লোক, তার পাশে বড় বড় ভাজা মাছের দাগা বিরাট একটা কড়ায় ঢালাচ্ছিল আরেক জনা। হরিশরণ হাঁ করে দেখেন।

কি রকম বড় বড় মাছের দাগা দেখেছো!" বিলাসমণিকে তিনি দেখান—"আর ভাতের হাঁড়ি থেকে কি রকম মিষ্ট সুবাস—ওঃ!"

"তুমি কি এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে সঙের মতই? মাছের দাগা দেখবে আর পোলাওয়ের গন্ধ শুঁকবে হাঁ ক'রে?"

কর্তার হাঁ-করা অবস্থা দেখে গিন্নী হুংকার না দিয়ে পারেন না।

"তুমি ঠিকই বলেছো। বাড়িতে আমাদের উপদ্রব সুরু হয়েছে—সত্যিই!" ঘাড় নেড়ে সায় দেন শ্রীহরিশরণই। "এরা যে জলজ্যান্ত—না, সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই।"

"তা'হলে—তা'হলে কি আমাদের কিছুই করবার নেই এর?"

"নেই কেন? এক্ষুনি আমি তাড়াচ্ছি ওদের এখান থেকে—দেখো না। নিজ-মূর্তি ধরি আগে। পালাতে পথ পাবে না যাদুরা। দেখাচ্ছি দাঁড়াও!"

বলেই হরিশরণ টেকো মাথাটা খসিয়ে নিজের হাতে নেন—হাত দুটো লম্বা করেন যারপর নাই। কন্ধকাটা রূপ ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন তীরবেগে। রাণী বিলাসমণিও নাকি-সুর বার করে পিছু পিছু ধাওয়া করেন তাঁর।

---

* আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা *

মৌচাক

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

মনে পড়ে সেদিন ছিলো
সবুজ বৈশাখ,
শৈশবের আকাশময়
নীল চোখের ডাক।
জামরুলের গন্ধ ছিলো,
ভোমরাদের ছন্দ ছিলো,
তারই মধ্যে পৌঁচেছিলো
প্রথম মৌচাক,
আমার হাতে প্রথম মৌচাক।

সেদিন মৌচাকের পাতার
লাইনগুলির ফাঁকে
দেখেছিলাম মাইল-জোড়া
পথ গিয়েছে বেঁকে।
দু-দিকে তার ছায়া-করা,
মধ্যিখানে স্বপ্ন-ঝরা,
শাদা-কালোর দিগন্ত যায়
চমকে থেকে-থেকে।
অবাক পথ হঠাৎ মৌচাকে।

কত নতুন আলোয় খোলে
পাতার পর পাতা,
সূর্য ওঠার আগে যেমন
রঙের জাল গাঁথা।

তাই নিয়ে কল্পনার খেলায়
এলিয়ে-পড়া অলস বেলায়
রোদ্দুরে বিছিয়ে গেলো
খুশির খোলা পাতা,
খুলে গেলো মনের কোন খাতা।

তারপরে আজ কতকাল যে
হাওয়ায় গেলো উড়ে,
সেই সবুজের আঁচল ছেড়ে
এলেম কত দূরে।
এখানে সব বন্ধ ঘরে
চশমা এঁটে নামতা পড়ে,
কিংবা চলে উড়িয়ে ধুলো
ব্যস্ততার ক্ষুরে।
ভোরবেলার গন্ধ কত দূরে

আজকে মনের মৌমাছিদের
ছড়িয়ে-পড়া ঝাঁকে,
শুনতে পাই অন্য সুর
গুঞ্জনের ফাঁকে।
খানিক তার রূপকথার
না-ফুরোনো ভোরবেলার ;
সেই সুরে আজ গানের ফোঁটা
জমাই মৌচাকে,
একটু মধু মনের মৌচাকে।

ছোটদের বাড়ি

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

চেকোশ্লোভেকিয়া হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে ছোটদের জন্তে অনেক কিছু করা হয়। ইউরোপের প্রায় সব দেশেই আজকাল চমৎকার স্কুল আছে—যেখানে মার-ধোর নেই, নেই বদমেজাজী মাষ্টারমশাই, পড়া এবং খেলা এবং গান এবং ফূর্তির সমান ব্যবস্থা। শহরের মধ্যে ছোটদের পার্ক, আমোদ-প্রমোদের সুন্দর বন্দোবস্ত, তারপর ছোটদের থিয়েটার, ছোটদের ছায়াচিত্র, ছোটদের ক্লাব, এ-সবও প্রায় সব দেশেই আজকাল হচ্ছে।

কিন্তু সম্প্রতি চেকোশ্লোভেকিয়া ছোটদের নিয়ে এমন উঠে পড়ে লেগেছে যে, এদিক দিয়ে তাদের অগ্রণী বল্লে কিছু ভুল হবে না।

গত বছর প্রাহা শহরে বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা নিয়ে এরা একটা

আশ্চর্য জিনিস খাড়া করে তুলেছে। এর নাম রাখা হয়েছে—"ছোটদের বাড়ি"। শুধু প্রাহায় নয়, এই রকম "ছোটদের বাড়ি" চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রায় প্রত্যেক শহরেই একটা করে খোলবার আয়োজন চলেছে। এই ছোটদের বাড়ি সম্বন্ধেই আজ বলব।

এটাকে কি বলা যায়? দোকান বাড়ি? ইস্কুল? খেলাঘর? ছোটদের খাবার হোটেল? আমোদ-প্রমোদের জায়গা?—সব মিশিয়ে এটা একটা কিছু।

এই বাড়িটাকে প্রধানতঃ কাজে লাগানো হয়েছে দোকান বাড়ি হিসেবে। কলকাতার "কমলালয় ষ্টোর", "বেঙ্গল ষ্টোর" অথবা অধুনা-লুপ্ত "হোয়াইট্‌অয়েস্"-এর দোকান-বাড়ি, যেখানে কাঁচা বাজার ছাড়া আর সব কিছুই পাওয়া যায়, ঠিক সেই রকম। ইউরোপের শহরগুলিতে এই ধরনের দোকান-বাড়ি প্রচুর। সেখানকার লোকেরা বিশেষতঃ গৃহিণীরা এমনি দোকানে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করেন এবং দোকান-বাড়িতে গিয়ে বাজার করতে খুব ভালোবাসেন।

চেক্‌রা বল্লে, শুধু দোকান-বাড়ি চলবে কেন? মা-বাপেরা বাজার করবে আর বাচ্চারা বাড়িতে বসে থাকবে? এটা ঠিক নয়। তার চেয়ে ঐ দোকান-বাড়ির মধ্যে ছোটদের আমোদ-প্রমোদের কি ব্যবস্থা করা যায়? এই ভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করলে এবং সেই চিন্তাকে কাজে পরিণত করলে যা হয়, তারই ফলে দাঁড়িয়েছে এই "ছোটদের বাড়ি"। এটাকে আর দোকান-বাড়ি বলে লোকে ডাকে না—সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সেখানে এতই শিশু-আগন্তুকের ভিড় যে ছোটদের বাড়ি নাম এর সার্থক হয়েছে।

মফস্বল থেকে একটি মহিলা প্রাহায় এসেছিলেন কিছু কেনাকাটা করতে। তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে এসে তিনি উঠলেন। এসেই তিনি শুনলেন এই ছোটদের বাড়ির কথা। বন্ধুর মেয়ে হেলেন্‌কা—পাঁচ বছর বয়েস—মহিলাকে মাসী বলে ডাকে, সেও বল্লে—"মাসী তুমি ছোটদের বাড়ি দেখনি?"

এমন একটা জিনিস না দেখে শহর থেকে যান কি করে? মাসী তাই ঠিক করলেন, ঐখানেই বাজার করতে যাবেন আর সঙ্গে নেবেন হেলেন্‌কাকে।

হেলেন্‌কা সেজেগুজে চল্লো মাসীর সঙ্গে। সেদিনটা ছিল রবিবার—অনেক দোকানই বন্ধ, কিন্তু ছোটদের বাড়ি বিশেষ করে খোলা, আর ভিড়ও তেমনি। কলকারখানার মজুর-মজুরানীরা সেইদিন ছুটি পায়, সেইদিনই তাদের নানারকম খুঁটিনাটি জিনিস কেনার সুবিধে। তাদের ছেলেপিলেরাও বাপ-মায়ের সঙ্গে আসে দলে দলে। ছোটদের বাড়ির মধ্যে সবাই

সমান—মজুরের ছেলে আর মন্ত্রীর ছেলের মধ্যে কোনই তফাত করা হয় না। হেলেন্‌কা তার মাসীর সঙ্গে ছোটদের বাড়িতে গিয়ে উঠল।

মাসী তাকে একতলার প্রকাণ্ড একটা ঘরে ছেড়ে দিয়ে ঘণ্টাখানেক বাজার করবার ছুটি নিলেন। এটা হচ্ছে ছোটদের খেলাঘর—নানারকম খেলনায় একেবারে ঠাসা। যে কোন খেলনা চাও, যত চাও, কেউ আপত্তি করবে না। যে সব দিদিমণিদের হাতে ভার ছোটদের খেলাবার, তাঁরা সব সময় প্রস্তুত কোন খেলনা নিয়ে কি করে খেলতে হয় তা দেখিয়ে দিতে। খেলাঘরের কাঁচের জানলা দিয়ে মাসী দেখলেন, হেলেন্‌কা সেখানে গিয়ে একেবারে মশগুল হয়ে গেছে। আর সব ছেলেমেয়েরাও তাই। মাসীর মতো আরো অনেক বাপ-মা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছোটদের খেলা দেখাচ্ছিলেন। ছোটদের কিন্তু কারুরই খেলাঘরের বাইরে তাকাবার ফুরসৎ নেই। কখনো কখনো অবশ্য এমন হয় যে, কোনো বাচ্চা হঠাৎ তার মায়ের জন্যে কেঁদে উঠল। সে সময় দোকান-বাড়ির রেডিওর মধ্যে দিয়ে চারিদিকে খবর পাঠানো হয়। ঘরে ঘরে মাইক্রোফোন আছে, তাতে শোনা যায়—"শ্রীমতী নোভাক, ৩৫ নম্বর—খেলাঘরে একবার আসুন, আপনার বাচ্চা কাঁদছে।" এরকম ঘটনা ঘটে অবশ্য ক্বচিৎ, কদাচিৎ। উল্টোটাই হয় বেশী। খেলাঘর থেকে নিয়ে যাবার বেলাতেই বরং ছোটদের কান্না শোনা যায়।

ছোটরা তাদের খেলার জিনিস দেখছে

মাসী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে চল্লেন। ছ'তলা বাড়ীর এক-এক তলায় এক-এক রকম ব্যাপার। জিনিস কিনবেন কি, সব কিছু দেখতে দেখতেই তাঁর প্রচুর সময় চলে গেল।

প্রথমতঃ ছোটদের লাইব্রেরী—সব রকম বই, পত্রিকা, খবরের কাগজ, ছবির বই, ছোটদের পড়বার এবং দেখবার যত কিছু সব এখানে আছে। ছোটদের আনাগোনারও এখানে বিরাম নেই। তারপর ছোটদের পড়ার ঘর—নিস্তব্ধ আলো-ভরা ঘর—ছোটদের উপযুক্ত নিচু নিচু চেয়ার টেবিল, লেখার সরঞ্জাম। এখানে বসে আরামে যে কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তে লিখতে পারে।

থিয়েটার ঘরটা একটা দেখবার মতো জিনিস। অতি চমৎকার ষ্টেজ, সেখানে পুতুল-

নাচের খেলা হচ্ছে। দর্শকদের বসবার ঘরটা একটা কূয়োর আকৃতিতে গড়া, যাতে করে সকলেই ষ্টেজের কাছেই বসবার সুযোগ পায়। চেয়ারগুলিকে ইচ্ছামতো উঁচুর দিকে উঠিয়ে বা নিচের দিকে নামিয়ে নেওয়া যায়। মা-মাসীরা চেয়ার নিচু করে বসেন, ছোটরা উঁচু করে বসে। যে যতই ছোট হোক না কেন, তার থিয়েটার দেখবার কোন অসুবিধা হয় না। মাসী ঠিক করলেন, কেনা-কাটা সেরেই হেলেন্‌কাকে পুতুল-নাচ দেখাতে নিয়ে আসতে হবে।

ছোটদের উপযুক্ত নানারকম প্রদর্শনী এখানে সব সময় হয়। ছোটদের আঁকা ছবি, শিক্ষনীয় বিষয়, দর্শনীয় বিষয়, ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী লেগেই আছে। মাসী একটা ঘরে ঢুকে দেখলেন প্রাহার এক বিখ্যাত "গল্পদাদু" একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব জমিয়েছেন। ছোটদের বই-এর মলাটের ছবির এক প্রদর্শনী সেখানে হচ্ছে। সে মলাটই বা কতরকম—চেনা বই-এর মলাট, অচেনা বই-এর মলাট, ছোট-বড় রঙিন সেই সব মলাট আর যে বই-এর মলাট সেই বই নিয়ে নানারকম মজার মজার কথা আর,গল্প বলে ভদ্রলোক ছোটদের প্রায় ক্ষেপিয়ে তুলেছেন।

তারপর রেস্তোরাঁ—একটা ছোটদের, একটা বড়দের। ছোটদের রেস্তোরাঁয় ছোটদের উপযুক্ত সব রকম খাবার পাওয়া যায়। যুদ্ধের পরে সারা চেকোশ্লোভেকিয়ায় এখনও খাদ্যসংকট চলছে। অনেক রকমের সৌখিন খাবার, যেমন—বাদাম, চকোলেট, কমলালেবু এ-সব আজকাল দেশের প্রায় কোথাও-ই দেখা যায় না ; দেখা গেলেও দুর্মূল্য বস্তু হিসেবে বিক্রী হয়। সমস্ত দেশের মধ্যে ছোটদের বাড়ির ছোটদের রেস্তোরাঁ হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে এইসব দুষ্প্রাপ্য লোভনীয় খাদ্যবস্তু অতি সুলভ মূল্যে ছোটদের বিতরণ করা হয়।

এর পর মাসী দেখলেন একটা ফটো তোলবার দোকান, বাচ্চাদের চুল ছাঁটবার দোকান এবং একটি শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান—সেখানে ভাল ভাল ডাক্তারেরা বাচ্চাদের স্বাস্থ্য আর রোগ নিবারণের বিষয় মা'দের উপদেশ দেবার এবং সাহায্য করবার জন্যে সদাই প্রস্তুত।

দোকানের মধ্যে দেখলেন প্রাহার শ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাত পণ্য-সম্ভার সবই রয়েছে সেখানে। কাপড়, জুতো, জামা, হাঁড়িকুড়ি, পেয়ালা-পিরিচ, ঘড়ি, কলম, খাতা, রঙ, তুলি; বই, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব কিছু এবং প্রচুর খেলনা। চারিদিকেই বাচ্চাদের খেলার জিনিস। যা কিছু নতুন খেলনা, কলের খেলনা, স্প্রীংএর খেলনা, কাঠের খেলনা, টিনের খেলনা, লোহার খেলনা, সাজাবার, ওড়াবার, গড়াবার, ঠেলবার, ছোঁড়বার, ভাসাবার খেলনা ; কচি ছেলের খেলনা, মাঝারি ছেলের খেলনা, বড় ছেলের খেলনা। সব রকম খেলনাই অন্য কোনো দোকানে দেখার আগে সব প্রথম এইখানে দেখা যায়।

সব শেষে মাসী উঠলেন ছাদে। সে আর এক অপূর্ব ব্যাপার—ছ'তলার ছাদের উপর চমৎকার সাজানো একটি বাগান। ফুলে ফুলে ভরা—দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাসী ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ব'লে ফুলের কেয়ারির পাশে একটি বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। বাগানের পাশেই দেখলেন একটি গোল ঘর। বাগানের মালিককে জিজ্ঞেস করতে সে বল্লে—"ওটা একটা 'অবসারভেটারি'। ওখানে বড় বড় দূরবীন আর অন্যান্য যন্ত্র আছে। রাত্রে ছোটদের আকাশের তারা দেখানো হয়। নক্ষত্র আর চাঁদের বিষয় যা জানবার তারা এখানে এসে শেখে।" মাসীর সব কিছুই দেখা হ'ল। বাকী শুধু হেলেন্‌কাকে নিয়ে পুতুল-নাচ দেখা। তিনি বেঞ্চি থেকে উঠলেন।

মালী এসে বল্লে—"আপনি তো অনেক জিনিস কিনেছেন দেখছি—আপনার 'ক্যাশ মেমো'র নম্বর মিলিয়ে দেখেছেন ?"

মাসী বল্লেন—"নম্বর আবার মিলিয়ে দেখবো কি ?"

মালী বল্লে—"নিচে গিয়ে মিলিয়ে নেবেন। দশটা করে নম্বর বাদ দিয়ে প্রত্যেককে একটা করে ষ্টীমার পার্টির টিকিট উপহার দেওয়া হচ্ছে। ছোটদের বাড়ি থেকে প্রতি হপ্তায় একটা করে ষ্টীমার পার্টির ব্যবস্থা করা হয়। আপনার নম্বর মিলে যায় তো আপনার বাচ্চাকে নিয়ে এই পার্টিতে যেতে পারবেন। গত হপ্তায় আমি আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলুম—ভারী আমোদ।"

মাসী নিচে গিয়ে দেখলেন তাঁর টিকিটের নম্বর মেলেনি। কিন্তু তাতে আর দুঃখের কি আছে ? পুতুল-নাচের পর তাঁরা ছোটদের রেস্তোরাঁয় ঢুকে এমন চমৎকার ষ্ট্রবেরী আর আইসক্রীম খেলেন যে ষ্টীমার পার্টির কথা তাঁদের আর মনেই রইল না।

---

* সার্থক মানব-জন্ম *

সর্ব-দেশের, সর্ব-ধর্মের এবং সর্ব-জাতির উর্ধে আছেন ভগবান, সেকথা একান্তভাবে স্বীকার করতে হবে, আর অশেষ যত্ন এবং নম্রতার সঙ্গে আমাদের অন্তরের মধ্যে তাঁর ইঙ্গিত, তাঁর নির্দেশ খুঁজে বার করতে হবে, এবং অবিচলিত পদে সেই নির্দেশ মেনে চলতে হবে তবেই হবে সার্থক আমাদের মানব-জন্ম।

ছন্দে শুধু কান রাখো

* শ্রীঅজিত দত্ত *

মন্দ কথায় মন দিয়োনা
ছন্দে শুধু কান রাখো,
দ্বন্দ্ব ভুলে মন না দিলে
ছন্দ শোনা যায় নাকো।
ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে
ছন্দ আছে জ্যোছনাতে,
দিন দুপুরে পাখীর ডাকে
ঝিঁঝির ডাকে ঘোর রাতে।
নদীর স্রোতের ছন্দ যদি
মনের মাঝে শুনতে পাও
দেখবে তখন তেমন ছড়া
কেউ লেখেনি আর কোথাও।
ছন্দ বাজে মোটর চাকায়
ছন্দে চলে রেলগাড়ি
জলের ছন্দে তাল মিলিয়ে
নৌকো জাহাজ দেয় পাড়ি।
ছন্দে চলে ঘড়ির কাঁটা
ছন্দে বাঁধা রাত্রি-দিন,
কান পেতে যা শুনতে পাবে
কিচ্ছুটি নয় ছন্দহীন।
সকল ছন্দ শুনবে যারা
কান পেতে আর মন পেতে
চিনবে তারা ভুবনটাকে
ছন্দ সুরের সঙ্কেতে।
মনের মাঝে জমবে মজা
জীবন হবে পদ্যময়,
কান না দিলে ছন্দে জেনো
পদ্য লেখা সহজ নয়॥

মা বললেন, ওগো শুনছ—পাঁজিখানা একবার দেখ তো—কাল বোধ হচ্ছে খোকনের জন্মদিন।

বাবা হেসে জবাব দিলেন, চমৎকার! নিজের ছেলের জন্ম-তারিখ পর্যন্ত ভুলে বসে আছ!

মা বললেন, এতো আর ইংরেজী মতের জন্মদিন নয়—পূর্ণিমা-মুখো চতুর্থীতে খোকনের জন্ম হয়—তিথিটা ঠিক করে নিতে হবে তো।

বটে—তা তিথিরা তো সব বছরে এক জায়গায় থাকেন না—আগিয়ে-পিছিয়ে আসে। ওতে জন্মমাসটা পর্যন্ত পালটে যেতে পারে!

তা হোক—তিথিটা তুমি ভাল করে দেখ। বলে পাঁজিটা তিনি খোকনের বাবার হাতে দিলেন।

খস্ খস্ পাতা উল্টানোর শব্দে খোকন বুঝলে—বাবা তিথিটাকে পাঁজির পাতা থেকে উদ্ধার করছেন। ওর মনে কৌতুহল হ'ল যথেষ্ট—তবু চোখ মেলে সে কৌতুহলকে প্রকাশ করতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভারী আনন্দ হ'ল। সত্য, এতকাল পরে ওর জন্মদিনের হিসাব কষা বাপ-মায়ের মনেও সুরু হয়েছে! কতই বা তার বয়স! ক্লাস ফোরের ছাত্র সে। এতদিন বাড়ীতে প'ড়ে মাত্র মাস চারেক হ'ল বড় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। ওর শহর-বাসের পরমায়ুও সেই অনুপাতে দীর্ঘ নয়। পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে—বাবার মুখে আজব শহরের অনেক গল্প শুনে—কল্পনায় তাকে প্রায় স্বর্গপুরীতে ঠেলে তুলেছিল। শহরে এসে অবশ্য সে কল্পনার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে, তবু নানান নতুন জিনিসের সমারোহ মনের মাঝে অদ্ভুত দেখায় ও ভাল লাগায়। তারাই সেই কল্পনার রঙটাকে বেশ খানিকটা উজ্জ্বল করে রেখেছে। নতুন পথ আর নতুন সঙ্গীর সঙ্গে এর সঙ্কীর্ণ আকাশের কৃপণ নীলটুকুকে ওর ভালই লাগে। সব সময়ে অনেক-পাওয়া জিনিসে যেমন জিনিসটার মহিমা ঠিকমত

বোঝা যায় না, এবং জিনিসটাকে দেখার কৌতূহলও তেমন উগ্র হয়ে ওঠে না—তেমনি ছিল পাড়াগাঁয়ের প্রকৃতি। শহরে এসে ওর মন ফেলে-আসা নিত্য-দেখা অবহেলার বস্তুকে—স্মৃতিতে ফুটিয়ে তুললে গভীরভাবে আর সেই কারণেই, মানুষের সৃষ্টির পাশে হারানো প্রকৃতি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠল ওর কাছে। সে যাই হোক—গেল বার পর্যন্ত ওর মনে হয়নি—সব মানুষের জীবনে একটি দিন আছে যা বিশেষরূপে স্মরণীয়। এর আগের কয়েকটা বারের কথা অবশ্য মনে পড়ছে। সকালে উঠেই ঠাকুরমা বলতেন—আজ একটু পায়েস করো বউমা—খোকনের জন্মদিন।

কোন কোন বার নতুন কাপড় পরে—চন্দনের ফোঁটা কপালে নিয়ে ওদের গৃহ-দেবতা শালগ্রাম শিলার সামনে গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হ'ত। প্রার্থনা করত, হে ভগবান—হে ভগবান—

কিন্তু সে প্রার্থনার ভাষা তার মনে নেই।

অত কচি বয়সে প্রার্থনার বস্তু যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না—তেমনি সে চাওয়ার একাগ্রতাও থাকে না। সুতরাং অভিভাবকের সুরে সুর মিলিয়ে হয়ত বলেছিল: হে ভগবান, আমায় বিদ্যা দাও—তার সঙ্গে দাও সম্পদ—তার সঙ্গে স্বাস্থ্য এবং আনন্দ আর দীর্ঘ পরমায়ু। এতগুলি প্রার্থনীয় বস্তুর কোনটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।—বিদ্যা কি বস্তু, সম্পদ নিয়ে কি করে মানুষ—আনন্দের স্বাদ ও পরমায়ুর অর্থ—কিছুই তাকে ভোলাতে পারেনি।···

এর পর শহরে এসে দু'বার বাসা বদল করেছে তারা। এঁদো-গলির একতলায় স্যাঁত-সেঁতে ভিজে ঘর থেকে—দোতলার আলো-বাতাস-ভরা ঘরে চলে এসেছে। মাথার ওপরের আকাশ কিছু চওড়া হয়েছে এবং জানালায় বসে অনেকখানি দূরের চারতলা বাড়ীর কোণ পর্যন্ত শহরের রূপটাকে দেখা যায়। চাকরির ক্ষেত্রে নাকি বাপের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। সেই সূত্র ধরেই জন্মদিনের ব্যাপারটা একটু নতুন করে জাঁকজমকের আভাস দিচ্ছে।

২

খুব সকালেই ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘরে মিটমিটে আলো জ্বলছে—মা শুয়ে আছেন পাশে। জানালার একটা কপাট খোলা—তা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বাইরে রাত্রির ঘোর রয়েছে লেগে। মশারির ভেতর থেকে আকাশ দেখা যায় না—নক্ষত্রও না। তবু খোকন বুঝতে পারছে—ওই নীল মখ্‌মলের পরদায় চুনি-পান্নার কুঁচোগুলো ছড়ানো রয়েছে। গভীর রাতের শোঁ শোঁ শব্দ-ভরা ভারী বাতাস ভোরের দিকে তরল হয়ে আকাশের অন্ধকার মুছিয়ে দিচ্ছে। এখুনি পাখীরা ডেকে উঠবে—দূরে বাজবে একটানা ভোঁ

—কলের বাঁশী—রাস্তায় পাইপ দিয়ে জল ছড়ানোর ছড়্ ছড়্ শব্দ—দুয়োরে দুয়োরে কড়া-নাড়ার ধুম। তারপর গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি আর ধোঁয়ার চাপ। গল্পে শোনা দৈত্যটাকে বোতলের ছিপি খুলে এই শহরের মাঝখানে কারা ছেড়ে দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কৌতুক দেখবে। ভোরের আলো ফুটবে তারও অনেক পরে, আর খোকন উঠবে সেই বেলায়। তখন চারিদিকে রোদের তাত—দিনমানটা যেন জরো-রুগীর মত মানুষকে জ্বালাতন করছে মনে হবে। যাহোক এমনি করে রোজই আসে নতুন দিন—ওটা প্রত্যেক দিনের জন্মদিন বুঝি!

রোজ খাওয়ার পর শোওয়া তারপর ঘুম—তারপর সকাল। জেগে উঠেই মনে হয় দেহটা তাজা হয়ে উঠল। কোথা থেকে খুশির জোয়ার নামে দেহে। ইচ্ছে করে সারাদিন ছুটোছুটি—লাফালাফি চীৎকার করে বেড়ায়। আরও কত কি ইচ্ছা জাগে—সেগুলি তো স্পষ্ট নয়, তাই সঙ্গী-সাথী কাউকে মেরে—কাউকে বা রাগিয়ে—কারও জিনিস ভেঙে—গোছানো ঘর আগোছালো ক'রে—বকুনি ও আদর খেয়ে দিনটা যেন ঝমাঝম বাজনার তালে কোথায় মিলিয়ে যায়।

কিন্তু খোকন দুষ্টু নয়। কারও সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে বেশীক্ষণ মুখভার করে থাকতে পারে না—দু'দণ্ড পরেই সেধে ভাব জমায়। বলে:

বলতো ডাব—ডাব।
তা'হলে ভাব—ভাব।

কাল যার সঙ্গে দিনে বার দুই আড়ি আর ভাব হয়ে গেছে, তার কথাটাই ঘুম ভেঙে উঠে মনে পড়ল। সন্ধ্যেবেলায় খেলা শেষ করে যখন ঘরে ফিরেছিল—তখন বোধকরি আড়ির পালাটা শেষ হয়নি। না, আজ জন্মদিনে ও পালাটা শেষ করে দিতেই হবে।

মুখ হাত ধুয়ে জামা গায়ে দিয়ে মাকে বললে খোকন, মা শিবুদের বাড়িতে যাচ্ছি।

মা শাসন করলেন, আজ না তোমার জন্মদিন! বলেছি না সারাদিন ভাল ছেলে হ'য়ে থাকবে—কারও সঙ্গে ঝগড়া করবে না—সমস্ত দিন হৈ হৈ করে খেলা করবে না—সকালে উঠেই যাই-যাই করবে না।

বকুনি খেয়ে খোকনের চোখের কোলে কোলে প্রায় জল এসে গেল। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিলে ও। মা শুধু শুধু সন্দেহ করছেন ওকে। ওকি ঝগড়া করবার জন্য শিবুদের বাড়িতে যাচ্ছে—না ঝগড়া মেটিয়ে নিতে? এই তো সবেমাত্তর সকাল হ'ল—সারাদিন হৈ হৈ করে খেলা করার কথাই বা উঠছে কেন! আর সকালে উঠে ক'বারই বা সে মায়ের কাছে খাবার চেয়েছে!

মা ওর অভিমানের তাপটা হয়তো টের পেলেন—তাই সস্নেহে ওর কাঁধের ওপর ডান হাতখানি রেখে বললেন, কিরে—রাগ করলি বুঝি? ওমা চোখে জল! কি এমন বলেছি তোকে যার জন্য—

এই কথায় চোখের জল কি চোখের পাতায় আটকে রাখা সম্ভব মনে কর? মা দারুণ অপ্রতিভ হয়ে ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

চোখের জলে মায়ের আঁচল ভিজিয়ে তবে খোকন শান্ত হ'ল। ওর মন অদ্ভুত তৃপ্তি আর আনন্দে ভরে উঠল। জানালার মাথা থেকে টেনিস বলটা টেনে নিয়ে ও লাফাতে লাফাতে ছুটল শিবুর উদ্দেশে। হাঁ—এই বলটার স্বত্ব-সাব্যস্ত নিয়েই কাল শিবুর সঙ্গে আড়ি হয়েছিল।

৩

কেন বল নিয়ে শিবুর সঙ্গে আড়ি হয়েছিল সে কথা শুনলে তোমরা হাসবে। তবু সে ঘটনা খোকনের মনে ছবির মত ফুটে উঠল। বলটা তার নয়—শিবুরও নয়। পাড়ার ক'জন ছেলেতে মিলে এটা কিনেছে। মাত্র এক আনা করে চাঁদা দিয়ে ছ'জন ছেলেতে মিলে। শিবু আর খোকন দিয়েছিল ছ'আনা করে। ওরা ছ'জনে আর সকলের চেয়ে বয়সে বড়—বুদ্ধিতেও বড়। ওরা ছ'জনেই প্রথমে ঠিক করে বড়দের মত একটা খেলার দল গড়তে হবে। বড়রা যাকে ক্লাব বলে—সেই জিনিস—তবে নিয়ম-কানুনগুলো ঠিক সেইমত নয়। একটি কাগজকে আট ভাঁজ করে তৈরী করলে একটি খাতা—তাতে চাঁদা দাতাদের নাম লিখলে শিবু। খোকন বললে, ক্লাবের একটি নাম দিতে হবে। কি নাম? সবাই ভাবতে বসলো। হঠাৎ খোকনের মনে কিছুদিন আগেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। ঐদিন বেলা বারোটায় শাঁখ বাজিয়ে—আর ফটোতে ফুলের মালা ঝুলিয়ে যাঁর জন্মদিন ওরা পালন করেছিল—তিনি বাংলার সুভাষচন্দ্র—ভারতবর্ষেয় নেতাজী। ওই সহজ বানানটি বেছে নিয়ে ওরা নামকরণ করলে 'নেতাজী সঙ্ঘ'। কিন্তু যে জন্য নেতাজী জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্ব-ভারতীয়ের শ্রদ্ধা অর্জন ক'রে ওই নামটি পেয়েছিলেন—তার তথ্য ভাল মত না জানাতে—শিবুদের তিন তলার ছাদে খেলতে খেলতে হঠাৎ শিবু বললে, বাঃ রে, বলটা খালি খালি তুই মারবি নাকি!

মারব না কেন—নিজে পারিস না ব'লে—

এমনি দু'চার কথা কাটাকাটি হতে শিবু বললে, ভারী তোর ফুটুনি—আজ আর খেলতে হবে না। বলে বলটি সে তুলে নিতেই খোকন ছোঁ-মেরে ওর হাত থেকে বলটা নিয়ে বললে, ইস্—তোর একার বল নাকি?

শিবুও রুখে উঠল, তোরই একার বল নাকি! ব'লে যেমন খোকনকে ধরতে এল—খোকন অমনি বল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে ছুটে পালালো।

ব্যাপারটা খানিক কোলাহল ও হইচই-এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। একবেলার মধ্যে নেতাজী সঙ্ঘের এমন অবস্থা হবে এ কথা কি ভাবতে পেরেছিল কেউ!

৪

যাইহোক—মনটা ওর কাল থেকেই খুঁত খুঁত করছিল। কেবলই মনে হছিল—এটা ঠিক হয়নি—ঠিক হয়নি। শিবুদের বাড়ির কাছে এসে—নতুন করে বিচার করতে বসলো—দোষটা কার? মন বললে, দোষটা শিবুরই। ও কেন বলটা কেড়ে নিতে গেল তার হাত থেকে?—যেন ওর পয়সাতেই···

না—বলটি সঙ্গে এনেই যত মুশকিল হয়েছে। এটা এখন ফিরিয়ে দেওয়া কি কম লজ্জার! এ বল তো শিবুর নয়—তবে ওকেই বা ফিরিয়ে দেবে কেন! ফিরিয়ে দিতে গেলে শিবু যদি বলে, কিরে—মারখাবার ভয়েই বুঝি—

কথাটা মনে হতেই খোকন ফিরলে। হঠাৎ কাঁদের ওপর এসে পড়ল একখানা ভারী হাত। ভারী গলায় প্রশ্ন হ'ল—আরে ফিরছ কেন খোকনবাবু?

শিবুর কাকা! খোকনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।—শিবুর কাকাকে তো ওরা জানে ভাল মতেই। এখুনি উনি ক্লাস খুলে বসবেন এই পথে। জিজ্ঞাসা করবেন, আহ্নিক-গতি কাকে বলে বল তো রে? মৌর্য বংশের সব চেয়ে বড় রাজা কে ছিলেন? দুষ্টু ছেলের ইংরেজী কি—আর ঊর্দ্ধ বানান?

কিন্তু ওর ভয় ভাঙিয়ে উনি বললেন, তোমাদের নাকি একটা সমিতি হয়েছে—নাম তার নেতাজী সঙ্ঘ। বাঃ খাসা নাম! কেন লোকে ওঁকে নেতাজী বলে—জান সে গল্প? শোন।

খোকন নির্ভয়ে ওঁর সঙ্গে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলো। উনি সঙ্ঘের খাতায় নামগুলি দেখে প্রত্যেক ছেলেকে ডাকিয়ে আনালেন। বললেন, তোমাদের একটা গল্প বলব—শোন।

যে ভাবে দূর প্রবাসে—স্বদেশ-হারা নানান জাতির ভারতীয়দের নিয়ে নেতাজী আজাদী দল গড়েছিলেন—নিয়মকানুন আর প্রীতি-ভালবাসায় বেঁধে তাদের তৈরী করেছিলেন—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যোদ্ধা-জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য, কত দুঃখ বিপদ মাথায় নিয়ে—অসীম ধৈর্য, ত্যাগ, অভ্যাস করিয়ে সেই রণ-নিপুণ যোদ্ধৃদলকে দিয়ে ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম প্রোথিত করেছিলেন—আজাদী পতাকা, নেতা হয়েও সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে ভাগ

করে খেয়েছিলেন—ঘাসের খাবার, বলেছিলেন—মাতৃভূমির জন্য তোমরা আমাকে রক্ত দাও—আমি দেব তোমাদের স্বাধীনতা···

ওরা মন্ত্রমুগ্ধের মত সে কাহিনী শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে চক্ষু অশ্রুসজল হ'ল।

গল্প শেষ করে উনি বললেন, তোমাদের ওপর ভারী খুশি হয়েছি—তোমরা তাঁর নামটি বেছে নিয়েছ বলে। এ নামের মর্যদা সব সময়ে রাখবে আশা করি।

বাইরে এসে খোকন শিবুর হাত ধরে বললে, বল তো ভাব? সঙ্গে সঙ্গে বলটা ওর হাতে গুঁজে দিলে।

শিবু হেসে বললে, দূর—ওটা আমার একলার নাকি! বিকেলে নিয়ে আসবি—সবাই মিলে খেলব।

তোর কাছে রেখে দে।

তা কেন—তুই তো ক্যাপ্টেন—তোর কাছেই থাকবে এটা। শুনলি নে—নেতাজীর হুকুম সবাই মেনে চলতো!

খোকন খুব খুশি হয়ে উঠল। বললে, আজ আমার জন্মদিন—তোদের সবাইয়ের নেমন্তন্ন—আসবি তো?

নিশ্চয়—নিশ্চয়—চপ খাওয়াতে হবে কিন্তু। সবাই এক সঙ্গে কোলাহল করে উঠল।

---

* ছবির ধাঁধা *
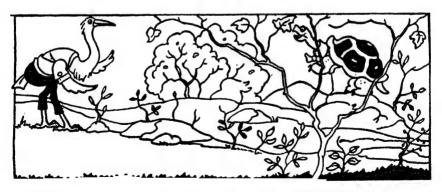
এই ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল-জলার মধ্যে কোথায় একটি কুমীর লুকিয়ে আছে উল্টে-পাল্টে হাতড়ে বার করো
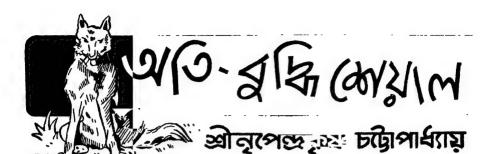
[চরিত্র : শেয়াল, শেয়ালের বাচ্ছা, মুরগী, কুকুর]

প্রথম অংশ

শেয়ালবাচ্ছা। হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া
ভোর হুয়া
হুক্কা হুয়া·· য়া···য়া···

শেয়াল। এই বুঝি হচ্ছে পড়া ?
বল্ নাম্‌তার ছড়া···

বাচ্ছা। হুক্···হুক্···হুক্···কা···
একটা মুরগী দুটো ছা···
ক্ষিদে পেয়েছে···হুক্কা হুয়া···

শেয়াল। ক্ষিদে পেয়েছে, তা কি করবো ?
বয়স হয়েছে, চার খা !

বাচ্ছা। কাল গিয়েছিলাম চরতে,
পেটের খুলি ভরতে,
কচি কচি মুরগীর ছা···
উল্টে পেলাম লাঠির ঘা !

শেয়াল। বারণ করলে শুনবি না···
দিনের বেলা যাবি না।
দিনের বেলা গর্ত্তে বসে
ভাল ছেলে হাড় চোষে।
[দূরে—মুরগীর ডাক]

বাচ্ছা। ঐ শোন বাবা ! মিষ্টি পাখী
দাও না ধরে···

শেয়াল। ওরে,
দিনকাল পড়েছে বড়ই মন্দ,
মুরগীগুলো করছে সন্দ,
মাটিতে আর ফেলে না পা,
পাঁচিলে বসে ঝাড়ে গা···

বাচ্ছা। হুক্কা হুয়া দেবো লাফ্ ?

শেয়াল। তা'হলেই তো হবে সাফ্ !
করতে হবে নতুন ফিকির,
তুলতে হবে নতুন জিগির !
[একটু কাছে···মুরগীর ডাক]

বাচ্ছা। যা হোক্ একটা করো কিছু
লুকিয়ে আছি তোমার পিছু।

শেয়াল। চুপ্‌টি করে দেখ্ তা'হলে
কেমন করে ফিকির ফলে।
[মুরগীর ডাক—কাছে]

শেয়াল। নমস্কার ওহে মোরগ মহাশয়
শুভদিনে আজ সুপ্রভাত হয়।

মুরগী। [সন্দিগ্ধ স্বরে স্বগত]
কোঁক···কোঁ···

ওরে ফাদার, এ যে শেয়াল খুড়ো,
ঘাড় মটকাবার শমন-বুড়ো।

[প্রকাশ্যে] বলি অ খুড়ো, এত সকালে
ব্যাপার কি ?

শেয়াল। আরে ছি !
শোননি সুখবর···?
বড়ই জবর···

মুরগী। [প্রশ্নভাবে]
কোঁকর···কোঁ ?

শেয়াল। কাল রাতে,
সকলে মিলে এক সাথে,
সিংহী মামা বাঘা খুড়ো,
হাঁদা হরিণ, মানুষ বুড়ো,
কেউ আর কারো করবে না হিংসে,
জগৎ জুড়ে হয়েছে এই মীমিংসে।

মুরগী। বল কি ! এমন তর !
খুড়ো আমায় ধর ধর !
ভেতর থেকে সোঁ সোঁ
উঠছে সুখের কোঁ কোঁ···
কোঁকর কোঁ···
কোঁকর কোঁ···

শেয়াল। তাই আজ ভোর না হতে
বেরিয়েছি রোঁদে।
মিলনের নতুন গান
পাড়ায় পাড়ায় করতে দান।

মুরগী। নতুন গান ?

শেয়াল। শুনবে ?
শুনলে পরে নেচে উঠবে প্রাণ !

শোন তা'হলে,
ধরছি তান···

দ্বিতীয় অংশ

[শেয়ালের গান]

হুক্কা হুয়া
হুক্কা হুয়া
সব্ মিল্ গিয়া ॥
সব্ মিল্ গিয়া ॥
সব্ এক্ হুয়া
হুক্কা হুয়া।
কোঁকর কোঁ
কোঁকর কোঁ
কেউ কারু নয় ফো ॥
কেউ কারু নয় ফো ॥
ঘেউ ঘেউ···ঘেউ···উ···
হিংসে করবে না কেউ···
হালুম্···হালুম···হাঁই···
সবাই ভাই ভাই···
বক্ বকুম্ কুম্ ॥
বক্ বকুম্ কুম্ ॥
ঘরে ঘরে আজ মিলনের ধূম—
প্রাণে প্রাণে আজ মিলনের ধূম···

মুরগী। [সন্দিগ্ধভাবে]
কোঁকর কোঁ···ওঁ···ওঁ···

শেয়াল। তাই, আর কেন ভাই দূরে থেকে
বাড়াও প্রাণের জ্বালা,
নেমে এসো পরিয়ে দিই
মিলন-ফুলের মালা।

মুরগী। কোঁকর কোঁ…কোঁ…ওঁ…
দাঁড়াও…দাঁড়াও…
শেয়াল…
কি হলো ভাই ?
ঘাড় উঁচু করে দেখছো কি ?

মুরগী। এদিক পানে আসছে যেন কারা !
[দূরে কুকুরের ডাক]
শেয়াল [স্বগত] সর্বনাশ ! আসছে
বোধ হয় কুকুর বেটা
ঘটলো দেখি বিষম ল্যাটা…
[প্রকাশ্যে]
বলি অ ভাই মিষ্টি পাখী…
মিছে করছো দেরি,
নেমে এসো ত্বরা করি…

মুরগী। আরে খুড়ো,
কেন করছো তাড়াহুড়ো ?
আসছে ঐ ডালকুত্তার দল…
ভালই হবে,
সবাই মিলে গলাগলি
গাইবো মিলন-মঙ্গল !
[কাছে—কুকুরের ডাক]

শেয়াল। ব্যাপার কি জানো ?
ওরা যে শোনে নি এখনো ?
[আরো কাছে—কুকুরের ডাক]
আর নয় দেরি,
ভালয় ভালয় সরে পড়ি…

মুরগী। আরে খুড়ো, যাচ্ছো কোথা ?
সবাই মিলে ভাই ভাই,
তবে কেন পালাই পালাই ?

শেয়াল। ভাল কথা সবাই কি
মানতে রাজী ?
ঐ কুকুরগুলো নেহাৎ পাজী…
হায় ! হায় ! করলুম্ কি ?
এ যে এসে গেল…
[কুকুরদের তাড়াকরা ডাক…
শেয়ালের আর্তনাদ…
মুরগীর আনন্দ-চীৎকার…]

দুষ্টু-দলের কারসাজি

শিল্পী : শ্রীনিশীথেব বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির প্রতি

শ্রীকালিদাস রায়

ওগো কবি, কল্পরথের রথী,
স্বপ্নলোকে ভাবের লোকে অবাধ তোমার গতি।
দেববালারা যেথায় গাঁথে পারিজাতের মালা,
নাগবালাদের মাথায় যেথায় হাজার মাণিক জ্বালা।
কিন্নরেরা গান করে আর বিদ্যাধরে নাচে,
লক্ষ রতন ফলে যেথায় যক্ষপুরীর গাছে,
যাও সেখানে স্বর্গে যেথায় বয় অমরাবতী
ওগো কবি কল্পরথের রথী।
ওগো কবি মানস রথের রথী,
মরু-মেরুর বিজন পথেও অবাধ তোমার গতি।
বরফ-ঘরে যেথায় মানুষ কাটায় গভীর শীত,
মরীচিকা নাচে যেথায় গায় বেদুইন গীত,
নিবিড় বনে পিগ্‌মি যেথায় জেব্রা চ'ড়ে ঘুরে,
সারা ভুবন দেখ্‌ছ বসে ধবলগিরির চূড়ে,
দেশ-বিদেশে দেখছ দেশের সুমতি দুর্মতি,
ওগো কবি মানসরথের রথী।
ওগো কবি স্মৃতিরথের রথী,
এই ভারতের অতীত পথে অবাধ তোমার গতি।
তুমি ঋষির আশ্রমে যাও সরস্বতীর তটে,
শীলভদ্রে করছ প্রণাম তাঁর নালন্দা মঠে।
উরুবিল্বে দেখছ তুমি মহাবোধির প্রভা,
দেখছ চোখে উজ্জয়িণীর নবরতন সভা।
যাচ্ছ যেথায় বুদ্ধে পূজে রাণী বিলাসবতী
ওগো কবি স্মৃতিরথের রথী।
ওগো কবি স্বপ্নরথের রথী,
অনাগত যুগেও তোমার নিত্য অবাধ গতি।
ভবিষ্যতের বঙ্গে তোমার নেই দীনতার লেশ,
নাইক ব্যাধি ক্ষুধার পীড়ন নেই অসূয়া দ্বেষ।
তোমার ভারত শৌর্যে-প্রেমে সবার পূজা পায়।
পণ্যে-ভরা হাজার তরী দেশ-বিদেশে ধায়।
সেই ভারতের স্বপ্নলোকে ধর্মে সবার মতি।
ওগো কবি! স্বপ্নরথের রথী।

তোমরা যদি কখনও মাজদিয়া ইষ্টিশানে নেবে হাঁটা পথে সোজা দক্ষিণ মুখো যাও, ভাজনঘাট আর নোনাগঞ্জ পেরিয়ে, খাটুয়োর বিল পার হয়ে পেঁপুলবেড়ের আমবাগান পার হও, ওই পেঁপুলবেড়ে আর ফতেপুরের মাঝখানে যে মাঠটা পড়বে ওইখানে অন্ধকার কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে হঠাৎ শুনতে পাবে বাঘের ডাক। আশেপাশে কোথাও জঙ্গল নেই, শুধু ধুধু করা মাঠ। বাঘ থাকবার কোনও জায়গাই নেই—তবু বাঘের ডাকে তোমরা চম্‌কে উঠবে। ভয় পাবে। কিন্তু ভয় তোমরা পেও না। ও বাঘ নয়, কিছু নয়। তোমরা শুধু ভেবো ওই বাঘের ডাকের পেছনে এক রহস্য লুকিয়ে আছে। ও এক বহু শতাব্দী আগের রহস্য। ও ওই বাঘমারির ভিটের রহস্য···

অনেক কাল আগের কথা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তখন বাঙলার দেওয়ান। পর্তুগীজরা বাঙলার নদীপথে ডাকাতি করে বেড়ায়। বাঙলার জায়গায় জায়গায় তখন নানা রাজা, নানা জমীদারের প্রতাপ। কেউ কাউকে মানে না। রাত্তির বেলা রাস্তা চলতে ভয় করে। টাকা-কড়ি নিয়ে পথ-চলা বিপদ। এ সেই যুগের কাহিনী।

পতিরামের ভিটে ছিল ওইখানে। একদিন পতিরামের কী খেয়াল হলো—বলা নেই কওয়া নেই, নিস্তারিণী আর তার এক বছরের ছোট ছেলে রাখোহরিকে রেখে বেরিয়ে পড়লো যে-দিকে দু'চোখ যায়। চোর ডাকাতের রাজ্যি। কোথায় মানুষটা গেল! প্রাণে বেঁচে আছে কিনা কে জানে—বছরের পর বছর কেটে গেল। তবু নিস্তারিণী সকাল-বিকেল সন্ধ্যেয় রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকে। আর রাখোহরিকে কোলে করে চোখের জল মোছে।

বছর ছয়েক পরে ভর-সন্ধ্যে বেলা পতিরাম একদিন বাড়ী এসে হাজির। বড় বড় গোঁফ দাড়ি হয়ে গেছে। চেনাই যায় না। বলে—ফিরে এলাম কামরূপ থেকে—

নিস্তারিণী বলে—এমন ভাবিয়ে তুলেছিলে—একটা খবর নেই, কিছু নেই—শুনিতো কামরূপে গেলে নাকি ভেড়া-ছাগল করে রাখে—তুমি যে প্রাণে বেঁচে ফিরেছ, এই সর্বমঙ্গলার দয়া—

পতিরাম বলে—ভেড়া ছাগল আমাকে করবে কি ছোট বউ, আমিই কত মন্তরতন্তর শিখে এসেছি—মন্তরের চোটে পাখী হয়ে উড়তে পারি, কুমীর হয়ে জলে ডুবতে পারি—গাছে চড়ে গাছ ওড়াতে পারি—

যা'হোক সর্বমঙ্গলার মন্দিরে পূজো দিয়ে এলো নিস্তারিণী। ভালোয়-ভালোয় যে মানুষটা বাড়ী ফিরে এল এই যথেষ্ট। রাখোহরিকে পতিরামের কাছে রেখে গেল। সাত বছরের ছেলে রাখোহরি। যখন বাড়ী ছেড়ে যায় রাখোহরি তখন এই এতটুকুন। পতিরাম ছেলে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরুল।

তারপর দিন থেকে বাড়ীতে লোক আর ধরে না। এ বলে—মন্তর শিখিয়ে দাও, ও বলে—অসুখ সারিয়ে দাও। হাতে আসতেও লাগলো দু'পয়সা, নবীন পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হলো রাখোহরি। এখন অবস্থা ভালো হয়েছে। জল-পড়া, চাল-পড়া নিয়ে লোকে কলটা-মুলোটা, টাকাটা-সিকেটা দেয়। ভিটের সামনে চণ্ডীমণ্ডপ উঠলো। পেছনে ঢেঁকিশাল হলো। বাড়ীর উঠোনে পাতকো কাটানো হলো। নিস্তারিণীর সুখ দেখে কে! কিন্তু সুখ তার বেশীদিন বুঝি থাকে না।

একদিন নিস্তারিণী বললে—সবাই বলছিল—তুমি নাকি ইচ্ছে করলে বাঘ হতে পারো—

পতিরাম বললে—খবরদার, অমন কথা বলো না ছোট বউ—শেষে ভয়ে আঁৎকে উঠে সে-এক ভীষণ কাণ্ড করে বসবে তোমরা, তখন আমার সামলানোই দায় হয়ে উঠবে—তাছাড়া রাখো শুয়ে আছে ঘরে—ছোট ছেলে যদি ভয় পায়—

রাত বোধ হয় দেড় প্রহর। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিস্তারিণী ঘরে এসেছে। রাখোহরি বিছানার একপাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু নিস্তারিণীর উপরোধ-অনুরোধ শেষ পর্যন্ত এড়ানো গেল না। নিস্তারিণী যে জীবনে কখনও বাঘ দেখেনি!

পতিরাম বললে—তা'হলে দু'টো পেতলের ঘটি আনো—

দু'টো ঘটিতে জল ঢেলে মন্তর পড়ে দিলে পতিরাম।—এই ঘটির জলটা আমার গায়ে ঢাললে আমি বাঘ হয়ে যাবো, আর এই ঘটির জলটা আমার গায়ে ঢাললে আবার মানুষ হয়ে উঠবো।—খুব সাবধান ছোট বউ—

তারপর তাই হলো। সে এক বীভৎস ব্যাপার!

দেখতে দেখতে সেই চালা-ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড একটা এগারো হাত সুন্দর বনের বাঘ

দাঁড়িয়ে উঠলো—গায়ে বড় বড় ডোরা ডোরা দাগ—ইয়া গোঁফ, ইয়া বড় বড় গোল-গোল চোখ, জিব বের ক'রে লক্ লক্ করতে লাগলো—আর ল্যাজটা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে ছাদের দিকে উঠতে লাগলো—

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আঁৎকে উঠে নিস্তারিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সেইখানে—

তারপর সর্বনাশ! নিস্তারিণীর চীৎকারে রাখোহরিরও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও বিছানার ওপর উঠে দেখে—বিরাট একটা বাঘ। বাঘ দেখে সেও পালাতে গেল। কিন্তু পালাতে গিয়ে মন্ত্রপড়া জলের ঘটিটা তার পায়ে লেগে গেল উল্টে পড়ে।

পতিরামের চোখ দু'টো তখন জ্বলছে। রাগে নয় ভয়ে, সেই অবস্থায় আর কোনও উপায় নেই মানুষ হয়ে উঠবার। নিস্তারিণী তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাখোহরিরও সেই অবস্থা। ভয়ঙ্কর একটা বুক-ফাটানো চীৎকার করে উঠলো পতিরাম। সে-চীৎকারে আশপাশের পাড়াপড়শীরা সবাই ছুটে এল। বাঘ এসেছে নাকি ওদের বাড়ীতে! লাঠি সড়কী বল্লম রাম-দা যার যা অস্ত্র আছে নিয়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে চোখের পলকে পতিরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ভিটে পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলো। পেঁপুলবেড়ের আমবাগানের ধারে খাঁটরোর বিলের দু'পাশে ঘন জঙ্গল—সেইখানে গিয়ে ঢুকে পড়লো পতিরাম।

পাড়ার লোক সবাই এসে জিজ্ঞেস করলো—কী হলো গা—

তখন জ্ঞান হয়েছে নিস্তারিণীর। সমস্ত অবস্থাটা বুঝতে পারলে। কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে তার। কেন সে বাঘ দেখবার জন্যে অমন পেড়াপীড়ি করলে।

তারপর সেইদিন থেকে আবার দুঃখের দিন সুরু হলো। নিস্তারিণীর হাতের পয়সা ফুরিয়ে এল।

ওদিকে খাঁটরোর পথে বাঘের উপদ্রবে লোকে আর চলতে পারে না। কেষ্ট চাঁড়ালের ষাঁড়টাকে একদিন পাওয়া গেল না আর। কাছারীর সেপাই রামভদ্র ভোর রাত্তিরে নোনাগঞ্জের

হাটে যেতে যেতে পেছন থেকে কে ঝাঁপিয়ে পড়লো পিঠের ওপর। ছাগলগুলোকে ওদিকে চরাতে নিয়ে যাওয়া বিপদ।

এদিকে নিস্তারিণীর আর চলে না। এর ওর কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় কলাটা-মুলোটা। নইলে রাখোহরিকে তো মানুষ করতে হবে। তবু নিস্তারিণীর সিঁথের সিঁদুর হাতে শাঁখা নোয়া ফেলেনি।

পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে বলে—সধবা মানুষ তুমি—কেন থান পরবে বাছা—সোয়ামী তো তোমার বেঁচেই রয়েছে—শুধু…

নবাবের সুবেদার আর ফৌজদারের কাছে খবর গেল। সবাই বললে—এমন করে অত্যাচার চললে আর তো পারবো না বাঁচতে—এতো বাঘ নয়, মানুষ-বাঘ যে—ফৌজদার মহম্মদ জান্ সেপাই পাঠালে। কিন্তু সারা জঙ্গল ঘিরেও কাউকে পেলে না তারা। এ তো আর সোজা বাঘ নয়—এ-বাঘ যে মন্তর জানে।

কিন্তু রাত্তির বেলা যখন সবাই ঘুমে অচেতন, খাঁটরোর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে পতিরাম। রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে পৌঁছয় নিজের ভিটেয়। ভিটের পেছনে ঢেঁকিশাল। সেখানে ঢেঁকিতে উঠে পাড় দেয়। নিস্তারিণী এতরাত্রে ঢেঁকির শব্দ শুনে ঢেঁকিশালে এসে দেখে—বাঘ। বাঘ কিছু বলে না। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে। কোনদিন একটা বিরাট পাকা কলার কাঁদি এনে ফেলে দিয়ে যায়। কোনদিন একটা মরা পাঁঠা! ওদের ঘরে চাল নেই—খাবার নেই। বাঘ এসে খাবার জুগিয়ে দিয়ে যায়। ভোরের আকাশ ফরসা হবার আগেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় দেখতে পায়না কেউ। নিস্তারিণী চোখের জল রাখতে পারে না। ফিরে এসে রাখোহরিকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

এমনি করে দিন চলে।

এদিকে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হয়েছে দেশে। কোথা থেকে হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে বর্গীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুঠপাট করে গ্রাম। ক্ষেত-খামার লোপাট করে নিয়ে যায়। সে-কদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে কাটায় সবাই। বড় অশান্তিতে কাটে জীবন। ওদিকে নবাবের খাজনা আদায়, খাঁটরোর জঙ্গলের বাঘের উপদ্রব আর তারপর এল বর্গী!

কিছু বড় হয়েছে রাখহোরি। কিন্তু রাখোহরির এমন এক কঠিন অসুখ হলো, সারে না আর কিছুতেই। ছেলে শুকিয়ে প্যাকাটির মত হয়ে যাচ্ছে। ওষুধ পথ্য কিছু গলে না গলা দিয়ে। সিধু কবিরাজ বড়ি খাইয়ে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল অনেকদিন। আর বুঝি বাঁচানো যায় না।

বাঘ রোজ আসে। ঢেঁকিশালে এসে ঢেঁকিতে পাড় দেয়। আর নিস্তারিণী ছেলের রোগশয্যা ছেড়ে উঠে আসে। মনের কথা সব খুলে বলে আর ঝর ঝর কাঁদে। বাঘ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শোনে। কিন্তু কথা বলবার ক্ষমতা নেই। চুপ করে শোনে—আর তারও বুঝি ছেলের অসুখে বুকটা কেঁপে কেঁপে ওঠে—ল্যাজটা পাকায় কেবল থেকে থেকে।

সেদিন সিধু কবিরাজ বললে—বাঘের চর্বি জোগাড় করতে হবে—বুকে মালিশ না করলে বাঁচাতে পারা যাবে না—কফ্ বসে গেছে বুকে—

কিন্তু কে আনবে বাঘের চর্বি কিনে! কবিরাজ নিজেই আনতে পারছে না। বর্গীর

যা হাঙ্গামা বেধেছে ঘর থেকে কেউ বেরুতেই চায় না! নোনাগঞ্জে গেলে হয়ত কিনতে পাওয়া যাবে! কিন্তু সে তো এখান থেকে মাইল দশেক রাস্তা পথে বাঘের উপদ্রব আছে, ইছামতীতে পোর্তুগীজ ডাকাতরা আছে, তারপর আছে বর্গী! কেউ আনতে রাজী হলো না।—নিস্তারিণীর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো—

সেদিন কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত। বাঘ তেমনি এসে ঢেঁকিশালে দাঁড়াল। নিস্তারিণী শব্দ পেয়েই এল। সিধু কবিরাজের কথা বললে—। কোনও উপায় নেই। রাখোহরিকে বুঝি এবার বাঁচানো গেল না গো—

নিস্তারিণী শেষকালে বললে—তুমি যাও এবার ভোর হয়ে আসছে—

বাঘ কিন্তু নড়লো না। ঢেঁকিশালে থাবা রেখে তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ একবার আর্তনাদ করে উঠলো।—একবার, দু'বার, তিনবার। পাড়াপড়শী সবাই-এর ঘুম ভেঙে গেছে।

নিস্তারিণী বললে—করছো কী, সর্বনাশ করছো আমার—এখনি যে ফৌজদারের সেপাইরা ছুটে আসবে গো—দেখতে পেলে আর আস্ত রাখবে না তোমাকে—

যা' বলা তাই হলো।

খবর পেয়ে এল চারদিক থেকে সবাই। সেপাই এল গাদা বন্দুক নিয়ে। কিন্তু কী যে বাঘের গোঁ। লোকজন দেখেও পালাল না। ঠায় সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঁক গাঁক করে চীৎকার করতে লাগলো।

তারপর তেমনি ভাবেই সেপাই গুলী করলে বাঘটাকে। লুটিয়ে পড়ল বাঘটা ঢেঁকিশালে। রক্তে ঢেঁকিশাল ভেসে গেল। নিস্তারিণীও সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তা হোক্। নিস্তারিণী একসময় সুস্থও হয়ে উঠলো। স্বামীর শোক রাখোহরির মুখের দিকে চেয়ে ভুলতে লাগলো। সাড়ী ছেড়ে থান ধুতি পরলো নিস্তারিণী। সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে ফেললে, হাতের শাঁখা নোয়া খুলে ফেললে।

আর তারপর? তারপর—লোকে বলে—সেই বাঘের চবি বুকে মালিশ করে রাখোহরিকে সিধু কবিরাজই বাঁচিয়ে তুললো তার দিন পনেরো পরে।

কিন্তু তারপর কত শতাব্দী কেটে গেছে। মুর্শীদকুলীখাঁ, সিরাজদ্দৌল্লা, লর্ড ক্লাইভ—কত লোক এল গেল। তবু আজো কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে ওখানে বাঘের ডাক শোনা যায়। তোমরা যদি কখনও মাঝদিয়া ষ্টেশনে নেবে হাঁটা পথে সোজা দক্ষিণ মুখো যাও, ভাজনঘাট আর নোনাগঞ্জ পেরিয়ে, খাঁটুরোর বিল পার হয়ে, পেঁপুলবেড়ের আমবাগান পার হও, ওই পেঁপুল-বেড়ে আর ফতেপুরের মাঝখানে যে-মাঠটা পড়ে, ওইখানে অন্ধকার কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে হঠাৎ শুনতে পাবে বাঘের ডাক। তোমরা হয়ত বাঘের ডাক শুনে চমকে উঠবে, ভয় পাবে। কিন্তু ভয় পেও না। ও বাঘ নয়, কিছু নয়। ভেবো ওই বাঘের ডাকের পেছনে এক রহস্য লুকিয়ে আছে। ও এক বহু শতাব্দী আগের রহস্য। ও ওই বাঘমারির ভিটের রহস্য···

গভীর রাতে

শ্রীসুনির্মল বসু

গভীর রাতে
বারান্দাতে
দেখ্‌ছি শুয়ে শুয়ে রে—
দেখ্‌ছি শুয়ে শুয়ে—
আকুল-করা জ্যোৎস্না-ধারা
পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে রে—
পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে।
দেখ্‌ছি আমি কৌতূহলে—
চাঁদের হাসি পড়ছে গলে'—
গগন তলে,—
বিরাম-বিহীন ঝরছে যেন
আকাশ ধুয়ে ধুয়ে রে—
আকাশ ধুয়ে ধুয়ে।
ফুল ফুটেছে রাশে রাশে,—
হেনার চেনা গন্ধ আসে
আজ বাতাসে,—
হাওয়ায় কাঁপা দোল্‌ন-চাঁপা
পড়ছে নুয়ে নুয়ে রে—
পড়ছে নুয়ে নুয়ে।
রাত হয়েছে দিনের মত,
সে শোভা আর বলব কত
অবিরত,—
গাছের মাথায় রূপালী ফুল—
যাচ্ছে কে ভাই রুয়ে রে—
যাচ্ছে কে ভাই রুয়ে?
চাঁদের আলোয় উড়তে গিয়ে—
জোনাক্ পোকা যায় মিলিয়ে—
প্রদীপ নিয়ে,—
একটি ফুঁয়ে ফুঁয়ে রে—
একটি ফুঁয়ে ফুঁয়ে!
কোথায় যেন বাজায় বাঁশি—
বন্‌-গাঁ-বাসী ভীম্‌-পলাশী,—
মন্‌-উদাসী,
বাঁশির সুরে আনন্দ তার
যাচ্ছে থুয়ে থুয়ে রে—
যাচ্ছে থুয়ে থুয়ে।
ঘুম আসে না নিঝুম রাতে,—
মিতালী আজ চাঁদের সাথে
নিরালাতে,—
মনটি আমার উজল হোলো
আলোর কাঠি ছুঁয়ে রে—
আলোর কাঠি ছুঁয়ে।
রাত-জাগা কোন্ অচীন্ পাখী—
আকাশ-পথে ফিরছে ডাকি—
ঐ একাকী,—
মাঝে মাঝে ছায়াটি তার
পড়ছে এসে ভূঁয়ে রে
পড়ছে এসে ভূঁয়ে।
গভীর রাতে,
বারান্দাতে—
দেখ্‌ছি শুয়ে শুয়ে রে
দেখছি শুয়ে শুয়ে।

অনামা বীরাঙ্গনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দিল্লীর প্রথম আফগান সুলতান হচ্ছেন লোদী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বহ্‌লল। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের কাছে পরাজিত হবার পর আফগানরা আর কখনো ভারতের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে নি।

বহ্‌লল জীবনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু সে সবের কথা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমরা এখানে একটি বিশেষ যুদ্ধের কাহিনী বলতে চাই। ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে এরকম কাহিনী দুর্লভ। "তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগান" নামক গ্রন্থ থেকে কাহিনীটি সংগৃহীত।

সিন্ধু প্রদেশে আহম্মদ খাঁ ভাট্টি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তিনি আর মুলতানের শাসনকর্তার হুকুম তামিল করতে রাজী নন। তিনি গঠন করেছেন এক বৃহৎ সেনাদল এবং তার মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যা বিশ হাজারের কম নয়। এই ফৌজ নিয়ে তিনি মুলতানের যত্রতত্র হানা দিয়ে বেড়ান—কোথাও লুঠতরাজ করেন, কোথাও কোন শহর দখল করেন। দিনে দিনে বেড়ে উঠছে তাঁর শক্তি ও সাহস। জীবনযাপন করেন তিনি স্বাধীন নৃপতির মত।

দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছল এই দুঃসংবাদ। সুলতান বহ্‌ললের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, অবিলম্বে এই বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে রীতিমত গুরুতর।

দিল্লী থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুলতানের ত্রিশ হাজার সুশিক্ষিত সাদী-সৈনিক, তাদের পুরোভাগে রইলেন সেনাপতি উমর খাঁ ও রাজপুত্র বেয়াজিদ।

কিন্তু খবর শুনে আহম্মদ খাঁয়ের মুখ শুকিয়ে গেল না, আত্মশক্তির উপরে তাঁর অটল বিশ্বাস। সব দিক তলিয়ে না বুঝে তিনি অস্ত্রধারণ করেন নি। সুলতানের ফৌজকে উত্তপ্ত অভ্যর্থনা দেবার জন্যে তিনিও প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সুলতানের মত তিনিও স্বশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন না। সেনাপতি করলেন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র নওরং খাঁকে এবং সুলতানের ত্রিশ হাজার অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন মাত্র পনেরো হাজার অশ্বারোহী! নিশ্চয়ই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁর এক একজন লোক শক্তিতে দু'জন শত্রুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

নওরং খাঁ বয়সে নবীন, বীরধর্ম পালনের চেয়ে আমোদ-আহ্লাদের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। প্রথমেই নিজের তরবারি কোষমুক্ত করবার ইচ্ছা তাঁর হ'ল না।

দাউদ খাঁ নামে এক সেনানীকে ডেকে বললেন, "দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তুমি শত্রুদের মুণ্ডপাত ক'রে এস। দরকার হ'লে আমি সাহায্য করব।"

ত্রিশ হাজারের বিরুদ্ধে দশ হাজার! কথাটা শুনতেও হাস্যকর। কিন্তু দাউদ খাঁ মুখে কোন প্রতিবাদ করলেন না, সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন যথাসময়ে।

যুদ্ধ হ'ল। ত্রিশ হাজার তরবারিকে জবাব দেবার চেষ্টা করলে দশ হাজার তরবারি। কিন্তু পারবে কেন? জয়ী হ'ল সুলতানের পক্ষ। রক্তাক্ত মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল দাউদখাঁর মৃতদেহ। মারা পড়ল বা জখম হ'ল তাঁর অনেক সৈন্য। বাকী সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল।

স্বাস্থ্য ভালো করো

শ্রীমিহিরকুমার মিত্র
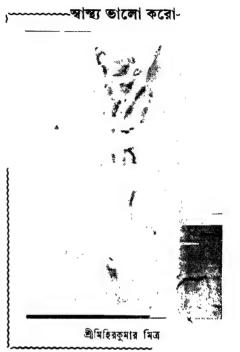
ছুটে গেল নওরং খাঁর আমোদ-আহ্লাদের স্বপ্ন। কেমন করে তিনি আর পিতৃব্যের কাছে মুখ দেখাবেন? বিলাসের আসন ছেড়ে নেমে এসে তিনি সজ্জিত হ'তে লাগলেন রণসজ্জায়।

এখন তিনি মরিয়া। নেই তাঁর মৃত্যু-ভীতি। তিনি প্রমাণিত করতে চান, তাঁরও ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে বীরের রক্ত, যোদ্ধার রক্ত।

তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন এক নারী। ইতিহাস তাঁর প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু আকৃতির কথা বলেনি। তাঁর নামও আমরা শুনিনি। কেবল এইটুকু জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন নওরং খাঁর প্রিয় বান্ধবী। বর্ণনার সুবিধার জন্যে আমরাও তাঁকে বান্ধবী ব'লে ডাকব।

বান্ধবী বললেন, "বন্ধু, আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাই।"

নওরং খাঁয়ের আপত্তি হ'ল না। সেকালকার অনেক রাজা-বাদশা নারীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতেন।

পরাজিত সৈন্যদের সঙ্গে নিজের নূতন সেনাদল নিয়ে নওরং খাঁ ছুটলেন শত্রুদের গতিরোধ করবার জন্যে। মনে মনে তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—হয় জিত্‌ব, নয় মর্‌ব।

আবার দুই দল হ'ল মুখোমুখী। বাজল কাড়া-নাকাড়া, দুলল যোদ্ধাদের মন, জাগল "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি। আরম্ভ হ'ল সংঘর্ষ।

হ্রেষারবে চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ক'রে, ধূলিপটলে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে তুলে দুইপক্ষের অশ্বরা পরস্পরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সওয়ারদের শাণিত অস্ত্রগুলো দিকে দিকে সৃষ্টি করতে লাগল চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-চমক, কত সওয়ার, কত ঘোড়া মাটির উপরে লুটিয়ে প'ড়ে ছটফট করতে করতে একেবারে স্থির ও নিসাড় হয়ে গেল, কত হুঙ্কারের সঙ্গে কত আর্তনাদ মিশ্রিত হয়ে বিদীর্ণপ্রায় ক'রে দিতে লাগল কর্ণপটহ।

লড়াই করছেন নওরং খাঁ মত্তহস্তীর মত—যেখানে বিপদ সেখানেই তিনি এবং সেইখানেই ঝক্‌মকিয়ে উঠছে তাঁর অশ্রান্ত হাতের তরবারি। শত্রুসৈন্যরা দলে দলে হ'তে লাগল পপাত-ধরণীতলে!

কিন্তু বৃথা! নওরং খাঁ নিহত হলেন অবশেষে। নায়কের মৃত্যু দেখে হতাশ হয়ে তাঁর সৈন্যরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে উদ্যত হ'ল। সেই সময়ে ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। কোথা থেকে সবেগে ছুটে এল এক তরুণ সুকুমার বীর, পরনে তার যোদ্ধার সাজ, চক্ষে তার তীব্র দীপ্তি এবং কণ্ঠে তার দৃপ্ত চীৎকার—"যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর! আমি আহম্মদ খাঁর পুত্র, আমিই তোমাদের চালনা ক'রে যুদ্ধ জয় করব। ফিরে দাঁড়াও, যুদ্ধ কর!"

ফিরে দাঁড়াল আবার পলায়মান সৈন্যগণ। এই নবীন নায়কের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখবার অবসরও তাদের হ'ল না, কিন্তু যেন নূতন জীবন ফিরিয়ে পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে দৃঢ়পদে ও ক্ষিপ্রহস্তে তারা করতে লাগল অস্ত্রচালনা এবং শত্রুসংহার।

নবীন নায়ক এসে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়েও দিল্লীর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে আর তিষ্ঠতে পারলে না, ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পলায়ন করতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। বিজয়গৌরব অর্জন ক'রে তরুণ নায়কের চারিপাশে দাঁড়িয়ে আহম্মদ খাঁয়ের সৈন্যরা গগণভেদী স্বরে জরধ্বনির পর জয়ধ্বনি করতে লাগল।

এই তরুণ নায়ক হচ্ছেন নওরং খাঁয়ের অনামা বান্ধবী!

বন্ধুর মৃত্যু দেখে পুরুষের ছদ্মবেশে তিনি ক্রুদ্ধ সিংহীর মত প্রতিশোধ নিতে ছুটে এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

আহম্মদ খাঁ এই সংবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এবং বীরাঙ্গনার কাছে উপহার পাঠিয়ে দিলেন দশ হাজার টাকার অলঙ্কার। পনেরো শতাব্দীতে দশ হাজার টাকার মূল্য ছিল এখানকার চেয়ে অনেক বেশী।

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে সৈন্যচালনা করেছেন এমন আরো দুই বীর-নারীর নাম অতি বিখ্যাত। রাজিয়া এবং চাঁদবিবি। কিন্তু তাঁহা ছিলেন সুলতানা এবং রাজধর্ম পালনের জন্যে লোকের উপরে কর্তৃত্ব করতে অভ্যস্ত। আর নওরং খাঁয়ের বান্ধবী সাধারণ নারী হয়েও অসাধারণ বুদ্ধি, বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দিয়ে বিস্মিত করেছিলেন সবাইকেই। এইরকম দ্বিতীয় ঘটনা ইতিহাস তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

সুলতান বহ্‌লল আবার আহম্মদ খাঁয়ের বিরুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন গল্প।

শরতের আকাশে খুশির বিকাশ

ফটো : শ্রীক্ষিরোদ রায়

যে-নিয়মে জিনিস ফুরায় সেই নিয়মের 'পর
দেবদত্ত সেনের আছে রাগ ভয়ংকর—
মানুষ অস্থির খেয়ে নানান্ ঠ্যালা-ধাক্কা-গুঁতো,
একেবারে মারতে আছে এই নিয়মের ছুতো।
বাজার থেকে যা' আনি তা' নামিয়ে দিতেই শেষ;
লোহার মটর ফুরিয়ে দিতে নেই আলস্য ক্লেশ
তামাক ফুরায়, টিকে ফুরায়, ফুরায় দিয়াশলাই;
দেবদত্ত বলে: "এ ত' ভারী বিশ্রী বালাই!
পরশপাথর আছে নাকি আমার ট্যাঁকে গোঁজা—
যাহার দরুণ কোটিপতি রাজা হওয়াও সোজা?
এক কোটি ধন ফুরিয়ে গেলে করব' আবার কোটি
এক নিমেষে! গাড়ী-গাড়ী খন্তা কুড়ুল বঁটি
দা কাটারি কোদাল আদি অঠেল ভাঙা লোহা
করব' সোনা এতই যাহার ওজন যায় না কহা!
তা' নয়কো যখন, তখন সাম্‌নে ভাতের থালি
এক পলকেই যদি হয় অর্ধেকটা খালি
মনে বড়ো বাজে; মনে হবেই: বাজে খরচ
এত দ্রুত এত! মন করবেই খচ্‌খচ্।
এম্‌নি করেই জিনিস ফুরায়; মাজলে বাসনগুলো
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ই; ভাঙে বাঁশের ঝুড়ি কুলো"।
কাজেই নাচার দেবদত্ত হিতৈষীদের কাছে
পরামর্শ চাহে: এর প্রতিকার কি আছে?
কেউ কহে না কথা—সবাই মৃদু মৃদু হাসে,
হতভম্ব দেবদত্তের এই সর্বনাশে।

শ্রীমতী পুষ্প বসু

ডাক্তার বল্লেন, 'ওষুধ ইনজেক্‌সেন ত' অনেক হ'ল এবার কিছুদিন চেঞ্জে যাওয়া দরকার।'

ছেলেমেয়েরা এখন সবাই সংসারী, কেউই যেতে রাজী হ'ল না, তার উপর ডিসেম্বর মাসে পাহাড়! শুনেই সবাই চমকে উঠল। আমি ছোটবেলা থেকে পাহাড়ে থাকতে অভ্যস্ত, তাই একাই যাওয়া স্থির করলুম; তাছাড়া কারসিয়ং-এ যখন নিজের বাড়ী রয়েছে! তবে পাঁচবছর প্রায় কারুর সেখানে যাতায়াত নেই, এমনি পড়েই আছে। বাড়ীতে থাকে আমাদের ত্রিশ বছরের পুরনো ঝি জেটি ও তার মেয়ে যোগমায়া।

ওখানে বাড়ীর কাছেই একজন পরিচিত ডাক্তার থাকতেন, যাওয়ার সব তোড়জোড় করে তাঁকে চিঠি দিলুম। উত্তরে তিনি জানালেন,—আপনার জেটি নামেমাত্র আছে বটে, তবে একেবারে জড়ভরত হয়ে গিয়েছে। তার মেয়েটি কিছুদিন হ'ল মারা যাওয়ায় আরো যেন ভেঙে পড়েছে বেচারা!—আপনি চলে আসুন আর একটা ঝি রাখলেই চলবে।…

জেটির খবরে মর্মাহত হলুম। আহা একটিমাত্র মেয়ে! আমি যখন শেষ করসিয়ং থেকে ফিরি—তখন সে নেহাতই বালিকামাত্র—এগার কি বারো বয়েস। তার বিয়ের কথা অনেকবার শুনেছিলুম, কিন্তু যোগমায়া নাকি মাকে ছেড়ে বিয়ে করতে চায়নি। বলেছিলো—কেউ ঘরজামাই হতে রাজী হলে তবেই সে বিয়ে করবে। যাক্ সবই ত' এখন চুকে গেছে তা'হলে—বেচারা জেটি!

এসে পৌছলুম কারসিয়ং-এ। অনেকদিন পরে আবার যেন নূতন করে পাহাড় ভাল লাগলো। আমাদের বাড়ীটা ডাউ হিলের কাছে, একেবারে পাহাড়ের উপর। ভারী নির্জন জায়গাটা। বাড়ীর ঠিক সামনের দিক দিয়েই গিয়েছে শ্মশানের রাস্তা। আমাদের বাগান থেকে শ্মশান স্পষ্ট দেখা যায়। নিঝুম অন্ধকার রাতে কখনো বাগানে বেরোতুম না, পাছে শ্মশানটা চোখে পড়ে যায় এই ভয়ে। কখনো আচমকা চোখ পড়ে গেলে দেখেছি—অন্ধকারের বুক-চিরে ধুক ধুক করে চিতা জ্বলছে—আর তারই অনতিদূরে দরোয়ানের ঘরে মিট মিট করে জ্বলছে আলোটা!

বাড়ীতে এসেই প্রথম জেটির দিকে নজর পড়তে স্তব্ধ হয়ে গেলুম। তার সেই টকটকে লাল রঙ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে—চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, বিভ্রান্ত! আমাকে প্রথম

দেখেই সে সেলাম করে বল্লে, 'বৌরাণী, যোগমায়া মরেনি, সে আমার সঙ্গে মিশিয়ে আছে—আমায় ছেড়ে ত' সে থাকতে পারতো না!—প্রথমে সকলে যখন বল্লে, যোগমায়া মরে গেছে, তখন আমি দেখলাম সত্যিই সে দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে—ঐ নীল আকাশের গায়, আর কালো কালো পাহাড়ের বুকে আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে! কিন্তু যখন তাকে দাহ ক'রে শ্মশান থেকে ফিরে আসছি, তখন দেখলুম কি জানো বৌরাণী—দেখলুম, সে মরেনি—নদীতে স্নান করে, ঝমঝম করে পায়ের মল বাজিয়ে আমারই কাছে ফিরে আসছে—তারপর থেকে সে কোথাও যায়নি—আমারই কাছে আছে!'···

আমি জেটিকে থামিয়ে সান্ত্বনা দেবার জন্য বল্লুম, 'এবার যাবার সময় তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবো, এখানে আর থেকে কাজ নেই।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে মাথা নেড়ে বল্লে, 'বৌরাণী তুমি বলছ কি—তা হতেই পারে না, যোগমায়াকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না!'

আমি আর কিছু বলতে পারলুম না। বুঝলুম, এ মানুষকে কিছু বলাই বৃথা। তবু অন্য প্রসঙ্গ তুলে বললুম, 'তা না হয় হলো, কিন্তু তুমি ত' দেখছি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছো, এখন ত' সব কাজ একা করা সম্ভব নয়, আর একটা ঝি দেখ।'

ঝি রাখার কথায় জেটি ভীষণ আপত্তি জুড়ে বল্লে, 'আমি এতোদিন তোমাদের এতো লোকের কাজ করে এলুম একাই, আর এখন শুধু তোমার কাজ পারব না!—এখন ত' আমার গায়ে দ্বিগুণ জোর, যোগমায়া যে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে বৌরাণী!

ওর কথায় আমার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল, আর কিছু না বলে জিনিসপত্তর গোছাবার জন্য লাগলুম।

সত্যিই আশ্চর্য লাগলো এ-বয়সেও জেটির কাজের তৎপরতা দেখে। এক নিমেষের মধ্যে ও নিজেই সব গুছিয়ে ফেললে। আমি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে একটু বাগানটা বেড়িয়ে এলুম। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে সারা বাগানটা। শীতের সময় এতো ফুল এর আগে আর কখনো দেখিনি। মনে পড়লো যোগমায়ার কথা। প্রতিদিন সে সকালে একটি করে ফুলের তোড়া এনে আমার হাতে দিয়ে সেলাম করত।

সেদিন আর রান্নাবাড়ার পাট করতে হ'ল না। পাশের ডাক্তারদের বাড়ী থেকেই খাবার এলো। এদিক-সেদিক ঘুরতে-ফিরতেই দিনের বাকী বেলাটুকু মুছে গিয়ে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর, শোবার সময় ঘরের জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে চোখ পড়ল সেই শ্মশানের দিকের পাহাড়টায়। ম্রিয়মাণ চাঁদের পাণ্ডুর আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে

—কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব সমস্ত কারসিয়ং পাহাড়টা জুড়ে রয়েছে! বাতাসের তীব্রতায় পাইনের গছগুলো হা-হা করে উঠছে—মনে হচ্ছে মরন্ত রোগীর নিঃশ্বাস ভেসে বেড়াচ্ছে যেন চারদিকে!—এখানে-ওখানে ছাড়া ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন শত শত অশরীরী! হঠাৎ বাগানের মহুয়া গাছটা থেকে অশুভ-কণ্ঠে কি একটা পাখী আচমকা ডেকে উঠলো! আমি সশব্দে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় এসে বসলুম। নিজের বাড়ী বলেই এমনভাবে একা চলে আসতে পারলুম, নইলে এমন নির্জন জায়গায় একা থাকা সম্ভব হ'ত না,—এবং একথা আগেই সবাই বলেছিল।

বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে জেটি এসে দরজা দিয়ে আমার খাটের কাছে মেঝেতে তার বিছানা পাতল; তারপর সুরু করল তার মেয়ে যোগমায়ার কথা। আমার কিছু বলার ভাষাও ছিল না, আর কারু সান্ত্বনা-বাক্যের প্রয়াসীও যে সে নয়, তা বেশ বোঝা গিছলো গোড়া থেকেই। তার প্রত্যেক কথার মাঝে সে দৃঢ়ভাবে বলতে লাগল, 'যোগমায়া মরেনি, সে সর্বদা আমার সঙ্গে আছে,—আমার কি আর নড়বার ক্ষমতা আছে এই পঁচাত্তর বছর বয়েস—দেহটা নিয়ে বেঁচে আছি মাত্র—করছে ত' সব যোগমায়াই!...

আমি তার কথায় হেসে একবার বল্লুম, 'দেখ জেটি, তুমি মেয়ের মায়া কিছুতেই কাটাতে পাচ্ছনা—এই স্নেহ বা মায়াই অহরাত্রি মনের মাঝে পুষে রেখেছ—কাজেই যোগমায়া নামটা তোমার জীবনে ছন্দের মত মিশে গেছে।'

জেটির কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলনা, আপন মনে অনর্গল মেয়ের কথা বলতে বলতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও আস্তে আস্তে উঠে আলোটা নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাড়ীর কথা, ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়তে লাগল বটে, কিন্তু সব ছাপিয়ে যোগমায়ার কথাগুলোই মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল, ঘুম না আসা পর্যন্ত।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, রোদে ঝলমল করছে চারিদিক। প্রাণ-চঞ্চল সবুজ গাছ-পালাগুলি প্রভাত-রবির আভায় যেন ঝিকমিক করছে। নির্মল নীলাকাশে কোথাও এতটুকু ভীতি বা গ্লানির চিহ্ন নেই। বাগানে মালী কাজ করছে। জেটি তার কাজকর্ম সেরে আমায় এসে ডাকল। এর মধ্যেই বাথরুমে সে গরম ও ঠাণ্ডা জল দিয়েছে। টেবিলে চা প্রস্তুত; ডিম রুটি জেলী মাখন সব সাজান। আশ্চর্য! এতো ভোরে উঠেছে বুড়োমানুষ—এতটুকুও কুড়েমী নেই! আমাকে চা খাইয়ে সে নিজে চা খেলো, তারপর চললো বাজারে। সেদিন হাটবার। আমি বে-উইণ্ডোর সামনে কাগজ-কলম নিয়ে ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখতে বসলুম। চিঠি লেখা শেষ হলে, জানলার বাইরে নীল আকাশ ও পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি মেলে দেবার আগেই চোখে পড়ল—আমার হাতের কাছে ফুলদানীতে এক গোছা প্রিমরোজ ফুল। কই এর আগে ত' চোখে পড়েনি এগুলো!

কিছুক্ষণ গোলাপ ফুলগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলুম না। তারপর ঘড়ির দিকে চাইলুম—দেখি ন'টা বাজে। জেটির হাট থেকে ফেরবারও সময় হ'ল। হঠাৎ সেই সময় মনে হ'ল বেডরুমে কে যেন চলাফেরা করছে। বোধ হয় জেটি এসেই বাসিপাট সারছে। কিন্তু বেডরুমে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কই কেউ ত' নেই, ভেতর'থেকে দরজা বন্ধ। সত্যি এ-বয়সে জেটির এই কাজের উৎসাহ দেখলে অবাক্ লাগে। বিছানাটি পরিপাটি করে পাতা, পরদা সরিয়ে জানালাগুলো খুলে দিয়েছে, ঘরে কাঁচা-সোনার মত রোদ এসে পড়েছে এক ঝলক। এ ঘরেও খাটের পাশে টেবিলের উপর একগোছা প্রিমরোজ! কার্পেটটা তুলে সযত্নে রোদে দিয়েছে। মন যেমন খুশিতে ভরে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যও হলুম কম না। এই সময়টুকুর মধ্যে এত কাজ সারল কখন! এর পর গেলাম রান্নাঘরের দিকে। দেখি উনুন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মনে হ'ল, এইমাত্র কে যেন কয়লা ঢেলে দিয়েছে উনুনে। পাশেই ভাঁড়ার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল, দেখে বুঝলুম আমারই বোঝার ভুল। শিলনোড়া পাতা, বাটনা অর্ধেক বাটা।—বেচারী জেটি! এবার চেঁচিয়ে 'জেটি জেটি' বলে ডাক দিলুম। মনে হ'ল নিশ্চয়ই সে হাট থেকে ফিরেছে, কিন্তু বাগান থেকে মালী বললে, 'মা, সে ত' এখনও ফেরেনি।' কি মুস্কিল! বাজার যাবার আগে ধড়ফড় করে এত কাজ সারতে যাওয়া কেন! একলা মানুষের এত করার কি আছে, আর এত তাড়াই বা কিসের!

কয়েক মিনিট পরেই জেটি হাট থেকে ফিরে এলো। পিঠ থেকে বোঝাটা নামিয়ে ধপাস করে বসে হাঁফাতে লাগল। আমি বল্লুম, 'তোমার কি কাণ্ড!—তাড়াতাড়িতে এত কাজ সেরে হাটে না-ই বা যেতে—এবার থেকে মালীকে পাঠাব. তোমায় আর যেতে হবে না।'

কথাটা শুনে, মুখের উপর থেকে রুক্ষ চুলগুলো সরিয়ে সে আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে ব'লে উঠল, 'এ বৌরাণী এ তুমি কি বলছো—কাজ কি আমি কিছু করি, ও সবই আমার যোগমায়া!—আর হাটে যেতে যে আমার চিরদিনই ভাল লাগে। যোগমায়া মরবার আগে বলতো: 'মা তুই একদম বুড়ো হয়ে গিয়েছিস, এবার বৌরাণীরা এলে আমি সব কাজ করব, তুই শুধু হাটে যাবি!'…

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লুম, 'এখন যাও জিনিসগুলো ভাঁড়ারে তোল গে।' আর মনে মনে ভাবলুম. তোমার মাথা আর মুণ্ডু—শেষ পর্যন্ত না তোমাকে পাগলাগারদে পাঠাতে হয়! পাহাড়ীদের এমনি সব ভুতটুতের বাতিক আছে জানি বলেই এ নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামালুম না।

ছেলেমেয়েরা চিঠি দিয়েছে: 'এবার চলে এসে মা, আর কতদিন থাকবে এই শীতের

মধ্যে।' আমিও আর শীত বিশেষ সহ্য করতে পাচ্ছিলুম না, তাই মনে মনে এবার নেমে যাবারই সঙ্কল্প করলুম। প্রথম যাবার কথা বলতেই জেটি একেবারে কান্নাকাটি সুরু করে দিলে। সত্যি এর পর এসে জেটিকে যে আবার দেখতে পাব, এমন আশা করা যায় না। ওকে অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিলুম।

তারপর একদিন সত্যিই যাবার দিন এসে উপস্থিত হ'ল। কারসিংয় ছেড়ে যেতে নিজেরই মনটা কেমন যেন ভার ভার লাগছিলো। জিনিসপত্তর গোছান হয়ে গেলো—বাক্স বিছানা সব বাঁধা। ট্রেনের জলখাবারটি পর্যন্ত জেটি ভাল করে গুছিয়ে বেঁধে দিলে। জেটির জন্যে এতো মন কেমন করছিল যে, তার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলতেই পাচ্ছিলুম না।

বেলা বারোটায় ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হলুম। অনেকেই ষ্টেশনে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

ট্রেন ছাড়বার যখন আর বেশী দেরি নেই—জেটি তখন ভীষণ কান্নাকাটি করতে লাগল। মনে হ'ল সত্যিই ওর সঙ্গে বোধ হয় এই শেষ দেখা। তাকে একজন ধরে প্ল্যাটফরমের বাইরে নিয়ে গেল। ট্রেন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরম ছেড়ে এগুতে লাগল। দেখি, প্ল্যাটফরম ছেড়ে ঠিক পথের ধারে, রেল লাইনের একটু দূরে, পাহাড়ের গা-ঘেঁষে একটা বড় গাছের নিচে জেটি বসে বসে চোখ মুচছে। আমি জানলার ধারে আরো সরে গিয়ে বসলুম, ওকে দেখার জন্যে। ঝলমলে রোদে চারিদিক উদ্ভাসিত—আকাশের নীলিমায় টুকরো টুকরো শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ভরা দুপুর। হঠাৎ স্পষ্ট দেখলুম—জেটির পিটের কাছে দাঁড়িয়ে যোগমায়া—এক গাল হেসে আমায় সেলাম করছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—যোগমায়া! যোগমায়া!...

সে তেমনি মিষ্টি হেসে—চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি কপালে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।...

ট্রেন তখন ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

বরযাত্রীর বিপদ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

×

ট্যাপ্‌নার তের বছরের জীবনে আজ একটা উল্লেখযোগ্য দিন। অত্যন্ত আদুরে আর অতি বড়লোক বলে বাড়ীর বাইরে পা দেবার অধিকার তার আদৌ নেই!

দাদু ওকে চোখে-চোখে রাখে···পলকে প্রলয় হেরে! ইস্কুল আর বাড়ী···তাও নিজেদের ঘরের মোটরে! এ ভালো লাগে কখনো? রাস্তার ধূলো কখনো পায়ে লাগে না ট্যাপ্‌নার। পাড়ার ছেলের দল—লাটিম ঘোরায়, ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়ায়, রাস্তা থেকে চানাচুর কিনে খায়··· ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সবাইকার কাঁধে-কাঁধ দিয়ে বানর নাচ দেখে···জীবন যেন ওদের হাল্‌কা স্রোতে পাল-তোলা নৌকো!

কিন্তু ট্যাপ্‌নার এ সব কথা চিন্তা করাও নাকি অন্যায়! আজ জীবনে প্রথম সুযোগ পেয়েছে সে!

দাদু অনুমতি দিয়েছেন—পাশের বাড়ীর পল্টুর দাদার বিয়েতে বরযাত্রী যেতে পারবে!

সারারাত স্বপ্ন দেখেছে ট্যাপ্‌না।

সে আর আলাদা-আলাদা—একা-একা নয়!

ক্লাসের ছেলের দল ওকে ক্ষ্যাপায়—

"একটা সুরে গাই
পালে না পায় ঠাঁই!"

কিন্তু আর নয়, এবার দশজনের একজন হয়ে বরযাত্রী যাবে সে! কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে, সবার পাশে—গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে, কলার পাতায় নেমতন্ন খাবে···আর আজ তাকে কোনো মতেই আলাদা ভাববার জো নেই!

সারাদিন ধরে জামা-কাপড় গুছিয়েছে ট্যাপ্‌না। গিলে করা পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি, 'কিপ্‌কুল' গেঞ্জি, পাম্পসু···সব ঠিকঠাক্ ছিম্‌ছাম্ গোছানো আছে।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে টেরি-বাগানো নিয়ে! মাথার চুলগুলি কি কিছুতে বাগ মানতে চায়? চিরুণী দিয়ে যদি ডান দিকে আঁচ্‌ড়ে দেয় ত' সব অবাধ্য গরুর পালের মতো বাঁ দিকে গিয়ে হাজির হয় তারা। চুলের কেয়ারী যদি ঠিকমতো করা না হ'ল—তবে বরযাত্রী যাওয়াই ত' বৃথা! অনেক ভেবে ঠিক করলে জল দিয়ে মাথা ভিজিয়ে তবে মাথা আঁচ্‌ড়াতে হবে। তবে যদি কদম-ছাঁট চুলগুলি কোনো রকমে বাগ মানে!

যদি বা কসরৎ করে সামাল দেয়া গেল টেরিকে···কিন্তু পাঞ্জাবী পরতে গিয়ে চুলের দু'পাশ আবার উঁচু হয়ে ওঠে! এ যেন সেই কুকুরের ল্যাজ সোজা করার মতো শক্ত কাজ হয়ে দাঁড়ালো!

ইস্কুলে যেতে হাফ্ প্যান্ট পরলেই চলে। কিন্তু বরযাত্রী যাওয়ার ব্যাপারই আলাদা!

সব চকচকে ঝক্‌ঝকে হওয়া চাই! এমন কি সিল্কের রুমালে সেণ্ট্ অবধি মাখ্‌তে হবে।

ওর খাস্ চাকর বিন্দে ওকে সাহায্য করতে এসে ধমক্ খেয়ে চলে গেল! না, স্বাবলম্বী হতে হবে ওকে··· সব নিজের হাতে করা চাই···বোতাম লাগানো থেকে সুরু ক'রে জুতো পরা—এমনকি রুমালটি ভাঁজ করে বুক-পকেটে একটুখানি বের করে রাখা অবধি!

টিপ্‌টাপ বরযাত্রী সেজে পল্টুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল ট্যাপ্‌না।

স্বাস্থ্য ভালো করো

শ্রীশরদিন্দু বসু
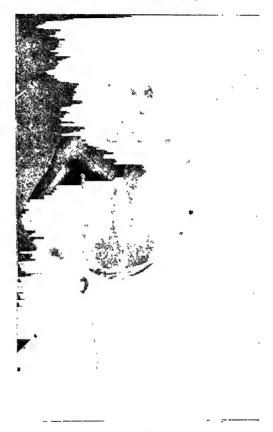
দাদু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুধু মুখ টিপে-টিপে হাস্‌লে। তা'হলে লায়েক হতে চলেছে তার নাতি!

লম্বা একটি বাস ভাড়া করা হয়েছে বরযাত্রীদের জন্য।

ট্যাপ্‌নার হাত ধরে পল্টু গিয়ে উঠলো সেই বাসে। সঙ্গে বরের বন্ধুরা। সবাইকার গা থেকে আতর আর গোলাপজলের গন্ধ ভুরভুর করছে। ট্যাপ্‌নার মনে হ'ল—একদিনে সে বড় হয়ে গেছে—তাই ত' সবাই তার পাশে বস্‌বার পেয়েছে সমান অধিকার। আজ আর বিন্দে ওকে খোকাবাবু বলে ডাকৃতে সাহস পাবে না।

কন্যাপক্ষের বাড়ীর সাম্‌নে বাস থাম্‌তে একদল ভদ্রলোক ছুটে এলেন—'আসুন-আসুন' শব্দে। ট্যাপ্‌নার সত্যি হাসি পেতে লাগলো; কোনো রকমে রুমালে মুখ চেপে উপ্‌চে-পড়া হাসি বন্ধ করলে।

গেটের সাম্‌নে আরো দু'জন ভদ্রলোক তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বরযাত্রীদের সবাইকার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন একটি করে বেলের শাদা মালা। ট্যাপ্‌নাও বাদ গেল না। তার কেবলি মনে হতে লাগ্‌লো—সে কি ইস্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি হয়ে গেল নাকি? ভারী মজা লাগলো তার! দাদু যদি দেখ্‌তে পেতো ত' অবাক হয়ে যেতো নিশ্চয়ই!

কিন্তু বিপত্তি ঘটল তার পরক্ষণেই। মালার দিকে চেয়ে পথ চল্‌তে গিয়ে একটা কলার খোসায় হড়কে পড়ে সে হুড়মুড় করে গিয়ে হাজির হ'ল সেই লোকটার ঘাড়ে, যে সবাইকার গায়ে আতর আর গোলাপজল ছিটিয়ে বেড়াচ্ছিল!

ঝন্ ঝন্ করে শিশিগুলি মেঝেতে পড়ে ভেঙে খান্ খান্! লোকজন ছুটে এলো—চারদিক থেকে। কিন্তু বরযাত্রীর সাতখুন মাপ। সবাই এসে শুধোতে লাগলো, লাগেনি ত' খোকা?

ট্যাপনা তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। সেই সময় তাকে বাঁচিয়ে দিলে পল্টু। কানে-কানে বল্লে, ছাদে খাবার জায়গা হয়েছে। আয় শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে—

ওকে কিছু বলবার ফুরসৎ না দিয়ে, হাত ধরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পথ ধরে তর্ তর্ করে ওপরে উঠে চলে গেল।

সারি সারি পাতা পড়েছে ছাদের ওপর। পল্টু বল্লে, চট্‌পট্ চলে আয়—নইলে এখুনি ভর্তি হয়ে যাবে। একটু দেরি করেছিস কি বোকা বনে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে। তারপর আবার দেড় ঘণ্টা বাদে আর এক ব্যাচ্!

রাতারাতি চালাক হতে চায় ট্যাপ্‌না। কিন্তু তার পা লেগে একটি জল-ভরতি গেলাস উল্টে পড়ল এক ভদ্রলোকের পাতের ওপর! গরম পোলাও ঠাণ্ডা জলে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে। তিনি চোখ গরম করে রেগে উঠেই থেমে যান। বরযাত্রীর দল···আজ তাদের সাতখুন মাপ!

কোনো দিকে না তাকিয়ে পল্টুর সঙ্গে গিয়ে দু'টি আসন অধিকার করে বসে ট্যাপ্‌না।

পরিবেশন সুরু হ'ল দ্রুতবেগে! যেন যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে সবাই। ওকে টপ্‌কে, তাকে ডিঙিয়ে, অন্য একজনের পাশ কাটিয়ে পরিবেশনকারীরা টপাটপ্ পাতে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে—লুচি, বেগুনভাজা, ছ্যাঁচড়া, ফ্রাই, আরো অনেক কিছু। যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে—ধরে ধরে খেতে হবে। এক মুহূর্ত দেরি করবার সময় নেই···এক্ষুণি ট্রেন ছেড়ে দেবে!

একজন মোটা ভদ্রলোক গলদঘর্ম হয়ে ছোলার ডাল নিয়ে আস্‌ছিলেন ; টাল্ সাম্‌লাতে না পেরে একেবারে ট্যাপ্‌নার পিঠের ওপর ঢেলে দিলেন খানিকটা ঘন ডাল ! আদ্দির পাঞ্জাবী একেবারে জব্‌জবে হয়ে গেল···'কিপ্‌কুল' গেঞ্জিকেও ভেদ করল এমন অব্যর্থ লক্ষ্য তার !

পল্‌টু বল্লে চুপ্‌চাপ খেয়ে যা। হাওয়া দিচ্ছে ঝির ঝিরে···দই মিষ্টি খেতে খেতে দিব্যি শুকিয়ে যাবে—ভাবনা কিরে !

পল্‌টু যে-ভাবে সমস্যার সমাধান করল, ট্যাপনা কিন্তু সে ব্যবস্থাকে আরামদায়ক মনে করতে পারল না ! ঘামে পাঞ্জাবী আগে থেকেই ভিজে ছিল—তারপর এই ডালের কোটিং ! যেন নরম পাউরুটির ওপর জেলি মাখিয়ে দিয়েছে কেউ !

ভোজন-পর্ব সমাধা হলে—পল্‌টু বল্লে, চল্ সক্কলকার আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই। রাস্তায় দাঁড়ালেই আরাম পাবি। তারপর আমরা দু'জন আগেই না হয় বাসে করে পালিয়ে যাবো'খন।

যুক্তি মন্দের ভালো ভেবে ট্যাপ্‌না পল্‌টুর পেছন পেছন নেমে এলো—বাইরে ফুটপাতে বেরিয়ে বাড়ীর যেদিকটা অন্ধকার সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পাঞ্জাবীর শোচনীয় অবস্থাটা এখানে কারো চোখে পড়বে না !

কিন্তু কে জান্‌তো অন্ধকার ব'লে বিপদ সেখানে আরো বেশী !

ছাদের ওপর থেকে এক ঝুড়ি এঁটো কলাপাতা আর ভাঙা গেলাস—ট্যাপ্‌নার মাথার ওপর এসে পড়ল—ঠিক যেন অভিষেকের পর রাজমুকুটের মতো ! চোখ মেলে তাকাবারও আর অবস্থা রইল না তার !

ট্যাপ্‌না মনে মনে বল্লে, মা বসুন্ধরা তুমি দু'ফাঁক হয়ে যাও—আমি তোমার ভেতর সেঁধিয়ে পড়ি ! মা বসুন্ধরা সীতার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন—কিন্তু ট্যাপ্‌নার বেলায় একেবারে নট্ নড়ন-চড়ন-নট্-কিচ্ছু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন !

হায় বরযাত্রী !

কোলকাতায় জায়গার নাম

ওয়াটগঞ্জ : ওয়াটগঞ্জ মহল্লার নাম কর্ণেল হেন্‌রি ওয়াটশনের নাম থেকে। কর্ণেল ওয়াটশনের প্ল্যান অনুযায়ী খিদিরপুর ডকের সৃষ্টি হয়।

আলুগুদাম : ক্লাইব ষ্ট্রীট অঞ্চলের এক অংশের নাম আলুগুদাম। এখানে আসলে আলু নয়, তুলার গুদাম ছিল পোতুর্গীজদের আমলে। পোতুর্গীজরা তুলাকে বলত 'অল্'। তাই থেকেই এই আলুগুদাম নাম দাঁড়িয়ে যায়।

আনন্দময়ীর আগমনে

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

*

শিশুরা আজো ভিড় ক'রে আসে দলে দলে,
কোটরগত হলুদ-চোখে তাকিয়ে দেখে কৌতূহলে
বাঁশ, দড়ি আর খড় দিয়ে সেই প্রথম
"কাঠাম্" তৈরী···
চাল-চিত্র, অসুর, সিংহ, লক্ষ্মী, সরস্বতী,
শিব, কার্তিক, গণপতি,
মা-দুর্গা আর ইঁদুর, ময়ূর,
'এক-মাটি' আর 'দুই-মাটি' :
রঙের পোঁচ আর তুলীর টান···
ঝলমলিয়ে হেসে-ওঠা মায়ের মুখ আর
ঠাকুর-দালান।
ফনা-মেলা জীবন্ত সাপ—আসল শংখ-নাগ
আর অসুর বুকে ফিন্‌কি দেওয়া তাজা-রক্তের দাগ
আজো দেখে অবাক হয় হালের ছেলেমেয়েরা,
যেমন দেখতো আগের কালের শিশুরা।
কিন্তু এদের কালি-পড়া মলিন চোখের তলে
সেদিনের সেই উপ্‌ছে-পড়া
হাসি-খুশির হর্ষ কি আর গলে ?
আজকে এরা দেখতে কি পায় আর
সেদিনের সেই মোয়া, মণ্ডা,
চিড়ে, মুড়ি, খৈ, বাতাসার পাহাড় ?
দৈ, কদমা, চিনি, নারকেল, কলা, শসা,
আখের ছড়াছড়ি
ক্ষীর পায়েস আর লুচির জড়াজড়ি,
সেই স্তূপাকার পদ্মফুল আর বেলপাতা,
হোমের সুবাস, ধূপের গন্ধ, ভোগের অজস্রতা ?
নতুন কাপড় নতুন জামা—তাক্ ডুমাডুম্ ডুম ?
সেই ঠাকুর প্রণাম, ভোগ বিতরণ, নিমন্ত্রণের ধুম ?
তারপরে সেই বিদায়-তিথি, বিসর্জনের শেষে
চোখের জলে ভেসে
নমস্কার আর কোলাকুলির প্রথা,
আজ মনে হয় স্বপ্ন-কথা !
আজওতো সেই আগের মতই আসে ছেলের দল
তেম্‌নি আসে পূজার তিথি আনন্দে উতল,
কিন্তু কই সে নতুন কাপড়,
নতুন জামা, জুতো, চাদর···
দেয়নাতো কেউ কিনে :
খালি পেটে ধুঁকে ধঁকে টোঁ টোঁ করে রাত্রি-দিনে
রোগা মায়ের আঁচল ধরে আজো তারা-ঠেঙিয়ে
ঠাকুর দেখে ;

একটি কুচি শসা কিম্বা
একটু ভাঙা বাতাসাও
হাতের পরে দেয়নাতো কেউ ডেকে !
ঠাকুর তারা দেখেছে, অগুন্‌তি :
কিন্তু কোথাও দেখেনিতো সদয় দু'টি হাত
স্নেহ ভরে ওদের হাতে
দিচ্ছে তুলে কোনখানে
একটি নাড়ু, এক ফোঁটা জল, একটু মায়ের
প্রসাদ।

ছবির পাতা

আমেরিকান নেভীর "ভাইকিং" রকেট

সম্প্রতি ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্-এর নৌবিভাগ রকেট ব্যাপারে পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। এই নতুন রকেটটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাইকিং' রকেট। একক এই রকেটটি ১৩৫ মাইল উচ্চে উঠে পৃথিবীর রকেট ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে।
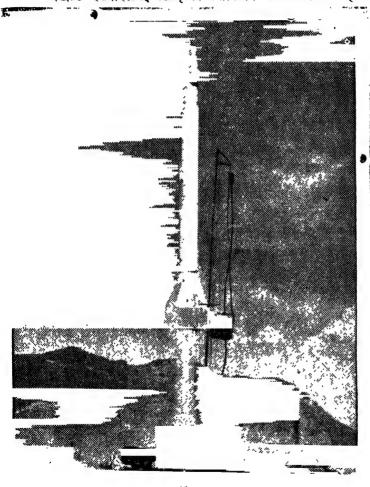
'ভাইকিং' আকাশ-পথে যাত্রা করছে

ভাইকিংকে উপরে তোলার জন্য আমেরিকান নৌবিভাগের খরচ বড় কম হয় নি। পঁচিশ মাইল উপরে তুলতেই তাঁদের খরচ হয়েছে লিকুইড্ অক্সিজেন ও এলকোহল মিলিয়ে প্রায় চার টন, ৭৫ সেকেণ্ডের জন্য। এই ভাবে এই রকেটটি ১৩৫ মাইল যায় চার মিনিট ২৩ সেকেণ্ডে।

শোপ-বক্স ডারবি প্রতিযোগিতা

পনেরো বছরের ছেলে ডারউইন কুপার এবার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটস্‌-এ ওহিয়োর ডারবি ডাউনস্‌-এ যে ন্যাশানল শোপ-বক্স প্রতিযোগিতা হয় তার চতুর্দশ বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ট্রফি পায়, এবং সেই সঙ্গে চার বছরের জন্য কলেজ কলারশিপ লাভ করে।

এই শোপ-বক্স প্রতিযোগিতাটিকে একটি মজার খেলাও বলতে পারো তোমরা। মাত্র এগারো থেকে পনেরো বছরের ছেলেরা এতে যোগ দিতে পারে। কাঠের বাক্সের গাড়ি তৈরী করে সেই গাড়ির রেস হ'ল এই 'শোপ-বক্স ডারবি প্রতিযোগিতা'।

এই প্রতিযোগিতার খুব নাম। পৃথিবীর নানা দূর দেশ, যেমন জার্মানী, কানাডা, আলস্কা থেকেও এবার বহু প্রতিযোগী এসেছিল। সবশুদ্ধ এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা হয়েছিল ১৪১ জন।

একটি পাহাড়ের উপর থেকে গাড়িগুলি নিচে ঢালু রাস্তার উপর গড়িয়ে দিয়ে এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এবার কুপার তার গাড়ি নিয়ে ৩০৫ গজ ঢালু রাস্তা মাত্র ২৯-৯৭ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে বিজয়ী হয়েছে। এই গাড়ি তৈরী করতে কুপারের তিন মাস সময় লেগেছিল।

ছবির পাতা

লেপটা কি বলে ?

(জাপানী গল্প)

একটা সরাইখানা। তার মালিক ছিল খুব গরীব। সরাইখানাটার আসবাবপত্র যদিও খুব ভাল ছিল না, তবুও সেগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। একদিন সেই সরাইখানাতে একজন বণিক এলেন এবং খাওয়াদাওয়া শেষ করে শুতে গেলেন।

কিছুক্ষণ ঘুমানর পর দুটি বালকের কথোপকথনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনলেন ওদের একজন বলছে, "দাদা, তোমাকে ঠাণ্ডা লাগছে ?" তাঁর মনে হ'ল ওরা সরাইখানারই মালিকের ছেলে। তাই তিনি বললেন, "ওহে, এটা তোমাদের ঘর নয়, এখানে গোলমাল করো না।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। আবার তিনি সেই একই কথা শুনতে পেলেন। বণিক তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বেলে দেখলেন যে, ঘরে কেউই নেই ! আলোটা জ্বেলে রেখেই তিনি শুয়ে পড়লেন এবার। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার সেই কথা কানে এলো। তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে, ঐ কথাগুলো আসছে লেপের ভেতর থেকে। তাড়াতাড়ি তিনি নিজের জিনিসপত্র বেঁধে ঐ হোটেলের মালিকের কাছে গিয়ে বললেন যে, "লেপের ভিতর থেকে কে কথা বলছে মশাই !" এই শুনে মালিকটি খুব রেগে গিয়ে তাঁকে বললে, "আপনি নিশ্চয়ই কিছু নেশা করেছেন, সেই জন্যে এই কথা বলছেন। লেপ কখনো কথা বলে নাকি !" কিন্তু বণিক সেখানে আর থাকতে চাইলেন না। তিনি তখনই চলে গেলেন।

তার পরদিন আরেকজন এলেন হোটেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ ঘুমানর পর তিনিও মালিকের কাছে এসে ঐ একই কথা বললেন। মালিকটি আবার বললে, "আমি আপনাকে আরাম দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, সুতরাং এই আষাঢ়ে গল্প ব'লে ,আমাকে বিব্রত করা আপনার অনুচিত।" কিন্তু লোকটি রাগতভাবে বললেম, "এটা বাজে গল্প নয়।" তিনিও তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন।

যখন দ্বিতীয় লোকটিও চলে গেল, তখন সরাইখানার মালিক কারণ অনুসন্ধান করার জন্য লেপগুলিকে তুলে দেখতে লাগল। সেও শুনতে পেলে যে সত্যিই একটা লেপ থেকে কার যেন কথা শোনা যাচ্ছে। যার কাছ থেকে ঐ লেপটা কিনেছিল, তৎক্ষণাৎ সে তার কাছে

এগিয়ে বললে, "আপনি কার কাছ থেকে এই লেপটা কিনেছেন?" লোকটি বললে "সে একজন বাড়ীর মালিকের কাছ হতে ওটা কিনেছে, এবং তার বাড়ী সরাই খানাটার পাশেই।

কিছুদিন আগে ঐ বাড়ীতে এক দরিদ্র পরিবার বাস করত। দুটি ছোট ছোট ছেলে ও মা-বাবা নিয়ে ছিল তাদের সংসার। তাদের মা ছিলেন পীড়িত। বাবা খুব কম বেতনে কাজ করতেন। এক শীতকালে তাদের বাবাও পীড়িত হয়ে মারা যান। কিছুদিন পরে মা-ও মারা গেলেন। সংসারে রইল ঐ দুটি ভাই মাত্র ক্ষুধার জ্বালায় তারা ঘরের সমস্ত জিনিস বিক্রী করতে বাধ্য হ'ল। শেষে তাদের আর রইল একটি মাত্র লেপ। এক শীতকালে বাইরে তুষারপাত হচ্ছিল। তারা ঐ লেপটা গায়ে জড়িয়ে বসে রইল। ছোট ভাইটি দাদাকে বললে, "দাদা তোমার ঠাণ্ডা লাগছে?" দাদা বললে, "তোমার ঠাণ্ডা লাগছে?" এই কথাগুলি কোন এক যাদুশক্তির দ্বারা ঐ লেপে
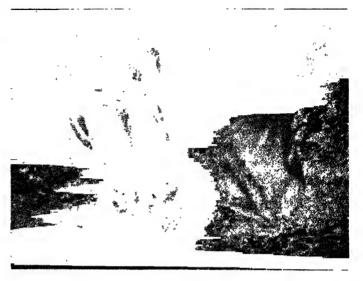
হিপোর হাঁ
ফটো: শ্রীসোমেশ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই সময় বাড়ীর মালিক এসে তাদের বলল: বাড়ীর ভাড়া দাও।

—মহাশয় আমাদের আর কিছুই নেই।

—তা'হলে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাও। আমি এই লেপটা তোমাদের বাকী ভাড়ার জন্য রাখলাম।

—মহাশয়, বাইরে তুষারপাত হচ্ছে যে।

—কোন কথা শুনতে চাই না—বেরিয়ে যাও। এই বলে তিনি লেপটি নিয়ে ঐ লোকটির কাছে বিক্রী করলেন।

সুতরাং তাদের বেরিয়ে যেতে হ'ল। তাদের পরনে তখন একটি মাত্র পাতলা জামা। তারা বাড়ীর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল।

মাথার উপর তুষারপাত হতে লাগল। শেষে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে তারাও গেল মারা। একজন পথিক তাদের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ক্যানন দেবীর মন্দিরে পাঠিয়ে দিল এবং সেখানে তাদের কবর দেওয়া হ'ল। এই দেবীর ছিল নাকি এক হাজার হাত। কথিত আছে যে, স্বর্গে গিয়ে শান্তি ও আরাম ভোগ করার পথ খোলা থাকলেও, তিনি সেখানে না গিয়ে মর্ত্যের আর্তলোকদের সাহায্য করার জন্য এখানে আছেন।'

এই ঘটনা শোনার পর সরাইখানার মালিক ঐ মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে লেপটা দিয়ে তার ইতিহাস সবাইকে বললে। শুনে সবাই অত্যন্ত দুঃখিত হ'ল। এর পর থেকে ঐ লেপটা আর কোন কথা বলেনি। কারণ এই ঘটনাটা সবাইকে জানাতে লেপের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

আজও পৃথিবীতে বহুলোক খেতে পায় না, উপযুক্ত বাসস্থান পায় না—তাদের জন্য কি আমাদের এই দেবীর মত মুক্ত হস্তে সাহায্য করা উচিত নয়?

শ্রীঅশোককুমার সরকার

খোকার সাধ

থাকবো না মা তোমার কোলে
আদর স্নেহের ভারে,
সদাই জাগে অন্তর মোর—
যেতে সাগর পারে।
কলাম্বাসের মতই আমি
জাহাজ নিয়ে সুখে,
নাম-না-জানা দেশের খোঁজে
চলবো সাগর বুকে।
দেখবো সেথা আছে কারা?
করবো নাক ভয়,
বুঝবে তখন তোমার খোকা—
মোটেই ভীরু নয়।

হাসান আলী শাহ

পথিক
শিল্পী : শ্রীবাসুদেব দাসগুপ্ত
বেনিয়াপুকুর বিদ্যাপীঠের ছাত্র (বয়স ১২ বছর)

নতুন বই

সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন

বাবলা রাণীর ছড়া—শ্রীসুধা দেবজা। এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা ১২। মূল্য : ১॥০

দু'রঙে ছাপা সুন্দর ছড়ার বই। আবৃত্তির পক্ষে উপযোগী। ছোটদের উপযুক্ত ছন্দ ও ভাষা। ছবিগুলিও খুব সুন্দর। কবিশেখর কালিদাস রায়ের ছোট্ট ভূমিকাটি যেমন বইখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছে, তেমনি শৈল চক্রবর্তীর ছবিগুলিও করেছে বইখানিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

ভলিবলের নিয়মাবলী—শ্রীস্বরাজ দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৩৭বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪। মূল্য : ॥০

বাংলা ভাষায় খেলাধূলার বই কম। সেদিক থেকে এই বইটির লেখক ব্যাড্‌মিণ্টন, টেনিস, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলার কয়েকখানি বই লিখে ক্রীড়ামোদিদের যথেষ্ট উপকার করেছেন। ভলিবল খেলা যারা শিখতে চান, এ বইটি তাঁদের বিশেষ উপকারে আসবে। প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আছে বইখানির মধ্যে।

নতুন ছড়া—শ্রীসুখলতা রাও। এম. সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য : ১।০

বহু খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের লেখার জন্য বহুকাল থেকে লেখিকার নাম পরিচিত। ইংরেজী নার্সারী রাইম থেকে বহু সুন্দর সুন্দর ছড়া অনুবাদ ক'রে সম্পূর্ণ দেশী ছাঁচে ফেলে তিনি এই বইখানি বাংলার ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। এর ভিতরের ছবিগুলিও তাঁর নিজের হাতে আঁকা। প্রচ্ছদপটটিও খুব সুন্দর।

অজস্র ছবিতে ভরা এই ছড়ার বইখানি হাতে পেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা যে খুশি হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

মিঠেকড়া—সুকান্ত ভট্টাচার্য। সরস্বতী লাইব্রেরী, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য : ২৲

ছেলেদের জন্য লেখা বড় ও ছোট কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। বইয়ের নামের মত দু'রকমেই কবিতা আছে এতে। শব্দ, ছন্দ ও কবিতার আধুনিক ভাব কতকগুলির মধ্যে খুবই সুন্দর, কিন্তু কতকগুলির মধ্যে রসের চেয়ে কষই বেশী প্রকাশ পাওয়ায় সেগুলি হয়ে গেছে বেশী কড়া।

এতে ছেলেমেয়েদের মন অহেতুক ভারাক্রান্ত হবে। বইখানির সাজসজ্জা, ছাপা, প্রচ্ছদপট ও দেবব্রত মুখোপাধ্যার ছবিগুলি আমাদের খুবই খুশি করেছে। যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় আছে এর মধ্যে।

সেকাল ও একাল—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ. মুখার্জী এণ্ড সন্স লিঃ কলিকাতা ১২। মূল্য : ২৷৷০

নানা ধরনের গল্প ও কাহিনীর সুন্দর একখানি বই 'সেকাল ও একাল'। যেমন কাগজ, তেমনি ছাপা ও ছবি। লেখাও সুন্দর প্রমোদবাবুর। এই ধরনের বই-ই আজকাল ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত—যার মধ্যে জ্ঞান, শিক্ষা ও আনন্দ এই তিনটি জিনিসই মিশেছে একসঙ্গে। আমরা এই বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

ছড়ার ছবি (৩য় ভাগ)—শ্রীসুনির্মল বসু লিখিত ও শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত। শিশু-সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য : ১৲

'ছড়ার ছবি', যে নিয়মিত বেরিয়ে চলেছে এটা খুবই আশার কথা। এ থেকে ভালো বইয়ের দিকে দেশের অভিভাবক ও ছেলে-মেয়েদের যে দৃষ্টি রয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। এই সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পরিচয় এর আগে আমরা প্রকাশ করেছি। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মত এই তৃতীয় ভাগটিও চমৎকার হয়েছে। পাতা-ভরা সুন্দর ছবি আর তার সঙ্গে সুন্দর কবিতাগুলি ছেলে-মেয়েদের মনকে যে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিশোর গ্রন্থাবলী (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : ১ম ২৲, ২য় ১।০, ৩য় ২৷৷০

ধীরেন্দ্রলাল ধরের কয়েকটি নানা ধরনের উপন্যাস এই তিন খণ্ড গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছবিতে ছাপায় সুন্দরভাবে ধরে দেওয়া হয়েছে ছেলে-মেয়েদের জন্য। খ্যাতনামা লেখকের লেখা সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, ছেলেমেয়েরা সকলেই তাঁর এই গ্রন্থাবলী হাতে পেয়ে খুশি হবে। অল্প দামে সুন্দর ছবিতে ও ছাপায় এই ধরনের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে প্রকাশক শিশু-সাহিত্যের যে যথেষ্ট উপকার করলেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

নতুন ধরনের ধাঁধা

(১) একটা মোরগ সপ্তাহে যদি তিনটে করে ডিম পাড়ে, আর তার একটা করে ইঁদুরে টেনে নিয়ে যায় ফি হপ্তাতেই, তা'হলে মোট কুড়িটা ডিম জমাতে তার কতদিন লাগবে ?

---

(২) **একটা নামকরা আঁক ঃ**

নীচের সংখ্যাগুলি যোগ দাও—

অণিমা-র $\frac{2}{3}$ দুই তৃতীয়াংশ,

অম্বালিকা-র $\frac{1}{4}$ এক-চতুর্থ,

মণিকা-র $\frac{1}{3}$ এক তৃতীয়াংশ,

প্রাণতোষিণী-র $\frac{1}{5}$ পাঁচ ভাগের এক ভাগ,

এইসব ভাগযোগ দিয়ে আরেকটা আন্‌কোরা মেয়ে বানাতে হবে। পারবে বানাতে ?

---

(৩) টালার থেকে টালিগঞ্জ (কিম্বা বালির থেকে বালিগঞ্জ) অব্দি জড়াতে হলে মোট কতো গুল্‌তি উল্ লাগবে ? জড়াতে কিম্বা গড়াতে হলে ?

---

(৪) নিচের বাক্যটির যথাস্থলে এমনভাবে কমা ও দাঁড়ি বসাতে পারো কি, যাতে ওর একটা মানে দাঁড়ায় ?

হাওয়া এখন যদি বলেন নৌকা খুলি বল্ল।

---

(৫) **টিকিটের টীকাভাষ্য**

দুই ব্যক্তি বসেছিল বাসে। পাশাপাশি বসেছে দু'জনায়। দু'জনেই এক মোড়ে উঠেছে, কিন্তু কেউ কারো চেনা নয়।

কণ্ডাক্‌টারও চেনে না ওদের কাউকে। যখন সে ভাড়া চাইতে এলো তখন দু'জনেই ওকে দু'আনা করে দিল। বিনাবাক্যব্যয়েই দিল—কোনোরকম ইঙ্গিত-ইসারা না ক'রে—কিছু না বলেই।

প্রথম লোকটিকে কণ্ডাক্‌টার একখানা দু'আনার টিকিট দিয়েছে—কোনো দ্বিরুক্তি না

করেই। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটির বেলায় সে কথা না ব'লে পারলো না—তার কাছে এসে শুধালো—"দু'আনার টিকিট, না, ছ'পয়সার—কী দেব আপনাকে ?"

প্রথম লোকটির বেলায় সে কিন্তু কোনো কথাই তোলেনি। তিনি যে ছ'পয়সার টিকিট চান না তা সে টের পেলো কি ক'রে ?

জবাব

(১) অনন্ত কাল। কেননা এখন অব্দি মুর্গিরাই ডিম পাড়ে, মোরগেরা পাড়ে না।

(২) মণিমালিনী।

(৩) একটাই। যদি বেশ বড় গুল্তি হয়।

(৪) হাওয়া এখন **কমা** যদি বলেন নৌকা খুলি, **দাঁড়ি** বল্ল।

প্রথম লোকটি যে দু'আনি দিয়েছিল তার একটা ছিল আনি, আর, দুটো ডবোল্ পয়সা। সে যদি ছ'পয়সার টিকিট চাইতো তা'হলে সে ঠিক ঠিক ভাড়াই দিতে পারতো অনায়াসেই ; তার কোনো অসুবিধা ছিল না।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি দুটো আনি দিয়েছিল, কাজেই তার দু'পয়সা ফেরৎ চাই কিনা সে বিষয়ে ওয়াকিব্হাল হওয়ার দরকার ছিল কণ্ডাক্টারের।

মজার খেলা

একটি টুথপিক বা এই ছবির সঙ্গে তীর দিয়ে দেখান আছে যে টুথপিক্টি তার মাপে একটি কাঠি কেটে নিয়ে উপর থেকে এই ছবিটির উপর ফেল, যার কাঠি যত সংখ্যার বেশী প্রজাপতির উপর পড়বে সেই জয়ী হয়ে প্রথম স্থান নেবে। তিন চার জনে খেলা যায়।

মধুচক্র

তোমাদের কাছে যখন মৌচাক পৌঁছবে তখন নয় পূজো শেষ হয়ে গিয়েছে, নয় তো শেষ হবে হবে। সারা বছর ধরে আমরা এই দিন ক'টির জন্য অপেক্ষা করি।—এই দিনটি যেন আমাদের কাছে উপস্থিত নানা আনন্দ উৎসাহ বহন করে আনে—সারা বছরের দুঃখ, ক্লেশ, গ্লানি ভুলে গিয়ে আমরা এই দিনটিকে যেন সাদরে আহ্বান জানাই। এই ক'টি দিন আমরা নিজেদের সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে শত্রু মিত্র নির্বিশেষে মিলিত হই—বৎসরকাল ধরে এই দিনের প্রতিক্ষা করি আমরা।

কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় এসে আমরা পৌঁচেছি, জীবন থেকে সব আনন্দ যেন বিদায় নিচ্ছে। চারিদিকে কেবল 'নেই নেই' রব আর অনুযোগ। তোমরা যখন আনন্দ করবে বলে বেরোবে, সেই সময় পাশেই হয়তো তোমারই মত একজন অনশনে ও অভাবের তাড়নায় ভিক্ষা চাইছে। এ দৃশ্য আমরা অহরহ দেখছি,—কেউ খেতে পাচ্ছে না আর কেউ খেয়ে ফুরতে পাচ্ছে না। পূজোর এই ক'টি শুভদিনে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ—যা পারো, যতটুকু পারো, তোমাদের ছোট্ট মুঠিতে যা ধরবে, তাই দিয়ে অন্ততঃ একজনেরও কিছুটা অভাব দূর করতে চেষ্টা করবে। তাতে তার কতটুকু উপকার হবে জানি না—কিন্তু তোমার হবে। এইটুকু আজকের দিনে মনে রেখো।

তোমাদের চিঠির জবাব: ননীভূষণ আইচ (উংলা)—অত মুষড়ে পড়লে চলে নাকি?—সকল বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে তাকে জয় করার মত সামর্থ সঞ্চয় করাটাই একমাত্র কর্তব্য। ভাগ্যকে দোষী না করে তাকে প্রয়োজন মত তৈরী করে নাও। **ডলি** ও **নমিতা চক্রবর্তী** (কৃষ্ণনগর)—তোমরা যাদের কথা বলেছ তারা কেউ এখন আমায় চিঠি দেয় না। আসন্ন পরীক্ষার জন্যে ভেবে কি লাভ বলো, বরং এখন থেকে ভালভাবে প্রস্তুত হও। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার বিরাট চিঠি পড়লাম। শোন, তোমাদের কোন চিঠিই আমার অমূল্য সময় নষ্ট করে না—সে যত বড়ই হোক আর যত ছোটই হোক। আগের আল্পনাটা ভেবেছিলাম আমায় পাঠিয়েছ, সেই জন্যে আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম এখন খুঁজে পাচ্ছি না। এবারেরটি যথাস্থানে পৌঁছে দেবো।···তোমাদের ক্লাসের বন্ধুদের ব্যবহার শুনে আমার মোটেই ভালো লাগলো না। চেষ্টা কর ওদের এরকম মনোভাবকে শুধরে দেবার। ডাক-টিকিট যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি ঠিকানা পাঠাবার জন্য। অন্যটির জন্যে পরে ঠিকানা দিয়ে চিঠি লেখ; ডাক-টিকিট পাঠাতে হবে না। **সুস্মিতা ঘোষ** (কোলকাতা)—তোমাদের লেখা দুটি যথাস্থানে পৌঁছে দিলাম। দুটির মধ্যে একটিকে আরো আগে পাঠানো উচিত ছিল। **শঙ্কর চক্রবর্তী** (কৃষ্ণনগর)—তোমার চিঠির জবাব যার মারফত চেয়েছ সেখানে আলাদা ভাবে চিঠি লেখ, তা'হলেই জবাব পাবে। এরকম ভাবে চিঠি দেওয়ায় অনেক অসুবিধে আছে। **অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়** (বোলপুর)—তোমার চিঠির জবাব খুব

ছোটতে বলা সম্ভব নয়—তার মধ্যে যতটা বলা সম্ভব তা বললাম। **গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়** (মিঠানী)—তোমার লেখা পাঠিও তারপরে বোলব তা সম্ভব কিনা প্রকাশ করা। **মঞ্জুশ্রী চক্রবর্ত্তী** (বালুরঘাট)—তুমি যার কথা লিখেছ সে আমাকে এবারে চিঠি লিখেছে। তোমার মজার লেখাটি রাখলাম। **গোবিন্দ সেন** (হাওড়া)—তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর আমি এর আগে ২।১ জনকে দিয়েছি—মধুচক্র খুললেই দেখতে পাবে। যাদের চিঠি পেয়েছি —**শোভনা রায়** (বালুরঘাট)—**সুনীল-কুমার মজুমদার** (বৈদ্যবাটী)—**অরুণ চক্রবর্ত্তী** (কোলকাতা)—**স্নিগ্ধা, জয়ন্ত, প্রশান্ত দত্ত** (শ্যামনগর)—**মঞ্জুশ্রী, মীনা, টুলটুল মুখোপাধ্যায়** (দমদম)।

আচ্ছা আজ এইখানেই শেষ করি। পূজায় আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। ইতি—

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**

---

* আলোকচিত্র-পরিচয় *

(৪৪ থেকে ৫৬ নং ছবি)

৪৪। শ্রীঅলকা মিত্র, ১১১এ, ডোভার লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; ৪৫। শ্রীঅমর শুড়, ২০ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৪৬। শ্রীপ্রণব চৌধুরী, ৯ গরদানীবাগ, পাটনা ২; ৪৭। শ্রীবাণী সিংহ, পি ৭২এ, সর্দারশঙ্কর রোড, কলিকাতা; ৪৮। শ্রীউদয়ন সেন, ৬ রাজা প্যারীমোহন রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী; ৪৯। শ্রীনন্দকুমার চ্যাটার্জী, c/o জেনারেল পোষ্ট অফিস, মজঃফরপুর, বিহার; ৫০। শ্রীআশুতোষ রায়, ৬ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা; ৫১। শ্রীদীপালী বাগচী, বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ; ৫২। শ্রীমিহিরবরণ, ৭।ই, দেব লেন, ইণ্টালি, কলিকাতা; ৫৩। শ্রীঅমিতাভ বসু, ১২ হালদার পাড়া রোড, কলিকাতা; ৫৪। শ্রীউষসী বসু, ৫২বি, লেক প্লেস, কলিকাতা; ৫৫। শ্রীনিরোজমোহন বসু, ১২ হালদার পাড়া রোড, কলিকাতা; ৫৬। কুমারী এনা সিংহ, c/o ডাঃ বি, পি, সিংহ, পোঃ কাঁকে, রাঁচী। (৫৪, ৫৫ ও ৫৬ নং ছবি তিনখানি রিডিং ম্যাটারের সঙ্গে আছে)।

* আঁচড় টেনে ছবি আঁকা *

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

পরিচয় :—(৫৭) শ্রীকিরণ ধর, নাসিক রোড, বম্বে ; (৫৮) শ্রীনিশীথেশ ব্যানার্জী, বকুলবাগান, কলিকাতা ; (৫৯) কুমারী ঝরণা চট্টোপাধ্যায়, পোঃ বেরিয়ারপুর, মুঙ্গের ; (৬০) শ্রীপার্থ গাঙ্গুলী, রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, দানাপুর, (৬১) শ্রীসমীরা ও সুজন সেন, ২১ লেক টেরেস্, কলিকাতা ২৯ ; (৬২) শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯ ; (৬৩) শ্রীপঞ্চানন দে, ৪৩-৩, নেপাল ভট্টাচার্য ফার্স্ট লেন, কলিকাতা ২১ (৬৪) শ্রীমতী উমারাণী রায়, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭ ; (৬৫) শ্রীবাঙ্ময় ব্যানার্জী, ১০০-১-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ—১৩৫৮

৩২শ বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

পৌরাণিকী

শ্রীনবগোপাল সিংহ

✱

ব্যথিত বক্ষ ভিতিয়া আপন তপ্ত অশ্রুনীরে
স্নেহ-বিহ্বল দীন ব্রাহ্মণ স্বগৃহে এলো ফিরে,
একটি মাত্র কন্যারে তার পাঠালোনা ওরা কেহ
মেয়ের পিতা যে কত পরাধীন রহিল না সন্দেহ।
আনন্দে দেশ ছেয়ে গেছে, আজি আসে আনন্দময়ী
ব্রাহ্মণ আনে আপন ভবনে দুখের বারতা বহি'।
কন্যা-বিহন পূজা-উৎসব আসেনা কল্পনাতে
কেমনে করিবে মায়ের বোধন, শূন্য এ আঙিনাতে ?
স্বামীরে একাকী দেখি, বিস্ময়ে কহে ব্রাহ্মণ জায়া
"একেলা কেমনে ফিরে এলে ওগো, কোথা মোর মহামায়া ?"
সজল নয়নে কহে দ্বিজ, "শুধু অনুনয়ই হ'লো সার
কন্যা মোদের পর হয়ে গেছে, নাহি কোন অধিকার।"

মায়ের বোধন করিলেন দ্বিজ ব্যথার বিল্বদলে
ব্রাহ্মণী করে পূজা আয়োজন তপ্ত অশ্রুজলে।
রাত্রি পোহালো, শারদ-আকাশে, ঝলমলি ওঠে রবি
ভোরের শানাই-এ স্বনিয়া উঠিল অপরূপ ভৈরবী।
অর্গল খুলি ব্রাহ্মণ জায়া যেমন বাহিরে আসে
বিস্ময়ে হেরে মহামায়া তার দাঁড়ায়ে দুয়ার পাশে।
পুলকে জননী প্রাণ-দুলালীরে জড়ায় আপন বুকে
সুখের প্রলেপ পড়িল সহসা, সুগভীর মনোদুখে।
ব্রাহ্মণ কহে, "কেমনে এলি মা, একেলা, কি কারো সাথে ?
সুমতি ওদের কেমনে হ'লো গো, পাঠালো অকস্মাৎ-এ ?"
কহে মহামায়া, "মনের সহসা হলো পরিবর্তন,
তিনদিন পরে ফিরে যাবো আমি, করিয়া এসেছি পণ।"
পূজা-উৎসব সহারোহে চলে, সপ্তমী পূজা সারা
দ্বিজ-দম্পতি কন্যারে পেয়ে পুলকে আত্মহারা।
যত উপাদেয় ভোগ সামগ্রী দুহিতারে দেন খেতে
হাসে মহামায়া, কহে "কত আর খাওয়াবে মা দিনে-রেতে ?"
অষ্টমী পূজা পার হ'য়ে গেলো, পোহালে নবমী রাতি
উদার আকাশে বিজয়ার রবি সহসা উঠিল ভাতি।
বিদায় লগন হলো আসন্ন, কাঁদে আজ মায়ে ঝিয়ে
উৎসব শেষে মহামায়া আজ ফিরে যান স্বামী গৃহে।
পরদিন প্রাতে পত্র আসিল কন্যার গৃহ হ'তে
শুভ বিজয়ার প্রণাম জানায়ে জনক জননী পদে।
লিখেছে কন্যা, উৎসব শুধু কাঁদিয়া কেটেছে হায়
ঘরের বাহির হইনি বারেকো, দেখিনিকো প্রতিমায়,
আমারে না পেয়ে তোমরা কেঁদেছো উৎসব প্রাঙ্গণে
দ্বিজ-দম্পতি ভাবে, একি ছল ; হাসে দেবী মনে মনে।

(সাপ ধরার গল্প)

আজ তোমাদের শোনাব শঙ্খচূড়ের এক বিচিত্র কাহিনী। শঙ্খচূড় যে কি সাংঘাতিক সাপ, তা পূর্বে তোমাদের বলেছি। দৈর্ঘে, আকারে ও শক্তিতে এই বিষধর সাপের তুলনা হয় না। ডিনামাইট কাকে বলা হয়, জানো তো? এর বিস্ফোরণে বড় বড় ইমারত এমন কি পাথুরে পাহাড়ের বড় অংশও মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে যায়। শঙ্খচূড় হ'ল এই জীবন্ত ডিনামাইট। গ্লাস্-কেস্ কিংবা জালতি তারের খাঁচার মধ্যে যখন শঙ্খচূড় থাকে, তখন বাইরে দূরে দাঁড়িয়েও মনের মধ্যে রীতিমত ভয় আর অস্বস্তি জেগে ওঠে। আর এই সাপ যদি কোনো রকমে সহসা মুক্তি পায়, তা'হলে কি ভীষণ অবস্থা দাঁড়ায় বল তো? সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু এমন মানুষও আছেন যাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস অসাধারণ। অপ্রত্যাশিত বিপদে যিনি ধৈর্যহারা না হয়ে এগিয়ে আসেন তাকে আয়ত্ত করতে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। এই জীবন্ত ডিনামাইট ধরতে গিয়ে নিউ ইয়র্ক চিড়িয়াখানার কিউরেটর ডাঃ রেমণ্ড ডিটমার্স কি ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন, তার গল্প এবারে বলি। আমেরিকার বৃহত্তম পশুশালার অধ্যক্ষ ডাঃ ডিটমার্স শুধু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক নন্, বিপজ্জনক জন্তু-জানোয়ার বিশেষ করে, সাপ ধরা বিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্য আছে।

একদিন সকাল বেলায় এক 'ডীলার' অর্থাৎ পশু-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডিটমার্স সাহেব সংবাদ পেলেন যে, তার বাসায় দুটো মস্ত বড় শঙ্খচূড় সাপ ছাড়া পেয়েছে। খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে তারা যে ঘরের মধ্যে রয়েছে, সে ঘর তালাবন্ধ থাকলেও সবাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। ডিটমার্স সাহেব যদি অনুগ্রহ করে শীঘ্র চলে এসে সাপ দুটোকে বন্দী করেন, তা'হলে নিশ্চিত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, জরুরী খবর পেয়েই অধ্যক্ষ তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীকে ডাকলেন। সঙ্গে একটা

মস্ত গুণচটের থলি, দুটো মাঝারি সাইজের ব্যাগ আর ডগার দিকে ফাঁস-লাগানো একটা লম্বা, মোটা লাঠি নিয়ে দু'জনে তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ডীলারের আস্তানায় পৌঁছে ডিটমার্স সাহেব সমস্ত ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হলেন। এই সব ডীলার বা পশু-ব্যবসায়ী সাধারণতঃ ভারত, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় ও ইন্দোচীন, এমন কি সুদূর আফ্রিকা থেকে দুষ্প্রাপ্য জন্তু-জানোয়ার আমদানি করে আর আমেরিকা কিংবা য়ুরোপের নামজাদা পশুশালায় তাদের চালন দিয়ে যথেষ্ট রোজগার করে। এ সব কাজে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু মোটা রকমের মুনাফার লোভ সাম্‌লানো শক্ত। সম্প্রতি ভারতবর্ষ থেকে জাহাজে নতুন কয়েকটা বাক্স-ভর্তি হয়ে এসেছে। অধিকাংশই কাঠের বাক্স, জালতি-লাগানো। সেগুলোয় আছে হরেক রকমের পাখী। আর এসেছে একটা মস্ত বড় ও ভারী সেগুন কাঠের বাক্স—সিন্দুক বললেই চলে। বাক্সর ডালার ওপরে আশে-পাশে আছে গোটাকয়েক ছোট ছোট ছিদ্র, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য। জাহাজ থেকে মাল খালাস করে নিয়ে ডীলার বাড়ী ফেরে এবং বড় কাঠের সিন্দুকটা ধরাধরি করে দোতলায় নিয়ে যায়।

বাক্সর ডালা খুলে ফেলে পাইথন অর্থাৎ ময়াল সাপটাকে কিছু খাইয়ে একটা খাঁচার মধ্যে পুরতে হবে। বাক্সটা এতই ভারী যে তার মধ্যে অন্ততঃ বারো তেরো হাত লম্বা একটি বৃহৎ আকারের ভারতীয় পাইথন আছে, ডীলার এই অনুমান করেছিল। পাইথনগুলো দেখতেই বিশাল, আসলে ওরা তেমন হিংস্র নয়। নতুন জায়গায় অনেক দিন পরে খোলা জায়গায় চোখে আলো লাগলেই ওরা অলস হয়ে ঝিমিয়ে থাকে। কাজেই সাপটাকে ধরাধরি করে বার করে দু'চারজন লোকের সাহায্যে তাকে স্থানান্তরিত করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। এই ভেবে ডীলার হাতুড়ি আর শলার সাহায্যে সিন্দুকের ডালাটা চাড় দিয়ে খুলে ফেললে। কিন্তু সিন্দুকটা যেন বেশ খালি-খালি লাগছে। প্রকাণ্ড কুণ্ডলী পাকিয়ে কোথায় ময়াল-প্রভু সমস্ত জায়গা জুড়ে শুয়ে থাকবে, তা নয় সিন্দুকের অর্ধেকটাই শূন্য!

কেবল আধো-অন্ধকারে চোখে পড়ল খানিকটা কাল্‌চে গোছের শ্যাওলা সবুজের কুণ্ডলী—তার মধ্যে মধ্যে গাঢ় কমলা রঙের ছাপ। ওপর থেকে এক নজরে আন্দাজ করা গেল, সাপটা মানুষের পুষ্ট বাহুপেশীর চেয়ে মোটা নয়। প্রথমটায় ডীলার ব্যাপার ঠিক্ বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে থাকে। তারপর যেই হাতুড়িটা উঁচু করে ধরা, অমনি কুণ্ডলি সর্‌-সর্‌ করে খুলে গিয়ে একটি লম্বা গলা ধীরে-ধীরে বাক্সর ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে উঠল। কী সর্বনাশ! এ যে সাক্ষাৎ যম, শঙ্খচূড়! একটু একটু করে শঙ্খচূড় খাড়া হয়ে দাঁড়াল মানুষটির বুক পর্যন্ত আর অদ্ভুত স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল ডীলারের দিকে। ভদ্রলোক

ইতিমধ্যে প্রাণভয়ে বিরাট এক লাফ দিয়ে পেছন দিকে দরজার কাছে হঠে এসেছেন! বাইরে বেরিয়ে এসে, দরজাটা সজোরে বন্ধ করবার সময়ে ডীলার দেখতে পেলেন—ঐ বাক্সর ভিতর থেকেই আর একটি লম্বা গলা উর্ধ্ব-ফণা হয়ে উঠতে সুরু করেছে। বাব্বা:—একেই রক্ষে নেই, তার এক জোড়া! রাজা এবং রাণী! ভদ্রলোক মরি-বাঁচি করে নীচেয় পালিয়ে এসে ডিটমার্স সাহেবকে টেলিফোন মারফৎ সংবাদ দিয়েছেন।

এখন সর্প-ব্যবসায়ীর যে ভয় হয়েছিল, সেটা নিতান্ত অমূলক নয়। ঐ ঘরটায় ছিল দুটো জানলা। সেগুলো অবশ্য শার্সি-দেওয়া আর শার্সির ওপরে শক্ত লোহার তারের জাল লাগানো। কাজেই জানালা দিয়ে সাপ পালাতে পারবে না। কিন্তু ঘরটা হ'ল রীতিমত গুদাম ঘর। রাজ্যের রাবিশে ভর্তি। চারদিকে ভাঙা টিনের কেস আর বড় বড় ডালা-ভাঙা কাঠের প্যাকিং বাক্স ছড়ানো। এর পেছনে সাপ যদি লুকিয়ে পড়ে, তা'হলে খুঁজে বের করাই মুস্কিল, ধরা তো দূরের কথা। নড়বার-চড়বার জায়গা অত্যন্ত কম, তার ঘুপ্‌সি ঘরখানায় বাহিরের আলো আসে অত্যন্ত ক্ষীণ। শুধু তাই নয়। ঘরের মেঝে হ'ল কাঠের আর পুরানো বাড়ীতে যে ইঁদুরের অভাব নেই, এ কথা কে না জানে! অতএব এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে অথবা বাহিরে নিশ্চয়ই ইঁদুরের তৈরি সুড়ঙ্গ বা লম্বা টানেল আছে। আর সাপ যদি তারই মধ্যে সেঁধিয়ে যায়, তা'হলে কোথায়, কোন ঘরে, কার সামনে হঠাৎ আবির্ভাব হবে, তার ঠিক কি?

ডাঃ ডিট্‌মার্স তাঁর সহকারীকে নিয়ে যথাসময়ে ডীলারের বাসায় এসে হাজির হলেন। দূর থেকেই দেখলেন, ভদ্রলোক ভয়ে আপশোষে ক্রমাগত হাত মোচড়াচ্ছেন এবং অস্থির-ভাবে পাইচারি করছেন। ব্যাপারটা সবিশেষ শুনে ডিটমার্স-এর মতন অমন সাহসী ও সাপ-ধরায় ওস্তাদ লোকেরও মন বেশ খানিকটা দমে গেল। সহকারীকে নিয়ে তিনি গুটিগুটি সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চট করে ঘরে ঢুকতে তাঁর সাহস হ'ল না। তারপর ডালার পকেট থেকে চাবি বার করে দরজার তালা খুলে দিলেন। ডিটমার্স বাইরে থেকেই দেখতে পেলেন, ঘরের মধ্যে দাঁড়াবার ও নড়া-চড়ার যায়গা খুবই কম। কোথায় গিয়ে দাঁড়ানো যায়, সেই কথাটাই ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে দরজা আর একটু খুলতে গিয়ে ঘরের ধূলো-ভরা মেঝেয় পুরানো পাল্লাটা ক্যাঁচ করে ঘেঁষটে গেল এবং আট্‌কে রইল। তাই কাত হয়ে ভেতরে ঢুকেই দরজাটা আধ-ভেজানো অবস্থাতেই খুলে রাখলেন—যাতে সেইখানে দাঁড়িয়েই কোথায় কি আছে দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন হলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। ক্রমে ওঁরা একটু-একটু দু'জনে সাবধানে পা বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে এগুতে

লাগলেন। বাইরে থেকে একটা চাপা আলো আসছে শার্সি দিয়ে। সেই আবছা আলোয় দেখা গেল—একটা প্যাকিং কেসের নীচে মেঝের ওপর খানিকটা জলপাই রঙের একটি মোটা কাছির অংশ কুণ্ডলী-পাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ডিটমার্স বুঝলেন, সর্পরাজের মুখ প্যাকিং কেসগুলোর পিছন দিকে লুক্কায়িত। তবে তিনি নিদ্রিত। নইলে এতক্ষণ দরজা খোলার অল্প আওয়াজেই ফণা খাড়া হয়ে উঠত। ভাবলেন, কি করা যায়! যদি ওকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে ফল কি হবে সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। সম্বলের মধ্যে তো হাতে একটা লাঠি, যার মাথায় 'ন্যুজ' অর্থাৎ দড়ি-লাগানো ফাঁস। আর সঙ্গীর হাতে একটা কাঠের ডাণ্ডা এবং দুটো থলে। যাই হোক, চটপট মন স্থির করে ফেললেন ডিটমার্স। এটাকে লাঠির সাহায্যে চেপে ধরে থলের মধ্যে ভরে নিতে হবে, অবশ্য দ্বিতীয় সাপটি যদি ইতিমধ্যে পার্টিতে যোগদান না করেন! তাঁর দর্শন দেবার আগেই কেল্লা ফতে করা চাই। বাক্সটার নীচে সাপের দিকে চোখ রেখে ডিটমার্স সঙ্গীকে বললেন, 'দরজাটা আর একটু খুলে দাও। তেমন বেগতিক দেখলে পালাবার পথ খোলা রাখা দরকার। সঙ্গী আস্তে আস্তে পিছু হঠে দরজার হাতলে হাত রাখতেই বুঝল, বাইরে থেকে লক্ করা—বন্ধ।

দাঁতে দাঁত ঘষা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তখন। ডীলার অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা করেছে। হুঁসিয়ার লোক! পাছে সাপ ঘর-ছাড়া হয়ে হাত-ছাড়া হয়, পাছে অতগুলো টাকা লোকসান হয়, তাই সতর্ক ডীলার বাইরে থেকে চাবি লাগিয়ে সরে পড়েছে। প্রথমে দরজায় টোকা দেওয়া হ'ল, তারপর মৃদু করাঘাত। কোনো সাড়া-শব্দ নেই! কা কস্য পরিবেদনা! বেশি আওয়াজ করতে ভরসাও হয় না। লাথি মেরে কিংবা গায়ের জোরে পুরু পাল্লা ভাঙা অসম্ভব। সম্ভব হলেও শব্দে সাপ তেড়ে আসবে এবং পেছন থেকে সর্পাঘাত অবধারিত। এদিকে একটাও খোলা জানলা নেই। তারের জাল-লাগানো শুধু দুটো ফোকর! ভিতরে দুটি মানুষ ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় নিস্তব্ধ আর সাপ দুটো হয় বিশ্রান্ত নয় ঘুমন্ত। শুধু দু'জনের হৃৎপিণ্ডের ধুক্-ধুক্ শব্দ! এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে লাঠির আগাটা দিয়ে সাপের গায়ে নাড়া দিলেন ডিটমার্স। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাপা হাঁচির শব্দ—বেশ একটানা রেশ—যেন ফোলানো ব্ল্যাডার থেকে খানিকটা হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। এ সাধারণ কেউটে-গোখরোর ক্রুদ্ধ গর্জন নয়, হিস্-হিস্ আওয়াজও নয়। আরও গভীর আরও বিলম্বিত।

তারপর সড় সড় করে সাপের মুখ বেরিয়ে এল বাক্সের ওপাশ দিয়ে। কেমন অনায়াসে অবলীলায় কাছির পাক্ খুলে যেতে লাগল। মুখটা মাটি থেকে খানিকটা উঁচু,

চোখে স্থির দৃষ্টি। অস্বাভাবিক স্থির ও ধীর চোখে কেমন যেন বিস্মিত, বিরক্ত দৃষ্টি। শঙ্খচূড়ের এ নজর তার নিজস্ব সম্পত্তি। আর কোনও সাপের চোখে এ ধরণের অনন্য-বদ্ধ দৃষ্টি দেখা যায় না। ইতিমধ্যে গলা ফুলে পেশী শক্ত হয়েছে। ফণাও উঠেছে—যদিও শঙ্খচূড়ের ফণা তার শরীরের তুলনায় অনেকটা সরুই বলতে হবে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বুকের ও পেটের আঁশগুলোর গায়ে চক্‌চকে শাদা-কালো দাগ। ফণাটা যে রকম ধীরে-ধীরে ফুলে বড় হচ্ছিল, সেটা একরকম শুভ লক্ষণ বলা চলে। কেন না, তখনও যে সর্পরাজের মতি স্থির হয় নি, ঘুমের চমক কেটে যায় নি, নিশ্চিত। রাগ আর বিস্ময়ের মাঝামাঝি মেজাজ। গর্জন করে তেড়ে আসার আগেই ফাঁস লাগিয়ে দিয়ে আয়ত্ত করা চাই। কিন্তু ফাঁস যদি লেগে ঠিক ভাবে বসে যায়, তবেই তো···নাঃ, আর ভাববার সময় নেই। চোখে এইবার যেন নিষ্ঠুর ও ক্রূর দৃষ্টি ঠিক্‌রে পড়ছে।
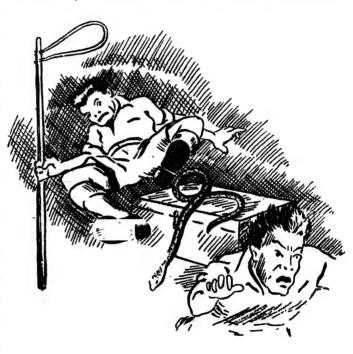
সঙ্কটময় মুহূর্ত! আর দেরি না করে লাঠির ডগায় বাঁধা ফাঁসটা সাপের মাথার দিকে বাগিয়ে ধরলেন ডিটমার্স। মাথা তখন মেঝে থেকে ঝাড়া তিনফুট উঁচুতে। হয় তো বা বেশি। শঙ্খচূড় একেবারে স্থির, একটুও দুলছেনা—যেন প্রতিটি গতি বিস্মিত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। লাঠির ডগা মুখের ওপর পৌঁছুতেই এক পলকের জন্য তার দৃষ্টি পড়ল গিয়ে ঝোলানো দড়ির ফাঁসের ওপর। মাথাটাও যেন একটুখানি কাত হয়ে নীচু দিকে হেলল। আর সেই পলকের অবকাশেই ডিটমার্সের বহুদিনের অভিজ্ঞ হাত ঠিক্ মাথার ওপর দিয়ে

ঝাঁ-করে ফাঁসটা দিল গলিয়ে। তারপর ফাঁস যেই গলার কাছে স্লিপ্ করে নেমে এসেছে, অমনি একপাশে হেঁচ্‌কা টান। সঙ্গে সঙ্গে সাপের বাকি অংশ বেরিয়ে এল। ঝাড়া তেরো ফুট লম্বা! আর সে কি গজরানি! লাঠিটা মুখ বেঁকিয়ে কামড়ে ধরে তাইতেই ছোবলের পর ছোবল। সঙ্গীকে ইসারা করতেই, সে কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে মাথাটা মেঝেতে ঝাঁ করে চেপে ধরল। ঝটাপটির আওয়াজে পাশে দ্বিতীয় সাপটি বেরিয়ে আসে, তাই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে এক হাতে সাপের গর্দানটা মুঠো করে বাগিয়ে নিলেন ডিটমার্স। একটা হাতের মুঠোয় আঁটল না। তখন পা দিয়ে মাজার কাছটা চেপে ধরে সঙ্গীকে বললেন, থলের মুখটা ফাঁক করে বাঁ হাতে এগিয়ে দিতে। দু'জনেরই একটি করে হাত সাপটাকে চেপে আছে। বাকি এক একখানা খালি হাত দিয়ে অত বড় সাপটার প্রথমে মুখ, তারপর আস্তে আস্তে ল্যাজ পর্যন্ত সমস্ত দেহটাই থলেয় ভরে কি ভাবে যে বেঁধে ফেলা হ'ল, তা এক দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু আরও এক ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখা তখনও বাকি ছিল। ব্যাগটাকে ঘরের এক কোণে রাখতে গিয়ে উভয়ের নজরে পড়ল এক ভয়াল কিন্তু অপরূপ সুন্দর দৃশ্য। দ্বিতীয় সাপটি ইতিমধ্যে কখন বেরিয়ে এসেছে, টের পাওয়া যায় নি। একটা প্যাকিং বাক্সর ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে উঠে তন্ময় হয়ে দেখছে। মেঝে থেকে দু'ফুট উঁচু বাক্স, আর মাথাটি উঁচু হয়ে আছে আরো দু'ফুট। স্থির, একাগ্র দৃষ্টি তার চোখে, সঙ্গীর মতই নিশ্চল অবস্থায় খাড়া হয়ে রয়েছে। আশ্চর্য, দেহ একটুও দুলছে না। মনে হচ্ছে যেন আঁকা ছবি। যুদ্ধক্ষেত্রের সমগ্র দৃশ্যটি সে এতক্ষণ দেখেছে। এবার যেন উপযুক্ত প্রতিহিংসার জন্য শত্রুদের ওপর আছড়ে পড়ে ছোবল দেবার শুভলগ্নটির প্রতীক্ষা করছে। কাল্‌চে সবুজ রঙের ওপর এক বিঘৎ অন্তর সেই কম্‌লা রঙের ব্যাণ্ড পরে সাপটা যেন রাজবেশে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা নয় রাণী। কারণ আকার আর গঠন দেখলে বোঝা যায়, এটা মাদী। লম্বায় আর একটু ছোট, আন্দাজ বারো ফুট। সঙ্গীকে হেঁকে বললেন ডিটমার্স—'চালাও তোমার ডাণ্ডা।' প্রথম সাপকে থলেয় ভর্তি করবার সময়ে ফাঁস-লাগানো লাঠিটা চট্ করে টেনে বার করা হয়েছিল। এখন ডিটমার্স সেইটে হাতে নিয়ে দু'এক পা এগিয়ে গেলেন। সহকারী ইতিমধ্যে ঠিক আগের মতই এ সাপের মাথাটা ডাণ্ডা দিয়ে চেপে ধরেছেন; তারপর ডিটমার্স যেই নিজের লাঠিটা বাড়িয়ে ধরেছেন, এমন সময়ে ধস্তাধস্তির ফলে প্যাকিং বাক্সটা পড়ে গেল হুড়মুড় শব্দে।

সর্বনাশ! সহকারীর হাতের মুঠো থেকে ডাণ্ডাটিও গেল পিছ্‌লে। সঙ্গে সঙ্গে সর্পিণীও মাথা ছাড়া পেয়ে ফণা উঁচু করে এক পলকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর দিকে। ভাগ্যিস্ দু'জনেই মরি-বাঁচি করে হাই-জাম্প দিয়েছিলেন, তাই ফুট খানেকের জন্য সাপের কবল থেকে বেঁচে

গেলেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ভাইপার—শ্রেণীর সাপের মতন কোব্‌রা কামড়ায় না। কামড় দেবার আগে ভাইপার সাধারণতঃ গলাটা গুটিয়ে নিয়ে দেহের মধ্যে অথবা কুণ্ডলীর সঙ্গে এক করে রাখে। তারপর ইলাস্টিক রবারের মতন অথবা স্প্রিং-এর মতন কখন যে ছোবল দেয়, তা ধরাই যায় না। এত দ্রুত, যেন বিদ্যুতের গতি! কিন্তু কোব্‌রা জাতের সাপ একটু পিছন দিকে মাথা ও গলা হেলিয়ে অবিকল ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ে। কিং কোবরা অর্থাৎ শঙ্খচূড়ের রীতিও তাই। তবে আকারে বড়, ফণা আর গলাটাও চার ফুট আন্দজ খাড়া থাকে। তাই সবসুদ্ধ যখন আছড়ে পড়ে, মাটি থেকে ততটাই দূরত্ব রেখে যদি হঠাৎ লাফ মেরে ঝুল কাটানো যায়, তা'হলে অক্ষত থাকার সম্ভাবনা। ডিটমার্স এবং তার সহকারী নিছক প্রাণ বাঁচানোর অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে দু'পাশে দু'জনে লাফ্ মেরেছিলেন তড়িৎগতিতে, তাই এ-যাত্রা সাপের নাগাল পৌঁছুল না। যদিও রাজ্যের রাবিশ, ভাঙ্গা বাক্স আর কাঠে-ভর্তি আঠারো ফুট আন্দাজ লম্বা-চওড়া একটা বদ্ধ ঘরে, আব্‌ছা আলোয় বারো তেরো ফুট দেহধারী শঙ্খচূড়ের ছোবল এড়ানো যে কি কঠিন ব্যাপার, সেটা কল্পনায় আসে না। যাই হোক্ আবার আক্রমণ করার আগেই চকিতের মধ্যে সহকারী ভদ্রলোক নিপুণ এবং অভ্রান্ত হস্তচালনায় ফের শঙ্খচূড়ের গলাটা ধরলেন চেপে। আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে ডিটমার্সও ফাঁসটা মাথায় গলিয়ে দিয়েই টান দিতে লাগলেন যাতে চাপ্ হয়ে এঁটে বসে। এবারে আর নীচু দিকে গলার কাছে নয়,—তাতে মুখ হাঁ করা যায়। ঠিক্ ফণার নীচেই—যাতে চোয়াল একেবারে জাঁতাকলে বদ্ধ থাকে। কিন্তু গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও তাকে সাম্‌লে ধরে রাখা দায়। ঝড়ের সময় ঢেউ যেমন তীরে এসে দুলে দুলে দাপাদাপি করে, সর্পিণীও তেমনি ক্ষুব্ধ তেজে আর অক্ষম আক্রোশে মেঝের ওপর সারা শরীর আর ল্যাজ নিয়ে আছড়াতে লাগল। দু'জনেই প্রাণপণ জোর দিয়ে শক্ত হাতে লাঠি আর ডাণ্ডা চেপে ধরে রইলেন। তারপর যেই একটু স্থির ও টান হয়ে সাপটা ভাবছে কি করে মুক্তি পাওয়া যায়, অমনি সেই অবসরে সহকারী ভদ্রলোক ওর দেহের ওপর দিব্বি সওয়ার হয়ে বসলেন আর এক হাত দিয়ে পিঠ আর মাজাটা চেপে ধরলেন, যেন হাতে পায়ে 'কয়েল' করে জড়িয়ে ধরতে না পারে। ইতিমধ্যে ডিটমার্স ক্ষিপ্র হাতে দ্বিতীয় থলেটাকে ওর মাথার ওপর দিয়ে বালিশের ওয়াড়ের মতন টেনে দিলেন। মুখ বদ্ধ থাকায় রাগে অন্ধ হয়ে সাপটা গজরাতে লাগল। যত ফুলে ফুলে ওঠে, ফাঁস ততই আঁট হয়ে চেপে ধরে। আর যত ঝটাপটি করে থলের মধ্যে এবং মুখটা কোনও মতে বেঁকিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে, ততই কুণ্ডলী পাকিয়ে যায় আর শিকারীদের পরিশ্রম লাঘব হয়। কিছুক্ষণ এই ভাবে ধস্তাধস্তি চলল। তারপর সঙ্গী পেছন

২

দিক থেকে যেমন বালিশে ঠেসে ঠেসে তুলো ভরে, সেই ভাবে সমস্ত দেহটাই থলের মধ্যে চালান করে দিলেন। কিন্তু আর এক সমস্যা! রাণীর যে মেজাজ ও প্রতিহিংসার ঝাঁজ যে ফাঁস-লাগানো লাঠিটা বাইরে টেনে নিতে ভরসা হয় না। যদি মুখটা খোলা পেয়ে রকেটের মতন শুট্ করে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে! তখন কি হবে! কিন্তু ভাববার আর সময় নেই। যা থাকে কপালে! ঝাঁ করে লাঠিটা হেঁচকা টানে বের করে নেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে থলের মুখ ফাঁস-গেরো দিয়ে বেঁধে ফেলা। ব্যাস্—নিশ্চিন্ত।

কাজ শেষ করে উভয়ে যখন পিট টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তখন হাত আর কোমর আড়ষ্ট এবং টনটন করছে। মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ। উত্তেজনায় হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে। বেশ খানিকক্ষণ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করে নিতে হ'ল। তারপর চুরুট ধরিয়ে একটু সুস্থ হয়ে নিয়ে, দু'জনে বেছে-বেছে সব চেয়ে দুটো লম্বা আর মোটা কাঠের কুঁদো নিলেন হাতে। অতঃপর প্রতিশোধ এবং মনের সুখে বন্ধ দরজায় দড়াদ্দুম ঘা। দরজা ভেঙে পড়ার জোগাড়! ওদিকে খুট্ করে একটা শব্দ হ'ল। ইতিমধ্যে আওয়াজের চোটে ডীলার এসে চাবিটি খুলে দিয়েছে আর বাইরে দাঁড়িয়ে পিট্-পিট্ করে তাকাচ্ছে। ইচ্ছে হ'ল, শয়তানের মাথাটা কাঠের কুঁদোয় গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেওয়া যায়। কিন্তু তার মুখ দেখে দয়া হ'ল। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় লোকটার মুখে যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই। ডিটমার্স গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমরা মরিনি, দেখতেই পাচ্ছ আর সাপ দুটোও গ্রেফ্‌তার হয়েছে।' আশ্চর্য! এক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে সাম্‌লে নিল ধূর্ত ব্যবসাদার। মিষ্ট চতুর কণ্ঠে বলল, 'সত্যি, আপনাদের বরাত ভালো। কেমন একজোড়া শঙ্খচূড় সস্তায় পেয়ে গেলেন। এর চেয়ে ভালো তেজী মাল চট্ করে জোগাড় করতে পারবেন কি?'

ডিটমার্স বুঝলেন, দরাদরি করতে হবে। বললেন, 'দুটো সাপ পঞ্চাশ টাকায় ছাড়বে কর্তা?'

'হেঁ-হেঁ, কি যে বলেন আপনি! ওতে যে প্যাকিং আর জাহাজের মাশুল খরচাই পোষায় না। শ'খানেক দেন তো ছেড়ে দিই।' ডিটমার্স গম্ভীর হয়ে বললেন, 'থাক্, দরকার নেই আমরাই ছেড়ে দিচ্ছি।' সহকারী ইসারা বুঝে ব্যাগ দুটোয় হাত দিতে যাচ্ছে, ডীলার ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, আহা:—করেন কি! সামান্য ঠাট্টাও বোঝেন না। আমি কি সত্যিই একশো টাকা চাইছি, না আপনারা তাই দেবেন। এত মেহনৎ করেছেন যখন, দেবেন কিছু কম-সম করে। যাকগে—একটু লোকসান হবে···ডিটমার্স আর একবার কট্‌মট্ করে তাকাতেই সহকারী হাত বাড়ালেন থলে খোলবার জন্য।

'আচ্ছা, আচ্ছা—ঐ পঞ্চাশই না হয় দেবেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন তো···ততক্ষণ একটা ট্যাক্সি ডাকি'। বলেই ডীলার সুট্ করে সরে পড়ল।···

জাপানী পুরাণের গল্প

শ্রীঅমলেন্দু সেন

✱

পুরাণ কাকে বলে জান? এগুলি হচ্ছে আদ্যিকালে লেখা বই, যাতে থাকে একেবারে সৃষ্টি হওয়ার তারিখ থেকে পৃথিবীর ইতিহাস। এরকম বই আমাদের সংস্কৃতে আছে কয়েকখানা। অন্য অন্য অনেক দেশেও এরকম পুরাণ আছে। জাপানের আছে দু'খানা, তাদের নাম 'কোজিকি' আর 'নিহোন্‌সি'। তাতে জাপান দেশটার একেবারে আদ্যিকালের কথাটা আছে এইরকম।

ইজানাগি বলে এক দেবতা ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ইজানামি। কি খেয়ালে জানি না, ইজানাগি একদিন হাতে এক মণিমুক্তাবসানো বর্শা নিয়ে এসে আকাশের উপর দাঁড়ালেন।

জান তো, আকাশটা হচ্ছে সমুদ্রের উপর একটা পোল? তাই তো আকাশটা গোল হয়ে সমুদ্রের এপার থেকে ওপারে চলে গিয়েছে, দেখ নি? সেই পোলের উপর দাঁড়িয়ে ইজানাগি তাঁর হাতের বর্শা জলে ডুবিয়ে তুলে ধরলেন। ধরতেই তা থেকে এক ফোঁটা জল সমুদ্রে পড়ে জমে গেল। সেটাই হলো জাপানের প্রথম দ্বীপ, যার নাম ওনোগোরো।

ইজানামিকে নিয়ে ইজানাগি নেমে এলেন ওনোগোরোতে। তারপর গাদা-গাদা দ্বীপ তৈরী করতে লাগলেন চারদিকের সমুদ্রে। এইভাবে গড়ে উঠল জাপানের দ্বীপপুঞ্জ, যার নাম 'দাই-নিপ্পন'।

একে একে তাঁদের ছত্রিশটি ছেলেমেয়ে হ'ল। শেষ সন্তানটি হচ্ছেন অগ্নিদেবতা। তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ইজানামি মারা গেলেন। তাতে ইজানাগি যে কান্নাটা কাঁদলেন, তা থেকে জন্মালেন ক্রন্দনদেবী। কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে ইজানাগি তলোয়ারের এক কোপে অগ্নিদেবতার মুণ্ডুটি কেটে ফেলে সটান পাতালে চলে গেলেন, ইজানামিকে যমরাজার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবেন। কিন্তু যমদূতেরা তাঁকে সেখানে ঘেঁষতে দিল না, তিনি ফিরে এলেন।

নরক থেকে ফিরে এসে কেমন গা ঘিনঘিন করতে লাগল ইজানাগির। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে সমুদ্রে নামলেন। নামবার আগে জামা জুতা, অস্ত্রশস্ত্র যা খুলে রাখেন, তা থেকেই একটি একটি করে দেবতা জন্মাতে থাকে। তারপর, স্নানের সময় তাঁর বাঁ চোখ থেকে উৎপন্ন হলেন সূর্যদেবী, যাঁর আসল নাম হচ্ছে 'আনাতেরাসু-ওমিকামি'। ডান চোখ থেকে জন্মালেন চন্দ্রদেবতা, আর নাক থেকে বের হলেন যিনি তাঁর নাম হ'ল খামখেয়ালী।

নিজের গলার হার পরিয়ে দিয়ে সূর্যদেবীকে ইজানাগি আকাশের রাণী করে দিলেন, চন্দ্রদেবকে করলেন রাত্রির রাজা। আর, সমুদ্রের রাজত্ব দিলেন খামখেয়ালীকে। কিন্তু একে তো

নাকে জন্ম, তার উপর নামটিও খামখেয়ালী। তিনি হঠাৎ নাকে-কান্না জুড়ে দিলেন। এমন কান্নাই কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি গজিয়ে বাড়তে বাড়তে তাঁর নাভি পর্যন্ত লম্বা হয়ে গেল, কান্নার তবু বিরাম নেই।

দেখেশুনে ইজানাগি তো অবাক! এমন রাজ্য পেল, তবু কাঁদে কেন?

খামখেয়ালী বললেন, আমি মাকে দেখতে চাই, অ্যাঁ-অ্যাঁ!

তাজ্জব ব্যাপার। মার পেটেই যে জন্মাল না, তার আবার মা কে? শেষে বোঝা গেল যে খামখেয়ালী রাজা-টাজা হতে চান না, আগে একবার ইজানামিকে দেখবেন।

এতে কার না রাগ হয়? ইজানাগ খামখেয়ালীকে দূর করে দিলেন।

তখন খামখেয়ালী চলে গেলেন আকাশে, দিদির কাছে। দিদি, মানে সূর্য্যদেবী, ঘাবড়ে গেলেন,—কি জানি ভাইটির মৎলবখানা কি? খামখেয়ালী বললেন যে, তাঁর কোনও কুঅভিসন্ধি নেই। তবু, সাবধানের বিনাশ নেই, এই মনে করে সূর্যদেবী খামখেয়ালীর তলোয়ারখানা চেয়ে নিয়ে চিবিয়ে ফেলে দিলেন তিন টুকরো করে। তিনটি টুকরো থেকে অমনি জন্ম নিলেন তিনটি দেবী।

ভাইটিও তো বড় কম যান না। তিনি দিদির একখানা গয়না নিয়ে চিবিয়ে তাকে পাঁচ টুকরো করে ফেললেন, তা থেকে হলেন পাঁচটি দেবী। সূর্যদেবী অমনি সব ক'টি দেবীরই সম্পত্তি তাঁর বলে দাবী করে বসলেন। কিন্তু খামমেয়ালী তা মানবেন কেন? ঝগড়া লেগে গেল।

খামখেয়ালী ক্ষেপে গিয়ে একেবারে এক লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। দিদির ক্ষেতের আল ভেঙে, বাগান তছনছ করে ফেললেন। ভয় পেয়ে সূর্যদেবী তাঁর তাঁতশালায় ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন, তাতেও রক্ষা নেই। খামখেয়ালী করলেন কি না, একটা শাদা-কাল ছিটওয়ালা ঘোড়ার ছাল উলটো করে ছাড়িয়ে এনে ঐ ঘরের ছাদ ভেঙে সেটা দিয়ে দিদিকে চাপা দিলেন। আরও কি হয়, এই ভয়ে সূর্যদেবী জড়সড় হয়ে বসে রইলেন, দরজা বন্ধ রইল। আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল।

দেবতারা দেখলেন যে সৃষ্টি বুঝি বা যায়। সূর্যদেবীকে তো বাইরে আনতেই হবে। তখন তাঁরা একটা ফন্দী এঁটে নিয়ে সবাই গিয়ে সূর্যদেবীর ঘরের দরজার বাইরে তুমুল নাচগান জুড়ে দিলেন। দেবীর কৌতূহল হ'ল, দরজা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারখানা কি?

দেবতারা বললেন যে, তাঁর বদলে খুব সুন্দরী আর একটি দেবীকে আকাশের রাণী

করা হবে, তাই সেই নতুন রাণীকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা হচ্ছে। এই বলে একখানা আয়না দেখিয়ে দিলেন তাঁকে।

তাঁর চেয়ে সুন্দরী! হিংসের চোটে ভয় ঘুচে গেল সূর্যদেবীর। তিনি তখনি দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন, নতুন রাণীকে দেখবেন বলে। আর, দেবতারাও তখনই দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন, দেবীর লুকোবার পথ বন্ধ হ'ল। আকাশ পৃথিবী আবার আমাতেরাস্থর আলো পেয়ে হাসতে লাগল। দেবতারা তারপর খামখেয়ালীকে দূর করে দিলেন স্বর্গরাজ্য থেকে।

সেখান থেকে বেচারা খামখেয়ালী এসে যেখানে নামলেন, সে জায়গাটার নাম ইজুমা। সেখানে এসে দেখলেন যে, একটি মেয়েকে খাবার উদ্যোগ করছে একটা আট মাথাওয়ালা অজগর সাপ। খামখেয়ালী সেই সাপটাকে মেরে তার পেট চিরে এক আশ্চর্য তলোয়ার পেলেন। তারপর মেয়েটিকে বিয়ে করে ইজুমোতেই বসবাস করতে লাগলেন। ক্রমে তিনি অনেক জায়গা জয় করে বেশ বড় একটি রাজ্য স্থাপন করেন।

অনেকদিন কেটে গেল এর পর। হঠাৎ একদিন স্বর্গের দেবতাদের মনে হ'ল যে, খামখেয়ালীর খবরটা একবার নিলে হয়। প্রথম দু'জন দূত কোনও খবর নিতে পারল না, তৃতীয় দূতটি খামখেয়ালীর মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই থেকে গেল। তারপর দেবতারা পাঠালেন এক তিতির পাখীকে। সে এসে একটা দারুচিনি গাছের ডালে বসে ঘরজামাই মশায়কে কিচিরমিচির করে গালমন্দ করতে লাগল। ঘরজামাইটি তাকে মারল এক তীর। সেই তীর ফিরে এসে লাগল তারই বুকে।

এই ভাবে নানারকম ব্যাপার হতে হতে শেষটায় দেবতারা খামখেয়ালীর রাজ্যটাই দখল করে নিলেন। তারপর মর্ত্যের রাজা করে যাঁকে পাঠালেন, তিনি সূর্যদেবীরই এক নাতি, তাঁর নাম সংক্ষেপে নিনিগি-নো-মিকাটো। আসল নামটা শুনে আর কাজ নেই, সে এক দেড় গজ লম্বা নাম। তিনি সূর্যদেবীর আয়না আর অজগরের পেটে পাওয়া সেই তলোয়ার হাতে নিয়ে আকাশের বুক-চিরে সদলবলে নেমে এলেন কিউশু দ্বীপে, তাকাচিহো পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানেই একটি মেয়েকে বিয়ে করে তিনি এক প্রাসাদ তৈরী করে রাজত্ব করতে সুরু করলেন।

নিনিগির ছেলে ছিল তিনটি। তাদের নামের মানে করলে বাংলায় দাঁড়ায় এই রকম,—জ্বলৎ-অগ্নি, চরম-অগ্নি, নির্বাণ-অগ্নি। মেজো ভাইয়ের কথা জানিনা, বড়টি ছিলেন পাকা মেছুড়ে, আর ছোটটি ছিলেন ওস্তাদ শিকারী। ছোটর একদিন সখ হ'ল মাছ ধরবেন। দাদার থেকে ছিপ নিয়ে গিয়ে বসলেন সমুদ্রের ধারে। কিন্তু মাছ তো ধরতে জানেন না,

বঁড়শী ছিঁড়ে নিয়ে গেল মাছে। তাই না শুনে দাদাটি তো রেগে টং, মেরেই ফেলে আর কি ছোট ভাইকে। নির্বাণ-অগ্নি নিজের খাসা তলোয়ারখানা ভেঙে হাজারখানেক বঁড়শী করে জ্বলৎ-অগ্নিকে দিলেন, কিন্তু তিনি যেই আগুন সেই আগুন! তাঁর নিজের বঁড়শীই ফেরৎ চাই, অন্য কিছু না।

ছোট কুমার কি আর করেন, গিয়ে কাঁদতে বসলেন সমুদ্রের ধারে। কান্না দেখে লবণ দেবতার দয়া হ'ল। তিনি এসে বললেন, বাছা, কেঁদো না। সাগর দেবতার কাছে চলে যাও, তিনিই তোমার বড়শী ফিরিয়ে দেবেন।

লবণ দেবতার কাছে সাগর দেবতার বাড়ী যাবার পথ জেনে নিয়ে একখানা ডিঙি চড়ে রওনা হলেন ছোট কুমার। ভাসতে ভাসতে ভাসতে ডিঙি গিয়ে ঠেকল মাছের আঁশে তৈরী সাগর দেবতার বাড়ীতে। কি করতে হবে, সেসব কথা লবণ দেবতা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই ছোট কুমার সেখানে নেমে বাগানে ঢুকে এক গাছে চড়ে বসে রইলেন।

খানিকক্ষণ বাদে রাজকন্যার সখীরা জল তুলতে এল বাগানের কূয়ো থেকে। নির্বাণ-অগ্নি তখন চুপে চুপে তাঁর গলার হার থেকে একটি মুক্তো ছিঁড়ে তাদের কলসীতে ফেলে দিলেন। সেই জল যখন রাজকন্যার কাছে গেল, তখন তিনি তো মুক্তো দেখে অবাক। নিজে খুঁজতে বেরোলেন, ব্যাপারটা কি!

খুঁজতে গিয়ে রাজকন্যা রাজপুত্রের দেখা পেলেন। দু'জনেরই দু'জনকে দেখে এত পছন্দ হয়ে গেল যে রাজকন্যা নির্বাণ-অগ্নিকে বিয়ে করে ফেললেন। নির্বাণ-অগ্নি সাগর দেবতার বাড়ীতে থেকে গেলেন। কিন্তু বঁড়শীর কথা ভোলেন নি।

জামাইয়ের কথায় সাগর দেবতা চারিদিকে খবর নিতে দূত পাঠালেন, কে তাঁর জামাইয়ের দাদার বঁড়শী নিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেটা পাওয়া গেল বুড়ো একটা 'তাই'-মাছের গলায়। সেটা নিয়ে নির্বাণ-অগ্নি দেশে ফিরে এলেন।

ওদিকে তাঁর দেরি দেখে জ্বলৎ-অগ্নি এতটা খাপ্পা হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে দেখেই তলোয়ার বের করে তাঁকে কাটতে উদ্যত হলেন। সাগর দেবতা কিন্তু আগে থেকেই জানতেন যে এরকম একটা কিছু হবে, তাই জামাইকে দুটো মুক্তো দিয়ে বলে দিয়েছিলেন যে বিপদে পড়লে সেগুলো কি করে কাজে লাগাতে হয়।

এখন দাদা তলোয়ার উঁচিয়ে তেড়ে আসতেই নির্বাণ-অগ্নি সেই মুক্তো দুটোর একটা তুলে ধরলেন। অমনি কোথা থেকে হু হু করে জল এসে বড় ভাইকে আচ্ছা করে নাকানীচুবুনী খাইয়ে দিল। তিনি চীৎকার করে ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইতেই নির্বাণ-অগ্নি অপর মুক্তোটি

তুলে ধরলেন, অমনি সব জল সরে গেল। সেই থেকে ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাই একেবারে হাত-জোড় করে থাকতেন।

নিনিগি-নো-মিকাটো মারা যাবার পর রাজা হলেন নির্বাণ-অগ্নি। পাঁচশো আশি বছর তাকাচিহোর প্রাসাদে বাস করে তিনি রাজ্য শাসন করেছিলেন। সাগর দেবতার মেয়েকে নিয়ে এসে তিনি রাণী করেন তাঁকে।

এঁদের নাতি হলেন যামাতো-ইওআরে, যিনি পরে সম্রাট্ জিম্মু তেন্নো নামে বিখ্যাত হন। তিনিই প্রথমে সমস্ত জাপানকে এক করে নিয়ে তার সম্রাট হন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৭৬০ বছর আগে ইনি রাজপদ লাভ করেন। তারপর ৭৫ বছর রাজত্ব করে ১২৭ বছর বয়সে ইনি মারা যান।

পুরাণের গল্প এখানেই শেষ। সম্রাট জিম্মুর সময় থেকেই জাপানের ইতিহাস আরম্ভ। সে আলাদা বইয়ের কথা।

★ চিঠি ★

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চিঠি তোমায় লিখতে হবে
　ভাবছি তোমায় লিখবো কী,
এবার যবে হাজির হব
　তোমার কাছেই লিখবো কী?
　কেমন করে শুধ্যি ওঠেন
　হঠাৎ কখন সন্ধ্যে হয়,
　রাত্তিরেতে তারার আলোয়
　সবাই কেন ঘুমিয়ে রয়?
অন্ধকারে বাদুড় যখন
　ছুড়ছুড়িয়ে উড়ছে দেখি,

প্রজাপতির ডানার কথা
　মনে তো হয় সবটা মেকি।
　নেংটিগুলোর চোখ তো নয়
　গভীর লালের পান্নাচুনি,
　বেড়ালছানার বাচ্চা কাঁদে
　ঘুমের ঘোরে সেটাও শুনি।
তখন তুমি কেমন আছো
　ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে জেগেই বা,
সে-খবরটা পেতেই হলে
　পাততে হয় খড়িই বা!

বারোয়ারির বর

শ্রীদেড়কড়ি শর্মা

বরা'নগরের বরদা বরাট আর বারিপুরের বারিদবরণ বেজায় বন্ধু। বরেন বারিকের সর্‌বতের আড্ডায় বেস্পতিবারের ভরা বারবেলায় বা বরিষণ-মুখর বাদল বাতাসে বাতাসা ও বাতাবি লেবুর লোভে তারা এই বারো বৎসর সমানে হাজিরা দিয়ে এসেছে। তারপর বরাকরে বরফের কারবার ফেঁদে কিছুকাল ঘর-বার করাই সার হোলো। গোড়ায় বন্ধু বটকেষ্ট বটব্যাল, বরুণ বড়াল ও নিবারণ বর্মণ কত বারণই না করলে! কিন্তু বরাতে দুর্ভোগ ঘনালে কে খণ্ডাবে বল?

যাইহোক্, বারবার ঠকবার পাত্র বরদা নয়, বারিদবরণ তো নয়ই। তাই ক'দিন বাদে দেখা গেল—বরদা বারুদের দোকানে আর বারিদবরণ বুড়ো ব্যারো সাহেবের 'বুরো'তে যে যার কাজে ব্যস্ত। উর্বর মাথা বলতে হবে বৈকি!

সেবার মাসের বারুই তারিখে বারুণীর পার্বণ পড়লো। দুই বন্ধুর কারবার বন্ধ। তাই বেড়াতে বেরিয়েছে। বেড়া ডিঙিয়ে বেলা বারটা অবধি বেজায় ঘুরে বেজার হয়ে বেচারা বেচারামের বিপণি থেকে বরফ, বরফি আর বরবটি কিনে বাসায় ফিরছে, এমন সময় পথে বাগ্‌বাজারের উকিল-বন্ধু বগ্‌লী-হাতে বগলা বাগ্‌চির সঙ্গে দেখা। সঙ্গে এক গাল দাড়ি।

বরদা বলে' উঠ্‌লো, আরে, বগলা যে! বলি, ব্যাপারখানা কি? র‍্যাপার গায়ে দিয়ে এক গাল দাড়ি নিয়েই চলেছ যে রাস্তা দিয়ে। বা রে! 'বারে' ঢোক্‌বার এই ফল নাকি হে?

এক বগল থেকে আর এক বগলে বগ্‌লী বদল করে' বগলা বল্লে, ভাই, কি আর করি বল? 'বার্‌বারের' দেখাই মেলে না!

বারিদ বলে, যা বলেছ ভাই। সব ব্যাটা 'বার্‌বার' বর্বর হয়ে উঠেছে আজকাল। ব্যাটাদের বারবেল-পেটা করলেও রাগ যায় না। সেদিন হোলোকি—বহুদিন পরে বহুবাজারের মোড়ে কামাবার বাক্স হাতে এক নাপিতের দেখা পেয়ে ডাকলুম, ওহে পরামাণিকের পো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়িটা কামিয়ে দিয়ে যাও তো। চট্‌পট্ উত্তর এল না মশায়, আপনি ভুল করছেন, আমি নাপিত নই। আমি একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।—পরে জানা গেল, ভদ্রলোকটি উত্তর-ভারতের খাস্ আমদানি। ও দেশে নাকি ডাক্তারদের বাক্স হাতে বাড়ী বাড়ী রোগীর খবর করাই দস্তুর। হবেও বা!

বরদা বল্‌লে তবেই বোঝ! সব দেখে শুনে আমি তো এবার থেকে নিজেই কামাতে সুরু করবো—মনে করেছি। যা নাপিতের বাজার!

বগলা তো অবাক। সে বল্‌লে, বলো কি? শেষে কিনা তুমিও 'বার্‌বারিজ্‌মে' ঢুক্‌বে? রক্ষা কর ভাই।

বরদা বলে, বাগ্‌চি! তুমি 'বার্‌ লাইব্রেরীতে' বসে' বসে' ভোঁতা মেরে যাচ্ছ। বারুদের ব্যবসা ছেড়ে নাপিতের ব্যবসা ফাঁদ্‌তে যাব কোন্ দুঃখে? আমি নিজেই নিজের দাড়ি কামাব 'নিরাপদ-ব্লেড্‌' দিয়ে। তা নয় তো কি, তোমার মত নারদ-মুনি সাজতে যাব?

তিন বন্ধুর বিশ্রম্ভালাপ বেশ জমে উঠ্‌লো এই ভাবে। কিন্তু কি আপদ! বিট্‌লে বেঁটে খোট্টাদের বিট্‌কেল হট্টগোলের চোটে সে সব গল্প শোনবার জো আছে নাকি?

কিসের এত বকবকানি, হৈ হল্লা? বলছি, শোনো।

বড়বাজারের বৃহৎ 'ব্যারাকে' তখন বিরাট্‌ ব্যস্ততা! বেনিয়া বনোয়ারীলালের বেলোয়ারির দোকানে বিশ্রী বাগেশ্রীর বিশাল আসর বসেছে। জঁাদরেল-গোছের দেদার পেশাদার পেশোয়ারি পাখোয়াজ-বাজিয়েদের ভিড়ে আসর সরগরম। ফুল-বাবুদের হাতে বেলফুলের তোড়া আর মস্তকে বাব্‌রি কেশ বিলক্ষণ শোভা পাচ্ছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক্‌ আর বীমা কোম্পানীর বিল্ডিংয়ের বাম পাশে ব্যোমকেশদের যে বাসি বিস্কুটের কেবিন—তারি ওধারে আবার মাড়োয়ারীদের বারোয়ারির বর বেরিয়েছে। সঙ্গে মানোয়ারী গোরার ব্যাণ্ড্‌। জানোয়ারই চলেছে কত শত! অবশ্য সে সব কাগজের। রঙ্‌বেরঙের সঙ্‌ আর নানান্ ঢঙের পুতুল-নাচ।

এই সব দেখে বসাকদের বিশ্ব-বকাটে বক্কেশ্বর বিকট চেঁচাতে লেগেছে মনের আনন্দে।—

সঙ্ (Song) মানে গান
গান্ (Gun) মানে কামান
কামান (Come on) মানে আইস
আইস (I saw) মানে আমি দেখেছি···

এমনি আরো কত কি বিচিত্র কবিতা।

এই সব ঝঞ্ঝাটের ঝঙ্কার মাঝে আবার এক ফ্যাসাদ বাঁধলো। তেমন বেশী কিছু নয়—শুধু একটা বড়দরের 'ধাক্কা'। কোথায়, কেমন করে' কিসের সঙ্গে? বলছি।

এক মোটকু হোঁৎকা ভুঁড়িদার পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বুটিদার পাঞ্জাবী চড়িয়ে ফুটপাথ দিয়ে চলেছেন—যেন চিতপাত হলেন বলে'। তাঁর নাদুস্-নুদুস্ নধর ভুঁড়িটির ওজন ক'জনই বা বলতে পারে? তাই তাঁকে হেল্‌তে দুল্‌তে চল্‌তে হচ্ছিল কচ্ছপ-গতিতে। এখন হয়েছে কি, মোটকু ভদ্রলোকটির বিপরীত দিকে মুখ করে' আর একটি ভদ্রলোক—বেশ পাতলা ছিপ্‌ছিপে

তোতলা, ফোক্‌লা, ছ্যাতলা-পড়া মুখ—পাৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হন্‌হনিয়ে তীরের বেগে সোজা চলে আসছিলেন। এমনি ভাবে চোখ কান বুজিয়ে আস্‌তে আস্‌তে ভুঁড়িদারকে 'পাস্‌' করতে গিয়ে, 'গ্যাসপোষ্টে' ধাক্কা খেয়ে—পড়বি তো পড়্‌—একেবারে সেই গোলগাল 'জীবন্ত ফুলবল'টির ঠিক উপরে! আর যায় কোথা! অমনি সেখানে লেগে গেল এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। আর সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল গণ্ডা গণ্ডা উৎসুক নর-মুণ্ডু এবং ষণ্ডাগোছের কয়েকটি লাল পাগড়ী।

এই সব গণ্ডগোল আর হট্টগোল মিশিয়ে একটা হট্টমন্দির বানিয়ে তুলেছে, কবির ভাষায় বলতে গেলে যার নাম—

"কানের কাছে নানান্‌ সুরে
নাম্‌তা শোনায় একশো উড়ে।"

দেওয়ালী

শ্রীকমলকুমার রায়

*

দীপালী উৎসবে—
হাজার দীপের আলোক মালা
আতস বাজির রোশনি-ঢালা
রঙ-বেরঙের ফানুস জ্বালা
দারুণ খুশি সবে;

হই হই হই হট্টগোল
বাজছে কাঁসি, বাজছে ঢোল
উৎসাহেরই উঠছে রোল
সুখের কলরবে—
দীপালী উৎসবে।

গ্রীণল্যাণ্ড :: শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

*

ইউরোপ যাওনি, কিন্তু ইউরোপের ম্যাপ্ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। ম্যাপের মাথার ওপর যে-দেশটি দেখতে পাও আজ আমরা সেই দেশের কথাই প্রথমে বলব। দেশটির নাম গ্রীণল্যাণ্ড। অতি অদ্ভুত জায়গা। শীতের দেশ। সেরকম শীতের কথা তোমরা ভাবতেও পারো না। সবুজ গাছপালার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ!

সেদেশের মানুষগুলি হয় ফর্সা, চোখের তারাটি কালো আর সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবান। মাথার চুলে মেয়েরা প্রায়ই বেণী বাঁধে, আর পুরুষদের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাব্‌রি!

সুতোর কাপড়-জামা তারা পরে না। তাদের পোষাক তৈরি হয় জন্তু-জানোয়ারের চামড়া দিয়ে। এ-ছাড়া সে দুরন্ত শীত তারা কাটাবে কেমন করে'?

টকি-বায়োস্কোপ 'এস্কিমো' বলে' একখানি ছবি তৈরি হয়েছে। সে ছবিখানি যারা দেখেছে তারা ঠিক বুঝতে পারবে—এরা কেমন করে' জীবন যাপন করে।

এ-দেশের মেয়ে আর পুরুষ—সবাই ঠিক একই রকমের পোষাক পরে। মাথা থেকে আরম্ভ করে' পা পর্যন্ত চামড়ার পোষাক। চামড়ার জুতোয় এদের হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকে।

কাঠ দিয়ে এরা বাড়ী তৈরি করে বটে, কিন্তু কাঠ সব সময় পাওয়া যায় না। বড় বড় তিমি মাছের হাড় দিয়েই সাধারণতঃ এদের ঘর-বাড়ীর কাঠাম তৈরি হয়। তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে সে এক অদ্ভুত ধরনের বাড়ী এরা তৈরি করে।

আরও উত্তরে যদি চলে যাও ত' দেখবে, সেখানকার বাড়ীগুলো অন্য রকমের। দূর থেকে মনে হবে গম্বুজের মতন খানিকটা বরফের ঢিপি। বরফ ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই।

এস্কিমোরা স্লেজ গাড়ি ক'রে চলেছে।

কাজেই বাড়ীও তারা তৈরি করে বরফের চাংড়া দিয়ে। বাড়ীর একটি মাত্র দরজা। তাও আবার ঢুকতে হ'লে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

তোমরা হয়ত ভাবছো, সেই শীতের দেশে বরফের তৈরি বাড়ীর মধ্যে তারা থাকে কেমন করে'! কিন্তু এইখানে আমরা বিধাতার অদ্ভুত এক সৃষ্টি-রহস্য দেখতে পাই। এই সব বরফের তৈরি ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে রাখলে তা এত গরম হয়ে ওঠে যে, ঘরের ভেতর ঢুকেই তাদের গায়ের জামা খুলে ফেলতে হয়। তাই দিবারাত্রি দেখা যায় এই-সব বরফের ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

এদের এই ঘরগুলো হয় গোল। দেওয়ালের গায়ে গায়ে চওড়া বেদীর মত বরফের বেদী তৈরি করা হয়। দিনের বেলা এই বেদীর ওপর তারা বসে, রাত্রে তারই ওপর শোয়।

সারা শীতকালটা তারা এমনি করে' ঘরের ভেতরেই কাটায়, তারপর শীত যেই শেষ হয়, তখন তারা সবাই মিলে মাছ ধরে' আর জন্তু-জানোয়ার শিকার করে' ঘুরে বেড়ায়। নির্দিষ্ট বাড়ী বলে' তখন আর তাদের কিছু থাকে না। তাঁবু তাদের সঙ্গেই থাকে। এক সঙ্গে অনেকগুলো তাঁবু খাটিয়ে, কয়েকটা দিন এক জায়গায় কাটিয়ে আবার তারা শিকারের সন্ধানে বেরোয়। এই সব তাঁবু তারা তৈরি করে তিমি মাছের হাড় আর শীল মাছের চামড়া দিয়ে। একমাত্র ঘুমোবার সময় ছাড়া তাঁবুর মধ্যে বড়-একটা তারা বাস করে না, কারণ বাইরে বাইরে ঘুরতেই এরা ভালবাসে।

এই সব এস্কিমোদের সব সময়ের সঙ্গী—পোষা কুকুরের দল। কুকুর না থাকলে এদের চলে না।

'শ্লেজ্' বলে একরকম গাড়ী এরা তৈরি করে। কুকুরে টানা গাড়ী। এদের দেশে না আছে ট্রেন, না আছে ট্রাম, না আছে মোটর, অথচ মেয়েছেলে ঘর-সংসার নিয়ে গ্রামকে গ্রাম আবালবৃদ্ধবনিতা দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বরফের ওপর দিয়ে ঘুরেই বেড়াচ্ছে! এই সব কুকুরে-টানা গাড়ীগুলিই তাদের একমাত্র বাহন। একখানি গাড়ীতে জিনিসপত্র, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যাকিছু সব চড়িয়ে দিয়ে সারি সারি অনেকগুলি কুকুর জুড়ে দেওয়া হয়, তারপর পিছন থেকে কুকুরের পিঠে লাগায় চাবুক! চাবুক খেয়ে সেই বরফের ওপর দিয়ে কুকুরগুলো প্রাণপণে ছুটতে থাকে।

এস্কিমোদের প্রায় সকলেরই একপাল করে' কুকুর থাকে। তবে নিতান্ত যারা গরীব, তারা হয়ত একটি দুটি ছাড়া বেশি কুকুর পুষতে পারে না। কুকুর যাদের নেই তারা নিজেরাই নিজেদের পিঠের ওপর বোঁচ্কা-বুঁচ্কি বয়ে' বেড়ায়।

গ্রীষ্মকালে এরা নৌকায় চড়ে' ঘুরে বেড়ায়। নৌকো নিয়ে পুরুষেরা শীকার করে আর মেয়েরা দাঁড় টানে। এদের পুরুষরাও যেমন বলবান, মেয়েরাও তেম্নি।

যে-সব এস্কিমো শহরের কাছাকাছি বাস করে তাদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায়, লেখাপড়া শেখে। বেশি লেখাপড়ার দরকার তাদের হয় না। কোনো রকমে একটুখানি লিখতে পড়তে আর গুণতে শিখেই তারা ইস্কুল ছেড়ে দেয়। কারণ মুক্ত আকাশের তলায় বরফের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবনের একমাত্র আনন্দ। লেখাপড়া শিখে চুপ করে' বসে থাকতে তারা চায় না।

ছোট ছোট মেয়েরা বাড়ীতে বসে রান্না শেখে আর সেলাই শেখে। জন্তু-জানোয়ারদের চামড়া দিয়ে কেমন করে' পোষাক তৈরি করিতে হয় সেইটে তারা আগে শিখতে চায়।

পুতুল বা খেলনা নিয়ে খেলা করতে এদের ছেলেমেয়েদের কাউকেই বড় একটা দেখা যায় না।

ছেলেগুলো বরফের 'শ্লেজ্' তৈরি করে' টেনে টেনে নিয়ে বেড়ায়। গ্রীণল্যাণ্ডে কাঠের বড় অভাব। তাই তারা চারকোণা করে' প্রকাণ্ড একটা বরফের চাংড়াকে প্রথমে কেটে নেয়, তারপর তাতে চামড়ার তৈরি দড়ি বাঁধে। বাস্, এই হ'লো তাদের শ্লেজ্ গাড়ী। একটা ছেলে সেই বরফটার ওপর বসে, আর একটা ছেলে দড়ি ধরে' প্রাণপণে টানতে থাকে।

আর-একটা ভারী মজার খেলা এদের আছে। দল বেঁধে ছেলেরা প্রথমে উঠে যায় প্রকাণ্ড উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর। পাহাড় মানে মাটি পাথর গাছপালা কিছুই সেখানে নেই, আছে শুধু শক্ত শক্ত মসৃণ বরফ। সেই পাহাড়ের মাথার ওপর সারি বেঁধে তারা ধরাধরি করে'

একজনের পর একজন বসে, তারপর সবাই মিলে গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নামতে থাকে। নীচে নেমে একে একে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে গায়ের বরফগুলো ঝেড়ে ফেলে।

ছোটবেলা থেকেই এরা শিকার করতে ভালবাসে। প্রায় প্রত্যেক ছেলের হাতেই দেখা যায়—তীর-ধনুক একটা আছেই। এই তীর ধনুক দিয়ে তারা-তখন থেকেই পাখী মারে, আর ছোট ছোট জানোয়ারগুলোকে মারতে শেখে।

ছ'বছর আট বছর যখন বয়স, তখন থেকেই এরা নৌকার দাঁড় টানতে আরম্ভ করে। তারপর যেই দশবারো বছরের হয়, বাপ তখন তার জন্যে ছোট্ট একটি নৌকো বানিয়ে দেয়।

গ্রীণল্যাণ্ডে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়—বড় বড় শিংওয়ালা হরিণ দলে দলে ঘুরে' বেড়াচ্ছে। এমনি হরিণের একটা দল দেখতে পাবামাত্র এস্কিমোরা তাদের তাড়া করে। তাড়া করে' তাদের জলে নামিয়ে দেয়। তারপর নৌকায় চড়ে লম্বা লম্বা ইস্পাতের বর্শা দিয়ে তাদের ফুঁড়ে মারতে থাকে।

এস্কিমোরা অত্যন্ত সাহসী। এরা বড় বড় তিমি শিকার করে, শীল শিকার করে। তিমি মেরে তারা তেলটা প্রথমে বের করে' নেয়। শীলের মাংস ত' তাদের উপাদেয় খাদ্য!

এখানে শাদা ভাল্লুক আর শেয়াল দেখতে পাওয়া যায় প্রচুর। ভাল্লুক আর শেয়াল মেরে এস্কিমোরা তাদের লোমওয়ালা চামড়াগুলো ছাড়িয়ে নেয়। ব্যবহার করে নিজেদের পোষাকের জন্যে, আর কতক্ বিক্রি করে' আসে শহরে।

ছেলেমেয়ে ও কুকুর সমেত একটি এস্কিমো পরিবার।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যেতে ইচ্ছে করে তো অনেক দূর। চোখ তো বহুদূরই যায়। আর চোখ যতদূর যায় তার চেয়েও লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে যায় মন। সে ঘুরে বেড়াতে চায় এশিয়া ইউরোপের দেশগুলিতে, আফ্রিকার গহন অরণ্যে ; জাহাজে জাহাজে ভেসে বেড়াতে চায় ফেনিল নীল সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ; উড়ে বেড়াতে চায় মেঘ-রঙীন আকাশে আকাশে, ছুঁতে চায় তারাগুলিকে।

কিন্তু চাইলেই তো শুধু হয় না। পকেটে টাকা থাকা চাই যে।

শম্ভু আর বিজুর পকেট একেবারে খালি। অমলের পকেটে যা আছে তিন বন্ধুতে মিলে তা গুণে দেখল। সবসুদ্ধ ছাপ্পান্ন টাকা বার আনা।

বিজু ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'মাত্র এই ? ও তো আমার এক মাসের পকেট খরচও না। এই টাকা নিয়ে তুই অত বড়াই করছিলি !'

বড়লোক বন্ধুর এই উপেক্ষায় অমল আহত হোল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলল, 'কেবল ওই টাকাই বা হবে কেন। আরো আছে। আরো সম্বল না নিয়েই বেরিয়েছি নাকি ভেবেছিস ?'

'কি আছে ? আরো কি আছে রে ?'

শম্ভু আর বিজু দু'জনেই উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করল।

অমল বলল, 'হার আছে এক ছড়া ছ'ভরির।'

শম্ভু বলল, 'পেলি কোথায় ? কার গলার হার।'

অমল একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলল, 'মার গলার। চুরি ক'রে এনেছি।'

তিনজনেই মুহূর্তকাল চুপচাপ রইল।

তারপর শম্ভু বলল, 'বেশ করেছিস।'

বিজু বলল, 'তবে আর ভাবনা কি। আমরা তো ওই হার বিক্রি ক'রে অনেক দূরের টিকিট কাটতে পারি।'

শম্ভু তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'দূর বোকা। এখন ওই হার বিক্রি করতে গেলেই তো ধরা পড়ব। তা'হলে বেশিদূর আর যেতে হবে না। লালবাজারেই আটকে থাকতে হবে। তার চেয়ে ও জিনিস এখন আমরা রেখে দিই। পরে যখন দরকার হবে, বিক্রি ক'বে নেব। কি বলিস অমল?'

মুখ নিচু ক'রে অমল বলল, 'হুঁ।'

বন্ধুদের ভাব ভঙ্গি ওর কেমন যেন ভালো লাগছে না। মার গলার হার বিক্রির প্রসঙ্গ উঠতেই ওর বুকের ভিতরটায় টন টন ক'রে উঠেছে। মনে পড়ে গেছে মার সেই রোগা, শীর্ণ, করুণ মুখখানি। আহা, সেই মুখ আর অমল কোন দিন দেখতে পাবে না। কোন দিন শুনতে পাবে না সেই মধুর মুখের মিষ্টি সম্বোধন।

মার কথা মনে পড়ায় বাড়ির সকলের কথা মনে পড়ল। ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল মন। তবে কি সত্যি ফিরে যাবে অমল? ফিরে যেতে পারবে? বন্ধুদের হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলবে, 'দরকার নেই ভাই আর কোথাও যাওয়ার। চল ফিরে যাই। এই, কলকাতারই তো কত জায়গা, কত জিনিস দেখা বাকি আছে, আশেপাশের গ্রামগুলি গঞ্জগুলি দেখা হয়নি। চল আগে আমরা সেইগুলি দেখি। তারপর আরো বড় হয়ে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে ভদ্রলোকের মত পৃথিবী ঘুরতে বেরোব। এমন চোরের মত পালাব না। চল ফিরে যাই।'

কিন্তু পর মুহূর্তেই অমল ভাবল, সত্যিই কি আর ফিরে যাওয়া সম্ভব? ফিরে গেলে তাকে কি কেউ আর আস্ত রাখবে? এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব জানাজানি হয়ে গেছে। সবাই জেনেছে টাকা আর হার চুরি করে পালিয়েছে অমল। মেজদা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে খবর দিয়েছে। তাদের ধরবার জন্যে লোক ছুটোছুটি করছে শহর ভরে। না, আর ফিরে যাওয়া যায় না, আর দেরি করাও যায় না।

রাঁচী, পুরী, ভাগলপুর, জব্বলপুর ভূগোলে পড়া বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশের শহরগুলির নাম নিয়ে আলোচনা করছে, শম্ভু আর বিজু; অমল বিরক্ত হয়ে বলল, 'যে কোন এক জায়গার

টিকেট কেটে ফেল ভাই। যেমন ক'রে হোক গাড়িতে আগে উঠে পড়। কেউ যদি এসে পড়ে তা'হলে আর যাওয়া হবে না। কান ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবে।'

শম্ভু বলল, 'ঠিক বলেছিস অমু। আর দেরি করা ঠিক নয়। গাড়িতে আগে উঠে তো পড়ি। বেশী দূরে না যাই বর্ধমানের ওপারে গিয়ে তো থাকি। তারপর কোন এক জায়গায় সুবিধে মত গেলেই হবে। তাছাড়া আমরা তো আর এক জায়গায় একদিনের বেশি থাকব না। এক একদিন এক এক জায়গায় যাব। রোজ রোজ নতুন মাটিতে পা দেব, নতুন আকাশের নিচে দাঁড়াব, নতুন নতুন গাছপালার ধার দিয়ে যাব, নদী-নালা পাহাড়-পর্বত পেরোব, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করব। আমাদের ধ'রে রাখবে কে!'

এ কেবল শম্ভুর মুখের কথা নয়, তিন বন্ধুরই মনের কথা। শম্ভুর স্ফূর্তি দেখে অমলের মনের ভার কেটে গেল, দূর হয়ে গেল অপরাধ-বোধ, ঝাপসা হয়ে গেল মা ঠাকমা দাদা বউদিদের মুখ।

অমল বলল, 'ঠিক বলেছিল। আমাদের কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না। যত বিপদআপদই আসুক আমরা কেটে বেরিয়ে যাব।'

কে জানত এত তাড়াতাড়ি, এত সহজে বইয়ে-পড়া রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক হয়ে পড়বে তারা। যেন বিশ্বাস হতেই চায় না। এখন যেন চটপট ক'রে তিনজনের জন্যে অন্ততঃ গোটা তিন চার শক্ত রকমের বিপদআপদ না এসে পড়লে যেন আর নিজেদের মান থাকে না। মেজদা যদি পুলিস নিয়ে এসে পড়ে তো পড়ুক, তিন বন্ধুতে মিলে তাদের সামনে রুখে দাঁড়াবে, চিৎপটাং ক'রে ফেলে, দৌড়ে গিয়ে উঠবে গাড়িতে।

কিন্তু তেমন কিছু ঘটবার লক্ষণ দেখা গেল না।

বর্ধমানের মত অত কাছাকাছি জায়গা কারোরই মনঃপূত হোল না। এদিকে বিহার আর সি. পি. নিয়েও শম্ভু আর বিজুর মধ্যে মতভেদ ঘটতে লাগল।

অমল বলল, 'তা'হলে আগে ইউ. পি-তে চল, সেখান থেকে পাঞ্জাব। সেই 'পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে...।'

শম্ভু ধমক দিয়ে বলল, 'তোর কবিতা এখন রাখ। আগে গাড়িতে উঠে নে, তারপর যত খুশি কবিতা আওড়াস। ইউ. পি. বললে তো আর টিকেট দেবে না। একটা জায়গার নাম বলতে হবে। চট ক'রে বলে ফেল একটা শহর-টহরের নাম।'

কিন্তু ধমক খেয়ে অমলের সব শুকিয়ে গেল। গোলমাল হয়ে গেল ভূগোলের। ইউ. পি-র কোন শহরের নামই আর মনে পড়ে না। যে নামগুলি জিভের ডগায় এসে ভিড় করে সেগুলি সবই বোম্বাই মাদ্রাজের।

বিজু বলল, 'বেশ এলাহাবাদের টিকেট কাট। এলাহাবাদ বেশ respectable town'.

শম্ভু আর তর্ক না ক'রে এলাহাবাদেরই টিকেট কেটে ফেলল তিনখানা। তারপর চলল গাড়ি ধরতে।

গাড়ি প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিল। সকালে যাত্রীদের বেশি ভিড় ছিল না। তিনজনে তৃতীয় শ্রেণীর একখানা কামরায় উঠে পড়ে উত্তরদিকের জানালা ঘেঁষে বসল।

খানিকবাদেই গার্ডের হুঁইসেল পড়ল। গাড়ি দিল ছেড়ে।

অমল বলল, 'বাঁচলুম।'

বিজু বলল, 'ঠিক বলেছিস। আর আমাদের কে নাগাল পায়।'

কিন্তু তিন বন্ধুর মধ্যে শম্ভুর শুধু বয়সই বেশি নয়, বুদ্ধি আর সাংসারিক অভিজ্ঞতাও বেশি। নানা মনিবের কাছে কাজ করতে করতে, তাদের মন জোগাতে জোগাতে নানারকম দুঃখ কষ্ট ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে শম্ভুর বুদ্ধি বয়সের চেয়ে অনেক বেশি পেকেছে। অমল আর বিজুর শুধু স্কুলে পড়া বিদ্যেটুকুই আছে, কিন্তু বুদ্ধি যা কিছু রাখবার শম্ভুই রাখে।

বন্ধুদের এই উচ্ছ্বাস দেখে শম্ভু ওদের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আস্তে আস্তে। এখনও হুগলী জেলার সীমানা পেরোয় নি। বাঁচলুম কি মরলুম এখনই অত সহজে বলা যায় না। দেখছিস নে গাড়িতে আরো বাঙালী আছে। বার বার তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, যদি কোন রকমে সন্দেহ ক'রে পুলিসে ধরিয়ে দেয় তা'হলেই গেছি।'

একথা শুনে অমল আর বিজন দু'জনেই বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

শম্ভু তখন তাকে ভরসা দিয়ে নিচুগলায় বলল, 'অবশ্য আগে থেকেই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তবে খুব সাবধানে চলতে হবে। সাবধানে হিসেব ক'রে বলতে হবে কথাবার্তা। যেন কেউ কিছু ধরতে না পারে। খোলা-খুলি ভাবে কোন রকম আলোচনা করা চলবে না। আবার তাই বলে যে গরুচোরের মত গুটিসুটি হয়ে বসে থাকব তাও নয়। তাতেও বিপদ। তাতেও সবার সন্দেহ হবে। মোট কথা অবস্থা বুঝে বুঝে চলা চাই। চোখ কান খোলা রাখা চাই, আর মাথার ভিতরকার বুদ্ধিটাকে জাগিয়ে চাগিয়ে রাখা চাই। তা'হলে সত্যিই আর কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।'

অমল আর বিজু দু'জনেই বুদ্ধির তারিফ করল শম্ভুর। সত্যি ওর পরামর্শ মতই চলতে হবে সকলের। এ অভিযানে শম্ভুর নেতৃত্ব অবিসংবাদী।

কিন্তু কিসের অভিযান? মনে মনে একবার না ভেবে পারল না অমল। হিমালয়ের কোন চূড়ায় উঠবার দুঃসাহসিক অভিযান নয়, কোন অজ্ঞাত দেশ, অজ্ঞাত দ্বীপ আবিষ্কারের অভিযান নয়,

কোন চোর দস্যু ডাকাতের পিছনে পিছনে রিভলভার নিয়ে ধাওয়া করা না, এ কেবল নিজেরাই চোর হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ানো।

একটু আগে শম্ভুর 'গরু চোর' কথাটা অমলের মনকে খোঁচা দিয়েছে। গরু চোর না হোক অমল হার চোর তো বটে। নিজের মায়ের গলারই হার। তবু সে হার অমল চুরি ক'রে পালাচ্ছে। অমল চোর! অমল চোর! দুঃখে লজ্জায় হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল ক'রে উঠল অমলের। এর আগে বড়দা মেজদাকে লুকিয়ে লুকিয়ে যতগুলি ডিটেকটিভ বই সে পড়েছে, সব বইতেই সে সেজেছে অপরিসীম বুদ্ধিমান অসম-সাহসিক ডিটেকটিভ গোয়েন্দা—পিস্তল হাতে, রিভলবার হাতে ছুটেছে দুর্বৃত্ত দস্যুর পিছনে পিছনে। দস্যুর হাতে অনেকবার নাকাল হয়েছে, অনেক মার খেয়েছে, ডাকাতের বন্দুকের অনেক গুলি কতবার গেছে তার কানের পাশ দিয়ে, কিন্তু তবু অমল সব সময়েই ডিটেকটিভের পক্ষ নিয়েছে, ডিটেকটিভের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ক'রে দেখেছে—কোন সময়ই চোর হয়নি, দস্যু হয়নি, দুর্বৃত্ত হয়নি। আর আজ সত্যি সত্যিই একি হোল! চোর হোল অমল নিজে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে সে। আজ ডিটেকটিভরা তাকে ধরবার জন্যে বন্দুক হাতে পিছনে পিছনে ছুটবে। ভেবে ভারী খারাপ লাগতে লাগল অমলের।

টাক-পড়া মোটাসোটা যে প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোকটি তাদের দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন তিনি এতক্ষণে কথা বললেন, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ খোকারা? তিনজনে এক সঙ্গেই যাচ্ছ নাকি কোথাও?'

বিজু বলল, 'হ্যাঁ, আমরা এলাহাবাদ যাচ্ছি।

নিজেদের গন্তব্য স্থানটা এক কথায় এমনভাবে ফাঁস করে দেবার ইচ্ছে ছিল না শম্ভুর। কে জানে কে কেমন লোক, কার মনে কি আছে। সে চোখের ইসারায় বিজুকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেতে। করুণ মুখে বলল, 'হ্যাঁ আমরা এলাহাবাদেই যাচ্ছি। সেখানে আমার বাবার অসুখ। মা টেলিগ্রাম করেছেন। বাবা ওদেরও দেখতে চেয়েছেন তাই ওদেরও নিয়ে যাচ্ছি। ওরা আমার খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই। কলকাতায় বোর্ডিংএ থেকে পড়ে।'

ভদ্রলোক তিনজনের মুখেই একটু চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর বললেন, 'তাই নাকি?'

কথার ধরনে সন্দেহের ভাবটা বেশ ধরা পড়ে। অমল আর বিজুর বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

তিব্বত ও দালাইলামা

শ্রীমতী চারুবালা মিত্র

অমিতাভ বা পাঞ্চেনলামা

সম্প্রতি নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে নতুন ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় স্রুরু হয়েছে। তিব্বত মধ্য এশিয়া হিমালয় পর্বতের উত্তরে একটি সুউচ্চ মালভূমি। এই সমতলভূমিটি ১৪০০০ থেকে ১৮০০০ ফুট উঁচু। তিনদিকে শীতল অনাবৃত মরুভূমি ও একদিক বিশাল হিমালয় পর্বতদ্বারা সুরক্ষিত। ইহার আয়তন ৫০০,০০০ বর্গমাইল, এবং লোক-সংখ্যা ৩ লক্ষ। এই দুর্গম স্থানে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর ও বিপজ্জনক। তিব্বতীয়রাও বিদেশীদের সে দেশে যাওয়া পছন্দ করে না, এবং সেখানে যাওয়া এক রকম নিষিদ্ধ, সেজন্য তিব্বতের আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে নিষিদ্ধ দেশ, বা Forbidden land.

ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বতের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা শুধু রূপক কাহিনীতে ভরা। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ থেকে দশম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বত প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, তখন চীন দেশের কোন কোন রাজ্য এরা দখল করেছিল এবং নেপাল ও ভারতবর্ষের কয়েকটি দেশও তিব্বতীদের অধীনে ছিল। সর্বশেষ রাজা (Langdorma) ল্যাঙদরমার মৃত্যুর পর, সমস্ত দেশটা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়। আস্তে আস্তে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশী হওয়াতে বৌদ্ধ লামারা দালাইলামাকে দেশের রাজনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত সকল বিষয়ের শাসনভার ও ক্ষমতা দিয়ে (God King) বা দেশের সম্রাট ও দেবতার পদে অভিষিক্ত করে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে। কিন্তু ষষ্টদশ খৃষ্টাব্দে চীনারা তিব্বতে আসে এবং তিব্বতের শাসন পরিচালনার ভার এক রকম ওদের হাতেই থাকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয়রা চীনাদের তাড়িয়ে দেয় এবং চীনা প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং দালাইলামা সর্বময় কর্তা হয়ে দেশ শাসন আরম্ভ করেন।

তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধধর্মকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করেছে যে, জড়বাদকে মোটেই জীবনের লক্ষ্য বলে প্রশ্রয় দেয়না। আজকালকার যুগে যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস তা তারা ব্যবহার

করেনা—যেমন ভাল রাস্তাঘাট, যানবাহন, বৈজ্ঞানিক কোন যন্ত্রাদি, বৈদ্যুতিক আলো বা জলের কল কিছুই ওদেশে নেই। কিন্তু তা ব'লে যে ওরা অসভ্য, অশিক্ষিত জাতি তা নয়। অনেক শত বৎসর থেকে ওদের সভ্যতা চলে আসছে। বহু বৎসরের পুরাতন মঠগুলি সব পাথর ও পাহাড় কেটে তৈরী। এই সব মঠে যে পাথরের খোদাইকরা মূর্তি আছে তা পৃথিবীর মধ্যে ভাস্কর্যে অতুলনীয়। তাছাড়া এই সব মঠে হাতে বোনা কাজ করা পর্দা (Tapestry) বা সিল্কের উপর আঁকা যে সব ছবি আছে তা সত্যিই অপূর্ব। এই সব ছবিকে তনখা বলা হয়। এদেশে ছাপাখানা নেই, কিন্তু তা ব'লে এদেশে বই-এর অভাব নেই। বহুযুগ থেকে এরা গাছের বাকল থেকে কাগজ তৈরী করেছে এবং গাছ-গাছড়া থেকে রং তৈরী করে বইগুলি ছাপার অক্ষরে লিখেছে। এই সব মঠে হাতে লেখা নানারঙের ছবি দেওয়া শত শত ধর্মগ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। এদেশে নৃত্য-গীত দৈনন্দিন জীবনের একটি অঙ্গ বিশেষ।

বর্তমান দালাইলামা

তিব্বত দেশটিকে ধর্মরাজ্য বলা হয়। এখানকার লোকেরা সকলেই বৌদ্ধ। পুরোহিতদের বলা হয় লামা। এই সব লামাদের বাসের জন্য অনেক মঠ আছে। কোন কোন মঠে ৮০০০।৯০০০ লামাও বাস করে। এরা সব সময় নানারকম যাগযজ্ঞ ও পূজা করে। এই সব লামাদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সব চেয়ে যারা উঁচু শ্রেণীর, তারা নানারকম জ্ঞানচর্চা ও ধ্যান করে দিন কাটায়। দ্বিতীয় দলের লামারা আমাদের দেশের পুরোহিতদের মত পূজোআর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তৃতীয় অর্থাৎ সর্বনিম্ন লামারা সাংসারিক কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, এক দেশ থেকে আর এক দেশে গিয়ে লোকদের দেখাশুনা ও পুজো করে। এই সব লামাদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চপদস্থ দু'জন লামা আছে, একজনকে দালাইলামা ও অন্য জনকে পাঞ্চেন লামা বলা হয়। দালাইলামা বাস করে তিব্বতের রাজধানী লাসাতে, পাঞ্চেনলামা থাকে চীন দেশে। এরা দু'জনেই উঁচুদরের লামা, কারণ তিব্বতীয়দের ধারণা যে
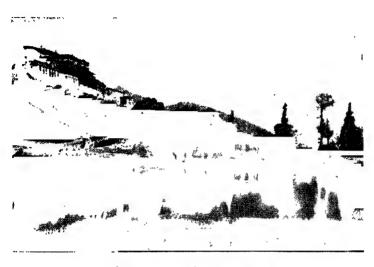
পোটালা প্রাসাদ—দালাইলামার আবাসস্থল

এদের দু'জনের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন। এক-জনকে বলা হয় Opagne—অর্থাৎ অমিতাভ, অসীম তেজোময় বুদ্ধ। ইনি জন্ম নেন পাঞ্চেন লামা রূপে। আর একজন তিনি হচ্ছেন অমিতাভর পুত্র নাম তার চেনরেজি, তিনি জন্ম নেন দালাইলামা রূপে গত ৫০০ বৎসর থেকে এই ভাবে দুই লামার জন্ম হয়ে আসছে। বর্তমান পাঞ্চেনলামা হচ্ছে ত্রয়োদশ ও বর্তমান দালাইলামা হচ্ছে চতুর্দশ। তোমাদের আজ বলব তিব্বতীয়রা দালাইলামা মারা গেলে অন্য দালাইলামাকে কি করে খুঁজে বের করে। যখন দালাইলামা এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন, তখন তার মধ্যে যে ঈশ্বরীয় আত্মা থাকে সেটি অদৃশ্য স্বর্গালোকে চলে যায়। এদের ধারণা দালাইলামার আত্মা দু'বৎসর পরে অন্য দেহে জন্ম নেয়। দালাইলামা মারা যাবার সময় ব'লে যান কোথায় তিনি আবার জন্ম নেবেন। তার মৃত্যুর দু'বৎসর পরে দৈবশক্তিসম্পন্ন লামারা নানারকম ধ্যানে মগ্ন হয়, তখন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অসুর দেবতারা তাদের উপর ভর করে তাদের মুখ দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে কোথায় দালাইলামা জন্মেছে, বা কোথায় খোঁজ করলে তাকে পাওয়া যাবে জানিয়ে দেন। তারপর কয়েকজন লামা ও কয়েকজন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিলে একটি কমিশন গঠন করে। তারা মৃত দালাইলামার ব্যবহৃত জিনিস—যেমন আংটি, জপের মালা, পানপাত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, শীলমোহর ইত্যাদি হুবহু নকল করে তৈরী করায়।

তারপর দালাইলামার তদন্তকারী কমিশন দল তিব্বতের সমস্ত শহরে ও গ্রামে গ্রামে দালাই লামার ব্যবহৃত ও নকল জিনিসগুলি নিয়ে নতুন দালাইলামার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

যে শিশুর মধ্যে দালাইলামার আত্মার জন্ম হয়েছে তার বয়স দুই বৎসরের বেশী হবে

না এবং তার জন্ম হতে হবে দালাইলামার মৃত্যুর পরে। এ শিশুর জন্মতিথি কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভূমিকম্প, ঝড়ঝঞ্ঝা, রামধনু ইত্যাদি—প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার যোগাযোগের মধ্যে হওয়া চাই। শিশুটিকে হতে হবে সুস্থ সবল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তার হাত বা পায়ের নীচে স্বস্তিকার চিহ্ন আঁকা থাকবে। যখন কোন শিশুর জন্মের সঙ্গে উপরোক্ত জিনিসগুলির মিল হয়ে যায় তখন তারা শিশুটিকে একটা কার্পেটের উপর বসিয়ে দেয় এবং দালাইলামার ব্যবহৃত নকল জিনিসগুলি কার্পেটের উপর ছড়িয়ে দেয় তারপর সকলে মিলে উৎসুক হয়ে দেখে ছেলেটি কি করে। কোন কোন ছেলে হতভম্ব হয়ে যায় ও কান্নাকাটি করে; কোন কোন শিশু নকল জিনিসগুলি তুলে নেয়, কেউ কেউ আবার দালাইলামার আসল জিনিসগুলি তুলে নিয়ে আর ছাড়তে চায় না। যে সকল শিশুরা দালাইলামার জিনিসগুলি আকড়ে থাকে এবং কিছুতে ছাড়তে চায় না, তাদের আরও কতকগুলি পরীক্ষা চলে। যখন দালাইলামাকে বেছে নিতে একটু মতভেদ ও মুস্কিল হয়, তখন লামারা খুব সমারোহ করে একটি ধর্মোৎসব করেন। তারা যে কয়েকটি ছেলেকে বেছে ছিলেন তাদের নামগুলি কাগজে লিখে একটি বড় স্বর্ণপাত্রে রেখে দেন এবং সবচেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরোহিত বা লামা তিনি সেই স্বর্ণাধার থেকে একটি কাগজ উঠিয়ে নেন। যে ছেলেটির নাম সেই কাগজে লেখা থাকে—সেই ছেলেটিকে দালাইলামার পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। যে পরিবারের শিশুপুত্রটিকে আজ দালাইলামার পদে বরণ করা হ'ল, সে পরিবারের আজ মহোৎসব ও পরম আনন্দের দিন। কারণ আজ থেকে সেই পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তন সুরু হ'ল। দালাইলামার মা ও বাবা যতই গরীব হোক না কেন, সেদিন থেকে তারা সম্ভ্রান্ত পরিবার রূপে গণ্য হবে এবং সরকার থেকে তাদের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করা হবে। ছ'বৎসর পর্যন্ত দালাইলামাকে তার মায়ের কাছে থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়, এবং তাদের বাসের জন্য একটি সুন্দর বাড়ী দেওয়া হয়। তারপর যখন দালাইলামার বয়স ছ'বৎসর পূর্ণ হয়, তখন খুব সমারোহ করে শোভাযাত্রা সহকারে তাকে রাজধানী লাসাতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে তার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়,—তিব্বতের সবচেয়ে জ্ঞানী ও গুণী পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে। এই রকম বয়স থেকেই বালক দালাইলামাকে অন্যান্য লামাদের মত কঠিন ও কঠোর জীবনযাত্রা সুরু করতে হয়। যখন দালাইলামার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয়, তখন নানারকম পূজা ও উৎসবের ভেতর দিয়ে দালাইলামার অভিষেক হয় এবং তিব্বতের সমস্ত শাসনভার ও সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়। ততদিন একজন প্রতিনিধি (Regent) অন্যান্য মন্ত্রীমণ্ডলী ও সদস্যদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করলে তিব্বতবাসীদে কাছে দালাইলামা একদিকে সম্রাট ও অন্যদিকে

বুদ্ধদেবের মত সম্মান পেয়ে থাকেন। বর্তমান দালাইলামার বয়স এখন ১৬ বৎসর। গত অক্টোবর মাসে চীনা সৈন্যরা যখন তিব্বত আক্রমণ করেছিল তখন দৈববাণী শক্তিসম্পন্ন লামারা ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিল যে, এই বিপদের সময় দালাইলামার অভিষেক হওয়া উচিত। সেইজন্য ১৮ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই দালাইলামার গত নভেম্বর মাসে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি দালাইলামা বর্তমান চীনা আক্রমণের ভয়ে কয়েকজন মনোনীত প্রহরী ও সঙ্গী নিয়ে ২৮৪ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে ভারত ও তিব্বতের সীমান্তে ইয়াটুং নামক জায়গায় এসে আশ্রয় নেন। গত জুলাই মাসে চীন কর্তৃপক্ষের লোকেরা কালিম্পঙ ও গ্যাঙটক হয়ে ইয়াটুং পৌছায় এবং দালাইলামাকে এই আশ্বাস দিয়ে সঙ্গে করে লাসা নিয়ে যায় যে, তিনিই তিব্বতে আগেকার মত শাসন পরিচালনা করে যাবেন। চীনারা তিব্বতীয়দের সঙ্গে এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় যে, তারা তিব্বতে যাবে এবং তাকে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

যে রাজ্য শাসিত হয় ভগবানের বাণীর দ্বারা, সেই ধর্মরাজ্য আজ বিনা রক্তপাতে লাল চীনের হাতে চলে গেল! সমস্ত পৃথিবী তিব্বতের এ অবস্থা দূর থেকে দেখল, কিন্তু কেউ তাকে এতটুকু সাহায্য করবার চেষ্টা করল না। অসহায়, ধর্মপ্রাণ, শান্তিপ্রিয় তিব্বতবাসী আজ চীনের হাতে আত্মসমর্পন করেও কিন্তু নিজের ধর্মবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এর পর ইতিহাসে আবার তিব্বত সম্বন্ধে কি কাহিনী লেখা হবে কে জানে?

বৃষ্টি

শ্রীদেবপ্রসাদ বসু

তীর-প্রায় ছুটে যায়,
কোন দিকে নাহি চায়
বিধাতার সৃষ্টি—
ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি!
কবি মনে জাগে তায়
'যেন আভা খেলে যায়'—
অপূর্ব সৃষ্টি—
ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি।
ঝাপ্‌সা যে গাছপালা
ভরপুর নদী-নালা,
অপরূপ সৃষ্টি
ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি!
চপ্ চপ্ মাঠ-ঘাট,
বন্ধ যে পাঠ-হাট,
নব এক সৃষ্টি
ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি।
সাড়া পেয়ে তরুকুল—
যুঁই-শেফালিকা ফুল
জেগে ওঠে 'নন্দে
অজ্ঞাত ছন্দে!

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

[বিখ্যাত সাহিত্যিক ও মৌচাকের জন্ম হোতেই নিয়মিত লেখক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সিনেমা ডিরেক্টার শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সিনেমা সংক্রান্ত ডিরেক্টার, অভিনেতা ইত্যাদির সঙ্গে রাশিয়ায় দু'মাসের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন। শ্রীমান সৌম্যেন্দ্র সিনেমা ক্ষেত্রে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন; তাঁর তোলা অনেক ছবি তোমরা অনেকেই দেখেছ। সেদিন আমাদের দেশের রূপকথা নিয়ে 'খেলাঘর' নামে একটা চমৎকার ছোটদের ছবি তুলে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সোভিয়েট দেশ থেকে ফিরে আসতেই তাঁকে আমরা রাশিয়ার সম্বন্ধে, বিশেষতঃ সেই দেশের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করি; তাঁর প্রথম লেখা এই মাসে বেরুলো। লেখাটি তোমাদের কেবল যে ভালো লাগবে তা নয়, রাশিয়ার সম্বন্ধে অনেক বিষয় তোমরা জানতেও পারবে।—মৌচাক-সম্পাদক]

আজকের দিনে সোভিয়েট দেশ ছোট-বড় সকলের কাছেই এক রহস্যময় রূপকথার রাজ্য। খবরের কাগজে, কেতাবে, লোকমুখে ভাল-মন্দ এত সব অদ্ভুত কাহিনী নিত্য ভেসে আসে এই আজব সোভিয়েট দেশ আর তার আজব বিধি-ব্যবস্থা এবং বাসিন্দারদের বিষয়ে, যে অনুসন্ধিৎসু মন আমাদের স্বভাবতঃই কৌতূহলী হয়ে ওঠে, এদের আসল রূপ এবং আসল ব্যাপারটি জানবার জন্যে। কিন্তু জানবার উপায় বড় শক্ত! ইচ্ছে করলেই নাকি গিয়ে হাজির হওয়া যায় না এই সোভিয়েট দেশে···এবং গেলেও নাকি খাঁটি পরিচয় মেলে না সে-দেশের লোকজনদের, তাদের আচার-ব্যবহার আর কীর্তি-কলাপের···এমনি অদ্ভুত নাকি এক রাজ্য!

কিন্তু, অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ মিলে গেল এই আজব রাজ্য সোভিয়েট দেশে যাবার। সম্প্রতি সোভিয়েট চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভা, ভারতবর্ষের বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং কোলকাতার বিশিষ্ট ক'জন চলচ্চিত্র-শিল্পীকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সোভিয়েট দেশে গিয়ে সেখানকার সিনেমা-শিল্পের কলা-কৌশল-কৃষ্টির সব কিছু ব্যাপার দেখবার, শোনবার এবং জানবার জন্যে। বিদেশী মন্ত্রীসভার আমন্ত্রণে দেশ ছেড়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের বিদেশ যাত্রা ভারতের চলচ্চিত্র-ইতিহাসে এই প্রথম। এর আগে আর কোনো বিদেশী রাজ্য কখনও কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পীদের এই ধরণের সুযোগ ও সম্মান দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আমাদের এই ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলে বোম্বাই থেকে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধা ফিল্ম-অভিনেত্রী শ্রীদুর্গা খোটে, জন-প্রিয় চিত্রাভিনেতা শ্রীঅশোককুমার (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের ফিল্মস্ ডিভিশানের অন্যতম কর্মকর্তা শ্রীহরি আবাজী কোলহাৎকার। আমার ভূতপূর্ব সহকর্মী-সুহৃদ জন-প্রিয় চিত্র-পরিচালক শ্রীফণী মজুমদারও আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সোভিয়েট

চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভার, কিন্তু ছবির কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মাদ্রাজ থেকে গিয়েছিলেন চিত্র-পরিচালক শ্রীসুব্রাহ্মণম্, হাস্যরসাভিনেতা কৃষ্ণণ এবং কৌতুকাভিনেত্রী শ্রীমতী মথুরম্। আর কোলকাতা থেকে, সুপ্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নবীন চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীনিমাই ঘোষ এবং আমি। স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও সোভিয়েট আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ কারণে তাঁর পক্ষে বিদেশ-যাত্রা সম্ভব হয়ে উঠলো না। আমাদের এই প্রতিনিধি-দলের মধ্যে অশোককুমার ছিলেন লণ্ডনে। তিনি লণ্ডন থেকে সোজা মস্কোয় এসে আমাদের পৌঁছুবার ক'দিন পরে দলের সঙ্গে মিলিত হন। তবে তিনি বেশীদিন মস্কোয় থাকতে পারেন নি। লণ্ডনে তাঁর অসুস্থা পত্নীর পরিচর্য্যার জন্য তাঁকে প্রায় সপ্তাহখানেক পরেই সেখানে ফিরে যেতে হয়। অশোককুমারের লণ্ডনে ফিরে যাবার ক'দিন পরে কোলহাৎকার বোম্বাই থেকে বিমান-যোগে ইউরোপের পথে এসে আমাদের সঙ্গে মস্কোতে মিলিত হন।

বিখ্যাত রাশিয়ান ফিল্ম-ডিরেক্টর রম ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা লিখছেন—ডান দিকে লেখক

১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রে দমদমায় প্লেনে করে আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের নেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মশাই এবং আমি রওনা হই দিল্লীর পথে। নিমাই ঘোষ ট্রেনে চড়ে আগে গিয়ে হাজির হন দিল্লীতে। দুর্গা খোটেও দিল্লীতে অপেক্ষা করছিলেন সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকেই। বাকী ছিলেন শুধু মাদ্রাজের দল। তাঁরা বিমান-যোগে দিল্লীতে এসে পৌঁছুলেন ১৭ই সেপ্টেম্বর সকালে। ওঁদের জন্যই আমরা ক'দিন অপেক্ষা করছিলুম দিল্লীতে—দল ভারী

করবো বলে। দিল্লীর সোভিয়েট-দূতাবাসে ডিনার-পার্টিতে শুনলুম, অশোককুমার লণ্ডন থেকে সোজা আসবেন মস্কোয় এবং কোলহাৎকারের আসার তখনও ঠিক নেই। কাজেই আর বিলম্ব না করে ১৯শে সেপ্টেম্বর সকালে দিল্লীর উইলিংডন এরোড্রোম থেকে আমাদের যাত্রা। বহু ভারতীয় বন্ধু-বান্ধব এবং সোভিয়েট দূতাবাসের বন্ধুরা এরোড্রোমে এসেছিলেন আমাদের 'শুভ-যাত্রা' শুভ-সম্ভাষণ জানাতে।

লাহোরে, প্লেন থেকে নেমে···সারাদিন ওখানকার সুপ্রসিদ্ধ 'ফেলেটিস্ হোটেলে' বিশ্রাম এবং আমাদের ভারতীয় হাই কমিশনারের ভবনে চায়ের পার্টি সেরে রাত্রের ট্রেণে রওনা হলুম পেশোয়ার অভিমুখে।

ট্রেনে রাত কাটালো। পরের দিন সকালে পৌঁছুলুম পেশোয়ার। ওখানকার সুবিখ্যাত 'ডীনস্ হোটেলে' স্নানাহার সেরে দুপুরে বিরাট দু'খানি মোটর-ভ্যানে চড়ে পাকিস্তান ছেড়ে কাবুলের পথে পাড়ি দিলুম। ভ্যান দু'খানি যেমন বিরাট—তেমনি আরাম সে-ভ্যানে চড়ে যাওয়া। খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে কাবুলের পথ।

মস্কো এরোড্রোমে ভারতীয় চলচিত্র প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনা

পথ খুব খারাপ। ধূলো আর পাথরে ভরা···এবড়ো-খেবড়ো, আঁকা-বাঁকা···চড়াই আর উৎরাই! পাহাড়ের পর পাহাড়···রুক্ষ ভীষণ···তবু কী অপরূপ বৈচিত্র্য! পেশোয়ার থেকে কাবুল, দুশো মাইল দূরে···কিন্তু এই দুর্গম পথ মাড়িয়ে পৌঁছুনো যেন এ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু আমাদের রথের সোভিয়েট-রথীরা খুব পাকা—কাজেই রাতের অন্ধকারের মধ্যেই তাঁরা প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করে কাবুলের অন্যতম প্রধান শহর জালালাবাদের হোটেলে এনে পৌঁছে দিলেন আমাদের এবং সেখানেই রাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা। এই দুর্গম পাহাড়ী-পথে অন্ধকারে পাড়ি—আতঙ্কের-ব্যাপার···তাই এ ব্যবস্থা!

পরের দিন ভোর রাতে আবার যাত্রা শুরু এবং বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমরা পৌঁছুলুম কাবুল শহরে। সেখানে আমাদের জন্য সোভিয়েট প্লেন অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে ওখানকার দূতাবাসে দেখা করেই সদলে উঠে পড়লুম সোভিয়েট প্লেনে। আমাদের বিদায় দিতে ওখানকার ভারতীয় এবং সোভিয়েট দূতাবাসের অনেকেই এসেছিলেন বিমান-বন্দরে।

আমাদের বুকে নিয়ে কাবুলের মাটি ছেড়ে বিরাট সোভিয়েট প্লেন উড়ে চললো সোভিয়েট রাজ্যের উজবেকীস্তানের প্রধান শহর তাশ্‌কান্দের অভিমুখে।

তাশ্‌কান্দের বিমান-বন্দরে পৌঁছুলুম বৈকালে…বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল ওখানকার এক বড় হোটেলে…চমৎকার সব সুব্যবস্থা…স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ। ওখানে একদিন থেকে এবং ওখানকার সিনেমা, অপেরা, আর্ট গ্যালারী, এম্যুজ্‌মেণ্ট পার্ক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখে ২২শে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে বারোটায় আবার সোভিয়েট প্লেনে চড়ে পাড়ি দিলুম মস্কোর উদ্দেশ্যে।

মস্কোতে পৌঁছুলুম ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ। এরোড্রোমে ওখানকার চলচ্চিত্র-বিভাগের সহ-মন্ত্রী প্রমুখ মস্কোর মঞ্চ-চিত্র এবং শিল্প-জগতের অনেকেই ছিলেন উপস্থিত—বিরাট জন-সমুদ্র যেন…আমাদের সাদর-সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য। প্লেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই অজস্র ক্যামেরার হাতল ঘোরানো শুরু…সেই সঙ্গে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন…অভ্যর্থনা-সম্ভাষণ-জ্ঞাপন…ফুলের তোড়া…কী সাদর আপ্যায়ন—আমাদের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত… কল্পনাতীত! নিজের দেশে আমরা সামান্য তুচ্ছ ব্যক্তি—কে আমাদের চেনে, কিন্তু আমরা ভারতবাসী এবং ভারতের শিল্পী হিসাবে এঁদের অতিথি…আমরা এঁদের হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতির অভিব্যক্তিতে অভিভূত হলুম।

মস্কোয় আমরা ছিলুম পরম-আরামে…রাজার হালে! থাকবার ব্যবস্থা ওখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল…এবং যান-বাহন-পরিচর্যার বন্দোবস্ত ত্রুটিলেশহীন সুন্দর! দেখবার, শোনবার এবং জানিবার ব্যবস্থাও ছিল সুপ্রচুর। এ-সবের সদ্ব্যবহারও করেছি আমরা চূড়ান্ত রকমে এবং এই অল্পকালের অবস্থানে সোভিয়েট দেশ, সেখানকার লোকজন, ব্যবস্থা, শিল্প-কলা সম্বন্ধে দেখবার, শোনবার এবং জানবার যা-কিছু আছে, যতদূর সম্ভব, দেখেছি, শুনেছি, এবং জেনেছি কৌতূহল মিটিয়ে।

এই সোভিয়েট পরিক্রমায় আমরা দেখেছি বিভিন্ন সোভিয়েট জন-পদ, লেনিনগ্রাদ, কীভ, টিবিলিসি, সোচি, গাগ্‌রে, গোর্কী, মাচসেস্তা, গোরী, সুখুমী, জুগদিদি, ইঙ্গুরী প্রভৃতি স্থান। দেখেছি বিভিন্ন সোভিয়েট থিয়েটার, সোভিয়েট সিনেমা, ষ্টুডিও, সিনেমা-ইন্‌ষ্টিটিউট, ড্রামাটিক স্কুল, ব্যালে স্কুল, কৃষ্টি-কলা-কেন্দ্র, কনসার্ট হল, লোক-সঙ্গীত ও নৃত্য উৎসব প্রভৃতি। শুধু ষ্টেজ, সিনেমা, নৃত্য-সঙ্গীতের দিক ছাড়াও আমরা সোভিয়েট মোটর গাড়ীর কারখানা, কাপড়ের মিল, জুতোর ফ্যাক্টরী, চকোলেট-কারখানা, চা-বাগান, যৌথ-কৃষি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এ-সবও দেখেছি এবং আরো বিশেষ করে দেখেছি এই সব কল-কারখানায় বা কৃষি-কেন্দ্রে যারা কাজ

করে—তারা কি ভাবে বাস করে, কি ভাবে থাকে, তাদের সুখ-সুবিধা, এবং আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা কি রকম।

সোভিয়েট দেশে ছোট ছেলেমেয়েদের কি করে মানুষ করে তোলা হয়—শিক্ষায়, রুচিতে, কৃষ্টি-কলায় এবং কর্মপটুতায় সকল দিকে—তাও নিজেদের চোখে দেখে এসেছি আমরা—কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, 'পাইয়োনীয়ার' এবং 'কম্‌সোমোল্‌' প্রতিষ্ঠান, ছোটদের রেষ্ট-ক্যাম্প, জিম্‌নাসিয়াম্‌, স্পোর্টস্‌ ষ্টেডিয়াম প্রভৃতিতে গিয়ে। দেখেছি, সোভিয়েট দেশের প্রত্যেকেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আন্তরিক ভালবাসে···এবং খাতির করে। ছোট ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যৎ···তাদের হাতেই রয়েছে দেশের উন্নতির ভার—শিক্ষায়, বুদ্ধিতে, কাজে-কর্মে, কৃষ্টি-কলার তারাই বড় হয়ে নিজেদের দেশকে বসাবে গৌরবের উর্দ্ধাসনে। এ বুঝে সারা সোভিয়েট রাজ্য জুড়ে বড়রা আজ প্রাণপাত চেষ্টা করছে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যেন মানুষ হয়···মানুষ হয়ে জীবনকে যাতে সুন্দর, মধুময় করে তুলতে পারে। এই দিকেই সোভিয়েটের একাগ্র সাধনা।

সোভিয়েট-পরিক্রমা সেরে সদ্য ঘরে ফিরেছি—ফেরবামাত্র শ্রদ্ধেয় 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার এসে আগ্রহভরে আমাকে বললেন,—ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সেখানে যা-কিছু দেখেছি, জেনেছি,—'মৌচাকে' লিখতে হবে। 'মৌচাকে'র সঙ্গে আমার পরিচয়—'মৌচাকে'র জন্ম-তারিখ থেকে···তখন আমি ইংরেজী ফার্ষ্ট বুক পড়ছি—সেই দিন থেকেই 'মৌচাক'কে ভালবাসি। তার ওপর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের এই স্নেহের আমন্ত্রণ!

সোভিয়েটের সব কথাই তোমাদের জানাবো। সব আগে আজ তোমাদের জানাতে চাই,—সোভিয়েটের ছেলেমেয়েরা তোমাদের কথা আমাকে বার-বার জিজ্ঞাসা করেছে—আমার মারফৎ পাঠিয়েছে তোমাদের জন্য তাদের আন্তরিক শুভ-সম্ভাষণ···কামনা করেছে তোমাদের মৈত্রী এবং সখ্য! তারা তাদের রুশ ভাষায় তোমাদের যা লিখেছে আমি তার কয়েকটি বাংলায় তর্জমা করে দিলুম:—

(১) "আমরা—সোভিয়েট ইউনিয়নের 'পাইয়োনীয়ার'রা (৭ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠান) ভারতের সকল ছেলেমেয়েকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তাঁদের সকলের জীবন সফল হোক্, সার্থক্ হোক্!" ইতি—

সোভিয়েট ইউনিয়নের 'পাইয়োনীয়ার'বৃন্দ

(২) "ভারতের সকল ছেলে-মেয়েকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি।"

ইউক্রাইনের 'পাইয়োনীয়ার'বৃন্দ

সোভিয়েট ছেলেমেয়েরা আমাকে আরো অনুরোধ করেছেন তোমাদের বলতে যে, তাঁরা চিঠি-পত্রের মারফৎ তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব (Pen-Friends) করতে চান। তোমাদের মধ্যে যারা সোভিয়েট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'চিঠির-বন্ধুত্ব' পাতাতে চাও—চিঠি লিখে 'মৌচাক'-সম্পাদক মশাইকে জানালে আমি তার ব্যবস্থা করে দেবো। আজ এই পর্যন্ত।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন এখন আর সে-লেন নেই। আগে গ্যাসের আলো জলতো। কিন্তু এখন এখানে-ওখানে আরো দু'চারটে দোকান হয়েছে। সেই দোকানের আলো এসে পড়েছে রাস্তায়।

রাতুল বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ছোটখাট ভিড় হয়েছে একটা। সকলের দিকে মুখ করে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গোবিন্দ। হাত মুখ নেড়ে গোবিন্দ কী যেন সব বলছে সকলকে—

গোবিন্দর ও কী চেহারা হয়েছে! এ যে আর চেনাই যায় না। আগে কেমন দেখতে নাদুস্‌নুদুস্ ছিল। ভুঁড়িটা ছিল মস্ত বড়। ওই ভুঁড়ি চিৎ করে শুয়ে থাকতো সে। যখন মেজাজ ভালো থাকতো গোবিন্দর, রোয়াকের ওপর দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে বাঁ-হাতটা বুকের ওপর আর ডান হাতটা ভুঁড়ির ওপর রেখে, আঙুলগুলো দিয়ে একমনে তবলা বাজিয়ে যেত। আর মুখ দিয়ে বেরুত তবলার বোল্—তাগে নাধিন্ নাগেধিন্—ত্রে কেটে তাক্—ত্রে কেটে তাক্ তাক্ তাক্—তাগে নাধিন্ নাগেধিন্…

দোতলার ওপরের ঘর থেকে শোনা যেত পায়রার বক্-বকম্ আওয়াজের মত গোবিন্দর ভুঁড়ির তবলার বোল্।

সে-ভুঁড়ি এখন চুপ্‌সে গেছে একেবারে। গায়ের মাংস এখন ঝুলে আসছে। রং আরো কালো হয়ে গেছে।

গোবিন্দ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে—

—আমাকে আপনারা কেন মিথ্যে মিথ্যে দুষী করছেন আজ্ঞে—আমি কে? আমি এ-বাড়ীর চাকর বই তো নয়—হুকুমের চাকর বটে তো। কর্তার অন্ন খাচ্ছি, কর্তাবাবুর হুকুম তামিল করতে হবে—আবার যে-দিবস আপনাদের অন্ন খাবো সে-দিবস আপনাদেরও…

কে বুঝি ভিড়ের ভেতর থেকে বলে উঠলো—আচ্ছা তুমি যাও না একবার—বলে এসো রাখালবাবু এসেছেন—কী বলেন এসে বল আমায়—

গোবিন্দও না-ছোড়বান্দা। বলে—আজ্ঞে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কথা কেউ শুনলে তো। দরজায় ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে ক্ষিতীনবাবু আর আমার কর্তাবাবু আমাদের খোকাবাবুকে নিয়ে কথাবার্তা বলছেন—আমার কথা এখন কে শুনবে আজ্ঞে—আমি তো সামান্য চাকর বটে—

তবু ভদ্রলোকেরা প্রতিবাদ করে—তোমাদের খোকাবাবু তা'হলে ফিরে এসেছে শেষ পর্যন্ত —মারা যায়নি—

গোবিন্দ জিব কাটলে—বালাই সাট—মারা যাবেন কেন হুজুর—কামিখ্যেয় গেলে যেমন মন্তর-তন্তর করে—এও তেমনি মন্তর-তন্তর করে রেখেছিল আর কি—

কে একজন বলে উঠলো—তবে এই নিয়ে এতদিন এত বই লেখা, এত বক্তৃতা...

আর একজন বললে—আহা, ওকে ওসব বলে লাভ কী মশাই—

—বলুন তো আপনি—বলুন তো—

গোবিন্দ যেন জোর পেয়ে গেল এতক্ষণে।

—বলুন তো আপনি—আমি সামান্য চাকর বটে কি না—আমার ওপরে কর্তাবাবুর হুকুম আছে কাউকে যেন ভেতরে ঢুকতে না দিই—এখন আমি আপনাদের ঢুকতে দেই—আর তারপরে আমার চাকরিটি যাক্—তখন আমি দাঁড়াব কোথায়—এই বুড়ো বয়েসে কে আমায় চাকরি দেবে শুনি—না আমার জমিদারী আছে তাই ভাঙাবো আর খাবো—

রাতুল তখন দাঁড়িয়ে গোবিন্দর কথা শুনছিল আর তার অঙ্গভঙ্গী দেখছিল। ওই চেহারাটাই যা বদলেছে গোবিন্দর—আসলে সেই আগেকার মত বাক্যবাগীশই আছে।

কিন্তু সে যা হোক, এদিকে মজা তো মন্দ নয়!

রাতুল সেজে কে আবার এসে হাজির হলো তা'হলে। জাল প্রতাপচাঁদ নাকি! কিম্বা ভাওয়াল মামলার মত মেজকুমারের পুনরাবির্ভাব! সত্যি সত্যি মজা তো মন্দ নয়। এ যে রাতুলের জীবন নিয়েও আবার একটা ডিটেকটিভ্ উপন্যাস সুরু হলো দেখা যাচ্ছে। খুব হাসি পেল রাতুলের।

এমন করে ঘটনাস্রোত বদ্‌লাবে কে ভাবতে পেরেছিল।

রাতুল ভিড়ের সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

একবার ডাকলে—গোবিন্দ—ও গোবিন্দ—শুনতে পাচ্ছো—

ডাকটা বোধ হয় গোবিন্দর কানে গেল।

বললে—এখন গোবিন্দ কারো নয় ভাই,—এখন কারো সঙ্গে কথাটি বলতে পারবো না আমি—আমি হুকুমের চাকর—যেমন হুকুম পাবো তেমনি তামিল করবো—আমার কিসের দায় পড়েছে সকলের কথা শোনবার—

রাতুল একবার বলতে গেল—গোবিন্দ শোন এদিকে আমি, রাতুল—আমিই আসল রাতুল—কিন্তু বলতে গিয়ে বলা হলো না। কী যেন ভাবলে একবার। এর শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক্ না—কোথায় গড়ায় ব্যাপারটা। সারাটা জীবন যার সামনে পড়ে রয়েছে তার এত তাড়াহুড়ো করারই বা কী প্রয়োজন। চিরকাল একটা মিথ্যেকে কখনও সত্যি বলে চালানো যায় না। কথাটা বাবার কাছেই শিখেছে সে। যা' ফাঁকি তা' একদিন ধরা পড়বেই। একদিন একসময় সবই জানাজানি হয়ে যাবে। তখনই মজা!

রাতুল সেই অন্ধকার—গলির ভেতর ভীড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো।

* * * *

সিঁড়ির ওপরে উঠেই ডানদিকে একখানা ঘর। সে-ঘরটা কোনও কাজে লাগে না সাধারণতঃ। সে-ঘরটায় এখন যাবতীয় বাজে জিনিস ভরা। তার ঠিক পরের ঘরটাতেই ভেতরে খিল দিয়ে বসে আছেন নিত্যানন্দ সেন। আর একটা চেয়ারের ওপর বসে আছে ছেলেটি। ক্ষিতীনবাবু সামনে বসে একদৃষ্টে তাকে দেখছেন আর কথা বলছেন।

ক্ষিতিনবাবু বললেন—সত্যি কথা বললে তোমার কী ক্ষতি হয় খোকা—

—আমি সত্যি কথাই তো বলছি—

ছেলেটি আস্তে আস্তে মুখ নিচু করেই বললে কথাটা।

—কিন্তু এই ঘর, এই বাড়ী—এ-সব তোমার স্বীকার করছ তো—চেয়ে দেখ দিকিনি তোমার বাবার মুখের দিকে—তোমার কথা ভেবে ভেবে চেহারা কী হয়েছে ওঁর—একটু মায়া-দয়াও নেই তোমার শরীরে—ছেলের জন্যে বাবার যে-দুঃখ তা' কি একটুও বুঝছো না—এতদিন ধরে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে কি এই শিক্ষা পেলে—

ছেলেটির মুখে কোনও কথা নেই—

—আর একটা কথা—

ক্ষিতীনবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে সরে এলেন আরো কাছে।

—আর একটা কথা, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে চেহারার যা দশা হয়েছে তা তো দেখছিই—কী ছিলে আর কী হয়েছ—কতদিন আমার পিঠে চড়ে তোমার খেলা হয়েছে—সেই রাতুল

তুমি, এ কী সর্বনাশ করছো বলতো, শুধু নিজের সর্বনাশ নয় বাবারও সর্বনাশ করছো—অথচ সমস্ত চুকে যায় যদি একবার বাবা বলে ডাকো ওঁকে—ওই তো দেখছ উনি মুখ ঢেকে অন্য দিকে চেয়ে তখন থেকে বসে আছেন, কিন্তু এখনি তোমার ডাকটি শুনলে সব ভুলে আবার তোমায় বুকে তুলে নেবেন—

• একটু থেমে বললেন—বল, কথা বল, তোমার কী বলবার আছে—মুখ ফুটে বল—উত্তর দাও—সেই ছটফটে ছেলেকে এমন বোবা করে দিলে কে যে—

খানিক পরে বিরক্ত হয়ে ক্ষিতীনবাবু বললেন—

—থাকগে, তুমি আজ রাত্তিরটা বরং ভাবো—সমস্ত রাত ধরে ভাবো—খাও-দাও—ঘুমোও বিছানায় শুয়ে,—অনেক দিন তো আরামে ঘুম হয়নি—তারপর, তারপর যখন বুঝবে যে তোমার ভালোর জন্যেই এত বলা—তখন উত্তর দিও কথার—কী বল ভাই নিত্যানন্দ—

ক্ষিতীনবাবু চেয়ার থেকে উঠে নিত্যানন্দর কাছে গেলেন। দুই হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে আছেন তিনি।

কাছে গিয়ে ক্ষিতীনবাবু বললেন—এখন ওকে বিরক্ত করবার দরকার নেই—কী বলো ভাই—আমি বলি কি একটু বিশ্রাম দেওয়া যাক্—ক্রমাগত প্রশ্ন করলেও নার্ভাস হয়ে যাবে—তাছাড়া নিজের ঘর, নিজের বাড়ীতে দিন-দুই বাস করলে তখন আবার পুরোন কথা মনে পড়বে—মা'র কথা মনে আসবে—দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে তখন ও-ঘোরটা কাটতে পারে—সাধু-সন্ন্যিসী হওয়া-টওয়া ও-সব একটা ব্যাধি তো—জিগ্যেস কোরো তোমার গিরীন্দ্রশেখর বোসকে—ওরা জানে—আরে কত দেখলাম ভাই জীবনে—

তারপর একটু ভেবে বললেন—আরে তুমি সুধীরকে চিনতে তো—আমাদের ক্লাস-ফ্রেণ্ড সুধীর চাটুজ্জে—দশছেলের বাপ—পয়সা-কড়ি কোথাও কিছুর অভাব নেই—সেই আমাদের সুধীর হে—চিনতে পারছো তো—

একটা কথারও উত্তর দিলেন না নিত্যানন্দ।

ক্ষিতীনবাবু এবার প্রসঙ্গ বদলে বললেন—মন খারাপ করে কী করবে ভাই—কিছু ভেবো না—আমি তো আছিই—দেখবে তোমার ঘরের ছেলে ঘরেই থাকবে—কোনও ভাবনা নেই—

তবু নিত্যানন্দ সেন যেমন বসেছিলেন তেমনি চুপ করে মুখ নিচু করে বসে রইলেন। ক্ষিতীনবাবু যেন একটা পাষাণস্তূপের সঙ্গে কথা বলছেন। ওদিকে ছেলেটি যেমন নির্বিকার নির্বিরোধ তেমনি ওর বাপও যেন সমাধি লাভ করে এক অচৈতন্য-লোকে বাস করছে। দুই-এর মাঝখানে ক্ষিতীনবাবু একলা কেবল বেঁচে আছেন—জেগে আছেন। কিন্তু তাঁকে এখন হাল

ছেড়ে দিলে তো চলবে না। এতদিন পরে রাতুল যদিই বা ফিরে এল—তার মৃত সত্তা নিয়ে তাঁদের কী কাজ হবে। আবার নিত্যানন্দকে সংসার করতে হবে। রাতুল আরো মাথা উঁচু ক'রে বাপের যশ সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিভা প্রতিষ্ঠার উত্তরাধীকারী হবে—তবেই তো বাপের মুখ উজ্জ্বল হবে।

—কে রে—ক্ষিতীনবাবু বাইরের দিকে চাইলেন।

খিল-বন্ধ দরজার বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি গোবিন্দ—

—কী খবর—সবাই চলে গেছে?

—আজ্ঞে চলে গেছে সবাই—

—বাইরে এখন আর গোলমাগ-টোলমাল নেই তো—

—আজ্ঞে না নেই—

—এইবার একটা কাজ করতে হবে যে তোমায় গোবিন্দ—আমার বাড়ীতে টুপ্ করে গিয়ে একবার একটা খবর দিয়ে আসতে হবে তারা হয়ত সব ভাবছে—খবর দিও আমার ফিরতে একটু রাত হবে আজ—এদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে—ঘরে শুইয়ে দিয়ে তবে আমার আজ ছুটি—

—খাবার আমার তৈরী বাবু—বাবুকে জিগ্যেস করুন এখনি কি উনি খাবেন—

এতক্ষণে কথা ফুটলো নিত্যানন্দর। মুখ নিচু করেই বললেন—আজ খাবো না আমি—

—সে কী?—গোবিন্দ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—

—হ্যাঁ, তুই এখন যাতো—

—কিন্তু খোকাবাবু? ছেলেমানুষ কতক্ষণ না খেয়ে থাকবেন—

নিত্যানন্দ জবাব দিলেন না।

জবাব দিলেন ক্ষিতীনবাবু। বললেন—কেন, তোমারও খেয়ে নিলে হতো না নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ আস্তে আস্তে বললেন—আমার ক্ষিদে নেই—

* * * *

তারপর রাত আরো গভীর হয়ে এল শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এ। এক ফাঁকে হঠাৎ রাতুল দেখলে গোবিন্দ বাড়ীর দরজা খুলে বাইরে এল। তারপর সোজা চলতে লাগলো গলির পূব দিকে। রাস্তায় কেউ কোথাও নেই। রাতুল নিঃশব্দে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো বাড়ীর ভেতরে।

(ক্রমশঃ)

বিচিত্রা

সুদর্শন

আপ-রুচি খানা

যাঁরা সারা দুনিয়া পর্যটন করেছেন, নানা জাতের মানুষ দেখেছেন, তাঁদের লেখায় মানুষের অদ্ভুত বিচিত্র কত খাদ্যেরই না পরিচয় পাই। কালো কুকুর এবং কালো বিড়ালের মাংস এখনো চীনের অনেক জায়গায় মুর্গী-মটন যেমন আমাদের কাম্য খাদ্য—তেমনি কাম্য। কুকুর, বিড়ালের মাংস তারা খায় রোষ্ট করে। পাখীর বাসার স্থপ তো চীনের পরম উপাদেয় খাদ্য। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে খাইয়ে জাত হলো তুর্কিস্তানের মোঙ্গলরা। তারা জনে-জনে এক একটা গোটা ভেড়ার মাংস খেতে পারে। ভোজ-সভায় আমাদের এখানে গণ্যমান্য অতিথির পাতে যেমন মাছের মুড়ো পড়ে, সেখানে গণ্যমান্য অতিথির পাতে পড়ে তেমনি গোটা ভেড়া—রান্না-করা অবশ্য। মোঙ্গলরা গোরুর দুধকে বলে শিশুর খাদ্য—বয়স্করা খায় ঘোড়ার দুধ, এবং ঐ দুধ ফুটিয়ে চামড়ার বোতলে রাখা হয়, খাবার সময় বোতলে মুখ দিয়ে তারা চুমুক দেয়। উত্তর অষ্ট্রেলিয়াতে রোষ্ট টিকটিকি —বেশ বড় তপসে মাছের মতো আকারে হলো সৌখীন লোকের খাদ্য—বিলাসীর ভোগ্য। হিপোর মাংস পেলে বুনো কাফ্রীরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে! আমাদের দেশে ইঁদুর, শাপ, গোশাপ খাইয়েও আছে প্রচুর।

অটোগ্রাফের নেশা

মিলোরাড রাইচোভিয় সার্বিয়ান্ কিশোর। অটোগ্রাফ সংগ্রহে তার ভয়ানক ঝোঁক—পয়সা-কড়িরও অভাব নেই। অটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য সে পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়েছিল গত মহাযুদ্ধের অনেক আগে। ১৯৩৫ সালে পৃথিবীর কোনো দেশ ঘুরতে বাকী রাখেনি সে, এবং তার অটোগ্রাফে নাম সহি ক'রে দিয়েছেন সর্বদেশের সর্বজাতের মহাজনেরা। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ, মুসোলিনি, হিটলার, মুস্তাফা কেমাল, মহাত্মা গান্ধী, লর্ড উইলিংডন, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, সুইডেনের অধিপতি এবং এ যুগের স্মরণীয় বরণীয় সকলেই। ফিরে গিয়ে রাইচোভিয় কাগজে যে কাহিনী ছাপিয়েছিল, তাতে লিখেছিল—যাঁরা সত্যই খুব বড়, তাঁরা বলবামাত্র সহি দিয়েছেন, আর যাঁরা বড়দের চেয়ে ছোট, সহি দেবার আগে তাঁরা হাঁ-না প্রভৃতি নানা তর্ক তুলে, দেরি করিয়ে দিয়েছেন।

হাত, না পিনকুশন?

আমাদের দেশে চড়ক পুজোর সময় সন্ন্যাসীরা বাণ দিয়ে গা ফুঁড়তো—পিঠ ফুঁড়ে বাণ বেরুতো পাঁজরার পাশ ঘেঁষে—এটা ছিল একটা ধর্ম-অনুষ্ঠান। বোহেমিয়ার উয়োটাওয়া আঞ্চলে জিপসীদের পাল-পার্ব উৎসবে তাদের মধ্যে চলে বাণ, পিণ ও ছুঁচ গায়ে ফুটিয়ে প্রতিযোগিতা। একবার জিপসীদের সর্দার বাগ্রে তার সারা ডান হাতে ৩২০০টি বড় ছুঁচ বিঁধে সেই ভাবেই ছিল ৩১ ঘণ্টা।

মধুচক্র

দীর্ঘ একমাস পরে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হোল। বিজয়ার প্রীতি-ভালোবাসা জানিয়ে আমি তোমাদের কিছু বলবো ভাবছি। ভালো কথা, মৌচাকের মৌ-বোনেদের হয়ে এবং নিজের তরফ থেকে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উপলক্ষে মৌ-ভাইদের আমি প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এবারের পূজোয় কোলকাতায় একটা জিনিস খুব বেশীভাবে আমার মনকে নাড়া দিয়েছে, সেটা হচ্ছে পূজোর আড়ম্বর। এই আড়ম্বরের অঙ্গ হিসাবে প্রথমেই চোখে পড়েছে সার্বজনীন পূজোর প্রাঙ্গণে ঢোকার সময়ে সামনে বিরাট বিরাট তোরণ আর তাতে ঝলমলে লাল, নীল শাদা, রংবেরঙয়ের আলো। এগুলো যদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে আবার রয়েছে লাউডস্পীকার সহযোগে আজকালকার তথা-কথিত হিন্দী গানগুলির তারস্বরে চ্যাঁচানি। সকাল হতে না হতে সুরু হোত আর থামত মাঝ রাত্তিরে। পূজোর মধ্যে আনন্দ করব নিশ্চয়, কিন্তু এই কি আনন্দ প্রকাশের উপায়? পূজোটা ত' খেলার জিনিস নয়। তার মধ্যে যে পবিত্রতা, নিষ্ঠা এবং শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন সেটার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না।...সেদিন কালীপূজো হয়ে গেল ২৯শে অক্টোবরে আর তার প্রতিমা নিরঞ্জন হোল ৪ঠা নভেম্বর—এটাই বা কি? পূজোর নামে সম্পূর্ণ ছেলেমানুষী নয় কি?...ধর্মের নামে ভণ্ডামী এবং অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেওয়াটাই আমাদের জীবনে একমাত্র লক্ষ হয়ে উঠেছে আজকাল। বাঙ্গালীর ধর্মসাধনা আজ অন্যান্য প্রতিবেশী-প্রদেশে উপহাসের বস্তু হয়ে উঠছে। স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতাকে যদি সময় থাকতে আমরা না সরিয়ে ফেলতে পারি, তা'হলে রত্নগর্ভা বাঙ্গলার পতনকে রোধ করা কোনমতেই সম্ভব হবে না।

তোমরা সকলেই শুনেছ নব-গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ও মুস্লিম লীগের সভাপতি জনাব লিয়াকত আলী খাঁ ১৬ই অক্টোবর জনৈক আততায়ীর হাতে রাওয়লপিণ্ডিতে নিহত হয়েছেন। এশিয়ার নব জাগরণের শুভ-মুহূর্তে ক্রমশঃ যেন কালোছায়া সমস্ত জাগরণকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচার আজ এশিয়ার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত শিহরণ জাগাচ্ছে। আমরা তাঁর স্বর্গীয় আত্মার শান্তি কামনা করি।

গতবারে মজার খেলা দেওয়া হয়নি, এবার দিলাম। এটি তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছে কলকাতার পদ্মপুকুর রোড থেকে অলকানন্দা বসু।...এটার জবাব যত তাড়াতাড়ি পাঠানো সম্ভব পাঠিও।

"দেখো এমন আমার কপাল! পশুপাখির কাছেও পাত্তা পাইনে। ওই একটু যা আদর পাই ছোট পিসীমার কাছে। মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে আমায় ডেকে নেন। সেখানে কথকতা হয় রোজ। মাইনে করা মহিম কথক আছেন। বসে শুনি খানিক। কিন্তু তাও আর কতক্ষণই বা! মহামুশকিল, একলা একলা সময় আর কাটে না। মনের দুঃখ হয় ভাবি, এর চেয়ে বেশ ছিলুম স্কুলেই। গাড়িতে ওঠবার আগেই যত কান্নাকাটি, উঠেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। গাড়ি চলত

গলির মোড় ঘুরে। সেই শিবমন্দির, কাঁসর ঘণ্টা, লোকজন, দোকানপাট রাস্তার দু'দিক বেশ দেখতে দেখতে যেতুম।"…

ভাদ্র মাসে যে মজার খেলাটি দিয়েছিলাম সেটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পথের পাঁচালী" বই থেকে নেওয়া হয়েছে।—তবে মৈত্রেয়ী জানিয়েছে যে, সে ওটা 'আম আঁটির ভেঁপু' থেকে গ্রহণ করেছে। যাদের জবাব পেয়েছি—**মীরা দত্ত** (মহিষাদল)—**অরুণ চক্রবর্তী** (কোলকাতা)—**মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী** (বালুরঘাট)—**রেখা** ও **অশোক দত্ত** (পাটনা)—**আরতি গুপ্তা** (ব্রজরাজনগর)—**অনিমা সান্যাল** (মেদিনীপুর)—**গীতা সেনগুপ্তা** (দমদম)—**রেখা সেন** (চেতলা)—**পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়** (গোবরডাঙ্গা)—**ভানু মজুমদার** (কোলকাতা)—**অলকানন্দা বসু** (ভবানীপুর)—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়** (মিঠানী)—**উৎপলপর্ণা** ও **অপরাজিতা রায়** (রায়পুর)—**নন্দিনী রায়** (কটক)—**জীবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য** (নৈহাটী)—**তপতী, পূরবী, মালবিকা রাহা** (বহরমপুর)—**অমর মল্লিক** (শেয়লদা)—**নমিতা, ডলি** ও **শঙ্কর চক্রবর্তী** (?)—**তপতী, ভারতী নন্দী, রাণা দত্ত** (বহরমপুর)—**মনীষ গুহ** (জলপাইগুড়ি)—**ছায়া দলুই** (হাওড়া)—**শ্রীপ্রদীপ** (বিষ্ণুপুর)—**শশীভূষণ আইচ** (টংলা)—**অলোক রায়** (শ্যামবাজার)—**বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়** (বউবাজার)—**মীরা বসু** (গোপালগঞ্জ)—**নবারুণ সেনগুপ্ত** (ভূরকুণ্ডা)—**সনৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়** (কোলকাতা)—**শ্রীকুমার মিত্র** (কোলকাতা)—**জয়শ্রী সেন** (টালীগঞ্জ)—**অরুণ, স্বাতী, শুভ্রা, শুক্লা** ও **অমরেশ গঙ্গোপাধ্যায়** (নিউদিল্লী)—**করুণা রায়** (কোলকাতা)—**রেবা সিংহ** (কোলকাতা)—**বিবেকজ্যোতি মৈত্র** (টালীগঞ্জ) **অরীন্দ্রজিত মুখোপাধ্যায়** (বোলপুর)।

এবার তোমাদের চিঠির জবাব দিই। **ভারতী সেনগুপ্ত** (বহরমপুর)—তুমি দেখছি আমার ওপর ভীষণ চোটেছ—আমার কাছে সবাই সমান বুঝলে। যাদের নাম লিখেছ তাদের সঙ্গে তোমাকে মোটেই তফাত করে দেখি না—তা'হলে এত বড় জবাব দিতাম না। চিঠির শেষেতে যেটা চেয়েছ সেটার অনেক অসুবিধে আছে। রাগ কমেছে কিনা জানিও।

শ্রীপ্রদীপ (বাঁকুড়া)—প্রত্যেক গ্রাহক-গ্রাহিকারই লেখার অধিকার আছে। তবে সেটার প্রকাশ করার ভার সম্পূর্ণভাবে সম্পাদক মহাশয়ের হাতে। পূজোর জন্যে যে খেলাটি পাঠিয়েছে সেটা অন্ততঃ মাস চারেক আগে পাঠানো উচিত ছিল—কারণ আগে থেকেই সমস্ত ঠিক হয়ে যায়। **অরীন্দ্রজিত মুখোপাধ্যায়** (বোলপুর)—তুমি যে প্রশ্নটি করেছ তার সঠিক জবাব দেওয়া মুস্কিল, তার কারণ এখনকার সাহিত্যিকদের প্রকাশভঙ্গী ও চিন্তাধারা দুটোই বহুমুখী। **কানাইলাল ঘোষ,** (চন্দননগর)—তুমি যেটা জানতে চেয়েছ সেটা কি করে জানাই বলতো? আর তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলছি ওটা আমার নেই। মজার খেলাটা ভীষণ

শক্ত হয়েছে! **তপতী রাহা** (বহরমপুর)—তোমার অনুযোগটি এখানে না জানিয়ে ওখানে জানাও, তা'হলে তার জবাব পাবে—এখানে কেন তার জবাব দিলাম না বুঝতে পারছ? **আশীষ চক্রবর্তী** (ঘাটশিলা)—তোমার চিঠি পড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না, ভালো করে সব জানাও। **অর্ধেন্দু বিশ্বাস** (মুর্শিদাবাদ) যে মৌচাকের গ্রাহক সেই মধুচক্রের সভ্য—কোন আলাদা নিয়মাবলী নেই। লেখা মৌচাক অফিসে পাঠালেই চলবে। **সুব্রতচন্দ্র খাঁ** (রাজসাহী)—তুমি অর্ধেন্দুর চিঠির জবাবটা পড়ে নাও। **মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী** (বালুরঘাট) আশাকরি এতদিনে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠেছ। তোমার অভিযোগ যথাস্থানে পৌছে দিলাম। **গৌরগোপাল সরকার** (নবদ্বীপ)—এখন ঐ চাঁদা সংগ্রহটা স্থগিত রাখা হয়েছে নানান কারণে। **দীপিকা গুহ** (?)—গ্রাহিকা নম্বর বিশেষ প্রয়োজন হয় না চিঠির জবাব লেখার সময়, কিন্তু স্থানের নামটা বিশেষ প্রয়োজন হয়। এবার থেকে ওটা লিখতে ভুলো না। **মীরা দত্ত** (মহিষাদল)—আমি একজন বিরাট কেউ নয় যে সব কিছু বলতে পারবো—তবে আমার মনে হয় কি জানো, এই পূজোয় আমরা মন-প্রাণ খুলে যে আনন্দ উপভোগ করতে পারিনি তার কারণ, বছরের বেশীরভাগ দিনগুলিই কোন রকমে কায়ক্লেশে এমনভাবে পার হয়ে যাচ্ছে যে, তার মধ্যে এই ক'টা দিন যে আনন্দ করবো তার আর উপায় থাকে না! **অরুণকুমার মৈত্র** (দারজিলিং)—তোমার চিঠিটি যথাস্থানে পৌছে দিয়েছি—খুব তাড়াতাড়ি জবাব দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছি। **বিভা ঘোষ** (লখনউ)—বইটি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। তোমার জন্মদিনের তারিখটা এমন সময় পড়েছে যে তা আমার জানতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তোমার শরীর আশাকরি এখন ভালোই আছে। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার দু'খানা চিঠিই পেলাম। দু'খানা চিঠিই একদম বিরক্তি আর রাগে ভরতি। ও দুটো মন থেকে একদম তাড়িয়ে দাও—তা'হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। লেখনী-বন্ধুর ঠিকানা পাঠানো নিয়ে কয়েকটি ব্যাপারে বাড়ীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সামান্য গোলমাল হওয়ায় এটা আমরা উপস্থিত বন্ধ করে দিয়েছি। তোমরা যারা ইতিপূর্বে ডাকটিকিট দিয়ে ঠিকানা চেয়ে পাঠিয়েছ, তারা আর একবার কে কে ডাকটিকিট দিয়ে পাঠিয়েছ জানাও; আমি অফিস থেকে তা ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। যাদের চিঠি পেয়েছি **স্মৃতি, দীপ্তি, তৃপ্তি রাহা** (বহরমপুর)—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়** (মিঠানী)—**বাণী চট্টোপাধ্যায়** (?)—**বনানী বসু** (লখনউ)—**সুনীলকুমার মজুমদার** (বৈদ্যবাটী)—**পার্থ বসু** (ভবানীপুর)—**শ্যামলকুমার সিংহ** (কোলকাতা)—**অজন্তা চক্রবর্তী** (শ্যামবাজার)—**শোভনা** (?)।

আজ এইখানেই শেষ করি। প্রীতি আর শুভেচ্ছা রইলো।

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস্ ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

পৌষ—১৩৫৮

৩২শ বর্ষ—নবম সংখ্যা

শিশু-বন্দনা

শ্রীঅমূল্য সরকার

হে ধরণীর অবোধ শিশু—
কেউবা তোরা ব্রজের গোপাল, কেউবা তোদের খৃষ্ট যিশু।
মোহম্মদের স্বরূপ কেহ—বুদ্ধদেবের হৃদয়খানি,
মুক্তি পেলো তোদের মাঝে সব দেবতা—এইতো জানি।
কোথায় জাগে ধর্মগ্লানি, কোথায় কা'রা দুঃখে ভুগে,
মুছে দিতে সে ভেদ-ব্যথা জনম নিলি যুগে যুগে।
এই মাটিরই সরস রসে রসিয়ে নিলি জীবন-জমি,
পূর্বভাগে সবার আগে তাইতো আমি তোদের নমি!

ভালে তোদের সূর্য জ্বলে, যুগল শশী আঁখির তারায়,
তোদের সরল হাসির মাঝে বিশ্ব-ভুবন আপনা হারায়।
রামধনুকের বর্ণচ্ছটা,—স্বর্গরাজের মুকুট-মণি,
মরণ-তারণ, ভাবনা হরণ, তোরাই সুধারসের খনি।

ভোলানাথের পাগল চেলা,—বাণীবনের কমল-কলি,
অঙ্গ-বাসে তোদের পাশে বেড়ায় উড়ে লুব্ধ অলি।
সৌরলোকে মধুর যাহা পরাণ পুটে নিলি ভরি,
অনুরাগে সবার আগে তাইতো তোদের প্রণাম করি !

কণ্ঠে তোদের মনমোহিনী সপ্তরাগের বীণা বাজে,
কলুষ যাহা, মিথ্যা যাহা, পেলোনা ঠাঁই তোদের মাঝে।
নির্ভেজালি খাঁটি মালের করিস্ হেথায় বেচা-কেনা,
মিশে আছিস সবার সাথে তবু তোদের যায়না চেনা।
হে অশিষ্ট-দুষ্টু-পাগল, হে অপরূপ—অভিনব,
খেলার ছলে জগত্‌তলে কি বিচিত্র লীলা তব !
বাঁধন-খোলা, আপন-ভোলা, বিশ্ব-গুরু, চপলমতি
মর্মে জাগে সবার আগে তোদের পায়ে জানাই নতি !

ঋতু-বৈচিত্র্য

আমাদের বয়সে এই কলকাতা শহরেই আমরা দেখছি, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত ক'টি ঋতুতে পঞ্চাশ বছরে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। সম্প্রতি এখানে গ্রীষ্মকালে যে পশ্চিমী গরম দেখা যাচ্ছে, সূর্যের অতি প্রখর জ্বলন্ত তাপ—পনোর-কুড়ি বছর পূর্বে এমন ছিল না। এখানকার গরমে গা ঝল্‌শাতো না। অনেকে বলেন, কলকাতার পথ টারমাকাডেম করা হয়েছে—বহু গাছপালা কাটা গেছে, তার দরুণ এ পরিবর্তন। কিন্তু মেটরোলজিকাল অফিসের তদন্তের রিপোর্ট যদি আমরা মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখবো, এখানকার গরমের মাত্রা বেড়ে চলেছে। শীতকালে সেকালে দেখেছি,—বিছানায় লেপ কম্বল বালাপোষ যা ব্যবহার করা হতো, একালে সে সবের বহর কমেছে—গরম ওভারকোটের চলন কমেছে।

বিজ্ঞানবিদরা এসব লক্ষ্য করে বলছেন—The temperature year by year has been fluctuating widely from the average. অর্থাৎ প্রকৃতির তাপ এবং শৈত্যের বছরে বছরে ঘটছে পরিবর্তন।

বোষ্টন শহরে এই ঋতু-বৈচিত্র্য নিয়ে রীতিমত অনুশীলন চলেছে। তাঁরা নানা দেশের ঋতুর বার্ষিক রিপোর্ট পরিক্ষা করে বলছেন, ১৮১২-১৩ সালে আমেরিকার নানা জায়গায় যে রকম শীত পড়তো, শীতের সে মাত্রা পরপর বৎসরে ক্রমাগত কমে আসছে। ১৯২৫ সালে শীতের মাত্রা হয়েছিল আগেকার শীতের অর্ধেক। তেমনি গরমের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

কানাডায়, কালিফোর্নিয়ায়—সর্বত্র এমনি ঘটছে। কোথাও শীতের মাত্রা বাড়ছে, গরমের মাত্রা কমছে—আবার কোথাও বা এর বিপরীত। এর কারণ, বিশেষজ্ঞরা নির্ণয় করছেন—ঘূর্ণনধারায় পৃথিবী নির্দিষ্ট স্থান থেকে সয়ে সয়ে চলেছে, এবং সয়ে সয়ে ক্রমে সূর্যের দিকে চলেছে। তার দরুণ বেশীরভাগ প্রদেশে গ্রীষ্মে রোদের তাপ বাড়ছে এবং শীতকালে ঠাণ্ডা পড়ছে কম। কে জানে সূর্যের আরো কাছে গেলে পৃথিবীর ভাগ্যে এবং আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে !

তবে যদি খুব খারাপ কিছু ঘটে—তাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কারণ দু'চারশো বছরের মধ্যেই সাংঘাতিক রকম কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

চার্চিলের পলায়ন

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

গত মহাযুদ্ধের সময় যে ক'জনের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরত, তাঁদের মধ্যে চার্চিল একজন। সে সময়ও ইনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। এই যুদ্ধের জন্য তাঁকে এক রকম সর্বাধিনায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। মানে, অন্য সময় অন্য সব প্রধান মন্ত্রীদের যতটা ক্ষমতা থাকে, তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর সত্যি কথা বলতে কি, হিটলার মুসোলিনীর মত বাঘা বাঘা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে যুদ্ধটা জেতাও কম ক্ষমতার কথা ছিল না। সারা পৃথিবীটা বলতে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল—এত তাল সাম্‌লানো কি সহজ কথা?

আমরা ভারতবাসীরা অবশ্য এতগুণ থাকা সত্ত্বেও এই লোকটিকে তত পছন্দ করি না। কেন জান? প্রথমতঃ কালো মানুষদের ইনি মানুষ বলে ভাবেন না। ভারতবর্ষের মত সাম্রাজ্যটা চলে গিয়ে আমরা স্বাধীন হই, এটাও ওঁর পছন্দ ছিল না আদৌ। মহাত্মাজীকে পর্যন্ত ইনি বিদ্রূপ করতে ক্ষান্ত থাকেন নি। গত ইংরেজ সরকার (লেবার গবর্ণমেণ্ট) সাম্রাজ্যটা বিলিয়ে দিলেন বলে ইনি এখনও 'হায়! হায়!' ক'রে বেড়াচ্ছেন। তার ওপর যুদ্ধের সময় আমরা যে মাল দিয়েছিলুম বা ওঁদের হয়ে যে সব খরচা করেছিলুম, সেই টাকাটা লেবার গবর্ণমেণ্ট শোধ দিয়েছেন বলে উনি তাদের ওপর মারমুখো। সম্প্রতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যে ইতিহাস উনি লিখে শেষ করেছেন, তাতেও সেই আপ্‌সোস করেছেন—ভারতবর্ষকে আমরা এ যুদ্ধে রক্ষা করেছি বলে উচিত ছিল ওদেরই কাছ থেকে কিছু আদায় করা, না, উল্টে আবার ওদের টাকা দিচ্ছি আমরা! কী অন্যায়!

এই ত' হ'ল মানুষটি। তবু, লোকটি যে বিখ্যাত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এখন এই চার্চিলের প্রথম যৌবনের একটি গল্প তোমাদের কাছে বল্‌ব।

সে অনেকদিনের কথা। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ চলেছে। অর্থাৎ ওখানকার অন্য শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের বেধেছে লড়াই। চার্চিল তখন 'মর্ণিং পোষ্ট' কাগজে রিপোর্টার বা সংবাদদাতার কাজ করছেন। যুদ্ধের খবর আন্‌তে উনিও গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে একটি অস্ত্রবাহী ট্রেনের সঙ্গে যেতে যেতে ধরা পড়ে যান বুয়রদের হাতে। এম্‌নি খবরের কাগজের লেখক বলে ওঁকে ছেড়ে দেবার কথা, কিন্তু চার্চিল ইংরেজদের হয়ে গাড়ীটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁকেও বন্দী করে রাখা হ'লো। মানুষের স্বভাব চিরকালই সমান থাকে; যে অদম্য উৎসাহে গত মহাযুদ্ধে অত বিপদের মধ্যেও

চার্চিল দমেন নি, সে উৎসাহ যে অল্পবয়সে আরও বেশি থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি! উনি স্থির করলেন ওখান থেকে পালাবেন।

ওঁদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল একটা ইস্কুলবাড়ীতে। তার চারদিকে উঁচু করগেট ও লোহার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেটাও তত দুর্লঙ্ঘ্য নয়, কিন্তু উঠানে প্রত্যেক পঞ্চাশ গজ অন্তর অন্তর একটি করে প্রহরী রাখা হয়েছে—তাদের সঙ্গে অস্ত্র। তারাও আবার এক এক কোণে স্থির হয়ে নেই—অনবরত নিজেদের এলাকার মধ্যে এক দিক থেকে আর এক দিক পায়চারী করছে। এদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া? সে যে অসম্ভব!

কিন্তু না, উপায় আছে। চার্চিলের মাথায় মতলব গেল একটা। একটা ছোট কী অফিস-ঘর আছে একেবারে পূবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে, তার সঙ্গে আছে একটা গোল শৌচাগার। সেইজন্য, যদিও রাত্রে ইলেক্‌ট্রিক আলোয় চারিদিক দিনের মত আলো হয়ে থাকে, তবুও সেই ঘরটা খাঁজে পড়ায় সেখানে একটু ছায়ার সৃষ্টি করে আছে। কাজেই যখন ওখানকার পাহারাদার উল্‌টো দিকে মুখ ক'রে তার 'বীট্'টুকু হাঁটতে থাকে, অল্প সেই সময়টুকুর মধ্যেই কাজ সারা যেতে পারে।

চার্চিল আর তাঁর দুই বন্ধু স্থির করলেন ঐ সুযোগটুকুই নেবার চেষ্টা করবেন তাঁরা। বিপদ কম নয়, কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময়—তার মধ্যে কাজ সারতে না পারলে কিম্বা কোথাও কোন গোল বাধলেই ধরা পড়ে যাবেন আর তা'হলেই নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু একে তখন অল্প বয়স তায় চার্চিলের উৎসাহ—কোন বিপদকেই তিনি আমল দিতে চাইলেন না।

একটা দিন স্থির হ'ল। ১২ই ডিসেম্বর।

ঠিক হ'ল একে একে ওঁরা ঐ সুযোগ নেবেন এবং লাফিয়ে পাশের বাড়ীতে পড়ে অপেক্ষা করবেন। পাশের বাড়ীটাতে প্রকাণ্ড বাগান আছে, গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে থাকার সুবিধাও আছে। সন্ধ্যার সময় ওঁরা তিন বন্ধুই বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম অন্য দু'জন একবার ক'রে চেষ্টা করলেন, সুবিধা হ'ল না। চার্চিলের পালা এবার। বেড়াতে বেড়াতে তিনি এগিয়ে গেলেন সেই ঘরটার দিকে, যেন শৌচাগারেই যাচ্ছেন—এক ফাঁকে সেই ছায়া-ভরা খাঁজটুকুতে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু আসল কাজটাই তখনও বাকী। ওপরে উঠলেই ত' নজরে পড়বেন।··· কয়েক মিনিট গেল···মিনিট ত' নয়, যেন যুগ এক একটা। প্রহরী চেয়েই আছে এদিকে। আর বুঝি হ'ল না। প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় দেখা গেল সেই প্রহরীটি ওধারে মুখ করে হাঁটছে—শুধু তাই নয়, ওদিকের প্রহরীটিও এগিয়ে এল—কী গল্প হচ্ছে দু'জনে।

এই সুযোগ! চার্চিল এক লাফে উঠলেন সেই ঘরটার ছাদে। আঃ—আবার জামাটা আটকে গেল যেন কিসে, ছাড়াতে গিয়ে খানিক দেরি! না, এখনও ওরা গল্প করছে।

যা থাকে কপালে, করগেটের পাঁচিলে উঠে যথাসম্ভব নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়লেন পাশের বাড়ীর বাগানে। ঠিক যে মুহূর্তে ওপরটায় উঠেছেন, একটি প্রহরী যেন এদিকে চেয়ে দেখলে। বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল ওঁর, কিন্তু না—দেখতে পায়নি। দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে লাগল বেশ ধীরেসুস্থেই—

এদিকে যে বাগানে পড়লেন চার্চিল সেখানেও লোকজন যথেষ্ট। তবু সাহসে ভর করে পাঁচিল ঘেঁষে একটা ঝোপের আড়ালে বসেই রইলেন। বন্ধুরা কৈ? মিনিটের পর মিনিট কাটে—আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা—কী বিপদ! অনবরত এধার দিয়ে লোক যাতায়াত করছে, একজন ত' সোজা ঐ ঝোপটার দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। দেখতে পায়নি ত'? না—ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন।

অকস্মাৎ মনে হ'ল লোহার দেওয়ালের ওপাশে করা যেন কথা কইছে—একটু চেঁচিয়েই। যা-তা বাজে কথা বক্‌ছে; তারই মধ্যে এক ফাঁকে কানে এল ওঁর নাম। চার্চিল সাড়া দেবেন নাকি? মরীয়া হয়ে একটু কাশলেন খুক্ করে। ওরার থেকে সাড়া এল—'সম্ভব হ'ল না পালানো—পারো ত' তুমিও ফিরে এসো।'

না। তা আর হয় না। আসবার সময় কেউ দেখতে পায়নি বলে যাবার সময়ও পাবে না তার মানে কি? মিছিমিছি জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন করার কোন মানে হয় কি? চার্চিল স্থির করলেন তিনি একাই পালাবেন।

বাগানে অগুন্তি লোক, ফটকে পাহারা। রাস্তাতেও মোড়ে মোড়ে পাহারাদারের অভাব নেই। এতদিনে তাদের মধ্যে অনেকেই মুখ চিনে গেছে। তবু, তবুও তিনি চেষ্টা করবেন। টুপিটা একটু সামনের দিকে টেনে বসিয়ে দু'পকেটে হাত পুরে শীষ দিতে দিতে চার্চিল খুব মন্থর গতিতে বেরিয়ে এলেন বাগান থেকে; রাস্তার মাঝখান দিয়ে ঠিক তেম্‌নি ভাবেই চললেন বেড়াতে বেড়াতে; পাশ দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে যাবার চেষ্টা মাত্র করলেন না। প্রহরীদের চার পাঁচ হাত দূর দিয়ে চলে গেলেন—সেইজন্য তারা সন্দেহ করলে না। চার্চিল আপাততঃ স্বাধীন হলেন।

কিন্তু তারপর?

প্রিটোরিয়া শহর এটা। এর চারিদিকের সমস্ত রাস্তায় কড়া পাহারা। প্রত্যেকটি প্রবেশ-পথে প্রহরীদের ঘাঁটি। সীমান্ত এখান থেকে প্রায় তিনশ' মাইল—এর পথে পথেও সামরিক বেসামরিক পাহারা। হেঁটে এই তিনশ মাইল যাবার চেষ্টা করা পাগ্‌লামি। অবশ্য ওঁর কাছে কিছু টাকা আছে—তিনটে চকোলেটের টুক্‌রোও আছে, কিন্তু বাকী খাদ্য-খাবার, দিক্ ঠিক

করবার কম্পাশ সব বন্ধুদের কাছে রয়ে গেছে। তাছাড়া উনি না জানেন কাফ্রিদের ভাষা, না জানেন ওলন্দাজদের। কথা কইতে গেলেই ধরা পড়ে যাবেন।

চার্চিল মহা চিন্তায় পড়লেন। আর একটু পরেই ওখানে ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবে। বড় জোর ভোরবেলা পর্যন্ত চাপা থাকতে পারে। তারপর? তখনই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খবর বলে যাবে, বলে যাবে ওঁর চেহারা আর পোষাকের বর্ণনা। তখন পালাবেন কোথায়? ভাবতেও হাত-পা অবশ হয়ে আসে।

কিন্তু তবু চার্চিল হাল ছাড়লেন না। আপন মনেই পথ চলতে লাগলেন। আকাশে অসংখ্য তারা—তারই মধ্যে ওরিওন নক্ষত্র, ওঁর প্রিয় তারাটি জ্বল্ জ্বল্ করছে। ঐদিক লক্ষ্য করেই তিনি হাঁটবেন। অদৃষ্ট যেখানে নিয়ে যায়, যা করায় তাই হবে। তবু হাত পা ছেড়ে বসে থাকবেন না; এটা ঠিক।

এইভাবে হাঁট্তে হাঁট্তে হঠাৎ একটা রেল লাইন পাওয়া গেল।

চোখ দুটো অন্ধকারেই যেন জ্বলে উঠল চার্চিলের। এইত' উপায় পাওয়া গেছে!

যেদিকেই যাক্—ট্রেন কোন-না-কোন সীমান্তের দিকেই যাবে। রাত্রির অন্ধকারে যদি কোন চল্তি ট্রেনে উঠে পড়া যায়, অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারা যাবে। না হয় ভোরের আগেই নেমে পড়া যাবে। সে গাড়ীর যাত্রীরা? যদি তেমন হয়ত কিছু টাকা দিয়ে ক্ষান্ত করা যাবে। সত্তর পাউণ্ড তখনও ওঁর পকেটে আছে—অনেক টাকা।

চার্চিল লাইন ধরেই চললেন। পথে পুলের কাছে কাছে প্রহরীরাও রয়েছে, কিন্তু তিনি এমন নিশ্চিন্তভাবে হাঁটছেন যেন ভয় পাবার, গোপন করবার কিছুই নেই তাঁর। কোথাও শীষ দিয়ে, কোথাও বা নীরব হয়ে অন্যমনস্কতার ভান ক'রে নিরাপদে পেরিয়ে গেলেন। মাইল দুই যাবার পর একটা ছোট ষ্টেশন নজরে পড়ল। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের ওপরে উঠ্তে ওঁর সাহস হ'ল না, উনি একটু ঘুরে ষ্টেশন ছাড়িয়ে অনতিদূরে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরে সত্যিই একটা ট্রেন এল। দাঁড়াল ষ্টেশনে, তারপর ঘণ্টা দিয়ে ছাড়ল। দুরু দুরু বুকে একটা ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা ক'রে রইলেন চার্চিল। সাধারণতঃ ষ্টেশন ছেড়ে খানিকটা আস্তে আস্তেই চলে কিন্তু সেদিন এ গাড়ীটা যেন সঙ্গে সঙ্গেই গতি বাড়িয়ে দিলে। তা হোক্—অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে—হাল ছাড়বেন না চার্চিল।

ইঞ্জিনের জোর আলোয় চোখে ধাঁধা লাগে, দেখা যায় না তারপর কি আছে। ড্রাইভার আবার এদিকেই চেয়ে, বয়লারের দোর খোলা, সেই লাল আলোয় যেন দৈত্যের মত দেখায়

তাকে ! চার্চিল কিছুই দেখ্‌তে পান না, কোন্ দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। একটা কি ধরতে যান, হাত ফস্‌কে যায়। আর একবার। আর একবার। কী একটা হাতে ঠেকেছে। ধরেছেন, চেপেই ধরেছেন। পা দুটো ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে যাচ্ছে। প্রাণপণে নিজেকে তুলে ধরেন—দুটো বগি যেখানে জোড়া হয় সেই 'বাফার'-এর ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

ও হরি ! এ যে মূলেই ভুল। এটা মালগাড়ী। সেইজন্য হাতল বলে যা ধরতে গেছেন, কোনটাই হাতল নয়। প্রাণে যে বেঁচেছেন, চাকার তলায় যান্‌নি যে এই ঢের। ড্রাইভারটা দেখ্‌তে পায়নি ত' ? এদিকেই চেয়েছিল কিন্তু ! হোক্ গে—আর ভাবতে পারেন না।

ভাগ্যক্রমে ওঁর সামনের গাড়ীটা খোলা বগি ছিল। খালি কয়লার থলিতে বোঝাই—কয়লা নিতে যাচ্ছে বোধ হয়। চার্চিল লাফিয়ে উঠলেন ভেতরে, তারপর নরম থলেগুলোর মধ্যে যতটা পারেন ঢুকে শুয়ে পড়লেন। স্তূপাকার চটের গরমে ওঁর চোখ বুজে এল।

কতটা ঘুমিয়েছেন জানেন না। বেশি ঘুমোন্ নি এটা ঠিক—হঠাৎ চম্‌কে ঘুম ভেঙে গেল। তখনও রাত আছে। ভোর হবার আগেই নেমে পড়তে হবে কোথাও। নইলে দিনের বেলায় ঐভাবে মাল গাড়ীর মধ্যে থেকে নাম্‌তে দেখলে এমনিই সবাই সন্দেহ করবে। বরং ভোর হবার আগেই কোথাও নেমে পড়ে ঝোপেঝাপে লুকিয়ে থাকলে আবার রাত্রে কোন ট্রেন ধরতে পারবেন।

চার্চিল দুটো বগির মধ্যে জোড়া দেবার শেকলে নেমে এসে দাঁড়ালেন। তারপর একটা ঝোপ দেখে মারলেন এক লাফ। একেবারে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু নরম জায়গায় আর ঘাসের ওপর পড়ার জন্য বিশেষ লাগল না। অন্ধকারেই উঠে হাতড়ে হাতড়ে চললেন কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা তারই খোঁজে। সন্ধ্যে থেকে জল খাওয়া হয়নি—আকণ্ঠ তৃষ্ণা।

সৌভাগ্যক্রমে সামনে একটা পাহাড়ের মত উঁচু পাথরের ঢিপি পাওয়া গেল—তারই নিচে বৃষ্টির জল জমে আছে। দু'হাতে আঁজলা করে যতটা পারলেন পান করলেন।...প্রয়োজনের ঢের বেশী—কারণ সারাদিনের মত হয়ত এই একবারই জল খাওয়া, দিনে কি আর জল পাবেন কোথাও ?

পকেট থেকে একটি চকোলেট বার করে খেয়ে আরও খানিকটা জল খেয়ে সেই পাহাড়ের ধারেই একটু উঁচু জায়গায় বন্যলতার ঝোপ খুঁজে নিলেন। এইখানে এখন অপেক্ষা করতে হবে। এখন সবে ভোর চারটে—সন্ধ্যে সাতটার আগে বেরোন যাবে না। পনেরো ঘণ্টা ধরে ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা !

ক্রমশঃ পূর্বদিগন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। চার্চিল আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে তিনি ঠিকই এসেছেন। লাইনটি পুব দিক থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে—পুব দিকে মাত্র আর শ' দেড়েক মাইল গেলেই সীমান্ত।

কিন্তু দিন যত বাড়তে লাগল, তত ক্ষুধা-তৃষ্ণাতে কাতর হয়ে পড়তে লাগলেন। হাত কয়েকের মধ্যেই জল, অথচ ঝোঁপের আড়াল থেকে লাইনটুকুও বেরোবার সাহস নেই। চারিদিকেই শ্বেতাঙ্গ বুয়রদের দল ঘোরাফেরা করছে—তিনি এখান থেকে তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। সেইখানেই স্থির হয়ে পড়ে রইলেন—এত অনড় যে তাঁকে মৃতপ্রায় মনে করে একটি শকুনিও ঠায় ওঁর কাছে বসে রইল, নড়ল না।

সন্ধ্যা হ'ল, চারিদিক আঁধার করে রাত্রি নাম্‌ল—দূরে উপত্যকায় কাফ্রিদের গ্রামে গ্রামে আলো জ্বলে উঠল। চার্চিল বেরিয়ে এলেন তাঁর ঝোঁপের আস্তানা ছেড়ে। ক্ষুধায় গা ঝিম্ ঝিম্ করছে। দু'টুকরো চকোলেটে একটা জোয়ান ছেলের কী হয় সারাদিনে? আর খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে তিনি বেছে বেছে একটা ভাল জায়গা নিয়ে লাইনের ধারে এসে বসলেন।

এক ঘণ্টা—দু'ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা—রাত বারোটা বাজল, গাড়ী কই?

এ লাইনে কি রাত্রে ট্রেন চলে না?

মালগাড়ীও ত' আসে না একটা। তবে কি গাড়ী আসবেই না? ভাবতেও যেন অবশ হয়ে আসে হাত-পা।

শেষে মরীয়া হয়ে হাঁটা দিলেন চার্চিল। কিন্তু আজ আর প্রহরীদের কাছ দিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। এতক্ষণে নিশ্চয় খবর চলে গেছে সর্বত্র। চার্চিল লাইন ছেড়ে পাশের জঙ্গল দিয়ে চলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাঁকে কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়, কাঁটায় যায় হাত পা ছড়ে—পাথরে হোঁচট খান। শেষে আবার লাইনে এসে উঠলেন। যা হবার হবে, এমন করে তিলে তিলে মরা যায় না!

একটা ষ্টেশন দেখা গেল। প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে দূরে সাইডিং-এ দুটো মালগাড়ী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটায় উঠে বসে থাকবেন নাকি গা-ঢাকা দিয়ে? চার্চিল দুটো গাড়ীর মাঝের সরু পথটাতে এসে ঢুকলেন, কিন্তু একটু পরেই ওধার থেকে শোনা গেল অনেকগুলি গলার আওয়াজ। জন দুই শ্বেতাঙ্গ অফিসার আর কয়েকটি কাফ্রি সিপাই পাহারা দিতে বেরিয়েছে। সুবিধে হ'ল না—তিনি আবার বেরিয়ে এসে লাইন ছেড়ে মাঠে পড়লেন।

কোথায় যাবেন? কি করবেন?

দূরে পাহাড়ের গায়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কাফ্রিদের গ্রাম নিশ্চয়ই—দিনের বেলায় ওরকম গ্রাম বিস্তর নজরে পড়েছে। ওদের ঝোঁপড়ায় আলো জ্বল্‌ছে। ওখানে গিয়ে আশ্রয় চাইবেন? ক্ষতি কি? ওঁর সঙ্গে যে টাকা আছে তাতে কিছু খাদ্য আর একটা ঘোড়া নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। চাই কি, ওরা বনের ভেতর দিয়ে যাবার নিরাপদ পথও বলে দিতে পারে। ওরা ত' বুয়রদের ওপর খুব তুষ্ট নয়।

চার্চিল সেই পথই ধরলেন। খানিকটা গিয়ে আবার যেন কেমন ভয় ভয় করে। যদি ওরা ওঁকে ধরিয়ে দেয়? ফিরলেন লাইনের দিকে। কিন্তু ওখানেই বা কি ভরসা? এদিকে তবু হয়ত কোন সম্ভাবনা আছে—

খানিকটা চুপ ক'রে বসে ভাবলেন একটা পাথরের ওপর, মোহাবিষ্টের মত। তারপর কতকটা হাল ছেড়ে দিয়েই চললেন ঐ আলোগুলো লক্ষ্য করে। কিন্তু ওগুলোকে দূর থেকে যতটা কাছে মনে হচ্ছিল মোটেই ততটা নয়। বহুক্ষণ হাঁটবার পর—বোধ হয় পাঁচ ছয় মাইল—আলোগুলো সত্যিই কাছে এল।

তবে কাছে আসতে যা দেখলেন তাতে রক্ত আবার জল হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। কাফ্রিদের ঝোঁপড়া মোটেই নয়—এ যে সার সার পাকা দোতালা বাড়ী! একটা কয়লা-খনির প্রবেশ পথ এটা, খনিরই কর্মচারীদের বাড়ী নিশ্চয়!

ইংরেজ না বুয়োর?

যদি বুয়র হয়। কিন্তু আর উপায় নেই, যা হবার হবে। আর দেহ নাড়বার ক্ষমতা নেই। বন্দী হওয়াও এখন সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। আশ্রয় চাই কোথাও, আর খাদ্য।

তবু খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে চার্চিল একটা বাড়ীতে গিয়ে কড়া নাড়লেন। অনেকক্ষণ পরে ওপরের জানলা থেকে সাবধানে কে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন। তারপর নেমে এসে দোর খুলে দিলেন।

যিনি নেমে এলেন তিনি ইংরেজ। সব শুনে বললেন, 'আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই এ বাড়ীতেই এসে কড়া নাড়লেন—কারণ আশপাশের সব বাড়ীই বুয়রদের।'

আশ্রয় এবং আহার শুধু নয়—গোপনে সীমান্ত পার হওয়ারও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন সেই ভদ্রলোক।

শিক্ষিতের পরিচয়

বিষ্ণুশর্মা

❋

য়ুরোপে সম্প্রতি এক শিক্ষা-কনফারেন্সে পাশ্চাত্যের বহু অধ্যাপক এবং শিক্ষকের সমাবেশ ঘটেছিল। আলোচনায় তাঁরা শিক্ষিতের যে পরিচয় প্রকাশ করেছেন—আমাদের প্রত্যেকের তা জানা প্রয়োজন। শিক্ষিত কে? তাঁরা বলেছেন—

১। আচারে-ব্যবহারে চিত্তবৃত্তির নিখুঁত চালোনায় যিনি সুদক্ষ। তৎপরতা, ভ্রমাপবাদশূন্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে যিনি বিভূষিত, মতামত প্রকাশে যিনি দ্বিধাহীন—তিনিই শিক্ষিত।

২। পরের সাহায্য ব্যতিরেকে যাঁর চিন্তা ও অনুশীলনের শক্তি আছে, নিসর্গের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে—তিনিই শিক্ষিত।

৩। সর্বকালের, সর্বদেশের ইতিহাস যাঁর জানা আছে, মানুষের শক্তিতে যাঁর অখণ্ড বিশ্বাস, বিচারবুদ্ধিতে যিনি নিরপেক্ষ, নির্ভীক, যিনি সত্যনিষ্ঠ,ন্যায়নিষ্ঠ—তিনিই শিক্ষিত।

৪। রসজ্ঞান ও সৌন্দর্যানুভূতি যাঁর আছে, গোমড়া-গাম্ভীর্যকে যিনি ঘৃণা করেন, অপরের মত যিনি সহিষ্ণুভাবে আলোচনা করতে পারেন—তিনিই শিক্ষিত।

৫। যাঁর রুচিজ্ঞান আছে—তিনি শিক্ষিত। তুচ্ছ কথা, তুচ্ছ ঘটনা, পরচর্চা এ-সবে যাঁর বিরাগ—তিনিও শিক্ষিত।

৬। আত্মজন বা সাধারণ নর-নারী সকলের প্রতি যিনি সহানুভূতিশীল—তিনি শিক্ষিত।

শিক্ষিত বলে নিজেকে যদি বিভূষিত করতে চাও, তা'হলে নিজের চরিত্রকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দিয়ে বিচার করো—

১। আমি অনুশীলন ও চিন্তা করি কিনা?

২। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে কিনা?

৩। আমি পৃথিবীর মানুষ—না কোন বিশেষ প্রদেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আমার বাস? সারা পৃথিবীকে জানবার ইচ্ছা আমার আছে কী?

৪। আমার সৌন্দর্যবোধ আছে? সুরুচিজ্ঞান আছে? কদর্য, কুৎসিতে আমার বিরাগ আছে কিনা?

৫। জীবনে আমার কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে—না গড্ডলিকাপ্রবাহে আমি ভেসে চলতে চাই?

৬। জীবন-পথে আমি অগ্রসর হয়ে চলেছি—না এক জায়গায় স্থাণুবৎ হয়ে আছি?

এ-সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারলে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে তোমাদের মন ভরে যাবে।

পয়েণ্টস্‌ম্যান

শ্রীমতী বেলা দে

রাত তখন অনেক। ঘড়ির কাঁটা দু'টোর ঘরে পা দিয়েছে। বাইরে নেমেছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। বিদ্যুতের আলোয় মাঝে মাঝে সারা ট্রেনের কামরাগুলো পর্যন্ত ঝলসে যাচ্ছে। এখনও কিন্তু ট্রেনটাকে ত্রিশ মাইল পথ যেতে হবে—মাঝে দুটো ষ্টেশন পেলেও থামবার নির্দেশ নেই। বাইরের ঝড় আর বাতাস সিগন্যালের কোনো ইঙ্গিতই ড্রাইভারকে দেখতে দিচ্ছে না—মনে এসেছে অসম্ভব ভয়, তবু থামবার উপায় নেই; গার্ডসাহেবের হুকুম। মাঝে মাঝে মনের ভয়টাকে কাটিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে হুইসিল দিচ্ছে—কিন্তু মেঘের গর্জন আর ঝড়ের আওয়াজ সব কিছু আওয়াজকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির জোর দেখলে মনে হয় সারারাত থামবার কোনো আশাই নেই। বাংলাদেশের মাঠ চারপাশে—সবকিছু জলে ভরে গেছে। ট্রেনের ঝাঁকুনীতে সারা গাড়ীর যাত্রীরা ঠোকাঠুকি খাচ্ছে—বৃষ্টির ছাঁটের ভয়ে সমস্ত কামরার জানলাগুলোও রয়েছে বন্ধ। প্রচণ্ড বাতাসে গাড়ীর গতি যেন আরো বেড়ে গেছে—মাঝে মাঝে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে গাড়ীটা যখন রাস্তা বদল করেছে—যাত্রীদের সে ধাক্কা সামলানো ক্রমশঃ দায় হয়ে উঠছে। সারা গাড়ীটায় তিল ধারণের স্থান নেই—যত লোক বেঞ্চির ওপর ব'সে, প্রায় ততলোকই দাঁড়িয়ে আছে। এ লাইনে মাত্র দু'টি গাড়ী, একটা সকালে চলে গেছে—আর এইটি ছেড়েছে রাত সাড়ে দশটায়। এমনি দুর্যোগের রাত ব'লে গাড়ীর যাত্রীদের কোলাহল একেবারে নেই বললেই হয়। ওরই ভেতরে জায়গা করে একদল লোক আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় রাতটুকু কাটাচ্ছে। সব রকমের যাত্রী মিলে কামরাটা একটা বাজারে পরিণত হয়েছে। বিড়ির ধোঁয়া আর নানারকমের দুর্গন্ধে কামরাগুলোয় যেন ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। প্যাসেঞ্জার গাড়ীর কামরা বলে গাড়ীর সব আলোতে 'বাল্‌ব ও নেই—দু'কোণে দুটোমাত্র আলো তাও মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে—কামরার এই অবস্থা অনুভব করে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ল্যাভেটারিতে ঢুকতে বিশেষ কোনো যাত্রীর ইচ্ছে নেই। ঐ ভীড়ের মধ্যেও যে যার মালপত্তরের দিকে সজাগ পাহারা রেখেছে।

হুহু শব্দে ছুটে চলেছে গাড়ীটা। প্যাসেঞ্জার গাড়ীর অত স্পীড্‌ দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে। শিক্ষিত যাত্রীরা গাড়ীটা লেট্‌ আছে ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে—সত্যিই ভয় হবার কথা! এই তীব্রবেগে মেলগাড়ীও কখনো এ লাইনে চলে না—কেউ কেউ 'চেন' টানার কথাও ভাবছে। বাইরের কোনো জিনিসই আর যাত্রীদের চোখে পড়ে না। 'মাইল মিটার' দেখা গেলে গাড়ীর স্পীডের তর্কের মীমাংসা হোত। মাঝে মাঝে

শুধু ইঞ্জিনের চীৎকার আর বাইরে মেঘের গর্জন কানে আসছে! এই ধরণের দুর্যোগে, বিশেষ করে রাত্রের যে কি দৃশ্য হয় সে ধারণা কোনো যাত্রীরই বিশেষভাবে জানা ছিল না! ভয় আর ভাবনায় মুখের চেহারা গেছে সকলের বদলে। বেশীক্ষণ এ অবস্থায় যাত্রীদের থাকতে হলো না—বিপদের ডাক কানে এলো—হঠাৎ লাগলো কামরায় কামরায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা! প্রায় সমস্ত যাত্রীকেই স্থানচ্যুত করলে এক মুহূর্তেই—কামরার আলোগুলো গেল নিবে, আর চারদিক থেকে উঠলো বিপুল চীৎকার! সেই বুকফাটা চীৎকারে সুস্থ লোকেরও কানে লাগল তালা। গাড়ীর গতি থেমে গেছে—কামরাটা ঢলে পড়েছে পাশের খাদে! ওঠবার মত ক্ষমতা প্রায় কোনো যাত্রীরই নেই—যারা হত, এই দুর্ঘটনার কোনো দৃশ্যই তাদের চোখে দেখতে হ'ল না—যারা আহত তারা চীৎকার করে চাইছে সেবা—সারা গাড়ীটায় শুধু 'মাগো আর বাবাগো' এই চীৎকারধ্বনি! কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই, সবাই গেছে পড়ে—যারা সুস্থ তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে ওঠবার, কিন্তু পায়ের জোর কারুরই নেই! অল্প আহত যাত্রীরা চাপাচাপি আর ধস্তাধস্তিতে করলো প্রাণত্যাগ—অন্ধকারে কামরার দরজা গেছে গোলমাল হয়ে—অন্ধকার বলে সুস্থ ব্যক্তিরাও বাইরে আসবার সুযোগ পাচ্ছে না। জানলাও বেশীরভাগ গেছে চুরমার হয়ে, কাজেই মালপত্র ঘাড়ের উপর থেকে সরিয়েও সে পথ দিয়ে বেরুবার উপায় নেই। আর্তনাদের আওয়াজ এই দুর্যোগ ভেদ করে প্রায় গ্রামের পাঁচ মাইল পর্যন্ত গেছে। সে এক অদ্ভুত কর্ণবিদারী শব্দ! লুটপাট যে হচ্ছে না তার মধ্যে তা নয়—মানুষের অত বড় বিপদের মাঝখানেও দুর্বৃত্তরা তাদের কাজ করে যাচ্ছে। সবাই খুঁজছে আপনজনদের—চীৎকার করে ডাকছে—কেউ পাচ্ছে শুধু সাড়া, কেউ বা তাও নয়! কে কাকে দেখে! ও সময় বাইরে বেরুনোও ভাল নয়। অনেকের ধারণা, সুস্থলোককেও নাকি দুর্বৃত্তরা হত্যা করে পাচার করে দেয় অন্য জায়গায়! সবাই খুঁজছে আলো—যাদের সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল তারা বিদ্যুতের আলোয় সেগুলো উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে। বাইরে বৃষ্টির জল আর রক্তের বন্যা এক হয়ে গেছে!

শ্যামল ছিল তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রী। মাঝের বেঞ্চিতে তার জায়গা ছিল বলে, পা ছাড়া দেহের আর কোনো জায়গা তার জখম হয় নি! কয়েকজন যাত্রী তার ঘাড়ের উপর পড়েছিল তাই মাথাটা ওর কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছল। মিনিট দশেক পরেই শ্যামলের জ্ঞান ফিরে এল। পকেট থেকে টর্চটা বার করে দেখলে, কাঁচটা ফেটে গেলেও কলকব্জা সব ঠিক আছে। কাজেই কোন রকমে সেটাকে সে জ্বালিয়ে ফেললে। কিন্তু জ্বালাবার পর যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো, তাতে আলো জ্বালিয়ে রাখার সাহস পেলোনা শ্যামল। এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই জায়গা করে শ্যামল বেরিয়ে এল জানলার মধ্যে দিয়ে। আহত অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে দেখলে

ইঞ্জিনসমেত প্রথম তিনটি কামরা লাইন থেকে সরে পাশের খাদে গড়িয়ে গেছে। পেছনের কামরার সুস্থ লোকেরা সামনের দিকে ছুটে গেছে সাহায্য করতে—তাদের আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল না—প্রায় দেড়শো লোককে কামরা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। কিছু না কিছু আঘাত সকলেই পেয়েছে। রেলওয়ে কর্মচারীরা ছোটাছুটি করছে নানান কাজে—গার্ড সাহেবের আলোটা ছিনিয়ে নিয়ে একদল যাত্রী অযথা দৌড়ঝাঁপ করছে। কাজের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা নেই—যার যা খুশি সে তাই করছে! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই 'রিলিফ্ ট্রেন' যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে আহত লোকদের এক এক করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেল। যারা চিরদিনের মত জ্ঞান হারিয়েছে, তাদের স্তূপিকৃত করে রাখা হ'ল এক জায়গায়! পুলিস এসে কামরাগুলোতে আলো জেলে সকলকে সাহায্য করছে। গ্রাম থেকেও একদল লোক এসেছে ছোট ছোট হারিকেন আর মশাল হাতে নিয়ে। ডাক্তার যারা এসেছেন তাঁরা আহতদের সেবার চেয়ে নিজেদের সরকারী অফিসের চাকরি বজায় রাখতে ব্যস্ত। শ্যামলের ডান পা দিয়ে ভীষণ রক্ত পড়ছে, খানিকটা মাংসও ছড়ে চলে গেছে। কারুর সাহায্য না নিয়েই সে প্রথম রিলিফ গাড়ীতে অন্য আহতদের সঙ্গে শহরের হাসপাতালে গিয়ে পৌছল। একদল আহত রোগীর পাশে শুয়ে শ্যামল আর কোনো কথাই কারুকে বলতে পারল না। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েই শ্যামল সে রাতটা হাসপাতালে কাটিয়ে দিলে।

পরদিন সকালে অনেক কিছু খবর সে জানতে পারলে সেখানকার ডাক্তার আর নার্সদের কাছে। তবে হতাহতের সংখ্যা কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তাছাড়া ট্রেন দুর্ঘটনার কারণও কারুর সঙ্গে কারুর বিবৃতিতে এক হচ্ছে না—কেউ বলছে 'ফিস্‌প্লেট' খোলা ছিল, কেউ বলছে 'সিগন্যাল ডাউন' ছিল। কাজেই লাইনের গোলমালই একমাত্র যে এই বিপর্যয়ের কারণ সে সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না। কেউ আবার বলছে পয়েন্টসম্যানের ভুলের জন্যই এ ব্যাপার হয়েছে। কারুর ধারণা ড্রাইভার সজ্ঞানে ছিল না ইত্যাদি—কিন্তু সব কিছু কল্পনাকে চাপা দিয়ে দিলে এক শীর্ণ বৃদ্ধ রেলওয়ে 'ক্রু'। তাঁর মাথায় লেগেছে ভীষণ আঘাত—গত রাত্রে তার জ্ঞান ছিল না—সকলের সঠিক কারণগুলোকে অস্বীকার করে করুণকণ্ঠে তিনি বললেন, "আমি জানি এর কারণ।" তিনি তাঁর বিবৃতিতে জানালেন, "সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা—এই রকম এক দুর্যোগময় রাত্রে এই লাইন দিয়ে এক মালগাড়ী তীরবেগে ছুটে যাচ্ছিল—পয়েন্টসম্যান আলো হাতে করে লাইনের মাঝে দাঁড়িয়ে গাড়ীটাকে থামাবার চেষ্টা করছিল দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার জন্য, কারণ হঠাৎ সিগন্যালের পাখা খারাপ হয়ে যায় এবং সে পাখা পড়ে যায় ইঙ্গিত না করা সত্ত্বেও—কিন্তু সেই গাড়ীর ড্রাইভার 'সিগ্‌ন্যাল ডাউন্' দেখে কারুর বাধা না মেনেই সোজা সেই পয়েন্টসম্যানকে চাপা দিয়ে চলে যায়,

এবং কিছুদূর গিয়ে গাড়ীটা লাইনচ্যুত হয়। তারপর থেকে এই জায়গা দিয়ে যে কোনো গাড়ী যাক্ না কেন রাত্তিরে ড্রাইভাররা দেখতে পায় একজন লোক লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলো হাতে করে গাড়ীকে থামাবার ইঙ্গিত করছে—তারপর কাছে আসার পর আর তাকে দেখা যায় না। কোথায় যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সেই লোকটি, তবে দূর থেকে একটা বিকট আর্তনাদও শুনতে পাওয়া যায় বহুক্ষণ। দু'তিন মিনিট পরে আবার গাড়ী সামনের দিকে চলতে থাকে। যে গাড়ী সেই আলো উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছে, তারই হয়েছে এই রকম বিপদ! এই নিয়ে অনেক গবেষণার পরও কেউ অন্য কোনো কারণ খুঁজে বার করতে পারে নি! আমি এই লাইনে অনেকদিন রাত্রে কাজে বেরিয়েছি—রোজই দেখেছি ড্রাইভাররা অন্ততঃ দু'মিনিট গাড়ী ওখানে বেঁধেছে। কালকের গাড়ীতে ছিল এক নতুন ড্রাইভার, তাকে গার্ডসাহেব সতর্ক করা সত্ত্বেও সে বিশ্বাস করেনি—তাতেই হয়েছে এতগুলো লোকের এই বিপদ!

সেইদিনের সেই ঘটনার পর থেকে সব ড্রাইভারকেই নিয়ম অনুসারে সেখানে দাঁড়াতে হয়েছে—সবাই দেখেছে সেই লোকটিকে—আজো গেলে তাকে দেখা যাবে!"

সব ঘটনা শুনে শ্যামলের গা'টা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করে উঠলো!

সর্বভুখ মানুষ

আসামে পার্বত্য অঞ্চলের এই মানুষটিকে সর্বভুখ বললেও যেন সব বলা হয় না! নির্বিচারে মানুষ যে এমন যা-তা জীবজন্তু, পোকমাকড় থেকে আরম্ভ ক'রে গাছপালা, লতাপাতা পর্যন্ত খেয়ে হজম ক'রে ফেলতে পারে তা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। তোমরা হয়ত ভাবছ জিনিসগুলি সবই রান্না করে খাওয়ার কথা বলছি, কিন্তু তা মোটেই নয়। জ্যান্ত শাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, পাখী, ইঁদুর, ফড়িং, উইচিংড়ে,—যা তার কাছে ধর, কাঁচাই খেয়ে ফেলবে সে। গাছপালা সম্বন্ধেও তার জঠরাগ্নির প্রকোপ এমনি। গাছের ডালপালা, কাঁচা মোচা, থোড়, লতাপাতা এমন কি বিছুটি পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলে লোকটা। লোকটিকে স্থানীয় লোকেরা প্রেত-সিদ্ধ, অর্থাৎ ভৌতিক শক্তিসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করত। গত যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈনিকদের এই সব দেখিয়ে সে প্রচুর পয়সা রোজগার করেছিল। সম্প্রতি দেহ রেখেছে লোকটি। লোকটির নাম—রনঝোড়।

(স্থানীয় সংবাদদাতা প্রেরিত)

আইন্‌স্‌ফোর্ড

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

চলো খুকুমণি আজ ইংল্যাণ্ডের গ্রাম দেখে আসি। হালকা রোদ উঠেছে, কেউ ঘরে ব'সে নেই, তোমার মতো ছোট ছেলেমেয়েরা মা-বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। এদেশে এতোটুকু রোদ্দুর কেউ নষ্ট করে না। সারা বছর হিম, কুয়াশা, বরফ আর ব্লিজার্ড। তাই যখনই রোদ্দুর পাও যতো পারো গায়ে লাগিয়ে নাও—অসুখ হবে না তা'হলে।

কিন্তু আজ কোথায় যাই বল তো? হোভ্? ব্রাইটন্? বড় পুরনো। অনেকেই গেছে, অনেকেই যায়। আমরা এক গ্রামে যাই চলো। তার নাম আইন্‌স্‌ফোর্ড। এ জায়গার নাম খুব কম লোক্ জানে। আমার এক বন্ধু থাকতো সেখানে অনেকদিন আগে। সে বলেছিলো ইংল্যাণ্ডের গ্রাম না দেখে দেশে ফিরে যেও না—পারো তো আইনস্‌ফোর্ড ঘুরে এসো—একেবারে অজ পাড়া-গাঁ তবু লণ্ডনের চেয়ে আমার সে-গ্রাম ভালো লাগে। চলো খুকুমণি আজ সেখানেই যাই।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে হবে। চারটি বড়ো ষ্টেশন লণ্ডনে—ইউষ্টন্, ওয়াটারলু কিংস্ ক্রশ্ আর এই ভিক্টোরিয়া। উঃ কী ভীড় এখানে! ফ্রান্স্, জার্মানী, ইটালী, সুইটস্‌জারল্যাণ্ড—ইংলণ্ড্যের বাইরে যেতে গেলে এই ষ্টেশন থেকে যেতে হয় ব'লে এতো ভীড়।

এসো গাড়ীতে উঠে পড়ি। না, আমাদের ট্রেনে একেবারে ভীড় নেই। দশ মিনিট পরপর ব্র্যাম্‌লের ট্রেন ছাড়ে কিনা। সেখানে বদল করে সোজা আইন্‌স্‌ফোর্ড।

কি খুকুমণি, থার্ড ক্লাসে যেতে কষ্ট হচ্ছে? দেখ কী সুন্দর পুরু দামী গদি! কী ঝকঝকে চারপাশ! ইণ্টার কিংবা সেকেণ্ড ক্লাস নেই এদেশে আর ফার্ষ্ট ক্লাসের সঙ্গে থার্ড ক্লাসের বলতে গেলে কিছুই তফাৎ নেই, শুধু ভাড়া বেশী। তাই এদেশে ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়ে খুব কম লোক।

এসো নেমে পড়ি, ব্র্যামলে এসে গেল। মিনিট পাঁচেক পর আইন্‌স্‌ফোর্ডের ট্রেন এই লাইনেই আসবে। কিন্তু শীত লাগছে যে। দেখ রোদ্দুর চ'লে গেল। এদেশের প্রকৃতিকে কখনও বিশ্বাস ক'রো না। এখন হয়তো বেশ গরম, একটু পরেই কনকনে ঠাণ্ডা হ'তে পারে। এই রোদ্দুর—সেজেগুজে রাস্তায় নামতে না.নামতেই আরম্ভ হ'লো বৃষ্টি। তাই গরম কাপড় কখনও ছাড়ে না কেউ, আর রেইনকোট হাতে থাকে সব সময়। বাহাদুরী দেখাতে

মেয়েরা লালিংষ্টোন সিল্ক ফার্মে কাজকর্ম করছে

গেলেই বিলেতের প্রকৃতি মুচকি হাসবে আর তোমাকে দেবে হয় ব্রঙকাইটিস্ নয় নিউমোনিয়া। কাজেই খুব সাবধান—গরম কাপড় কখনও ছেড়ো না।

এই ট্রেন এসে গেল। আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা আইন্‌স্‌ফোর্ড পৌঁছে যাবো। আমরা যে শহর ছেড়ে বেশ দূরে চ'লে এসেছি সেকথা এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে। ওই দেখ কতো ছেলেমেয়ে হাঁ ক'রে আমাদের ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন আমরা শিয়ালদা' থেকে কৃষ্ণনগর যাচ্ছি। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, কে বলতে পারে আজ আর সূর্য উঠবে কিনা।

নামো, এই হ'লো আইন্‌স্‌ফোর্ড। প্ল্যাটফর্মে আর কেউ নেই, শুধু আমরা দু'জন। চ'লে এই রাস্তা ধ'রে সোজা এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্ ইংলণ্ডের গ্রাম কি রকম। ওই দেখ মাঠে কতো গরু চরছে। গরু দেখে খুব অবাক হচ্ছো না? লণ্ডনের রাস্তায় গরু কখনও দেখা যায় না। ইংল্যাণ্ডে আমিও এই প্রথম গরু দেখলাম। আইন্‌স্‌ফোর্ড খুবই ছোট গ্রাম। রাস্তার এপাশে-ওপাশে মাঠ। অনেক নাম-না-জানা লম্বা গাছ। তাই শীত এখানে খুব বেশী। হাওয়া দিচ্ছে, শিরশির ক'রে উঠছে সমস্ত শরীর। সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছগুলিও যেন কেঁপে উঠছে আর ঝুর ঝুর ক'রে ঝরে যাচ্ছে পাতা। সেপ্‌টেমবার মাস। এখন ইংলণ্ডে শরৎ। শরৎ এদেশে প্রকৃতিকে পরায়না কোনো সাজ। শীত আসছে ব'লে গাছপালার কাছ থেকে সমস্ত উজাড় ক'রে যেন খাজনা নিয়ে যায়। খাজনা দেয়া সুরু হ'য়ে গেছে। আর ফুল নেই, নতুন পাতা এপ্রিলের আগে দেখা যাবে না। এই গাছগুলি আর কয়েকদিনের মধ্যেই একেবারে ন্যাড়া হ'য়ে যাবে।

কিন্তু ওটা কি খুকুমণি? এই গ্রামে অতো বড়ো বাড়ী এলো কোথা থেকে? মনে হচ্ছে যেন প্রাসাদ। চলো চলো ওই দিকেই যাই।

ও, এখানে সিল্ক তৈরী হয়। ওই দেখ লেখা রয়েছে: "লালিংষ্টোন্ সিল্ক ফার্ম"। হ্যাঁ, সকলেই ভেতরে যেতে পারে। চলো আমরাও যাই। ওই মেয়েটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে। তুমি বোধ হয় ওর সব কথা বুঝতে পারবে না। আমি পরে তোমাকে ব'লে দেবো ও আমাদের কি বললো।

এই বিরাট বাড়ীর নাম "লালিংষ্টোন সিল্ক ফার্ম"। এটি আগে ছিলো দুর্গ। সপ্তম হেনরীর সময় এ দুর্গ তৈরী হয়। আজ দুর্গ ভ'রে গেছে গুটি পোকায়। সারা ইংলণ্ডে এই একটি মাত্র সিল্ক ফার্ম।

বহুদিন অবধি রেশমশিল্প শুধু এশিয়াতেই ছিলো। প্রথম জেমস্‌ প্রচুর উৎসাহ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এই শিল্প প্রসারের চেষ্টা করলেন। হাজার হাজার মালবেরী গাছ বিদেশ থেকে আমদানী ক'রে গুটিপোকার চাষও করা হ'লো, কিন্তু প্রকৃতির জন্যে বিশেষ সুবিধা হ'লো না। আর বিজ্ঞানও আজকের মতো উন্নত ছিলো না ব'লে, কৃত্রিম উপায়ে কিছু করা গেল না। তারপর প্রথম জর্জও এ বিষয়ে উৎসাহ দেখালেন এবং নতুন প্রথায় ইংলণ্ডে মালবেরী গাছের চাষ করালেন। লোকের উৎসাহ হ'লো, কিন্তু খুব বেশী ফল পাওয়া গেল না। ওদিকে তখন ফ্রান্স আর ইটালীতে এ শিল্প সুরু হ'য়ে গেছে। শুধু ইংল্যাণ্ড প'ড়ে রইলো পেছনে।

তারপর এই সেদিন—মানে ১৯৩২ সালে লেডী হার্ট ডাইক তার নামকরা ইঞ্জিনীয়ার স্বামী সার অলিভারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাতারাতি এক আশ্চর্য কাণ্ড ক'রে তুললেন। তাঁর প্রচেষ্টার জন্যে তিনি এক কথায় আইন্‌স্‌ফোর্ডের এই দুর্গ পেয়ে গেলেন। সেখানে অনেক যন্ত্রপাতি বসানো হ'লো। প্রয়োজন মতো ঘর সাজানো হ'লো। তুরস্ক, ইটালী থেকে গুটি পোকার ডিম আনানো হ'লো— মালবেরী গাছ পোঁতা হ'লো। শীতে যাতে কিছু নষ্ট না হয় সে-বিষয়ে সার অলিভার সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন আর কৃত্রিম উত্তাপের অসংখ্য যন্ত্র আনানো হ'লো। কয়েক মাসের মধ্যেই আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। লেডী হার্ট ডাইকের চেষ্টা সফল হ'লো। ইংল্যাণ্ডের রেশম শিল্পের ইতিহাসে অমর হ'য়ে রইলো তাঁর নাম। আজ আইন্‌স্‌ফোর্ড "লালিংষ্টোন সিল্ক ফার্ম" থেকে থান থান রেশম বাইরে চালান যায়।
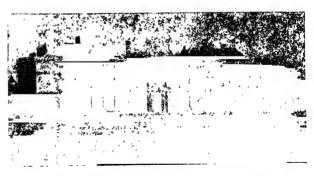
আইন্‌স্‌ফোর্ড দুর্গের এই বাড়ি এখন পরিবর্তিত হয়েছে লালিংষ্টোন সিল্ক ফার্মে

শীতকালে ফার্মের কাজ বন্ধ থাকে।, এখানে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশী। এই গ্রামেই তাদের বাড়ী। সব কাজই হয় যন্ত্রের সাহায্যে। দুর্গের বাইরে অনেকখানি জমি। সে-জমি ভ'রে উঠেছে মালবেরী গাছে। গুটি পোকার ডিম রাখা হয় যন্ত্রের মধ্যে, মেয়েরা সুতো বের করে যন্ত্রের সাহায্যে—তা' ধোয়া হয় অন্য ঘরে, আর এক কলে। তারপর তৈরী হয় রেশম। নানা রঙের রেশম এখান থেকে বিদেশে চালান যায়।

সব ঘুরে দেখা হ'লো খুকুমণি। চলো এবার চায়ের ঘরে গিয়ে চা খাই। এ গ্রামে নাকি বাইরে কোথাও চায়ের দোকান নেই। বেশী লোক থাকে না কিনা এখানে। কিন্তু যারা থাকে তারা খুব যত্ন করলো। ম্যানেজার আর যারা কাজ করে এখানে তারা সকলেই অনেক কথা জিজ্ঞেস করলো—আমাদের নেমন্তন্ন করলো তাদের বাড়ী যাবার জন্যে। অন্য আর একদিন আবার আসা যাবে, কি বল? কিন্তু আজ চা খেয়েই লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে—এটাই নাকি শেষ ট্রেন।

ওই দেখ চারটে বাজতে-না-বাজতেই অন্ধকার হ'য়ে গেল। হঠাৎ যেন ভারী হ'য়ে গেল ঠাণ্ডা। দূরে মাঠে গরুগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে আর চারপাশে যতো গাছ তাদের পাতা ঝরে যাচ্ছে মিনিটে মিনিটে। আকাশে-মাটিতে শুধু শীতের ভয়। চলো বাড়ী যাই।

রোদ-নিবারক রঙিন চশমার গ্লাসের সাহায্যেও কতরকম ছবি আঁকা যায় এখানে তার কয়েকটি নমুনা দেয়া হ'ল। তোমরা এই ছবি দেখে আরো কত রকমের ছবি আঁকতে পারো চেষ্টা করে দেখ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাতুলের মনে হলো যেন প্রত্যেকটি পদপাতে তার রোমাঞ্চ জাগছে। দু'পাশের অন্ধকার সব তার চেনা। এই অন্ধকারগুলোর সঙ্গে যেন তার বহুদিনের পরিচয়। ছোটবেলায় ওরা তাকে ভয় দেখিয়েছে কতবার। আবার এক-এক সময় ওই অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে কত ভালোই যে লেগেছে সেকালে। রামধনুর সাত রঙ মেশানো অন্ধকার সব। মনে হয় আঙুল দিয়ে একটু ছুঁলেই, অন্ধকারগুলো টুং-টাং শব্দে বেজে উঠবে। যেন সাত-রঙা পরীর পায়ে ঘুঙুরের বাজনা। আবার ওদের ভয় দেখানোও ছিল বড় অদ্ভুত। শোবার ঘরের ছোট জানালা দিয়ে উঠোনের কোণটার দিকে চাইতেই মনে হতো যেন আস্তিবুড়ী ওর দিকে ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে দেখছে। আস্তিবুড়ীর কপালজোড়া সিঁদুর, কড়ির মত সাদা সাদা চোখ আর জট্-পাকানো শনের দড়ির মত কালো-কিষ্টি চুল-ভর্তি মাথা।

সদর দরজা যেমন ভেজানো ছিল তেমনি ভেজিয়ে রেখে রাতুল রোয়াক পেরিয়ে সিঁড়ির রেলিং-এ হাত দিলে। চেনা হাতের ছোঁয়া পেয়ে রেলিংটা যেন চম্‌কে উঠেছে। কোথাও কিছু বদলায় নি। আছো তো ভাই তোমরা তেমনি? সবাই তেমনি আছো? আর রেলিং-এর শিকগুলো? মাঝে মাঝে এক-একটা ভাঙা। তাও তেমনি সব। কত মেরেছি তোমাদের লাঠি দিয়ে—যখন পড়া বলতে পারতে না। দেখতে তো চুপচাপ শান্ত-শিষ্ট ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়ে সব, কিন্তু কী দুষ্টুমি ছিল ভেতরে ভেতরে! মাষ্টারকে অপগ্রাহ্যি! ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নাম্‌তে কতবার পা পিছলে চিতপটাং। ওই রেলিঙের শিকগুলো ছিল তার সব ছাত্র আর রাতুল ছিল ওদের মাষ্টার।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রাতুল মনে মনে হাসলে।

তা' মনে পড়লে এখনও হাসি পায় বৈ কি !

সেদিন ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেছে। খেলতে গিয়েছিল রসার মাঠে। হাতে পায়ে জামায় কাদা লেগে আছে। মতলব ছিল সবাই-এর চোখে ধূলো দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকে জামা কাপড় বদ্‌লে ফেলা।

—কে যায় রে—কে যায় ওখানে—পেছনে গোবিন্দর গলা—

গোবিন্দকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালাতে গিয়ে এই সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সামনেই বাবা। ভুত দেখার সামিল।

বাবা বলেছিল—গোবিন্দ দেখ্ এসে—কাদের ছেলে রে—কাদের ছেলে এটা—

ছাই ফেলা কুলোটা নিয়ে গোবিন্দ এসে দেখে—খোকাবাবু—

—এ যে আমাদের খোকাবাবু—

—না তুই ভালো করে দেখ্ গোবিন্দ—তুই নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিস—নিত্যানন্দ সেন মাথা নাড়তে লাগলেন।

—সে কি কথা বাবু, এ যে নির্ঘাৎ আমাদের খোকাবাবু—আর কেউ নয়—

যত বাজে কথা তোর গোবিন্দ—আমার খোকা হলে কি এমন কাদা মেখে বাড়ি ফেরে—গোবিন্দর কথা না শুনে লুকিয়ে পালায়—কখ্খনও নয়, আমার খোকা এ কখ্খনো নয়—তুই ভালো করে দেখ্ গোবিন্দ—চোখ বোধ হয় তোর খারাপ হয়েছে—আহা এই বয়েসেই চোখটা নষ্ট হলো তোর—

—না বাবু—আপনি কী বলছেন—এই দেখুন ভালো করে চেয়ে দেখুন—

বলে রাতুলের চিবুকটা তুলে ধরতে যেতেই রাতুল কেঁদে বাবার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল—

—আমি আর করবো না বাবা, আর আমি কখনও এমন করবো না—

এমনি শিক্ষার রীতি ছিল বাবার। কখনও রাগ নয়, বকাবকি নয়, ধমকানো নয়। কখনও কোনও অন্যায় করতে বারণ করেন নি বাবা। বাবা তার বন্ধু। কতদিন দু'জনে একসঙ্গে দোতলার বারান্দায় বল খেলেছে। খেলতে খেলতে বাবাকে হারিয়ে দিয়েছে। বাবার সঙ্গে গুলি খেলতে গিয়ে বাবার সব গুলি জিতে নিয়েছে। 'চোর-পুলিস' খেলতে খেলতে বাবাই তো বেশিরভাগ দিন চোর হতো। আবার সেই বাবাকেই রাতুল অন্য সময় যেন চিনতেই পারতো না। খুব ভোরে উঠতো বাবা। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছে—সূর্য ওঠেনি তখনও। চুপি চুপি লেপ ছেড়ে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে—মস্ত ভারী একখানা মহাভারত

নিয়ে বাবা পড়ছে। চারদিকে ধূপ জ্বলছে। খালি গা—তসরের কাপড় পরা। সেই মাথা নিচু করে পড়া—সাড়া নেই—শব্দ নেই, কোনও দিকে খেয়াল নেই। একমাত্র নিজের মনের সঙ্গেই যেন নিজের মনের গলাগলি ভাব। আর সবাই তারপর।

এক একদিন সেই সময়ে সাহস করে পাশে যেতেই বই-এর দিকে চোখ রেখেই ডান হাত দিয়ে রাতুলকে কাছে টেনে নিয়েছে বাবা। কিন্তু পড়া তার বন্ধ হয়নি।

অনেক পরে পড়া শেষ করে বই বন্ধ করে বাবা জিজ্ঞেস করেছে—সকালে ওঠা খুব ভালো রে খোকা—

—আমিও রোজ ভোরে উঠে পড়বো—

বাবা বলেছিল—যদি উঠতে ভালো লাগে তো উঠো—নইলে নয়—তাতে শরীর খারাপ হবে তোমার—

ভোরে ওঠা আর হয়নি রাতুলের। কিন্তু আশ্চর্য, বাবাও আর কখনও পেড়াপীড়ি করেনি। অথচ রাতুল ভাল করেই জানে—সে ভোরে উঠে পড়াশোনা করলে বাবার মতন আর কে বেশি খুশি হতো!

তবু রাতুলের মনে হতো কোথায় কেমন করে বাবাকে যেন সে সম্পূর্ণ করে পায় না। মন ভরে না। ছুটির দিন দুপুরবেলা কেউ যখন বাড়িতে থাকে না—তখন ভূগোলের ম্যাপের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মন এই পিচ-ঢালা রাস্তা পেরিয়ে চিলের পাখায় ভর করে এশিয়া আর এশিয়া মাইনর ছাড়িয়ে, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন আর দ্বীপ-দ্বীপান্তর পার হয়ে থামে গিয়ে পেঙ্গুইন আর এক্কিমোদের দেশ উত্তরমেরুতে—তারপর আবার এক সময় উত্তরমেরু ছাড়িয়ে কোথায় কোন্ রহস্যপুরীর অন্দর মহলে গিয়ে হারিয়ে যায় কেউ আর তার ঠিকানা জানে না।

তারপর একদিন যখন আরো কিছু বড় হলো রাতুল—কাউকে বোঝানো যায় না তার কথা। তার কথাও কেউ বোঝে না আর।

খিদিরপুর ডক্ থেকে জাহাজটা যখন ছেড়ে দিলে সেদিন জেটিতে এসে কোনও চেনা মুখ তো তাকে আনন্দ-বিদায় দিতে আসেনি। এলে হয়ত দেখতে পেত জাহাজের অসংখ্য পোর্ট হোলের একটির মধ্যে একটি শুধু মুখ—কোনও বিশেষ দিকে তার দৃষ্টি আটকে নেই। কিন্তু তার এক চোখে হাসি আর এক চোখে জল।

*　　　　*　　　　*

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল রাতুল। এখানে অন্ধকার একটু পাতলা। দূর আকাশের জ্যোছনায় অন্ধকার এখানে ছাই-ছাই হয়ে এসেছে।

আগেকার মত্ত টিয়া পাখীটা খাঁচায় ঝুলছে এখনও।

নিজেকে হঠাৎ লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলে রাতুল। এখনি তাকে দেখতে পেলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চীৎকার স্বরু করে দেবে। এতদিন হয়ে গেছে—হয়ত আগেকার মত কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকলে আর শিষ্ দেবে না। এখন হয়ত ভয় পাবে। পাখীরা তো অন্ধকারেও দেখতে পায়!

কিন্তু লুকোতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো গঙ্গারাম তো অনেকদিন মারা গেছে। মনেই ছিল না তার। স্মরণশক্তিটা কি এখনও ভালো করে ফেরেনি তবে!

সেই গঙ্গারাম। সে অনেক কথা। গোবিন্দ তার দেশ থেকে এনেছিল পাখীটা। তখন সবে রাতুল জন্মেছে। একই সঙ্গে ম-হারা রাতুল আর ওই গঙ্গারামকে বাঁচিয়ে তোলবার মহৎ ভার নিয়েছিল ওই গোবিন্দই।

রাতুলকে সবাই ডাকতো—খোকা—

গঙ্গারাম শুনে শুনে বলতে শিখলে—খোকা—ও খোকা—

কিন্তু বিদ্যের দৌড় ওই পর্যন্তই। প্রথমভাগ শেষ করে যখন অস্তে অস্তে ফাষ্টবুক ধরলে রাতুল, তখনও গঙ্গারাম 'ক-খ-'ই শেষ করেনি। কিন্তু সেই গঙ্গারাম একদিন হঠাৎ মারা গেল। আর রাতুল? সে তো মরেই গেছে। বেঁচে আছে যে, সে তো 'কেস্ নম্বর ৪৯'।

গঙ্গারামের মৃত্যুর ঘটনাটা যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে।

গোবিন্দ খাঁচা নিয়ে গঙ্গারামকে স্নান করাচ্ছিল। হঠাৎ গোবিন্দ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো—কান্না শুনে ওপর থেকে সবাই ছুটে নিচে এসে দেখে খাঁচার ভেতর গঙ্গারাম দাঁড় থেকে ছিট্‌কে কাত হয়ে নিচে পড়ে আছে। ওঃ গোবিন্দর সে কী বুকফাটা কান্না! রাতুলেরও সমস্ত বুক ফেটে যেন কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সে আর গঙ্গারাম, গঙ্গারাম আর সে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ তাকে কালিঘাটের আদি-গঙ্গায় গিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

মনে আছে রাতুলের সে-রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়নি। কেবল মনে হয়েছে গঙ্গারামকে বাঁচানো হলো না কেন। বাড়িতে খবরের কাগজ আসতো "দৈনিক যুগবার্তা"। সেই "দৈনিক যুগবার্তা"র সামনের পাতায় বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন থাকতো—

"মরা মানুষ বাচাইবার উপায়
বিদ্যুৎ সলিউশন্"

যে-কোনও মানুষ বা যে-কোনও জীবজন্তু নাকি বিদ্যুৎ-সলিউশনের গুণে মরে যাবার পর আবার বেঁচে উঠতে পারে। সে-বিজ্ঞাপনটা বছরের পর বছর রোজ-রোজ দেখে দেখে কেমন যেন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একই কাগজের একই জায়গায়, একই ভাষায়, একই বিজ্ঞাপনের যে কী মোহ আছে কে জানে। সেদিন রাতুলের শিশু-মনে এই প্রশ্নই জেগেছিল যে গঙ্গারামকে 'বিদ্যুৎ-সলিউশন্' খাওয়ানো হলো না কেন। তা'হলে তো আবার বেঁচে উঠতো গঙ্গারাম।

* * *

হঠাৎ একতলায় যেন সদর দরজা খোলার মত একটা শব্দ হলো।

রাতুল টপ্ করে সিঁড়ির পাশের ঘরটাতে ঢুকে পড়েছে। গোবিন্দ বোধ হয় ফিরে এল।

এ-ঘরটায় যেন বহুদিন পা দেয়নি কেউ। রাতুলের মা নাকি এই ঘরে থাকতো। এখন অবস্থা দেখে মনে হলো—নানা জিনিসের সমাবেশ হয়েছে বুঝি এ-ঘরটায়। ঘরটা ভীষণ অন্ধকার। দরজা ভেজানো ছিল। দরজার কপাট খুলতেই ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ শব্দ হয়ে আবার থেমে গেল। দেখা যাক্ না। পাশের ঘরেই আলো জ্বলছে। ওখানেই বোধ হয় আলোচনা চলছে। বেশ জটিল একটা সমস্যায় পড়েছে সবাই।

কিন্তু এ-ঘরে যদি কেউ ঢুকেই পড়ে! তা'হলেই তো সর্বনাশ।

তা, সর্বনাশ আর কিসের! তোমার বাড়ি তুমি এসেছ—তোমার অধিকার আছে এ-বাড়িতে! কী আর হবে! জেলও হবে না—হাজতও হবে না। যে জাল-রাতুল সে-ই বিদায় নেবে।

সিঁড়ি দিয়ে যেন কার ভারী পায়ের ওঠার শব্দ হলো। রাতুল নিমিষে নিজেকে সুস্থির করে নিলে। তারপর আর যখন কোনও আওয়াজ নেই কোথাও, চেয়ারটা সরিয়ে একটা মস্ত-বড় সুটকেসের পাশে গিয়ে বসলো। দুটো ঘরের মধ্যে একটা দরজা। দরজার মধ্যে একটা ছোট ফুটো দিয়ে দৃষ্টি দিলে ওদিকের ঘরে। প্রথমটা স্পষ্ট দেখা গেল না।

তারপর কী মনে হতেই রাতুল সুটকেসটা ঠেলে সরিয়ে দিলে।

বেরিয়ে পড়লো আর একটা বড় ছিদ্র। তার ভেতর দিয়ে উঁকি দিতেই রাতুল অবাক হয়ে গেল। ওপাশে ক্ষিতীনবাবু—আর পেছন ফিরে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে বাবা। আর মেজের ওপর বসে আছে—ও কে? ওই বুঝি জাল রাতুল!

আশ্চর্য! হঠাৎ রাতুলের আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো। আরে ও যে হরিদাস!…ভবতোষবাবুর কাছে হরিদাস!… (ক্রমশঃ)

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

অবন ঠাকুর ছবি আঁকে

মৌচাকের জন্য অবনীন্দ্রনাথের নিজের হাতে আঁকা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম তোমরা হয়তো সকলেই জানো। এতদিন তিনি বেঁচেই ছিলেন, সম্প্রতি এ-জগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর লেখা "ক্ষীরের পুতুল", "বুড়ো আংলা" প্রভৃতি আরো অনেক রকমের ছোটদের জন্যে লেখা বই নিশ্চয়ই তোমরা পড়ে থাকবে। এই সব লেখবার ধরণটাই তাঁর ছিল ভারী মজার, পড়লেই বোঝা যেতো যে অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া এ-লেখা আর কারোই হতে পারেনা,—এত অদ্ভুত রকমের মিষ্টি মিষ্টি হাসির কথা আর কেউই বলতে পারেনা। এঁর লেখা বই পড়ে ছেলে-বুড়ো সকলেরই খুব আমোদ লাগতো। ছেলেদের মনকে কেমন করে খুশি করতে হয়, আর বুড়োদেরও কেমন করে ছেলে-মানুষ করে তুলতে হয়, এই যাদুবিদ্যা তিনি জানতেন। "মৌচাকের" সঙ্গে তাঁর ছিল গোড়া থেকেই ভালোবাসার সম্পর্ক। প্রথম বছর থেকেই নানা ধরণের অনেক লেখা তিনি তোমাদের এই কাগজে লিখে গেছেন।

কিন্তু তিনি কেবল এমনি মজার গল্প লেখবারই ওস্তাদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহা-শিল্পী। শিল্পী মানে তোমরা হয়তো ভাবছো যারা ছবি আঁকে। কিন্তু এ-কথা ভাবলে ভুল করা হবে। ছবি তো অনেকের হাত দিয়েই বেরোয়, সে আর এমন শক্ত কথা কি? যারা পটুয়া হয় তারা নিত্যই কত রংবেরং-এর ছবি আঁকে। আবার যারা ফটো তোলে তাদের তো আঁকবারই দরকার হয় না, ক্যামেরার যন্ত্র দিয়ে তারা এমন সব ছবি তুলে দেখায় যা অনেক সময় সত্যিকার জিনিসের চেয়েও সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ সব ছবির সঙ্গে শিল্পীর ছবির

অনেক তফাৎ আছে। কি তফাৎ সেটা একটু বুঝিয়ে বলি। কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা যে সুন্দর সুন্দর পুতুল গড়ে তা আর কে না জানে? এক একটা পুতুল মানুষের চেয়েও ঢের বেশি সুন্দর, ঢের বেশি জমকালো দেখতে হয়, কিন্তু তবুও আমরা দেখেই বুঝতে পারি এটা মানুষ নয়, এটা নিতান্ত পুতুলই বটে। আর মানুষকে তার চেয়ে খারাপ দেখতে হলেও, তাকে দেখলেই বুঁঝি যে এটা পুতুল নয়, জ্যান্ত মানুষ। কেমন করে তা বুঝি? তার মধ্যে প্রাণের চিহ্ন দেখে। মানুষের মধ্যে প্রাণ আছে, পুতুলের মধ্যে প্রাণ নেই। পুতুলকে যিনি তৈরি করেন, তাঁকে বলি কারিগর। মানুষকে যিনি তৈরি করেন তাঁকে বলি ভগবান। আর শিল্পী যিনি হন তিনি কারিগরও নন, ভগবানও নন, কিন্তু ভগবানেরই কতকটা কাছাকাছি। তার কারণ, তিনি যা-কিছুই গড়েন তার মধ্যে ঐ রকম প্রাণ থাকে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির মধ্যে তেমনি প্রাণের চিহ্ন-ফোটাতে জানতেন, সেই জন্যেই তাঁকে বলছি মহা-শিল্পী। এমন শিল্পী সাধারণ মানুষদের মধ্যে সহজে মেলেনা। জাপানের একজন বিখ্যাত শিল্প-রসিক একবার বলেছিলেন যে, "এমন শিল্পী কোনো দেশে পাঁচশো বছরের মধ্যে একটিমাত্রও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।" তবে এ কথাও ঠিক যে, শিল্প ভালো করে বুঝতে হইলে শিল্প-রসিক হওয়া চাই।

আমাদের দেশে প্রথমে ওঁকে নিয়ে সেই গণ্ডগোলই হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ জন্মালেন শিল্পী হয়ে, অথচ এই দেশের লোকেরা কেউ তেমন শিল্প-রসিক নয়। এই হ'ল মহা মুশকিল। ওঁর ছবি দেখে সবাই হাসতো, ঠাট্টা করতো, বলতো যে, এমনি লম্বা লম্বা-হাত পা, এ তো মানুষের মতোই নয়। তিনি অনেক ক'রে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কেউই বুঝতো না। সবাই তাঁকে বিদ্রূপ করতো, অনেকে বলতো লোকটার মাথা খারাপ। কিন্তু ১৯১৪ সালে ফরাসী দেশের যত বড়ো বড়ো শিল্পীরা এক সঙ্গে ঘোষণা করলে যে, এঁর মতো একজন শিল্পী জগতে দুর্লভ। প্রত্যেক দেশের ভালো ভালো শিল্পের মধ্যেই সেই দেশের প্রাণের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়. তাতেই সেই দেশের অন্তরের বিশেষ রকম সৌন্দর্যটি ফুটে ওঠে, এবং সেই সৌন্দর্য দেখতে পেয়েই মানুষের মন আনন্দে ভরে ওঠে। সব দেশেতেই বড়ো বড়ো শিল্পী আছে, কেবল ভারতে এতকাল এমন শিল্পী কাউকে দেখা যায়নি। এবার দেখা গেল এই অবনীন্দ্রনাথকে। ভারতের যা প্রাণের কথা তাই তিনি ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বহু আগেকার দিনে. ভারতের শিল্পও অতি চমৎকার ছিল, এখানকার শিল্পকে গড়ে তোলবার এবং ছবি আঁকবার একটা বিশেষ রকমের ধারা ছিল। আমাদের নিজেদের মনের আনন্দ প্রকাশের যেমন একটা বিশেষ রকমের ধারা আছে, তেমনি সেই আনন্দকে শিল্পে এঁকে দেখবারও একটা ধারা আছে। বহু আগেকার শিল্পীরা সেই ধারাটিকে রপ্ত করেছিল।

তারপরে উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে সে ধারা এ দেশ থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথই তাঁর অপূর্ব প্রতিভার গুণে সেই ধারাটিকে আবার নতুন ক'রে প্রাণদান করলেন। আমরা ওঁর ছবি দেখে ভারতের অন্তরের কথা ভারতের ধারাতেই জানতে পারলাম। এই কথাই বলছিল ফরাসী শিল্পীরা। তখন থেকে এই দেশের লোকের চোখ ফুটলো। তারপরে এখন ওঁর দেখাদেখি আরো অনেক শিল্পী এখানে তৈরি হচ্ছে।

শুধু ছবি আঁকিতেই নয়, সকল দিক দিয়ে শিল্পসৃষ্টি করাই ছিল তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা। সামান্য কথায়, সামান্য কাজেও তাঁর এই গুণটি বেরিয়ে পড়তো। তাছাড়া মনকে আনন্দ দেবার জন্যে যত রকমের দিক আছে, সব দিকেই ছিল তাঁর দক্ষতা। ছোটদের জন্যে কেমন চমৎকার গল্প লিখতেন তিনি তা তো তোমরা সকলেই জানো। এদিকে আবার গান বাজনার দিকেও ছিল অত্যন্ত ঝোঁক। কবি রবীন্দ্রনাথের তিনি খুব নিকট আত্মীয় ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাকা হতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক গানের আসরে তিনি আগের থেকে এসরাজ নিয়ে বসতেন, চমৎকার এসরাজ বাজাতেন। তাছাড়া নাট্যকলাতেও তিনি কম ওস্তাদ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের হাসির বই "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয়ে তিনি তিনকড়ি সেজে এমন কৌতুকের অভিনয় ক'রে দেখিয়েছিলেন যে সেটা যারা দেখেছিল তাদের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল। স্টেজ সাজাতেও পারতেন তিনি চমৎকার। "ডাকঘরের" অভিনয়ে কুঁড়েঘরের চালের উপর পাখি বসিয়ে, আর গভীর বনের দৃশ্যে আঠা দিয়ে জ্যান্ত জোনাকিপোকা এঁটে দিয়ে তিনি অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কথাতেও ছিল শিল্প, কাজেও ছিল শিল্প, সবের মধ্যেই একটু বিশেষ কিছু।

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার নিজের জানা একটা সত্যিকার গল্প বলি। আমি তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করতাম। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে উনি অনবরত তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। একবার তাঁর পায়ে বাত হয়েছিল। বাত হলে গাঁঠে গাঁঠে খুব যন্ত্রণা হয়, সোজা হয়ে চলা কষ্টকর হয়। কিন্তু বাত হলেও তাঁর যাতায়াতের কামাই নেই। একদিন দেখি তিনি মুখটাকে বিকৃত ক'রে খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাঠি ধরে অতি কষ্টে আসছেন। আমি একটু সহানুভূতি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আহা, আপনার পায়ে বাত হয়েছে বুঝি?" তিনি চেয়ারের উপর থপ্ ক'রে বসে প'ড়ে খুব জোরে একটা ফুৎকার ক'রে বললেন—"তোমরা ডাক্তাররা কোনোই কাজের নও, মুখেই কেবল বিজ্ঞান আওড়াও। সামান্য একটা বাতের কষ্ট, তাও তোমরা সারাতে পারো না। কি বলবো, আমি যদি ডাক্তার হতুম, তোমাদের মতো বাজে কথা বলতুম না।" আমি বললাম—

"বাতের আমি খুব ভালো ওষুধ জানি, খেলে আপনার কষ্ট নিশ্চয় সেরে যাবে।" তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেমানুষের মতো বললেন—"কৈ কৈ, দাও তো দেখি, এই বেটাকে তা'হলে জব্দ করি। কিন্তু বাজে কথা হলে চলবে না, সত্যি সেরে যাওয়া চাই। তুমি যদি আমাকে খুশি করতে পারো, তা'হলে তোমাকেও খুশি করবো।" আমি একটু হেসে একখানা কাগজে ওষুধের নামটি লিখে দিলুম।

তারপর থেকে দু'বছর তাঁর সঙ্গে আর মোটে দেখাই হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদেশে কাজেই ওদিকে আমার আর যাওয়া হয়নি। দু'বছর পরে একদিন পয়লা জানুয়ারি। তারিখটা মনে আছে, কারণ সেদিন আমার এক বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। মনটা খুবই খারাপ, মনে হচ্ছে দুনিয়াটা একদম বাজে। হঠাৎ এক পাগড়ি-বাঁধা দরোবান ফিতে-বাঁধা এক পুলিন্দা এনে মস্ত এক সেলাম ঠুকে বললে—"ঠাকুর সাহেব পাঠিয়েছেন।" পুলিন্দা খুলে দেখি তার মধ্যে অপূর্ব একখানি ছবি। সেটি অবনীন্দ্রনাথের নিজের হাতের আঁকা 'মালিনী'র ছবি। মাথার কবরিতে তার বিপুল ফুলের সম্ভার, দুই হাত দিয়ে ধরেও সেই ফুলের প্রাচুর্যকে কিছুতে যেন সামলাতে পারছে না। ছবিটিকে সযত্নে বাঁধিয়েই তিনি পাঠিয়েছেন। দু'বছর আগে একদিন কি বলেছিলেন, সে কথাটি তিনি ভোলেন নি। নিজেই উপযাচক হয়ে ছবিখানি আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, দুনিয়ার রংটাই আমার কাছে বদলে গেল। তাঁর সেই অপূর্ব স্নেহের দানটি এখনো আমার ঘরে টাঙানো আছে।

ইংলা-সনেট : : শ্রীঅমলেন্দু সেন

ইংলা কথাটা কথনও শোনো নি তো? ওটা হচ্ছে ইংরেজী আর বাংলা—এই দুটো শব্দের সন্ধি করলে যা হয়। যেমন, হাঁসজারু। সনেট বলে চৌদ্দ লাইনের পদ্যকে। তাহ'লে ইংলা-সনেট জিনিসটা হলো গিয়ে ইংরেজী অক্ষরে লেখা চৌদ্দ লাইনের বাংলা পদ্য। তার নমুনা পাশে দেওয়া হ'ল পড়তো দেখি! আচ্ছা, পড়বার কায়দাটা না হয় বলে দিচ্ছি। ইংরেজী অক্ষরগুলো পরপর পড়ে যাও। তাতে যে উচ্চারণগুলো পাবে, তা দরকার মত জুড়ে অথবা আলাদা করে নিলেই বাংলা শব্দ হয়ে যাচ্ছে দেখবে। তার মধ্যে দরকার মত যতি-চিহ্নগুলি দিয়ে নিতে হবে, সব যতি-চিহ্ন দেওয়া নেই। এভাবে পড়লে দেখতে পাবে যে, এক বিয়েবাড়ীর কর্মকর্তা কেমন অভ্যর্থনা আর হাঁকডাক লাগিয়েছেন। বাংলা কবিতায় উত্তর আগামী মাসে পাবে।

২০-T L-O T-P T-P, K-R B-A J.
A-E J T-R-O-B S-O! L-A V-J V-J?
P-C-O-J L-N-A-A! M-A-A-T K?
O M-N-E? S-O, L-S-R-E V-G-A?
S-Y-V ! L-M-L-A ? R-A, R-A, KO ?
H-L-E R N-D-T-K S-N-E-A J-O.
B-B-P-C, L-F-L-S-L-I ? R-N-L-E !
S-N-C H-R-E C-C J-N-E-A L-E ?
A-Q-P ? L-S-S-F-L-N-E-C-K ?
R-S-S-M-S-N-A-E ? L-I-T K ?
M-M-T ? R-A A-J L-O-K-C I-E !
R-C-T-K N-F-L-O, I-E L-H-I.
K-H-N-N ? H-A-R-A M-R-O-R-E !
I-A G I-A L-E-G-A B-D.

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভদ্রলোক কিন্তু সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 'তার জন্যে চিন্তা কোরোনা। অসুখবিসুখ সকলেরই হয়। ভালো ডাক্তার-কবরেজ দেখালেই সেরে যাবে। তোমার বাবার নাম কি খোকা? কি করেন তিনি এলাহাবাদে?'

শম্ভু নিজের মৃত বাবার নামটা ঠিকই বলল, 'মনোহর দাস, ওকালতি করেন, নামকরা উকিল ওখানকার।'

ভদ্রলোক মনোহর দাস বলে কাউকে চেনেন কিনা নিজে একটু চিন্তা ক'রে দেখলেন, তারপর বললেন, 'না চিনিনে। এলাহাবাদে আমিও বছর পঁচিশেক আছি। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই জানাশোনা। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আলাপ নেই। এবার গিয়ে আলাপ করব কি বলো?'

শম্ভু নিস্পৃহ-ভঙ্গিতে বলল, 'বেশ তো করবেন।'

ভদ্রলোক একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ওখানে কি তোমাদের নিজেদের বাড়ি আছে? না ভাড়াটে বাড়ি?'

শম্ভু বলল, 'ভাড়াটে বাড়ি।'

ভদ্রলোক বললেন 'হ্যাঁ, বাড়িটাড়ি করা তো সহজ নয়। যা জিনিসপত্রের দাম আজকাল। তাছাড়া পারমিট বের কেরো, এটা করো, সেটা করো, হয়রানির একেবারে চূড়ান্ত। এই তো আমিও কিছু জায়গা কিনে রেখেছি, কিন্তু রাখলে হবে কি। হ্যাঁ, এলাহাবাদে তোমরা আছ কোথায় আজকাল। কোন দিকে বাসা তোমাদের?'

এবার শম্ভু বড় ফাঁপরে পড়ল। এলাহাবাদে জন্মেও সে যায়নি। কোন জায়গার নামও সে জানে না। হঠাৎ কোন্ জায়গার নাম করবে ভেবে পেলনা। আর এ ভদ্রলোকও তা' আচ্ছা আলাপী মানুষ দেখা যাচ্ছে। একেবারে চোদ্দপুরুষের হাঁড়ির খবর না পেলে যেন ওঁর পেটের ভাত হজম হচ্ছে না। কি দরকার বাপু তোমার অত সব কথা জেনে। গাড়িতে তুমিও উঠেছ, আমরাও উঠেছি। বেশ চুপচাপ বসে যাও। অত বক বক করবার কি দরকার তোমার। ভদ্রলোককে নিজেদের বেলেঘাটার কোন গলির মধ্যে পেলে জন্মের মত বকবকানি ঘুচিয়ে দিতে পারত শম্ভু। কিন্তু গাড়ির মধ্যে তো সে সুযোগ নেই।

জবাবটা একটু ভেবে নিয়ে শম্ভু বলল, 'মাত্র কিছুদিন আগে ওঁরা বাড়ি বদলেছেন। নতুন ঠিকানাটা আমাদের জানান নি। আমরা প্রথমে গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠব। সেখানে গিয়ে জেনে নেব।'

ভদ্রলোক একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'ও!' শম্ভুকে যে তিনি সন্দেহ করেছেন তা তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা যেতে লাগল। ভিতরে ভিতরে বেশ ঘেমে উঠল শম্ভু। তারপর একটু বাদে উঠে পড়ে বলল, 'আপনি বসুন, আমি বাথরুম থেকে আসছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা এসো।'

শম্ভু বাথরুমে ঢুকে একটা বিড়ি ধরিয়ে মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগল। ভদ্রলোকের কথার জবাব এর পর থেকে আরো সাবধানে দিতে হবে। তাছাড়া সহজে আর ওঁর কাছে ঘেঁষবে না! ডাকলেও না-শোনার ভান ক'রে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে।

একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ি থামল। কিছু লোক উঠল, নামল। 'চাই চা, গরম চা।' শব্দ প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধারে ছুটে বেড়াতে লাগল।

ভদ্রলোক হঠাৎ বিজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না খোকা। আমার জন্যে এক কাপ চা নাও দেখি। এখান থেকে ডাকলে তো শুনবে না ওরা। নিজেরাই কেবল চেঁচাচ্ছে।'

শম্ভু তার অনেকক্ষণ আগেই ফিরে এসে বন্ধুদের পাশে বসেছে! মৃদুস্বরে বলল, 'ইশ কত বড় নবাবের বেটা নবাব, ওঁর চা এগিয়ে দাও, জলখাবার তৈরী ক'রে দাও, যেন বাঁধা মাইনের চাকর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। খবরদার যাবিনে, তুই যেন শুনতে পাসনি এমনি ভাব ক'রে থাক।'

অমল বলল, 'কিন্তু সেটা কি ভালো হবে। ভদ্রলোকের মনে যদি সন্দেহ হয়েই থাকে নিজেদের চালচলন দিয়েই সে সন্দেহ ঘোচানো দরকার। নইলে শেষে হয়তো একটা গোলমাল হবে।'

শম্ভু মুখ ভেংচিয়ে বলল, 'গোলমাল না ঘোড়ার ডিম হবে, আচ্ছা চাইছে যখন এক কাপ চা, দিয়ে আয় এগিয়ে, কিন্তু খবরদার মুখ খুলবিনে। কালা যদি নাও সাজতে পারিস ওঁর কাছে বোবা সেজে থাকবি বুঝলি? একেবারে জন্ম হাবা।'

বিজু হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর এক গ্লাস চা নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ' বেশ, বোসো।' বলে নিজেই হাত ধরে পাশে বসালেন বিজনকে। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তোমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে বুঝি খুব ভাব?'

বিজু বিব্রত হ'য়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তা দেখেই বুঝতে পারছি। গাড়িতে উঠে অবধি তিনজনের মধ্যে খুব কথাবার্তা গল্পগুজব চলছে।'

বন্ধুর পরামর্শ মত বিজু বোবা সেজে রইল। কোন কথা বলল না।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমরা কিন্তু খুব ডানপিটে ছিলাম। ভাইতে ভাইতে ভাব যেমন ছিল, তেমনি ঝগড়াঝাঁটি বিবাদ-বিসংবাদও কম ছিল না। আমি একবার আস্ত ইট ছুঁড়ে আমার ছোট ভাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। মোটের ওপর রামলক্ষণের চেয়ে কুরুপাণ্ডবের সম্পর্কটাই আমাদের মধ্যে বেশি ছিল। কুরুক্ষেত্র লেগেই থাকত!'

এ-কথা সে-কথায় বেশ গল্প জমে উঠল। ভদ্রলোক একটার পর একটা তাঁর ছেলে-বেলার কাহিনী বলে যেতে লাগলেন। কবে কোন্ জমিদারের বাগান থেকে আম চুরি করতে গিয়ে দারোয়ানের হাতে নাকাল হয়েছিলেন, কাকুতি-মিনতি ক'রে তার শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে এসেও বাবার হাত এড়াতে পারেন নি। ব্যাপারটা জানতে পেরে বাবা তাঁর পিঠে আস্ত এক জোড়া খড়ম ভেঙেছিলেন। সেই মারের দাগ বোধ হয় এখনো তাঁর পিঠে আছে।

বলে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি তোমার বাবার হাতে মারটার খাওনি?'

বিজন বলল, 'কোন দিন না। আমি তো আমি, আমার দাদা তো আমার চেয়েও দুরন্ত—তার গায়েও কেউ হাত তোলেনি। আমাদের চাটুয্যে বাড়িতে ছেলেপুলেকে মার-ধোরের নিয়ম নেই। আমার ঠাকুরদা নিষেধ করে গিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাই নাকি? তোমার ঠাকুরদা তো ভারী ভদ্রলোক ছিলেন তা'হলে। কি নাম ছিল তাঁর?'

বিজন বলল, 'বি. বি. চ্যাটার্জী, কেবল তিনি নন, সংক্ষেপে আমাদের বাড়ির সবাই বি. বি. চ্যাটার্জী।'

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বললেন, 'সত্যি? কিন্তু এই মাত্র তোমার খুড়তুতো না জ্যাঠতুতো ভাই যে ব'লে গেল তাঁর বাবার নাম মনোহর দাস। তা কি ক'রে হয় খোকা?'

বিবর্ণ মুখে বিজন এবার মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে রইল তারপর বলল, 'মানে—মানে—'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন,' 'হ্যাঁ, বলো, মানেটা কি?'

শম্ভু পিছন থেকে বলল, 'এই বিজু, শুনে যাও এখানে। সুটকেসের চাবিটা তাড়াতাড়ি দিয়ে যাও তো।'

বিজু নিষ্কৃতি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল। কিন্তু বন্ধুদের পাশে গিয়ে বসতেই শম্ভু তাকে চাপা-গলায় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠল; 'বড়লোক বাপের ঘরে জন্মে এতকাল বসে বসে শুধু হাঁড়ি হাঁড়ি দুধ ঘি সাবাড় করেছিস। মাথায় এক ফোঁটাও বুদ্ধি জমাতে পারিস নি।'

বিজু বলল, 'কেন কি করেছি।'

শম্ভু বলল, 'কি আবার করবি। সর্বনাশ করেছিস। কি বুদ্ধিমানের ঢেঁকি আমার। আবার আহ্লাদ ক'রে বংশ-পরিচয় দিতে গেছেন। 'আমরা সব বি. বি. চ্যাটার্জী।' কেন বলতে গেলি ও কথা। একটু আগে 'আমি যে বলে এলুম আমরা সব খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই, আমার বাবার নাম মনোহর দাস—তা খেয়াল করলিনে?'

বিজু লজ্জার ভঙ্গিতে বলল, 'তা আমি ভাই কি ক'রে বুঝব—'

শম্ভু বলল, 'তুই আর বুঝেছিস। এখন মজাটা টের পেতে হবে সবাইকে।'

অমল এবার বলল, 'যা হবার তো হয়েই গেছে শম্ভু, আর বকাবকি করে লাভ কি। এখন চুপ কর।'

'তুই আবার আর এক বুদ্ধিমান।' বিজু যা ক'রে এসেছে তারপর কি আর চুপ ক'রে বসে থাকবার জো আছে? দেখছিস না লোকটি কি ভাবে বার বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, আরো তিন চারজন লোক এগিয়ে বসেছে তার কাছে, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছে, লক্ষ্য করছিস সব?'

অমল শঙ্কিতভাবে বলল, 'করছি। ওরা বোধ হয় আমাদের সন্দেহ করেছে।'

শম্ভু বলল, 'বোধ হয় না, তাই।'

অমল আর বিজু অস্ফুট স্বরে বলল, 'তা'হলে তো বড় মুশকিল।' শম্ভু বলল, 'আর এখন থেকেই অমন কাত্‌রাতে সুরু করিসনে। আমাকে ভাবতে দে একটু।'

শম্ভুকে ভাবতে দিয়ে বিজু আর অমল এক পাশে চুপ ক'রে রইল। গাড়ি ছুটে চলতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে বাদে এক একটা ষ্টেশন। কত লোক উঠছে নামছে। সোরগোল চলছে খানিকক্ষণ ধ'রে। তারপর আবার ছুট দিচ্ছে গাড়ি। অমলের চোখে পড়ল রাস্তার ধারে সুন্দর একটি বাড়ির জানলায় একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখখানা প্রায়ই তার মার মত। অমল চমকে উঠল। দামী একখানা শাড়ী পরনে। একগা গয়না। কপালে বড় একটি

সিঁদুরের ফোঁটা। অমন সুন্দর বাড়িতে অমন চমৎকার শাড়ী গয়নায় সাজলে তার মাকেও নিশ্চয়ই আরো সুন্দরী দেখাত। মনে পড়ল তাদের তিন ভাইকে পাশাপাশি ঠাঁই ক'রে ভাতের থালা সামনে এগিয়ে দিয়ে মা বলতেন, 'তোরা বেঁচে থাকলে আমার দুঃখ কি। এত গরীব আর থাকব নাকি আমরা। কত বাড়ি হবে, গাড়ি হবে—'

বড়দা মৃদু হেসে বলত, 'হুঁ, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ-টাকার স্বপ্ন। ডাঁটাচচ্চড়ি খেতে খেতে বাড়ি-গাড়ির কল্পনা!' মা বলতেন, 'তুই থামতো, তখন কি আর ডাঁটাচচ্চড়ি খাব নাকি আমরা। ঘি দুধ মাছ মাংস সব ভালো ভালো জিনিস আসবে বাড়িতে। তিন ভাই যখন যোগ্য হয়ে উঠবি তখন আর কোন দুঃখ থাকবে নাকি—এক ভাই বাড়ি করবি, এক ভাই গাড়ি। আর তুমি, তুমি কি করবে অমল?

মা হাসিমুখে তার দিকে তাকাতেন।

অমলের বয়স তখন অল্প। সাত আট বছরের বেশি নয়। সে জবাব দিয়েছিল, 'আমি তোমাকে শাড়ী কিনে দেব মা।'

মা হেসে বলেছিলেন, 'ওমা, কেবল একখানা শাড়ী? আর কিছু দিবিনে?'

অমল বলেছিল, 'দেব। ভালো ভালো গয়না গড়িয়ে আনব তোমার জন্যে। মুক্তোর হার—'

আর সেই অমল আজ মার একমাত্র সম্বল হার ছড়া চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে। মার মুখখানা মনে পড়ায় বুকের ভেতরটা পুড়ে উঠল অমলের।

শম্ভু এসে আলগোছে কাঁধে হাত রাখল। ফিস ফিস করে বলল, 'এই ওঠ্। সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নে। এখানে নেমে পড়তে হবে।'

অমল অবাক হয়ে বলল, 'সে কি, এলাহাবাদে এসে গেছি নাকি? শম্ভু বলল, 'না, এলাহাবাদ পর্যন্ত আর যাব না। এই বেনারসেই নেবে পড়ব। ভদ্রলোক ঠিক একেবারে পুলিসের গোয়েন্দার মত চোখ রাখছেন আমাদের দিকে। ওঁর মতলবটা ভালো মনে হচ্ছে না। চুপচাপ বসে আছে। হয়তো এলাহাবাদ ষ্টেশনে নেমেই পুলিস ডাকবে, ও আপদকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে লাভ নেই, তার আগেই আমাদের কেটে পড়তে হবে।'

অমল এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'কই সে ভদ্রলোককে দেখছিনে তো।'

শম্ভু বলল, 'এতক্ষণ একেবারে ঠায় কাঠের জগন্নাথ হয়ে বসেছিল। এবার উঠে গেছে পাশের গাড়িতে। কে একজন চেনা লোক এসে ডেকে নিয়ে গেছে। ফের এল বলে। তার আগেই পালানো চাই। বেনারসে আমরা এক রাত্তির হল্ট করব। তারপর কাল ধরব এলাহাবাদের গাড়ি। সেই ফাঁকে কাশীর মন্দির-টন্দিরগুলোও একটু দেখে নেওয়া যাবে।'

প্রস্তাবটা বিজু আর অমল দু'জনেরই বেশ মনে ধরল। গাড়িতে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, কিন্তু পথের সব জিনিস দেখা যায় না। সুযোগ যখন রয়েছে কাশীটা দেখে যেতে ক্ষতি কি। বিছানা সুটকেস হাতে তিন বন্ধু নিমেষের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। (ক্রমশঃ)

অমূলক কাহিনী নয়!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

ছেলে এসে ষষ্ঠীচরণকে ধরলো—'ক্লাস্ সুরু হয়ে গেছে, বাবা, এখনো তুমি আমার বইগুলো কিনে দিলে না? পড়াশুনার ভারী ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু।'

'দে তো। দেখি তোর বইয়ের লিস্‌টি।...নেস্ ফিল্‌ডের গ্রামার, ট্র্যান্সলেশন্ ম্যাহুয়াল, যাদব চক্কোত্তির পাটিগণিত, ব্যাকরণ কৌমুদী...ও, এই সব? এসব তো আমার জানা। আমাদের সময়ও ছিলো। কেবল একটা নতুন বই দেখছি—বাঙালী জাতির ইতিহাস। আচ্ছা, লিস্‌টিট থাক্ আমার কাছে। ব'লে বাবা বইয়ের তালিকাটা নিজের হাতের তলায় রাখেন।

'কবে দিচ্ছো কিনে?' ছেলে তাগাদা লাগায়।

'দেবো রে দেব, এত তাড়া কিসের? এমন ব্যস্ত কেন? স্কুলের ফ্যাংশন্‌টা হয়ে যাক্ না। তারপরে দিলেই হবে।'

'ওব্ বাবা! সে যে অনেক দেরি।' ব্যয়কুণ্ঠিত বাবাকে সে অব্যয়রূপে প্রয়োগ করে।

'আহা, তাতেও আবার আমায় এক গাদা বই দিতে হবে যে! স্কুল কমিটি ধরেছে। আমি হচ্ছি ইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট, আর আমার একটা প্রাইজ থাকবে না? ছেলেরা সবাই আশা করে আছে? তাদের কি আমার কাছে কোনো দাবী নেই? কথাটা আমি ভেবে দেখেছি—'

'তুমি—তুমিও তা'হলে প্রাইজ্ দিচ্ছো বাবা?' বরদা বাবার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।—'দেবে তা'হলে এবার?'

'দিতেই হবে। না দিলে ছাড়বে না।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠ শোনা গেল বাবার—'সবাই বলছে গোবিন্দপুর হাইস্কুলের সভাপতি ষষ্ঠীচরণ ধাড়ার কোনো পুরস্কার নেই এ কেমন কথা? আমি যতো বলি যে সভাপতি হয়ে আপনাদের সেবা করছি—সেবা করার এই সুযোগ পেয়েছি এই তো আমার পুরস্কার। চরম পুরস্কার। কিন্তু তারা তা শুনছে না মোটেই। বলছে, এ তো গেল আপনার পুরস্কার—কিন্তু আপনার পুরস্কার কই? তার মানে, আমাদের পুরস্কার কোথায়? নাও ঠ্যালা!'

'তুমি কী পুরস্কার দেবে?'

'ছাখ্ না, বইয়ের তালিকা দিয়েছে একখানা। এইসব আমায় দিতে হবে।' একটা পুরস্কারেই গাদাখানেক বই।—ছাখ্ না।' এই বলে তালিকা দেখে তিনি আওড়াতে থাকেন—"খেজুর আঠির ভেঁপু,' 'হাই হাই,'—কী বইরে বাবা! এছাড়াও তারপরে 'রাত্রি বেলার গল্প,'

'তালগোল,' ছেলেদের গপ্‌পো যে তালগোল লাগান হবে এতো জানা কথা—তা কি আবার বই লিখে বলতে হয়? তারপরে ফের এই গ্যাখ, 'প্রেমহরি মিত্রের সেরা গল্প, হরকুমারের সেরা গল্প, রাজীব লোচনের…' সব সের সের ওজনের—ভারী ভারী বই—বেশ দামীই হবে মনে হয়। এরপরে আধ সের, এক ছটাকী, কাচ্চা বাচ্চা আরো বিস্তর আছে।' তালিকার মধ্যে তারা বিস্তারিত থাকে—সেগুলি বলা তিনি বাহুল্য বোধ্‌ করেন।

'তুমি দেবে এ-সব?' বরদাচরণের চোখ বড়ো বড়ো হয়। এমন বাবাকে সে কখনো গ্যাখেনি। বাবার এহেন বরদাতারূপ সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

'দিতেই হবে। না দিলে কি রেহাই আছে?' দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে বাবার। 'ছাড়ান্‌ আছে আমার?'

'দাও না, বেশ তো দিলে খুব নাম বেরুবে তোমার। তা, আমার পড়ার বইটই না হয় তুমি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের পরেই আমায় দিয়ো।' পৈতৃক খ্যাতিলাভের খাতিরে ছেলে নিজের স্বার্থত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। অম্লানবদনে নিজের দাবী মুলতুবি রাখে।

'হ্যাঁরে বদ্রু, আবৃত্তি-টাবৃত্তি আসে তোর?' বাবা জিগেস করেন হঠাৎ।—'রেসিটেশন্‌ করতে পারিস্‌?'

'কেন বাবা?'

'তাই জিগেস করছি। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কারটাই দেবো কিনা আমি। তাই ভাবছিলাম, তুই যদি ঐ প্রতিযোগিতায় নাম দিস্‌, নামতিস্‌ যদি, তা'হলে ঘরের জিনিসগুলো ঘরেই আসতো—বেঘোরে যেত না। বইগুলো তুই পেতিস্‌ তা'হলে। বেহাতে যেত না নেহাৎ।'

'প্রথম হতে পারলে তো? সে আর আমায় হতে হয় না। সোমনাথ আছে, চিত্রক আছে, কৈলাস রয়েছে—তাদের সঙ্গে আবৃত্তিতে কে পারবে? তারা সব এক নম্বর!'

বাবার কথায় বরদা তেমন উৎসাহ পায় না।

'আরে, প্রাইজ তো দেব আমি। আমার পুরস্কার আমিই দেব। বিচার করবার ভার আমার। আমি যদি তোকে দিই—কে আট্‌কায়? তুই তা'হলে আবৃত্তিতে নামছিস্‌, কেমন?

নামছিস্‌ বল্লেই নামা যায় না। এ কিছু নামতা-আবৃত্তি নয়—দুয়েক্কে দুই, দু-দুগুণে চার নয়। ধারাপাত আওড়ানো নয়। শ্রীমান্‌ বরদাচরণ ধাড়াকে পাত করলেও তার গলা থেকে সে-বস্তু গলানো যাবে কিনা সন্দেহ। রীতিমতন একখানা বক্তৃতা। গলানোর পরের কথা, ওগ্‌লানো, কিন্তু তার আগে গেলানোই আগে দায়। লম্বা-চৌড়া একটা বক্তৃতা সে মুখস্থ করতে পারলে তো? একটানা বলো যাওয়া তো তার পরের ধাক্কা।

বাবা কিন্তু নাছোড়বান্দা। উৎসাহদানের তাঁর কার্পণ্য নেই—'যেমন তেমন করে তুই, আউড়ে যাবি তা'হলেই হবে। আওড়ানো নিয়ে কথা। বিচারের ভার তো আমার ওপর। আমার প্রাইজ আমি যাকে খুশি দেব। কে কী বলতে পারে? নিজের ছেলে বলে কি রেয়াৎ করতে হবে নাকি? তুই কিচ্ছু ভাবিস্‌নে, মুখ বুজে তুই বলে যাস্, আমি চোখ বুজে দিয়ে দেব। চক্ষুলজ্জা রাখলে, কি, মুখচোরা হয়ে থাকলে—কখনো কোনো কাজ হয়। তা, বড়ো কাজ, মেজ কাজ আজ ছোট কাজ—যে কাজই বল্।'

বরদাচরণ ভাবে। ওর অবৃত্তি, আর ওর বাবার প্রবৃত্তি। এই দুয়ের যোগে, অযোগ্য হলেও, প্রাইজগুলো ওর বরাতে লাগতে পারে। এমন অঘটন কি হয় না? যেমন করে ঠাণ্ডা লাগে, সর্দি লাগে, খিদে লাগে, তেম্‌নি করে—অভাবিত ভাবে—প্রাইজ লাগা কি এতই অসম্ভব? আর ঐ বইগুলোর—অমন সব বইয়ের কথা ভাবলে লোভ হয় সত্যিই!

বরদাচরণ বাবার কথামত আচরণ করিতে রাজী হয়। ষষ্ঠীচরণ ধাড়া প্রাইজ দিচ্ছেন এ-সংবাদে সাড়া পড়ে গেল সারা ইস্কুলে। তস্যপুত্র বরদাচরণও আবৃত্তিতে এবার নাম দিয়েছে, এ খবরও জানতে বাকী থাকলো না কারো। সেই সঙ্গে, ষষ্ঠিচরণের পুরস্কার যে বরদাচরণের মাঠে মারা যাবে—এই গুপ্ত কথাও কানাকানি হয়ে রটে গেল।

সোমনাথ, চিত্রক, কৈলাসের কানেও গেল কথাটা। তারাও কিছু চিত্রপুত্তলিকার মত খাড়া থাকবার ছেলে নয়। সোমনাথ বল্লে—'দেখাচ্ছি মজা। দেওয়াচ্ছি পুরস্কার। দাঁড়া।'

'দাঁড়াতে হবে না। ষষ্ঠীচরণের ঠ্যাং ভেঙে দেব। তবে আমার নাম কৈলাস। লাশ যদি না বানাই ওকে তো কী বলেছি!'

চিত্রক বল্লে—'না না, ওসব নয়। মারধোরের মধ্যে আমি নেই বাবা। আমি অন্য মৎলব ঠাউরেছি। শোন্ বলি—'

পুরস্কার বিতরণের দিন।

বরদাচরণ 'চন্দ্রগুপ্ত' বই হাতে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার মত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, বাড়ির পাশে আসতেই চিত্রক তাকে ডাকলো।

'সুরু হবার এখনো ঢের দেরি, আয়, চারটি মুড়ি খেয়ে যা।'

'না ভাই, এখনো আমার মুখস্থ হয়নি ভালো।'

'হয়ে যাবে'খন। আমি তোকে পেছন থেকে প্রম্‌প্‌ট করবো না হয়। আর, তোর বাবাই তো পুরস্কার দেবেরে, তোর আবার ভাবনা কি সের? চিত্রক অভয় দেয়।

'তা বটে। তবে দে দুটি মুড়ি, খাই। তেলমাখা মুড়ি খেতে বেশ লাগে।' বরদা মুড়ির সঙ্গে লাগে।

'তার সঙ্গে আবার দ্যাখ এই।—মূলো।' চিত্রক আরো দেখায়: 'মূলোর কুচি দিয়ে মুড়ি খেয়েছিস্ কখনো? খেয়ে দ্যাখ, ভুলতে পারবিনা জীবনে।'

সত্যি কথাই চিত্রকের। একেবারে আমূল সত্যি। মূলো দিয়ে তেলমাখা মুড়ির তুলনা হয় না। বেশ লাগে বরদার। চিত্রক একটু ভেতরে গেছল, সেই ফাঁকে আধখানা মূলো আর এক ধামা মুড়ি একাই সে শেষ করে—ওর বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে।

মুড়ি ফুরোতে না ফুরোতেই ইস্কুলের ঘণ্টা শোনা যায়। সভা সুরু হবার ঘোষণা। বই ফেলে মূলো চিবোতে চিবোতে বরদা দৌড়য়।

ইস্কুলের প্রাঙ্গণে বিরাট সভা। ছেলেরা বসেছে সারি দিয়ে। ছেলেদের অভিভাবকরাও এসেছেন। সামনের সারিতে বসেছেন শিক্ষকরা, আর মহকুমার মান্যগণ্য যতো অতিথি। প্রধান শিক্ষকের পাশের আসনে সভাপতি শ্রীষষ্ঠীচরণ ধাড়া। কলকাতার থেকে আমন্ত্রিত হয়ে নামজাদা এক সাহিত্যিকও এসেছেন—সেই ধাপ্ধাড়া গোবিন্দপুরে। প্রধান অতিথিরূপে তিনি শোভ বাড়িয়েছেন সভার।

বইয়ের গাদা বগলে নিয়ে বসেছেন সভাপতি মশাই। একগাদা বই—রঙচঙে কাগজের মোড়কে পরিপাটিরূপে প্যাক্ করা। বইগুলি দেখবার কৌতূহল প্রকাশ করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু ষষ্ঠীবাবু বাধা দিয়েছেন—'চমৎকার করে বাঁধা রয়েছে, থাক্ না! কী হবে প্যাকিং খুলে? কী আর দেখবেন? দেখবার কিছু নেই মশাই। যতো সব তালগোল! আর, খেঁজুর আঁঠির ভেঁপু। ভেঁপু, কিন্তু বাজে না। একেবারে বাজে। যাচ্ছে তাই!'

বলতে বলতে সুরু হয়ে গেছে প্রতিযোগিতার উদ্যোগ। সভার পুরোভাগে বাঁশ বেঁধে ষ্টেজের মতন খাড়া করা হয়েছিল, তাতেই একটার পর একটা ছেলে এসে নিজেদের বাহির করে—জাহির করে নিজেদের। হাত পা নেড়ে নিজের নিজের গুণপণা দেখাতে সুরু করে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পালা এলো সব শেষে। সভার শেষদিকে। আর, সবার শেষে বরদার পাল্লা।

'স-স-সত্য সেলুকাস্…' বলে বরদা আরম্ভ করে—করেই তার মনে হয় তিন সত্যি দিয়ে সুরু করা কি ঠিক হোলো দোনামোনায়? গোড়া ধরে সে টান্ মারে আবার—

'স-সত্যি সেলু-লু-লু-লু-লু—' আওড়াতে গিয়ে তার চোখ কপালে উঠে যায়, কিন্তু লুকাস যে কোথায় লুকায়—তার পাত্তা মেলে না।

'ইস্, ছেলেটা লু বইয়ে দিলো দেখছি।' আপন মনে হু হু করেন ষষ্ঠীচরণ—'দিল্লির লু এনে ফেল্লে আমাদের গোবিন্দপুরে।' কিন্তু লুতাতন্তু ভেদ ক'রে বরদা বেরয়—'সেলুকাস্—কী—কী—কী-কীক্ …' (ও নিজে নয়, ওর পেটের ভেতর থেকে কে যেন Kick মারে—আচম্‌কা মারটা খেয়ে সে থতমত খায়—নতুন করে ফের তার সত্যগ্রহ হয়।)

'স—স-• সত্য সে—সে—সে—লুকাস্—কী—কী—বি—বি—-বি—-বি—হিক্…'

কিক্ নয়, হিক্। হিক্ই বটে এবার। হিক্কাই ঠিক, কিন্তু এর ত' একটা বিহিত করতে হয়। কিন্তু কী করবে, হিকিয়ে-ঢিকিয়ে চলতেই হয়—

'…বিহিক্—-চি-চি—চিহিক্‌ত্র এ দেশ—হি—হিক্!' হিক্ করে সে দেশে এসে দাঁড়ায়। না, তার সন্দেহ অমূলক নয়, হতভাগা চিত্রকই এই

ষষ্ঠিচরণ মুখব্যাদন ক'রে কর্ণবিদারী বক্তিমা করছেন

চিত্তিরের জন্যে দায়ী। সেই একাণ্ডের মূল। অতগুলো মূলো খাওয়া তার ঠিক হয়নি। সেই জন্যেই এখন এই হেঁচ্‌কি উঠচে—হেঁচ্‌কির সঙ্গে মূলোর ঢেঁকুর দিয়ে হিক্কার-ধ্বনি তার কানে ধিক্কার-ধ্বনির মতই বাজে। আর, তার চারধারে সভাসুদ্ধ সবার অট্টহাসি ভেঙে পড়ে। দেশ-এর নিকটে. আসা হেঁচকি নিরুদ্দেশে না যেতেই সারা দেশের হাসি টেনে আনে—হাঁচ্‌কা টানে।

প্রতিযোগিতার পালোয়ানির পর পুরস্কার দানের পালা। পালাক্রমে এক একটি ছেলে সভাপতির সামনে এসে দাঁড়ায়, এসে তাঁর হাত থেকে নিজের পুরস্কার নেয়, নিয়ে পালায়। আবৃত্তি

পুরস্কারটা বরদাই পায়। ষষ্ঠীচরণের অপত্য-স্নেহে—সভ্যাপত্য-স্নেহে বাধা দেয়া যায় না। শুধু প্রধান অতিথি মশায় একটু আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন—এটা কী করলেন? এটা কি ঠিক হোলো? এ কেমন ধারা?

সভাপতি ভরাট গলায় জবাব দিয়েছেন—'বরদাচরণ ধাড়া। তাছাড়া কে? ষষ্ঠীচরণ ধাড়ার ছেলে। আপনি কলকাতার আম্‌দানি, এ অঞ্চলে এই প্রথম আসচেন, এখানকার' ধাড়াদের কী জানবেন? কিন্তু চমৎকার করেছে মশাই ছেলেটা, কী বলেন? খালি একটু তোতলামি তুলে আর তার সঙ্গে সামান্য হেঁচ্‌কি মিশিয়ে একেবারে নতুন ধারার রেসিটেশন বানিয়েছে। নয় কি? এরকমটি আর শোনা যায়নি কখনো। গুরুগম্ভীর বিষয়কে এমন বিসদৃশ করে তোলা বাহাদুরী বই কি! হাসির দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করে, এত সহজে দেশের বৈচিত্র্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে এর আগে আমি আর কাউকে দেখিনি। আবৃত্তিটা খুব বাস্তবানুগ, কী বলেন?'

প্রধান অতিথি কিছু বলেন না। গোবিন্দপুরে এসে গোঁয়ারতুমি করার মানে হয় না। ধানবাদে গিয়ে চাল মারার মতই বেকুবি।

চক্‌চকে কাগজে পরিপাটি করে মোড়া বইয়ের প্যাকেটটা হাতে পেয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফেরে বরদা। ঝক্‌ঝকে বইগুলির স্বপ্নে বিভোর হয়ে। এখুনি সে বইগুলির মধ্যে ডুব মারবে, হাবুডুবু খাবে গল্পগুলির মধ্যে। চিল কোঠায় গিয়ে খিল্ এঁটে সে মোড়ক খোলে। বুক তার দুরদুর করে আশায়—আনন্দে—উত্তেজনায়।

বইয়ের ঘোমটা খুলতেই চম্‌কে ওঠে। অ্যাঁ? বই? হ্যাঁ, বই-ই বটে। তারই বই যে, তাতেও কোনো ভুল নেই। কিন্তু, এ কী বই? বই হয়েও যেন বই নয়—বইয়ের মত নয়। এসব বই তো সে আশা করেনি। অবশ্যি—এ-সবও—এর সবই সে চেয়েছিল বটে—তার চাওয় বই-ই—কিন্তু এমন অবাঞ্ছিতভাবে এদের আবির্ভাব যেন তার আকাঙ্ক্ষিত নয়।

হতাশ হয়ে সে শুয়ে পড়ে—চিল্-কুঠরির ভুঁয়ে—ধুলো-মাটির মধ্যে। আর, বইগুলি তার হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে—ছড়িয়ে থাকে—নেস্‌ফিল্‌ডের গ্রামার, যাদব চক্রবর্ত্তীর পাটিগণিত, কে, পি, বোসের অ্যাল্‌জেব্‌রা, জিওমেট্রি, ট্রিক্‌নোমেট্রি, ব্যাকরণ-কৌমুদী, আর—আর—

আর, বাঙালী জাতির ইতিহাস। আরেক ইতিহাস!

টেষ্ট-ক্রিকেটে ভারতীয় ও বিদেশী

কয়েকজন খেলোয়াড়ের পরিচয়

ভারতীয় দল

বিজয় হাজারে—ভারতীয় দলের অধিনায়ক। জন্ম মার্চ ১১, ১৯১৫ সাল। তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য 'কভার ড্রাইভ'। তিনি একজন মিডিয়াম পেস্‌ড অফ্‌-ব্রেক বোলার। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় দল ১৯৪৯-৫০ সালে

বিজয় হাজারে

প্রথম কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় 'রবার' লাভ করে। রঞ্জিট্রফির খেলায় ৪র্থ উইকেটের জুটিতে হাজারে—গুল মহম্মদ ৫৭৭ রান ক'রে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪র্থ টেষ্টের উভয় ইনিংসে শতরান (১১৬ ও ১৪৫) করেন যা কোন ভারতীয় খেলোয়াড় সরকারী বা বে-সরকারী টেষ্টে করতে পারেননি। এবছরের দিল্লীর ১ম টেষ্ট ম্যাচ নিয়ে তিনি এপর্যন্ত ১৫টা সরকারী টেষ্ট খেলেছেন—৩ (বঃ ইংলণ্ড) ১৯৪৬; ৫ (বঃ অষ্ট্রেলিয়া) ১৯৪৭-৪৮; ৫ (বঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) ১৯৪৮-৪৯; ২ (বঃ ইংলণ্ড) ১৯৫১। দিল্লীর প্রথম টেষ্টে তাঁর নট আউট ১৬৪ রান ভারতীয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। এছাড়া তিনি মার্চেণ্টের জুটিতে ২য় উইকেটে ২১১ রান ক'রে ভারতীয় দলের পক্ষে টেষ্টের যে কোন উইকেটের রেকর্ড পার্টনারসীপ রান করেন। এ পর্যন্ত সরকারী টেষ্টে ভারতীয় দলের পক্ষেই তিনি সর্বাধিক ৪টি সেঞ্চুরী করেছেন।

বিজয় মার্চেণ্ট—জন্ম অক্টোবর ১২, ১৯১১ সাল। ব্যাটিংয়ের বিশেষতঃ 'কাট এবং হুক'। তাঁর নিখুঁত glance এবং লেগে বল পাঠাবার ভঙ্গিমা দর্শনীয়। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি নেতৃত্বের ভার পেয়েও অষ্ট্রেলিয়া সফরে যাননি এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচ খেলেননি। ইংলণ্ড সফরে টেষ্টের

ব্যাটিংয়ের গড়পড়তায় ১ম এবং উভয় দেশের গড়পড়তায় ৩য় স্থান পান। ইংলণ্ডের বিপক্ষে একমাত্র তিনিই দলের পক্ষে সব থেকে বেশী ৩টি সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯৩৬ সালে তিনি মুস্তাক আলীর জুটিতে ১ম উইকেটে ২০৩ ক'রে দলের পক্ষে রেকর্ড পার্টনারসীপ রান করেন। রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতায় তাঁর একাধিক রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এ পর্যন্ত ১০টি সরকারী টেষ্ট খেলেছেন এবং সবগুলিই ইংলণ্ডের বিপক্ষে। ১৯৩৭ সালে ক্রিকেট খেলার প্রামান্য পুস্তক 'Wisden' কর্তৃক তিনি বছরের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নামের তালিকায় স্থান পান।

ভিন্নু মানকড়—জন্ম এপ্রিল ১২, ১৯১৭। একজন চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড়। ডানহাতে

ভিন্নু মানকড়

ব্যাট করেন এবং ন্যাটা স্লো-স্পিন বোলার ১৯৩৭-৩৮ সালে লর্ড টেনিসন দলের বিপক্ষে তিনি বে-সরকারী টেষ্টের গড়পড়তায় ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে প্রথম স্থান পান। ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ড সফরে ১,০০০ রান ক'রে এবং ১০০টা উইকেট নিয়ে 'অল রাউণ্ডার' খেতাব পান। ঐ বছরের সফরে টেষ্টের বোলিং এভারেজে ২য় এবং প্রথমশ্রেণীর খেলায় ১ম স্থান লাভ করেন।

১৯৪৭-৪৮ সালের অষ্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে ৩য় স্থানে থাকেন। ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগের গড়পড়তা তালিকায় মানকড় প্রথম স্থান নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসেন। ১৯৪৭ সালের Wisden পুস্তকে 'Five cricketer's of the year' এই নামের তালিকায় স্থান পান।

পলি উমরীগড়—জন্ম মার্চ ২৮, ১৯২৬। একজন চৌকস খেলোয়াড়। ১৯৪৮ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নট আউট ১১৫ রান করেন ফলে তিনি দ্বিতীয় টেষ্টে নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে প্রথম কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে ৫টা টেষ্টের ৮ ইনিংসে মোট ২৭৬ রান করেন, সর্বোচ্চ ৬৭ রান। ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে প্রথম স্থান পেয়ে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে আসেন। ১৯৫০-৫১ সালে ২য় কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে ৯ ইনিংসে মোট ৫৬২ রান করেন, সেঞ্চুরী

১৩০ এবং ১১০ ; ক'লকাতায় ৩য় টেষ্টে ৯৩ রান করেন। ব্যাটিংয়ের গড়পড়তায় ২য় স্থান

পলি উমরীগড়

পান। তিনটি উইকেট পান ১১৭ রানে।

দাত্তু ফাদকার—ব্যাটসম্যান এবং ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার। ভারতবর্ষের পক্ষে টেষ্টে তাঁকে দিয়েই বোলিংয়ের সূচনা করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেষ্টে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন—খেলা ৪টে, ইনিংস ৮টা, নট আউট ২ বার, মোট রান ৩১৪, সর্বোচ্চ রান ১২৩ এবং গড়পড়তা ৫২.৩৩। বোলিং এভারেজে ২য় স্থান পান ২৫৪ রানে ৮টা উইকেট নিয়ে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে টেষ্ট খেলায় ব্যাটিং এভারেজে ৪র্থ এবং বোলিংয়ে ২য় স্থান পান। এ পর্যন্ত ৯টা সরকারী টেষ্ট খেলেছেন—৪ (বঃ অস্ট্রেলিয়া), ৪ (বঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) এবং ১ (বঃ ইংলণ্ড)—১৯৫১। প্রথম কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে ৫টা টেষ্ট ম্যাচ খেলে মোট ৩৭৪ রান এবং এক ইনিংসে সর্বাধিক ১১০ রান করেন। বোলিংয়ে দলের পক্ষে সর্বাধিক ২১টা উইকেট পেয়ে গড়পড়তা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পান। ২য় কমনওয়েলেথ দলের বিপক্ষে টেষ্টের ৯ ইনিংসে মোট ২৩৪ এবং এক ইনিংসে সর্বাধিক ৬১ রান করেন, স্থান ৪র্থ।

হেমু অধিকারী—ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডিংয়ে সুদক্ষ। তাঁর ব্যাটিংয়ে বৈশিষ্ট্য কাট এবং গ্লান্স, এ ছাড়াও তাঁর ড্রাইভ দর্শনীয়। এ পর্য্যন্ত ১২টা সরকারী টেষ্টম্যাচ খেলেছেন—৫ (বঃ অস্ট্রেলিয়া) ১৯৪৭-৪৮, ৫ (বঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১৯৪৮-৪৯ এবং ২ (বঃ ইংলণ্ড) ১৯৫১। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে দিল্লীতে তাঁর প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী করেন এবং শেষ দিন সারভাতের জুটিতে দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। টেষ্টে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তায় ৫০ রানের উপর দাঁড়ায়। প্রথম কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে ৯ ইনিংসে মোট ৩৪১ রান, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৯৩ রান এবং এভারেজ ৫৬.৮৩ করে ৩য় স্থান পান। দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে টেষ্টে খুব ভাল ফল দেখাতে পারেননি, ৫ ইনিংসে মোট ৯২ রান।

লালা অমরনাথ—জন্ম ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১১। অষ্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন। এ মরসুম বাদ দিয়ে সরকারী টেষ্ট খেলেছেন ১৬টি—৩ (বঃ ইংলণ্ড) ১৯৩৩-৩৪, ৩ (বঃ ইংলণ্ড) ১৯৪৬, ৫ (বঃ অষ্ট্রেলিয়া)

১৯৪৭-৪৮, ৫ (বঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) ১৯৪৮। ভারতীয় দলের পক্ষে টেষ্টে প্রথম সেঞ্চুরী ১১৮ রান করেন, তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেষ্ট খেলতে নেমে। ক্রিকেট খেলায় তাঁর ১১৮ রানই সর্বোচ্চ। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় ৩৬৬ রানে ১৩টি উইকেট পেয়ে প্রথমস্থান অধিকার করেন।

সি টি সারভাতে—জন্ম জুলাই ২২, ১৯২০। চৌকস খেলোয়াড়। এ পর্য্যন্ত ৯টা সরকারী টেষ্টম্যাচ খেলেছেন—১ (বঃ ইংলণ্ড) ১৯৪৬, ৫ (বঃ অস্ট্রেলিয়া) ১৯৪৭-৪৮, ২ (বঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১৯৪৮ এবং ১ (বঃ ইংলণ্ড) ১৯৫১। ইংলণ্ড সফরে তিনি এবং স্যুঁটে ব্যানার্জির ১০ম উইকেটের জুটিতে ২৪৯ রান ক'রে ইংলণ্ডের মাটিতে প্রথম শ্রেণীর খেলায় রেকর্ড স্থাপন করেন। স্কট্ল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩০ রানে ৫টা উইকেট পান, তার মধ্যে একটা হ্যাট-ট্রিক। অস্ট্রেলিয়াতে ৫টা টেষ্টে মোট ১০০ রান—কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মারাত্মক বলের মুখে ৩য় টেষ্টে তিনি নির্ভীকভাবে খেলে মানকড়ের সঙ্গে ১ম উইকেটের জুটিতে দলের ১২৪ তুলতে সাহায্য করেন।

এম, সি, সির দল

এখানে আমরা এম, সি, সির দল, যাঁরা ১৯৫১-৫২তে ভারতে ক্রিকেট-খেলতে এসেছেন, তাঁদের খেলার বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হোল —

নাইজেল হাওয়ার্ড (ল্যাঙ্কেসায়ার)

—এম সি সি দলের অধিনায়ক। জন্ম ১৮ই মে, ১৯২৫। সুদক্ষ ফিল্ডার এবং ব্যাট্স্‌ম্যান।

জন্ রবার্টসন (মিডলসেক্স)—জন্ম ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭। চটকদার ব্যাটসম্যান এবং যেকোন জায়গায় ফিল্ডিং করতে পারেন। অফ্-ব্রেক বলও দিতে পারেন। ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেট খেলায় তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এখানে আসার আগে ইংলণ্ডের পক্ষে ৬টা টেষ্ট ম্যাচ খেলেছেন। টেষ্টে তাঁর সেঞ্চুরী ২টো—১২১ (বনাম নিউ জিল্যাণ্ড) এবং ১৩৩ (বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ)।

জে ব্রেন ষ্ট্যাথাম (ল্যাঙ্কাসায়ার)—জন্ম ১৭ই জুন, ১৯৩০। ফাষ্ট বোলার। এ সফরের আগে মোট ৩টে টেষ্ট খেলেছেন—২টো (বঃ দক্ষিণ আফ্রিকা) ১৯৫১ এবং ১টা (বঃ নিউ জিল্যাণ্ডে)—১৯৫১।

ডোনাল্ড বি কার (ডার্বিসায়ার)—দলের সহ-অধিনায়ক। জন্ম ২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৬। চৌকস খেলোয়াড়। ন্যাটা শ্লো বোলার কিন্তু ডান হাতে ব্যাট করেন।

ফ্রেড রিজওয়ে (কেণ্ট)—জন্ম ৮ই আগষ্ট, ১৯২৩। মিডিয়াম ফাস্ট বোলার এবং দক্ষ ফিল্ডার। গত বছর দ্বিতীয় কমনওয়েল্থ দলের সঙ্গে ভারত সফরে আসেন।

ডোনাল্ড কেনিয়ন (ওরসেস্টারসায়ার) —জন্ম ১৫ই মে, ১৯২৪। নিজ দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান।

টম্ ডব্লুউ গ্রেভ্নী (গ্লসেষ্টারসায়ার) —জন্ম ১৬ই জুন, ১৯২৭। চটকদার ব্যাটসম্যান; নিখুঁত ফিল্ডিং করেন। একটা টেষ্ট খেলেছেন, এবছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩য় টেষ্ট।

আর টি স্পুনার (ওয়ারউইকসায়ার) —জন্ম ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯১৯। উইকেট-কিপার এবং ন্যাটা ব্যাটস্ম্যান। গত বছর দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে ভারত খেলতে আসেন।

আর টি স্পুনার

এ্যালেন ওয়াটকিন্স (গ্লামর্গান)—জন্ম ২১শে এপ্রিল, ১৯২২। শক্তিশালী ন্যাটা ব্যাটসম্যান। এ সফরের আগে মোট ৭টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছেন। টেষ্ট সেঞ্চুরী ১১১ রান; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪র্থ টেষ্ট, ১৯৪৮-৪৯।

ম্যালকম হিল্টন (লাঙ্কাসায়ার)—জন্ম ২রা আগষ্ট, ১৯২৮। ন্যাটা স্লো-স্পিন বোলার। ১৯ বছর বয়সে ১৯৪৮ সালে ম্যাঞ্চেষ্টারে ডন্ ব্র্যাডম্যানকে একই খেলায় উভয় ইনিংসে আউট ক'রে রাতারাতি খ্যাতি-লাভ করেন। এ সফরের আগে ২টি টেষ্ট খেলেছেন—১টি (বঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) এবং ১টি (বঃ দক্ষিণ আফ্রিকা) ১৯৫১।

ম্যালকম হিলটন

ডেরিক শ্যাক্‌লটন (হাম্পসায়ার)—জন্ম ১২ই আগষ্ট, ১৯২৪। মিডিয়াম ফাষ্ট বোলার, ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডার। এ সফরের

ডেরিক শ্যাক্‌লটন

আগে ২টি টেষ্ট খেলেছেন। গত বছর দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে ভারত সফরে আসেন।

ডি ভি ব্রেনান (ইয়র্কসায়ার)—জন্ম ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২০। উইকেট-কিপার এবং ব্যাটসম্যান। এ সফরের আগে মোট ২টি টেষ্ট খেলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

সিরিল পুল (নটিংহামসায়ার)—জন্ম ১৩ই মার্চ, ১৯২১। ন্যাটা ব্যাটসম্যান এবং সুদক্ষ ফিল্ডার। আইকিনের শূন্য স্থানে দলভুক্ত হয়েছেন। ফুটবলও খেলেন।

ফ্র্যাঙ্ক লসন (ইয়র্কসায়ার)—জন্ম ১লা জুলাই, ১৯২৫। চটকদার খেলোয়াড়। লেন হাটনের খেলার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। এ সফরের আগে ২টি টেষ্ট খেলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৫১ সালে।

রয় ট্যাটারসাল (ল্যাঙ্কাসায়ার)—জন্ম ১৭ই আগষ্ট, ১৯২২। ডানহাতে অফ্‌-ব্রেক বল করেন ; স্পিন বলও দিতে পারেন। দলের মধ্যে সব থেকে লম্বা। এ সফরের আগে মোট ৯টি টেষ্ট খেলেছেন—২টি (বঃ অষ্ট্রেলিয়া) ১৯৫০-৫১ ; ২টি (নিউজিল্যাণ্ড) ১৯৫১ ; ৫টি (বঃ দক্ষিণ আফ্রিকা) ১৯৫১।

এড্‌ লেডবিটার (ইয়র্কসায়ার)—জন্ম ১৫ই আগষ্ট, ১৯১৭। ডান হাতে ব্যাট করেন এবং লেগব্রেক গুগলী বল করেন। ফিল্ডিং খুব ভাল করতে পারেন। অসুস্থ রোডসের শূন্যস্থানে দলভুক্ত হয়েছেন। এখনও কাউন্টি ক্যাপ পাননি।

(ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড : টেষ্ট ক্রিকেটের ফলাফল)

১৯৩২-৪৬

স্থান	বৎসর	ইংলণ্ড জয়ী	ভারত জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংলণ্ড	১৯৩২	১	০	০	১
ভারতবর্ষ	১৯৩৩-৩৪	২	০	১	৩
ইংলণ্ড	১৯৩৬	২	০	১	৩
ইংলণ্ড	১৯৪৬	১	০	২	৩
	মোট :	৬	০	৪	১০

ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

ইংলণ্ড—৬

(১) বি ভ্যালেণ্টাইন—১৩৬ (১ম টেষ্ট, ১ম ইঃ, বোম্বাই, ১৯৩৩—৩৪)
(২) সি, এফ ওয়াল্টার্স—১০২ (৩য় টেষ্ট, ২য় ইঃ, মাদ্রাজ, ১৯৩৩—৩৪)
(৩) ডবলিউ আর হ্যামণ্ড—১৬৭ (২য় টেষ্ট, ১ম ইঃ. ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৩৬)
(৪) ডবলিউ আর হ্যামণ্ড—২১৭ (৩য় টেষ্ট, ১ম ইঃ, ওভাল, ১৯৩৬)
(৫) টি, এস, ওয়াঙ্গিংটন—১২৮ (৩য় টেষ্ট, ১ম ইঃ, ওভাল ১৯৩৬)
(৬) জি, হার্ডষ্টাফ—২০৫ (১ম টেষ্ট, ১ম ইঃ, লর্ডস ১৯৪৬)

ভারতবর্ষ—৪

(১) লালা অমরনাথ—১১৮ (১ম টেষ্ট, ২য় ইঃ, বোম্বাই. ১৯৩৩—৩৪)
(২) ভি, এম, মার্চেণ্ট—১১৪ (২য় টেষ্ট, ২য় ইঃ, ম্যাঞ্চেষ্টার ১৯৩৬)
(৩) মুস্তাক আলি—১১২ (২য় টেষ্ট, ২য় ইঃ, ম্যাঞ্চেষ্টার ১৯৩৬)
(৪) ভি, এম, মার্চেণ্ট—১২৮ (৩য় টেষ্ট, ১ম ইঃ, ওভাল, ১৯৪৬)

	ইংলণ্ড	ভারতবর্ষ
বৃহত্তম জয়	১০ উইঃ (১ম টেষ্ট, ১৯৪৬)	×
বৃহত্তম ইনিংস	৫৭১ (৮ উইঃ, ডিক্লেয়ার, ম্যানচেষ্টার, ১৯৩৬)	৩৯০ (৫ উইঃ, ম্যানচেষ্টার, ১৯৩৬)
ক্ষুদ্রতম ইনিংস	৯৩ (লর্ডস, ১৯৩৬)	৯৩ (লর্ডস, ১৯৩৬)
ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড		
৪০০ রানের উপরে ইনিংস :	৫ বার	×
১০০ রানের নীচে ইনিংস	×	১ বার

টেষ্ট খেলায় প্রথম যোগদান ও সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষ : ১১৮—লালা অমরনাথ (১ম টেষ্ট, ২য় ইনিংস। বোম্বাই, ১৯৩৪)
ইংলণ্ড : ১৩৬—বি এইচ ভ্যালেনটাইন (১ম টেষ্ট, ১ম ইনিংস। বোম্বাই, ১৯৩৪)

একটি টেষ্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষ : ৮ উইঃ ১৪১ রাণে—লালা অমর সিং (৩য় টেষ্ট, মাদ্রাজ ১৯৩৪)
৮ উইঃ ১৬৭ রাণে—লালা অমরনাথ (২য় টেষ্ট, ম্যাঞ্চেষ্টার ১৯৪৬)
ইংলণ্ড : ১১ উইঃ ১৫৩ রাণে—এইচ ভেরিটি (৩য় টেষ্ট, মাদ্রাজ, ১৯৩৪)
১১ উইঃ ১৪৫ রাণে—এ, ভি, বেডসার (১ম টেষ্ট, লর্ডস, ১৯৪৬)
১১ উইঃ ৯৩ রাণে—এ, ভি, বেডসার (২য় টেষ্ট, ম্যাঞ্চেষ্টার ১৯৪৬)

নতুন বই

সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন

ভুতুড়ে—শ্রীমতী পুষ্প বসু। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : ১৸৹

ভূতের গল্পের চাহিদা চিরকালই। যারা ভূত বিশ্বাস করে না, তারাও ভূতের গল্প পড়তে ভালোবাসে। যা অদৃশ্য, অশরীরী তা দেখার জন্য, তার সম্বন্ধে জানার জন্য মানুষের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। শ্রীমতী পুষ্প বসুর এই বইখানি পড়ে আমরা খুবই খুশি হয়েছি। ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও লেখার কৃতিত্বে সব গল্পগুলিই যেন জীবন্ত রূপ নিয়েছে। এর বইয়ের অনেকগুলি ঘটনা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা এবং কতকগুলি বিশ্বস্তসূত্রে শোনা। প্রতি পাতার ছবিগুলি গল্পগুলিকে আরও স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। প্রচ্ছদপটটি সত্যিই অদ্ভুত। ছাপা কাগজ, বাঁধাই সবই সুন্দর। শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের একটি সুন্দর ভূমিকা আছে বইখানির গোড়ায়। ভূত, প্রেত, অশরীরী সম্বন্ধে যাদের কৌতূহল আছে, সে রকম ছেলে-বুড়ো সকলেই এ-বই পড়ে আনন্দ পাবে।

খেয়াল খুশি—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য : ১৷৹

বইখানি নতুন ধরণের একখানি ছো নৃত্য-নাটিকা। শরীর-চর্চার জন্য নাচ-গান ও ব্যায়ামের ভেতর দিয়ে এই অভিনব নাটিকাটির ঘটনা বয়ে গিয়েছে। দেশের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইরূপ নাটিকার সাহায্য অভিনয়ের ভেতর দিয়ে আনন্দ দানের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। আমরা এই নাটিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি, এবং স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের অভিনয়ের সময় এটি অভিনীত দেখতে ইচ্ছা করি।

যে গল্পের শেষ নেই—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দি ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯ হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা। মূল্য : ১৷৹

পৃথিবীর সৃষ্টিকথা, প্রথম ইতিহাস, মিষ্টি গল্পের ভেতর দিয়ে এই পাত্‌লা বইখানির মধ্যে লেখক সুন্দরভাবে ধরে দিয়েছেন। এই ইতিহাসের সঙ্গে জল, বাতাস, মাটি, পাথর, সূর্য্য, চন্দ্র সমস্ত কিছুই এসেছে সহজ ভাবে—লেখকের লেখার মুন্সীয়ানায় ইতিহাস ও বিজ্ঞান আকর্ষণীয় গল্প হয়ে উঠেছে। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দেখার জন্য উৎসুখ রইলাম।

ছেলেদের শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। চক্রবর্তী চাটুজ্যে এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : ৪৲

এক সময় অচিন্ত্যকুমার ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক গল্প, উপন্যাস লিখছেন। অনেক উৎকৃষ্ট গল্প এই "মৌচাকে"ই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। বিভিন্ন গ্রন্থ ও কাগজে প্রকাশিত সেই গল্পগুলির অধিকাংশই একত্রে পাওয়া গেল এখন এই সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে। সুন্দর ছবি, ছাপা ও কাগজে মুদ্রিত এই বইখানি যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি বিনা দ্বিধায় ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। আমরা এর আগে এই সিরিজের আরও দু'খানি বই-এর সমালোচনা করেছি। তাদের তুলনায় এই বইটিও একটি লোভনীয় প্রকাশ।

ময়ূরকণ্ঠীবন—শ্রীসুকুমার দে সরকার। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির; ২৪বি লেক রোড, কলিকাতা ২৯। মূল্য : ২৲

লেখক জীবজন্তুদের নিয়ে গল্প লিখে শিশু-সাহিত্যে বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন। আমাদের দেশে এই রকম বনের অধিবাসীদের পেয়ে কাহিনী খুবই কম দেখা যায়—যদিও এই ধরণের গল্প আমাদের দেশে প্রথম সূত্রপাত হয় বিষ্ণু শর্মার লেখার ভিতর দিয়ে।

মধু-ক্র

ভারতীয় শিল্পকলার পুরোধা,—বাংলা তথা ভারতের প্রাচীন শিল্পের পুনঃস্থাপনের অগ্রদূত শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন !

ঠাকুর পরিবারের যে কয়জন মনীষী বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতির জন্যে, সংস্কারের জন্যে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ সেই মনীষীদের মধ্যে একজন ! ধর্মপ্রাণ দ্বারকানাথ থেকে সুরু করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ সবাই একে একে এলেন ও চলে গেলেন। ঠাকুর-পরিবার অভিজাত-পরিবার সন্দেহ নেই কিন্তু তার জন্যে তাঁদের মোটেই গর্ব ছিল না।

অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ভারতীয় শিল্পের ও কৃষ্টির যথেষ্ট যে ক্ষতি হয়েছে একথা অনস্বীকার্য।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ শুধু শিল্পী নয়, সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথও। তাঁর "ক্ষীরের পুতুল" "বুড়ো আংলা" প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে তিনি তাঁর শিশু-সাহিত্যিক প্রতিভার বহু জলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে এসো আমরা আজ তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের কাছে আমাদের সভক্তি প্রার্থনা জানাই। গেছেন।

এবার জায়গা অল্প থাকায় মজার খেলা না দিয়ে শুধু তোমাদের চিঠির জবাব দিই। এই জবাব না পেলে ত' আবার তোমাদের মুখ হাঁড়ি হয়ে যাবে—**তাপস বসু** (বেলগাছিয়া)—১৩৪৭ সালে যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, এখন নানান কারণে তা সম্ভব নয়। তবে মাঝে মাঝে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা তো ছাপা হয়। তোমার চিঠির শেষাংশটুকু ভালো ভাবে বুঝতে পারলাম না। **সলিলচন্দ্র সেনগুপ্ত** (ভুবনেশ্বর)—পরীক্ষা এলে আমাদের ভয় কেন বাড়ে জানো ? আমার মনে হয় সারা বছর নিয়মিতভাবে পড়াশোনা না করার জন্যই আমাদের এত বেশী' ভয় হয়। পরীক্ষায় পাশের মান নির্ধারণের জন্য কোন system ভাল সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ ঐ দুটো system-এর একটাও ঠিক নয় বলে আমার মনে হয়। যথেষ্ট গলদ রয়েছে দুটোতে। হ্যাঁ, সম্ভবতঃ আবেদন করতে হয়। ১৯০১ সালে সাহিত্যে ফ্রান্সের R. F. A Sully Prudhomme, পদার্থ-বিজ্ঞানে জার্মানীর W. C. Roentgen, রসায়নে হলাণ্ডের J. H.Hoff, শান্তি স্থাপনের জন্য সুইজারল্যাণ্ডের Henri Dunnant ও ফ্রান্সের Frederick Passy, শরীর ও ঔষধ শাস্ত্রে জার্মানীর Adolf Von Behring নোবেল পুরস্কার পান। **আরতি সেনগুপ্তা** (দেওঘর)—তোমার মজার খেলার জবাব এতো দেরিতে পেয়েছি যে, ঠিক হওয়া সত্ত্বেও তোমার নাম গেলো না।

রঞ্জনা বসু (যাদবপুর কলোনী)—তোমার লেখাটি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। প্রতি বৎসর শারদীয়-সংখ্যা বার করবার চেষ্টা করছি। না, প্রিন্ট করে পাঠিও। **রবি গুপ্ত** (বউবাজার)—তুমি তোমার ছবি ক'টির জন্যে যে কোনদিন ১১টা-৪টের মধ্যে এসে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করো। **পরেশ** ও **বীরেন** (তেজপুর)—তোমরা যে ব্যবস্থা করার কথা বলেছ তা 'মৌচাকে'র ভেতর দিয়ে করা সম্ভব নয়—আর ঐ কাজের জন্যে অনেক পত্র-পত্রিকায় ব্যবস্থা আছে। **শঙ্করজীবন সেনগুপ্ত** (কাছাড়)—তোমার জবাবটিও দেরিতে এসে পৌঁছেচে। **অলকানন্দা বসু** (ভবানীপুর)—তোমার মজার খেলাটি গতবারে দেওয়া হয়েছে, আশা করি রাগ কমেছে ? সুযোগ ও সুবিধে বাছা বাছা কয়েকজনকে শুধু দেওয়া হয় না—এটা নিশ্চয় এবার স্বীকার করবে। তোমার শেষ-প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, না। **শোভনা রায়** (বালুরঘাট) —তোমার সাফল্যের কথা জেনে আনন্দিত হলাম। **অরুণ চক্রবর্তী** (কোলকাতা)—"রাজনীতি" জিনিসটা এখনও ভালো ভাবে বুঝে উঠতে পারোনি। তবে ঠিক্ সাধারণ-নির্বাচনের সূচনায় যে সমস্ত তথাকথিত বামপন্থী দল মাটী কেটে গজিয়ে উঠছে তাদের রাজনৈতিক-সংস্থা বলে স্বীকার করতে ব্যক্তিগত ভাবে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে।" আবার বলছি এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজস্ব মতমত। তোমাদের সঙ্গে আমার হয়ত এক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য থেকে যেতে পারে। **প্রতীপকুমার লাহিড়ী** (লখনউ)—তোমার "সাজেসান"গুলি খুব ভালো কিন্তু তুমি যে বিষয়টি নিয়মিত প্রকাশের জন্য জোর দিয়েছ সেটা যে সবাই চায় তাতো নয় আবার তাদের মধ্যে অনেকে এমন অনেক কিছু চায় যা তোমার ভালো নাও লাগতে পারে। আর সমস্ত বিভাগকে চুল চেরা ভাবে ভাগও করা যায় না। **ভারতী নন্দী** (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)—তোমার পাঠানো মজার খেলাটি আমার মনে হয় বড্ড শক্ত হবে। ছোটদের মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে, অবশ্য যেগুলি এখনও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়, **"মৌচাক"** সবচেয়ে পুরণো। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার হাতে আঁকা সুন্দর চিঠিটি পেলাম। ঐ দিনটি তোমার জীবনে বহুবার মধুর ও সার্থক হয়ে ফিরে আসুক এই আশীর্বাদ করি। **শশীভূষণ আইচ** (টংলা), **রেবা সিংহ** (বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট), **অজন্তা চক্রবর্তী** (শ্যামবাজার), **লীলা মুখোপাধ্যায়** (দমদম), **নীহারকুমার মণ্ডল** (বর্ধমান)—তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি। আজ এইখানেই শেষ করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো।

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী।**

গত দু' মাস স্থানাভাবে 'গ্রাহক-গ্রাহিকার পাতা' দেওয়া সম্ভব হয়নি, আগামী মাস থেকে তা আবার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এমাসে ফটো-প্রতিযোগিতার ছবিও ছাপা হয় নি, আগামী মাস থেকে তা আবার প্রকাশিত হবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

গত পৌষ-সংখ্যায় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার চিত্রগুলি প্রকাশিত হয়নি। বর্তমান মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত ছবিগুলি আবার প্রকাশিত হবে।

মাঘ—১৩৫৮

৩২শ বর্ষ—দশম সংখ্যা

রোগা ছেলে

শ্রীমতী উমা দেবী

❋

ইস্কুলে আজ নাই বা গেলে মাগো
মাগো ওদের নাই পড়ালে আজ,
একটু না হয় আমার কাছে থাকো
ফেলে রাখো পড়াশুনোর কাজ—
রোজই তো যাও ওদের পড়াতে
ওদের খুশি হাওয়ায় ছড়াতে।

এই তো সবে কাল খেয়েছি ভাত
এখনো গায় চাদর জড়ানো,
এখনো এই কাঁপছে দেখ হাত
ওষুধ গেলাস চামচে ছড়ানো—
শিরশিরে শীত হিমেল হাওয়াতে—
পেট ভরে না একটু খাওয়াতে।

আজকে আমায় গল্প শোনাও মাগো
রাবণ রাজা কংস রাজার কথা,
কনকমালা চম্পা পারুল জাগো
হরিশ্চন্দ্র নলের কথকতা।
শোনাও মাগো যুদ্ধ-কাহিনী
কাদের কত সৈন্যবাহিনী।

এই তো দেখো ওদের বাড়ীর টুটুল
মা-মণি তার কতই ভালবাসে,
সারাক্ষণই খেলছে কত পুতুল
মা-মণি তার সারাক্ষণই পাশে
তোমার অনেক কাজ তা জানা মা,
একটি দিনের আমার বাহানা!

ঝক্‌ঝকে আজ রোদের সোনা জ্বলে
তেজ যেন তার তেজী ঘোড়ার মত,
পথ দিয়ে সব লোকজনেরা চলে
ঝল্‌মলে মুখ খুশির আলো কত!
আমিই শুধু ভুগছি অসুখে
ঘুমাতে দাও তোমার ও বুকে।

ঘুমের দেশে আমরা যাবো চ'লে
তুমি আমি আর মাগো কেউ নয়,
সকালবেলা ঝাপসা চোখের জলে
ফিরবো না আর ফিরবো না নিশ্চয়।
একটু ব'সো একটু ব'সো কাছে
পড়ানো তো সব দিনেতেই আছে!

মজার নাটিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পুতুলের দোকান। নানা রঙের, নানা ঢঙের, দেশী-বিদেশী কত পুতুল সাজানো। সব মেয়ে পুতুল। বাঙালী পুতুল, হিন্দুস্থানী পুতুল, মাদ্রাজী পুতুল, চীনে পুতুল, মেম পুতুল —আরও কত কি। আর আছে লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীমূর্তির পুতুল।

দোকানের মালিক এক বুড়ী। সে এইসব পুতুল বানায়। এখন সে একা বসিয়া চরকা কাটিতেছে আর গুণগুণ গান গাহিতেছে।

"চরকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র!
চরকাই দৈন্যের সংহার অস্ত্র।
চরকাই সম্তান, চরকাই সম্মান,
চরকাই দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ!
চরকার ঘর্ঘর ভারতের ঘর ঘর
ঘর ঘর সম্ভ্রম, আপনায় নির্ভর।
প্রত্যাশ ছাড়বার জাগলো সাড়া,
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।"

এমন সময় বাহির হইতে কে দরজায় ধাক্কা দিল—

ও বুড়ী, বুড়ী, দরজা খোলো। নাঃ, দরজা এঁটে বন্ধ ক'রে দিয়েছে পাছে ঢুকি। দেখোনা আবার গান করা হচ্ছে। বুড়ী, ভালো চাও তো দরজা খোলো।

বুড়ী॥ কে তুমি?

লোকটা॥ কে তুমি? আর চিনতেই পারছো না।

বুড়ী॥ না, বাপু, তুমি কে?

লোকটা॥ বটে, এখন তো চিনতেই পারবে না।

বুড়ী॥ ওঃ এবারে বুঝেছি। রঙ বুড়ো?

রঙ বুড়ো॥ তবু ভালো যে বুঝেছ? এবারে দরজা খুলবে কি?

বুড়ী॥ কেমন ক'রে খুলবো? চাবিটা হারিয়ে গিয়েছে।

রঙ বুড়ো॥ চাবি হারিয়ে গেছে? তবে নিজে বেরুবে কি ক'রে?

বুড়ী॥ আমি তো বেরুবো না।

রঙ বুড়ো॥ তবে কি ঘরেই পঁচে মরবে? যাক্ আর বেরিয়ে কাজ নেই। এখন আমার দাম মিটিয়ে দাও।

বুড়ী॥ কিসের দাম বাবা?

রঙ বুড়ো॥ কিসের দাম? পুতুল গড়বার জন্য যে রঙ এনেছিলে, রাংতা এনেছিলে—মনে নেই?

বুড়ী॥ বুড়ো মানুষ ভুলে যাই, বাবা।

রঙ বুড়ো॥ নেবার সময় তো ভুল হয় না। যাক্, এখন দাম মিটিয়ে দাও।

বুড়ী ॥ কেমন ক'রে দেবো বলো, দরজা যে বন্ধ।

রঙ বুড়ো ॥ তবে দরজা ভাঙি।

বুড়ী ॥ অমন কাজটি ক'রো না, আমার চাবি-তালা জোড়া নষ্ট হ'য়ে যাবে।

রঙ বুড়ো ॥ দরজা যাবে তাতে দুঃখ নেই। চাবি-তালা জোড়া নষ্ট হ'য়ে যাবে যত দুঃখু তার জন্যে। বলি, দরজার জন্য তালা, না তালার জন্য দরজা ?

বুড়ী ॥ পাওনাদার এলে তালার জন্য দরজা আর—

রঙ বুড়ো ॥ নিজে বেরুবার সময়ে দরজার জন্য তালা ? না ? ঠিক বুঝেছি কিনা ?

বুড়ী ॥ এত বোঝো—আর এটুকু বোঝো না যে আজ লক্ষ্মীবার।

রঙ বুড়ো ॥ তোমার আজ লক্ষ্মীবার, কাল সরস্বতীবার, পরশু কার্ত্তিকবার, পয়সা দেবার সময় কতই যে বাহানা হয়।

বুড়ী ॥ তা হয় বাচা। নইলে দেবদেবীর সৃষ্টি হয়েছে কেন ?

রঙ বুড়ো ॥ পাওনাদার ঠেকাবার জন্যে ? কি বলো।

বুড়ী ॥ আমি আর কি বলবো ? তুমিই তো মনের কথাটা বলে ফেল্‌লে।

রঙ বুড়ো ॥ যাক্, এখন পয়সা দিয়ে ফেলো।

বুড়ী ॥ ঐ তো বল্‌লাম।

রঙ বুড়ো ॥ কি বল্‌লে ? লক্ষ্মীবার।

বুড়ী ॥ না, দরজা বন্ধ।

রঙ বুড়ো ॥ তবে জানলা দিয়ে দাও।

বুড়ী ॥ (মনে মনে) ইস্, তাইতো জানলাটা বন্ধ করতে ভুল হয়ে গিয়েছে।

(প্রকাশ্যে) জানলা দিয়ে কি লক্ষ্মী দিতে আছে ?

রঙ বুড়ো ॥ দেখো বুড়ী ভালো হবে না, বলছি। আমি এখন যাচ্ছি। খানিক পরে ঘুরে আসবো। এর মধ্যে চাবি খুঁজে বের ক'রে রাখো। নইলে তখন দরজা ভেঙে ঢুকে পুতুলগুলো নিয়ে গিয়ে কাপড়, রাংতা খুলে নেবো। আর পুতুলগুলো গুঁড়িয়ে গোবরে মিশিয়ে ঘুঁটে দেওয়ার কাজে লাগাবো।

বুড়ী ॥ সেই ভালো বাবা।

রঙ বুড়ো ॥ সেই ভালো! এর মধ্যে জানলায় চাবি-কুলুপ এটে দিতে চাও ? ও সব চালাকি ক'রো না বলছি। ভালো হবে না। এখন চল্‌লাম।

বুড়ী ॥ (জানলায় উঁকি দিয়া দেখিয়া) গিয়েছে, বাঁচা গিয়েছে। কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা বাঁচলাম। আবার তো এখনি ফিরে আসবে, এবার হয়তো সঙ্গে পুলিস নিয়ে আসবে। এখন করি কি ?

এক কাজ করি। ঘর-দোর বন্ধ ক'রে মেয়ের বাড়ী গিয়ে লুকিয়ে থাকি। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসবো।

(এই বলিয়া সে ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া নাতনীর বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। ঘরে কেবল থাকিল পুতুলগুলি।)

(এবারে পুতুলগুলির মধ্যে প্রাণের চাঞ্চল্য দেখা দিল। তারা যেন রক্ত-মাংসের জীব—বেশ নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে পুতুলগুলি নিজ নিজ ভাষায় গান সুরু করিল। বাংলা গান, হিন্দীগান, তামিল, তেলেগু গান, ইংরাজী গান, চীনে ভাষার গান। লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবিগণ এখনো সংস্কৃত ভাষাটা আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাই সরস্বতী বীণা বাজাইতে লাগিল, আর লক্ষ্মীর হাতে কোন বাদ্যযন্ত্র না থাকায় তিনি কেবল হাততালি দিতে থাকিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ চলিল। এবারে কথাবার্তা সুরু হইল।)

বাঙালী পুতুল॥ গান তো হ'ল। এবারে একটু কাজের কথা শুনবে কি ?

আর একটি বাঙালী পুতুল॥ কাজ ? কাজ করতে হবে জানলে তো মানুষ হয়েই জন্মাতাম। পুতুল হয়েছি, সেজেগুজে চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকবো। খবরদার কাজের কথা ব'লো না।

বাঙালী পুতুল॥ ব'সে থাক্‌বে ? সেজেগুজে ব'সে থাকবে ? ব'সে থাকা যে ঘুঁচিয়ে দেবে। শুন্‌লে না ? সাজপোষাক খুলে নিয়ে ঘুঁটে ক'রে দেবে !

অন্য এক পুতুল॥ মিথ্যা কথা বলো না। ঘুঁটে ক'রে দেবে বলে নি। বলেছে গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে ঘুঁটে দেবে।

বাঙালী পুতুল॥ সেটাই বড় আরামের হ'ল না ? জলে-পুড়ে মরবে যে।

হিন্দুস্থানী পুতুল॥ এহি বাৎ তো ঠিক হ্যায় !

বাঙালী পুতুল॥ ঠিক হ্যায় তো চুপ ক'রে ব'সে আছে কেন ?

হিন্দুস্থানী পুতুল॥ ক্যা করে গা ?

বাঙালী পুতুল॥ করে গা না তো কি মরে গা ! যা করবার হয় করো। আর সব হাত তুলে ভঙ্গী করে বসে থাক্‌তে হবে না। যত দুশ্চিন্তা সবই কি আমার একার ! জ্ব'লে মলাম, জ্ব'লে মলাম। মাগো মা !

অন্য বাঙালী পুতুল॥ দিদি, আমাদের আবার নূতন জ্বলুনি-পুড়ুনি কি ? আমরা বাঙালী জন্ম থেকেই জ্ব'লে পুড়ে মরছি।

বাঙালী পুতুল॥ সে জ্বলুনি নয়, সে জ্বলুনি নয়, এ ঘুঁটের জ্বাল, বড় জ্বালা।

হিন্দুস্থানী পুতুল॥ এহি বাৎ ভি ঠিক হ্যায়। আগ মে বড়ি জ্বালা।

বাঙালী পুতুল॥ বোঝো ? তবে একটা ব্যবস্থা করো।

হিন্দুস্থানী পুতুল॥ সবাই মিলে চিন্তা ক'রে একটা উপায় বের করো।

বাঙালী পুতুল॥ এই তো বেশ বাংলা বল্‌ছ। তবে এতক্ষণ ঢঙ করছিলে কেন ? হিন্দী বল্‌ছিলে কেন ?

হিন্দুস্থানী পুতুল॥ সাধে কি আর বলেছি। হিন্দী না বল্‌লে চাকরি পাওয়া যায় না শুনে হিন্দী বল্‌তে সুরু করেছি।

বাঙালী পুতুল॥ এসব কথা আবার শুনলে কোথায় ?

হিন্দুস্থানী পুতুল॥ মাটির জুড়িতে আসতে আসতে। ছিলাম তো মাটি। যে বুড়োটা আমাকে মাথায় ক'রে বিক্রি করতে যাচ্ছিল—সে আর একটা লোককে বলছিল। তখন শুনেছি।

বাঙালী পুতুল ॥ তুমি হিন্দীই বলো আর ইংরেজীই বলো—তুমি আবার কি চাকরি পাবে?

হিন্দুস্থানী পুতুল ॥ কেন স্কুল মিস্‌ট্রেস হবো।

অন্য পুতুল ॥ আমি ভাই পারবো না, পড়াতে হয় যে।

আর এক পুতুল ॥ পড়াবে কেন? অঙ্ক ক'ষতে দিয়ে চুপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে বসে থাকবে।

অন্য পুতুল ॥ যখন জিজ্ঞাসা করবে?

আর এক পুতুল ॥ ধমক দেবে।

অন্য পুতুল ॥ না ভাই তার চেয়ে হেড মিস্‌ট্রেস হওয়া ভালো। পড়াবার দায় নেই, সেজেগুজে স্কুলে এসে মাষ্টারদের উপর মাষ্টারি করবো, কেউ কারো সঙ্গে কথা না বল্‌তে পারে লক্ষ্য রাখবো।

আর এক পুতুল ॥ তার যে আবার ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের ভয়।

অন্য পুতুল ॥ তাও বটে। না জীবনে কিছুতেই শান্তি নেই, শান্তি নেই।

হিন্দুস্থানী পুতুল ॥ তবে এক কাজ করবো, রেশনিং অফিসার হবো, কিংবা টেলিফোন গার্ল।

মেম পুতুল ॥ No, that service is reserved for us, you can not get into it.

বাঙালী পুতুল ॥ তবু ভালো যে এতক্ষণে কথা ফুটেছে। তাই বলি চাকরিতে হাত না পড়া অবধি সবাই ভালো মানুষ। কথা বল্‌তে জানে ব'লেই মনে হয় না।

হিন্দুস্থানী পুতুল ॥ যা বলেছ ভাই, চাকরি নিয়েই যত গণ্ডগোল।

বাঙালী পুতুল ॥ আর চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লেই বুঝি আরামে থাকবে ভাবছ! ঐ যে রঙ বুড়ো আসছে। সব গুঁড়িয়ে ঘুঁটে করে দেবে।

হিন্দুস্থানী পুতুল ॥ ঘুঁটে পারবে না, ঘুঁটের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

বাঙালী পুতুল ॥ নাও মেশো গিয়ে।

অন্য পুতুল ॥ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ক'রেই কাটাবে নাকি? একটা উপায় বের করো।

বাঙালী পুতুল ॥ আমি বলি কি, নিজেদের মধ্যে চাঁদা করে টাকা তুলে রঙ বুড়োর পাওনাটা দিয়ে দিই।

সকলে ॥ ঠিক্‌, ঠিক, ঠিক! এইতো উপায়! জয় হিন্দ্‌

বাঙালী পুতুল ॥ ঝগড়া হয়েছিল বলেই বুদ্ধি বেরুলো।

হিন্দুস্থানী পুতুল ॥ ঝগড়া না করলে বুদ্ধি খোলে?

বাঙালী পুতুল ॥ সেই জন্যে তো বুদ্ধিতে পুরুষে আমাদের সঙ্গে পারে না।

চীনা পুতুল ॥ চিং চুং চাং।

বাঙালী পুতুল ॥ নাও এবারে কিচির-মিচির আরম্ভ হ'ল।

চীনা পুতুল ॥ চিং চিং চিং।

বাঙালী পুতুল ॥ অমন চিং চিং করো কেন? খিদে পেয়েছে?

হিন্দুস্থানী পুতুল ॥ ওকে একটা লজেঞ্চুষ দাও না?

(লজেঞ্চুষ বাহির করিতেই চীনা পুতুল খপ করিয়া কাড়িয়া লইয়া মুখে পুরিল) (ক্রমশঃ)

১

সন্ধ্যাবেলা হেদোর ধারে
ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে
বিজ্‌লী-বাতি সারে সারে
উঠল জ্ব'লে হঠাৎ।
শ্যামল, সুনীল সাঁতার কেটে
বাড়ীর পানে ফিরছে হেঁটে,
পৌঁচেছে প্রায় সদর গেটে
শব্দ হ'ল 'মটাৎ'।
গাছ থেকে কোন্ সেই নিমেষে
তাদের পায়ের কাছে ঘেঁষে
ডাল ভেঙে এক পড়ল এসে
মস্ত বুড়ো শকুন।
আঁকড়ে ধ'রে ভাঙা শাখায়
কাতর চোখে কেবল তাকায়,
সুনীল বলে, "বাবা কাকায়
মারুন কিম্বা বকুন
যাবই এরে বাড়ী নিয়ে,
সুস্থ ক'রে ওষুধ দিয়ে
পু'ষব এরে ভাত খাইয়ে—
পাতের এঁটো-কাঁটায়।
নাম দে'ব এর 'জরদ্গব',
আর একটু যেই বড়ো হ'ব,
স্কুলে যেতে সঙ্গে লব ;
তখন যদি ঘাঁটায়
হ্যাপলা, ঘোঁতন আমায় বেশী,
ক্যাপায় যদি হৃষীকেশই,—
কিম্বা করে রেষারেষি
ভুল্টে, কানাই, সুধীর,—
লেলিয়ে দে'ব শকুনটারে,
ঝাপটে ডানা পড়বে ঘাড়ে,
মাংস ছিঁড়ে ঠুকরে হাড়ে
বইয়ে দেবে রুধির।"
শ্যামল বলে, "আচ্ছা তো লোক !
কাজ এর দ্বারা হোক বা না হোক
আর্ত এ যে পক্ষীশাবক,
না হয় হ'ল বুড়োই,—
বৃদ্ধ হ'লে কি ক'রত রে ?
সঙ্গে নিতে হবেই ওরে,
প্রাণ বাঁচিয়ে তাহার পরে
আমরা যদি উড়োই
'ধন্য ধন্য' বলবে সবে,
দেখবি কেমন কাণ্ড হবে,
পড়ার বই-এ ছাপা রবে
অমর কীর্তি মোদের।"

এমনি ক'রে আলোচনা ধরতে শকুন যায় দু'জনা ;
বোকা পাখীর দুষ্টপনা,— ঠোকরাতে যায় ওদের।
যুক্তি ক'রে শেষটা গিয়ে দড়ি কিনে ফাঁস লাগিয়ে
ঠোঁটটি বেঁধে, বাঁধন দিয়ে শক্ত ক'রে দু'পায় ;—
ভাঙা ডালের বানিয়ে লাঠি ঝুলিয়ে নিলে পরিপাটি ;
মাথা গিয়ে ঠেকল মাটি : বওয়ার হ'ল উপায়।
এমনি ক'রে কাঁধে তুলে চ'লল দোঁহে হেলে দুলে
বাড়ীর পানে, হেদোর কূলে তাকিয়ে দেখে যে যায়।
"বলো হরি, হরি বলো" কেউ বলে, "এও দেখতে হ'ল ?"
শ্যামল বলে, "আস্তে চলো, ওজন ব্যাটার বেজায়।"

২

সুনীলবাবুর লাঞ্ছনাটা শুনলে দেবে গায়ে কাঁটা,
বাবা দিলেন দু'চার চাঁটা— এবং কর্ণ-নাড়াও,
"হচ্ছ যত বুড়ো ধেড়ে বুদ্ধি ততই যাচ্ছে বেড়ে,"
কাকা বলেন, দু'চড় মেরে, "এক পায়েতে দাঁড়াও।"
মা ক'ন, "ওমা, কি ছেলেগো ? শ্মশান থেকে মড়াখেগো
আনলে পাখী;—গেলুম যে গো তোদের জ্বালায় জ্বলেই।"
পিসীমা ক'ন, "কি সর্বনাশ ! সবাই মরুক এই কিরে চাস ?
বাড়ীটাকে ভাগাড় বানাস না হয় মোরা ম'লেই !"
কর্ণপীড়ন, চাপড়, চাঁটি, গালাগালি, কান্নাকাটি,—
সমস্ত প্ল্যান হ'ল মাটি : জীবে দয়ার কি দায় !
শ্যামল হঠাৎ সদর থেকে লম্বা দিল ব্যাপার দেখে।
বস্তি থেকে ডোমকে ডেকে আপদ হ'ল বিদায়।

৩

রাত্তিরে ঘুম হয়নি ভালো ভোরে সুনীল যেই তাকাল
জানলা দিয়ে দেখল আলো জ্বলছে গলির মুখেই ;
তারি লোহার থামটি ঘেঁষে সেই তো পাখী সর্বনেশে,

যার তরে কাল মার খেলে সে!　ঘুমোচ্ছে বেশ সুখেই
ডানার ভেতর ঘাড়টি গুঁজে।　সবাই ঘুমোয় চক্ষু বুজে,
সুনীল উঠে আনলে খুঁজে　দড়ি সে প্রায় ছ'গজ ;
আস্তে খুলে সদর দুয়ার　পায়ের দড়ির সঙ্গে উহার
বাঁধল দড়ি থামে লোহার :　ঠাণ্ডা হ'তে মগজ
বাড়ী ফিরে ঘুম দিল ফের।　রোদ উঠেছে পায়নি সে টের
ভাঙল সে ঘুম পথের লোকের　হট্টগোলে দেদার।
দেখল চেয়ে জানলা থেকে　ভিড় জমেছে শকুন দেখে,
জরগদব এঁকে বেঁকে　চলছে ওধার-এধার।

খাবার দোকান গলির মাথায়　রংবেরঙের মেঠাই সেথায়,
ভ্যাজাল ঘি-এর গন্ধে মাতায়　রাস্তা সকাল সাঝেই ;
রাবড়ি, পুরী, সরপুরিয়া　খাজা, গজা ঘর পুরিয়া,
দেখলে মাথা যায় ঘুরিয়া　দাঁড়িয়ে পথের মাঝেই।
পরাত-ভরা থরে থরে,　হঠাৎ শকুন ঝপাং ক'রে
পড়ল গিয়ে তার উপরে　সন্দেশেরি থালায়।
ময়রা পালায় দেকোন ফেলে ;　হল্লা করে পাড়ার ছেলে ;
গণ্ডা কয়েক মোণ্ডা খেলে　নেহাৎ পেটের জ্বালায়।
হ'ল না তার স্বাদ পছন্দ,　নাইকো মাংস পচার গন্ধ ;
জরগদবের বরাত মন্দ　মিটল না তো ক্ষুধাও।

বেরিয়ে এসে দোকান থেকে　ছুটল তেড়ে রিক্স দেখে,
রিক্সওলা রিক্স রেখে　এক লাফেতে উধাও।
উল্টে পড়ে নতুন জামাই,　কাদায় নষ্ট রেশমী জামাই,
তার উপরে অফিস কামাই　সময় মন্দ নেহাৎ!
গুঁড়িয়ে গেল সোনার ঘড়ি,　ডায়রী, কলম, পয়সাকড়ি
কাদায় হ'ল ছড়াছড়ি,—　খানিক হ'ল বেহাত।
সুখ হ'ল না রিক্স চ'ড়ে,　শকুন দেখে গলির মোড়ে
দাঁড়িয়ে মুটে ঝাঁকায় ভ'রে　নানান উপকরণ—
ফুলের তোড়া, মালা, টোপর,　বসল গিয়ে সে তার ওপর,

ঝাঁকা ফেলে ভয়ে ফাঁপর
পালাল রামচরণ।
শকুন ব'সে মুটের ঝাঁকায়
ভাবছে, 'এসব কি ক'রে খায় ?'
পালক ঝাড়ে, গলা বাঁকায়,
তাকায় আড়ে আড়েই ;
দত্ত-বাড়ীর সত্যব্রত—
মাথাতে চুল নেইকো তত,
টাকটি খাসা বেলের মতো,
বসল তা'রি ঘাড়েই।
"বাপ্‌রে" ব'লে লাফ দিল সে,
হোঁচট খেল ভাগ্যদোষে।
জরদগব দেখল ব'সে
ছ্যাকড়া গাড়ীর ছাদেও ;
সুখ পেলনা। বাড়ছে বেলা,
চলছে বেড়ে লোকের মেলা,
গাড়ী, বাইক, রিক্স, ঠ্যালা,
মোটর, লরি বাদেও
জমল পথিক নিয়মমাফিক,
গলির পথে বন্ধ 'ট্রাফিক' ;
কেউ ছোঁড়ে ঢিল, কেউ করে 'কিক্',
কেউবা শোনায় আইন :
"জানা আছে হুকুমজারি,—
শকুন বড়োই উপকারী,—
মারলে ওরে বিপদ ভারী,
একশ' টাকা ফাইন।
শকুন মারা নয় চালাকী,
বুঝবে ঠ্যালা ম'রলে পাখী।"
কে আনতে চায় বিপদ ডাকি ?
দাঁড়ায় সবাই তফাৎ।
অফিস-টাইম কাজে কাজেই
ফিরল মোটর (ভেঁপু বাজেই),
রহিম মিঞা পক্ষীরাজেই
চাবুক লাগায় সপাৎ।
নাই ভরসা রাস্তা পাওয়ার,
পার হ'য়ে যায় 'অফিস আওয়ার',
বল নাহি যার ব'সে খাওয়ার
ফিরল সে পথ ছেড়েই :
পিছিয়ে যেতে গাড়ী ঘোড়া
দু'চার জনে করলে খোঁড়া।
চ্যাচায় যত পাড়ার ছোঁড়া,
শকুন ফেরে তেড়েই
দড়ির ফেরে চক্র দিয়ে ;
এগোয়-পেছোয়, যায় লাফিয়ে,
ওড়ে, পড়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে
মিটমিটিয়ে তাকায়।
এই ঢোকে সে আস্তাবলে,
(খায় না কোসে ঘাস তা ব'লে)
ওই সে ফেরে রাস্তা চ'লে,
সেই সে গাছের শাখায় !
শেষটা ক'জন বুদ্ধি করি
ছুরি দিয়ে কাটল দড়ি,
জরদগবে মুক্ত করি
বাঁশের বাড়ি খোঁচায়।
ছিন্ন দেখে পায়ের বাঁধন
আনন্দেতে ধায় বাছাধন,

ক্ষনিক দূরেই 'শিক্ষাসদন' ঢুকতে তা'তে ও চায়।
তাইতে হ'ল বিপদ বিশেষ। বালিকাদের ক্লাস সবে শেষ,
তা'রা যাবে, ক'রবে প্রবেশ বালকরা এর পরেই,
এমন সময় সদর দ্বারে দেখতে পেয়ে শকুনটারে
মেয়েগুলো সচীৎকারে ছুটল স্কুলের ঘরেই।
ধায় প্রতিমা, ধায় অমিতা, ঝরনা, মালা, মেঘ্না, গীতা,
রত্না, ঋতা—ছুটল ভীতা ছাত্রী দু'দশ ডজন।
'টিচার্স রুমের' বারান্দাতে ধাক্কা লেগে তাদের সাথে
ছিটকে পড়েন ডাইনে বাঁ'তে শিক্ষিকারা ক'জন।
সুলতা সেন, মালতী কর, বিজয়া সোম, অজিতা ধর,
আড়ে-দীঘে সবার উপর প্রধানা 'মিস্ ওটেন'।
ছাত্রীদলে ব্যাঘ্রীসমা কুন্তলিনী কারফরমা
দু'হাত দূরে সকর্দমা নর্দামাতে লোটেন।
পলায়নের নাই অবকাশ, ধুপুস, ধপাস, ধড়াস, ঠকাস,—
পড়েন সবাই,—শব্দে প্রকাশ কার কি রকম গড়ন।
কেউ বা চ্যাঁচায়, কেউ বা ফোঁপায়, কেউ দেখে ফুল আছে খোঁপায়?
শুয়েই থাকে কেউ নিরুপায়, নাইকো নড়নচড়ন।
মাড়িয়ে তাদের পায়ের তলে তরুণ প্রাণের বন্যা চলে,
ক্ষুরে ক্ষুরে পাঁজর দলে, সাধ্য কাহার থামান?
পিষছে স্লিপার স্যাণ্ড্যালেতে,— যেন গথ-হুন-ভ্যাণ্ড্যালেতে
ভাঙছে শহর, ম্যাণ্ড্যালেতে দাগছে বৃটিশ কামান।

৪

দাঁড়িয়েছে লোক রাস্তা জুড়ে, শকুন বুড়ো বেড়ায় উড়ে,
গুটিয়ে পাখা আঁস্তাকুড়ে খাদ্য খোঁজে তাহার।
দেখে মরা বিড়ালছানা আনন্দে সে কাঁপায় ডানা,
বুঝল চেখে তৈরি খানা,— মনের মতো আহার।
বার করে সে নাড়ীভুঁড়ি দিল খানিক মুখে পুরি।
গঙ্গা নেয়ে বামুনবুড়ী— (শুদ্ধ তাঁহার আচার)—

যান সে পথে, শকুন ভাবে, 'খাবারে মোর ভাগ বসাবে',
ছুটল তেড়ে, স্থানাভাবে বাম্‌নী খেলেন আছাড়
শকুন বুড়োর ঘাড়ের পরে। চ্যাঁচায় পাখী তারস্বরে,
বামুন বুড়ী উঠলে পরে (নোংরা মাখা কাপড়)
জরদ্গব হাঁফায় ব'সে। ভাগ্যে শেষে এই ছিল সে ?
বামনী তারে রুদ্ধ-রোষে মারেন লাথি চাপড়।
ছেলেগুলো বই বগলে দেখছে মজা দলে দলে,
ক্লাসের সময় পেরিয়ে চলে, শিক্ষকেরা ব্যাকুল।
স্কুলের দ্বারে সাহসিকা জমছে দু'চার বীর বালিকা,—
শান্তা, শিখা, মন্দালিকা, গৌরী, মেরী, বকুল।
সুনীল, শ্যামল ততক্ষণে স্কুলের পথে যায় দু'জনে
বুকের ভিতর শব্দ শোনে করছে ধড়াস ধড়াস।
প্রকাশ হ'লে দেবেন সেরে ভূধরবাবু গাঁট্টা মেরে,
দুইজনে দোষ দেয় ও এরে, "তুই বিপদে জড়াস।"
আনল কে সে পুলিস ডেকে, "ক্যা হোতা হ্যায়" বলেই হেঁকে
পাহারওলা পিছন থেকে পড়ল স'রে থানায়।
শেষটা দু'চার জনে গিয়ে কাঁচ ভেঙে আর কল ঘুরিয়ে
মোড়ের থেকে খবর দিয়ে দমকলেরে আনায়।
বামুন বুড়ীর বপুর চাপে আধমরা,—তার মারের দাপে
থরথরিয়ে শকুন কাঁপে, ভাবলে, "একি ব্যাপার ?"

ঝড়ের বেগে ঘণ্টা নেড়ে দেখল কি এক আসছে তেড়ে,
বসল স'রে রাস্তা ছেড়ে কাণ্ড দেখে ক্ষ্যাপার।
থামল গাড়ী কলের মতো লাফিয়ে নামে কর্মী যত,
আগুন খোঁজে ইতস্ততঃ, চিহ্ন তো নেই ধুঁয়ার ?
হেল্‌মেটেতে রৌদ্র জ্বলে বর্ম-আঁটা বক্ষতলে
সাহেব আসেন রণস্থলে, বলেন, "ব্লাডি, শুয়ার,
আজ তোমাদের নে'ব দে'খে, মিথ্যে মোদের 'কল' দিলে কে ?
'ফল্‌স্ অ্যালার্মে' আনলে ডেকে জানো কী হয় ফাইন ?"

এগিয়ে বলেন রামহরি ঘোষ,
"দোহাই ব্রাদার, নিয়োনা দোষ,
ডাক দিয়েছি মিথ্যে কি আর ?
ব্রাদার ডিয়ার, লাইন ক্লিয়ার
পক্ষীদায়ে রক্ষা করো,
জলের পাইপ বাগিয়ে ধরো
শেষটা হ'ল রাজী তারা,
ধড়ফড়িয়ে শকুন সারা,
ডেকে এনে এই অত্যাচার ?
সাধে বলে 'মানুষ' কি আর ?
নাকাল হ'য়ে জলের তোড়ে
উধাও হ'ল গলির মোড়ে
বেথুন স্কুলের দেবদারু বন
সেথাই গেল,—কিম্বা গেল

(মনে তাঁহার বেজায় সাহস)
রাখো তোমার আইন।
বন্ধ মোদের আহার বিহার।
করো; দে'ব যা চাও।
আগুন হ'তেও ভয়ঙ্কর ও,
তাড়িয়ে ওরে বাঁচাও।"
ফড়ফড়িয়ে ছুটল ধারা.
গড়িয়ে চলে কাদায়।
দোলায় তুলে পথে আছাড় ?
বুড়ো পেলেই কাঁদায়।
শকুন বুড়ো শেষটা ওড়ে,
ছড়িয়ে ডানা বিরাট।
তাহার প্রিয় প্রমোদভবন,
দিল্লী কিংবা মীরাট।

গাছের টান

আশ্চর্য কথা! বৈজ্ঞানিকরা বলেন, গাছের যে শুধু অনুভূতি আছে তা নয়, পছন্দ-অপছন্দ বোধও আছে। কড়া রোদ কোন গাছ পছন্দ করে না। সম্প্রতি আমেরিকার দু'জন বোটানিষ্ট ডাঃ ব্রাকেট ও ডাঃ জনশন গাছের সম্বন্ধে এক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ছোট একটি বন্ধ ঘরের দু'কোণে দুটি আলো জেলে, আলো দু'টির মধ্যে একটির সামনে সবুজ পর্দা ও অপরটির সামনে একটি লাল পর্দা ঝুলিয়ে তাদের মাঝখানে দুটি চারা গাছ পাঁচ-সাত দিন রাখার পর তাঁরা দেখেন যে, যেদিকে বাতির সামনে সবুজ পর্দা টাঙান ছিল, সেদিকে দুটি চারা গাছেরই মাথা হেলেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সবুজ রঙের দিকেই গাছের টান বেশী। এই সবুজ ও লাল রঙ ছাড়াও হলদে, নীল প্রভৃতি নানা রঙের আলো দিয়েও তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু এই সবুজ রঙ ছাড়া আর কোন রঙের দিকে গাছের টান দেখা যায় নি। এ সম্বন্ধে এখনো তাঁরা নানাভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন।

খৃষ্টোৎসব

শ্রীমতী সুলতা কর

প্রকাণ্ড এক শহর। আলোর মালায় সাজান, গানে বাজনায় উৎসবে সাড়া পড়ে গেছে। খৃষ্টোৎসবের দিন।

এই দিনে এক গরীব ছোট ছেলে কন্‌কনে ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরের ভিতর ময়লা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। বয়স তার মোটে ছ'বছর। একটা কোট পরে রয়েছে তাতে অসংখ্য ফুটো, প্যাণ্ট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ছোট ছেলেটি বিছানা থেকে উঠে একটা ভাঙ্গা কাঠের বাক্সয় বসল। একটু পরেই তার খুব খিদে পেল। সামনেই ছোট্ট একটুকরো ছেঁড়া চটের উপর তার রুগ্ন গরীব মা শুয়ে রয়েছে। ছেলেটি মার কাছে গিয়ে মার গায়ে হাত দিয়ে ডাকবার চেষ্টা করল। মার মুখের দিকে চেয়ে কিন্তু তার ভয়ানক ভয় করতে লাগল। মুখ এরকম সাদা কেন? আর শরীরটা এত বরফের মত কেন? কিছুই সে বুঝতে পারল না। বুঝতে পারল না যে, না খেতে পেয়ে তার মা মারা গেছে। খানিকক্ষণ সে মার গায়ে হাত দিয়ে বসে রইল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারল না, পেটের ভিতর জ্বালা করছে, একটুকরো খাবার কোথাও নাই। আর কি অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘর, একটা মোমবাতিও জ্বলছে না।

ছেলেটি মায়ের গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল—ছেঁড়া টুপীটা এক কোণে পড়েছিল, সেটা মাথায় প'রে বাইরের রাস্তায় এল।

কি আশ্চর্য শহর। জীবনে কখনও সে এত আলো, এত লোক, এত গাড়ী দেখেনি।

সে আর তার মা একটা ছোট পাড়াগাঁয়ে থাকত। সেখানে তার মা ভিক্ষা করে দিন চালাত। শেষে একদিন খেতে না পেয়ে এই শহরে তারা চলে এসেছে।

বাইরের রাস্তায় এসে অবাক হয়ে ছেলেটি দেখতে লাগল—কি প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা। চারদিকে আলোর যেন ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আর ওখানে কি দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড কাঁচের জানলা। ছেলেটি জানলার সামনে এল, জানলার পিছনে একটা চমৎকার সাজান ঘর রয়েছে। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক টেবিলে রাশরাশ কেক ঢালা রয়েছে, বাদাম, পেস্তা মাখান কত অসংখ্য কেক।

ছেলেটি চেয়ে দেখল রাস্তা থেকে ভাল পোষাক-পরা কত লোক ঘরের ভিতর গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াচ্ছে, আর সুন্দরী মেয়েরা হাসতে হাসতে হাতে খাবার ভর্তি প্লেট তুলে দিচ্ছে। তাই দেখে ছোট ছেলেটি সাহসে ভর করে কোন রকমে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল,

ভয়ে ভয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কি সর্বনাশ। সুন্দরী মেয়েরা তাকে দেখে ঘৃণায় চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল। হাত নেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিতে লাগল। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে একটা পয়সা তার হাতে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"যাও, যাও বেরিয়ে যাও। কি ভয় না সে পেয়ে গেল। ভয়ে সে এমন কাঁপছিল যে হাত থেকে পয়সাটা গড়িয়ে ঘরের মেঝেয় পড়ে গেল। শীতে জমা শক্ত কাঠির মত আঙ্গুল দিয়ে সে আর পয়সা তুলতে পারল না। প্রাণপণে সে ছুটতে লাগল, কোথায় যে যাচ্ছে সে জ্ঞান রইল না।

ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে হাতের জমে যাওয়া আঙ্গুলগুলোয় ফুঁ দিয়ে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগল। কি শোচনীয় দুর্দশাই না হচ্ছিল বেচারীর। মনে হচ্ছিল তার কোথাও কেউ নাই, পৃথিবীর কোন লোক তাকে খেতে দেবে না, কোথাও বুঝি সে আশ্রয় পাবে না। দৌড়তে দৌড়তে একজায়গায় এসে ছেলেটি থেমে পড়ল। আবার একটা জানালা দেখা যাচ্ছে। অনেক লোক জানালার ধারে ঝুঁকে ভিতরে উঁকি মেরে দেখছে। ছোট ছেলেটিও এক ফাঁকে উঁকি মারতে লাগল। চমৎকার দৃশ্য। লাল পোষাক-পরা দাড়ীওয়ালা এক বুড়ো প্রকাণ্ড বীণা হাতে নিয়ে বসে বসে বাজাচ্ছে আর তার দু'পাশে দু'জন সবুজ পোষাক-পরা ছোট মেয়ে ছোট দুটি বীণা নিয়ে বাজাচ্ছে। তারা থেকে থেকে ঘাড় নাড়ছে, ঠোঁট নেড়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেটি জানালায় কান চেপে ধরে তারা কি বলছে শুনতে চেষ্টা করল।

প্রথমে তার মনে হয়েছিল এরা বুঝি মানুষ। তারপর ভাল করে দেখে বুঝতে পারল এরা পুতুল। তখন তার এত হাসি পেল যে, সব কষ্ট ভুলে হো হো করে হেসে উঠল। এমন পুতুল সে কখনও দেখিনি, পুতুলেরা যে এত কাণ্ড করতে পারে কখনও ভাবেনি।

শীতের কষ্টে, খিদের কষ্টে চোখে তার জল আসছিল, তবুও যতবার পুতুলদের দিকে চাইছিল ততবারই না হেসে থাকতে পারছিল না।

কি মজার পুতুল এগুলো। একমনে সে পুতুলদের দেখছে আর হাসছে; এমন সময় হঠাৎ রাস্তার একটা দুষ্টু ছেলে তার মাথা থেকে টুপীটা ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। রাস্তার লোকেরা হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল। বেচারী ছেলেটি ভয়ে পাগলের মত হয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে এসে প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে একটা কাঠের বোঝার পাশে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। একটু পরে চেয়ে দেখল চারদিক অন্ধকার, রাস্তার লোকেরা কেউ কোথাও নাই, আর কেউ তাকে তাড়াও করছে না। কাঠের বোঝার পাশে শুয়ে তার খুব আরাম হতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন আর মোটেই খিদে পাচ্ছে না, শীত করছে না। চারদিকে কে যেন গরম আগুন জেলে দিয়েছে। হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল

যে এত টন্‌টন্ করছিল, এখন কিন্তু আর কোন ব্যথা নাই। কেবল যেন তার খুব ঘুম পাচ্ছে। সে যেন কি রকম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল। তন্দ্রার ঘোরে মনে হ'ল মিষ্টি সুরে কে যেন কানের কাছে বলছে—"এস বাছা, আমার খৃষ্টোৎসবের গাছের কাছে চলে এস।" কে এত মিষ্টি সুরে ডাকছে? প্রথমে তার মনে হ'ল মা বুঝি, কিন্তু তারপরই বুঝল মা নয়, আর কেউ ডাকছে। হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক ভরে উঠল। আর এক আশ্চর্য সুন্দর রঙ্গীন ফুলে-ভরা গাছ সেই আলোর কোলে ভেসে উঠল।

ছোট ছেলেটি চোখ রগড়াতে লাগল—"এসব কি সত্য? এমন চমৎকার আলো, এমন আশ্চর্য সুন্দর গাছ সে ত' কখনও দেখেনি, কোথায় সে রয়েছে তাও ত' বুঝতে পারছে না!"

চারদিক এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভরে রয়েছে—আর সেই জ্যোতির ভিতর দিয়ে কত অসংখ্য সুন্দর সুন্দর পুতুল দেখা যাচ্ছে। ছোট ছেলেটি ভাল করে চেয়ে দেখতে লাগল—পুতুল কোথায়? ওরা ত' সবাই জীবন্ত, তারই মত ছোট ছোট ছেলেরা আর মেয়েরা। কি সুন্দর দেখতে সবাই, কি চমৎকার পোষাক-পরিচ্ছদ।

নাচতে নাচতে ছোট ছেলেমেয়ের দল এগিয়ে এল। ছোট ছেলেটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই তার মুখে চুমু খেতে লাগল। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলতে লাগল—"এস ভাই কাছে এস। আমরা সবাই খৃষ্টোৎসবের গাছ নিয়ে খেলা করব।"

অবাক হয়ে ছোট ছেলেটি তাদের দিকে তাকাচ্ছে এমন সময় দেখল তার মা পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাকে দেখছেন। "মা, মাগো! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? কি সুন্দর এই জায়গাটা, কি চমৎকার আমার এইসব বন্ধুরা। কি সুন্দর ওই আলোর গাছ!" বলতে বলতে ছোট ছেলেটি ছুটে গিয়ে তার মার গলা জড়িয়ে চুমু খেল। তারপর ছোট ছেলেদের হাত ধরে খেলা করতে লাগল। খেলা করতে করতে ছোট ছেলেটি বলতে লাগল—"কে ভাই তোমরা সব? আমার প্রিয় বন্ধু, তাই না?"

হাসতে হাসতে তারা ছোট ছেলেটির গলা জড়িয়ে বলতে লাগল—"হ্যাঁ ভাই, আমরা সবাই প্রিয় বন্ধু। ওই যে আলোর গাছ দেখছ, ও হ'ল খৃষ্টোৎসবের গাছ। যে সব ছেলেদের নিজেদের গাছ নেই তারা ও গাছটি নিয়ে আজকের দিনে আমোদ করবে বলে আমাদের সকলের পিতা যীশুখৃষ্ট ওই গাছটি উপহার দিয়েছেন।" ছোট ছেলেমেয়েরা আবার বলতে লাগল—"আমরা সবাই ঠিক তোমারই মত গরীব ছিলাম, কেউ কেউ শীতের রাতে রাস্তার ফুটপাথে পড়ে মারা গিছলাম। কেউ কেউ গরীব মার কোলে শুয়ে না খেতে পেয়ে গলা শুকিয়ে ইহলীলা শেষ করেছিলাম। ঠিক তুমি যেমন কষ্ট পেয়েছিলে, আমরা সবাই পৃথিবীতে তেমনি কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন

আমরা সবাই স্বর্গে এসেছি, এখন আর আমাদের কোন কষ্ট নাই। চারদিকে চেয়ে দেখ না ভাই, কত আনন্দে আমরা এখন রয়েছি।" ছোট ছেলেটি চারদিক চেয়ে দেখতে লাগল। দেখল সব গরীব ছেলেমেয়েরাই এখানে এসে পরী হয়ে গেছে। এখানে তারা সবাই যীশুখৃষ্টের আদরের অতিথি। তাদের সবায়ের মাঝখানে যীশুখৃষ্ট দাঁড়িয়ে রয়েছেন শান্তি ও করুণামাখা তাঁর চোখের দৃষ্টি। তিনি তাঁর দু'খানি হাত তাদের মাথার উপর রেখে আশীর্বাদ করছেন।

একটু দূরে ছেলেমেয়েদের গরীব মায়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে তাঁদের জল, মুখে তাঁদের হাসি। মায়েদের ছেলেদের ঘিরে স্বর্গের মধুর বীণা মধুর সুরে বেজে উঠল। ঠিক সেই সময় পৃথিবীর সেই শহরে ভোর হ'ল। রাস্তার এক ঝাড়ুদার ঝাঁট দিতে দিতে দেখল একটি গরীব ছোট ছেলে কাঠের বোঝার উপর মাথা রেখে শীতে জমে মারা গেছে। পোষাক তার ছেঁড়া টুকরো টুকরো, দেখলেই বোঝা যায় অনেকদিন খেতে পায়নি।

বেলা হ'ল। শহরের লোকেরা আর একটি মৃতদেহ দেখতে পেল। অন্ধকার ঘরের কোণে জীর্ণ শীর্ণ একটি গরীব মেয়ের মৃতদেহ। ঘরের কোণে এক বুড়ী বসেছিল সে বলল—"না খেতে পেয়ে রোগে ভুগে ও কাল মারা গেছে। ওর ছেলেও না খেয়ে বোধ হয় রাস্তায় পড়ে মারা গেছে।"*

* বিদেশী গল্পের ছায়ায়

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার চিত্র-পরিচয়

প্রথম সারি: (৬৬) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৭ বি, ষ্টার লেন কলিকাতা; (৬৭) কুমারী ছন্দা বাগচী, টাকী, ২৪ পরগণা; (৬৮) শ্রীঅপর্ণা গাঙ্গুলী, চিহারতা, অমৃতসর। দ্বিতীয় সারি: (৬৯) শ্রীঅর্চনা ও বন্দনা রায় (ঠিকানা পাওয়া যায় নি); (৭০) শ্রীছন্দারাণী শেঠ, ৩, দ্বারিক গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা; (৭১) শ্রীসুস্মিতা ঘোষ, ১৪এ, নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। তৃতীয় সারি: (৭২) শ্রীঅশ্রুবিন্দু বসু, দশঘরা, হুগলী; (৭৩) শ্রীদেবপ্রসাদ দত্ত, ২০০, সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা; (৭৪) শ্রীসুশান্তকুমার মুখার্জী, রামপুরহাট, বীরভূম।

ভূমিকম্প কি ও কেন?

শ্রীকল্যাণকুমার দে

নৈসর্গিক লীলার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আত্মপ্রকাশ হ'ল ভূমিকম্প। মানুষের হাতে গড়া জগতের সমস্ত পরিচিতি এক নিমেষে নিঃশেষ করে ধূলায় মিশিয়ে দেবার স্পর্ধা একমাত্র এরই আছে। গত ১৫ই আগষ্টের পর হ'তে যে ভীষণ ভূমিকম্পের লীলা উত্তর আসাম জুড়ে চলেছিল, তার মারফৎ কত যে মূল্যবান জীবন, অর্থসম্পদ চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। মনে মনে তোমরা হয়ত প্রশ্ন করছ, এই ভূমিকম্প কি? কেন বার বার পৃথিবীতে ধ্বংসের সৃষ্টি ক'রে এই ভূমিকম্প মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

ভূতত্ত্ববিদরা ভূমিকম্পের সাধারণতঃ চারটি কারণ নির্দেশ করেন :—

(১) পৃথিবীর অনেক পাহাড় যথা, হিমালয়, আণ্ডিজ প্রভৃতি এখনও সঠিক অবস্থান স্থির করতে সক্ষম হয়নি এবং এদের ভিতর অনেক ফাটল আছে। এই দুর্বল অংশযুক্ত পাহাড় যখনই নড়াচড়া ক'রে নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে চেষ্টা করে, তখন দুর্বল অংশ হ'তে পৃথিবীর ভিতর বিরাটাকৃতি পাথর ধ্বসে প'ড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভূমিকম্প দেখা দেয়।

(২) ভূগর্ভ এখনও তরল অবস্থায় আছে। অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাস ও তরল ধাতব পদার্থ এক স্থান হ'তে আগ্নেয়গিরির ভিতর দিয়ে পথ ঠিক করে বার হওয়ার চেষ্টায় পাহাড়ের নীচে চাপ দেয়, ফলে চারিপাশে ভূমিকম্পের আবির্ভাব হয়।

(৩) সমুদ্রের তলায় বহুদিন পূর্বকার পাহাড় অনেক সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে দুর্বল তলদেশের জন্য ভূগর্ভে প্রবেশ করে, তার ফলেই সমুদ্রতীরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দেয়।

(৪) পাহাড়ের ভিতর ও সমুদ্রের তলায় অনেক সময় নৈসর্গিক কারণে ফাটলের সৃষ্টি হয়। সেই পথে বৃষ্টির অথবা সমুদ্রের জল অত্যন্ত উত্তপ্ত পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ করে ও প্রচণ্ড গ্যাসের চাপে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত ছাড়াও ভূগর্ভের অন্তস্থিত বৈদ্যুতিক কার্যকলাপও ভূমিকম্প সৃষ্টির অন্যতম কারণ ব'লে গৃহীত হয়, যদিও এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে।

বর্তমান কালে পৃথিবী অনেক ধ্বংসের ভিতর পড়ে এর ভয়ঙ্কর ক্রিয়াকলাপের সম্যক তাৎপর্য গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। ১৭৬২ খৃঃ চট্টগ্রামের ভূমিকম্পে সমুদ্রের প্রসার অনেক দূর হয়েছে ও অনেক জমি জলের তলায় তলিয়ে গেছে, মানুষ জীবজন্তুর প্রাণহানিও অস্বাভাবিক রকম হয়েছে। ১৮৯৭ খৃঃ আসাম ও পূর্ববঙ্গ এবং জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের অংশবিশেষে যে প্রবল

ভূমিকম্প দেখা দেয়, তার তুলনা প্রায়ই দেখা যায় না। ১৭৫৫ খৃঃ ভূমিকম্পে লিসবন শহর ধ্বংস হয় ও আল্পসের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি বহু ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯২৩ সালে জাপানের ভূমিকম্পে স্থানীয় প্রায় এক চতুর্থাংশ লোককে কষ্টভোগ করতে হয়, এবং বহুলোক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইতালির গ্রামাঞ্চল ও মধ্য-ইউরোপ ভূমিকম্পের প্রকোপে নষ্ট হয়। এই সময় ভারতবর্ষের সীমান্তেও ভূমিকম্প অল্পবিস্তর ঘটেছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমভাগে কোয়েটার ভূমিকম্পে সমস্ত শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং বহুলোক ও জীবজন্তুর প্রাণনাশ হয়। ১৯৩৪ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বিহারে যুগান্তকারী ভূমিকম্পে সমস্ত প্রদেশ, বিশেষ করে মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা জেলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ-ধরনের ভূমিকম্প পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু ভারতবর্ষে পর পর ঘটেছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করে,পণ্ডিতরা জানিয়েছেন—হিমালয়ই হ'ল এদের উৎপত্তিস্থল।

বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ভূমিকম্প আসামে ১৯৫০ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট হ'তে সুরু হয়েছিল। উত্তর আসাম, বিশেষ করে ডিব্রুগড়, উত্তর লক্ষ্মীমপুর প্রভৃতি অঞ্চল অস্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং সুবর্ণশ্রী নদী আংশিক গতি পরিবর্তন করেছে এই ভূমিকম্পের ফলে। গ্রামের পর গ্রাম সভ্যজগত হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কতলক্ষ নরনারী যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল বা কত জীবজন্তু প্রাণ হারিয়েছিল তার হিসাব করা অসম্ভব।

এই ভূমিকম্পের কারণ এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি তবে এই মতগুলি চালু রয়েছে :—

(১) একদল জানাচ্ছেন, আসাম সীমান্তে দশহাজার বছেরর সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ফুজিয়ামার মত হঠাৎ জেগে ওঠার চেষ্টা করায় এই বিরাটতম ভূকম্পের সৃষ্টি হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ এঁরা বলছেন, সুবর্ণশ্রীর জলে গন্ধক ও অন্যান্য গলিত ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া দুরধিগম্য অঞ্চলসমূহে নাকি ধোঁয়ায় ঢাকা পাহাড়ও দেখা গিয়েছে।

(২) অন্য মতে, হিমালয়ের অবস্থার চাঞ্চল্যই ভূমিকম্প সৃষ্টির জন্য দায়ী, কারণ বিংশ শতাব্দীর সুরুতে যে শৃঙ্গের উচ্চতা ছিল ২৯,০০২ ফিট, সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে এর উচ্চতা দেখা গেছে ২৯,২০০ ফিট, প্রায় ১৯৮ ফিট উচ্চতা বৃদ্ধিকে ভূমিকম্পের কারণ বলে ধরা হয়েছে।

(৩) একদল ভূতত্ত্ববিদ বলছেন, হিমালয়ের সীমান্তবর্তী কোন পাহাড়ের ভিতর চ্যুতি বা ধ্বস হ'তে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি। সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে তাঁরা নাকি এর প্রমাণ পেয়েছেন।

(৪) অতীত-দ্রষ্টা একদল বলছেন জাপানী ভূতত্ত্ববিদ্‌রা ১৯০২ সালে নাকি বলেছিলেন, আসাম হ'তে পাঞ্জাব পর্যন্ত মাটি এক বিরাট ফাটল হয়ে বসে যাবে, যার উৎপত্তি ভূকম্পের কারণে

হতে পারে। আসামের ঘন সন্নিবিষ্ট ফাটল এবং এই পূর্ব-উল্লিখিত অঞ্চলের অন্তর্গত ভূপৃষ্ঠের (ময়মনসিং অঞ্চলে) অন্তস্থিত অস্বাভাবিক গর্জনকে এঁরা সাক্ষী করেছেন।

যাই হোক ভূমিকম্প বন্ধ করা যেমন কোন দিনই সম্ভব হবে না, তেমনি এর সঠিক কারণ নির্দেশ করাও কোন দিন সঠিকভাবে বোধ হয় কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ভূমিকম্পের ফলে, পাহাড় ধ্বংস হয়, বন্যা, জলপ্লাবন ও শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিবর্তন হয়, চ্যুতি ও ফাটল সৃষ্টি হয়। মানুষের ইতিহাসে এর ধ্বংসলীলা সত্যিই অদ্ভুত! এর সংঘটনায় উষ্ণ প্রস্রবণ, নদীর গতি পরিবর্তন, বনজঙ্গলের সমাধি প্রভৃতি বহু প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা যায়।

ভূমিকম্প উৎপত্তিস্থল হ'তে ঢেউয়ের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জলে ঠিক ঢিল ফেলার মত, এর কম্পন চলে ভেতরে ভেতরে, কাজেই চতুর্দিকে এর ধ্বংসলীলার সঙ্কেত পাওয়া সম্ভব। এই ঢেউ আলোকতরঙ্গ ও শব্দতরঙ্গের অনুরূপভাবে প্রতিফলন ও প্রতিসরণে সক্ষম, আবার বিদ্যুচ্চুম্বক শক্তির মত বিরুদ্ধ মতেও পরিবর্তনে সক্ষম। সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে এর উৎপত্তি, আকার ও অবস্থান অনুসন্ধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্ভব।

পণ্ডিতরা অনুসন্ধান করে বলেছেন, ভূকম্পের প্রধান অঞ্চলগুলি পাহাড় ও আগ্নেয়গিরির এক বিশেষ শৃঙ্খলে পৃথিবীতে সংবদ্ধ। হিমালয় হ'তে সুরু করে গারো, খাসিয়া, লুসাই, আরাকান ইয়ামো, বারমাইয়ামো হয়ে এই শৃঙ্খল সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। জাপানে ফুজিয়ামা, আমেরিকায় কটোপাক্সি, চিম্বোরাজো, আগুিঞ্জ, ইতালিতে ভিসুভিয়াস, আইসল্যাণ্ডে হেক্ল, সিসিলির এট্‌না, এরা সকলেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ; অবশ্য কারু মতে এগুলি পূর্ব-পশ্চিমে দুইভাগে বিভাজ্য। এই সমস্ত পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই ভূকম্প অধ্যুষিত, সেইজন্য এই সমস্ত অঞ্চলে ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্য হাল্কা দোলন-নিরোধক জিনিসে বাড়ীগুলি তৈরী করা হয়, যদিও এ সমস্ত দিয়া ধ্বংসলীলার হাত এড়ানো সম্পূর্ণভাবে কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এই সব থেকেই বোঝা সম্ভব যে, নৈসর্গিক শক্তির কাছে আমরা কত ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তি কত নগণ্য।

যারা বেশী কথা বলে, তারা মিথ্যে কথা বলে; যারা বেশী কথা কয়, তারা বাজে কথা কয়; যারা সব কথাতেই কথা বলে, তাদের ভেতর ফাঁকা। বাক্‌-সংযমের অনেক গুণ; তবে একেবারে চুপচাপও ভাল নয়।

পেটুকে ক্যাব্‌লা

শ্রীকুড়রাম ভট্টাচার্য

নামটি যে তার কেবলরাম, "ক্যাব্‌লা" লোকে বলে,
বাস করে সে বংশবাটীর বাঁশবাগানের তলে।
বুদ্ধি তাহার বেজায় মোটা, পেট্‌টি নিয়ে ব্যস্ত,
ভূতের-বোঝা বইতে পেলে ঠিক সে গাধা আস্ত।
মায়ের মনে সাধ হয়েছে দিয়ে ছেলের বিয়ে,
আনন্দেতে ঘর করবেন টুকটুকে বৌ নিয়ে।
পাশের বাড়ীর পঞ্চা এসে বিয়ের খবর বল্‌লো
সময় যে নেই, পুরুত ডেকে দিনটি বিয়ের করলো।
জাঁক-জমকে জমলো বিয়ে, পড়শীরা সব জুটলো
এবার বুঝি কেবলরামের ফুলটি বিয়ের ফুট্‌লো।
টোপর মাথায় বর চলেছেন সঙ্গে লয়ে যাত্রী
নবদ্বীপের "ব্যাছরা" পাড়ায় বিয়ের আছে পাত্রী।
ভুষ-ভুষিয়ে কলের গাড়ী ছুটলো নানা রঙ্গে
সঙ্গীরা সব হল্লা করে কেবলরামের সঙ্গে।
থাম্‌লো গাড়ী গুপ্তীপাড়ায় ময়রা হাঁকে মোণ্ডা
দৌড়ে গিয়ে নাম্‌লো কেবল, কিন্‌লো দশেক গণ্ডা।
ভেংচি কেটে ছুটলো গাড়ী পেট না হ'তে ঠাণ্ডা
গলায় লেগে মোণ্ডা-মেঠাই যায় বুঝি রে প্রাণটা!
ছুট্‌ছে যত হাওয়াই গাড়ী, দ্বিগুণ ছোটে ক্যাবলা
ড্যাব্‌রা চোখে কেবলবাবু হলেন এবার ভ্যাব্‌লা।

সহ্যের মত শক্তি আর নেই! সহ্যশক্তি মানুষের অন্তরের শক্তি বৃদ্ধি করে, মানুষকে শুদ্ধ করে—স্থির, ধীর, সংযমী করতে সাহায্য করে, এবং সংসারে তার ফল হয় অত্যন্ত শুভ।

জাতির কল্যাণে

(ইতিহাস)

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

দেশ ও জাতির কল্যাণে অকাতরে বিপুল স্বার্থত্যাগ করে বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়েছেন, এমন অনেক মহাপুরুষের নাম তোমারা নিশ্চয়ই শুনেছ। আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিদেশেরও এমনি অনেক মহাত্মার নাম করা যেতে পারে: আজ তাঁদেরই একজনের কথা আমি তোমাদের এখানে বল্‌বো।···

গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়: ইংলণ্ডের সম্মুখে তখন নানা জটিল সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আবার তার মধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনে রকমারি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীর সমস্যাটাই ছিল সবচেয়ে দুরূহ।

বিস্ফোরক তৈরী কর্‌তে এসিটোন নামক একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য চাই-ই চাই। অথচ এই অতি আবশ্যক জিনিসটির জন্যে ইংলণ্ডকে সব সময় আমেরিকার মুখ চেয়ে বসে থাক্‌তে হ'তো···আমেরিকা থেকে জিনিসপত্র আনারও তখন সুবিধা ছিল না। একে সুদূর পথ,—তায় নানান বিঘ্ন-বিপদে পথ সর্ব্বদাই কণ্টকিত হয়ে থাক্‌তো।

কিন্তু এসিটোন না হ'লেও তো চলে না!···যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে হ'লে, যেমন করেই হোক্, 'এসিটোন' আনিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী কর্‌তেই হবে। নচেৎ পরাজয় অনিবার্য। আর পরাজয়ই যদি হ'লো,—তবে আর ইংলণ্ডের গৌরব বা মান-সম্মান থাক্‌লো কোথায়? সবই যে ডুবে যাবে অতল তলে!

সুতরাং রাষ্ট্রনেতারা বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবেই চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁরা অনেক ভেবে দেখ্‌লেন,—'এসিটোন' যদি তাঁরা নিজেরাই তৈরী ক'রে নিতে পারেন,—তবেই তাঁদের একটা গুরুতর সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়: যুদ্ধজয়ের পথও হ'য়ে ওঠে সুগম। কিন্তু এসিটোন তৈরীর উপায় তো তাঁদের জানা নেই!

এমন সময় হঠাৎ তাঁরা এমন একজন বিজ্ঞানীর সন্ধান পেলেন,—'এসিটোন' তৈরীর পদ্ধতি যাঁর অনেকটা জানা আছে। রাষ্ট্রনেতারা তখন তাঁকেই আহ্বান কর্‌লেন,—উৎকৃষ্ট 'এসিটোন' তৈরী যে উপায়ে হ'তে পারে,—তার গবেষণার জন্যে।

তাঁদের আহ্বান পেয়ে বিজ্ঞানীও এসে সোৎসাহে যোগ দিলেন গবেষ.
জানালেন,—এর জন্যে তাঁরা যে কোন পরিমাণ অর্থব্যয় করতে রাজী আছেন। কি'ও নেতারা
চাই। ইংলণ্ডের গৌরব বাঁচাতেই হবে।

বিজ্ঞানী দিবারাত্র পরিশ্রম করতে লাগলেন। কি সে অধ্যবসায়!—যেন পণ করেছেন, হয় জীবনপাত করবেন,—নব সাফল্য নিয়ে আসবেন। দুটোর একটা না হলে তিনি আর ছাড়ছেন না!

কথায় বলে, উদ্যোগী পুরুষের প্রতিই ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন্।...যেখানে উদ্যম একান্ত আন্তরিক এবং নিরলস,—জয় সেখানে অনিবার্য। বহুদিন কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর বিজ্ঞানীর গবেষণাও একদিন জয়যুক্ত হলো। তিনি আবিষ্কার করলেন,—শ্বেতসার জাতীয় দ্রব্য—যেমন আলু, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি পচিয়ে ('ব্যাকট্রিয়ার' সাহায্যে) প্রচুর পরিমাণে 'এসিটোন' তৈরী হ'তে পারে।

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনেতারা বিজ্ঞানীর গবেষণার ফল পরীক্ষা ক'রে দেখে বিপুল আনন্দে ও আশায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন!...সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা-সঙ্কুল ইংলণ্ডের একটা দারুণ সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল।...প্রচুর পরিমাণে 'এসিটোন'ও তৈরী হতে লাগলো বিজ্ঞানীর নব আবিষ্কৃত পন্থা অবলম্বন ক'রে। ইংলণ্ডবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লো,—যাক্, তাদের মান-মর্যাদা এবার তবে রক্ষা পাবে!

লয়েড জর্জ তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। তিনি একদিন প্রভূত সম্মানে বিজ্ঞানীকে 'পার্লিয়ামেণ্ট' ভবনে আমন্ত্রণ করে বললেন,—আপনি আমাদের একটি দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছেন,—এজন্য আপনি প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসীরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কিন্তু আমাদের দিক দিয়াও একটা কর্তব্য আছে। তাই ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করতে চাই। অগাধ ঐশ্বর্য মহা-সম্মানজ্ঞাপক উপাধি,—রাজ-সরকারে বিশিষ্ট উচ্চপদ—আপনি যা চাইবেন, আমি সানন্দে আপনাকে তাই দিয়ে নিজেদেরই কৃতার্থ মনে করবো।

বিজ্ঞানী মৃদু হাস্‌লেন এবং সবিনয়ে বল্‌লেন,—আপনাকে ধন্যবাদ! আমার সৌভাগ্য যে, আমি আমার সাধনায় সাফল্যলাভ ক'রে আপনাদের প্রীতি-অর্জন করতে পেরেছি।...কিন্তু নিজের জন্য চাইবার মত আমার কিছুই নেই। যদি সত্যিই আমাকে পুরস্কৃত করতে চান্ তবে—

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। লয়েড জর্জ সাগ্রহে বল্‌লেন,—বলুন, কি আপনার কাম্য থাম্‌লেন কেন? যদি দেওয়া আমাদের পক্ষে সাধ্যের বাইরে না হয়,—অবশ্যই আপনার আশা পূর্ণ হবে।

বিজ্ঞানী তখন ধীরে ধীরে বল্‌লেন—তাঁর কণ্ঠ যেন ভারী মনে হ'তে লাগলো—"দেখুন, জগতে 'নিজের বাসভূমি' বল্‌তে যাদের কোন স্থান নেই,—তাদের মত হতভাগ্য জাতি আর কে আছে? আমরা ইহুদী জাতি—নিজের দেশ ব'লে গর্ব বোধ করতে পারি,—এমন স্থান এই বিশাল বিশ্বে আজ আমাদের কোথায়? সেইজন্যে আমার নিবেদন,—যদি পৃথক দেশহিসাবে প্যালেষ্টাইনকে ইহুদী জাতির হাতে তাদের বাসভূমি ব'লে ফিরিয়ে দেওয়া হয়,—তবেই আমি কৃতার্থ হই। তাতে একটা জাতির উপকার হবে। আমার ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য সম্মান যার কাছে অতি তুচ্ছ;—এমনকি কিছুই নয়! আপনি যদি পারেন, তবে তারই ব্যবস্থা করুন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে ও গভীর শ্রদ্ধায় লয়েড জর্জ বিজ্ঞানীর দিকে চাইলেন। তাঁর স্বজাতি-প্রীতি প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট ক'রে তুল্‌লো। ধীরে ধীরে তিনি বল্‌লেন,—বেশ, তাই হবে। আমি তারই ব্যবস্থা করবো। স্বজাতির কল্যাণের জন্য আপনার এই স্বার্থত্যাগের সত্যিই তুলনা নেই।

বিজ্ঞানী সবিনয়ে মাথা নত করলেন।

* * *

অতঃপর লয়েড জর্জ উপযুক্ত কমিশন বসিয়ে নিজে যথারীতি তদারক-তদ্বির ক'রে প্যালেষ্টাইন ইহুদীদের হাতে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

ইহুদীদের হাতে ফিরে আসবার পর এই 'প্যালেষ্টাইন'ই পরিণত হ'লো ইস্‌রাইল রাষ্ট্রে'।—আর সমগ্র ইহুদী জাতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ সেই বিজ্ঞানীরই কণ্ঠে জয়মাল্য দিয়ে—তাঁকে বরণ করলো তাদের নব-গঠিত রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টরূপে।

এই মহাপ্রাণ বিজ্ঞানীর নাম কি জান?…ডাঃ কাইম হাইজম্যান। স্বজাতির কল্যাণে বিপুল স্বার্থত্যাগ ক'রে ইনি প্রতি ইহুদীর অন্তরে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।…বিশ্বের ইতিহাসেও এঁর নাম চিরদিন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে।

পরিশ্রমে লক্ষ্মী বাধ্য, সত্যে নারায়ণ,
মিষ্টালাপ গুণে বাধ্য মানবের মন
প্রেম ভক্তি গুণে বাধ্য হয় ত্রিভুবন।

—রামপচুয়া

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এতক্ষণে সমস্ত রহস্যটা রাতুলের কাছে স্পষ্ট হয়ে এল। ছি ছি এই নিয়ে এত কাণ্ড! এইবার যখন সে নিজে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন অবশ্য সকলের ধারণা বদলে যাবে। মিছিমিছি সেই হরিদাস বেচারাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। ও তো সন্নিসী মানুষ। সংসারধর্ম ওর পোষায় না। ভবতোষবাবুর মুখেই শুনেছে সে। নইলে ভবতোষবাবুকে একলা ফেলে কোথায় কোন্ হিমালয়ের গুহার উদ্দেশে কিম্বা কোন্ নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছিল। আবার ঘুরে ঘুরে এ-কোন্ সংসারের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে!

কান পেতে শুনতে লাগলো রাতুল—

ক্ষিতীনবাবু বলছেন—রাখো তোমার বুজ্রুকি—তোমার জন্যে একটা লোক জীবনপাত করছে, তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে দিনরাত পাগলের মত প্ল্যান্চেট্ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে—চাকরি ছেড়ে দিয়েছে—আর তুমি কিনা—

বাইরে গোবিন্দর গলা—বাবু—

—কে গোবিন্দ এলে—বাড়িতে খবরটা দিয়ে এসেছ—

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

নিত্যানন্দ সেন এতক্ষণে কথা বললেন—তুই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় গোবিন্দ—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, গোবিন্দ কেন বসে থাকবে—কিন্তু তুমি খাবে না নিত্যানন্দ?

বাবা বললে—আমার ক্ষিদে নেই—

—ক্ষিদের আবার থাকাথাকি কি?—ও সব পাগলামি ছাড়ো—এখন ছেলে ফিরে এলো বাড়িতে, কোথায় আমোদ-আহ্লাদ করবে তা নয়—

বাবা কিছু কথা বললে না।

ক্ষিতীনবাবু হরিদাসের দিকে চেয়ে বললেন—তোমারও খাবার দেওয়া হোক্—বলার সঙ্গেই বসে পড়—আগে তো একসঙ্গেই খেতে বসতে—তুমি না খেলে নিত্যানন্দর খাওয়া হতো না মনে আছে,—মনে নেই ভাই তোমার ?—

তারপর গোবিন্দকে ডেকে ক্ষিতীনবাবু বললেন—তা'হলে বাবু আর খোকাবাবুর' দু'জনেরই একসঙ্গে খাবার দিয়ে দাও গোবিন্দ—একি, এতদিন পরে হারানো ছেলে ফিরে এল, আর তোমাদের কারো গা নেই—

হরিদাস মুখ তুললে এবার। বললে—আমি রাত্রে কিছু খাইনে যে—

—সে কী—বরাবর তো রাত্রে খেতে—

—আগে খেতাম, কিন্তু দীক্ষা নেবার পর থেকে আর খাইনে—

—দীক্ষা ? দীক্ষা-টিক্ষা সব ভুলে যাও—

আজ্ঞে না, দীক্ষা ভুলতে পারবো না, গুরুর নির্দেশ—

—গুরু ! কে তোমার গুরু ?—চল দিকিনি যাই সবাই মিলে তোমার গুরুর কাছে—ভদ্রলোকের ছেলেদের ধরে বিষমন্ত্র দেওয়া—কোথায় তোমার গুরু ?—

—আজ্ঞে, সে অনেক দূর—

—শুনিই না কতদূর—

—হিমালয়ের দক্ষিণে—টেরাই-এর জঙ্গলে—

—তা' বেশ, যাওয়া যাক্ সেখানে—তোমার নাম যে রাতুল সেন, তোমার বাবার নাম যে নিত্যানন্দ সেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এ যে তোমার বাড়ি—তুমি যে যুদ্ধে গিয়েছিলে বাবাকে না বলে—তারপর কোথা দিয়ে কেমন করে যে কোন সাধুর পাল্লায় গিয়ে পড়ে সন্নিসী হয়েছ, ছাই-ভস্ম দীক্ষা নিয়েছ—সব আমি প্রমাণ করে তবে ছাড়বো—

ক্ষিতীনবাবু এবার বাবার কাছে গিয়ে বললেন—সাউথ ক্যালকাটার পুলিসের ডেপুটি কমিশনার আমার বিশেষ বন্ধু বুঝলে, তা'কে একবার টেলিফোন্ করবো নাকি—ও হিমালয়ই হোক আর যেখানেই হোক—ঠিক সব ধরে ফেলবে সে—

বাবা পেছন ফিরে বসেছিলো। কথা শুনে তেমনি বসেই রইলো। মাথাও তুললো না। শুধু হাত তুলে জানালো—না, থাক্ কাজ নেই—

ক্ষিতীনবাবু বললেন—তা'হলে কী করতে চাও—বল—

বাবা বললে—তোমাকে এখন কিছুই করতে বলছিনে—

ক্ষিতীনবাবু বললেন—কিন্তু এও বলে রাখছি ভাই, খোকা যদি একটু সুযোগ পায় তো বাড়ি ছেড়ে পালাবে—

বাবা বললে—আমাকে একটু ভাবতে দাও—

—এতে ভাববার কী আছে ?—

—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—

—কিন্তু তোমাদের দু'জনকে এ অবস্থায় ফেলে আমিই বা কেমন করে চলে যাই বল—তুমিও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলে, ওদিকে খোকাও খাবে না বলছে—আমি তোমার বন্ধু হয়ে তাই দেখতে পারি নাকি—

বাবা বললে—তা'হলে ওকে তুমি খাইয়ে নিয়ে এস—আমি একটু বসে বসে ভাবি—

—তা বেশ, ভাবো না—কিন্তু শেষে তোমাকেও খাইয়ে তবে আমি বাড়ি যাবো ভাই—বলে ক্ষিতীনবাবু হরিদাসকে হাত ধরে ওঠালেন।

বললেন—চলহে—চল আমার সঙ্গে—

—কোথায়—

—চলই না আমার সঙ্গে—

হরিদাসকে জোর করে টানতে টানতে ক্ষিতীনবাবু দরজা খুলে বাইরে গেলেন। ওরা দু'জনে বাইরে যেতেই মনে হলো বাবা যেন মাথা তুললো। দরজার ফাঁক দিয়ে রাতুল ভালো করে দেখতে লাগলো। বাবা যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। রাতুলের মনে হলো—এখনি, এই মুহূর্তে বাবার বুকের মধ্যে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাবা এবার নড়ে উঠলো। আবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর ধীর স্থির পায়ে পায়চারি করতে সুরু করলো। সেই আগেকার মতন। গায়ে শাল জড়ানো। কিন্তু সত্যিই বাবার বয়েস হয়েছে। সামনের দেয়ালে মা'র সেই বড় অয়েল-পেণ্টিংখানার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো একবার; একদৃষ্টে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ সেইদিকে। তারপর উত্তরের দেয়ালে রাতুলের নিজের ফটোটার সামনে এসে দাঁড়ালো।

রাতুলের সেই ছোট ফোটোখানাকে অনেক বড় করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। যুদ্ধে যাবার পথে বর্মায় নেমে সেই ফোটোখানা তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাবাকে। মিলিটারি পোষাক-পরা চেহারা। কোমরে ক্রস্ বেল্ট্। মাথায় ফোরেজ্ ক্যাপ্। সেই ফোটোটাই রাতুলের শেষ ছবি। তারপর আর কোনও ছবি তোলা হয়নি। ওইখানার আশেপাশে রাতুলের ছোটবেলাকার আরো নানা ছবি টাঙানো রয়েছে।

বাবা সেই দিকেই চেয়ে দাঁড়ালো।

মনে হলো ঠোঁঠ দু'টো তার যেন মৃদু মৃদু নড়ছে। রাতুলের ছবি লক্ষ্য করে কি যেন বলছে। যেমন করে লোকে রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তেমনি করে। কিন্তু বাইরে কোনও শব্দ নেই। যেন আত্মায়-আত্মায় যোগাযোগ। অন্তরে অন্তরে কানাকানি।

রাতুল এতদিনে বুঝতে পারলে—তার মৃত্যুর সংবাদ, তার বিচ্ছেদ—কতখানি কষ্ট দিয়েছে বাবাকে।

রাতুল দেখলে—বাবা তারই ফোটোখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আর দু'গাল বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে অজস্র জল ঝড়ে পড়ছে। বাবাকে কখনও কাঁদতে দেখেনি রাতুল। বরাবর দার্শনিক মানুষ বাবা। আজ বিশেষ করে যেন বাবাকে চিনতে পারলে সে। তার লুকোচুরির অর্থ কি! কোথাকার কাকে মিথ্যে টানাটানি চলেছে—অথচ সে তো এখনি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে।

বাবার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে রাতুলেরও চোখ ভিজে এল। সে সত্যিই বড় নিষ্ঠুর—বড় নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছে সে। বাবার স্নেহের অপমান করেছে সে—মর্যাদাহানি করেছে।

রাতুল উঠলো।

অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে চারদিকে জিনিসপত্র ঠাহর করে দরজা দিয়ে বেরবার চেষ্টা করলে। এতক্ষণ ক্ষিতীনবাবু হরিদাসকে নিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে হয়ত তাকে খাওয়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কী কর্মভোগ হরিদাসের। সে সংসার-বিরাগী হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় কোন গুহায় বসে ধ্যান করবে—না কোন্ ঘটনাচক্রে পড়ে এই বিপত্তি। হয়ত ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে—লোকালয়ের, মানুষের সংস্পর্শে এসেই হয়ত এই দুর্ভোগ।

রাতুলের মনে পড়লো—হরিদাসকে লেখা সেই চিঠিগুলো। কোথায় সেই কোন্ বাঙলা দেশের এক গ্রামের একটি মেয়ে। নাম তার শৈল। বছরের পর বছর চিঠি লিখেই চলেছে তার পল্টুদাকে। পল্টুদার চিঠি হয়ত কোনও দিনই সে পাবে না। সেই তার বুড়োশিবের মন্দিরে পুজো দেওয়া হয়ত কোনও কাজেই লাগবে না আর। তবু একজন বৃদ্ধা আর একটি মেয়ে হয়ত হরিদাসের পথ চেয়েই বসে থাকে আজো···। হয়ত এডেনের মা-আলা রোডের ওপারে ভবতোষবাবু এখনও আশা করে—রাতুল একদিন ফিরবে। ফিরে বর্মায় হরিদাসের দাদামশায়ের উইল করে যাওয়া দু'লক্ষ টাকার সম্পত্তি হরিদাস সেজে আদায় করে নেবে। হয়ত মনে আশা আছে—সেই দু'লক্ষ টাকা যে-ই নিক্, তার কিছু অংশ দেবে ভবতোষবাবুকে।

একদিন ভাইদের সংসার থেকে যে-মানুষটা বেরিয়ে এল পৃথিবীর পথে—এক স্নেহ-নিবিড় ঘর বাঁধবে বলে, সে ঘর বাঁধলো যেখানে সেটা হয়ত মাটি নয়, বালির চর। নিজের দেশ নয়, নিজের পৃথিবী নয়। তবু বন্ধু বলে সঙ্গে যাকে নিয়েছিল—সে-ও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন!...

এবার হয়ত রাতুলের যাত্রা শেষ। পৃথিবী পরিক্রমার পর আজ যখন সে নিজের কোটরে এসে প্রবেশ করতে চলেছে, তখন আরো একজনকে তার মনে পড়লো। সে ভোম্বল।

ভোম্বল তাকে খুঁজে বেড়াবে সারা জীবন?

সে কি তার—মা?

ভোম্বল কোন্ আদর্শ নিয়ে অনির্দিষ্ট যাত্রা করেছে?

সে কি তার—ম্যাজিক?

ওর মা'র পেছনে ধাওয়া করা যেন একদিন শেষ হয় ঈশ্বর!

আর ম্যাজিক?

ইন্দ্রজালের মোহও যেন একদিন ঘুচে যায় ওর!

রাতুল আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এল। সারা বারান্দাটা অন্ধকার। বারান্দার ওপর দিয়ে পাশের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাতুল। তারপর ভেজানো দরজাটা নিঃশব্দে খুলে বাবার ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো।

(ক্রমশঃ)

ভোট-গণনা

স্বাধীন ভারতে প্রথম সার্বজনীন ভোট-গ্রহণ সারা দেশে যে কি রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে তা তোমাদের কারুর কাছেই অজানা নেই। এত বড় একটি দেশের ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে পরিণতবয়সী মেয়ে-পুরুষ সকলের এই ভোট-গ্রহণ কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়! কিন্তু বর্তমান গভর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থায়, অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে সেই ভোট-গ্রহণ সর্বত্র সুসম্পন্ন হতে চলেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের বাংলা দেশে ত' বটেই এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই ভোট-গণনা সমাপ্ত হবে। ভোট-গণনা সমাপ্ত হবার পর বিভিন্ন দলের প্রার্থী যাঁরা বিধান-সভা ও লোকসভার জন্য মনোনীত হবেন, তাঁরা দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন এবং তাদের মধ্যে থেকেই বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি নির্বাচিত হবেন। যে সকল দল এবার এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কংগ্রেস, কৃষক প্রজা, সোসালিষ্ট দল, হিন্দুমহাসভা, জনসঙ্ঘ, কম্যুনিষ্ট, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, সি, পি, আই, রামরাজ্য পরিষদ প্রভৃতিগুলি বিখ্যাত। এছাড়া অন্যান্য ছোটখাট দল ও স্বতন্ত্রভাবেও দাঁড়িয়েছিলেন বহু লোক।

হলিউডে টাকার পাহাড়

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

যকের ধন বা গুপ্তধনের কথা শুনলেই লোকের প্রাণ নেচে ওঠে পরম আনন্দে। গুপ্তধন লাভ আর কয়জনের ভাগ্যেই বা ঘটে? কিন্তু কেবল তাই নিয়ে কল্পিত গল্প রচনা করলেই পাঠকরা দস্তুরমত কাড়াকাড়ি ক'রে পড়তে চায়। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, গুপ্তধনের নামেই আছে মোহ!

কিন্তু হলিউডে টাকা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলে, তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় যকের ধন বা গুপ্তধন। সেখানে প্রতি বৎসরে যত টাকা ঢালা হয়, তা এক জায়গায় জমিয়ে স্তূপীকৃত করলে সত্যসত্যই একটি টাকার পাহাড় তৈরি করা যায়।

প্রধানতঃ হলিউডের কর্মীরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রয়োজক, পরিচালক, লেখক ও অভিনেতা। তাঁবেদার হয়ে কাজ করে নানা শ্রেণীর আরো হাজার হাজার ব্যক্তি, তাদের পিছনেও খরচ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু তাদের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা কেবল পূর্বোক্ত চার শ্রেণীর কর্মীদের নিয়েই আলোচনা করব।

আমাদের কাছে হিসাব আছে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। হলিউডের বড় বড় চিত্র-সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র, লো, পারামাউণ্ট, ওয়ার্নার ব্রাদার, টোয়েন্টিথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স, ইউনিভার্সল, কলাম্বিয়া, আর. কে.ও এবং ইউনাইটেড আর্টিষ্ট। তাছাড়া ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানও আছে আরো কয়েকটি। ঐগুলির মধ্যে বৎসরে কুড়ি হাজার ডলার কি তার চেয়েও বেশী রোজগার করেছেন এমন প্রয়োজক, পরিচালক, লেখক ও অভিনেতার সংখ্যা হচ্ছে আট শত পঞ্চাশ জন। মোট টাকার পরিমাণটা আঁক ক'ষে হিসাব ক'রে দেখলে মাথা ঘুরে যেতে পারে। কিন্তু এই হিসাবই একমাত্র হিসাব নয়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীরও এমন বহু প্রয়োজক, পরিচালক, লেখক ও অভিনেতা আছেন, যাঁদের বাৎসরিক আয় হচ্ছে দশ, পনেরো কি আঠারো হাজার ডলার!

এইবারে ঐ চার শ্রেণীর কর্মীদের নিয়ে সংক্ষেপে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা যাক্।

প্রথমেই প্রয়োজকদের কথা। এদেশে চলচ্চিত্রে অ-আ-ক-খ না জেনেও কেবল টাকা দিতে পারলেই 'প্রডিউসার' বা প্রয়োজক হওয়া যায়। কিন্তু হলিউডের কথা স্বতন্ত্র। সেখানকার প্রথম শ্রেণীর প্রয়োজকরা রীতিমত বিশেষজ্ঞ। তাঁরা ভালো গল্প এবং যথাযোগ্য শিল্পী নির্বাচন করতে পারেন, দর্শকদের রুচি বুঝতে পারেন, নানা শ্রেণীর শিল্পীদের প্রকৃতি বুঝে চালনা করতে পারেন এবং আয়-ব্যয়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে পারেন। কাপ্তেন না হ'লে যেমন জাহাজ,

ম্যানেজার না হ'লে যেমন কল-কারখানা চলে না, তেমনি প্রয়োজক নাহ'লে ছবির কাজও অচল হয়ে পড়ে। ছবির প্রত্যেক বিভাগই তাঁকে তদারক করতে হয় এবং খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত থাকা চাই তাঁর নখদর্পণে।

এদেশে সাধারণতঃ প্রয়োজক বলতে বুঝায় স্বত্বাধিকারী। হলিউডেরও স্বত্বাধিকারী-প্রয়োজকরা আছেন, কিন্তু সেখানে তাঁদের চেয়ে বেতনভোগী প্রয়োজকদের সংখ্যা অনেক বেশী। যাঁরা বেতন নিয়ে কাজ করেন, তাঁদেরও বাৎসরিক আয় ৩২৮,৮১৭ ডলার থেকে ১০৪,২৫০ ডলার পর্যন্ত! বলা বাহুল্য, স্বত্বাধিকারী-প্রয়োজকরা আরো বেশী টাকা রোজগার করেন।

এইবারে পরিচালকের কথা। লেখক লেখেন গল্প, অভিনেতা করেন অভিনয়, শিল্পী করেন দৃশ্য-সংস্থান, সঙ্গীতবিদ করেন গানে স্বরসংযোগ, আলোকচিত্রকর তোলেন ছবি আরো কেউ কেউ করেন আরো কোন কোন কাজ; কিন্তু এঁদের প্রত্যেককেই থাকতে হয় পরিচালকের অধীনে। পরিচালক নিজের স্বাধীন পরিকল্পনা অনুসারে ছবির ভিতরে ফুটিয়ে তোলেন বিশেষরূপ, বিশেষ অর্থ। ছবির মুল্লুকে প্রয়োজকের পরেই পরিচালকের আসন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, বৎসরিক ৭৫,০০০ ডলারেরও বেশী রোজগার করছেন পঁয়তাল্লিশ জন পরিচালক। একত্রিশ জন পরিচালকের বাৎসরিক আয় ১৯৯,০৬১ ডলার থেকে ১০০,০০০ ডলার পর্যন্ত। এঁদেরও চেয়ে রোজগারী পরিচালক আছেন। ফ্র্যাঙ্ক কাপ্রা, ডবলিউ. এস. ভ্যানডাইক ও রয় ডেল রুথ যথাক্রমে ২৯৪,১৬৬ ডলার, ২১৬,৭৫০ ডলার ও ২১৬,৭৪১ ডলার উপার্জন করেছেন।

ওটা তো গেল বিশেষ এক বৎসরের হিসাব। জন ফোর্ড, ফ্র্যাঙ্ক কাপ্রা, লিউ ম্যাককেরি ও গ্রিগরি লা কাভা পরিচালকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁরা মাত্র একখানি ছবিতে কাজ ক'রে ৭৫,০০০ ডলার থেকে ১৫০,০০০ ডলার পর্যন্ত লাভ করতে পারেন।

অতঃপর লেখকদের আয়ের কথা বলব। চিত্রজগতে লেখকদেরও আয় যে উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে একথা শুনলে এদেশী লিখিয়েদের মুখে ফুটবে কৌতুক-হাসি। কারণ এখানে ছবির বাজারে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম টাকা পান লেখকরাই। এখানকার কোন চিত্র-প্রতিষ্ঠানেই নিজস্ব বৈতনিক লেখক নেই। বাইরের যে সব সাহিত্যিকের রচনা নির্বাচিত হয়, তাঁদেরও যথাসম্ভব কম টাকা দেবার জন্যে ছবির মালিকদের প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি নেই।

কিন্তু হলিউডের চিত্রনির্মাতারা হচ্ছেন পাকা ব্যবসায়ী। তাঁরা জানেন, ভালো গল্প না হ'লে কোন ছবিই চলে না। এবং ভালো গল্প পেতে গেলে লেখককে খুশি করতে হয়। হলিউডের

চিত্রজগতের ধুরন্ধর ব্যক্তি হচ্ছেন গোল্ডউইন সাহেব। তিনি বলেন, নট-নটি পরিচালক ও প্রয়োজকদের চেয়ে লেখকদের স্থান আরো উপরে। ভালো ছবি তৈরি হয় ভালো গল্পের গুণেই। কোন বিখ্যাত নট-নটী, পরিচালক বা প্রয়োজকই খারাপ গল্প নিয়ে ভালো ছবি তৈরি করতে পারে না।

কেবল এক একটি গল্পের জন্যে হলিউড এক একজন লেখককে কত টাকা দিয়েছে, এখানে তার হিসাব দাখিল করলুম :

Lady in the Dark—২৮৫,০০০ ডলার। The American Way—২৫০,০০০ ডলার (সেই সঙ্গে ছিল 'রয়েলটি' বা সেলামীর ব্যবস্থাও)। The Man Who Came to Dinner—২৫০,০০০ ডলার। Abe Lincoln in Illinois—২২৫,০০০ ডলার (সেই সঙ্গে সেলামী)। My Sister Eileen—২২৫,০০০ ডলার। Tobacco Road—২০০,০০০ ডলার (সেই সঙ্গে সেলামী)। Arsenic and Old Lace—১৭৫,০০০ ডলার (সেই সঙ্গে সেলামী)। Saratoga Trunk—১৭৫,০০০ ডলার (ছবি তোলার পর গল্পের স্বত্ব লেখক ফিরে পাবেন)। For Whom the Bell Tolls—১৫০,০০০ ডলার।

হলিউডের প্রত্যেক চিত্র-প্রতিষ্ঠানেই বেতনভোগী লেখকদের নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা প্রয়োজক, পরিচালক ও নট-নটীর মত অত বেশী মাহিনা পান না বটে, তবে তাঁরাও নিতান্ত অল্প টাকা উপার্জন করেন না। সেখানকার প্রথম শ্রেণীতে এমন সতেরো জন বৈতনিক লেখক আছেন, যাঁদের বাৎসরিক আয় ৭৬,২৫০ ডলার থেকে ১৮০,১২৫ ডলার পর্যন্ত। কয়েক জন লেখক এর চেয়েও বেশী রোজগার করেন, কারণ তাঁরা বিভিন্ন ষ্টুডিয়োর লেখক। হলিউডে বৈতনিক লেখকদের মোট সংখ্যা হচ্ছে আট শত জন।

সর্বশেষে নট-নটীদের কথা। বড় বড় নট-নটীদের অভিনয় দেখবার জন্যে, জনসাধারণের আগ্রহের অন্ত নেই। বড় বড় নট-নটী না থাকলে ছবি জমে না। বড় বড় নট-নটীদের নিয়ে তাই বিভিন্ন চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা টানাটানি না ক'রে পারেন না। এক শিশু শারলি টেম্পেলকে দেখিয়ে টোয়েন্টিথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স সম্প্রদায় দুই কোটি ডলারেরও বেশী রোজগার করেছিল। ইউনিভার্সাল সম্প্রদায়ের পতন যখন সুনিশ্চিত, তখন অভিনেত্রী ডিয়ান্না ডার্বিনের আবির্ভাবে আবার সে আত্মরক্ষা করতে পারে। ডার্বিনের জনপ্রিয়তা ছিল এত বেশী যে, এক কোটি ডলারের বিনিময়েও ইউনিভার্সালের কর্তৃপক্ষ তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হন নি।

কাজেই নট-নটীদের দর বেড়ে গেছে অসম্ভব রকম। তাঁদের অনেকের আয়ের কথা শুনলে ভারতের করদ নৃপতিরাও হিংসা প্রকাশ করবেন। ছোটদের ও মাঝারিদের কথা ধরছি না, হলিউডের বড় বড় নট-নটীদের মধ্যে এমন আশীজন লোক আছেন, যাঁদের বাৎসরিক আয় হচ্ছে এক লক্ষ ডলার থেকে পাঁচ লক্ষ ডলার পর্যন্ত!

তাই বলছি টাকার পাহাড়ের কথা। হলিউডের চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা ছেড়ে দি, কেবল নট-নটী, প্রয়োজক, পরিচালক ও লেখকরাই ইচ্ছা করলে অনায়াসেই একটি টাকার পাহাড় তৈরি করতে পারেন।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্লাটফর্ম পার হয়ে এসে তিনবন্ধু একবার থেমে দাঁড়াল। কোথায় যাওয়া যায়। কাশীর এই ষ্টেশনে বহু লোকই নেমেছে। কেউ কেউ মালপত্র নিয়ে টাঙ্গায় উঠে বসেছে। কেউ কেউ মোটর গাড়িতে। বেশিরভাগ লোকই পায়ে হেঁটে চলেছে শহরের দিকে।

অমল বলল, 'কোথায় যাবি ?'

বিজু বলল, 'হ্যাঁ, পথের মাঝখানে টেনে তো নামালি। এখন কোথায় উঠবি তাই বল।'

শম্ভু হঠাৎ কোন জবাব দিল না।

তার একটু সামনে দু'জন প্রৌঢ়া মহিলা তাদের পোঁটলা-পুঁটলী কাঁধে তুলে নিয়েছেন। দু'জনেরই বয়স পঞ্চাশের ওপরে। পরনে খাটো সাদা থান। মাথায় কদম-ছাঁট কাঁচা-পাকা চুল। চলতে আরম্ভ করার আগেই তারা পথের ধূলো মাথায় নিলেন। একজন বললেন, জয় বাবা বিশ্বনাথ।

আর একজন বললেন, 'জয় মা অন্নপূর্ণা।

তারপর দু'জনেই গুটি গুটি করে এগুতে লাগল।

বিজু বলল, 'কি রে শম্ভু, পথের মাঝখানে এমন হাঁ করে দাঁড়িয়েই থাকবি নাকি ? চল্‌না একটা ধর্মশালা-টালায় গিয়ে উঠি। কাশীতে শুনেছি তার অভাব নেই।'

শম্ভু বলল, 'না ধর্মশালায় না।'

বিজু বলল, 'তবে কোথায় যাবি মরতে, ভালো হোটেল-টোটেলে যে উঠবি তেমন টাকা কই সঙ্গে।'

শম্ভু বলল, 'উঁহু, হোটেলেও না।'

অমল বিরক্ত হয়ে বলল, 'তবে ?'

শম্ভু বলল, 'দেখ, এই বুড়ীদের দেখে মনে পড়ল আমারও এক দূর সম্পর্কের পিসীমা আছেন কাশীতে। অনেকটা এঁদের মত দেখতে, একবার কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি নিজেই চেনা-পরিচয় করলেন। অনেক আগেকার কথা-টথা সব বললেন। বাবা নাকি তাঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। তিনিও ভারী ভালোবাসতেন বাবাকে। যাওয়ার সময় বললেন, কাশীতে যদি কোন দিন যাস, আমার ওখানে গিয়ে উঠিস, ঠিকানাটাও দিয়েছিলেন। বাঙ্গালীটোলা। যাবি সেখানে ?'

বিজু বলল, দূর পিসী-মাসীর কাছেই যদি যাব তবে বাড়িঘর বাপ মা ভাই বোনদের ছেড়ে এলাম কেন। আমারও অমন আত্মীয়-স্বজন দু'একজন আছেন কাশীতে। গেলে তো তাঁদের কাছেও যেতে পারতাম। কিন্তু গেলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে যে, আর একেবারে সোজা বাবার কাছে টেলিগ্রাম ক'রে দেবে।

শম্ভু বলল, 'কিন্তু পিসীমা তো আর অমার বাবাকে টেলিগ্রাম করতে পারবেন না। করলেও স্বর্গে এখানকার টেলিগ্রাম পৌঁছাবে না। আর অমলের বাবা তো নিরুদ্দেশ সন্ন্যাসী, আধা স্বর্গবাসী, তাঁর কাছেও যাবে না টেলিগ্রাম। তোর বাবার নাম ঠিকানা তিনি পাবেন কোথায় যে খবর দেবেন ? 'চল যাই তাঁর ওখানে গিয়েই উঠি এখনকার মত। কতক্ষণই বা আছি শহরে।

বিজু আর অমল অগত্যা শম্ভুর মতেই রাজী হোল। রাস্তায় চা আর মিষ্টিটিষ্টি ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ তর্ক করবার সাধ্য কারোরই নেই।

তিনজনে একটু এগিয়ে যেতেই সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দু'জনের সঙ্গে দেখা হোল।

শম্ভু বলল, 'আপনারা কোথায় যাবেন সব ?'

তাঁরা ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'বাঙ্গালীটোলা। তুমি কে বাছা—যাবে কোথায় ?'

শম্ভু বলল, 'আমরাও বাঙ্গালীটোলাতেই যাব। আপনার পুঁটলিটা দিন না আমার হাতে। আপনার চলতে কষ্ট হচ্ছে।

কয়েকটা বড় রাস্তা পেরিয়ে একটা ছোট গলির মুখ, সামনে বড় একটা ষাঁড় পথ আটকে রয়েছে। বিজু ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। ওঁরা বললেন, 'তোমাদের ভয় নেই বাবা, উনি

মহাদেবের বাহন তোমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। এসো। তোমরা কার বাড়ি যাবে বলতো?'

শম্ভু তার পিসীমার নাম করল, 'কাত্যায়নী চন্দ।'

'কাতু? তাই বল, আমরা তো একই বাড়িতে থাকি।

বাইরে থেকে মনে হয়েছিল একটা গলি। কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখা গেল গলির গোলক-ধাঁধা। দু'দিকে গিঁটে গিঁটে পাথরের বাড়ি। মাঝখানে এক-চিলতে পথ। বার কয়েক ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরে পুরোন একতলা একটি বাড়ির সামনে এনে তাদের দাঁড় করিয়ে সেই স্ত্রীলোকদের একজন ডাক দিলেন, 'ওকাতু, দেখ এসে কারা এসেছে তোমার ঘরে।'

রোগা মত বেঁটেখাট আর একটি প্রৌঢ়া বেরিয়ে এলেন, 'কে?—ওমা এরা আবার কারা? ও ক্ষেম, ও শশী তোমরা আবার কাদের জুটিয়ে আনলে।'

ক্ষেমঙ্করী বললেন, 'ওমা কথা শোন, জুটিয়ে আবার আনব কি। আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঝগড়া সুরু করলে নাকি কাতু?'

শশীমুখী বললেন, 'ওরা যে তোমারই ভাইপো কাতু। পথে কতবার পিসীমা পিসীমা করছিল।'

কাত্যায়নী বললেন, 'পিসীমা পিসীমা করছিল তবে আর কি, আমার কোন জন্মে কোন ভাই ছিল না, আর তিন তিনটে ভাইপোকে তোমরা জুটিয়ে নিয়ে এলে। আমাকে জব্দ করার মতলব এঁটেছ, না?'

শম্ভু এবার এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি ভুলে গেলেন পিসীমা? সেই যে সেবার কলকাতায় দেখা হোল না আমার সঙ্গে? অত করে আসতে বললেন তখন। আমি মনোহর দাসের ছেলে!'

কাত্যায়নী বললেন, 'মনোহর দাসের ছেলে তবে আর কি, আমাকে জুড়িয়ে দিয়েছ! বেঁচে থাকতে মমোহর আমার খোঁজখবর করেনি, একটা কানাকড়ি দিয়েও কোনদিন সাহায্য করেনি, আর এখন বুঝি তিন তিনটে ভূতকে পাঠিয়ে দিয়ে মজা দেখছে? কিন্তু তার তো ছেলে ছিল একটি? ও দুটি আবার এল কোত্থেকে?'

বন্ধু কথাটিকে পিসীমা হয়তো তেমন ভালো অর্থে নেবেন না। তাই শম্ভু বলল, 'ওরাও সম্পর্কে আপনার ভাইপো পিসীমা। ওরা আমার ধর্মভাই।'

কাত্যায়নী আবার মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'ঈস্ ধর্মভাই। নিজে খেতে পায় না শঙ্করাকে

ডাকে। নিজের নেই চাল চুলো, দুটো ধর্মভাইকে জুটিয়ে এনেছে। ধর্মভাইদের নিয়ে ধর্মশালায় উঠলেই পারতে। এখানে কেন।

অভ্যর্থনার বহর দেখে বিজু আর অমল শম্ভুর কানে কানে বলল, 'ঢের হয়েছে, এবার চল।'

শম্ভুও রূঢ়কণ্ঠে বলল, 'ধর্মশালাতেই তো যাব। যাবার আগে আপনার ধর্মকর্মের দৌড়টা একটু দেখে গেলাম পিসীমা।—চলরে বিজু।'

ক্ষেমঙ্করী বললেন, 'ওমা, সে কি কথা! তোমরা এই অসময়ে না খেয়ে না দেয়ে কোথায় যাবে?

শশীমুখী বললেন, 'এ বেলা তোমরা থাক। আমরা তো দুটি ফুটিয়ে নিচ্ছি। সেই সঙ্গে তোমাদেরও হয়ে যাবে। কাতুকে এপাড়ায় সবাই জানে, ওর মত কেপ্পন আর দুটি নেই। এসো তোমরা আমাদের ঘরে।'

কাত্যায়নী ঘর থেকে বারান্দায় নামলেন, 'খবরদার খেমো, খবরদার শশী, আমার ভাইপোদের নিয়ে টানাটানি করলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। ওরা আমার ঘরে এসেছে আমার ঘরেই থাকবে, শাক-ভাত যা জোটে তাই খাবে। অত ভালোমানুষি করতে এলে মোটেই ভালো হবে না।' ব'লে শম্ভুদের দিকে ফিরে তাকালেন কাত্যায়নী, 'এসো ধর্মপুত্রের দল।'

তাঁর পিছনে পিছনে তিনজনেই ঘরে ঢুকল। ছোট ঘর। এক পাশে একটা বিছানা গুটানো। পাশেই একটা তোরঙ্গ। অল্প কিছু হাঁড়িকুড়ি বাসনপত্র। দেয়ালে টাঙানো অনেকদিনের পুরোন ছোট একটা বাঁধানো ছবি। রক্তচন্দন আর বেলপাতার দাগে দেব-দেবীর পায়ের দিকটা আর দেখা যায় না।

কাত্যায়নী শম্ভুদের একটা মাদুর পেতে দিয়ে বললেন, 'বসো'।

নাওয়া-খাওয়া সারতে সারতে বিকেল গড়িয়ে গেল। বৈশাখ মাসের দুঃসহ গরমে ঘরে টিঁকবার জো নেই। ছোট মাদুরটা নিয়ে তিনজনে এসে বারান্দায় বসল। পরামর্শ চলতে লাগল এর পর কি করা যায়। শহরের কোন হোটেল কি ধর্মশালায় গিয়েই উঠবে, না শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

ছেড়ে যাওয়ার মত নয় বিজুর। সে বলল, 'এলামই যখন একটু দেখে-টেখে যাব না?'

অমলেরও সেই ইচ্ছা।

শম্ভু বলল, 'তা'হলে থাক।' তারপর কাত্যায়নীকে বলল, 'পিসীমা আমরা তা'হলে চলি।' কাত্যায়নী অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি কথা! জানা নেই, এই রাতে কোথায় যাবে তোমরা? আজ এখানেই থাক্ তারপরে কাল যা করবার কোরো।'

একটু বাদে কাত্যায়নী এসে সামনে বসলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। শম্ভুর না হয় চাল-চুলো নেই। কিন্তু তোমাদের তো দেখে গেরস্থ ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে? তোমরা কেন সব বেরিয়ে পড়েছ বাবা? এতো তোমাদের তীর্থধর্মের বয়স নয়। বাড়ি-থেকে রাগারাগি ক'রে অসনি তো?'

বিজু আর অমল পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর দু'জনেই বলল, 'না।'

শম্ভু আরো জোর দিয়ে বলল, 'কি যে বলেন পিসীমা, রাগারাগি করবে কেন। স্কুলের ছুটিতে ওরা আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। বড় বড় লোকের ছেলে সব ওরা, ঘুরেটুরে সব দেখতে এসেছে আর কি।'

কাত্যায়নী বললেন, 'ওমা তাই নাকি। তা'হলে তো এখানে খেতে ওদের বড়ই কষ্ট হোল। তা' কষ্ট হলে আর আমি কি করব, আমার তো আর মাসে মাসে মাসোহারা আসে না। নিজে যা আনি তাই খাই।'

একটা ডাল আর নিরামিষ তরকারি দিয়ে খেতে বিজুর সত্যিই খুব অসুবিধে হয়েছিল। চোখে জল এসে পড়ছিল প্রায়। মাছ ছাড়া কোনদিন ওর খাওয়া হয় না। কিন্তু পিসীমার কথায় লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না কষ্ট হবে কেন। নিরামিষ খাওয়া আমার খুবই অভ্যেস আছে।'

কাত্যায়নী একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তবে তোমরা যদি মাছ ডিমটিম এনে দাও আমি রেঁধে দিতে পারি। আগে এসব রাঁধতুম না। কিন্তু সুরেনবাবুর বাড়িতে এসবও আজকাল রাঁধতে হয়। পোড়া পেটের জন্যে আরো কি করতে হবে কে জানে! আসবার সময় কাপড় ছেড়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ঘরে ঢুকি।'

কথায় কথায় সবই বললেন কাত্যায়নী। ভাসুর-পো দশটি করে টাকা পাঠাতেন। কয়েক বছর ধ'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। এখন নিজেই রোজগার ক'রে খেতে হয়। সুরেন দত্ত নামে সপরিবারে এক উকিল ভদ্রলোক থাকেন খানিক দূরে। তাঁর বাড়িতে দু'বেলা রাঁধেন কাত্যায়নী। তিনি মাসে মাসে খোরাক আর বারটি করে টাকা দেন। তাতেই অতি কষ্টে চলে।

একটু বাদে কাত্যায়নী উঠে পড়লেন। তাঁকে রাঁধতে যেতে হবে। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি শম্ভুদের রান্না করবেন।

কাত্যায়নী চলে গেলে অমল বলল, 'শুনলি তো সব? এঁর এখানে তো বিনা খরচে খাওয়া যায় না। এক বেলা খেয়েছি তাতেই ভারী খারাপ লাগছে।'

বিজু বলল, 'সত্যি।'

শম্ভু বলল, 'কিন্তু খরচ দিয়ে খাবি অত টাকা কোথায় সঙ্গে? যা এনেছিস তা ফুরোতে ক'দিন?'

অমল বলল, 'সে পরে যা হয় হবে। তাই বলে এই বুড়ীর ঘাড়ে বসে বসে খেতে পারব না।'

শম্ভুর চোখটা চক্ চক্ করে উঠল, 'ও ভুলে যাচ্ছিলাম। তোর কাছে তো আরো জিনিস আছে। টাকা ফুরিয়ে গেলে সেইটা বিক্রি করলেই হবে।'

অমল বুঝতে পারল তার মায়ের হারের কথাটা বলছে শম্ভু। ওর বলবার ভঙ্গিটা ভালো লাগল না অমলের। এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা সে যেন ভুলেই ছিল। এবার সেই চোরাই হার বিক্রি করবার প্রস্তাবে অমলের মন গ্লানি আর অনুশোচনায় ভরে উঠল। বন্ধুর কথার জবাবে বলল, 'যা ভেবেছ তা হবে না। ও হার কিন্তু আমি দেব না কাউকে।'

শম্ভু বলল, 'দিবি না তো করবি কি। নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখবি নাকি?'

অমল চুপ করে রইল।

বিজু ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ চুপ কর তোরা। কেউ শুনে-টুনে ফেলবে। সে যখন দরকার হবে তখন ভেবে দেখা যাবে। তাই নিয়ে এখন ঝগড়া ক'রে লাভ কি।'

ক্ষেমঙ্করী আর শশীমুখী এদিক দিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন দেখে তিনজনেই তখনকার মত চুপ করল।

(ক্রমশঃ)

গত মাসের "ইংলা-সনেটের" উত্তর

বিষ্টি এলো টিপি টিপি, কেয়ার বিয়ে যে।
এই যে টিয়া! রবি এসো! এলে ভিজে ভিজে?
পিসী ও যে এলে নেয়ে! এ মেয়েটি কে?
ও, এ মেনী? এসো! এলে সাড়ী ভিজিয়ে?
এসো আইভি! এলে মেল্-এ? আরে, আরে, কে ও?
এই চেলী আর এণ্ডিটিকে এসে নিয়ে যেও।
বিবিপিসী, এলে ফেলে সেলাই? আরে নেলী!
এসেন্স্ই এই চারি শিশি যেয়ে নিয়ে এলি?
একি উপী? এলে শেষে ফেলে নিশিকে?
আরে, সে সে-মেস্এ নেই? এলো, ইটি কে?
এ মেমটি? আরে, এ যে এলোকেশী আয়ী!
আরাসটিকে এনে ফেলো, আয়ী এলেই চাই।
কে এই? চেনেন? এই চেয়ারে এ মাড়োয়ারী?
আইয়ে জী! আইয়ে! লিজিয়ে বিড়ি!

(শেষ লাইনটা আবার হিন্দী হয়ে গেছে। তা এইটু থাকা ভাল। রাষ্ট্রভাষা তো!)

পূজার ছুটিতে চেরাপুঞ্জি

আবার আমাদের চেরাপুঞ্জি যাবার সুযোগ ঘট্‌ল ১৯৫০ সনের অক্‌টোবর মাসে। আমরা বেশ বড় দল মিলে পিক্‌নিক্ করতে গিয়েছিলাম। সকাল সাতটার সময় গাড়ী ছাড়ার কথা, তাই খুব তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পৌনে সাতটার সময় আমরা বাড়ী ছাড়লাম। সাতটার সময় গিয়ে বাস ধরলাম। গাড়ী ছুট্‌লো হু'হু ক'রে, আমাদের দু'পাশের গাছপালাগুলি তীরের মত পেছন স'রে যেতে লাগ্‌ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা আপার (upper) শিলং-এ এসে পৌঁছলাম। এ জায়গাটা শিলং থেকেও বেশ কিছু উঁচুতে। এখানকার দৃশ্য খুব সুন্দর—এখানেও আছে পাইনগাছের বন। আপার শিলং-এ একটি নাম-করা জলপ্রপাত আছে। তার নাম "এলিফেণ্ট ফল্‌স্"। একটি গভর্ণমেণ্টের ফার্মও আছে। আপার শিলং, শিলং শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে। চেরাপুঞ্জির দূরত্ব শিলং থেকে তেত্রিশ মাইল। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত রাস্তার দৃশ্য অতি চমৎকার।

আবার সেই প্রকাণ্ড পুরোন গভীর খাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। আমাদের মোটার যে কিছুতেই তাকে পেছনে ফেলতে পারছে না। এই প্রকাণ্ড খাদের দৈর্ঘ্য সতর মাইল। খাদের শোভা যে কত সুন্দর তা' না দেখলে ঠিক বোঝান যায় না।

ক্রমে আমরা চেরাপুঞ্জিতে এসে পৌঁছলাম। সেদিন ছিল চেরাপুঞ্জির বাজার বার। কাজেই অনেক খাসিয়া স্ত্রীলোক ও পুরুষ এসেছিল বাজারে। ষ্টেশন আর বজার খুব কাছাকাছি। প্রথমেই বাজার দেখতে গেলাম। চেরাপুঞ্জির কমলা লেবু বিখ্যাত। বাজারে কমলা লেবু এসেছে রাশি রাশি। তারপর এখান থেকে আবার আমরা বাসে চ'ড়ে এখানকার বিখ্যাত মোসমাই জলপ্রপাতটি দেখতে গেলাম। এই জলপ্রপাত এক সময় পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় ছিল, কিন্তু ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখন তার জলের ধারা শুষ্ক। তবে এক সময় এই মোস্‌মাই যে একটি বিরাট জলপ্রপাত ছিল তা এখনও বেশ বোঝা যায়। এই জলপ্রপাতের খানিক নীচে একটি গ্রাম আছে। খাসিয়া

বস্তি। ছোট ছোট ঘর বাড়ীগুলো ওপর থেকে ভারী সুন্দর দেখায়। এখানে কলাগাছের বাগান আছে অনেক। মোসমাই-এর কলা বিখ্যাত।

জলপ্রপাতের একেবারে পাশ দিয়ে মোটারের পথ। তারপর পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তা। আগে আগে এখানে "থাপার"-র প্রচলন ছিল। চেয়ারের মত বেতে ও বাঁসে তৈরি এক রকমের যানের নাম 'থাপা'। মানুষ পিঠে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যায়। ঐ সরু রাস্তায় আর কোন রকমের যানবাহন চলে না। তার কারণ এ জায়গাটার চড়াই অত্যন্ত বেশী। এই রাস্তা দিয়ে বার মাইল নেমে গেলে পাওয়া যায় "থারিয়া ঘাট"। থরিয়া ঘাট হ'চ্ছে থারিয়া নদীর ওপরে। এখান থেকে ভোলাগঞ্জের বাজার অল্পই দূরে। থারিয়া ঘাট ও ভোলাগঞ্জ ব্যবসার কেন্দ্র। সিলেটে যে চূণ ও কমলা লেবু পাওয়া যায় তা এখান থেকেই চালান দেওয়া হয়।.

মোসমাই হ'তে সিলেট জেলাটা মানচিত্রে আঁকা ছবির মত দেখায়। আগে এখান দিয়ে খাসিয়ারা পিঠে ক'রে মালপত্র ব'য়ে নিয়ে সিলেটের সঙ্গে কারবার চালাত। এখন আর পিটে ব'য়ে নিতে হ'য়ে না। Ropeway দিয়েই মাল চলাচল ক'রে। পৃথিবীর মধ্যে চেরাপুঞ্জিতে সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়।

মোসমাই থেকে ফিরে আমরা গেলাম চেরাপুঞ্জির বিখ্যাত গুহা দেখতে। প্রবাদ আছে যে, এই গুহার ভিতরের সুড়ঙ্গ দিয়ে আগে গৌহাটির কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়া যেত। আমরা সঙ্গে একজন খাসিয়া গাইডকে নিয়ে গিছলাম। সে বাজার থেকে দু'টো মশাল কিনে নিল! আমাদের সঙ্গে আরও একটি দল জুটে গেল। তারপর আমরা গুহা অভিমুখে রওনা হলাম। মাঠের ওপরে এক কোমর ঘাস। সেই ঘাসের মাঝখান দিয়ে লোক যাওয়া আসা ক'রে একটা রাস্তা হয়েছে। আমরা কোন রকমে সেই রাস্তা দিয়ে সার বেঁধে চল্‌লাম। প্রায় এক মাইল যাওয়ার পর একটা গভীর জঙ্গলে এসে প্রবেশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দিনের আলো নিবে গেল। সেই ভীষণ বনের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর, দেয়ালের মত খাড়া আর পিচ্ছল পথে পড়লাম। আমরা যাহোক, কষ্টেসৃষ্টে আরো কিছু ওপরে উঠতেই দেখি সামনে গুহা।

বড়রা সব পেছনে পড়েছিল, একটু পরে সবাই এসে জুটলো। মশালগুলো জ্বালা হ'ল এবার। গুহার ভিতরে খুব সম্ভব সাপটাপ আছে। মশাল হাতে সেই গাইডটি আগে আগে চল্‌লো, আমরা যেতে লাগলাম তার পেছনে পেছনে। গুহার ভেতরে আমি ত' আর কোনো দিন ঢুকি না! ভেতরটা খুব অন্ধকার। কিন্তু মশালের আলোতে সমস্তই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ল মাঝে মাঝে কারুকার্য করা থামের মতন কি সব রয়েছে। ভাবতে লাগ্‌লাম, এগুলো কি খাসিয়ারা

পাথর কুঁদে এরকম করেছে নাকি? আমার দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"দিদি, এগুলো কি? আর এ গুহাটাই বা কিরকম ক'রে তৈরি হ'ল?" তখন দিদি বল্লেন—"চেরাপুঞ্জি যে চুণা-পাথরের জন্য বিখ্যাত তা জান নিশ্চয়। অনেক অনেক হাজার বছর আগে এখানে একটা চুণা পাথরের পাহাড় ছিল, সেই পাহাড়ের উপর বৃষ্টি প'ড়ে প'ড়ে চুণা-পাথরগুলো অনেকটা নরম হ'য়ে গেল এবং বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে একটা মস্ত গর্তের সৃষ্টি হ'ল। সেই গর্তটাই হচ্ছে এই গুহা।

গুহা তৈরি হবার পরেও চুঁইয়ে চুঁইয়ে বিন্দু বিন্দু জল ভেতরে এসে ঢুকেছে এবং টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে গুহার মেঝেতেও এসে পড়েছে। এই জলের সঙ্গে মেশান ছিল অল্প অল্প চুণা-পাথর। জল সহজেই শুকিয়ে গেল আর তার জায়গায় পড়ে রইল অতি অল্প চুণা-পাথর। তারপর আবার ঐ জায়গাতেই আর একবিন্দু জল পড়ল এবং সেই জলবিন্দুর সঙ্গে আর একটু চুণা-পাথর জম্‌ল। ক্রমশঃ এইগুলি উঁচু হতে হতেই এই থামগুলোর সৃষ্টি। এক হাজার বৎসরে এই থাম এক এক ইঞ্চি ক'রে বেড়েছে। প্রত্যেকটা থাম দশ বার ফিট উঁচু। এখন ভেবে দেখ এক একটা থাম তৈরি হ'তে কত বছর লেগেছে!"

গুহার ভেতরে অল্প দূর একটু এগুতেই টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে জল পড়তে লাগ্‌ল। কেউ কেউ সেখান থেকেই ফিরে গেল। কিন্তু আমরা বাকী কয়েকজন ভাবলাম যে, আমরা গুহার শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফিরবো না। প্রায় তিন ফারলং যাওয়ার পর আমরা গুহার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে দু'টো বড় বড় গাছ গুহার মুখটাকে বন্ধ ক'রে রেখেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেখানকার দৃশ্য দেখলাম। তারপর ফিরে এলাম গুহার বইরে। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় "যখের ধনে" যে "রূপনাথ গুহা"-র কথা লিখেছেন, তার সঙ্গে এই গুহাটি হুবহু মিলে যায়। আর সেখানকার যে গাছের কথা উল্লেখ আছে সে গাছও আমরা দেখতে পেলাম। তাই মনে হ'ল এটাই বোধ হয় যখের ধনের সেই রূপনাথ গুহা। গুহার কাছাকাছি পাহাড়ের নীচে একটি সুন্দর ঝরনা আছে, তার ধারেই আমরা পিকনিক করতে বসলাম। পিক্‌নিকের পক্ষে জায়গাটা খুব ভাল ছিল। আমাদের সঙ্গে খাবার ছিল—খিচুড়ী, আলু ভাজা আর ডিমের অমলেট। ক্ষিদের চোটে ঠাণ্ডা জিনিসগুলোও অমৃতের মত লাগলো। খাওয়াদাওয়া হ'য়ে গেলে পর আমরা বড় রাস্তার দিকে চল্‌লাম। সেখান থেকে বা'সে চ'ড়ে চেরাপুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশনে গেলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের জায়গাটা ভারী সুন্দর। একটা টিলার ওপরে। চারিদিকের দৃশ্যও খুব সুন্দর। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একটা স্কুলও আছে। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা মাত্র কয়েকজন, এবং শিক্ষক ও একজন সন্ন্যাসী থাকেন। আর একজন নূতন এসেছেন বিলাতের বড় ডিগ্রী নিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের

ভিতর ও বাইরে সব ঘুরে দেখলাম। তারপর ফিরে চল্‌লাম শিলং-এর পথে। বিকাল পাঁচটার সময় আমরা চেরাপুঞ্জি ছাড়লাম। যখন শিলং-এ পৌঁছলাম তখন রাত.হ'য়ে গেছে।

শ্রীরজত চন্দ
(বয়স দশ বৎসর)

আজগুবি দেশ

এক যুগেতে ছিল যে ভাই আজগুবি এক দেশ,
শুনবে যদি, বলবে আমায়, লাগছে তোমার বেশ।
হয়ত' তুমি গল্প শুনে রাত্রি বেলাই শেষে,
স্বপন-ভেলায় আজব দেশে চলবে ভেসে ভেসে।
দেখবে তখন সেই দেশেতে আজগুবি সব খেল,
আকাশ মাথায় মটর গাড়ী জলের মাঝে রেল।
জাহাজ ছুটে জমির'পরে নৌকা চলে মাঠে,
যে যার খুশি খেয়াল মত যখন তখন হাঁটে।
বাই-সাইকেল হাওয়ায় উড়ে ট্রাম চলে যায় জলে
ঘোড়ার গাড়ী রিক্সা ছুটে জল জলাময় স্থলে।
গরুর গাড়ী, ছ্যাক্‌রা গাড়ী শূন্যে চলে নিজে,
দেখলে ভায়া বুঝবে নাকো বলবে এসব কি যে ?
এমনি মজার দেশটিতে ভাই যাবে যদি কেহ,
নদীর জলে সাতটি বার ডুব দিয়ে আন দেহ,
নাক্ বরাবর পথটি ধরে চলবে শুধু সোজা,
আজব দেশের আজগুবি সব যাবে সবই বোজা।

হাসান আলী শাহ্

বিশ্বাস করো আর নাই করো

কয়েক ফোঁটা কালো রং সাদা রংকে আরও বেশী সাদা করতে পারে। কালো পেইণ্ট ব্লিচিংএর কাজ করে, ফলে সাদা রং আরও সাদা হয়ে যায়।

* * * *

মৌমাছিরা খুব কাজের বলেই অনেকের ধারণা। আসলে কিন্তু তা মোটেই নয়। তারা অধিকাংশ সময়েই স্ফূর্তি করে বেড়ায় আর অল্পক্ষণের জন্য কাজ করে।

* * * *

"I am not here"-এ ব্যাকরণের দিক দিয়ে কোনও ভুল নেই ; অথচ "আমি এখানে নাই" কথাটি কেউ কোনও দিন ব্যবহার করতে পারেন না।

* * * *

সম্রাট টাইবিরিয়াসের সামনে নভেলিয়াস টরকুয়াটাস এক নিঃশ্বাসে তিন গ্যালন মদ পান করেন।

* * * *

ফ্র্যাঙ্ক কেলগ নামে ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান কুইনটিন জেলের এক বন্দী সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই ব'লে একবার নালিশ করেন যে, তার ১৪ বছরের শাস্তি মোটেই লম্বা নয়।

* * * *

আমেরিকার জুরিয়াল কুকের ১৪ জন ছেলেমেয়ে। তাদের সকলেরই নাম 'z' দিয়ে :

জেরিনা, জুরিয়াল জেরিমা, জিমরি, জেফরোনা, জেরুসা, জেটনা, জুলটিস, জেলোরা, জিথানিয়াল, জেরুথ, জেলোটাস, জেভিলিয়া, জেজেমেস !

* * * *

ব্রুকলিনে O. Howe Good নামে একজন ভদ্রলোক আছেন।

* * * *

প্রিন্স ফ্রেডেরিকের কবরে এ কথা কয়টি আজও দেখতে পাবে :

Here lies Fred
Who was alive and is dead
There is no more to be said.

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

বিচিত্রা

সুদর্শন

মনসা-গাছ

আমাদের দেশে মনসা-পূজার ব্যবস্থা আছে, মনসা-পূজা করলে সাপের ভয় থাকে না নাকি! এ পূজার আয়োজন খুবই সামান্য—মাটীতে কাঁচা-মনসার ডাল পুঁতে দিলেই দেবীর অধিষ্ঠান—তারপর মন্ত্র প'ড়ে পূজা। হয়তো এ পূজার কোনো অর্থ ছিল—সে অর্থ আমরা জানি না। ছাদে অনেকে টবে কাঁটা-মনসা রাখেন, শুঁচোলো কাঁটার গুণে বজ্রাগ্নির বিপত্তি নিবারণ হয় শুনি।

কিন্তু মনসার আদর আমেরিকায় অনেক বেশী। সেখানে আরিওজোনা মরুপ্রদেশ শুধু এই মনসার দৌলতে উদ্ধার হয়েছে, শস্যসম্পদ-শালী হয়েছে।

আরিওজোনায় জমির পরিমাণ দশলক্ষ একরের উপর—সেখানে অজস্র মনসা জন্মায়। সেই মনসা থেকে নানা রকম ঔষধ, সাবান, ক্লীনিং-নির্যাস, মিছরী প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। মনসার রস থেকে একরকম কমপাউণ্ড তৈরী হচ্ছে বয়লারে ব্যবহারের জন্য। মার্কিন যুক্ত-রাজ্যে এবং কানাডায় এই মনসার নির্যাস নানা কাজে লাগছে।

এ নির্যাসের নাম ক্যাকটিজোন। দশ গ্যালন জলে এক গ্যালন ক্যাকটিজোন মিশিয়ে সেই জলে এঞ্জিন ধুলে এঞ্জিনের কোথাও এতটুকু মরীচা ধরবে না। মার্কিন রাজ্যে ট্যাঙ্ক, পাম্প এবং দীঘির জল মনসার এই নির্যাসে পরিশুদ্ধ করা হচ্ছে।

গাছপালা এবং ফসলের পরিপুষ্টিকল্পে মনসার নির্যাস অত্যন্ত উপকারী। মিশিসিপির তীরবর্তী বহু গ্রাম মনসার চাষের কল্যাণে আশ্চর্য উর্বরাশক্তি পেয়েছে। এজন্য সারা মার্কিন মুলুকে মনসার অপরিসীম যত্ন নেওয়া হচ্ছে। যত্নের ফলে সেখানে মনসা গাছ বেড়ে নারিকেল গাছের সমান দীর্ঘ হচ্ছে। জলে মনসার ক-ফোঁটা নির্যাস মিশুলে, জলে যদি কোনো রকম বিষ বা রোগের জীবাণু থাকে তাদের বিলোপ সুনিশ্চিত।

কানাডায় এবং যুক্তরাজ্যে আজ মনসার খুব আদর। মনসার বীজ লক্ষ লক্ষ প্যাকেটে ভর্তি হয়ে দেশ-বিদেশে চালান যাচ্ছে।

মনসাকে দেবী বলে আমরা যে মন্ত্রে প্রণাম জানাই, সে মন্ত্রটিতে মনসাকে বলা হয়েছে বাসুকির তিনি ভগ্নী! বাসুকি তো পৃথিবীকে মাথায় করে আছেন। সুতরাং পৃথিবীর উপরে ভগ্নী-মনসার মায়া-মমতা স্বাভাবিক! কাজেই পৃথিবীর সম্পদ-বর্ধনে মনসার হাত থাকবে, বিচিত্র কি! মার্কিনী রিপোর্টেও দেখছি, মনসার দৌলতে সেখানকার জমির উর্বরতার বৃদ্ধি!

আমাদের এদেশে মনসার ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল প্রচুর। বুনো গাছ বলে আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। জানি না, এদেশের কোনো বৈজ্ঞানিক উদ্যোগী হয়ে মনসার চাষে ভারত-লক্ষ্মীর আসন রচনা করবেন কিনা!

নতুন ধরনের গোলক-ধাঁধা

শহরের মাথার ইষ্টিশন থেকে শহরতলীর বন্দরে পৌঁছতে সোজাসুজি একটা রাস্তা থাকলেই সবচেয়ে ভালো হ'ত, সহজেই চলে আসা যেত। কিন্তু তা হয়নি, মাঝখানে এত পথঘাট, অলিগলির ঘোর-প্যাঁচ পড়েই যতো গোল বেধেছে—অবাধে যাওয়া-আসা সম্ভব নয়। যাই হোক, এখন দেখ খুঁজে বার করতে পারো কিনা রাস্তাটা ?

মধুচক্র

আজকে তোমাদের জন্যে লিখতে বসে একে একে অনেক কথা মনে পড়ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে নেতাজীর জন্মদিন আর অহিংসা ও মানবতার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু।

নেতাজীর জন্মদিনটিকে যেন কেবল উৎসব ও আনন্দের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ করে না রাখি। তাঁর জীবনের অসম্পূর্ণ আদর্শকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার জন্যে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।…যে নেতাজীর তেজ, বীরত্ব, অসীম সাহস সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল, তাঁকে কেবলমাত্র উৎসব ও আনন্দের মধ্য দিয়ে স্মরণ করে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখানোর বিন্দুমাত্র অধিকার আমাদের নেই। নেতাজী আদর্শ ছিল বেশী বলার চেয়ে বেশী কাজ করা। আশা করি তোমরা তাঁর আদর্শকে তোমাদের জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করবে।

দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল মানবতার ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। হিংসা, অত্যাচার প্রবঞ্চনা, গ্লানি যখন দেশের প্রত্যেক জাতির শিরায় শিরায় বইছে, সেই সময় আবির্ভাব হলেন অহিংসার গুরু গান্ধীজী আমাদের মধ্যে। অহিংসার মধ্যে দিয়ে মৈত্রী ও প্রেম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি।…কিন্তু সেই মহৎ কর্মের সম্পূর্ণতা লাভ করার আগেই তাঁকে এই মরজগত থেকে চলে যেতে হয়েছে।…এই দুই পুণ্যাত্মার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের স্পর্শহীন প্রণাম জানাই।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই প্রথম ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমরা সাধারণতন্ত্রী ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করলাম।…এই সার্বজনীন ভোটাধিকার আমাদের নেতাদের অনেক প্রচেষ্টার ফ'ল। অতএব এই ভোট সম্বন্ধে আমরা যেন বিশেষ সচেতন হই।…যখন তোমাদের হাতে আমার লেখা গিয়ে পৌঁছবে তখন পশ্চিম বাংলা, তথা ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রে ভোট-গ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে গেছে—তাই এ সম্বন্ধে বেশী বলে কোন লাভ নেই।

এবারের সরস্বতী পূজোর তাড়া পাড়ায় পাড়ায় মনে হচ্ছে যেন একটু তাড়াতাড়ি সুরু হয়ে গেছে। জানিনা এটা আমার চোখের বা মনে ভুল কিনা—। তবু একটা কথা বলছি, এই সরস্বতী পূজোকে উপলক্ষ করে আবার যেন উৎকট লাউডস্পীকারের আয়োজন এবং তার রসদ হিসেবে সস্তা হিন্দী গানগুলোর উৎপাত সুরু না হয়।—সরস্বতী পূজোটা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের নিজেদের আয়ত্তাধীনে—সেইজন্যেই এই অনুরোধ জানাচ্ছি।

গতবার তাড়াতাড়িতে এবং তোমাদের চিঠির চাপে পড়ে মজার খেলা দিতে পারেনি,

এবার দিলাম। আশা করি তোমরা এতে রাগ করবে না আমার ওপর। এবারের মজার খেলাটি তোমদের জন্য পাঠিয়েছে টালীগঞ্জ থেকে জয়শ্রী সেন।

"প্রাচীন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তাহার বহু চিত্র ইতস্ততঃ ছাড়াইয়া আছে। সেই সমস্ত কাব্য হইতে আমরা জানিতে পারি, আমাদের দেশে আমাদের বহু আগে যাঁহারা বাস করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিদিনের খাওয়াদাওয়া, ওঠা-বসার জীবন কিরূপ ছিল। অবশ্য এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে বহু পরিবর্তন হইয়াছে, একটি পুরাতন লক্ষণ চলিয়া গিয়া নূতন কোন লক্ষণের স্থান করিয়া লইতে বহু সময় লাগিয়াছে, সেই সব পরিবর্তনের মধ্য হইতে সংকলন করিয়া প্রাচীন বাঙলীর প্রতিদিনের জীবনের যুগ-যুগ পরিবর্তিত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।"

এবার তোমাদের চিঠির জবাব দিই। **অর্ধেন্দুকুমার বিশ্বাস** (মুর্শিদাবাদ)—তোমার প্রশ্নগুলির জবাব খুব সংক্ষেপে দিচ্ছি। দীলিপ চট্টরাজ যদি কিছু করে থাকে, তবে তার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে সাজে না, কারণ সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আর এ খবরও আমি পেয়েছি যে 'মৌচাকের' একজন উৎসাহী গ্রাহক এ সম্বন্ধে ঐ পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে। তবে সে কে, তা আমি জানি না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, তবু আমার মনে হয় বনফুল ও প্রমেন মিত্র এঁদেরই স্থান দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলছি—না, সম্ভব নয়; তার কারণ অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকার বাড়ীর অভিভাবকদের সঙ্গে এনিয়ে আমাদের অত্যন্ত মতবিরোধ ঘটে গেছে।...ধাঁধাটা যথাস্থানে পাঠালাম।...**বিনা ঘোষ** (লখনউ) তোমার চিঠি পেলাম। বাবার শরীর ভালো আছে জেনে আনন্দ হ'ল। কোলকাতায় এলে নিশ্চয় দেখা করবে। না, তোমার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আসেনি। **মৈত্রেয়ী ও গোপা দত্ত, পুরবী ও তপতী রাহা** (বহরমপুর)—কয়েক মাস ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাগজ বার করতে হচ্ছে, সেইজন্য তোমাদেরও পেতে দেরি হচ্ছে। যত তড়াতাড়ি এ ব্যবস্থার প্রতিকার করা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি।

যাদের চিঠি পেয়েছি—গৌরগোপাল সরকার (নবদ্বীপ) **পিন্টু মজুমদার** (লখনউ) **বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়** (বউবাজার) **রেবা মজুমদার** (ধর্মতলা) **পার্থ বসু** (ভবানীপুর)। আচ্ছা আজ এইখানেই, আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

— চিত্র-পরিচয় —

প্রথম সারি ঃ (৭৫) শ্রীঅরবিন্দ রায়, ২০ ভগবান চ্যাটার্জী লেন, হাওড়া ; (৭৬) শ্রীশঙ্কর মুস্তাফী, ৩৩ কবির রোড্, কলিকাতা ; (৭৭) শ্রীনিলকুমার সেনগুপ্ত, পোঃ আনিসাবাদ, পাটনা ; (৭৮) শ্রীপ্রমোদরঞ্জন মুখার্জী, ২৮ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

দ্বিতীয় সারি ঃ (৭৯) শ্রীফটিকচাঁদ দত্ত, ৩৪ মহেশ দত্ত লেন, কলিকাতা ; (৮০) শ্রীপার্থসারথী মুখার্জী, চাঁইবাসা রোড্, পুরুলিয়া ; (৮১) শ্রীসুধীরকুমার ভড়, বিবির হাট, চন্দননগর ; (৮১) শ্রীমতী জয়শ্রী সেনগুপ্তা, পূর্ণিয়া, বিহার ।

তৃতীয় সারি ঃ (৮২) শ্রীতপনকুমার পালিত, মডেল হাউস, লক্ষ্ণৌ ; (৮৩) এস. কে. মিত্র, পোঃ বড়বিল, সিংভূম ; (৮৪) শ্রীশিশিরকুমার চক্রবর্তী, প্রসান্ত নিবাস, মাহেশ, হুগলী ।

চতুর্থ সারি ঃ (৮৬) শ্রীরেণুকণা কুমার, শশীলজ পূর্ণিয়া ; (৮৭) লিলি, C/o শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, পোঃ পশডোল, দারভাঙ্গা ; (৮৮) শ্রীননীগোপাল মাঝি, দোভাগা, মেদিনীপুর ।

ফাল্গুন—১৩৫৮
৩২শ বর্ষ—একাদশ সংখ্যা

*

কে কি ভালবাসে

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

জেনে রাখা ভালো কে কি ভালোবাসে
কোন্ দিকে কার টান্‌টা।
কে কি পেলে কিছু চায় নাকো আর,
কিসে খুসী কার প্রাণটা।—
আরশুলা খোঁজে এঁদো আস্তানা,
স্যাঁৎসেঁতে সোঁদা গন্ধ।
চাম্‌চিকে চায় পোড়ো হানাবাড়ী—
মানুষের বাস বন্ধ।
এক মনে জাল বোনে মাকড়সা
পেলে ঝুলে-ভরা ঘর তো!
ইঁদুরেরা খুসী খাবার ভাঁড়ারে
পায় যদি চোরা-গর্ত।
ছুঁচোর নজর রান্নাঘরেতে
খোলা আছে কার ঢাক্‌না!
বেড়ালেরা চায় দুধ আর মাছ
থরে থরে ভরা থাক্‌না।

মশা ভালোবাসে ঘুপ্‌সি ঘর আর
নরম গায়ের চামড়া।
হাল্কা-বোঝাই-গাড়ী-টানা চায়
কুড়ে গরু মোষ, দাম্‌ড়া।
রোদে কে কি দেয় বড়ি বা আচার
কাক খোঁজে আড় চক্ষে।
খাবারের ঠোঙ্গা-হাতে যায় কেবা
চিল থাকে তারই লক্ষ্যে।
কুকুরেরা চায় ভোজ হোক্ রোজই
বিয়ে, বৌভাত, শ্রাদ্ধে।
শকুনি শ্যালের মড়ক কামনা
ভাগাড় ভরিবে খাদ্যে!
প্যাঁচা ভালোবাসে রাতের আঁধার ;
চোরেরাও খোঁজে রাত্রি।
পকেটমারেরা ভিড়্ খোঁজে আর
ট্রাম বাস ঠাসা যাত্রী!
ছিঁচ্‌কেরা খোঁজে আল্‌গা'দু'য়ার
ছড়ানো জিনিসপত্তর।
জুয়াচোরে চায় বোকা খদ্দের
বেচাকেনা সারে সত্বর।
হাতুড়েরা চায় রোগের হিড়িক,
মাম্‌লাবাজেরা মাম্‌লা।
ডাকাতেরা খোঁজে শিথিল পাহারা,
গুণ্ডারা চায় হাম্‌লা।
মুনাফাখোরে ও চোরাকারবারি
তারা ভালোবাসে যুদ্ধ।
ঠক্ দম্‌বাজে মনে মনে চায়
সব লোকে হোক বুদ্ধু!
ফাঁকিদার ছেলে খুব খুসী থাকে
পেলে রোজ হৈ-হাল্লা।
হরতাল ক'রে ইস্কুলে, দেয়
সিনেমা লাইনে পাল্লা।

পুরানো দিনের একটি গল্প

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

অনেকদিন আগেকার কথা।

তখন বাঙ্‌লায় বাঙালীদের জন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রধান শিক্ষায়তন ছিল হিন্দু কলেজ। কিছুদিন পরে ক্রিশ্চান ধর্মযাজকেরা কলকাতায় জেনারেল এসেম্বিলিজ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও খৃষ্টধর্ম বিস্তারের প্রচেষ্টা করেন। তখনকার মিশনারী বিদ্যালয় ছিল, দাতব্য শিক্ষালয়। কাজেই দুঃস্থ বাঙালীর ছেলেরা গিয়ে সেখানে ভীড় জমাতো। মিশনারী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো, কিন্তু হিন্দু কলেজ ছিল একমাত্র শিক্ষায়তন যেখানে ধর্মের কোন বালাই ছিল না। অভিজাত হিন্দুঘরের ছেলেরা বেশীরভাগ সেইখানেই পড়তো।

সেকালে একটি গরীবের মেধাবী ছেলে জেনারেল এসেম্বিলিজে পড়তো। তার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা, তার জীবনস্বপ্ন, হিন্দু কলেজ হ'তে উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে সে বড় হবে। কিন্তু পঠদ্দশায় পিতার মৃত্যু তার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ডুবিয়ে দিল। কলকাতার মত শহরে একা ছেলেটি অকুলে ভাস্‌তে লাগল। কিন্তু তবু সে হতাশ হলো না। নিজের শক্তি ও সাহসের ওপর ভর ক'রে সে সেই অকুল সমুদ্রে পাড়ি দিল। পূর্বের মতই সে পূর্ণোদ্যমে লেখাপড়া করতে লাগল। তখনো তার আশা, সে বাঙলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিন্দু কলেজে পড়বে এবং যেমন করে হোক্ সেখানে সে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

মাত্র তেরো চোদ্দ বছরের ছেলে, পল্লীর অশিক্ষার অন্ধকার হ'তে এসে সবেমাত্র যে শহরের আলো দেখেছে, সেই ছোট্ট স্বভাব-ভীরু বাঙালীর ছেলেটি নামজাদা শিক্ষাবিদ্ সাহেব অধ্যক্ষর দোরে গিয়ে ধর্ণা দিল। সাহেবের দর্শন মেলে না, ছেলেটিও নাছোড়বান্দা। দিনের পর দিন নিয়মিত সময়ে সে সাহেবের দোরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে সে তার আর্জি পেশ করবেই।

শেষে একদিন সুযোগ মিলল। ওপরের ঘরে সাহেব টেবিলের সাম্‌নে ব'সে আছেন, ছেলেটি সোজা গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল। সুন্দর, সুশ্রী কিশোর, মুখে-চোখে প্রতিভার ছাপ। সাহেব তার পিঠ্ চাপড়ে আদর ক'রে কাছে টেনে নিয়ে জিগ্‌গেস করলেন, কি চাই?

ছেলেটি উত্তর দিল, আপনার স্কুলে আমি ভর্তি হ'তে চাই।

সাহেব প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন্ স্কুলে পড়?

বালক উত্তর দিল, এখন জেনারেল এসেম্বিলিজে পড়ছি।

—কী কী বই পড়?

ছেলেটি বলল, মার্সম্যানের ইতিহাস, লেনির গ্রামার, ভূগোল, ইউক্লিডের জ্যামিতি, বাইবেল এবং বাঙ্‌লা—

সাহেব প্রশ্ন করলে, ইউক্লিডের ৭-এর সম্পাদ্য কি বল' তো ?

এক টুক্‌রো খড়ি হাতে বোর্ডে গিয়ে ছেলেটি প্রতিজ্ঞাটি সুষ্ঠু ভাবে প্রমাণ ক'রে দিল।

ছেলেটির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে সাহেব খুশী হলেন। প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বললেন, তুমি তো ভালোই শিখ্‌চো,—তবে জেনারেল এসেম্বিলিজ্‌ ছাড়তে চাও কেন ?

ছেলেটি উত্তর দিল, লোকে বলে আপনার এখানে আরো ভালো পড়ানো হয়, তাই। হিন্দু কলেজে পড়বার আমার ভারী ইচ্ছে।

সাহেব বললেন, জেনারেল এসেম্বিলিজে পড়াশুনো ভালোই হয়। যেখানে পড়্‌চো, সেইখানে পড়।

ছেলেটি কাকুতি ক'রে বললে, দয়া ক'রে আপনার এখানে আমায় ভর্তি ক'রে নিন্।

সাহেব বললেন, তুমি বাইবেল পড়, তুমি আধা-খৃষ্টান। তুমি আমার ছেলেদের নষ্ট ক'রে দেবে।

ছেলেটি বললে, ক্লাসে পড়া হয়, তাই আমি বাইবেল পড়ি, নইলে বাইবেলে আমার বিশ্বাস নেই। খৃষ্টান আমি মোটেই নই।

—জেনারেল এসেম্বিলিজের সব ছাত্রই আধা-খৃষ্টান। আমি তোমায় নিতে পারবো না। আমার ছাত্ররা খারাপ হ'য়ে যাবে।

ছেলেটি কাকুতি ক'রে অনুনয়ন করলে, আমি খৃষ্টান নই, আমাকে দয়া ক'রে আপনার স্কুলে নিন্।

সাহেব কিন্তু অটল, অচল। অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, বাইবেল-পড়া আধা-খৃষ্টানের আমার স্কুলে ঠাঁই হবে না। আমার ছেলেদের তুমি নষ্ট ক'রে দেবে।

হিন্দু কলেজের সিংহদ্বার ছেলেটির কাছে চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। এ তার নিয়তি ! নির্মম অদৃষ্ট তার হাত ধ'রে অন্যপথে টেনে নিয়ে চলেছিল। সাহেব আশ্রয় দিলে হয়তো ছেলেটির জীবনের গতি ফিরে যেতো।

ছেলেটি কে জানো ?—'গোবিন্দ সামন্ত' বা Bengal Peasant Life,' 'Folk-tales of Bengal' প্রভৃতির বিখ্যাত লেখক লালবিহারী দে—আর সাহেব হচ্ছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ হিতৈষী ডেভিড্‌ হেয়ার।

হয়তো হেয়ার সাহেবের স্কুলে লালবিহারীর স্থান হ'লে, হিন্দু সমাজ তার মত একটি রত্নকে হারাতো না। মাত্র উনিশ বছর বয়সে লালবিহারী জেনারেল এসেম্বিলিজের মিশনারী সাহেবদের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে 'রেভারেণ্ড' পদবী লাভ করেন।

কলকাতার পথে

সত্যব্রত

দুনিয়ার পথে কত মানুষের না নিত্য যাতায়াত! এ পথে যাঁদের চলা শেষ হয়েছে তাদের ক'জনের পায়ের চিহ্নই বা পথে আঁকা থাকে! পথ এ চিহ্ন এঁকে রাখে না, তাই মানুষ এঁকে রাখতে চায় পথে-পথে মানুষের স্মৃতির রেখা! বিদ্যাসাগর, রামমোহন—এঁদের নাম কালের ছকে অমর অক্ষরে লেখা থাকবে—এঁরা ছাড়া আরো বহু কৃতী পুরুষ নানাদিক দিয়ে দেশকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন; তাঁদের নাম পথে এঁকে রাখার রীতি এদেশে চলে আসছে ব্রিটিশ-আমোলের পত্তন-যুগ থেকে। কলকাতার নানা পথের এই যে সব নাম—এ-সব নামের যাঁরা অধিকারী ছিলেন, তাঁদের কথা আমরা ক'জন জানি!

দৃষ্টান্ত দিই: কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বৃটিশ ভারতের বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের স্মৃতিকল্পে ও তাঁর নামে এ রাস্তার নাম। কলেজ ষ্ট্রীট নামের কারণ এ রাস্তার উপর বড় বড় স্কুল-কলেজ আছে তাই!

এই সঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ছে। ১৮৯৯—১৯০০ সালের কথা—ভবানীপুরে ঐ যে সুদীর্ঘ রাস্তা হরিশ মুখার্জী রোড—ঐ পথ তৈরী হয় সেই সময়ে। বাঙলার প্রথম বা আদি রাজনীতিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাস্তু ভেঙ্গে, বহু বাগান নিশ্চিহ্ন করে, পুকুর বুজিয়ে এবং বহু গৃহ চূর্ণ করে এ পথের সৃষ্টি। কথা ওঠে, এত বড় রাস্তা হচ্ছে, এ রাস্তার কি নাম দেয়া হবে! ইংরেজেরা বললে—সে-সময়কার বাঙলার ছোটলাট লর্ড উডবার্ণের নামে রাস্তার নাম হবে—বাঙালীরা সভা করে একজোটে তুললেন প্রতিবাদ—না, এটা বাঙালী-পাড়া—তার উপর হরিশচন্দ্রের বাড়ী ভেঙ্গে এ রাস্তা হচ্ছে তৈরী—এ রাস্তার নাম হবে হরিশচন্দ্র মুখার্জী রোড। ইংরেজেরা শিউরে উঠল, বললে, বাস্‌রে—তিন হাত লম্বা নাম! শেষে বাদানুবাদের ফলে বাঙালীর হলো জিত—তবে সাহেবদের সঙ্গে একটা রফাও হলো। সেই রফার ফলে হরিশচন্দ্রের 'চন্দ্র' বাদ দিয়ে রাস্তার নাম রাখা হলো হরিশ মুখার্জী রোড। এই নাম রাখার ব্যাপারে তখনকার 'ষ্টেটস্‌ম্যান' 'ইংলিসম্যান' কাগজে এবং আমাদের দেশী কাগজ 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'বেঙ্গলি' 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' খুব চোখালো-চোখালো চিঠিপত্র ছাপা হয়েছিল!

এ-কথা রেখে এখন রাস্তার নামের ফর্দ বলি। বর্ণমালা অনুযায়ী বলবার সুবিধা হবে না—তবু সেদিকে একটু চেষ্টা করেছি, যাদ কোন নাম বাদ পড়ে, পরে যেখানে হোক্ লিখতে পারবো না, এমন কোনো সর্ত থাকতে পারে না।

অক্রুর দত্ত লেন :—ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমোলে অক্রুর দত্ত কমিশেরিয়েটে কাজ করে বহু ধন-ঐশ্বর্য উপার্জন করেন—ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলের দত্ত-পরিবারের আদিপুরুষ তিনি।

অনাথ দেব লেন :—অনাথনাথ দেব ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ ধনী রামদুলাল দেব সরকারের পৌত্র—পরে লাটুবাবু (বীডন ষ্ট্রীটের) তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

অখিল মিস্ত্রী লেন :—অখিল ছিলেন সেকালে সুদক্ষ একজন মিস্ত্রী।

অভয় মিত্র ষ্ট্রীট :—কুমারটুলি মিত্র-বংশের আদিপুরুষ ছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র। পলাশীর দরবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে ডেপুটি-রেজিষ্টারের পদে বাহাল করেন। গোবিন্দরাম ব্যারাকপুরের অধিবাসী—১৬৮৬ সালে কুমারটুলিতে এসে বসবাস করেন। তাঁর প্রপৌত্র ছিলেন এই অভয় মিত্র।

আণ্টনিবাগান লেন :—ফিরিঙ্গী কবি (বাঙলা) আণ্টনি সাহেবের নামে—এখানে পুরুষানুক্রমে তাঁদের বাস। কবি আণ্টনি চাকরি করতেন বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়িতে।

আলিপুর :—বাংলার নবাব সুবেদার মীরজাফর আলি খাঁর নাম থেকে।

আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট :—এ অঞ্চলে আর্মানীদের বাস ছিল।

আমড়াতলা ষ্ট্রীট :—এখানে আমড়া গাছের জঙ্গল ছিল।

সৈয়দ আমীর আলি এভিনিউ :—পার্ক সর্কাস অঞ্চলে সুদীর্ঘ সড়ক। সৈয়দ আমীর আলি বাঙ্গালী মুসলমান,—জন্ম চুঁচুড়ায়। এম-এ, বি-এল পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি সুরু করেন—তারপর সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিলাত যান—ব্যারিষ্টার হন। পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। মুসলমানী আইন এবং ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম সদস্য হন।

উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী ষ্ট্রীট :—খিদিরপুরে জন্ম। প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ডব্লু. সি. ব্যানার্জী নামে প্রখ্যাত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ন্যাশানাল কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯০২ সালে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারী করেন।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোড্ :—প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পাশ করে এসে ম্যাজিষ্ট্রেট হন,—তেজস্বিতার জন্য চাকরি ত্যাগে বাধ্য হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রিপণ কলেজ প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। ভারতীয় রাজনীতির জন্মদাতা হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৯১৮ সালে মতানৈক্য হেতু কংগ্রেস ত্যাগ করে মডারেট কন্ফারেন্সের প্রবর্তন করেন। তিনি কলিকাতা

মিনিউসিপাল আইনের সংস্কার করেন—পরে বৃটিশ শাসনাধীনে স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রিত্বপদ পান।

দুর্গাচরণ ব্যানার্জী রোড :—রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের পিতা, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কলিকাতা অঞ্চলে তাঁর বাস ছিল।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস রোড :—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাটে জন্ম। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ ক'রে জাহাজে চাকরি নিয়ে লণ্ডনে যান; সেখানে খবরের কাগজ বিক্রী এবং কুলীর কাজ করেছেন—সেই সঙ্গে লেখাপড়া করেন। তারপর সার্কাস দলে যোগদান এবং পরে সার্কাস ছেড়ে আমেরিকার এক পশুশালায় অধ্যক্ষতা করেন। তারপর ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের অধীনে সেনাদলে প্রবেশ। ১৯০৫ সালে রায়ো দ্য জেনেরো শহরে মৃত্যু।*

(ক্রমশঃ)

---

* 'সত্যব্রত' একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও অনুসন্ধানী গবেষক। তিনি 'কলকাতার পথে' নেমে তাঁর নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। কিন্তু পথের নাম যাঁদের নামে, তাঁদের পরিচয় যথাসম্ভব সঠিক দিয়েছেন। এরদ্বারা তোমরা কেবল শহরের পথেরই পরিচয় পাবে না, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির, বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথাও জানতে পারবে। পথ-চলতে যে সব লেন, ষ্ট্রীট, রো, রোড, স্কোয়ারের নাম নিত্য আমাদের চোখে পড়ে, তার ইতিহাস, যে ব্যক্তিদের নামে ঐ সব রাস্তা হয়েছে তাঁদের নাম জানার, পরিচয় জানার সার্থকতা আছে বইকি! পুরাতন, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করা মানেই, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করা। এই 'কলকাতার পথে' প্রবন্ধ যে শুধু পথেরই পরিচয় নয়, আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারবে। এই প্রবন্ধটির কিছু অংশ ইতঃপূর্বে আমরা মধ্যে মধ্যে 'মৌচাকে' ছেপেছি, এবং এর পরও, ঠিক ধারাবাহিকভাবে না হলেও, মধ্যে মধ্যে ছাপা হবে। মৌঃ. সঃ

স্ফিঙ্ক্স (Sphinx) সম্বন্ধে জনপ্রবাদ

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যবস্তুর মধ্যে মিশরের পিরামিড (Pyramid) অন্যতম। আবার উহার সন্নিকটে গিজে (Gizeh) নামক স্থানে মিশরের দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির প্রান্তভাগে একটি বিশাল প্রস্তরমূর্তি কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া দিগন্তচুম্বিত বালুকারাশির পানে তাকাইয়া দণ্ডায়মন আছে। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে ভাস্কর-শিল্পের প্রাচীনতম্ এবং বৃহত্তম নিদর্শন। মূর্তিটি এক বিশাল স্বাভাবিক নিটোল শিলাস্তূপ হইতে খোদিত; ইহার সম্মুখের থাবা দুইটি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত এবং ইহা স্ফিঙ্ক্স (Sphinx) নামে অভিহিত। ইহার স্কন্ধ পর্যন্ত সমস্ত অংশটা অধুনা বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত; ইহার বিপুল মস্তকটি মাত্র নয়নগোচর হয়। পূর্বাপর শতাব্দীতে সময়ে সময়ে বালুকারাশি সরাইয়া দিয়া সমগ্র মূর্তিটির এবং দুইটি থাবার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র মন্দিরটির দর্শনলাভ হইত। যুগযুগান্তর অতীত হওয়া সত্ত্বেও কাল-সংস্পর্শজনিত সামান্য ক্ষয় ব্যতীত এবং মুসলমান সৈন্যগণ কর্তৃক ইহা চাঁদমারীরূপে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে সামান্য অনিষ্ট ব্যতীত মূর্তিটিতে কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। অতি প্রাচীন ভাস্কর-শিল্পের এই অলৌকিক অবদান আপন মহিমায় স্বগর্বে মস্তকোত্তলন পূর্বক আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা লম্বে, প্রস্থে ও উচ্চে ১০০ ফুটেরও অধিক। আরবেরা ইহাকে 'ভয়ের জনক' (Father of Terror) এই আখ্যা দিয়াছে। পরন্তু এই প্রকাণ্ড মূর্তিটি কাহার স্মৃতি-চিহ্ন, কে বা ইহার নির্মাণকর্তা অথবা কতদিন ধরিয়া ইহা ঐখানে বর্তমান আছে, কেহই সঠিক বলিতে পারে না।

স্ফিঙ্ক্সের উৎপত্তি জানিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে—১ম, গ্রীসদেশীয় জনপ্রবাদ এবং ২য়, মিশরদেশীয় জনপ্রবাদ। গ্রীসদেশীয় প্রবাদ অনুসারে স্ফিঙ্ক্স একটা ভীষণাকার সামুদ্রিক দানব। গ্রীসের পুরাতত্ত্বে ও শিল্পকলায় উহা পাখা-যুক্ত সিংহীরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; উহার বক্ষঃস্থল এবং তাহার উপরিভাগ অবিকল একটি স্ত্রীলোকের চেহারার মত। পক্ষান্তরে মিশর-দেশীয় স্ফিঙ্ক্সের আকার পাখাহীন সিংহের মত; উহার শরীরের উপরিভাগটা অবিকল মনুষ্য শরীরের মত এবং উহা শায়িত অবস্থায় প্রদর্শিত হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে গ্রীসে স্ফিঙ্ক্স সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; সংক্ষেপে এখানে সেটি বিবৃত করলাম :—

সে অনেক দিনের কথা। তখন উত্তর মিশরের রাজধানী থীব্স (Thebes) নগরে ক্যাড্মাস (Cadmus) নামক এক নরপতি ছিলেন। একবার তিনি নানা প্রকার চমকপ্রদ ও

রোমাঞ্চকর জনশ্রুতি শুনিতে পান। এই নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহ হইতে বহু লোক আসিয়া বলে যে, এই নগরে আসিবার প্রশস্ত রাজপথের ধারে একটি গুহার মধ্যে এক ভয়াবহ সিংহী বাসবাস করে এবং সেটা পথিকদিগকে বিরক্ত করে। অনেকে বলে, ঐ গুহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি উক্ত জন্তু কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হতভাগ্য পথিকদিগের কঙ্কাল দ্বারা আচ্ছাদিত; আবার কেহ কেহ বলে, সেটা একটা দুর্দান্ত রাক্ষস; অবশেষে আর এক দল লোক আসিয়া বলে যে, সেই বিস্ময়কর জন্তুটা পথিকদিগকে আটক করিয়া প্রহেলিকা-পূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং কেহ সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারিলে তাহাদিগের প্রাণবধ করে।

প্রকৃত কথা যাহাই হউক, পুরবাসীরা যে এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অগত্যা পার্শ্ববর্তী জনপদ সমূহ হইতে ভয়ভীত পথিকরা থীব্‌সের পূর্বোক্ত বিপদশঙ্কুল রাজপথ পরিহারপূর্বক অন্য পথ দিয়া গমনাগমন আরম্ভ করে। ইহার ফলে ক্যাড্‌মাসের একটা বিশিষ্ট আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায়। তাহার এক বিশেষ কারণও ছিল।

থীব্‌সের বহির্ভাগস্থিত সমতলভূমি এবং পাহাড়গুলি ছিল সর্বাপেক্ষা সবল ও দ্রুতগামী অশ্বের নিবাসস্থান। দেশ-দেশান্তর হইতে ঐ অশ্ব ক্রয় করিবার জন্য থীব্‌সে প্রত্যহ শত শত সওদাগর যাতায়াত করিত; ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, থীব্‌সে যাতায়াতের রাস্তাগুলি নিরাপদ রাখা কত দরকার। কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর জীবটার আবির্ভাব হওয়া অবধি আর কেহ থীব্‌সে সহজে আসিতে ভরসা করিত না। কাজেই ক্যাড্‌মাসের আয় বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছিল।

ক্যাড্‌মাস স্বয়ং এই সকল জনশ্রুতিতে বিস্মিত হইলেও বিচলিত হন নাই; কারণ উনি উহাতে তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তত্রাচ তাঁহার কোষাগার অদূর ভবিষ্যতে হতশ্রী হইবার আশঙ্কার তিনি উন্মনা হইয়া পড়েন। পরিশেষে তিনি দুইজন বলিষ্ঠ যুবককে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করেন। তাহাদিগকে তিনি উপযুক্ত উপঢৌকনের লোভ দেখাইয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রকৃত রহস্য জানিয়া আসিতে আদেশ দেন। তাহার পর তিনি প্রজাদিগকে ডাকাইয়া বলেন যে, আমি ঐ বিস্ময়কর জন্তু সংক্রান্ত জটিল সমস্যার সমাধান শীঘ্রই করিব; আপাততঃ তোমরা আপন আপন কাজকর্ম আগেকার মত নির্ভয়ে করিয়া যাও এবং জনশ্রুতিতে কর্ণপাত করিও না।

দুই সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই সংবাদ আসে যে, সেই যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন ফিরিয়া আসিয়াছে। অচিরে সেই যুবক রাজার নিকট উপস্থিত হয়। তাহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়াই রাজা বুঝিতে পারেন যে সমাচার শুভ নহে। সে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে যে, তাহার সাথী

সেই দানব কর্তৃক নিহত হইয়াছে এবং সেই অদ্ভুত জীবটা সে অঞ্চলে সত্যসত্যই স্ফিঙ্ক্‌স (Sphinx) নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর রাজা তাহাকে সমস্ত ঘটনাবলী দেশব্যাপী কৌতূহল ও আগ্রহ চরিতার্থ করিবার মানসে উদগ্রীব জনতার সম্মুখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিতে আজ্ঞা দেন। তাহার বিবৃতির আনুপূর্বিক বিবরণটিও নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

—"প্রথমে আমরা উভয়ে, কতক্ষণ ঠিক বলতে পারি না, উপত্যকার মধ্য দিয়ে নীরবে পথ অতিবাহিত করলাম। তারপর আমার সাথী যখন গুহাটার সামনে উপস্থিত হয়, তখন তার ভিতর থেকে একটা অসাধারণ জানোয়ার বেরিয়ে আসে। তাকে দেখে ত'আমার পিলে চমকে যায়। ফিকে তামাটে গোছের তার গায়ের রঙ, দেখতে মানুষের চেয়ে ঢের বেশী লম্বা। তার শরীরটা একটা বিরাট সিংহীর মত। তার আবার খুব বড় বড় থাবা আছে, আর তার ল্যাজের শেষভাগে চামরের মত একটা গুচ্ছ আছে ; তার আবার দুটো খুব শক্ত পাখাও আছে, সে পাখা দুটো তার কাঁধ থেকে মাথা ছাড়িয়ে সোজাভাবে উপরের দিকে চলে গেছে। তার মুণ্ড এবং বুক অবিকল নারীর মত ; তার কেশর মাথা থেকে চুলের মত কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে ; সেটা আবার ঠিক মানুষের মত কথা কয়।

সেই বিচিত্র জানেয়োরটা আমার সাথীকে আটক করে ভীমগর্জনে বললে, 'আমার হেঁয়ালির উত্তর দাও ; ঠিক উত্তর না দিতে পারলে, তোমাকে আছড়ে টুকরো টুকরো ক'রে এই পাহাড় থেকে ঐ সরু গিরিপথের মধ্যে ফেলে দেব। এখন শোন হেঁয়ালিটা—

'বল দেখি, ওহে পান্থ, কি নাম তাহার—
প্রথমে যে হেঁটে চলে, দিয়ে পাদ চার ;
তার পর দুই দিয়ে, অবশেষে তিন ;—
পায়ের গণনা বাড়ে যত হয় ক্ষীণ।'

সে বেচারীর এ হেঁয়ালি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না, তাই সে কেবল হাঁ ক'রে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তার দিকে চেয়ে রইল। অমনি স্ফিঙ্ক্‌সটা তাকে তুলে নিয়ে সেই গিরিশৃঙ্গের উপর থেকে সবলে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ তখন ঘামে ভিজে গেছে, আর হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের পাঁজরায় মাথা কুটছে। আমি প্রাণ নিয়ে কোন গতিকে পালিয়ে এসেছি।"

এই কাহিনী দাবানলের ন্যায় সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সত্বর রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং রাজা নিজেও এই হেঁয়ালিটিকে চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কেহ ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিবে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহার ফলে অনতিবিলম্বে রাজ্য মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

একদিন এক প্রশান্তমূর্তি, সহাস্যবদন যুবাপুরুষ একটি নেবু বাগানের ভিতর দিয়া এক প্রস্রবণের সন্নিকটে উপনীত হইল। ঐ প্রস্রবণের পাশে বসিয়া রাজা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তাহাকে দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে বিস্ময়ব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি ?—কেমন ক'রে এখানে এলে ?'

যুবক অতি সহজভাবে উত্তর দিল, 'আমি আপনারই একজন দরিদ্র প্রজা, আমার নাম অডিপস্ (Odeipus)। দৈববাণীর নির্দেশ অনুসারে আমি এখানে এসেছি।'

'তোমার দৈববাণী-বক্তা কে ?'

'তা'ত আমি জানি না মহারাজ। তবে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমার নিদ্রিতবস্থায় তিনি আমার সঙ্গে কথা কন।'

'বটে, তিনি তোমাকে কি বলেছেন ?'

'তিনি আমাকে ফিঙ্ক্সের ধাঁধার উত্তর ব'লে দিয়েছেন।'

আকুল আগ্রহে, কম্পিতকণ্ঠে, চমকিতের মত রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি সে উত্তর ?'

'ক্ষমা করবেন মহারাজ, তা' আমি কোন মানুষকে বলতে পারি না, কেন না তিনি কাকেও বলতে বারণ ক'রে দিয়েছেন। আমি একমাত্র ফিঙ্ক্স-এর কাছে সেই উত্তর বলতে আদিষ্ট হয়েছি।'

'ফিঙ্ক্সের কাছে যেতে তোমার ভরসা হয় ?' বিস্ময়বিমুগ্ধ রাজা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সোৎসাহে, স্মিতমুখে সে কহিল, 'খুব হয় মহারাজ, আমি অকপটে আপনাকে বলছি, আমি তার কাছে যাব এবং দু'দিনের মধ্যে কার্যোদ্ধার ক'রে ফিরে আসব।...আর আমি যদি দেশবাসীকে এই মহাভীতি থেকে মুক্ত ক'রে দি, তা'হলে আপনি আপনার প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিবেন ত' মহারাজ ?'

'নিশ্চয়ই দিব।' যুবার উৎসাহে, যুবার আন্তরিকতার আবেগে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা সহর্ষে উত্তর দিলেন। তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তাহার পর অডিপস্ রাজার নিকট বিদায় লইয়া ঐ থীবস্ নগরের উত্তর দিক দিয়া যে পার্বত্য-পথ চলিয়া গিয়াছে, তাহা ধরিয়া নির্ভয়ে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার নিকট কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি এক গাছি ছড়ি পর্যন্ত ছিল না। দ্বিতীয় দিন সে এমন এক স্থানে পৌছিল, যেখান হইতে সেই গুহাটির ব্যবধান কেবলমাত্র দুই মাইল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনাইয়া আসে নাই। পশ্চিম দিগন্ত তখনও বর্ণনাতীত বর্ণসমারোহে

ঝলমল করিতেছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অবসন্নতা মিশ্রিত একটা অবসাদ তাহাকে তখন উদ্যম-উৎসাহহীন করিয়া ফেলিয়াছিল। আর অগ্রসর না হইয়া, সে সেখানেই রাত্রিযাপন করিল এবং অতি প্রত্যূষে সেখান হইতে সজীব সতেজ শরীর-মন লইয়া পুনরায় যাত্রা করিল। সে যতই সেই ভয়াবহ স্থানের সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই তাহার আনন্দ বর্ধিত হইতে লাগিল এবং যখন সে সেখানে পৌছিল, তখন স্ফিঙ্ক্‌সটা সেই গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পাখা দুইটি তখনও মেলা ছিল। সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল ঠিক সেইখানেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাকে দেখিয়া সে এতই বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ভয়ের পরিবর্তে বিদ্যুতের মত একটা পুলকিত শিহরণে তাহার সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া উঠিল।

স্ফিঙ্ক্‌সটা অবজ্ঞাসূচক হাস্য-দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল, 'যুবক, তোমার জীবন-দীপ নির্বাপিত প্রায়।'

এই কথা শুনিয়া অডিপসের কৌতুক-দীপ্ত নয়ন দুটিতে চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে তদ্রূপই অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে অকুতোভয়ে কহিল, 'আমি তা' তো বিবেচনা করি না।'

এই দম্ভপূর্ণ কথা শুনিয়া স্ফিঙ্ক্‌সটা দারুণ ক্রোধে দাঁত কড়মড় করিয়া তাহার পানে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। বোধ হইল যেন তাহার নয়নদ্বয় হইতে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তাহার পর গম্ভীর মুখে, বজ্রকঠোর স্বরে বলিল, 'বটে! আচ্ছা আমার এই হেঁয়ালির উত্তর দাও তো?' এই বলিয়া আগেকার হেঁয়ালিটি পুনরাবৃত্তি করিল।

অডিপস্ কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া স্মিতহাস্যে উত্তর দিল, 'নর শৈশব অবস্থায় হামাগুড়ি দেয় (অর্থাৎ চার পায়ে হাঁটে); ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত দু'পায়ে হাঁটে; তারপর যখন সে খুব বুড়ো হয়, তখন সে তৃতীয় পদের স্বরূপ লাঠির সাহায্যে হাঁটে; যত সে বুড়ো হয়, এইরূপে ততই তার পায়ের সংখ্যা বাড়ে।

এই অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া স্ফিঙ্ক্‌সটা বিকট চীৎকার করিয়া গিরিশৃঙ্গের উপর নিজেকে নিক্ষেপকরতঃ গিরিশঙ্কটের ভিতর গিয়া পড়ে এবং সেইখানেই সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

স্ফিঙ্ক্‌সটা এইরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে অডিপস্ থীবসে ফিরিয়া আসে এবং রাজা তাহাকে নিজ প্রতিশ্রুত পুরস্কার দানে আপ্যায়িত করেন। স্ফিঙ্ক্‌সের মহাভীতি হইতে রাজ্যটির উদ্ধার সাধিত হইলে, একদিন মহাসমারোহ সহকারে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্বান প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্ফিঙ্ক্‌সের উৎপত্তি এবং স্থিতিকাল সম্বন্ধে আজিও অনিশ্চিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, এই প্রতিমূর্তিটি মিশরের আদিম অধিবাসীদিগের সূর্যদেবতা 'রা'র (Ra) প্রতীক বুঝায়, এবং সম্ভবতঃ পিরামিড্ অপেক্ষা অধিক পুরাতন। কিন্তু ইহা যে কি, তাহা এ পর্যন্ত রহস্যগর্ভেই নিহিত রহিয়াছে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাইরে কা'দের কথাবার্তার শব্দে রাতুলের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

একজন বলছে—শুনলাম কিনা বাবুর ছেলে ফিরে এসেছে—খবরের কাগজেও দেখলুম কাল, তাই দেখতে এলুম—ব্যাপারটা সত্যি কিনা—

রাতুল সেই দরজা-বন্ধ ঘরে চারদিকে চোখ মেলে দেখলে। কাল সে রাত্রে এই ঘরে ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে যা' কিছু দেখেছিল সব মনে করতে চেষ্টা করলো। স্বপ্ন তো তবে নয়। সত্যিই। বাইরে দরজার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো উঁকি দিচ্ছে। তবে কি দিন হয়ে গেছে। রোদ উঠেছে নাকি! বেলা হয়েছে! কী সর্বনাস! কখন সে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়েছে জ্ঞান ছিল না। আধা-স্বপ্ন আধা-জাগরণের মধ্যে দেখা, গত-কালের সমস্ত ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে আবার ভেসে উঠতে লাগলো। সেই ভবতোষবাবুর বন্ধু হরিদাস! কোথায় গেল সে! সেই ক্ষিতীনবাবু আর তারা বাবা—প্রফেসর নিত্যানন্দ সেন! তাঁরাই বা কোথায় গেলেন!

এবার আর একজন ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল—আমিও দেখলাম কাগজে—ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে মিটিং হবার কথা ছিল, সে মিটিং-এও নিত্যানন্দ যান্‌নি—তাঁর ছেলে ফিরে এসেছে বলে—

প্রথম ভদ্রলোক বললেন—আমিও তাই ভাবলাম যে, সেই ছেলে যদি ফিরেই এসে থাকে তো দেখেই আমি—আমি ছেলেকে ঠিক চিনতে পারবোই—আট দশ বছর আগে দেখেছি—যখন এ-বাড়িতে আসতুম আমার কোলে চড়ে কত বেড়িয়েছে—আর এতদিন পরে যত বড়ই হোক—দেখলে চিনতে পারবো নিশ্চয়ই—

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন—আমিও সেই চাকরি নিয়ে কলকাতা ছেড়েছি—আর তো আসা হয়নি এদিকে—বড় মন খারাপ ছিল ওই ব্যাপারে—একমাত্র ছেলে মারা গেলে প্রাণে যে কী হয়, যে বাপ হয়েছে সে-ই বলতে পারে—

প্রথম ভদ্রলোক বললেন—ও গোবিন্দ শুনে যাও—

গোবিন্দর গলা শোনা গেল—আজ্ঞে যাই—এই ভাতের হাঁড়িটা নামিয়েই যাচ্ছি—

খানিক পরে গোবিন্দ এল। বললে—আর একটু বসুন—এই এলেন বলে—

—কতক্ষণ গেছেন ?

গোবিন্দ বললে—এই আধঘণ্টা হলো—তা' আমার বাবুর যাবার ইচ্ছে ছিল না আজ্ঞে, থানা পুলিসদের বাবু পছন্দ করেন না তো, কিন্তু ক্ষিতীনবাবু ধরে বসলেন ওর এক বন্ধু আছেন পুলিসের বড় চাকরি করেন—সেখানে নিয়ে যাবেনই—ক্ষিতীনবাবু নিজে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির, বললেন—যেতেই হবে তোমাকে—তুমি মন খারাপ করে থাকলে চলবে না—

—আর তোমার খোকাবাবু ?

—তাকেও নিয়ে গেলেন মটরে তুলে।

—তাকে তো তুমি ছোটবেলা থেকে নিজে মানুষ করেছ—তুমি যেমন চিনবে এমন আর কেউ চিনবে না, তা' তোমার কী মনে হয় ? ওকি তোমার খোকাবাবু সত্যি-সত্যিই—

গোবিন্দ বললে—আজ্ঞে আপনারা বাবুর পুরোন ছাত্র সব, ভালোমানুষ লোক, বলুন তো আজ্ঞে, আমি চিনবো না তো কে চিনবে ? আমিই তো প্রথম কালীঘাটে দেখে আসি, বাবুকে এসে খবর দেই, তারপর ক্ষিতীনবাবু এলেন খবর দিতে—তা' বাবুর বিশ্বেসই হয় না—বললেন —তোর চোখ খারাপ হয়েছে গোবিন্দ, তুই চশমা নে—হ্যান্-ত্যান্—কত কী—কী বলি বলুন তো বাবু, আমার হলো চোখ খারাপ—তো আপনাদের দেখেই চিনলাম কী করে— ?

—তা তো বটেই, তুমি যদি না চিনবে তো চিনবে কে ?

—আজ্ঞে তাই বলুন আপনারা, আমি তাই বললাম—খোকাবাবু কামিখ্যের গিয়ে মন্তর নিয়ে ওম্‌নি হয়ে গিয়েছেন—এখন কি আর সেপাই-পুলিসের কম্ম—এখন ওঝা ডেকে ঝাড়াতে হবে—তবে ঘাড় থেকে ভূত নামবে—তা আমার কথা কেউ শোনেনা আজ্ঞে—

—তা' তোমার বাবু এখন, কী বলছেন ?

—কিছুই বলছেন না হুঁজুর—কাল সারা রাত উপোষ,—কিছুই খেলেন না, অতগুলো ভাত তো নষ্ট করতে পারি না, ভাত হলো মা-অন্নপুন্না—খোকাকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছিলুম—আর আমি সেই দু'জনের ভাত খেয়ে মরি—পেটটা দমসম্ মেরে আছে—বুড়ো বয়সে অত

খাওয়া সহ্য হবে কেন—সকাল থেকে এখনও হাতের জল শুকুচ্ছে না—বাড়িতে একে ওই বিপদ তার ওপর আবার আমার এই বিপদ—

—তা' তোমার খোকাবাবু কী বলছেন ?

—তার মুখে কথা বার করে কার সাধ্যি ? কথা বলবার কি ক্ষমতা রেখেছে—মন্তর-তন্তর করে মাথার দফাটি তার যে সেরে দিয়েছে একেবারে—খোকাবাবুরও কি কম নাকাল চলেছে কাল থেকে—

ভদ্রলোক দু'জন বললেন—তা'হলে তোমাদের বাড়িতে খুব বিপদ চলছে বলো—

—বিপদ বলে বিপদ বাবু, কাল রাত্তিরে লোক ছেঁকে ধরেছিল বাড়ির বাইরে—সকলকে ঠেকিয়ে রেখেছে এই একা গোবিন্দ শর্মা—তারপর ভোর হতে না হতে খবরের কাগজের লোক, বাইরের লোক, আপনার লোক, লোকের যেন আর কামাই নেই—এই দেখুন না, এই একগাদা 'তার' এসেছে বাবুর নামে—কে যে কোন দিকে দেখে, আমি একলা মানুষ—বাজার করবো, রাঁধবো, বাসন মাজবো না ভাববো—তার ওপর আমার আবার এই পেঠের···আচ্ছা আপনারা বসুন, আমি আবার উনুন খালি রেখে এসেছি, কয়লাগুলো জ্বলে যাচ্ছে—কয়লার যা দাম—

গোবিন্দ চলে গেল।

ভদ্রলোক দু'জন বসে গল্প করতে লাগলো।

একজন বললেন—কী কাণ্ড বল দিকিনি ? যদি প্রমাণ হয় যে এই ছেলেই ওর আসল ছেলে রাতুল—তা'হলে কী হবে বল তো ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন—সত্যিই, তা'হলে বড় সমস্যার কথা—

প্রথম ভদ্রলোক বললেন—শুধু সমস্যার কথা, ভয়ের কথা—অথচ আমরা সবাই চাই যে ছেলে তাঁর ফিরেই আসুক—রাতুলের বেঁচে থাকার খবরটা যেন সত্যি হয়—

—কিন্তু উল্টোদিকের কথাটা ভেবে দেখো—মাষ্টার মশাই-এর অবস্থাটা কী হয়। এই এত যশ, নাম, ডিগ্রি, টাকা, বই লেখা,—প্রতিষ্ঠা—সব তো ওই ছেলের মৃত্যুর ওপর ভিত্তি করে—ছেলে যদি সত্যিই ফিরে আসে, তখন এতদিনের সব কিছু যে ধূলিসাৎ—

রাতুল বন্ধ ঘরের ভেতর চুপ করে এতক্ষণ সমস্ত কথাবার্তা শুনছিল।

না আর নয়। এবার তাকে সামনে এগিয়ে এসে নিজের কাজ করতে হবে। প্রথম হরিদাসের মুখোসটা খুলে দিতে হবে। যা'কে নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক, কল্পনা-জল্পনা, যাকে নিয়ে এত পুলিস-ঘর হচ্ছে—তাকে প্রকাশ করে দিতে হবে। অযথা মাঝখানে পড়ে তার হয়রানি। বেচারী কোথায় সংসার-সমাজ সব ছেড়ে ঈশ্বরের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করেছে, ঘটনার বিচিত্র

আবর্তে পড়ে তার এ কী বিপদ! হরিদাসকে উদ্ধার করলে—সবাই উদ্ধার পাবে! বাবাও শান্তি ফিরে পাবে।

বাইরে দরজার ফাঁক দিয়ে রাতুল একবার উঁকি মেরে দেখলে।

পাশের ঘরে বসে সেই দু'জন ছাত্র আবার নিজেদের মধ্যে তখনও আলোচনা চালিয়েছে। বাইরে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল রাতুল। এখান থেকে একটু নিচু হলে রান্না-ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। রান্না-ঘরেও গোবিন্দ নেই। তবে নিশ্চয়ই কল-ঘরে। কাল দু'জনের ভাত পেট ভরে খেয়েছে—শরীর খারাপ হয়েছে। ঘন-ঘন কল-ঘরে যাচ্ছে। সিঁড়িতে একধাপ নেমে দেখলে উঠোনের পূব-দক্ষিণ কোণের কল-ঘরটার দরজা বন্ধ বটে। ভেতর থেকেই বন্ধ মনে হচ্ছে। বাইরেও শেকল খোলা।

এই সুযোগ!

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রাতুল। সকলের দৃষ্টির আড়ালে হঠাৎ নিজকে অদৃশ্য করে নিঃশব্দে দরজার খুললে।

বাইরে বেরিয়ে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করতে যাচ্ছিল রাতুল, কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখতে গিয়ে দেখলে—গলির মুখে একটা মটর ঢুকছে। হুড্‌খোলা মটর। দিনের আলোয়, দুপুরের সূর্যের তলায় স্পষ্ট দেখা গেল—গাড়ির মধ্যে ক্ষিতীনবাবু, বাবা আর নেড়া-মাথা গেরুয়া পরা চেহারা—হরিদাস।

এক নিমিষে গলির উল্টোদিকে মুখ করে চলতে লাগলো রাতুল।

আজ এখনি হরিদাসের ব্যাপারটার একটা সমাধান করতে হবে। হরিদাসের সমস্যাটা মিটলে—তখন রাতুল নিজের কথা ভাবতে পারবে।...

পেছনে মটর থামার শব্দ হলো একবার। পেছন ফিরে না চেয়ে, রাতুল সোজা শম্ভুনাথ লেন-এর উল্টোদিকে চলতে লাগলো।

* * * *

এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে রাতুল ভবানীপুর পোষ্ট অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল।

রাতুল ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তারপর 'টেলিগ্রাফ' লেখা কাউণ্টারের সামনে এক ভদ্রলোককে বললে—একটা টেলিগ্রাফের ফর্‌ম্‌ দিন তো—

ভদ্রলোক ফর্‌ম্‌ দিলেন।

রাতুলের হঠাৎ মনে পড়লো—কলমও তো তার নেই—

—আপনার কলম্‌টা একবার দেবেন দয়া করে

ভদ্রলোকের বোধ হয় কলম দেবার অবসর ও ইচ্ছে কোনটাই ছিল না। একহাতে টরে-টক্কা করছেন, আর অন্যদিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েই বললেন—কলম ওখানে ঝুলছে—নিন্—

অনেক খুঁজে-পেতে রেলিং-এর একধারে একটা ভাঙা নিব-ওয়ালা কলম দড়িতে বাঁধা ঝুলছে দেখা গেল। তার পাশেই লোহার একটা বিরাট হাঁ-মুখ দোয়াতও।

ভূষো কালি। তা হোক।

ভাগ্যিস, ভোম্বল সেই দশটাকার নোটটা দিয়েছিল তাকে। ভোম্বলের ওপর কৃতজ্ঞতায় রাতুলের বুকটা ভরে উঠলো। হরিদাসের ফয়শ্‌লাটা হয়ে যাক, তারপর রাতুল আত্মপ্রকাশ করে বাবাকে বলে তার একটা ভালো চাকরি করে দেবে।

ভদ্রলোক ফরম্‌খানা নিয়ে অক্ষরগুলো বার দুই গুণে দেখলেন।

বললেন—এডেন্?

—আজ্ঞে হাঁ,

ভদ্রলোক আরো বার দুই অক্ষরগুলো গুণে দেখে বললেন—আপনার লাগবে পাঁচটাকা তেরো আনা—ওই ওখানে স্ট্যাম্প বিক্রী হচ্ছে—কিনে এইখানটায় এঁটে লাগিয়ে দিন—

* * * *

তারপর···

তারপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রদ্দুর। সেই রদ্দুরের মধ্যে খিদিরপুর ডকের ভেতরে খুঁজে খুঁজে বার করলে ভোম্বলদের জাহাজখানা। বড় বড় অক্ষরে জাহাজের গায়ে লেখা রয়েছে—'NEPTUNE' জলদেবতা—

ভোম্বলও আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে—কীরে? হঠাৎ তুই?

—কেন? আসতে নেই?

—না, তা কেন, বেশ করেছিস এসেছিস্—এইনে, চিনেবাদাম খা—

পকেট থেকে চিনেবাদাম বার করে দিয়ে ভোম্বল বললে—তোর কথাই ভাবছিলাম একটু আগে, তুই অনেকদিন বাঁচবি—তোর শরীর খারাপ নাকি?

—না,···তোদের জাহাজ আর ক'দিন এখানে থাকবে রে?

—এই বড় জোর তিনদিন কি চারদিন—

—এই তিন-চারদিন তোর এখানে থাকবো আমি—থাকতে দিবি আমাকে?

ভোম্বল আকাশ থেকে পড়লো। বললে—কেন?

—সে-কথা জিগ্যেস করিস নি—এখন কিছু খাওয়া আমাকে, কাল রাত্তিরে কিছু খাওয়া হয়নি—

(ক্রমশঃ)

সোভিয়েট দেশের ছেলেমেয়ে

শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সোভিয়েট দেশের ছেলেমেয়েরা আমার মারফৎ তোমাদের যে প্রীতি-সম্ভাষণ এবং চিঠির-বন্ধুত্ব পাতাবার জন্য যে সাগ্রহ আহ্বান পাঠিয়েছে, গেল-বারের লেখায় আমি তোমাদের তা জানিয়েছি। জবাবে অনেকে নাম-ধাম-পরিচয় পাঠিয়ে বন্ধুত্ব-কামী হয়ে তাদের উদ্দেশে যে সব চিঠি পাঠিয়েছো—সেগুলি সে-দেশের ছেলেমেয়েদের পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে…এই 'মৌচাকের' পাতাতেই তোমরা সে-ব্যবস্থার সব খপর যথাসময়ে পাবে।

তোমাদের মধ্যে অনেকে জানতে চেয়েছো, সোভিয়েট ছেলেমেয়েদের ঐ যে সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, 'ক্রেশ,' 'কিণ্ডারগার্টেন,' 'পায়োনীয়ার' এবং 'কম্‌সোমোল্'…এগুলো কি? আজ সেই পরিচয়ই দেবো।

কিন্তু সে-পরিচয় দেবার আগে গোড়াকার কিছু কথা বলা দরকার। সোভিয়েট দেশে রাষ্ট্রনেতা থেকে শুরু করে, অতি সাধারণ ব্যক্তি সকলকেই দেখেছি,—ছেলেমেয়েদের তাঁরা কতখানি আন্তরিক ভালবাসেন…তাদের তুচ্ছ না করে কতখানি খাতির করেন। এর কারণ, ওখানে সকলের ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস দেশকে বড় করতে হলে, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে,—যে ছেলেমেয়েরা হলো দেশের ভবিষ্যৎ—সেই ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো মনে-প্রাণে সুস্থ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ করে গড়তে হবে। ছেলেমেয়েরা হলো ভবিষ্যতের বনিয়াদ। এ শুধু কথার কথা বা প্রবন্ধ লেখার হিসাব নয়। এ ধারণা মনে রেখে ছেলেমেয়েদের শিক্ষায়-দীক্ষায়, কাজে-কর্মে, বুদ্ধিতে,—বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী-সৃষ্টির কলা-কৌশলে, কৃষিকর্মে, জনসেবায়, ধর্মে-আদর্শে, স্বাস্থ্য-সম্পদে, সামাজিক সৌজন্যে সব দিক দিয়ে তারা বড় হয়ে দেশের মঙ্গল করে দেশকে যাতে গৌরবের উর্ধাসনে বসাতে পারে—সে সম্বন্ধে সজাগ সাধনা করছেন সে-রাজ্যের বড়রা প্রত্যেকেই। সোভিয়েট দেশে হাজার-হাজার মাইল পর্যটন করে আমরা দেখেছি, সেখানকার শহরে, গ্রামে সর্বত্র ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছে সংখ্যাতীতভাবে—বহু 'ক্রেশ,' 'কিণ্ডারগার্টেন,' 'পায়োনীয়ার' এবং 'কম্‌সোমোল্' প্রতিষ্ঠানগুলি।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পূর্বে সমগ্র রাশিয়া-রাজ্যের হর্তাকর্তা-বিধাতা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর রাজার দল—রুশ-ভাষায় রাজাকে বলা হতো 'জার' অর্থাৎ সম্রাট। তাঁদের আমলে জনসাধারণকে মানুষ বলে তাঁরা গণ্য করতেন না—কাজেই দেশের ছেলেমেয়ে বা কিশোর-কিশোরীর জীবন ছিল খুব নীচু স্তরের। দেশে তখন না ছিল শিক্ষা, না কারো বাঁচবার

জন্য প্রেরণা, উৎসাহ বা স্পৃহা! স্বেচ্ছাচারী অভিজাত-শ্রেণীর অধীনে, তাদের খেয়াল-খুশীমত

নৃত্যরত সোভিয়েট দেশের ছেলেমেয়ে

সাধারণে বেঁচে থাকতো। নিজেদের স্বাধীন-সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে, ভাগ্যের উপর নির্ভর করেই ছিল তাদের বাঁচন-মরণ!

অবিচার এবং অত্যাচারের বিষবাষ্পের আবহাওয়া থেকেই একদিন নিপীড়িত রাশিয়ার অতি-সাধারণ এক গরীব প্রজার ঘরেরই ছেলে—ভ্লাদিমির্ ইলিচ্ লেনিন মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন—দেশের লাখ লাখ কোটি কোটি সাধারণ মানুষ ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে চলেছে! এ রোধ করতে না পারলে দেশ এবং দেশের মানুষ একদিন সমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই ১৯১৭ সালে তাঁরই একদল সহযোগীকে নিয়ে বিপ্লব ঘোষণা করলেন লেনিন—অভিজাত-শাসক 'জারের' বিরুদ্ধে। লেনিনের সহযোগীরা সকলেই ছিলেন সাধারণ-ঘরের অতি সাধারণ মানুষ। এই সব সহকর্মী-শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই আজ তাঁদের লোকান্তরিত জনপ্রিয় নেতার পদাঙ্কানুসরণ করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধিনায়ক, নেতা, সমাজ এবং রাষ্ট্র-পরিষদের নানান্ গুরুভার নিয়ে দেশকে সুখে-সম্পদে-শান্তিতে গরীয়ান করে গড়ে তুলছেন।

লেনিনের এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে রুশ-রাজ্যে শুধু যে আভিজাত্য-দম্ভ আর অত্যাচারে-ভরা 'জার্'-রাজত্বেরই অবসান হলো তাই নয়···সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এমন এক অভিনব সাম্যবাদী সামাজিক-প্রজাতন্ত্রের, যার বিচিত্র বিধি-ব্যবস্থার বিধানে সারা রাশিয়ায় চিরদিনের মতো লোপ পেলো জারতন্ত্রের অত্যাচার ও অসাম্য।

লেনিনের নূতন সামাজিক-প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থায় দেশের প্রত্যেকটি প্রজার জন্যেই হলো এক বিধান, এক নিয়ম,—কাজকর্ম, সুযোগ-সুবিধার দিকেও ছোট-বড় কারো কোনো প্রভেদ থাকলো না। লেনিনের প্রবর্তিত শ্রেণী-ধর্ম-হীন এই অভিনব সাম্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেই দিনের পর দিন সোভিয়েট দেশে সাধারণ মানুষরাই ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলেছে নূতন জীবন, নূতন সমাজ, নূতন মানুষ এবং সুখে-শান্তি-সম্পদে বাঁচবার নূতন উপায়, নূতন পথ।

ছোটদের জন্য সোভিয়েট দেশের সর্বত্রই অর্থাৎ শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে:ও পাড়ায়-পাড়ায় তৈরী হয়েছে সুন্দর এবং আধুনিক ব্যবস্থায় তৈরী 'ক্রেশ্' (Creche) বা শিশু-সদন। এগুলির ব্যবস্থা শুধু খুব ছোট-ছোট শিশুদের জন্যে। সদ্যোজাত-শিশু থেকে দু'তিন বছর বয়সের যে সব শিশু সবেমাত্র চলতে-ফিরতে বা আধো-আধো ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে—এমন শিশুদেরই জায়গা এই সব শিশু-সদনে। যে সব মেয়েরা ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায় কিম্বা অফিসে স্কুলে কাজ করেন—দৈনন্দিন কাজে যাবার পথে শিশুদের তাঁরা রেখে যান সোভিয়েট দেশের সর্বত্র ছড়ানো এই সব শিশু-সদনের সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ কর্মীদের জিম্মায়। তারপর কাজ সেরে বাড়ী ফেরার পথে আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান্ ঘরের

ছেলেমেয়েদের। শিশু-সদনের প্রত্যেকটি কর্মীকেই শিশুদের লালনপালন-পরিচর্যার সবকিছু বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হতে হয়—এই হলো সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিধান।

সোভিয়েট শিশু-সদনগুলির মধ্যে বেশীরভাগই দিনের বেলায় শিশুদের দেখা-শোনার জন্য। আবার এমন অনেক বিশেষ শিশু-সদনও আছে, যেখানে সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত শিশুদের দেখা-শোনার ভার দিয়ে মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে কোনো মিটিঙে বা সিনেমা-থিয়েটারে কিম্বা লোকজনের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে যান্। এছাড়া যে-সব মা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেন—তাঁদের শিশুদের দেখাশোনা বা পরিচর্যার জন্যও শিক্ষায়তনের সঙ্গেই বিশেষ শিশু-সদনের ব্যবস্থা আছে। আরো এক ধরণের সাময়িক শিশু-সদন আছে সোভিয়েট-রাজ্যের
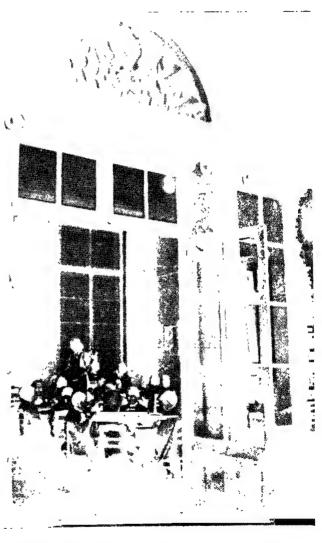
সোভিয়েট রাজ্যের একটি শিশু-সদনে ছেলেমেয়েরা খাওয়াদাওয়া করছে

গ্রামাঞ্চলে! দেশের মাঠে-বাটে, ক্ষেতে-খামারে ফসল কাটবার বা বোনবার সময় যে-সব মা দল বেঁধে ঘর থেকে মাঠে বা বনে চাষীদের সঙ্গে কাজ করতে যান্—তাঁদের শিশুদের দেখা-শোনা, যত্ন-আত্তির ভার নেন্ এই সব সাময়িক শিশু-সদনগুলি। এ-সব ছাড়াও বড় বড় রেল ষ্টেশন, পার্ক, দোকান এবং কারখানার মত জায়গাতেও ছোটখাট বহু সাময়িক শিশু-সদন আছে। সেখানে শিশুদের নিরাপদ আরামে রেখে মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে নিজের নিজের কাজকর্ম সারতে পারেন।

এমনি লক্ষ-লক্ষ শিশু-সদন ছড়িয়ে আছে সারা সোভিয়েট-রাজ্য জুড়ে। এ-সব জায়গায় শিশুদের সময়মত খাওয়ানো-দাওয়ানো, স্নান-করানো, ঘুম-পাড়ানো, সব কিছুরই ব্যবস্থা যেমন সুষ্ঠু, সুন্দর তেমনি পর্যাপ্ত। আধুনিক বিজ্ঞাতসম্মত ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি শিশুর আহার, আরাম, বিরাম এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে-তক্‌-তকে ঘরদোর, আরামপ্রদ খাট-বিছানা, আসবাবপত্র, শিশুদের খেলবার ও আনন্দে রাখবার জন্য রঙ-বেরঙের বিচিত্র খেলনা; ছুটোপাটি করে বেড়াবার জন্য ফুলে-ঘাসে-পাতায় সাজানো রৌদ্রোজ্জ্বল বিস্তীর্ণ বাগান—এ-সবেরই ব্যবস্থা আছে সোভিয়েট দেশের শিশু-সদনগুলিতে। এখানে এসে প্রত্যেক শিশুই সেবা-আরাম-যত্ন-পরিচর্যা এবং সুখ-সুবিধা লাভ করে।

সোভিয়েট রাজ্যের ব্যবস্থামত, বছর পাঁচেক বয়স হলে, শিশুদের জন্য অজস্র 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রতিষ্ঠান রয়েছে—দেশের সর্বত্র পাড়ায়-পাড়ায়। এ-সব কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানের আর একটি নাম: 'পড়ার বই-বিহীন' পাঠশালা! এখানে শিশুদের জন্য যে-সব বইপত্র দেওয়া হয়, সেগুলো গুরুগম্ভীর ইস্কুলের বই নয়। সবই নানা রকমের রঙীন ছবি আর গল্পের বই। এ-সব গল্পের বইও আবার ছেলেমেয়েরা নিজেরা পড়েনা···কিণ্ডারগার্টেনের দিদিমণিরাই ছবি আর গল্পের বই থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিত্য নূতন নানা গল্প-কাহিনী-ছড়া পড়ে শোনান। কিণ্ডারগার্টেনে এসে ছেলেমেয়েরা, খেলাধূলো, গল্প-ছড়া, নাচ-গান, মেলা-মেশা, পরিচ্ছন্নতা আর 'ডিসিপ্লিনের' মধ্য দিয়েই শেখে অক্ষর চিনতে এবং সংখ্যা গুনতে। যে-সব ছেলেমেয়ে বয়সে একটু বড়-সড় কিম্বা বুদ্ধিসুদ্ধিতে পাকা হয়েছে—তাদের শেখানো হয়, কেমন করে ঘরদোর-জিনিসপত্র পারিপাটি ও সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে হয়। তাছাড়া ছবি-আঁকা, কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে নানা রকম নক্সা বানানো, কাগজে জলছবি তোলা, প্যারিস-প্লাষ্টার দিয়ে হরেক ছাঁদের খেলনা ও পুতুল গড়, 'বিল্ডিং-ব্লক্‌স্' দিয়ে খেলার বাড়ী-ঘর তৈরী করা, ফুলদানীতে নানা জাতের ফুল-পাতা সাজানোর কলা-কৌশল-কায়দা, কার্ডবোর্ডের টুকরো দিয়ে জাহাজ, এরোপ্লেন, ট্রাক্টর, পুতুলের ঘর-বাড়ী বানানো, নানান্ দেশের ডাক-টিকিট জমানো, হরেক জাতের, হরেক ধরণের পাথর-নুড়ির টুক্‌রো আর গাছের ফুল-পাতা-ডাল সংগ্রহ করা, নানা রকমের পাখী,

প্রজাপতি, কাঠবেরালী, খরগোস, লাল মাছকে পোষ মানানো···এমনি আরো কত কি যে শেখে সোভিয়েট ছেলেমেয়েরা দেশ-জোড়া এই সব কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানের দৌলতে তার ইয়ত্তা নেই।

'ক্রেশে'র যেমন ব্যবস্থা, ঠিক তেমনি ব্যবস্থা এখানেও। রোজ সকালে কাজে বেরুবার সময় মায়েরা তাঁদের ছোট ছেলেমেয়েদের রেখে দিয়ে যান এই সব কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানের জিম্মায়।···দিনের শেষে কাজ সেরে বাড়ী ফেরবার সময় আবার যে-যার ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে নিয়ে যান নিজের নিজের ঘরে। ছেলেমেয়েরা সারাটা দিন থাকে কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানের অভিবন মধুর আবহাওয়ার মধ্যে—খেলাধূলো, নাচ-গান ও স্বাভাবিক সহজ সরল হৈ-চৈ-আনন্দে! কত রকমের ছড়া-ছবি-গল্পের আর শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে তারা ক্রমে ক্রমে শেখে সমাজে পাঁচ-জনের সঙ্গে একত্র মিলে-মিশে বন্ধুভাবে বড় হয়ে, মানুষ হয়ে উঠে ভবিষ্যৎজীবনকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও শান্তি-সুখে সুন্দর করে গড়ে তোলবার প্রথমপাঠ।

সোভিয়েট দেশের এইসব অসংখ্য কিণ্ডারগার্টেনগুলির দেখা-শোনা এবং সুষ্ঠু ভাবে চালানোর ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের দায়িত্বও বড় কম নয়! কেন না, দেশের আশা-ভরসা-ভবিষ্যৎ যা কিছু, সবই গড়ে তুলতে হয় তাঁদের।

ছেলেমেয়েদের আনন্দবিধানের জন্য, তাদের রুচি এবং পছন্দমাফিক আগাগোড়া ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর রঙীন পরিপাটি করে রাখতে হয় এইসব কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন এবং প্রাঙ্গণ। এখানকার কর্মীদের বিশেষভাবে নজর রাখতে হয় ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকেও। রোজ সকালে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে কিণ্ডারগার্টেনে পৌছানো মাত্র প্রতিষ্ঠানের পাশ্‌-করা ডাক্তার তাদের পরীক্ষা করে দেখেন—কেউ কোনো রোগের ছোঁয়াচ্‌ নিয়ে এলো কিনা···কেন না, এতগুলি ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবে এতক্ষণ, সুতরাং কারো যদি সর্দি, কাশি, কিম্বা কোনো রকম রোগের ছোঁয়াচ লেগে থাকে তো প্রতিষ্ঠানের অন্য ছেলেমেয়েদের সহজেই তা সংক্রামিত হতে পারে—এই জন্যই এঁরা এত হুঁশিয়ার। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের সুস্থ-সবল-সচঞ্চল এবং মনের স্ফূর্তিতে রাখা চাই—তাই ছোটদের সব কিছু ব্যাপারেই এত যত্ন নেন এঁরা। ডাক্তারের পরীক্ষা হলে, ছেলেমেয়েরা তাদের ছোট্ট ঝক্‌ঝকে সাজানো-সুন্দর কলঘরে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, বাইরের জামা-কাপড় বদলে ফেলে কিণ্ডারগার্টেনে রাখা ধোপ-দোস্ত পরিষ্কার পোষাক পরে। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের জন্য নিজস্ব আলাদা জলের কল, সাবান, তোয়ালে, দাঁতের মাজন, ব্রাশ্‌, চিরুনি এবং পোষাক-রাখবার আলমারীর ব্যবস্থা আছে। যে-সব ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের অক্ষর পরিচয় হয়নি, তাদের প্রত্যেকের জিনিসে ফল, ফুল, পাখী, জানোয়ারের হরেকরকম রঙীন ছবির নিশানা এঁকে চিহ্ন

দেওয়া থাকে—যাতে একজনের জিনিস আরেকজন ভুল করে টেনে না ব্যবহার করে। ছেলেমেয়েদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও এই কিণ্ডারগার্টেনে। দুধ, ডিম, ফল, রুটি, মাখন, জ্যাম্, পরিজ্, স্যুপ্, কেক্, বিস্কুট, চকোলেট, টফী, লজেঞ্জস্ প্রভৃতি শিশুদের উপযোগী নানান্ পুষ্টিকর অথচ সহজ-পাচ্য খাবারের বন্দোবস্ত রয়েছে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং শিশু-বিদ্যায় পারদর্শীর পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্য আছে তাদের নিজের নিজের ব্যবহারের থালা, বাটি, গেলাস, চামচে, কাঁটা এবং ছুরি।

বাড়ীতে প্রভাতী-জলযোগ সেরে ছেলেমেয়েরা প্রত্যহ আসে কিণ্ডারগার্টেনে...তারপর এখানে এসে প্রাতরাশ সেরে খেলাধূলো, নাচ-গান-গল্পগুজবে মেতে থাকে। দুপুরে, ঠিক সাড়ে এগারোটা বারোটায় মধ্যাহ্ন-ভোজ। হাত-মুখ ধুয়ে সবাই জড়ো হয় ছোট-ছোট রঙীন টেবিল-চেয়ার-কার্পেট দিয়ে পরিপাটি ও সুন্দর করে সাজানো খাবার-ঘরে। সেখানে পরিচ্ছন্ন-পরিষ্কার চাদর-মোড়া টেবিলের ওপর ধোয়া-মোছা তক্‌তকে থালা-বাটি-গেলাসে রয়েছে ঠাণ্ডা-গরম টাট্‌কা নূতন নানান সব উপাদেয় খাবার। মনের আনন্দে খাওয়াদাওয়ার পর, সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, দাঁত মেজে, জামা-কাপড় বদলে, শোবার-পোষাক পরে ছেলেমেয়েরা বিশ্রাম করতে যায় তাদের ঘুমের-কামরায়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্য পাতা রয়েছে ছোট-ছোট সুন্দর খাটে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র আরাম-শয্যা। এইখানে ছুটোপাটি ছেড়ে তারা পরম-নিশ্চিন্তে ঘুম দেয় বিকেল পর্যন্ত। ঘণ্টা দুই-তিন বিশ্রামের পর, বেলা তিনটে নাগাদ ছেলেমেয়েরা বিছানা ছেড়ে উঠে, হাত-মুখ ধুয়ে, শোবার-পোষাক বদলে, বিকেলের জল-খাবার সেরে বাগানের মাঠে যায় খেলাধূলো ছুটোছুটি করতে। সেখানে হৈ-চৈ-স্ফূর্তিতে সারা বিকেলটা কাটিয়ে সন্ধ্যার আগেই ছেলেমেয়েরা ফিরে আসে তাদের কিণ্ডারগার্টেন-ভবনে। সেখানে আবার হাত-মুখের ধূলো-কাদা-মাটি ধুয়ে, কিণ্ডারগার্টেনের পোষাক বদলে বাড়ীর জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে থাকে মায়েদের অপেক্ষায়—দিনের কাজ সেরে তাঁরা এসে যে যার নিজের ছেলেমেয়েদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফেরার সময় ছোট ছেলেমেয়েদের অনেকের খুব অনিচ্ছা দেখতে পাওয়া যায় কিণ্ডারগার্টেনের সমবয়সী বন্ধুদের আর বিচিত্র খেলনা-পুতুল, ছবির বই-খাতার রাজ্য ছেড়ে যেতে। এর ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়,—সকালে বাড়ী থেকে কিণ্ডারগার্টেনে আসবার সময়! ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে, কখন কিণ্ডারগার্টেনে নিয়ে যাওয়া হবে—তার তাগাদায়! সোভিয়েট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এই কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানগুলি হলো তাদের একান্ত প্রিয় অন্তরের প্রীতি-ভরা খেলাঘর।

কিণ্ডারগার্টেনের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের প্রায়ই বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় সোভিয়েট দেশের সর্বত্র ছড়ানো নানান্ সব মিউজিয়াম, আর্ট-গ্যালারী, যাতুঘর, বোটানিকেল গার্ডেন আর চিড়িয়াখানায়—বাইরের তুনিয়ার সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও উৎসাহ জাগাবার উদ্দেশ্যে! এছাড়া শহর বা গ্রামের বাইরে দূরে মাঠে-ঘাটে বনে-প্রান্তরে সমুদ্র-উপকূলেও ছেলেমেয়েরা মাঝে-মাঝে যায় বেড়াতে, পিক্‌নিক করতে, উন্মুক্ত খোলা-হাওয়ায় রৌদ্রস্নান করে স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনের জন্যে। দেশকে ভালো করে জানতে, চিনতে এবং আপন বলে মানতে ও ভালবাসতে শেখে তারা এই রকমে।

কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষা-দীক্ষায়, খেলাধূলোয় ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে, আট বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা শুরু করে তাদের স্কুলের পাঠ্য-জীবন। এ জীবন শুধু স্কুলে পড়ার বইয়ের পাতাতে মুখ গুঁজেই কাটে না, সোভিয়েটে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান-বুদ্ধি-আনন্দের আরো নানান্ দিকের সন্ধান পায় তারা দিনের পর দিন।

আট বছর বয়সের আগে সাধারণতঃ কোন ছেলেমেয়েকেই স্কুলে ভর্তি করা হয় না। কারণ, সোভিয়েট দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের অভিমত—আট বছর বয়স হবার আগে মগজের বুদ্ধি-কোষগুলি ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল এবং পাটিগণিতের ভারী-ভারী শক্ত-শক্ত বিষয় ঠিক পরিপাক করতে পারে না। সুতরাং তার আগে জোর করে তাড়াতাড়ি ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে পণ্ডিত বানাবার চেষ্টায় ওদের শরীর ও মনের ক্ষতি হয় যথেষ্ট—সে-ক্ষতির পরিণাম বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে মর্মান্তিক। সেইজন্যই সোভিয়েট দেশের কিণ্ডারগার্টেনে খেলাধূলো, বিশ্রাম আর গল্প-আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিশুদের মনকে, বুদ্ধিকে, ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক পন্থায় গড়ে তোলা হয়—তাদের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না ঘটিয়ে। ছোট চারাগাছকে স্বাভাবিকভাবে আলো-জল-হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে বাঁচতে দিলে সময়কালে তার বিরাট মহীরুহ-রূপে বেড়ে ওঠা সম্ভব হয়—সুন্দর ফুল-ফল-পাতার বিচিত্র বিভবে!

কিণ্ডারগার্টেনের পালা শেষ করে স্কুলে এসে সোভিয়েট দেশের ছেলেমেয়েরা যে নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন জীবন এবং 'পায়োনীয়ার' হবার সুযোগ পায়—সে-কথা জানাবো তোমাদের আগামী কোন মাসের 'মৌচাকে'!

আমাদের সোভিয়েট-রাজ্য পরিদর্শনের সময়, ও-দেশের কিণ্ডারগার্টেন, 'পায়োনীয়ার' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি চোখে দেখবার এবং সেখানকার ছেলেমেয়েদের ও কর্মীদের সঙ্গে মিশে তাদের সত্য-পরিচয় জানবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলুম। সে-সব কাহিনীও তোমাদের শোনাবো ক্রমে-ক্রমে। আজ এই পর্যন্ত!... (ক্রমশঃ)

মজার নাটিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সরস্বতী ॥ আর আছে ?

বাঙালী পুতুল ॥ আর আছে ? এতক্ষণ দেবতা সেজে ব'সে ছিলেন, এবারে লজেঞ্জুষের লোভে মানুষের ভাষায় কথা ফুটেছে।

সরস্বতী ॥ আমি বিদ্যার দেবী, সব ভাষাই আমার জানা।

বাঙালী পুতুল ॥ বটে ? চীনে পুতুল কি বল্‌লো বলো দেখি।

সরস্বতী ॥ ও বল্‌লো, আমার খিদে পেয়েছে।

বাঙালী পুতুল ॥ আচ্ছা ওর সঙ্গে কথা বলো দেখি।

সরস্বতী ॥ এই কথা ! টিং টুং টাং।

বাঙালী পুতুল ॥ ওতো তোমার বীণার গৎ হ'ল।

সরস্বতী ॥ চুপ ক'রে থাকো। ফিচিং ফ্যাচাং ফিচিং।

চীনা পুতুল ॥ পিচিং পিচিং ডিং।

সরস্বতী ॥ চিং চুং টাং।

চীনা পুতুল ॥ দিচিং ধিচিং ধুচুং।

সরস্বতী ॥ দিং দাং চাং।

বাঙালী ॥ একি ভাষা হচ্ছে না মোহর বাজছে ?

সরস্বতী ॥ তেমন ক'রে কথা বল্‌তে পারলে ভাষাতে মোহরই বাজে।

বাঙালী পুতুল ॥ বটে, তবে লক্ষ্মী সরস্বতী-তে ঝগড়া শুনতে পাই কেন ? কাগজে যারা লেখে তাদের দুরবস্থা কেন ?

লক্ষ্মী ॥ তেমন তেমন কাগজে লিখ্‌তে পারলে টাকা হয়।

বাঙালী পুতুল ॥ সে আবার কি কাগজ।

লক্ষ্মী ॥ কোম্পানীর কাগজ, হুণ্ডি, খৎ, হ্যাণ্ডনোট, তমঃসুখ !

বাঙালী পুতুল ॥ তা'হলে তোমাদের ঝগড়া ?

লক্ষ্মী ॥ লোক-দেখানো।

হিন্দুস্থানী পুতুল ॥ সারাদিন এমনি চলবে নাকি ? ওদিকে যে রঙবুড়োর আসবার সময় হ'ল।

বাঙালী পুতুল ॥ ঠিক, ঠিক, দাও, কে কত চাঁদা দেবে দাও।

হিন্দুস্থানী পুতুল ॥ হামারা পাশমে তো কুছ নেহি হ্যায়।

বাঙালী পুতুল ॥ ও পয়সা দেবার নাম শুনেই আবার হিন্দি ধরেছ। তুমি কি দেবে?

আর একটি বাঙালী পুতুল ॥ বাঙালীর আবার পয়সা কোথায়?

বাঙালী পুতুল ॥ সিনেমা দেখতে তো পয়সা বের হয়।

পূর্বোক্ত বাঙালী পুতুল ॥ সে কি পয়সা দিয়ে দেখি?

বাঙালী পুতুল ॥ তবে?

পূর্বোক্ত পুতুল ॥ ঘটিবাটি বেচে দেখি।

বাঙালী পুতুল ॥ তুমি কি দেবে অন্ধ্র-কন্যা?

দক্ষিণী পুতুল ॥ [কানে হাত দিয়া দেখাইল যে কথা বুঝিতে অক্ষম]

বাঙালী পুতুল ॥ এতক্ষণ তো কথাবার্তা শুনে বেশ মুচকি মুচকি হাসছিলে। এবারে পয়সার কথাতেই কানে হাত। তুমি কি দেবে চীনা সুন্দরী?

চীনা পুতুল ॥ চিং চুং চাং।

বাঙালী পুতুল ॥ বাঃ বাঃ কথায় মোহর ঝরিয়ে দিলে। কিন্তু ওতে তো রঙবুড়ো ভুলবে না। আর সরস্বতী ঠাকরুন।

সরস্বতী ॥ ছিঃ, পয়সা দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে একটা গৎ শোনো।

[বীণা বাজাইল]

বাঙালী পুতুল ॥ বুঝেছি ঘুঁটে হওয়া তোমাদের অদৃষ্টে লেখা?

অন্য একটি পুতুল ॥ তুমি কি দেবে শুনি।

বাঙালী পুতুল ॥ আমিই যদি দেবো, তবে আবার চাঁদা আদায় করতে বের হ'লাম কেন?

অন্য একটি পুতুল ॥ তোমারও অদৃষ্টে ঘুঁটে হওয়া লেখা আছে।

বাঙালী পুতুল ॥ আর লক্ষ্মী ঠাকরুন—তুমি একাই তো পারো।

সকলে ॥ ঠিক, ঠিক, লক্ষ্মী থাকতে ভাবনা কি?

লক্ষ্মী ॥ আমি পারি সন্দেহ নেই। কিন্তু বুড়ীটা যে আমার হাতে ঝাঁপি দিতে ভুলে গিয়েছে।

বাঙালী পুতুল ॥ আনিয়ে নাও না।

লক্ষ্মী ॥ আনাবো কাকে দিয়ে? আমার বাহন পেঁচাটাকে দেয়নি কেন?

বাঙালী পুতুল ॥ তোমরা দেবতারা তো ইচ্ছে করলেই সব পারো। আনাও না।

লক্ষ্মী ॥ ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে দেবতাগিরি এক রকম ভুলেই গিয়েছি। আয় তো আমার ঝাঁপি।

[অমনি ঝুপ করিয়া এক থলি মোহর তাহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল]

বাঙালী পুতুল ॥ দেবতা তাতে আর সন্দেহ নেই [থলিটা হাতে তুলিয়া, মোহর বাহির করিয়া] আরে এ যে সব মোহর! কি ঠাকরুন—সত্যি না মেকি? [সকলে এক একটা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল]

সকলে ॥ না সত্যি মোহর। কেমন চকচক করছে।

একটি পুতুল ॥ এ সব রঙবুড়োকে দিয়ে নষ্ট করা কেন? এ দিয়ে আমার একটা স্থন্দর হার তৈরি হ'তে পারে।

আর এক পুতুল ॥ তোমার গলায় মানাবে না। আমাকে চমৎকার মানাবে।

বাঙালী পুতুল ॥ তোমার কালো রঙের উপর বেশ মানাবে। মনে হবে অমাবস্যার আকাশে তারা ফুটেছে।

পূর্বোক্ত পুতুল ॥ আহা তোমার রঙ যেন ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না।

বাঙালী পুতুল ॥ দেখো, রঙ তুলে কথা বলো না।

পূর্বোক্ত পুতুল ॥ তুমি যে তুল্‌লে?

বাঙালী পুতুল ॥ কালোকে কালো বল্‌বো না?

[এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল]

একটি পুতুল ॥ ঐ যে আসছে।

বাঙালী পুতুল ॥ রেখে দাও, রেখে দাও।

[সকলে মোহর থলিতে রাখিয়া দিল]

বাঙালী পুতুল ॥ এবার বুড়ী এসে নিক। রঙবুড়োকে দিয়ে যা থাকবে তাতে ওর চলে যাবে।

[বাহিরে দরজা খোলার শব্দ]

বাঙালী পুতুল ॥ আবার সব পুতুল হ'য়ে যাও, যে-যেমন আগে ছিলে।

[সকলে পূর্ববৎ পুতুল হইয়া গেল। বুড়ীর বদলে ঢুকিল রঙবুড়ো।]

রঙ-বুড়ো ॥ বুড়ী যে থাকবে না, তা আগেই জানতাম। তাই নিজেই একটা চাবি জোগাড় ক'রে এনে ঘর খুলেছি।

[এখন রাত্রি। তাহার হাতে একটা টর্চ। আলো জ্বালিয়া চারদিক দেখিয়া লইল]

পুতুলগুলো ছাড়া কিছুই তো নেই, নেবো কি?—এটা কি? একটা থলে। [হাতে তুলিয়া] বেশ ভারী, কি আছে? [মুখ খুলিতেই মোহর পড়িয়া গেল] আরে এযে মেহর! জাল নয় তো? এক,, দুই, তিন, পাঁচ, দশ—এ যে অনেক! বাঃ বাঃ বুড়ী, তুমি না থেকে ভালোই করেছ। এবারে এগুলো নিয়ে সরে পড়ি। পাঁচটাকা পাওনার বদলে পাঁচশো মোহর! কেন নেবো না? বুড়ী কি আমাকে কম ভুগিয়েছে? নিশ্চয়ই নেবো। তাছাড়া এগুলো তো বুড়ীর কখনোই নয়। বেটি চুরি করেছে! এবারে এসে দেখবে চুরির উপরে বাটপাড়ি হয়ে গিয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

ঘরে মোহর জমিয়ে রেখে পাওনাদার ঘোরানো। বুঝুক এবারে বুড়ী।

[যেমনি সে মোহরের থলি লইবার ইচ্ছায় হাতে তুলিল, অমনি সে পুতুলের মতো স্থাণু হইয়া গেল। আর পা তুলিতে পারে না, যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল গাছের মতো অচল হইয়া রহিল।]

রঙবুড়ো ॥ একি, একি, পা ওঠেনা কেন? উঁহু কিছুতেই যে সরতে পারিনে, নড়তে পারিনে, একি আপদ্!

[পা টানাটানি করিয়াও পা ওঠে না, ক্রমে পালাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।]

ওরে সর্বনাশ! এ যে ডাইনির টাকা। বুড়ীটা আস্ত ডাইনি। প'ড়ে মরুকগে টাকা!

[মোহরের থলি ফেলিয়া দিতেই স্বাভাবিক গতি পাইল।]

এই তো পা উঠ্‌ছে। এবারে পালাই। কিন্তু এতগুলো মোহর ফেলে রেখে পালাবো। না, তা কখনো হয় না।

[আবার মোহরের থলি হাতে লইল।]

একি হ'ল, আবার যে আটকে গেলাম। পায়ের তলায় আঠা লেগেছে নাকি? না, আঠা লাগবে কি ক'রে? নড়ি আর না নড়ি, মোহর ছেড়ে পালাচ্ছি না।

বুড়ী যদি মারপিঠ করে? ওতো বুড়ো কত আর মরবে। পাঁচ শো মোহরে অনেক সয়। কিন্তু ওর নাতিটাকে যদি সঙ্গে আনে সেটা যা যণ্ডা। তার মার পাঁচ শো মোহরেও সইতে পারবো না। যাকৃগে মোহর।

[থলি ফেলিয়া দিতেই চলৎশক্তি পাইল।]

কিন্তু এতগুলো মোহর, একেবারে আনকোরা নূতন, আয়নার মতো চক্‌চকে। প্রাণ থাকে আর যায় মোহর ছাড়ছিনে!

[এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ।]

ঐ রে পায়ের শব্দ। নিশ্চয় বুড়ীটা আসছে। থাক্ গে মোহরের থলি।

[কিন্তু দেখা গেল এবার থলি হাতে আটকাইয়া গিয়াছে।]

এ যে পড়ে না। সর্বনাশ। এখন করি কি? আগে আস্থক তো।

[বুড়ী প্রবেশ করিল।]

বুড়ী ॥ ও কে?—সর্বনাশ!

[পালাইতে উদ্যত।]

রঙবুড়ো ॥ বুড়ী মাসী, পালিও না, পালিও না, বরঞ্চ আমিই পালাই।

বুড়ী ॥ আজকে তো টাকার যোগাড় হয়নি।

রঙবুড়ো ॥ তুমি টাকা দেবে কেন? আমিই তোমাকে টাকা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এই নাও।

[থলি বুড়ীর হাতে দিল।]

বুড়ী ॥ কি আছে?

রঙবুড়ো ॥ দেখো না, দেখো না, মোহর!

বুড়ী ॥ মোহর? পেলে কোথায়?

রঙবুড়ো ॥ যেখানেই পাই, দেখো না!

বুড়ী ॥ আমাকে কেন?

রঙবুড়ো ॥ তোমার বড় কষ্ট তাই দিতে এলাম।

বুড়ী ॥ দেখি কি মোহর?

[থলি খুলিতেই দেখা গেল মোহর নয় খোলাম কুচি।] এ কি বুড়ো মানুষের সঙ্গে মস্করা?

রঙবুড়ো ॥ দেখি, দেখি।

[খোলামকুচিগুলি থলিতে ভরিয়া আবার ঢালিল—এবারে মোহর।]

বুড়ী ॥ দেখি, দেখি।

[মোহরগুলি আবার থলিতে ভরিয়া ঢালিতেই খোলামকুচি। অনেকবার এই ভাবে পরীক্ষা হইল, বুড়ী ঢালিলেই খোলামকুচি, রঙবুড়ো ঢালিলেই মোহর। থলির মধ্যে ছুটো ঘর থাকিলে এই কৌশল দেখানো সহজ হইবে।]

বুড়ী ॥ মোহর না খোলামকুচি ?

রঙবুড়ো ॥ খোলাম কুচি না মোহর ?

বুড়ী ॥ এ যে ঠগের হাতে পড়েছি।

রঙবুড়ো ॥ এ যে ডাইনির পাল্লায় পড়েছি।

বুড়ী ॥ তুই ঠগ।

রঙবুড়ো ॥ তুই ডাইনি।—নে তোর থলি নে! আমি প্রাণ নিয়ে পালাই।

থলি ছুঁরিয়া দিতেই সে গতিশক্তি ফিরিয়া পাইল এবং এক ছুটে প্রস্থান করিল।

বুড়ী ॥ কতগুলো খোলামকুচি দিয়ে ঠকিয়ে গেলো। পড়ে মরুক্‌গে।

[রাগের মাথায় থলির মুখ খুলিতেই ঘরময় মোহর ছড়াইয়া পড়িল।]

[ঘরের মধ্যে মোহর কুড়াইতে কুড়াইতে]

এ কি, এ কি, এ যে মোহর! অন্ধকারে জলছে। সত্যি তো! এ যে বাজে! সোনার মতোই বাজে! আরে আরে মোহর! ওরে, আমার মোহর! ওরে আমার মোহর! ওরে কাউকে আমি দেবো না, এর একটিও দেবো না কাউকে। নিজেও খরচ করবো না। না খেয়ে মরলেও খরচ করবো না। মাথার তলায় রেখে তিলে তিলে না খেয়ে মরবো—তবু খরচ করবো না। পয়সা খরচ করি, টাকা খরচ করি, তাই বলে মোহর! সেটি হচ্ছে না।

[এবারে থলিটা মাথায় করিয়া বুড়ী ঘরময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে ঘরের বাতিটা নিভিয়া ধীরে ধীরে ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল—অমনি পুতুলগুলা সব সমস্বরে হী হী করিয়া হাসিয়া উঠিল—বুড়ীর রকমসকম দেখিয়া। বুড়ী ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।]

বুড়ী ॥ ও বাবা হাসে কে? ডাইনি, ডাইনি। আজ রাতটা মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকিগে। এ ঘরে আজ রাত্রে আর থাক্‌ছিনে, কি জানি মোহরগুলো যদি কেড়ে নেয়।

[মোহরের থলি লইয়া বুড়ীর সবেগে প্রস্থান।]

শেষ

টিক টিক পিক্‌নিক্‌

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

বিনি আমার ওপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে। এবং চিঠিটার ওপরেও—‘কী পড়ছো গো দাদা অমন ক’রে?

‘নেমন্তন্ন পত্র। আমাদের ইতু লিখেছে। ওদের পিক্‌নিকে যাবার জন্যে সেধেছে···যাবি?’

‘ইতুদের পিক্‌নিক্‌?’

‘হ্যাঁ। ইতু ছাড়াও ইত্যাদি আছে। এই ছাখ্‌ না, কী লিখেছে—জবাদি যাবে, রেবাদি যাবে, শিপ্রাদি যাবে শকুন্তলাদি যাবে, ভুতুদি যাবে, পুতুলদি যাবে—অ্যাঁ, মেয়েটা কি কবি হয়ে গেল নাকি? ছবিই আঁকতো আমি জানতাম।’

‘কবিত্ব কোথায় পাচ্ছো?’ বিনি শুধোয়।

‘মিলে। একটা মিল দিতেই আমি হিম্‌শিম্‌ খাই, ও কেমন দিদিতে দিদিতে মিলিয়েছে—দেখছিস্‌! বাহাদুর মেয়ে। লিখেছে যে, ওদের পিক্‌নিকে একজন প্রধান-অতিথি না হলেই নয়। সভায়-টভায় যেমন থাকে আর কি! সেই জন্যেই নাকি আমাকে দরকার—’

‘যাবে তুমি?’

‘ভাবছি। প্রধান-অতিথি বটে, কিন্তু ভরসা দিয়েছে যে বক্তৃতা করার কোনো ফ্যাসাদ্‌ নেই—মুখ নাড়তে হবে, কিন্তু কথা দিয়ে নয়, খাবার দিয়ে। তা’হলে গেলে কি ক্ষতি? অতিথির প্রাধান্যে তো খাবার আসবেই, ভোজ সভাতেই, নয় কি?’ আমি বলি—‘তোকেও নিয়ে যেতে বলেছে। বলেছে যে বিনিদিকে চাই-ই। কেন না—’

‘কেন না?’

‘কেন না, মিনিদিও যে আসছে।’ আমি নিঃশ্বাস ফেলি—আমার ভয় হচ্ছে মেয়েটা নিশ্চয় কবি হয়ে গেছে। ভারী খারাপ কথা।’

‘মিনতিও আসবে বুঝি? তা’হলে তো যেতেই হয়।’ বিনি বলে।

—‘কিন্তু তোমার মাথা ধরছে না আজকাল? বলছিলে না তুমি যে বেশি খেলেটেলে মাথাধরাটা আরো নাকি বেড়ে যায় তোমার?’

‘হ্যাঁ। আমার এই শিরঃপীড়া। এই এক হাঙ্গাম। সেটা আবার আরো বেড়ে আজ দেখছি আমার পায়ে এসে ধরেছে।’

‘পায়ের মাথাব্যথা?’ অবাক্‌ হয় ও।—‘সে আবার কি?’

'তাই তো দেখছি রে! কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই—' আমি প্রকাশ করি—'অনেক দিন থেকেই আমার সন্দেহ যে আমার মস্তিষ্কের খানিকটা আমার পায়ে গিয়ে জমেছে। কি করে গেল জানিনে। কিন্তু দেখেছি পায়ের আমার ধারণাশক্তি আছে। পায়চারি করলে আমার মাথা খোলে। যখন গল্পের প্লট মেলে না, কি খেই পাই না, তখন দেখছি দু'পাক ঘুরলেই তাদের পাত্তা মেলে। দুয়েক চক্কর মারলেই তারা চক্কর-বর্তির খপ্পরে এসে পড়ে।

চক্রে এসে খপ্পরে পড়ে। দেখেছি আমি, পা খেলালেই মাথায় খ্যালে। আমি দেখেছি। এটা তুই কি মনে করিস্?'

'তোমার মুণ্ডু।'

'মুস্কিল হয়েছে আজ আবার এই শিরঃপীড়াটা আমার পায়ে নেমেছে। সকাল থেকেই পা-টা টন্‌টন্ করছে এমন! ঠিক যেন মাথার মতই। চলতে ফিরতে গেলে পায়ের শির টেনে ধরছে। কি করে ওদের পিক্‌নিকে যাই ভাবছি তাই—'

পিক্‌নিকটা হচ্ছিল আবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেখানে ওরা সবাই নৌকা করেই যাবে; বোটানিক্যাল যাবার আমার বাধা ছিল না, কিন্তু বোটে ছিল। আমি আবার সাঁতার জানিনে।

বোশেখ মাস। কালবৈশাখী আছেই। ঝড়-ঝাপটা লেগেই রয়েছে। কাল হয়ে গেছে, আসছে কালও হবার কথা—আজ যে হবে না তা কে বল্লে? আর, কালবৈশাখী মানেই নৌকাডুবি। সাঁতার জানিনে, জলে পড়লে মার্বেলগুলির মতই টুপ করে ডুবে যাবো—কিন্তু আমার নিজের জন্যে না—মেয়েগুলোও জলের মধ্যে গুলিয়ে যাবে। সাঁতার জানিনে বলেই কারুক্কেই ওদের তুলতে পারবো না—বাঁচাতে পারবো না কাউকে। ইতুর দিদিরা, দেবীরা, নৌকায় যাচ্ছেন যান—দেবীদের নৌকা-যাত্রা পাঁজিতেই লেখে। কিন্তু তাঁদের সহগমন করতে এইজন্যেই আমার অনিচ্ছে।

তাছাড়া, আরো একটা কথা। আমার মতন ভারিক্কি লোক যদি ওদের নৌকোয় ভর করে, তা'হলে হয়তো কালবোশেখীর তর সইবে না। দরকার হবে না তার। এম্‌নিতেই ভরাডুবি হবে। প্রাণের ভয় নেই আমার তা নয়—কিন্তু তা হচ্ছে আসলে-ওদের প্রাণের ভয়।

প্রাণের ভয়ে আমরা নৌকো না ধরে ট্রাম ধরলাম। যাচ্ছিতো গাছপালাদের আড়তে, তবুতার জন্যেই বিলির সাজ গোছের অন্ত নেই। ভ্যানিটি ব্যাগটাও সঙ্গে নিতে ভোলেনি।

আমি আধ-ময়লা কাপড় জামা বেছে নিয়েছিলাম। ভোজ খেতে বসলে দেখেছি, আমার

কাপড় জামাও আমার সঙ্গে সমান উৎসাহে যোগ দেয়। সন্দেশের গুঁড়ো, ডাল ভাতের কিছুটা, মাছের টুক্‌রো, মাংসের ঝোল—আমার গায়ে এসে পড়বেই। লাগবেই আমার জামা-কাপড়ে। নিজের পাতে ঝোল টানার অভ্যেস আমার নেই, কিন্তু ঝোলরা যে নাছোড়-বান্দা। তারা আমার গায়ের ওপর তাদের হলুদ্‌-রঙা ছোপ দেবেই—ঝোলাবেই নিজেদের বিজ্ঞাপন। তাই সাধ্যমত সাবধান হতে হয়েছে।

কিন্তু বিনির কোনো কসুর নেই। বেশবাস নিখুঁৎ। ছোটদের পিক্‌নিক-এ নয়—যেন বড়দের—বড় দরের গার্ডেন পার্টিতেই যাচ্ছে সে।

'যাচ্ছিস্‌ তো আহারে, তা এত বাহারের কী দরকার ছিলো বাপু?' না বলে পারিনে—'তোর এই ভ্যানিটী ব্যাগটাও না নিলেই কি চলতো না?'

'বারে, ভ্যানিটি ব্যাগ্‌ ছাড়া কোথাও বুঝি যাওয়া যায়?'

'কেন বল্‌তো? ও, বুঝেছি! বুঝেছি এবার। তা, ক'টা সন্দেশ ওর মধ্যে আঁটবে মনে করিস?' আমারও এবার ব্যগ্রহ দেখা যায়।

'আহা, সন্দেশের জন্যেই বুঝি? চোরের মন বোঁচকার দিকে! কতো টুকিটাকি রয়েছে এর মধ্যে, পাউডার পাফ্‌—!'

'থাক্‌ থাক্‌, হয়েছে। ও শুনলে কি আমার পেট ভরবে? তার চেয়ে একটা বড়ো দেখে থলে নিলে কাজ দিতো।' আমি মুখ বাঁকাই। বাস্তবিক্‌, যা কিছু বাগাবার কাজে লাগে না তা নিয়ে ব্যাগাড়ম্বরে কাজ কী?

বোটানিক্‌সে গিয়ে আমার শিরঃপীড়াটা খালি শুধু পায়েই না, সারা গায়েই যেন ছড়িয়ে পড়লো। পাগলা হাওয়ায় গাছপালাদের সড়সড়ানি! পাতার ঝরঝরানি চারধারে। গা শির্‌ শির্‌ করতে লাগলো আমার।

ইতু ভুতুরা একটু আগেই পৌছে আয়োজনে লেগেছে। ওরা এসেছে সরাসরি গঙ্গা পেরিয়ে, আমরা এসেছি ট্রামে করে সারা কলকাতা বেড়িয়ে। যাক্‌, খাবার আগে তো বটেই, রাঁধবারো আগে এসে পড়া গেছে। এই রক্ষে!

বিনি তার ব্যাগটা একটা গাছের ফ্যাক্‌ড়ায় ঝুলিয়ে রাখলো। তার কাছাকাছি উনুন পেতে ধরাবার চেষ্টায় ছিলো মেয়েরা। গোড়ায় উনুন আর শেষে নুন—রান্নার দুই সমস্যা। এদের সমাধান ঠিকমতো হলেই তবে খাওয়াটা পরিপাটি হতে পারে।

মাংসের কড়া নামবার আগে খাবার বরাত ছিল না। তাই ঘুরে ফিরে আমি হাওয়া

খাচ্ছিলাম। এমন আবহাওয়ায় বিনির দেখা পাওয়া গেল—'আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা দেখেছো দাদা ?'

'না তো।···তখন যে একটা গাছের ফ্যাকড়ায় রাখলি দেখলাম।'

'দেখছি না তো। কোন্ ফ্যাকড়ায় বলো দেখি ?'

'তা কী জানি! আমি কি মার্কা দিয়ে রেখেছি ?' আমি জানাই—কোনো ফ্যাকড়ার মধ্যে কি যেতে আছে ? কী ছিলো তোর ব্যাগে ? টাকাকড়ি ছিলো নাকি কিছু ?'

'ছিলো কয়েকটা। কিন্তু সে জন্যে না—'

'তবে এই ছ্যাখ্'—বলে দু'পকেট উল্‌টে দেখাই—'আমি কিন্তু নিইনি। তা আমার যতই খিদে পাক্ না!'

'আমি কি বলেছি তুমি নিয়েছো ?' ও মুখ ভার করে থাকে।

সহানুভূতি-ভরে আমিও মুখখানা ভার ভার করতে চেষ্টা করি, কিন্তু বেশিক্ষণ পারা যায় না। খাবার ডাক এসে পড়ে।

ইতু পেল্লায় একখানা মাংস আমার পাতে দিয়ে বলে—'এই নাও—একটা মাটন্ চপ্ তোমায় দিলাম। কতোবড়ো একখানা—ছ্যাখো! মাংসটা কিন্তু আমার রান্না, বুঝলে বড়দা ? জবাদি চাপিয়েছিল বটে, কিন্তু নুন ঝাল সব আমার দেয়া। তাছাড়া একটা কাঁচামিঠে আমও দিয়েছি ওর মধ্যে। খেতে বেশ টক্‌মিষ্টি হবে।'

'আম দিয়েছিস্ ? পেলি কোথায় রে ?' আমি শুধাই।

'পেতে হয়নি। গাছে ডাল থেকে খসে পড়লো—হাঁড়ির মধ্যে। আপনার থেকেই।'

'বলিস্ কিরে ? তা পড়তে পারে, আশ্চর্য কি ? মাংসের গন্ধে এসে পড়েছে। আমগাছটা তো কচি আমে ভেঙে পড়বার যোগাড়! ওরই মধ্যে একটা—আমেদের একটা পেটুক চ্যাঙড়া হয়তো···কিন্তু তাই বা কি করে হবে ? আমি তো জানতাম পাকা আমরাই গাছ থেকে টুস্ করে খসে পড়ে, কিন্তু কাঁচা আম তেমন ঝড় না হলে পড়ে কি ?'

'কেন পড়েছে, বলবো বড়দা ? এ আমটা আমাদের পাড়ার ছেলেদের মতম এঁচোড়ে পাকা ছিলো হয়তো, তাই—বুঝলে কি না'—

'কিন্তু ভাই, ভালো ছেলেদেরই তো পড়ার দিকে মন থাকে বলে জানি।' ব'লে, ভালো ছেলের মত পাতের মাংস নিয়ে পড়ি। পাঁঠার যে প্রকাণ্ড মাটন চপটা ইতু আমার পাতায় ছেড়েছিল তাকে চেপে ধরি। কিন্তু যতই চেপে ধরি না, কিছুতেই সেটাকে বাগাতে পারছিলাম না। যতই কামড়াই, দাঁত বসাতে পারিনে।

'ইস্! মনে হচ্ছে এটা পাঁঠাটার পাকস্থলী।' অমি নিঃশ্বাস ফেলি—'পাকস্থলী কি খায় মানুষ? খেলে কি হজম করতে পারে?'

'কেন, পাকস্থলীর সাহায্যেই তো সবাই হজম করে।' শিপ্রা বলে।

কিন্তু হজম্ করবো কি, জম্‌তেই পারছি না আদপে। হাতে আর দাঁতে টাগ্ অব ওয়ার লাগিয়েও বাগ মানাতে পারছি না। অনেক টানাটানির পর মাংসটার ভেতর থেকে আরেকটা মাংসপিণ্ড বেরয়—'এই ছাখ, কী বেরিয়েছে! পাকস্থলীটা পেটে পুরেছিল কিন্তু হজম করতে পারেনি। সময় পায়নি বোধ হয়। তার আগেই তোদের কোপ পড়েছে ওর ওপর।'—জিনিসটা আমি মুখে পুরি, চিবোতে যাই—'সম্ভবতঃ এটা ওর মেটুলি।...কিন্তু...' চিবোতে গিয়ে হঠাৎ কড়াৎ করে ওঠে—'কিন্তু metal-এর মত কী একটা মনে হচ্ছে যেন!'

আঁশের মত কী যেন সব দাঁতের ফাঁকে লাগে—'নাঃ, পাঁঠাটার রুচি খুব ভালো ছিল না। যা পেত তাই খেত হতভাগা। এসব কী? এসব কী আমার মুখে?' আঁশের মতন জিনিসগুলিকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার করি।

'আমের আঁশ নয় তো? সেই কাঁচা আমটার না তো?' ইতু জিগেস করে।

'পড়তে না পড়তেই পাঁঠার পেটের মধ্যে গিয়ে সেঁধিয়েছে? আশ্চর্য নয়। কিন্তু যাই বল, কাঁচা আমের আঁশ আমি মোটেই পছন্দ করি না। খাবার আশাও করিনে।' বিরক্তিম মুখে বলি।

'আরে—আরে—এ কী!...এ কিরে আবার...' বলতে বলতে আমি চেপে যাই। ভাত চাপা দিই তার ওপর। পাঁঠার পাকস্থলীটার থেকে একটা টাকা বেরিয়েছিল। ঝক্‌ঝকে রূপোর টাকা! ইস্, টাকা হজম্ করতেও ওস্তাদ ছিলো পাঁঠাটা। খালি ঘাস খেতো না, মানুষ ছিলো। আরে আরে,—আরো টাকা দেখছি যে! নিজেই দেখি—আর কাউকে দেখাইনে—কোন উচ্চবাচ্য করিনে একদম্। কাউকে দেখতেও দিইনে। পাঁঠা হ'লে কী হবে, ব্যাটা ভারী রোজগারে ছিলো দেখছি। এই মন্দার বাজারেও মন্দ উপায় করেনি। আর বেছে বেছে এক নিরুপায় লেখকের পাতে এসে পড়েছে। ভালোই করেছে যাহোক্। ইতুরা ভোজ দিয়েছে আর এর ভোজন-দক্ষিণা দিয়েছে পাঁঠাটাই।

পাঁঠাটা মনীষী ছিলো মনে হচ্ছে। কোন বিখ্যাত বংশের কেউ হবে কিনা কে জানে! ইতিহাসের দিক দিয়ে, প্রীতিকর না হলেও, যতো খাসা বংশেই খাসিরা এসে জন্ম নেয় দেখা গেছে। মাইকেলের সময় থেকে—বাঙালী লেখকের বরাবর দারিদ্র্যের কথা হতভাগার

অগোচর ছিল না মনে হয়। নিজের পাকস্থলী—কিম্বা ট্যাঁকস্থলী যাই হোক্—এক দরিদ্র লিখিয়েকে উজাড় করে দিয়ে গেছে অকাতরে।

কিন্তু পাকস্থলীটাকে তা বলে আমি ছাড়চিনে। খাবই যে করে হোক্। যে আমাকে এত দিলো তাকে কি আমি অবহেলায় পাতে ঠেলে রাখতে পারি? কৃতজ্ঞতা বলে কি আমার কিছু নেই?

কৃতজ্ঞতা আর দাঁতের জোরে খানিকটা ওকে ধ্বসাই। কিন্তু তার বেশি পারা যায় না। অধ্যবসায় হার মানে। কামড় বসাতে পারে না। মাংসটায় যদি একটুখানিও চর্বি থাকতো! তা'হলেও কিছুটা চর্বিতচর্বণ করা যেত—কিন্তু না, বেবাক্ নিহাড়—নির্মেদ। অগত্যা, পাকস্থলী আক্রমণ মুলতুবি রাখি। দেশের ছেলে, সন্দেশের দিকে মন দিই!

কিন্তু সেদিকেই যে জুত করবো তার জো কী? সন্দেশই বা এমন কী মজুত? এক আধ টুক্‌রো যা পড়ছিলো আমার ভাগে, তা-ই মজা করে অনেকক্ষণ ধরে খেলাম। তারিয়ে তারিয়ে—চারিয়ে চারিয়ে খাওয়া গেল।

'কেমন খেলে বড়দা?' পুতুল আমায় শুধায়।—'মাংসটা কেমন লাগলো?'

'তা—তা—এমন মন্দ কি?' নিঃশ্বাস ফেলে বলি। 'আরেক টুক্‌রো পেলে টের পেতাম। এক টুক্‌রোয় আর কী বুঝবো?'

'এক টুক্‌রো পড়েছিলো তোমার পাতে? মোটে একটুক্‌রো?—জবা আবাক্ হয়ে তাকায়। আমার দিকে আর ইতুর দিকে—এক সঙ্গে।

'কিন্তু কতো বড়ো এক টুক্‌রো তাও বলো।' জবাবদিহি দেয় ইতু।—'তাছাড়া, আমার রান্নাটা কেমন হয়েছে বল্লে না?'

'রান্না? টকটক হবে বল্‌ছিলি না? কিন্তু কই, তা তো হয়নি, অন্ততঃ তোর মতন এতটা টকটকে নয়।' আমি বলি—'মোটের ওপর মন্দ হয়নি তাহলেও। সবই ভালো হয়েছে, কেবল একটুখানি যা খুঁৎ দেখলাম—চোখে নয়—চেখেই দেখেছি খুঁৎটা—' বলে একটু আমি খুঁৎখুঁৎ করি। কৈবল্যলাভের কথাটা বলবো কিনা ভাবি—'তবে হ্যাঁ, কেবল এই খুঁৎটাই। তাছাড়া সবই ভালো। কেবল তোমাদের বিনিদির ভ্যানিটি ব্যাগটা যা একটু আধসেদ্ধ রয়ে গেছে।—এই যা।'

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দু'তিনদিনের মধ্যেই শম্ভুর পিসীমা অতিষ্ঠ হয়ে 'উঠলেন। বলতে লাগলেন, 'নিজেরই চলে না আবার তিন তিনটে ছোকরা এসে আমার ঘাড়ে চেপেছে। কাণ্ড দেখ।'

বিজুরা অবশ্য বাজার খরচটা দিচ্ছিল। কিন্তু শম্ভুর কৃপণ পিসীমা সব খরচ না করে তার থেকে কিছু কিছু আবার জমিয়ে রাখছিলেন। এ দিকে তার বকুনিও কিছুতে থামতে চাইছিল না।

তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হোল বিজু। খাওয়ার কষ্ট শোওয়ার কষ্ট। তারপর আবার উঠতে বসতে গঞ্জনা। বিজু বলল, 'ঢের হয়েছে, এবার অন্য কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করবি তো কর, না হ'লে আমি একাই চলে যাব।'

শম্ভু বলল, 'দাঁড়া দাঁড়া। অত অস্থির হ'লে কি চলে। বিদেশ-বিভূয়ে মাথা ঠিক রাখতে হয়।'

কিন্তু সেই শম্ভুরই মাথা একদিন গরম হয়ে উঠল। তিন বন্ধুতে মিলে ওরা সেদিন সারনাথের বৌদ্ধ-বিহার দেখতে গিয়েছিল। তার আগে কাশীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি ওরা দেখে সেরেছে। ঘুরে ঘুরে দেখেছে নদীর ঘাটগুলি, অন্নপূর্ণার মন্দির, বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবন। নতুন জায়গায় নতুন্ নতুন জিনিস দেখে দেখে ওদের দিনগুলি বেশ ভালোই কাটছিল। কিছু সময়ের জন্য অমলের মন থেকেও যেন সমস্ত গ্লানি আর অপরাধ-বোধ মুছে গিয়েছিল।

সারনাথে গিয়ে প্রথমে দেখল ওরা নতুন বৌদ্ধ-মন্দির। অজন্তা গুহার অনুকরণে

দেয়ালে দেয়ালে বুদ্ধলীলা আঁকা রয়েছে। সেখান থেকে ওরা গেল পুরোন বৌদ্ধ-বিহারের ভগ্ন স্তূপ দেখতে। অশোকের আমলের বিহার। এখন শুধু তার ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে। ইতিহাস পড়তে অমলের তেমন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু এখানে এসে মনটা অদ্ভুত ভালো লাগতে লাগল।

হেঁটে ফিরল ওরা শহরে। বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল ফিরতে। বাসায় ফিরে এসে দেখে পিসীমা খুঁটি ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

শম্ভু অবাক্ হয়ে বলল, 'কি পিসীমা রান্না-বাড়া হয়ে গেছে নাকি?'

কাত্যায়নী কর্কশ গলায় মুখ ভেংচিয়ে উঠলেন, 'রান্না-বাড়া হয়ে গেছে নাকি? আমি, আমি কি তোর বাপের কেনা রাঁধুনী নাকি যে দু'বেলা তোদের পিণ্ডি যোগাব? খরচ দেওয়ার বেলায় দেখা নেই, কেবল রাতদিন ও'র তোয়াজ করো। তাও একা নয়, দু'দুটো এয়ারকে কোত্থেকে আবার জুটিয়ে এনেছে সঙ্গে। আমি পারব না। স্পষ্ট বলে দিচ্ছি বাপু, আমি আর এই ভূতের ব্যাগার খাটতে পারব না। এ হোটেলে আর হবে না। তোমাদের যার যেখানে খুশি জুটিয়ে নাও গিয়ে।'

শম্ভু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাই নেব পিসীমা, আমরা এই রাত্রেই আপনার এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আর কষ্ট দেব না আপনাকে।'

তারপর বন্ধুদের দিকে চেয়ে বলল, 'চল, তোদের বাসন বিছানা নিয়ে আয় আমার সঙ্গে।'

কাত্যায়নী গুম হয়ে বসে রইলেন, কোন কথা বললেন না।

ওরা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে পথে নামবার পর কাত্যায়নীর সেই প্রতিবেশিনী খেমঙ্করীর সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল।

খেমঙ্করী বললেন, 'সেকি তোমরা এত রাত্রে কোথায় চলেছ!'

শম্ভু সব খুলে বলল। কাত্যায়নীর নিষ্ঠুর আচরণের কোন কথাই শম্ভু আজ গোপন করল না।

খেমঙ্করী বললেন, 'আহাহা, তাই বলে তোমরা এমন ক'রে রাগ ক'রে চললে। কাতু বেচারার মাথার ঠিক নেই আজ। মাইনে পত্তর নিয়ে মনিবের সঙ্গে আজ ওর ঝাগড়া হয়েছে। নিজেও সারাদিন উপোস ক'রে রয়েছে। চল, আমি গিয়ে সব বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলছি। ফিরে এস তোমরা।'

কিন্তু দেখা গেল কারোরই আর ফিরবার ইচ্ছা নেই।

কোন ধর্মশালায় গিয়ে ওঠাই ওদের মতলব।

ধর্মশালার খোঁজ-খবর বিজু প্রথম থেকেই নিচ্ছিল। চায়ের দোকানে একটি ভদ্রলোকের

সঙ্গে এর মধ্যে তার বেশ আলাপ হয়ে গেছে তাঁর নাম হীরালাল নন্দী। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। বেশ জোয়ান শক্ত-সমর্থ চেহারা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। পোষাক-টোসাকেও বেশ একটু সৌখীন ভদ্রলোক।

শম্ভু সাবধান ক'রে দিয়েছিল, খবরদার বিজু কাউকে নাম-ধাম বলবিনে। তাই নিজের নাম-ধাম গোপন করেই বিজু হীরালাল বাবুর সঙ্গে আলাপ করেছে। শহরের কোথায় কি দেখবার আছে না আছে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছে। হীরালাল এখানকার অনেকদিনের পুরোন বাসিন্দা। সব তার জানা-শোনা। অনেক জায়গা সে নিজে সঙ্গে ক'রে দেখিয়েছেও ওদের।

মোড়ের চায়ের দোকানটায় আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে বসে হীরালাল অত রাত্রেও চা খাচ্ছিল আর গল্প করছিল। তিন বন্ধু গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

বিজুই প্রথমে তাকে ইসা। ক'রে ডাকল, 'হীরালালবাবু একটু বাইরে আসবেন দয়া ক'রে ?'

হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, 'নিশ্চয়ই।'

বাইরে এসে বিজুর কাঁধে হাত রাখল হীরালাল, 'কি ব্যাপার বলতো ভাই।'

এরই মধ্যে হীরালাল বেশ ঘনিষ্টতা ক'রে নিয়েছে বিজুদের সঙ্গে। বিজু বলল, 'আপনাকে একটা ধর্মশালার কথা বলেছিলাম না। আজ দেবেন তার একটা ঠিক ক'রে ?'

হীরালাল বলল, 'তোমাদের যদি দরকার হয়, কেন দেব না ? কিন্তু এত রাত্রে যে ধর্মশালার খোঁজ নিচ্ছ তোমরা ব্যাপার কি, বাসার লোকের সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি ?'

বিজু কি বলতে যাচ্ছিল, শম্ভু তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'না না না ঝগড়া-টগড়া কিছু নয়। আমরা যাঁর বাসায় উঠেছিলাম, তাঁর শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে। রেঁধে-টেঁধে দিতে অসুবিধে হচ্ছে, তাই আমরা অন্য জায়গায় উঠে যেতে চাইছি।'

হীরালাল বলল, 'বেশ তো, তা ইচ্ছে করলে তোমাদের ছোটখাট একটা বাসাও খুঁজে দিতে পারি। কি বল হে রতন ? তোমার তো অনেক বাসা-টাসা সন্ধানে থাকে। এদের একটা দাও না ঠিক ক'রে।'

ব'লে হীরালাল চায়ের দোকানের ভিতরে তারই সমবয়সী একটি বন্ধুর দিকে তাকাল।

কালো মোটা মত সেই লোকটি অমলদের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে বলল, 'বাসা আছে আমার হাতে। আজই ঠিক ক'রে দিতে পারি। মাসে টাকা দশেক মাত্র ভাড়া। চলুন না, দেখে আসবেন।'

বিজু বলল, 'মন্দ কি।'

কিন্তু অমল বাধা দিয়ে বলল, 'না না বাসা-টাসার দরদার নেই আমাদের। আমরা অল্প ক'দিন মাত্র আর আছি এখানে। ধর্মশালাই ভালো হবে আমাদের পক্ষে।'

হীরালাল বলল, 'বেশ। এসো আমাদের সঙ্গে।'

তারপর অনেক গলি-ঘুঁঝি পার হয়ে একটা ছোট মত বাড়ির সামনে এনে তুলল ওদের।

দোতলা বাড়ি। নিচে একটা হোটেল। ওপরে পাশাপাশি কয়েকটা ঘর। একটা ঘরে গান-বাজনা হচ্ছে। বাঁয়া-তবলার আওয়াজ ভেসে আসছে। আর একটা ঘরে কয়েকজন লোক তাল ঠুকছে বসে বসে। তাদের একজনকে ডেকে হীরালাল বলল, 'এই বিনোদ, দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটা এদের খুলে দে তো। এরা তিন বন্ধু কাশীতে বেড়াতে এসেছে, ক'দিন থাকবে এই ঘরে। খুব ভদ্রলোকের ছেলে, দেখিস যেন এদের কোন অসুবিধে না হয়।'

কিন্তু বাড়িটার ধরন আর এখানকার বাসিন্দাদের চাল-চলন দেখে শম্ভুর যেন একটু কেমন কেমন লাগল, সে হীরালালকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা হীরালালবাবু, এ কোন্ জায়গায় এনে তুললেন আমাদের? এটাকে তো ধর্মশালা বলে মনে হচ্ছে না।'

হীরালাল বলল, 'না ঠিক ধর্মশালা নয়। তবে ধর্মশালার চেয়ে অনেক ভালো জায়গা। ধর্মশালায় এক সপ্তাহের বেশি থাকতে দেয় না। কিন্তু ইচ্ছে করলে এখানে তোমরা বাহান্ন সপ্তাহও থাকতে পারবে। ভাড়া লাগবে না। নিচেই হোটেল আছে। ডিম চাও, মাংস চাও সব রকমেরই ব্যবস্থা আছে এখানে। যখন যা খেতে ইচ্ছে করে খেতে পারবে। দামও সব জিনিসের এখানে সস্তা। হোটেলওয়ালাকে আমার নাম ব'লো। তোমাদের কাছ থেকে একটা পয়সাও বেশি নিতে পারবে না।'

অমল বলল, 'কিন্তু আপনি কেন এত কষ্ট করতে গেলেন। আমাদের ধর্মশালাই তো ভালো ছিল।'

হীরালাল একটু সস্নেহ ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'তবু বলে ধর্মশালা ভালো ছিল। বেশ তো এসেছ এখানে থেকে দেখ দু'একদিন। তারপর যদি অসুবিধা বোঝ ধর্মশালায় চলে গেলেই পারবে। কেউ তো আটকে রাখবে না তোমাদের। ধর্মশালায় কত রকমের কত লোক থাকে। কত চোর গুণ্ডা এসে আশ্রয় নেয় সেখানে। তার চেয়ে এটা আমাদের পাঁচজন ভদ্রলোক বন্ধুবান্ধবের মেস, বেশ নিজের বাড়ির মত নিশ্চিন্তে থাকবে। এটা ধর্মশালার চেয়ে খারাপ হোল কিসে?'

বিজু বলল, 'না হীরালালবাবু এই বেশ ভালো হয়েছে।' শম্ভুও চোখ টিপে অমলকে থামতে ইসারা ক'রে বলল, 'হীরালালবাবু যা করেছেন আমাদের ভালোর জন্যেই করেছেন।'

হীরালাল একটু হাসল, 'তোমাদের অবুঝ বন্ধুটিকে ভালো ক'রে কথাটা বুঝিয়ে দাও।'

তারপর হীরালাল ওদের নিচে ডেকে নিয়ে হোটেলের ঘরে বসিয়ে দিল। ঠাকুরকে ভালো ক'রে বলে দিল, 'এদের বেশ দেখে-শুনে যত্ন ক'রে দিও হে। এরা সবাই আমার লোক।'

হোটেলে অনেক লোক আসছে-যাচ্ছে। কেউ খাচ্ছে, কেউ কেউ মুখ ধুচ্ছে।

একটি সারিতে তিন বন্ধু খেতে বসে গেল। শম্ভুর পিসীমার বাড়িতে বেশিরভাগই শাক-চচ্চড়ি আর নিরামিষ তরকারি জুটেছে ভাগ্যে। আজ সুযোগ পেয়ে তার শোধ তুলল তিনজন। নিরামিষ মোটে ছুঁয়েই দেখল না। ডিম, মাছ, মাংস সব নিজেদের পছন্দমত ঠাকুরকে ফরমাশ ক'রে ক'রে চেয়ে নিল।

খাওয়া হয়ে গেলে পর হীরালাল আবার এল খোঁজ নিতে। অমলকেই প্রথমে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন? কোন অসুবিধে-টুবিধে হয়নি তো? হয়ে থাকলে বলো। মোটেই লজ্জা করো না যেন।'

অমল কুণ্ঠিতভঙ্গিতে বলল, 'না না অসুবিধে কিসের।'

শম্ভু বলল, 'আপনি যখন রয়েছেন হীরালাল দা', তখন কি কোন অসুবিধে হবার জো আছে।'

হীরালাল একটু হেসে বলল, 'তোমার বন্ধুটি তো ভেবেই সারা হয়েছিল। যাও এবার শুয়ে পড় গিয়ে। অনেক রাত হয়ে গেছে। বেশি রাত জেগে আজ আর কাজ নেই। ছেলে-মানুষ অসুখ-টসুখ ক'রে বসতে পারে।'

অমলদের পিছনে পিছনে তাদের ঘরে এল হীরালাল। বলল, 'আর কি। বিছানা-টিছানা পেতে এবার শুয়ে পড় যার যার।'

বিজু বলল, 'আপনি বাসায় গেলেন না?'

হীরালাল হেসে বলল, 'আবার যাব কোথায়। আমারও এই আস্তানা। পাশের ঘরেই আমি থাকি।'

বিজু খুশি হয়ে বলল, 'তাই নাকি?'

হীরালাল বলল, 'তা না হ'লে তোমাদের একটি অজানা অচেনা বাড়িতে এনে তুলেছি নাকি ভেবেছ? কাশী হেন জায়গা। এখানে কত রকম গুণ্ডা বদমাইসের আড্ডা। আমার একটা দায়িত্ব নেই?'

শম্ভু বলল, 'তা তো ঠিকই।'

হীরালাল যাওয়ার সময় ফের ওদের আশ্বাস দিয়ে গেল, 'কোন ভয় নেই তোমাদের, এখানে আমারই সব জানাশোনা লোক একটা মেসের মত ক'রে থাকে। দিনের বেলায় কাজকর্ম

করে। রাত্রে একটু আমোদ ফুর্তি না করতে পারলে ওদের চলবে কেন। কিন্তু তোমাদের ও সবের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা শুয়ে এখন বিশ্রাম করো। আমি পাশের ঘরেই আছি। যখন যা দরকার হয় বলো। কোন অসুবিধে হ'লে ডেকো আমাকে।'

বলে হীরালাল চলে গেল।

পাশাপাশি বিছানা পাতল তিন বন্ধু। বিজু শুয়ে পড়ে বলল, 'যাই বলিস, লোকটি কিন্তু সত্যিই খুব ভদ্রলোক। অমল মিছামিছি ওকে সন্দেহের চোখে দেখছিল। বলতে কি, এমন আদর-যত্ন আমি বাড়িতেও কারো কাছে পাইনি।'

অমল কোন কথা না বলে চুপ ক'রে রইল। শম্ভু একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'হু, ভদ্রলোক ভালোই, তবু আমাদের সাধ্যমত সাবধান হয়ে থাকতে হবে। ধর্মশালার নাম ক'রে আমাদের এখানে এনে তুললেন কেন উনি। তাতেই যা একটু খটকা লাগছে। তাছাড়া আপত্তির আর কিছু নেই।'

বিজু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোদের সব কিছুতেই খুৎখুতনি, সত্যিই তো। ধর্মশালার চাইতে এ জায়গায় আমি তো অসুবিধের কিছুই দেখছিনে। বিদেশে এর চাইতে আর বেশি আরাম কি চাস তুই ?' তারপর একটু হেসে বলল, 'যাই বলিস তোর পিসীর বাড়ির তুলনায় এ বাড়ি স্বর্গ—স্বর্গের চেয়েও বেশি।'

হীরালালের সঙ্গে বিজুরই প্রথম খাতির হয়েছে। সেই গর্ব বন্ধুদের কাছে ও নানাভাবে প্রকাশ করতে চায়।

শম্ভু চুপ ক'রে আছে দেখে বিজু ওকে আর একবার খোঁচা দিল, 'কিরে, কথা বলছিস না যে। পিসীমার জন্যে মন কেমন করতে সুরু করল নাকি তোর ?'

শম্ভু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ, থাম এবার।'

তারপর ইসারায় সামনের জানলাটা বন্ধুদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শম্ভু।

বিজু আর অমল সবিস্ময়ে দেখল খানিকটা দূরে বারান্দার কোণে একটা থামের আড়ালে জন দুই লোকের সঙ্গে বিজুর হীরালাল দা' কি এক গভীর পরামর্শে মগ্ন রয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন লোক বার বার তাকাচ্ছে অমলদের ঘরের দিকে। শম্ভুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল তারা।

শম্ভু উঠে গিয়ে ভালো ক'রে জানলাগুলি বন্ধ ক'রে এল। তারপর অমলের স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে বলল, 'ওটা আমার কাছে দে।'

আর কারো সঙ্গে তো কিছু নেই, একটি মাত্র মূল্যবান জিনিস আছে, তা এই স্যুটকেসের মধ্যেই। তাই স্যুটকেসটিকে নিজের মাথার তলায় রেখে শুয়ে পড়ল শম্ভু। তাতে অমলও একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল। তিনি বন্ধুর মধ্যে শম্ভুই সব চেয়ে শক্তিমান, বুদ্ধিমান। স্কুলের বিদ্যা কম থাকলে কি হবে। বাইরের অভিজ্ঞতা বেশি। ওর ওপর নির্ভর করা যায়। (ক্রমশঃ)

দুপুরবেলার কথা

১

দিনটা যে আজ মেঘলা আছে ভারী,
আমার রে ভাই হচ্ছে মনে যেন,
সুযিমামার ধরার সাথে আড়ি।

২

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ কামার করে কাজ,
দুপুরবেলা বসে এখন আছি,
আমার চোখে নিদ্রা নাহি আজ।

৩

ডুমুর গাছের পাতা কেবল নড়ে,
যেম্‌নি জোরে একটু হাওয়া চলে,
টপাস্ করে ফলটি ঝরে পড়ে।

৪

মহিষ শুয়ে জাবর কাটে খালি,
ন্যাংলা কুকুর এধার-ওধার করে,
ঘুরে ফিরে শুঁকছে কেবল নালি।

৫

অদূরে কোন নাম-না-জানা পাখী,
ডাকছে কু, কু, অতি মধুর স্বরে,
কেমন সেটা দেখতে চেয়ে থাকি।

৬

ছাতের উপর বাঁশের খোঁটা আছে,
তাহার উপর বসল শঙ্খচিল,
উড়বে সে কি গেলে তাহার কাছে।

৭

ঘ্যান্ ঘ্যান, ঘ্যান শব্দ অবিরত,
সামনে বসে দর্জি চালায় কল,
দিনে-রাতে করছে জামা কত।

৮

পাশের ঘরে নড়ে ভাতের থালা
বেঁজী দুটো করছে আসা-যাওয়া
ডাকের চোটে কানটি ঝালাপালা।

৯

কাঠবেড়ালী গাছের গোড়া খোঁড়ে,
দেখে, যদি খাবার কোথাও মেলে,
তাড়া পেলেই অমনি গাছে চড়ে।

১০

রেলগাড়ী যায় পুলের ওপর দিয়ে
ঝক্ ঝক্ ঝক শব্দ করে চলে
দেশ-বিদেশের যাত্রী কত নিয়ে।

১১

কাছে কোথায় বিয়ে সেদিন হ'ল
মেয়ে এবার যাবে শ্বশুরবাড়ী,
মেয়ের মা তাই কেঁদে কেঁদেই মল।

১২

তিনটে এবার বাজতে চলে প্রায়,
আমি এবার চেয়ার ছেড়ে উঠি
জল খেতে যাই তেষ্টাতে প্রাণ যায়।

শ্রীমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনা

মোর কল্প-জল্পনা—
নীলাকাশে তারার আল্পনা—।
ওই—স্বপ্নপটের পরে,
সাজাই থরে থরে,
কল্প-পুষ্প মালিকা—
আমি, একাকী বালিকা।
আমি, স্বর্ণ-বরণ আবরণে,
কণক চম্পা আভরণে,
নব-আনন্দে—
বাদল-ছন্দে—
করি কল্পনা,
কত জল্পনা।
শরৎ দিনের যে মঞ্জরী—
শীতের বায়ে যায়রে ঝরি,
স্নিগ্ধ আবেশে—
কুহেলী দিবসে,
তারে লয়ে মোর কল্পনা—
জীবনে কিছুই স্বল্প—না।

শ্রীসুস্মিতা ঘোষ

পুষির বাচ্চা
ফটো: শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবরাদার মামার বাড়ী যাত্রা

সূর্যি-মামা পুব থেকে পশ্চিমে যেতে না যেতেই পাড়ার ছেলেরা এসে জমাট্ বাঁধত গোবরাদা'র ওখানে। ওহো! তোমরা বুঝি তাকে চেন না? সে হচ্ছে আমার মেজমামার মেজ ছেলে। লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, গৌরবর্ণ, চুলগুলোও বেশ পেছন দিকে হেলে পড়েছে। মোটের উপর দেখতে সুপুরুষ। গোবরাদা' ভারী সুন্দর গল্প বলতে পারত; তাই পাড়ার ছেলেমেয়েরা কেন, বুড়োবুড়ীরাও তাকে খুব ভালবাসত।

সেবার মামার বাড়ী গিয়ে দেখি সন্ধ্যেবেলা গোবরাদাকে ঘিরে পাড়ার ছেলেরা গোল হ'য়ে বসে গিয়েছে। এই প্রথম মামারবাড়ীতে এসেছি তাই ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না। যাক্ দাঁড়িয়ে না থেকে ঝুপ্ ক'রে দাদার পাশেই বসে পড়লাম। গোবরাদা' আমাকে দেখেই তো একটু মুঁচকি হাসলেন। তারপর একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, কে কি গল্প শুনতে চায়। কেউ বল্‌লে—ভুতুড়ে গল্পে, কেউ বল্‌লে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, আবার কেউ বল্‌লে, রাজকুমার-রাজকুমারীর গল্প। সবাই যখন নিজেদের মত ব'লে চুপ করলে, তখন গোবরাদা' হাত নেড়ে বল্‌লেন—আজকে তোমাদের আমার 'জীবন খাতা'র একটি পাতা থেকে কিছু বলছি, শোন।

সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন চোদ্দর কোঠা ছেড়ে পনরোয় পা দিয়েছি। ঐ যে বেলতলার স্কুলটা দেখা যাচ্ছে, ঐখানে তখন আমি পড়তাম। সেবার গরম খুব তাড়াতাড়ি পড়ায় ছুটিটা আমরা খুব

শীগ্‌গির উপভোগ করলাম। ছুটির দিন-কয়েক বাদে একদিন মা আমায় বল্‌লেন—বাবা গোবরা! একবার তোর মামারবাড়ী থেকে ঘুরে আয়না। আমি বল্‌লাম—তাতে আর ক্ষতি কি মা। হুকুম পেলে এখুনই বের হই। আমায় বাধা দিয়ে মা বল্‌লেন—থাক্ বাবা, আজকে গিয়ে কাজ নেই, কাল সকালে ৭টার ট্রেনে গেলেই চল্‌বে।

পরের দিন যথা সময়েই রওনা হলাম। মা তো 'শ্রীদুর্গা' 'শ্রীদুর্গা' ব'লে আমার মঙ্গল-কামনা করতে লাগলেন। ষ্টেশনে এসে দেখি ট্রেন ছাড়তে বেশী দেরি নেই। চট্‌পট্ টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠলাম। হু হু শব্দে ট্রেন চলেছে সামনের দিকে। আমি একমনে পাশের সমস্ত দৃশ্য দেখে চলেছি। চমক ভাঙ্গতে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়েছে পাশকুঁড়া ষ্টেশনে। তাড়াতাড়ি তল্পিতল্পা নিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম। ষ্টেশন থেকে মামারবাড়ী বেশ কিছুটা যেতে হয়। সামান্য একটু জলযোগ ক'রে হণ্টন সুরু করলাম। কিছুদূর গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েই শিউরে উঠলাম। সারা আকাশ ছেয়ে গিয়েছে কালো মেঘে। সন্ধ্যে হতেও আর বেশী বিলম্ব ছিল না। তাই আমি তাড়াতাড়ি পা চালালুম। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলুম না। ঝড় জল দুই সুরু হ'ল। রাস্তার পাশেই ছিল একটা জীর্ণ পোড়ো বাড়ী। উপায় না দেখে তারই মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। বাড়ীটার চারপাশ জঙ্গলে বোঝাই হ'য়ে গিয়েছে। আমার সাড়া পেয়ে বহু চাম্‌চিকে, বাদুড়, কিঁচমিঁচ শব্দ ক'রে উড়ে পালাল।

বেশ সন্ধ্যে হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু বাইরে তখনও প্রবল ঝড় বইছে। মনে হ'ল জলের ঝাপটা
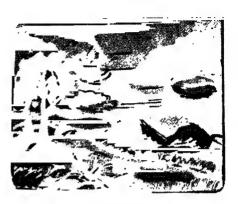
হাতে আঁকা ছবি
শ্রীইরা ও রীণা চৌধুরী

ক্রমশঃ যেন বেড়েই চলেছে। যাক্ ঘরের কোণে বসে আমি এক মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। ওমা! ঘুটঘুটি অন্ধকারে চোখ পড়তে দেখি, অনতিদূরে লাল ভাঁটার মত দুটো চোখ ঐ জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছে! ভয়ে তো আমার গায়ে কাঁটা দিল। আস্তে আস্তে গুঁড়িসুড়ি মেরে আরও কোণঠেসে বস্‌লাম। এবার দেখি চোখ দুটো আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। উপায় নেই দেখে সাহসে ভর ক'রে যেই দাঁড়িয়েছি, অমনি কি যেন একটা আমার পায়ে লাগল, আর আমি হুড়মুড় ক'রে পড়ে গেলুম সেইখানেই। তারপর কখন কি হয়েছে জানিনি। চোখ চেয়েই দেখি পূর্বাচলে নবারুণের আলোকছটা দেখা দিয়েছে। আমি ভয় পেয়ে পড়ে গেলেও, জন্তুটা যে আমার পড়ে যাওয়ায় ভয় পেয়েছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না। অনেক বেলায় আমি সেদিন মামারবাড়ী এসে পৌঁছিলাম।

শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী।

ভারতের জন্য মার্কিন বালিকার অর্থদান

কিছুদিন পূর্বে একটি ছোট্ট মার্কিন মেয়ে তার খাবারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করে এক ডলার ভারবর্ষে পাঠিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই দান সানন্দে গ্রহণ করে জাতীয় সাহায্য ভাণ্ডারে জমা দিয়াছেন। বালিকাটির নাম ওয়েণ্ডি মার্কস। তার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর আট মাস। কনেকাটিকটের অন্তর্গত ষ্টর্সে মেয়েটি বাস করে। নিউ ইয়র্কে ভারতীয় কনসাল জেনারেলকে এই দান পাঠাবার সময়ে একখানি চিঠি লিখে ওয়েণ্ডি মার্কস জানায় যে, খাবারের পয়সা থেকে এই অর্থ বাঁচিয়ে, তার প্রিয় ভারতবাসীর জন্য সে এই টাকা পাঠাচ্ছে।

এই দান ও চিঠি পেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাকে একটি সুন্দর ছোট্ট উত্তর দেন। উত্তরটি হচ্ছে:—"প্রিয় ওয়েণ্ডি মার্কস, ভারতবাসীদের সাহায্য করবার জন্যে তুমি যে অর্থ সঞ্চয় করে পাঠিয়েছ তা তোমার চিঠির সঙ্গে পেয়েছি। এর জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই দানের ভিতর দিয়ে তোমার যে গুণ প্রকাশ পেয়েছি তার প্রশংসা করে। তুমি আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।"

সুদূর ভারতের প্রতি ছোট্ট মার্কিন মেয়ের এই টান—ভারতের গরীব-দুঃখীদের জন্যে এই সমবেদনা, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের উদাহরণস্বরূপ হোক।

নতুন বই

সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন

পরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীঅনিলবরণ রায়। গীতা-প্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। মূল্য: ১॥০

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় শ্রীঅরবিন্দের জীবদ্দশায় তার একান্ত ভক্ত ও নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাঁর পক্ষেই শ্রীঅরবিন্দের এমন একটি সুন্দর ও সত্য-ঘটনার উপর নির্ভর করে জীবনী লেখা সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শন জানার পক্ষে প্রত্যেকেরই বইখানি পড়ে দেখা কর্তব্য।

আগামী (প্রথম খণ্ড: মাঝি)—শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটুর্য্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: ১॥০

তরুণ লেখক দীপেন্দ্রনাথের "আগামী" একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের লেখা ছোট্ট উপন্যাস। লেখাটি ছোট্ট হলেও, এবং লেখক তরুণ হলেও, এই ছোট্টা লেখার মধ্যে যে বস্তু রয়েছে, এই তরুণ লেখকের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে শক্তির যে পরিচয় রয়েছে তা অনেক প্রবীণ লেখকের মধ্যেও বিরল। এই কারণেই গ্রন্থের ছোট একটি ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন—"লেখকের বয়স অল্প, কিন্তু ক্ষমতা অনেক! এঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অপরিসীম।" হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই বইখানি লেখা। কিন্তু এইটুকুই গ্রন্থখানির পরিচয় নয়, এছাড়াও সতেরো বছরের নবীন লেখকের রচনাশৈলী সম্পর্কে অনেক কিছুই না-বলা রয়ে যায়।

ফুটবল খেলা ও খেলোয়াড়—শ্রীস্বরাজ দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৩৭বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: ২৲

ফুটবল খেলা সম্পর্কে বাংলায় এমন একখানি গ্রন্থ ইতঃপূর্বে আমরা আর দেখিনি। খেলা, খেলোয়াড়, খেলার ইতিহাস, নিয়ম সবই আছে এর মধ্যে। ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে বইটির নিশ্চিত প্রচার হবে।

মধুচক্র

এবারের নির্বাচনে আমাদের এক বিরাট অভিজ্ঞতা হোল।...দেখলাম; বিভিন্ন দলের স্বেচ্ছা-সেবকদের ও সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতার চরম রূপ। নির্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত প্রার্থীর প্রতি কদর্য ভাষায় বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করে যে উক্তি এরা করেছেন, তা যে কেউ সভ্য জগতের সামাজিক জীব হিসেবে করতে পারে তা আমাদের ধারণাতীত ছিল। এ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, কারুর মুখে শোনা কথা নয়। এখন প্রশ্ন হোল এই অধঃপতনের কারণ কি? স্বাধীন দেশের, স্বাধীন নাগরিক হিসেবে কোনো জাতির কাছে আমরা পরিচয় দিতে পারবো?...স্বাধীনতা পাওয়ার পর যে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবন কাটছে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গেলে চাই সংযম, সহিষ্ণুতা আর সুশৃঙ্খলা, কিন্তু এই তিনটির কোনটাই আজ আমাদের জীবনে নেই। তার জায়গায় অভদ্রতা, অশিক্ষা আর বিশৃঙ্খলা আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। শ্রদ্ধাস্পিদদের মধ্যে যদি কেউ বল্লেন, ডাইনে যাও বাঁয়ে যেও না, আমরা জোর করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর নির্দেশকে অবমাননা করার জন্য বাঁয়েতে যাবোই। এটাই আমাদের জীবনের এখন মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। আমাদের এই অধঃপতনের জন্য শিক্ষার দোষ দিয়ে কি হবে? শালীনতা বোধ, উন্নত রুচির প্রতি আন্তরিকতা, এটা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত মানসিক অনুভূতির প্রশ্ন—ব্যক্তিগতভাবে ও সংঘবদ্ধভাবে আমরা নিজেরা এই অধঃপতনের উদ্দাম স্রোতকে যদি না রোধ করি, তাহ'লে তার পরিণাম যে ভয়াবহ হবে সেটা যে কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকই অনুভব করতে পারবেন। আর জিজ্ঞাসা করি—এই কি আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার ফল?

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ট জর্জ ৫৬ বৎসর বয়সে শান্তিতে এই মরলোক ত্যাগ করছেন।...ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজা ষষ্ঠ জর্জের নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। ঈশ্বর তার স্বর্গত আত্মার মঙ্গল করুন।

অগ্রহায়ণ মাসের মজার খেলাটা ভবানীপুর থেকে অলকনন্দা বসু পাঠিয়েছিল। ওটি সে তোমাদের জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ রচিত "জোড়াসাঁকোর ধারে" থেকে নিয়েছে। জবাব যাদের ঠিক হয়েছে—পার্থ বসু (ভবানীপুর), অরুণ চক্রবর্তী (কোলকাতা) ছায়া দলুই (হাওড়া), তপতী নন্দী, মৈত্রেয়ী, গোপা, রাণা দত্ত (বহরমপুর), সুমিতা চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (বউবাজার), স্নিগ্ধা দত্ত (শ্যামবাজার), গোপা পাল (কোলকাতা) এবারে তোমাদের একটা চিঠি উপহার দিই—এ চিঠিটি লিখেছে বহরমপুর থেকে

প্রতিমা দত্ত।…'প্রিয় মধুদি, মৌচাক কত কত বৎসর ধরে আমাদের বাড়ীতে আসছে, সেই যখন আমরা ছোট ছিলাম—তারপর কত বৎসর চলে গেল, সময়ের পাখায় পাখায় কতদিন কেটে গেল—সেই ছোট আমরা বড় হলাম, School-এ ঢুকলাম—তারপর কলেজ—এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হলাম। তবু এখনও মৌচাক পড়ছি—আগে যে আনন্দ পেতাম, তাই পাচ্ছি—বেশী করে পাচ্ছি, কম তো নয়ই। এখন মৌচাক আসে আমার ছোট বোন মৈত্রেয়ী দত্তের নামে। ওকে নিশ্চয় চেনেন—যা ঘন ঘন চিঠি দেয়, তাই না মধুদি?…যাই হোক মৌচাকের দীর্ঘ জীবনযেমন কামনা করি, তেমনি কামনা করি আপনার দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য ও সুখ-সম্পদ। আপনার চিঠি আমাদের কত অনুপ্রেরণা দেয়। কত কথাই আমাদের মনে হয় আপনাকে জানাতে।…উত্তর চাই নইলে মৈত্রেয়ীর মত আমিও অভিমান করবো। প্রণাম নেবেন।'…

তোমাদের চিঠির জবাবঃ কানাইলাল ঘোষ (চন্দননগর)—তোমার চিঠি পড়ে আমার কি মনে হচ্ছে জনো? মনে হচ্ছে, তোমার মত বোকা দুটি নেই। মৌচাকের মারফৎ তুমি যা জানতে চেয়েছো তা কি জানানো যায়? কোলকাতায় এসে মৌচাক অফিসে খোঁজ নিলে তোমার প্রশ্নের জবাব পেতে নাকি? **প্রদোষরঞ্জন মুখোপাধ্যায়** (আহিরীটোলা) তোমার চিঠি আমরা পাইনি। এখানকার ঠিকানা চিঠি দিলেই আমি পাবো। **ভারতী সেনগুপ্তা** (বহরমপুর) —তোমার সাফাল্যের কথা শুনে সুখী হলাম। তোমার 'মজার খেলা' দুটি পেয়েছি, তার মধ্যে একটি আসছে মাসে প্রকাশ করবো। **সতী হালদার** (মানভূম) কাগজ না পাওয়া প্রভৃতি নানান কারণে কয়েক মাস মৌচাক বেরোতে সামান্য দেরি হচ্ছে; সেইজন্য তোমাদের কাছেও পৌঁচচ্ছে দেরিতে। **কল্যাণী মিত্র** (বেলেঘাটা)—তোমার মজার খেলাটি বড্ড শক্ত বলে মনে হচ্ছে, সেইজন্যে ওটা দেওয়া যাবে না—সোজা দেখে কিছু পাঠিও। **শোভনা রায়** (বালুরঘাট) —তোমার কবিতা যথাস্থানে পৌঁছে দিলাম। **মৈত্রেয়ী দত্ত** (বহরমপুর)—তোমার বিরাট চিঠি পেলাম। শিখারাণীকে চিঠি দিতে বোলো। রুণুদের চিঠিতে যে অনুরোধ জানিয়েছ তার জবাব হচ্ছে "হ্যাঁ"। তোমার ছবি পেয়েছি। **অরুণ চক্রবর্তী** (কোলকাতা)—B.A. পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় চিঠি দিতে পারছো না বলে দুঃখ করছে—আমি বলি কি জানো পরীক্ষার জন্যে যদি অতই ভয় থাকে তাহলে পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে আবার চিঠিপত্র লেখা সুরু কোরো।—কি বল? **রুণু, রাণা ও গোপা দত্ত** (বহরমপুর)—তোমাদের মজার খেলাটি মনোনীত হয়েছে। ঠিক সময় প্রকাশিত হবে। **অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক** (শেয়ালদা)—শোন, বাংলা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের যে বিপর্যয় ঘটেছে, সেটা তাদের স্বকৃত। এ সমস্যা আমার মনে হয় ক্রমশই সার্বজীনন হয়ে উঠছে। **তপতী নন্দী** (বহরমপুর)—তোমার প্রস্তাবগুলোর কিছু কিছু আসছে বৈশাখ মাস থেকে কাজে লাগাবো। যাদের চিঠি পেয়েছি—**পিণ্টু মজুমদার** (লখনউ), **তাপস সেন** (কলুটোলা), **প্রতীপ, প্রবীর, প্রসূন রায়চৌধুরী** (কোলকাতা), **অজন্তা চক্রবর্তী** (শ্যামবাজার) **তড়িৎকুমার বিশ্বাস** (বীরনগর)।

আচ্ছা আজ এইখানেই। প্রীতি, শুভেচ্ছা আর অনেক ভালোবাসা রইলো।

তোমাদের—**মধুদি**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা
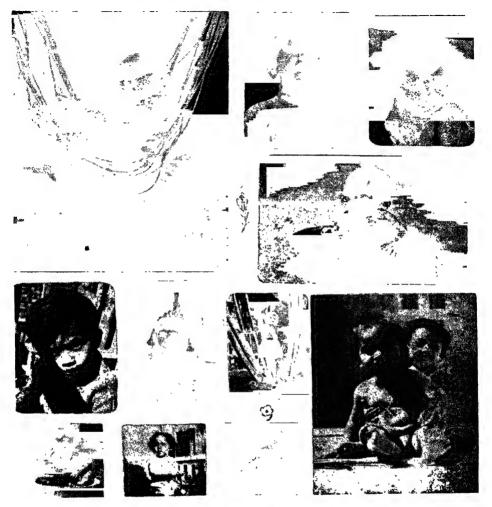
চিত্র-পরিচয়

প্রথম সারি (৮৯) শ্রীনবকুমার সরকার মোশলাপুর, পাটনা ৬; (৯০) শ্রীদীপিকা গুহ, স্কুল-ডাঙ্গা, বাঁকুড়া; (৯১) শ্রীদেবযানী দাস ২০০।৩বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। **দ্বিতীয় সারি** (৯২) শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী, কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া। **তৃতীয় সারি** (৯৩) শ্রীকুমুদভূষণ ঘোষাল, ৬ নতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা; (৯৪) মিস্ লিলি রায়, ৫ বি, দেশপ্রিয় পার্ক ইষ্ট, কলিকাতা। (৯৫) শ্রীসুধা ঘোষ, ২৫ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; (৯৬) শ্রীবনশ্রী দত্ত, ৩৪ বেনীনন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। **চতুর্থ সারি** (৯৭) শ্রীমিলনকুমার মিত্র, সাউলি, চন্দননগর; (৯৮) শ্রীরবি গুপ্ত, ৫৫ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা; (৯৯) শ্রীরজতকুমার মিত্র . ৭ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা।

চৈত্র—১৩৪৮
৩২শ বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

অভিমান

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

❋

মাগো তুমি বলো আমায় পষ্ট—
পুতুল খেলে সময় কি মা
করি আমি নষ্ট ?

তুমি ত' মা দুপুরবেলা
খেল্‌তে বসো তাসের খেলা
চেয়ারেতে ব'সে বাবা
পড়েন প্রহর অষ্ট।
সে কি মাগো নয়ক সময় নষ্ট ?

খেল্‌তে গেলে গুরুমশাই
বলেন আমায় দুষ্টু
মেঘের সাথে চাঁদের খেলায়—
তাদের মা কি রুষ্টু ?

বনের সাথে হাওয়ার খেলা—
দোদুল-দোলায় সারা বেলা—
খেল্‌ছে বেলি—চাঁপা—পারুল
বকুলতলায়—বিষ্টু,
এদের চেয়ে আমি কি মা দুষ্টু ?

খুকিকে মা বলো তুমি লক্ষ্মী !—
নেয় কি সে মা আমার মতন
কাজের তোমার ঝক্কি ?—
ছোট্ট আমার কলসী ক'রে—
দীঘির জলটি আনি ভ'রে
তুলি পুজোর ফুলটি তোমার—
জানে পশুপক্ষী !
খুকিই তবু তোমার কাছে লক্ষ্মী ।—

কারোয় আমি চাই না দিতে
একটুও মা কষ্ট ।—
ঘরে আমায় না চাও যদি
বলোই মাগো স্পষ্ট ;—

ফুলের দেশে যাই মা চ'লে—
ভোরের শিশির হয়েই গলে ।
ফুলের মা মোর চুমো নিয়ে—
বল্‌বে সোনা—শিষ্ট !
থাক্‌ব না মা হেথায় দিতে
তোমারে আর কষ্ট ।

★ সাপের গল্প ★

'সম্বুদ্ধ'

এই ঘটনাটির প্রথম আধখানা আমার নিজের দেখা, বাকি আধখানা লোকের মুখে শোনা।

গ্রামের ভদ্র হিন্দু-পাড়ার প্রায় পশ্চিম প্রান্তে একটি বাড়ি। অনেক ঘর গৃহস্থ ছিল সে বাড়িতে। জম্‌জমাট একটি পাড়া বিশেষ। এখন গ্রামেরই লক্ষ্মী ছেড়েছে, সে বাড়িও নির্জন।

এই বাড়িটির লাগাও পশ্চিমে এদেরই একটা জমি, ঝোপেঝাড়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। তারপরে রাস্তা, রাস্তার পরে খাল। জমিটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, পরিমাণ বিঘা দুই-তিন হবে; শুধু আগাছা আর জঙ্গলে ভর্তি। বহু শরীকের ভাগের জমি, তাকে কেউই কোনদিন কেটে সাফ করত না।

কুড়ি বছর আগের কথা। কলকাতায় কলেজে পড়ি তখন, ছুটিতে বাড়ি গিয়েছি। আমাদের ছিল জঙ্গল-কাটার দল, বাবা তার উদ্যোক্তা। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে এইটাই আমাদের চাকরি হ'ত —কে কোথায় বন-জঙ্গল জমিয়ে রেখেছে, তার সমতে বা অমতে কিভাবে তাকে শেষ করে আসা যায়।

সে জঙ্গলটাকে চিরদিনই চিনি; কিন্তু গ্রামের একটেরে, বিশেষ কোন বিঘ্ন করে না, বনও বিরাট, কাজেই তার গায়ে কোনদিন হাত দিইনি আমরা। একদিন সকালবেলা সেই জঙ্গলের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। পাড়ার একটি লোক ডেকে থামালে। বললে, বাবু, এই জঙ্গলটাকে একটু দেখবেন, মনে হয় বাঘের বাসা হয়েছে।

যা জঙ্গল, না হওয়াই অন্যায়। বললাম, দেখেছ?

সে বললে, চোখে দেখিনি। দিন কয়েক আগে গরু বাঁধতে এসেছিলাম পথের ওপর, শুনলাম জঙ্গলের মধ্যে কি যেন গোঁ গোঁ করে গজরাচ্ছে। বাঘ ছাড়া আর কি হতে পারে বলুন। অথচ কথাটা তো ভাল নয়। পথের ওপর, তায় বাড়ির ছেলেপুলেরা সারাক্ষণ যাচ্ছে-আস্‌ছে, খেলাধূলো করছে, কাউকে একটা আবার চড়-কামড় যদি দেয়?

বাড়ি এসে বাবাকে বললাম। তিনি বললেন, অসম্ভব কি, যা জঙ্গল।

আমি বললাম, কাটে না কেন ওরা?

বাবা মুখ মচ্‌কালেন শুধু। পুরোনো পরিবারের শরীকানা সম্পর্ক, সুখশ্রাব্য আলোচনা নয়।

আমি বললাম, ঢুকে দেখব নাকি একবার?

বাবা বললেন, তা দেখ্। তবে একা যাস্‌নে।

তোমরা শুনে হেসো না—বাঘের বাসায় ঢুকতে যাবার বড় ভয়ই হচ্ছে, বাঘে যদি খায় তো

বাবা বকবেন। সেই বাবাই যদি অনুমতি দিলেন তবে আর কার চিন্তা—বাঘ তো আর জ্যাঠামশাই নয় যে বাবার চেয়েও বেশি ভয় করতে হবে তাকে।

ছেলের দল তো মজুতই থাকত; পরদিনই সব জুটে গেল। অনেকে মিলে সে জঙ্গলে ঢুকে লাভ নেই। আমার পাশের বাড়ির ছেলে ছিল শ্রীশ সেন, অতি ভালো ছেলে। আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, গ্রামসুবাদে কাকা।

কাজে ভীষণ বন্ধু। এই সব ডানপিটেমির ব্যাপারে আমার ভারী নির্ভরযোগ্য সঙ্গী ছিল সে। আমরা দু'জনে জঙ্গলে ঢুকলাম। তাঁর হাতে লাঠি, আমার হাতে শড়কি, দুজনেরই বাঁ-হাতে টর্চ। বাকি ছেলেদের সার দিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দিলাম। বলে দিলাম, বাঘ যদি বেরোয় তো হৈ চৈ করবি, নইলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি, আর বেরিয়ে যদি একটাকে ধরে তো বাকিগুলো পালিয়ে না গিয়ে বাঘ ঠেঙিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিবি। আমাদের ধরলে আমরাও ডাকব, তখন ঢুকে পড়িস, একেবারে না খেয়ে ফেলে।

'তার হাতে লাঠি, আমার হাতে শড়কি, দু'জনেরই বাঁ-হাতে টর্চ'

অদ্ভুত জঙ্গল। পায়ের নীচে প্যাচ্‌প্যাচে কাদা। ঘাস-টাস প্রায় নেই, কারণ রোদ ঢোকে না সেখানে। মাটি থেকে হাত তিনেক পর্যন্ত সাফ্, শুধু ছোট ছোট আগাছার গুঁড়ি। তিন হাত ওপরে সমস্ত আগাছাদের ডালপালা আর নানা রকমের বুনো লতায় জড়াজড়ি হয়ে এমনই একটি দুর্ভেদ্য ছাদ তৈরি করে রেখেছে, তাকে ফুঁড়ে বৃষ্টির জলও সহজে নামবার কথা নয়। সেই অন্ধকারে মাথা

নিচু করে দু'জনে হাঁটছি, জঙ্গলের এক মুড়ো থেকে শুরু করে অন্য মুড়োর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিই, আবার টর্চ নেবাই। টর্চ নেবালে জায়গাটা প্রায় অন্ধকার।

বাঘের বাসা খুঁজতে গেলে চোখের চেয়ে বেশি কাজ দেবে নাক—বাঘ যদি ধারে কাছে থাকে, তার গায়ের গন্ধ নাকে আসবেই; বাসাটাও খুব দুর্গন্ধ হয়। কিন্তু কই গন্ধ কিছুই পাই না।

বনের তিন ভাগের এক ভাগ যখন চলে গেছি, তখন খোকন হঠাৎ বললে, এই শোন্ তো, কিসের শব্দ?

কান পেতে শুন্‌লাম। ঠিক বড় লাট্টুর ডাক যেরকম হয়, তেমনিধারা একটা একটানা শব্দ—ম্ ম্ ম্ ম্—। শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললাম, কিছু নেই। আবার এগোলাম। আবার শব্দ কানে এলো, এবার অন্য দিক থেকে। আলো ফেলো, কিছু নেই।

প্রায় পনরো মিনিট দু'জনে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার এদিকে, একবার ওদিকে; কখনও কাছে, কখনও দূরে—সেই শব্দ জেগে ওঠে; টর্চ ফেললেই থেমে যায়। শব্দটা কোথা থেকে আসে তাও বুঝি না কিছু, কখনও মনে হয় মাটির তলা থেকে উঠ্‌ছে, কখনও মনে হয়, না, মাটি থেকে ওপরেই হচ্ছে শব্দটা।

কিসের শব্দ কে জানে, তবে বাঘ নয়—এটা ঠিক। খোকন বললে, দাঁড়া, এগিয়ে গিয়ে দেখি কিসের ডাক ওটা।—বাঁদর নাচাচ্ছে?

আমি বললাম, দাঁড়া। বাঘ এ নয়।

খোকন বললে, বাঘ নয় সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কি তবে?

আমার কেন মনে হ'ল কথাটা কে জানে, হঠাৎ বলে ফেললাম, সাপ যদি হয়?

খোকন বললে, সাপের এত বড় গর্জন—সে সাপ কত বড়?

আমি বললাম্ হয়তো মেঘডম্বুর। মেঘডম্বুর আমরা বলি ময়াল বা অজগরকে—আলিপুরের বাগানে যেরকম অজগর আছে।

খোকন বললে, কিন্তু তাও যদি হয়, কতগুলো?

আমি বললাম, অনেকগুলো। খোকন বললে, তারপর?

আমি বললাম, তারপর আবার কি, বাঘ না হলেই হ'ল। এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে সাপের সঙ্গে হাতাহাতি করা যাবে না, সাপের হাত থাকে না। চল বেরিয়ে পড়ি।

বন থেকে বেরিয়ে এলাম। সেই লোকটি ছিল, শব্দটা নকল করে তাকে শুনিয়ে বললাম, এই রকম তো ?

সে বললে, হ্যাঁ।

বাড়ি এসে বাবাকে বললাম। বাবাও বললেন, তা সাপও হ'তে পারে। যা জঙ্গল, সাপে বাসা বাঁধবে আর আশ্চর্য কি !

ছুটি ফুরিয়ে গেল, আমিও চলে এলাম। এর পরের অংশটা অন্যের মুখে শুনেছি, আবার একবার বাড়ি গিয়ে।

বলেছি, আমাদের গ্রামের দক্ষিণ দিকের গ্রামের কয়েকজন মুসলমান সাপ ধরতে শিখেছিল, দিনকতক মহা হৈ চৈ বাধিয়েছিল তারা। তারা নাকি এসে সে বাড়ির বুড়োকর্তাকে বলেছিল, আপনাদের বাগানে সাপের খোঁজ পাচ্ছি, ধরব ?

তিনি বললেন, স্বচ্ছন্দে, এর আর অনুমতি কি।

ভোরবেলা তারা এসে বনে ঢুক্‌ল। খানিক পরে দূত পাঠিয়ে আরও লোক ডেকে পাঠাল, গ্রামে সাপ ধরবার ওস্তাদ যে ক'জন আছে সবাইকে।

সারাদিন ধরে সেই জন পনরো লোক বনময় তোলপাড় করে বেড়াল। বিকেল বেলায় বুড়ো সর্দার বুড়োকর্তার কাছে এসে আছাড় খেয়ে পড়্‌ল। বললে, আমার মাথায় জুতো মারুন আপনি, আমি আপনাদের সবাইকে মারবার ব্যবস্থা করেছি।

তিনি বললেন, কি হয়েছে ?

সে বললে, সমস্ত বন সাপে কিলবিল করছে, এত সাপ জানলে আমি বনে হাত দিতাম না। সারাদিন ধরেছি, তবু সাপের শেষ নেই। বাসায় নাড়া পড়েছে, এই সাপ এসে এবার বাড়িতে উঠ্‌বে যাকে পাবে তাকেই খাবে। আপনারা অন্ততঃ আজ রাতের মত অন্য বাড়িতে চলে যান, নইলে কি যে হবে বলতে পারি না ! দেখা গেল, বড় আকারের, মানে সাড়ে তিন হাতের ওপরে সাপ ধরেছে তারা গোটা কুড়ি, সাড়ে তিন থেকে দু'হাত আন্দাজ সাপ ধরেছে আশীটার মত, তার চেয়ে ছোট প্রায় ধরেই নি। ধরেনি যাদের তারা তো রইলই ; ধরেছে যেগুলো তাদের নিয়ে কি করা, সেও তখন এক মহা সমস্যা। সাপুড়েকে সাপ মারতে নেই।

ভেবে-চিন্তে শেষে এক ফন্দি ঠিক হ'ল। সেই বড় বড় কুড়িখানেক সাপকে তারা রেখে দিলে, খেলা দেখাবে। বাকিগুলোকে ছোট ছোট মট্‌কিতে (কালো রঙের মাটির হাঁড়ি চাল রাখবার জন্যে তৈরি হয়, খুব মোটা আর খুব মজবুত) পুরে সরা দিয়ে মুখ বেঁধে, বড় খালের জলে ভাটায় ছেড়ে দেওয়া হ'ল, নদীতে নেমে যাবে বোলে। মট্‌কির গায়ে লিখে দেওয়া হ'ল, সাবধান, সাপ, কেউ খুলো না। যাক আপাততঃ নদীর স্রোতে ভেসে, তারপর আয়ু থাকে কোন-গতিকে বেঁচে যাবে, না থাকে মরবে। হাতে করে, তো মারা হ'ল না তাদের।

কিন্তু এদিকে বাড়িতে কম করেও ছেলে-বুড়োয় ষাট-সত্তর জন লোক, এতগুলো মানুষকে অন্য বাড়িতে চালান করা সহজ নয়। ছোটদের খাটে শুইয়ে বড়রা আলো জ্বেলে সারারাত জেগে কাটালেন। শাপ কিন্তু বাড়িতে উঠ্‌ল না। বোধ হয় তার কারণ, বাগানটাই মস্ত বড়—নাড়া খেয়ে তারই মধ্যে এ-পাড়ার সাপ ও-পাড়ায় গেছে, ও-পাড়ার সাপ এ-পাড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। বন ছেড়ে বাড়িতে আসবার কথা তাদের মনেও হয় নি, দরকারও হয় নি।

বলেছি, গল্পের এই দ্বিতীয় অংশটা আবার অন্যের মুখে শোনা। অত্যুক্তি থাকা অসম্ভব নয়। তবে সাপের বাসা যে বনে হয়েছিল এবং তারা বেশ দুর্দান্ত-সংখ্যক সাপ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার প্রকাণ্ড প্রমাণ, এর পরের বারেই বাড়ি গিয়ে দেখেছিলাম, সে জঙ্গলটা কাটা হয়েছে। বিশেষ রকম ভয়ের গুঁতোয় না পড়লে সেটা হ'ত মনে করা কঠিন।

কি জাতের সাপ তারা, তাও জানিনে। মেঘডম্বুর নয়। জাত-সাপ নামটি গ্রামের লোক যে-কোন বড় আকারের ফণাধারী সাপের উপর সহজেই প্রয়োগ করে থাকে। আমাদের দেশে জাত-সাপ বলতে কেউটে, গোক্ষুর, কিন্তু গোক্ষুররা শুক্‌নো ডাঙার বাসিন্দা, ও-রকম ভিজে প্যাচ্‌-পেচে জায়গাতে বাসা তারা করে না। তাছাড়া অতগুলো সাপ একসঙ্গে কলোনি করে থাকা, এ-ও তাদের রীতি নয়।

সাপ দেখিনি, যারা দেখেছে বললে, তাদের কাছ থেকেও সাপের আকৃতির যথার্থ বর্ণনা কিছু পাইনি। এর অনেক পরবর্তীকালে নূতন যে জ্ঞান আহরণ করেছি, তার থেকে এখন আমার ধারণা, যদি ফণাধারীই হয় তবে সে সাপ শঙ্খচূড়। ঐরকমের ছায়া-ঢাকা ভিজে জায়গাতেই শঙ্খচূড় বাসা বাঁধে, অনেকগুলো একসঙ্গে থাকাও তাদেরই রীতি; শব্দ ক'রে গর্জন করাও তাদের অভ্যাস আছে।

আর শঙ্খচূড়ই যদি হয় তবে আরও একটা কথা সহজে বোঝা যায়—বনে নাড়া পড়ল তবু তারা বাড়িতে গিয়ে উঠ্‌ল না কেন। শঙ্খচূড় বনবাসী সাপ, মানুষের বাড়িতে তারা যেতে চাইবে না। গোক্ষুর হ'লে ঠিক বাড়িতে ঢুকে আশ্রয় নিত।

গ্রামের লোককে জিজ্ঞেস করে লাভ হয় না, কারণ তারা যখন গল্প করতে বসে তখন সে গল্পের রং চড়ানোর ঠেলায় সব সাপেরই চেহারা কুচকুচে কালো হ'য়ে যায়; তা সে সাপ মাছরাঙাই হোক আর কঞ্চির-খোঁচাই হোক। তাছাড়া শঙ্খচূড়ও প্রায় কালো রঙের সাপ, যদিও তার পিঠের ওপর সারবন্দি সাদা V-আঁকা থাকে। আমাদের দেশে বিশেষ দেখা যায় না এদের। তাই দেখলেও হঠাৎ একে লোকে চেনে না। বছর দেড়েক হ'ল বরিশালে এক সাপুড়ে দলের কাছে আমি শঙ্খচূড় দেখলাম, তারা বললে, এ হচ্ছে মণিরাজ সাপ। মণিরাজ কোন সাপেরই নাম নয়, সুবিধেমত একটা সুশ্রাব্য নাম বানিয়ে নিয়েছে তারা।

শেষকালে একটি কথা বলি; এই গল্পটিতে আমার নিজের কথা আছে, কিন্তু তাই বলেই এটাকে আমার বীরত্বের কাহিনী বলে ভুল কোরো না তোমরা। আমার বীরত্বের ব্যাপার এর মধ্যে কিছুই নেই—সাপ জানলে কি আর আমি জঙ্গলে ঢুকতে যেতাম ভাব? বাঘের কথা আলাদা। বাঘ মানুষকে গিলে খায় না। তাই ব'লে সাপ আর ছিনে জোঁক যেখানে থাকে তার ধার কাছ দিয়েও হাঁটিনে আমি!

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীঅশোক গুহ

তা তিরিশ বছর আগে তো হবেই। বাংলার কোন এক পাড়া-গাঁয়ে ছিল একটি ছেলে। নাম তার কুণাল।

ঘর-কুণো ছেলে সে। তাই তার জগতে সঙ্গী-সাথী বড় একটা ছিল না। ইস্‌কুল থেকে বাড়ী এসে সে বসে থাকত ঘরে। কখনো বা আপন মনে বাঁখারির তলোয়ার ত্তুলিয়ে বীরের অভিনয় করত, কখনো বা পুরানো একটা বড় তোরঙ্গ খুলে বই নিয়ে বসতো। এসব অ-পাঠ্য বই; তাই গুরুজনের বিধি-নিষেধ এড়িয়ে তাকে তৈরি করে নিতে হোত আড়াল-আবডাল।

এরই মধ্যে অনেক পড়ে ফেলেছিল কুণাল। উপেন্দ্রকিশোর রায়মহাশয়ের রামায়ণ, যোগীন সরকারের মহাভারত; সুখলতা রাও-এর আরো গল্প, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের জন্তুদের বন্ধু নন্তবাবু—এমনি কত বই! তার কল্পনার জগতে আনাগোনাও ছিল এঁদের বইয়ের মানুষ আর জীবজন্তুর। কতদিন তো কুণাল স্বপ্ন দেখেছে, সে যেন নন্তবাবুর মতোই উড়ে চলেছে শ্বেতপরীর সঙ্গে; আরো গল্পের ফুলরাণীর প্রতাপ যেন সে, বার বার ঘুড়ঘুড়ির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতের আবেদনও তার কাছে কম নয়। সে কতদিন মাথায় পাগ প'রে সেজেছে রাম, অর্জুনের মতো তীর ধনুক নিয়ে লক্ষ্যবেধ করেছে। তাছাড়া ছিল 'সন্দেশ' আর 'শিশু'র মতো মাসিক, তারাও তার কল্পনার কম খোরাক জোগায় নি। এমনি করেই কুণাল বেড়ে উঠছিল, একটু বা বেশি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠছিল।

সেদিন দিদি এসেছেন। কুণাল ইস্‌কুলে যায়নি। দিদির সম্মানে ছুটি নিয়েছে। দিদি থাকেন কলকাতায়। সাহিত্যের খবর বেশ ভালই রাখেন, বইয়েরও খুব ভক্ত। দুপুরে দিদির বাক্স খোলা হোলো। মাও বসে আছেন। কুণাল আর তার ছোট বোনও সেখানে হাজির। কত রঙ্‌-বেরঙের শাড়ী, জামা, সেলাইয়ের বাক্স, হরেকরকমের জিনিস—আর সবার নীচে থরে থরে বই। সিল্কের প্যাডে-বাঁধানোচিত্রে চন্দ্রশেখর, তিনবন্ধু, মোহিত সেনের রবীন্দ্র কাব্য গ্রন্থাবলী, আরো কত কি! দিদি বইগুলো সব নামিয়ে রাখলেন, তারপর কুণালের হাতে একখানা হাসিখুসির মতো চৌকো বই দিয়ে বললেন, 'নে তোর জন্যে এনেছি।' কুণাল বই নিয়ে নাম পড়ে দেখলে, 'ক্ষীরের পুতুল,' লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর এক ছুটে সেখান থেকে চলে এল।

নিরালা ঘর। নিঝুম দুপুর। রূপকথার মহল তার দুয়ার খুলে দিয়েছে। সেখানে আছে অভাগিনী দুয়োরাণী, হিংসুটে সুয়োরাণী আর কানাকড়ি দিয়ে কেনা বাঁদর। বাঁদরের পণ রাজপাটে বসাবে তার মাকে। তারপর কত কৌশল। বাঁদর এসে মাকে বললে, 'মা ওঠ, বৌ-বেটা বরণ কর! দুয়োরাণী উঠে বসলেন, গল্পও ফুরালো।

কুণাল এক নিঃশ্বাসে শেষ করলে বই। পড়ন্তবেলার রোদ এসে পড়েছে জানালা দিয়ে। তার মনে তখনো ঘুরছে গল্পের রেশ। সে আবার পাতা ওল্টালে। কেমন রিমঝিম করে গানের মতো দুলে দুলে চলেছে ভাষা, কথায় ছবির পর ছবি আঁকা। তাছাড়া আছে সাদায়-কালোয় ছবি। এগুলো আবার লেখকের নিজের আঁকা। (তা'হলে ছবি আঁকতেও জানেন লেখক!—ছবিগুলোও ভারী চমৎকার! গোদা ষষ্ঠী ঠাকরুণ ক্ষীরের পুতুল চুরি করতে চলেছেন, পাল তুলে নীল সাগরে চলেছে জাহাজ—এমনি কত! মন নাড়া দিয়ে যায় ছবি, দুলিয়ে দিয়ে যায়।···

এখন কুণাল আর একটু বড় হয়ে উঠেছে। একটু বা সে পাকা। বড়দের বই সে নাড়াচাড়া করে। বাড়ীতে "প্রবাসী" এলেও দেখে। রবি ঠাকুরের 'অচলায়তন' সে পড়েছে, পড়েছে 'জীবনস্মৃতির' দু-এক পাতা। অবনীন্দ্রনাথও তার কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর আঁকা ছবি সে বহু দেখেছে। এই তো 'শেষ বোঝা' ছবিখানা তো তাঁরই আঁকা। একটা উট পড়ে আছে, তার পিঠে বোঝা। তাছাড়া আরো কত ছবি! অবনীন্দ্রনাথের কথাও শুনেছে তার দিদির কাছ থেকে।

কে তিনি? রবীন্দ্রনাথের ভাইপো, মস্ত শিল্পী। তিনি আগে বিলেতী ধরণে ছবি আঁকতেন। তারপর একদিন ফারসী একখানা পুঁথি দেখলেন, সেদিন থেকেই তাঁর ছবি আঁকার ধারা বদলালো। তারপরে গুপ্তযুগের এক পুরানো গুহাও আবিষ্কার হোলো। তার নাম অজন্তা। তারই গায়ে আঁকা ছবি তাঁকে মাতিয়ে তুললো। তিনি পুরানো দিনের আমাদের দেশের শিল্পীকে জাগিয়ে তুললেন। দেশ-বিদেশে সাড়া পড়ে গেল। ফ্রান্সের মস্ত শহর পারী। সেখানে তাঁর আর তাঁর শিষ্যদের আঁকা ছবির বসলো প্রদর্শনী। এমনি কত কথা শুনলো কুণাল। তারপর পুরানো বাঁধানো "প্রবাসী" বার করে দিদি তাকে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা লেখা পড়তে দিলেন। কুণাল তো অবাক। শুধু কলমের নয়, অবনীন্দ্রনাথ তুলিরও যাদুকর। কলমে তিনি ভাষায় ছবি আঁকেন আর তুলিতে আঁকেন টানে-টোনে। কুণাল ঠিক করলে, এই যাদুকরকে জানতে হবে, ভালো করে চিনতে হবে।

ইস্‌কুলের উঁচু ক্লাসেই তখন কুণাল। লাইব্রেরীতে বই খুঁজছিল। ইংরেজী সাহিত্যেও সে একটু-আধটু পড়তে শুরু করেছে। বইয়ের আলমারীতে জুলে ভার্ণের একখানা বই খুঁজতে খুঁজতে সে দেখলে একপাশে একখানা ফরাসী কেতাব রয়েছে। কেমন কৌতূহল হোলো তার। সে বইখানা তুলে নিয়ে পাতা ওলটালো। একি! ফারসী তো নয়, এ যে অবনীন্দ্রনাথের 'রাজ-কাহিনী'! তখুনি লাইব্রেরীয়ানকে বলে সে বইখানা বাড়ী নিয়ে এল।

আবার রাত জেগে পড়া। লণ্ঠনের আলোয় মায়াপুরী বসে গেল। এ কিন্তু রূপকথার রাজ্য নয়, ইতিহাসের পুরানো মহল। বালুময় রাজস্থান। তার কঠোর মাটির বুকে ফসল না ফলুক, বীরের তো জন্ম হোলো। সেই বাপ্‌পা, সেই চণ্ড, সেই হামীর। এঁরা দেশের জন্য লড়লেন, কেউ বা বুকের রক্ত ঢেলে দিলেন, দেশের মান বাঁচালেন। কুণাল এ কাহিনী আগেই পড়েছিল যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ করা টড সাহেবের 'রাজস্থানে'। কিন্তু এতো তেমন নীরস নয়, তার মরা হাড়ে যে জীয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে দিলেন অবনী ঠাকুর। বীর চণ্ড মুকুল, বাপ্‌পা, অরি সিং এরা যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এল, সবাই হোলো কুণালের বড় আপন জন। কুণাল ভাষায় নতুনের সন্ধান পেল। কথার ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক কত আরবী-ফারসী কথা এনে বসিয়েছেন। মনে হয়, বাদশাহী আমল যেন চোখের সুমুখে ভাসছে। বই পড়ে বাংলার মাষ্টারমশাইকে বললে সে কথা। তিনি বললেন, বড় শিল্পীরা এমনি করেই তো ভাষার সম্পদ বাড়ান।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। কুণাল এসেছে কলকাতায় পড়তে। এর মধ্যে অবনী ঠাকুরের 'শকুন্তলা' পড়েছে। "মৌচাকে" 'বুড়ো আঙলা' বেরুচ্ছিল তাও সে পড়েছে। তারপর 'ভূতপত্রীর দেশ'। "বিচিত্রা" মাসিকে অবনীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার রসও পেয়েছে। তার বার বার মনে হয়েছে, যাদুকরের এত কাছে থেকেও সে কি তাঁকে দেখতে পাবে না। কিন্তু সে যা ঘর-কুণো। কলকাতার পথঘাট-ই চেনে না! না হলে ঠিকানা তো তার অজানা নয়। চিৎপুরের দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। ছোটমামার ডায়েরী দেখে সে গলিটা কোথায় তাও জেনে নিয়েছে। তবু যাওয়া তার হয়-ই না। সে থাকে দক্ষিণ অঞ্চলে, উত্তর অঞ্চলে যাবার তার সাহসই নেই। তবু একদিন ছুটির দিনে সে অবনী ঠাকুরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। সরকারী ছুটি নয়, তাই দুপুরের সস্তা ভাড়ায় পাড়ি জমানো গেল ট্রামে। এসপ্লানেডে ট্রাম বদলে চিৎপুরের ট্রামে উঠে পড়লো কুণাল। কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করায় সে ঠিক-ঠিকানায় নামিয়ে দিলে। সরু পথ, ঘটাং ঘটাং করে ট্রাম চলেছে, হুস হুস করে ছুটছে বাস, আর পিল পিল করে

মানুষের সার, তারই পাশে মস্ত পুরানো বাড়ী। এখানেই আছেন অবনী ঠাকুর। কিন্তু গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকতে সাহস হোলো না। কুণাল যাদুকরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এল।

তারপর খবরের কাগজে, সভা-সমিতি, থিয়েটারের উদ্বোধনে, অবনীন্দ্রনাথের নাম বহুবার সে পড়লো, কিন্তু দেখা আর হয়ে উঠলো না। কুণাল এবার "ভারতী" যোগাড় করে পড়তে লাগলো অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সম্বন্ধে লেখা। ভারতীয় শিল্প কি, কি তার মূল কথা, কত সহজ করে জানিয়ে দিয়েছেন : খুকু যে কি করতে কি করে, শিব গড়তে বাঁদর গড়ে, তিনি জানিয়েছেন এই বাঁদরটাই সত্যি, শিব কিন্তু সত্যি নয়। এসব তো পড়লোই, তাছাড়া তারই ফাঁকে ফাঁকে পড়লো তাঁর লেখা যাত্রার পালা, উদ্ভট কবিতা। একদিন হঠাৎ পুরানো একখানা "প্রবাসী"তে একটা ঐতিহাসিক গল্প তার চোখে পড়লো, 'যুগ্মতারা' না কি নাম। দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শাহের শিল্পী নাদির শাহকে হত্যা করে বাদশাহের অপমানের প্রতিশোধ নিলে। গল্পের শেষে লেখা দেখলে অবনী ঠাকুরের নাম। কুণাল অবাক হলো, রাজকাহিনীর রূপ এ নয়, এ আরো সংযত, আরো ভাব-গম্ভীর।

কয়েক বছর পরে। কুণাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে এসেছে। এখন আর সে ঘর কুণো নয়। তার সাহিত্যিক আর শিল্পী-বন্ধুও জুটেছে। কিন্তু তবু অবনীন্দ্রনাথকে দেখা হয়নি। তবে অবনী ঠাকুরের নানা গল্প সে শুনেছে। ছাত্রেরা ছবি করছে, ইজেলে রয়েছে ছবি। অবনীবাবু এসে বললেন, 'কিছুটা কেটে বাদ দে।' কাটতে কাটতে ছবির যা দশা হলো সে আর বলবার নয়। কখনো বা তিনি ছবি আঁকা তাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা নানা গল্প করছেন। বিদেশ থেকে কেউ হয়তো নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন, অবনীবাবু ছেলে মানুষের মতোই আঁতকে উঠে বলছেন, 'মাথায় থাক আমার বিলেত! এই কলকাতাই আমার বিলেত, আমার ফ্রান্স।' কুণাল তো শুনে আবাক, তিনি কোনারকের মন্দির ছাড়া নাকি ভারবর্ষের ও আর কিছুই দেখেন নি! কি করে তা'হলে আঁকলেন শাজাহানের অন্তিমের ছবি?

কুণাল শিল্পী-বন্ধুদের কাছে এমনি নানা গল্প শোনে, বিশ্বাস হয় না। তারপর একদিন অবনীবাবুর গড়া 'সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্টাল আর্টস্'-এ গিয়ে ওর বিখ্যাত ছাত্র ক্ষিতীন মজুমদারের সঙ্গে আলাপ করলে। ক্ষিতীনবাবু মজলিসি লোক, অবনীবাবু সম্বন্ধে কত গল্প করলেন, বললেন, 'ওরে বাবা! বাংলার বাইরে কোনো ছাত্র চাকরি নিয়ে যাবে শুনলেই হয়েছে আর কি! এই তো আমিই একবার যাব, উনি বাধা দিয়ে বললেন, যাস নে রে, কোট ফেল'ব! "দেশ কখনো যেতে আছে!'

কুণালের বন্ধুরা হেসে বললে, 'এখন তো বিশ্বাস হোলো।' তা না হয়ে উপায় কি! অবনীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে তার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল।

সেদিন সোসাইটিতে বক্তৃতা দেবেন জার্মান চিত্রকর অনাগারিক গোবিন্দ। সঙ্গে তাঁর আঁকা তিব্বতের দৃশ্যচিত্রের প্রদর্শনী। হল ভরতি হয়ে গেছে। কুণালও এসেছে। বক্তৃতা হয়ে গেল। কুণাল বেরিয়ে আসছিল, এমন সময় বন্ধু তাকে ফিসফিসিয়ে বললে, 'ঐ তো অবনীন্দ্রনাথ।' কুণাল তাকালো। দীর্ঘ মানুষটি, গায়ে জোব্বা, মুখে দীপ্ত প্রতিভার ছাপ। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন। সঙ্গে তাঁর নাতি শোভনলাল। সে হাত ধরে নামাচ্ছে। কুণাল পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। তার বুক দুলে উঠছিল আনন্দে! এতদিনে সে দেখলো যাদুকরকে। তার কামনা সফল হলো!

কুণাল কখনো ভাবেনি অবনীবাবুর সঙ্গে সে আলাপ করবে। তার ইচ্ছে আছে, কিন্তু উৎসাহ সে পায় না। তাছাড়া কিই বা বলবে তাঁর কাছে? তাই সে অবনীবাবুর লেখা পড়ে আর আঁকা দেখেই খুশি হয়েছিল। সে এর মধ্যে দিয়ে তাঁকে জেনেছে, চিনেছে। এও সে জানে তিনি আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে থাকেন না, তিনি থাকেন বরাহনগরে।

একদিন এক শিল্পী-বন্ধুর সঙ্গে সে গেল তাঁরই কাছে। পথে শ্যামবজারের মোড় থেকে কিছু সরেস সন্দেশও নিলে সঙ্গে। উনি নাকি সন্দেশ খেতে খুবই ভালবাসেন।

খুঁজে খুঁজে তাঁর বাড়ীতো বার করা গেল। বাগান-ঘেরা বাড়ী। ওরা বাড়ীতে ঢুকতেই অবনীবাবুর-ছেলে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তারা এসেছে?

শিল্পী-বন্ধুটি জানালো, দেখা করতেই আসা।

ছেলে বললেন, বাবা অসুস্থ, তবু আপনারা যখন এসেছেন, খবর দিই। ওরা বসে আছে কিছুক্ষণ, এমন সময় ঢুকলেন অবনীন্দ্রনাথ। বড় বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি, ভেঙে পড়েছেন, তবুও মুখে রয়েছে উজ্জ্বল প্রতিভার ছাপ।

ওরা প্রণাম করতেই তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বন্ধুটি তুলে দিলেন তাঁর হাতে সন্দেশের বাক্সটি। খুশিতে ঝলমল করে উঠল তাঁর মুখ। ঠিক যেন এক লোভী শিশু! বললেন, 'সন্দেশ এনেছ—বাঃ বেশ!'

গলার স্বর তাঁর ভাঙা।

তারপর কুণালের বন্ধু বার করলো তার ছয় ঋতুর ছয়খানি ছবি। এই ছবি সে য়্যালবাম ক'রে বার করবে, কিছু লিখে দিতে হবে। ছাত্রের এ দাবী, আবদার। তিনি উলটে-পালটে

মন দিয়ে দেখলেন ছবিগুলি। তারপর হঠাৎ মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, এ কি এঁকেছ? শীত কখনো এমনি থুখ্‌ড়ে বুড়ো হয়! শীতের কি দাপট দেখনি? না বাপু হয়নি। আর একটা এঁকো! এ হয়নি,—হয়নি!

বন্ধুটি বললে, 'তাই-ই আঁকব।'

এবার তিনি লিখে দিলেন তার য়্যালবামে: 'ঋতুর মধুকর, মধু আহরণ করে সাজিয়েছ তোমার ডালা।'

এবার ওরা প্রণাম করে বিদায় নিলে।

কুণালের কামনা আর একবার সফল হোলো।

কুণাল অবনীন্দ্রনাথকে ভোলেনি। তার আফশোস, আর তো দেখা হবে না, সে কেন একটু তাঁর হাতের লেখা নিয়ে এল না। সে তাঁর সম্বন্ধে সব খবরই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাখে। তিনি কবে শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন, কবে তাঁর নতুন বই বেরুলো বিশ্বভারতী থেকে—সব খবরই তাঁর জানা। সে বইগুলো সংগ্রহও করে রেখেছে, এমন কি চিত্র-বিদ্যা শেখার বইখানাও। তার কাছে তাছাড়া পুরানো সংস্করণগুলিও আছে। সেই ইণ্ডিয়ান প্রেসের ক্ষীরের পুতুল, সেই রাজকাহিনী, আবার গোপেশ্বর চক্রবর্তীর আঁকা ছবিওয়ালা রাজকাহিনী, নতুন সিগনেটের সূর্য রায়ের আঁকা বই—সবই আছে। তার দুঃখ, এত বই বেরুচ্ছে, কিন্তু এম. সি. সরকার থেকে যে 'বুড়ো আংলা' বেরিয়েছিল, এখন আর তা পাওয়া যায় না।

কুণাল রোজ খুব ভোরেই ওঠে। ভোরে উঠেই আগে সে খবরের কাগজ পড়ে। হকারকে বলা আছে, ভোর না হতেই তাকে কাগজ দেওয়া চাই। সেদিনও সে ভোরে উঠে দরজার কাছ থেকে কাগজ নিয়ে এসে দেখলে, আগের দিন রাতে অবনীবাবু মারা গেছেন। কুণাল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ঘরের দেওয়ালে অবনী ঠাকুরের ছবি সে টাঙিয়ে রাখেনি, তবু তাঁর ছবি তো আছে। সে আছে তাঁর মনে। তার মনে পড়লো, প্রথম যেদিন সে ক্ষীরের পুতুল পড়লো, যেদিন সে প্রথম ছবি দেখলো অবনীন্দ্রনাথের সেদিনের কথা, তারপর সেই ক্ষণিকের দেখা, সেই এক মুহূর্তের আলাপ। তার ইচ্ছে হোলো, ছুটে যায়, দেখে আসে যাদুকরকে, যিনি তার জীবনকে—বাংলার কিশোর-জীবনকে ভরে দিয়েছিলেন রূপে, রসে।

কুণাল বেরিয়ে পড়লো পথে। এমনি কবিগুরুকে শেষ দেখা দেখতে সে বেরিয়েছিল। আজ বেরিয়েছে শিল্পগুরুকে, কলম আর তুলির যাদুকরকে দেখতে।

দাম

শ্রীমিহির আচার্য

জানালার ফাঁক দিয়ে সকাল-স্থর্যের সোনা-রোদ বিছানার ওপর এসে পড়েছে। চোখ খুলেই স্থর্যের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল খোকন। হাসিতে ঝলমল করে উঠল তার ছোট্ট মুখখানা। সূর্যও হেসে জবাব দিল তার হাসির। পৃথিবীর আলোতে চোখ মেলার পর জীবনের উত্তাপ পয়েছিল প্রথম এই রাঙা-স্থর্যের কাছেই একদিন! কী-ভালোই লাগে চোখ পিট্ পিট্ করে ঐ স্থর্যের সঙ্গে খেলা করতে।

হাঁা। আর কে আছে তার জীবনে—এতো আপনার, এতো নিকট। জন্মের সঙ্গেই তার পাতুটো খোঁড়া, হামাগুড়ি দিয়ে গড়িয়ে চললেও, হাঁটতে পারে না। কাঁপে সমস্ত শরীর, কোমরে জোর পায় না। তাই যতক্ষণ ইচ্ছে এই বিছানার ওপড় পড়ে থাকে। স্থর্য ওঠে, দূরের মহানন্দার ওপরে গাছের ফাঁকে তার রক্তিমাভা, অবাক হয়ে রোজই চেয়ে দেখে সে। লাল আভা সরে গিয়ে হলদে স্থর্যটা এক সময় আয়নার মতো চক চক করে ওঠে। আর ঐ স্থয ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাছপালার ঘুমিয়ে-থাকা পাখীগুলো সশব্দে জেগে উঠে জাগরণী শোনায়, সমস্ত নিদ্রিত পৃথিবী ঘুমের খোলশ ছেড়ে ফেলে চোখ মেলে ওঠে।

খোকনও জাগে। কি বিস্ময় এই জেগে ওঠায়। আর কি আনন্দ। চোখ রগড়ে খোকন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে। তার ছোট্ট দেহের খাঁচা থেকে শালিকের মতোই একটা ধুকপুকে প্রাণ উন্মত্ত আবেগে পাখা ঝাপটাতে থাকে। বলে: 'ভালোবাসি—স্থয তোমায় ভালোবাসি—'

'কে?' ফিরে চাইল খোকন। হঠাৎ স্থযের আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর চাইতে গিয়ে কখন অন্ধকার হয়ে উঠল সব কিছু। অন্ধকার! এই অন্ধকারকে বড় ভয় খোকনের। চোখটা আর একবার রগড়ে নিল। না। ঘরে কেউ নেই। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। আর সব ভাইবোনেদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বারান্দা থেকে।

'মা—' খোকন চিঁ চিঁ করে ডেকে উঠল।

কোন সাড়া নেই।

একদিনের ইতিহাস নয়। রোজ এমনই হয়। কেউ তার খোঁজ করে না, না কারুর কাছ থেকে এতটুকু মনোযোগ। এতটুকু ছেলে সেও বুঝতে পারে এই তফাৎটুকু। কিন্তু···কেন?

'হে স্থর্য বলে দাও: আমার জীবনের কি কোনো দাম নেই!' খোকনের যেন চীৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করে।

'মা—মাগো—'

না। এবারও কোনো জবাব মেলে না।

বারে! তার খিদে পায় না বুঝি! বাইরে বারান্দায় ভাইবোনেরা খেতে বসেছে। ওদের গলার খুশি-ভরা আওয়াজ কানে আসছে।

ঘরে ঢুকল দিদি কি-এক কাজে।

'দিদিভাই—' খোকন ডাকল কাতর গলায়।

'কি, চেঁচাচ্ছিস কেন?' দিদি ধমকে দিল জোর গলায়।

একমুহূর্তে বোবা হয়ে যেতে চাইল খোকন। অভিমানে বুক ভরে উঠল। না, কিছু বলবে না, কিছু চাইবে না এদের কাছে।

কিন্তু···খেতে হবে যে। খিদে পেয়েছে।

'দিদিভাই—খিদে পেয়েছে—'

'খিদে পেলেই হ'ল। তোর না জ্বর হয়েছে। মা বালি চাপিয়েছে—'

'না। আমি বালি খাব না। কিছুতেই না।' খোকনের চোখ জলে উঠল।

এর পর দিদি যদি আরো বকে উঠত, যদি গায়ে হাত তুলত তা'হলেও খোকনের ভালো লাগত। অন্ততঃ, এটা বোঝা যেত ওরা তার বেঁচে-থাকা নিয়ে চিন্তা করে, তাকে ভালোবাসে। কিন্তু···কই, তারা তো ওর জীবন সম্পর্কে মোটেই মাথা ঘামায় না!

খোকনের কাঁদতে ইচ্ছে করে। তবু কাঁদবার জো নেই, সে-কথা ভাবতেও লজ্জা করে। চোখ ছলছল দেখলেই মা এসে হয়ত বলবে: 'আবার জানালা খুলে ভোরের ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস্। এর মানে: তারও যে কাঁদবার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে সেই কথাটাই তারা অস্বীকার করে।

খোকন বালিশে মুখ গুজে তার কান্না চাপবার চেষ্টা করে।

'এই খোকন—' মা বালির বাটি নিয়ে দাঁড়িয়েছে বিছানার কাছে।

খোকন মুখ তুলে মায়ের পানে চাইল। সকালের সমস্ত রোদ মা'র মুখে এসে পড়েছে। রোদে-উজ্জ্বল মা'র মুখখানার দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হতবাদ হয়ে গেল খোকন।

'নে—এই বালিটুকু খেয়ে নে—' মা বললে।

'না!'

'সে কি রে! না-খেলে শরীরে জোর হবে কি করে? নে—খেয়ে নে—' মা বাটিটা খোকনের মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

খোকন মায়ের হাতটা চেপে ধরল।

'কীরে কিছু বলবি ?' মা হেসে জিজ্ঞেস করল।

খোকন আরো শক্ত করে মা'র হাতটা চেপে ধরে নিজের ছোট্ট মুঠোয়। সব কথাই কী বলা যায়! তার হাতের ভাষা বোঝবার কি ক্ষমতা নেই মা'র! মা—মাগো—আমায় কেন ভালোবাসো না আর সকলেরই মতো। আমি যে ভালোবাসতে চাই, ভালোবাসা পেতে চাই। যেন বলতে থাকে খোকনের মনের ভেতরটা : এ পৃথিবীটা মস্ত বড়, আমার একা ভারী ভয় করে তোমার হাতটা চেপে ধরে তাইতো ভরসা পাই!

'আঃ ছাড়, সকালে উঠেই কি পাগলামি সুরু করলি—' মা'র কণ্ঠে বিরক্তি।

'মা—'

'ছাড় খোকন। ওদিকে উনুনে ডাল চাপিয়ে এসেছি। পুড়ে যাবে—' মা বাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

খোকন আবার জানালার বাইরে চোখ ফেরাল। অস্ফুটে বললে, 'মা, তুমি কেন সূর্য হতে পারো না ?'

বেলা বাড়ে।

সূর্য আকাশের মাঝামাঝি।

ঘরের ভেতরে ভীষণ গরম। ঘামতে থাকে খোকন। গায়ের জামাটা সটান গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে।

নিচে উঠোনে ভাইবোনেরা খেলা করছে। ওরা কত সুখী! আর সে! নিঃসাড় পড়ে থাকবে এই বিছানা আঁকড়ে। নিজে-নিজে একটু উঠতে চেষ্টা করলে অমনি সব হৈ হৈ করে উঠবে। বড়গিন্নী ফলানো! বেশ পড়ে যাবে যাবে! কার কি! তার জন্যে তো কতোই ভাবনা ওদের!

'দাদামণি—অ দাদামণি—লক্ষিটি—' ঘর দিয়ে দাদাকে চলে যেতে দেখে ডাকল খোকন।

দাদা বললে, 'অমনি পেছু ডেকে উঠলি তো ? ব্যস হয়েছে! ম্যাচে আজ হারব নির্ঘাৎ, কিম্বা তোর মতোই ঠ্যাং খোঁড়া হবে।'

খোকন পাথর হয়ে গেছে।

'কি বলবি, বল ?' দাদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে।

'না। কিছু নয়।' কিছুতেই বলবে না খোকন।

'কিছু নয়!' দাদা মুখ ভেংচে উঠল : 'তবে পেছু ডাকলি কেন ?'

না। কিছুতেই বলবে না খোকন। মরে গেলেও না। দাঁতে দাঁত এঁটে রইল।

দাদা ছুটে বেরিয়ে গেল।

দরদর করে ঘামছে খোকনের সারা শরীর। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠছে। কেউ চায় না তাকে, কেউ ভালোবাসে না। সব শত্তুর! সে কী ওদের কেউ নয়?···কী করেছে সে তাদের? তার জীবনের কী কোনো দামই নেই!

কিন্তু কী করে একবার ওদের জানিয়ে দেয়া যায়: তারও জীবনের দাম আছে। এত অবহেলা সে মোটেই সইবে না। হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে ওঠে তার।

ঘৃণায় রাগে মরীয়া হয়ে ওঠে খোকন। চীৎকার করে যেন সে জানতে চায়: 'আমি আছি—আমি আছি এখানে। ওগো তোমরা শোনো—'

যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে খোকন। নখ দিয়ে বালিশটা আঁচড়াতে থাকে। না। খোকন আর কিছুতেই মানবে না। জোর করে স্বীকার করিয়ে নেবে তার মূল্য। তার জীবন কারুর চেয়ে কম নয়।

বিছানার শিয়রের কাছেই টেবিল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল সে টেবিলের কাছে। কনুয়ের ভর দিয়ে টেবিলের ওপর উঠে বসল। কিন্তু কী নিবে সে টেবিল থেকে? কী করবে এখন?

হঠাৎ টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে খুলল। আনন্দে রোমাঞ্চে জলজল করে উঠল তার চোখ। ওই তো বাবার মনিব্যাগটা। হ্যাঁ: ওটা নিয়েই সে আজ দুঃসাহসী কিছু করে বসবে!

মনিব্যাগটা হাতে নিয়ে আবার তার বিছানায় ফিরে গেল খোকন।

একবার চারদিক চেয়ে দেখল। না, কেউ ঢুকছে না এ ঘরে।

ব্যাগটা খুলল খোকন। ওঃ কত টাকার নোট ওগুলো? এক-দুই-তিন। ওঃ কতো—কতো! আঙুলগুলো উত্তেজনায় নিশপিশ করে ওঠে খোকনের।

আর কিছু মনে নেই খোকনের। বাইরে জানালায় একটা কাক কখন থেকে বিশ্রী স্বরে ডেকে চলেছে। উঠোনে ভাইবোনদের কোলাহল ক্রমশঃ মিলিয়ে গেছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেছে খোকন।

হাতের আঙুলগুলো কেবল সমান তালে কাজ করে চলেছে। একটির পর একটি—নোটগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে মেঝের ওপর।

এর পরের ঘটনাগুলো বেশ স্পষ্ট মনে আছে খোকনের।

দিদি প্রথমে ঘরে পা দিয়েই চীৎকার করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল রান্নাঘর থেকে মা, খেলা ফেলে উঠোন থেকে একরাশ ভাইবোন। সকলে হাঁ করে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে খোকনের দিকে, আর টুকরো-টুকরো করা মেঝের ওপর ছড়ানো নোটগুলোর দিকে!

খোকন নিশ্চল পুতুলের মতো নিশ্চিন্তে বসে। তার হঠাৎ মনে হয় সে যেন এক যুদ্ধ-জয়-করা বীরপুরুষ। তার জীবনের দাম সে আদায় করে নিয়েছে।

প্রতিধ্বনির জন্মকথা

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

বর্তমান যুগে ছোট ছেলেমেয়েরাই পরী বা অলৌকিক কাণ্ডকারখানা বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রাচীনকালে প্রায় সবাই এ সব বিশ্বাস করতো আর সে সব সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প বা কিংবদন্তী সত্য বলেই ধরে নিত।

ফাঁকা ও নির্জন জায়গায় তুমি যদি চীৎকার করে কোন কথা বল, তা'হলে তুমি তোমার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। এই প্রতিধ্বনির জন্ম সম্বন্ধে গ্রীস দেশে একটা সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। গ্রীক উপকথা থেকে সেই গল্পটাই এখানে বলব।

প্রাচীন গ্রীসে 'একো' অর্থাৎ প্রতিধ্বনি নামে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিলো। হেসে-খেলে সে খুবই সুখে থাকত। কিন্তু তার একটা দোষ ছিলো—সে অনবরত কথা বলত।

জুনো নামে এক দেবী তখন ভাবলেন, প্রতিধ্বনিকে ওর দোষের জন্য শাস্তি দিতেই হবে। সে সব সময় বাজে কথা অনর্গল বকে। এ ভেবে তিনি 'একো' অর্থাৎ প্রতিধ্বনিকে ডেকে বললেন, তুমি তোমার জিহ্বা আর কণ্ঠস্বরকে এত বার ব্যবহার করেছ যে, আমি সেটাকে বিশ্রাম দিতে চাই। আজ থেকে তুমি যা শুনবে তার শেষ বা শেষ দুটো অক্ষর শুধু উচ্চারণ করতে পারবে।

প্রতিধ্বনি তাঁর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বললো—করতে পারবে।

অভিশাপের ফল ফলেছে দেখে রাণী জুনো জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি বুঝেছ ?

প্রতিধ্বনি উত্তর করলো—বুঝেছ ?

বেচারা প্রতিধ্বনি। এর পর বনের ভিতর গিয়ে একলাই খেলে বেড়াতে লাগলো সে। গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকে, আর যেসব কথা শুনতে পায় তার শেষ কথাটি কেবল বলতে পারে।

একদিন সে এক যুবককে তীর-ধনুক হাতে—সেই বনের ভিতর দেখলো। সে খুবই বলবান্, দেখে বেশ সুখী বলেই মনে হয়। প্রতিধ্বনি যুবককে ভালোবেসে ফেললো। সে তার সঙ্গে মিশতে চাইলেও দৃষ্টির আড়ালে থাকলো লুকিয়ে। কেননা সে যে কথা বলতে পারে না—এটা অন্য কাউকে জানাবার ইচ্ছা তার ছিলো না।

যুবক ছিলো শিকারী—সে তীর ছুঁড়লো। প্রতিধ্বনি উঁকি দিয়ে দেখলো। তারপর যুবক বনের ভিতর-দিয়ে দৌড়িয়ে চললে সেও তার পিছনে পিছনে চললো। কিন্তু—সব সময়ই যুবকের দৃষ্টির বাইরে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরে যুবক খুঁজতে লাগলো কোথায় তার অন্যান্য বন্ধুরা গেল। তারা প্রথমে একসঙ্গেই শিকারে বেরিয়েছিল। সুতরাং সে চীৎকার করে ডেকে বললো,—তোমরা কোথায় ?

এ কথায় সুমিষ্ট গলায় কাছ থেকে উত্তর এলো—কোথায় ?

যুবক খুব আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—ওখানে কে আছ ?

কে আছ ?—প্রতিধ্বনি উত্তর করলো।

যুবক কিছু বুঝতে না পেরে আবার বললো—আমাকে বল, তুমি কে ?

'তুমি কে'—উত্তর ফিরে এলো।

তখন সেই যুবক গাছের আশেপাশে এমন কি ডালপালা পর্যন্ত খুঁজে দেখলো, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। তখন সে বললো—যেই থাকো, দয়া করে আমাকে দেখা দাও।

উত্তর হলো—'দেখা দাও।'

প্রতিধ্বনি আর নিজেকে গোপন রাখতে পারলো না। সে যুবকের সামনে এসে দাঁড়ালো। যুবককে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিলো কিন্তু—কোন কথাই প্রকাশ করে বলবার ক্ষমতা তার ছিলো না।

এদিকে ঐ যুবক এ পর্যন্ত কাউকে ভালবাসেনি। সুতরাং প্রতিধ্বনির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই সে তার বন্ধুদের খুঁজতে—বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

যুবকের ব্যবহারে প্রতিধ্বনি খুবই দুঃখিত হয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো, যাতে আর কেউ না তাকে দেখতে পায়।

এইভাবে দিনের পর দিন প্রতিধ্বনি বনে সেই সুন্দর শিকারী যুবকের কথা ভেবে শীর্ণ ও পাণ্ডুর হয়ে গেল। শরীর ঠিক রাখবার জন্য প্রয়োজন মত খাওয়াদাওয়াও সে ত্যাগ করলো।

কিছুদিন পরে অনাহারেই দিন কাটাতে লাগলো তার। কিন্তু তখনও সকলের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রইলো সে। এভাবে থাকতে থাকতে একদিন প্রতিধ্বনি মারা গেল।

কালের গতিতে তার দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার গলার স্বর রয়ে গেল পৃথিবীতে। তাই নির্জন জায়গায় বা কোন জলাশয়ের কাছে চীৎকার করলে বা জোরে কথা বললে এখনও কথার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে।

প্রতিধ্বনি সম্বন্ধে গ্রীক উপকথায় এই ধরণের উল্লেখ থাকলেও, বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু 'একো' সম্বন্ধে অন্য কথা বলেছেন।

রামধনু

শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তীরে কেঁদে বলল : দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। আজও আমার বন্ধুর দেখা পেলুম না।

নদী ছুটে এসে বলল : এই যে আমি।

তীর বলল : তুমি এসেছ? দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে আমার চোখ যে অন্ধ হয়ে এসেছে মিতা। দেখো, আজ আমি রিক্ত। বুকের সব মধু শুকিয়ে গেছে, আমার দিগন্তে-লোটান সবুজ এলো চুল হয়েছে রুক্ষ, বিপর্যস্ত। আমাকে ভুলে কোথায় ছিলে এতদিন? আর কখনো···একি, এ কিসের আওয়াজ মিতা?

নদী বলল : মানুষ যে আমায় আটকে রেখেছিল বন্ধু। তাদের শিকল ছিঁড়ে আমায় আসতে হয়েছে। তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে কি পারি?

তীর আর্তনাদ করে উঠল : না না, থামাও···শান্ত হও। তোমার ফেনার মুকুট-পরা রুদ্রমূর্তি, তাথিয়া নাচ, ছলছল খলখল কলকল্লোল আর চোখ চেয়ে দেখতে পারছিনে। আমার জীর্ণ ফাটা তৃষ্ণার্ত বুক তোমার অশান্ত পরশে শান্ত স্নিগ্ধ হচ্ছে···আমার ধূলিলাঞ্ছিত রুক্ষচুল তোমার জলসিঞ্চনে সবুজ হয়ে উঠছে,···তবু···তবু মিনতি করছি, তুমি থামো। বন্ধ কর এই ভৈরব-নৃত্য।

চেয়ে দেখো অসহায় মানুষ ত্রস্তপদে দিকে দিকে ছুটে ফিরছে। তাদের সৃষ্টি, তাদের স্বপ্ন, তোমার উন্মাদ স্পর্শে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। মিতা, বন্ধু থাম, আমি যে মা—টী, সন্তানের দুর্দশা দেখব কি করে?

নদী বলল : তুমি আমার বন্ধু, তবু তোমার মাতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার না করে পারলুম না। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ তোমার বুক-চিরে সব ঐশ্বর্য অপহরণ করে, রিক্ত পঙ্গু ভেবে পদাঘাতে তোমায় দূরে সরিয়ে দিয়ে, নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা হতে চেয়েছে। অথচ তার জন্যই তোমার এত দরদ? সত্যি মিতা···এক অনির্বচনীয় উপলব্ধি আমার চোখে তোমাকে ভাস্কর করে তুলছে। তুমি শুধু ধরিত্রিই নও, জননী বসুন্ধরাও।

মাতৃস্নেহে অন্ধ তোমার চোখ। তাইত' দেখতে পাচ্ছনা। ভয় কি? পেছনে চেয়ে দেখো ত'?

তীর বলল : চর! আরো উর্বরা, আরো সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন মাটি জেগে উঠছে। ও যে আমারই হারানো সত্তা; সিন্ধুর স্নিগ্ধ অঙ্কে। আগামী সৃষ্টির স্বপ্নে অনন্ত-সমাধিতে মগ্ন ছিল!

নদী বলল : মহাকালের নির্দেশ সকলকেই যে মানতে হবে মিতা। তোমার মাতৃত্ব যেমন সত্য, এও তেমনি মিথ্যা নয়। সামনের ধ্বংসই তুমি দেখলে, পেছনের সৃষ্টি তোমার চোখ এড়িয়ে গেল কেন?

ওখানেই আবার নতুন করে জনপদ গড়ে উঠবে।
নতুনতর সৃষ্টির স্বপ্নে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।
আকাশের রামধনুতে ওই দেখ তারই প্রতিচ্ছবি।

ছেলেমানুষের পছন্দ

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

প্রতিবেশীর কন্যা সুশীর
আজ রাত্রে বিয়ে—
রাত্রি ন'টায় ঘাটায়পটায়
বিয়ে দেখ্‌ব' গিয়ে।
এখন সকাল, আস্‌বে বিকাল
সন্ধ্যা তাহার পর—
সন্ধ্যার পর নয়নগোচর
হ'বে সুশীর বর।
সকাল এখন, খুব, আয়োজন
চল্‌ছে বিয়ে বাড়ী—
আজেবাজে অনেক কাজে
হল্লা তাড়াতাড়ি।
চল্‌ছে বুঝি খোঁজাখুঁজি
জরুরী যা' তারই—
প্রশ্নমালা কানে তালা
লাগিয়ে দিলে ভারী।
জাঁতা ঘর্ঘর ভাঙ্‌ছে মটর—
তেতো ডাল-ও হবে;
শিশুদের ঐ কান্না ক্ষিদের
ভাব্‌ছি থাম্‌বে কবে!
গন্ধ ঘিয়ের অঙ্গ বিয়ের—
পাচ্ছি ক্ষণে-ক্ষণে;
পাড়ার বেবাক কুত্তার ডাক
রাগ ধরাচ্ছে মনে।
খুব চীৎকার—কে বা কাহার
কথা তোলে কানে!

এমন কথা হ'চ্ছে তথা
নাইকো যাহার মানে—
মানে, মানুষ প্রায় বেহুঁশ,
চেঁচিয়ে যাচ্ছে' খালি—
সেই পুলকেই যে-সেই
খাচ্ছে কপট গালি।
লোভের দরুণ বাচ্চারা খুন—
"ঐটে আমায় দাও"···
খাচ্ছে তাড়া: "লক্ষীছাড়া,
এখন সরে যাও।"
"ওরে, পোষাক খুলে রাখ্‌;
পরবি সন্ধ্যাবেলা—
বল্‌ছেন মা: "দে রে ক্ষমা;
কর্‌না নিয়ে খেলা।"
কয়লার আঁচ তরকারি মাছ
জুত্‌সই ত' নয়!
কেলেঙ্কারি হ'বে ভারী,
করছে ঠাকুর ভয়।
ঝি ঠাকুরে নানান্ সুরে
হচ্ছে বিবাদ ঢের—
ধমক্ খেয়ে থেমে যেয়ে
করছে সুরু ফের।
এঁটো পাতা, আরও যা-তা',
ফেল্‌ছে এনে ঝি—
তারই জয় অকুতোভয়
যে-কুকুরটা তেজী।

সন্ধ্যাবেলা আলো মেলা
জল্‌ল' কেবল আজই ;
তিন্‌টে ছেলে ফুর্তি পেলে
ছুটিয়ে ছুঁচোবাজী।
বরের আশায় বাড়ী বাসায়
ব্যাকুল হ'ল লোক—
পাম্প্‌-সু পায় মালা-গলায়
বড় জুড়োবে চোখ।
যাচ্ছে' সময়— আর নাহি সয় ;
দেরি হ'চ্ছে ভারী···
এম্‌নি যখন অধীর মন
তখন এল গাড়ী—
মস্ত ক্রুহাম, অনেক দাম—
লাগ্‌ল' এসে ধীরে ;
হুলু শাঁখে হাঁকে-ডাকে
আকাশ গেল চিরে।
দর্পণ হাতে বরের সাথে
বরযাত্রী মেলা—
সুদর্শন তারা একজন
বরকে দিল ঠ্যালা ;
ঠেলে তারে একেবারে
তুলে খাড়া ক'রে
হাতে একটা লাঠি মোটা
দিয়ে রাখ্‌ল ধ'রে ;

বল্‌লে : "ঈশান, খুব সাবধান !
পা নামাচ্ছ, দেখো—
লাঠির উপর দেহের ভর
শক্ত ক'রে রেখো।"
সব আনন্দ হ'ল মন্দ—
মলিন হ'ল মুখ
ঘটনাটি করল' মাটি
বরকে দেখার সুখ ;
একটু দেখে একে একে
সবাই গেলাম স'রে—
হ'ল মনে : সেইক্ষণে,
দামী কাপড় প'রে
বসে আছে মায়ের কাছে
ক'নে একটি কোণে ;
যাচ্ছে এ বর অসুন্দর
বস্‌তে বরাসনে !
কুঁজো, বেতো, নেশা খেতো,
তেজপক্ষের বর—
নাতির বয়স বছর দশ,
শুন্‌লাম পরস্পর।
মিছি মিছি 'ছি ছি ছি ছি'
করলে পুরুষ-নারী
বিয়ের রাতে ; বরের তা'তে
বয়েই গেল ভারী।

খরগোসের গল্প

(তুরস্কের রূপকথা)

শ্রীপবিত্র দাস

কোন এক দেশে তিনটি বাচ্চা খরগোস ছিল। তারা তাদের বাবা মার সঙ্গে সরু একটি গভীর গর্তে বাস করত। একদিন তাদের বাবা সবাইকে ডেকে বলল, "দেখ, আমি তোমাদের একটি কথা বলব, বেশ মন দিয়ে শোন।"

বাচ্চা তিনটির কান খাড়া হয়ে উঠল।

বাবা বলতে আরম্ভ করল, "দেখ, এখন তোমরা বড় হয়েছ। আজ তোমাদের বয়স একমাস হ'বে। আজ রাত্রে বা কাল আবার তোমাদের কয়েক ভাইবোন জন্ম নেবে। আমাদের এই সরু গর্তে সবার আর থাকবার জায়গা হবে না, তাই বলছি, তোমরা বাইরে কোথাও গর্ত খুঁড়ে নিজেরা নিজের বাসা তৈরী করে নাও। তোমরা কিছু মনে করো না, এইটিই হচ্ছে আমাদের খরগোস মুলুকের নিয়ম। এমনিভাবে আমাদেরও একদিন বাবার বাড়ী ছেড়ে অন্য জায়গায় বাসা তৈরী করে নিতে হয়েছিল। তবে দেখ, আমাদের ধারে-কাছেই বাসা কর, যাতে সব সময় দেখা হ'তে পারে।"

"বাচ্চা তিনটি কি আর করে, বাবা মার কাছে বিদায় নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল।

প্রথম বাচ্চাটি বলল, "আমি এখানে কিছুতেই থাকব না আর এরকম গর্তও খুঁড়ব না। নর্দমার মত বাবার ঐ গর্তে থেকে শরীরটা আমার একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। সুন্দর জায়গার ত' আর অভাব নেই। বনের কাছে সুন্দর একটি জায়গা বেছে নিয়ে সুন্দর একটি ঘর করে আমি বাস করব। যখন খুসী বেরিয়ে গিয়ে পেট পুরে খেয়ে আসব, আর ঘরে বসে জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করব।"

সে নিজের মনের মত খড়কুটো বাঁশ জোগাড় করে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর একটি ছোট ঘর করে ভিতরে গিলে শুয়ে পড়ল। একটু যেতে না যেতেই তার খুব ক্ষিধে পেল। খাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি মাঠে বসতেই এক খেঁকশিয়াল এসে হাজির হয়ে বলল, "আর শোন ভাই, শোন, এসনা আমরা দু'জনায় গল্প করি। দৌড়ে পালিয়ে যেও না আমি তোমার কিচ্ছু করব না।"

"ওরে ও দুষ্ট খেঁকশিয়াল, ভেবেছো আমায় ধরে তুমি খাবে—সে হচ্ছে না—" বলেই বাচ্চাটি ছুটে নিজের বাসায় গিয়ে ঢুকল। একটু পরেই শিয়াল ভায়া এসে হাজির হ'ল, ঘরদোর ভেঙে বাচ্চাটিকে ধরে বেশ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

দ্বিতীয় বাচ্চাটি বলল, "আমি যা করব তা আমার মনেই আছে। আমি বাবা ঐ অন্ধকার গর্তে থাকতে পারব না। আমি দেখে-শুনে কোন একটা গাছের গুঁড়িতে বাসা করব।"

এ বাচ্চাটিও প্রথমটির মত নিজের মতলব মত খড়কুটো জোগাড় করে একটি গাছের গুঁড়িতে জড় করে সে তার ভিতরে গিয়ে বসল। ক্ষিধে পেতে সে বেরিয়ে এল। সবুজ কচি ঘাসে-ঢাকা একটি মাঠে বাচ্চাটিকে চরতে দেখে খেঁকশিয়ালটি তার কাছে আসতে আসতে বলল, "শোন ভাই, শোন, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। দৌড়ে পালিয়ে যেও না ভাই—আমি কিছু করব না।"

ভয়ে বাচ্চাটির কান দুটো খাড়া হ'য়ে উঠল। বাচ্চাটি বলল, "ওরে ও দুষ্ট খেঁকশিয়াল, তুমি যে কি বলবে তা আমার জানা আছে। তুমি আমায় খেতে চাও—সে হচ্ছে না!"

বাচ্চাটি এক দৌড়ে তার বাসয় গিয়ে ঢুকল।

পাখীর মত বাসা দেখে খেঁকশিয়ালটি হেসে উঠল, বলল, "এবার তোমায় দেখাচ্ছি রোস। আমি তোমায় খেয়েই ফেলব। একেবারেই আমি তোমায় মুখে পুরে দেব।"

দেখতে না দেখতেই খেঁকশিয়ালটি বাসার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বচ্চাটির টুঁটি চেপে ধরল। তারপর খাওয়াদাওয়া শেষ করে জিভ দিয়ে মুখ চাটতে চাটতে শিয়াল ভায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌ল।

এবার তৃতীয় বাচ্চাটির কথা বলছি শোন। সে বলল, "আমি বাবার কাছেই বাসা করব। বাসাটাও হ'বে বাবার মতই, তবে আমারটা হবে আরও একটু গভীর ও লম্বা।"

সে ধারে কাছে একটি জায়গা বেছে নিয়ে দিনরাত্রি পরিশ্রম করে গর্ত খুঁড়ে ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে রইল। ক্ষিধে পেতে বেরিয়ে একটি মাঠে যেতেই খেঁকশিয়ালটির সঙ্গে তারও হ'ল দেখা।

এ বাচ্চাটিকে দেখেও খেঁকশিয়ালটি ডেকে বলল, "আরে শোন, শোন, আমার কাছে এস—আমি কিছু করব না।"

"ওরে, ও দুষ্ট খেঁকশিয়াল, তুমি ভেবেছ আমি তোমার মতলব জানি না—তাই না? আমি সব জানি। তুমিই কাল আমার দুই ভাইকে খেয়েছ!" বলে বাচ্চাটি দৌড়ে গিয়ে তার গর্তে ঢুকে বসে রইল। শিয়াল ভায়া তার গর্তের কাছে গিয়ে কয়েকবার ঢোকার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু সে গর্ত এমনি যে, তার ভিতর ঢোকার তার সাধ্য নেই! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শিয়াল ভায়া ফিরে যেতে বাধ্য হ'ল।

নিজেদের বুদ্ধির দোষে প্রথম দু'টি বাচ্চা প্রাণ হারাল। তারা যদি বুঝত যে পাখীর বাসা খরগোসের কোন কাজেই আসে না, তা'হলে তারাও তৃতীয় বাচ্চাটির মত শিয়াল ভায়ার হাত থেকে রক্ষা পেত।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভোম্বল বললে—তা দিচ্ছি—কিন্তু আমি ভাবছি…

রাতুল বললে—থাকতে এলুম—দিবিনে থাকতে তোর কাছে? এই দু'তিন দিনের জন্যে বড় জোর—

ভোম্বল কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—থাক তুই, তার জন্যে কিছু নয়, কিন্তু কেন?

—সে যে কেন তা তুই এখন জিগ্যেস করিস নি, একদিন সময় হলে সব বলবো তোকে, এতদিন একসঙ্গে কাটালুম, একবার আমার নামটাও জিগ্যেস করিসনি তুই, আজও তাই জিগ্যেস করতে বারণ করছি—কেন নিজের বাড়ি ছেড়ে তোর কাছে ফিরে এসেছি! তিন চারটে দিন থাকত দে তোর কাছে—

ভোম্বল কী যেন ভাবতে লাগলো।

রাতুল বললে—তোর পায়ে পড়ছি ভোম্বল, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই তোর—

ভোম্বল বললে—কিন্তু জাহাজ যদি তার আগেই ছেড়ে দেয়? তখন কী করবি?

—কবে ছাড়বে তোদের জাহাজ?

—ঠিক নেই, কিন্তু দু'তিন দিনের মধ্যেই।—

রাতুল বললে—সেই দু'তিন দিনই তো থাকি—তা'র আগেও অবিশ্যি আমার কাজ হয়ে যেতে পারে—এতই যখন করেছিস্—আর একটু কষ্ট কর্, আর অন্ততঃ দু'টো দিন—

দুটো দিন!

ঝাঁঝাঁ করছে রদ্দুর। চারিদিকে শুধু জল, ডেক, ক্রেইন্ আর কয়লা। কড় কড় শব্দে ক্রেইন নামছে। আবার উঠছে। অন্ধকারে ডেকের তলায় নিয়ে গেল ভোম্বল। ছোট একটা প্যাকিং কেস্ দেখিয়ে দিয়ে বললে—এইখানে বোস্ তুই—দেখি মহারাজকে বলে, ভাঁড়ারে কিছু খাবার-দাবার আছে কিনা—

* * * * *

ক্রমে রাত হলো। আলোর মালা পরে সমস্ত ডক্ যেন নতুন করে সেজে উঠলো। আর কতদিন! কতদিনকার প্রতীক্ষা! জাহাজের অন্ধকার ডেকের উপর বসে রাতুল আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অসংখ্য তারার ভিড়! একটা তারা বুঝি খসে পড়ল। পড়তে পড়তে অনেক দূর নিচেয় নেমে এসে কোথায় শূন্যে হারিয়ে গেল ঠিক নেই। হঠাৎ মনে হলো অনেক উঁচু দিয়ে যেন একটা তারা সোজা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে চলেছে। ওটা কি তারা না এরোপ্লেন! এরোপ্লেন আসছে বহু দূরের বার্তা নিয়ে। অজানা পৃথিবীর রহস্য উন্মোচন করবে ও।

এডেন-এর সেই বন্দরে এতক্ষণ কি উটের পিঠে চড়ে ডাক-পিওন চলেছে। না সাইকেল, কিম্বা জিপ্-গাড়ীতে চলেছে আরবী পিওন! চায়ের দোকানে এখনও কি তেমনি রেডিও চলছে আজও। রাত কত হলো এখন। ভবতোষবাবুর কি বাঙলা গান শোনবার সময় হলো!

টেলিগ্রামটা এতক্ষণে নিশ্চয় পৌঁছে গেছে। হঠাৎ টেলিগ্রামটা পড়ে একটু আশ্চর্য হয়ে যাবে বৈকি। হয়ত ভাববে—কোথা থেকে কে তাকে টেলিগ্রাম করে বসলো। এতদিন পরে হঠাৎ হরিদাসের খোঁজ পাওয়ার আনন্দে হয়ত সেই মুহূর্তেই বন্ধ করবে দোকান। বলবে—আজ তোমাদের সব ছুটি ভাই—বন্ধ কর দোকান—সব ঘরে যাও—

কর্মচারীরা বলবে—খদ্দেররা সব ফিরে যাবে যে—

—যাক্ সে ফিরে—দরকার নেই দোকানের। হরিদাসকে পাওয়া গেলে দোকান নিয়ে কী হবে। অমন একশোটা দোকান চালাতে পারবে ভবতোষবাবু।

হয়ত এতক্ষণে ভবতোষবাবু জাহাজের সন্ধানে ব্যস্ত। কিন্তু যদি এরোপ্লেন পাওয়া যায়—তাইতেই বোধ হয় আসবে ভবতোষবাবু। তাড়াতাড়ি আসবার জন্যেই তো লিখেছে রাতুল।

রাতুলের ঘুম আসে না। ডেকের অন্ধকারে বসে নিজের ভাগ্যকে নিয়ে ভাবতে ভাল লাগে। বেশ মজা হবে। এতবড় একটা নাটকের প্লট জমেছিল তার জীবনে কে জানতো! কিন্তু সবে তো এখন চতুর্থ অঙ্ক—এর পর যখন পঞ্চম অঙ্কের সুরু হবে, তখন দেখা যাবে—ষ্টেজের ওপর হাজির হয়েছে ভবতোষবাবু, জাল-রাতুলকে দেখিয়ে বলছে—এ যে আমার বন্ধু হরিদাস—এর জন্যে এতদিন ধরে কত জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছি—এর নাম

রাতুল কোনও কালে নয়—আমি আমার বন্ধুকে পেয়ে খুসী হয়েছি আজ—কিন্তু ডাক্তার নিত্যানন্দ সেনকে অতি দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে—এ তাঁর ছেলে নয়—

পঞ্চম অঙ্ক। সেই পঞ্চম অঙ্কের শেষ যবনিকা পড়বার আগে রাতুলের আবির্ভাব হবে। নতুন করে পুনর্জন্ম নেবে রাতুল সেন—কেস নম্বর ৪৯—।

অন্ধকার ডেকের ওপর বসে সেই দিনটার জন্যে রাতুল মুহূর্ত গুণতে লাগলো। পাশে ঘুমোচ্ছে ভোম্বল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে।

হঠাৎ হাউ মাউ শব্দে কেঁদে উঠলো ভোম্বল। নিজের কান্নার শব্দে নিজেই জেগে উঠেছে। বললে—ভারী একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম রে—

রাতুল জিজ্ঞেস করলে—কিসের স্বপ্ন ?

—বড় খারাপ স্বপ্ন ভাই, মনে হলো, তুই যেন ডুবে গেলি—

হাসলো রাতুল। বললে—কেন—ডুববো কেন—?

ভোম্বল বললে—স্বপ্ন মিথ্যে, কিন্তু···মনে হলো সমুদ্রে আমাদের জাহাজটা হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটায় উল্টে গেছে—সবাই জলে ভাসছি, চারদিকে হাঙর আর কুমীর—অনেক দিন ভাসতে ভাসতে চলেছি তুই আর আমি—শেষকালে একটা জাহাজ এসে আমাদের তুলে নিলে—কিন্তু পেছন ফিরে দেখি তুই নেই—ভালো করে চেয়ে দেখি—তুই তখনও জলে ভাসছিস্—। সবাইকে বললাম—ওকে তোল—ওকেও তোল—কেউ শুনলে না, ওরা বললে—ও মরে গেছে—। মনে হলো সবাই মিথ্যে কথা বলছে। তোকে বাঁচাবার জন্যে আমি জলে ঝাঁপ দিলুম—কিন্তু কোথা থেকে একটা মস্ত ঢেউ এল—আর তুই ডুবে গেলি—সঙ্গে সঙ্গে আমি হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠলুম—

রাতুল ভোম্বলের কথা শুনে হেসে উঠলো আবার। বললে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখে গেছেন—স্বপ্ন মিথ্যা—

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু নিজের বাড়ি ছেড়ে কেন তুই এখানে এলি—সেইটেই বুঝতে পারছিনে আমি—

—আর দু'তিনটে দিন সবুর কর—সব জানতে পারবি—বলে সেই খোলা আকাশের নিচে তারাদের মুখোমুখি ডেকের ওপর শুয়ে পড়লো রাতুল।

* * * * *

সকালবেলার খিদিরপুরের ডক এলাকা! রাত থাকতে বাঁশি বাজে। ভোর হবার আগেই সকাল হয়। কাজ আরম্ভ হয় ঘুম ভাঙবার আগেই।

ভোর বেলা খবরের কাগজটা পড়েই হো হো করে হেসে উঠলো রাতুল।

হঠাৎ যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে। পাশ দিয়ে হন্ হন্ করে কে যেন যাচ্ছিল। চোখ চাইতেই রাতুল দেখলে—গুদামবাবু—

গুদামবাবু চলতে চলতে বলছেন—ঝকমারী হয়েছে গুদামের কাজ করা—এক কাজ করতে করতে আর এক কাজের ডাক—

ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

রাতুল আবার মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো। কাগজে বাবা বিবৃতি দিয়েছেন। লম্বা বিবৃতি।

বাবা লিখেছেন: আমি আর একবার প্রমাণ করিলাম মৃত্যুর পর আমরা ওপারে ঠিক এপারের মতই বাস করি। শুধু জড়দেহ থাকেনা বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারি না। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পর আমরা আত্মাকে ইচ্ছামত এপারে আহ্বান করিতে পারি, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারি, এমন কি তাহাকে দেখিতে পর্যন্ত সমর্থ হই। আমার এ-কথা আরব্য উপন্যাস নয়—যাহারা অবিশ্বাসী তাঁহারাই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া হরিদাস ঘোষ নামক একটি বালককে আমার পুত্র বলিয়া চালাইয়া দিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন—লোকচক্ষে আমাকে হেয় এবং মিথ্যাবাদী ভণ্ড বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন।···জগতের সমস্ত ধর্মমত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে, প্রত্যেক মানবের জড়দেহের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম দেহধারী এমন একটা জিনিস আছে যাহা অমর, যাহার বিনাশ নাই—এই অমর জিনিসকেই আত্মা বলা হয়—যাহা হউক, যাহারা আমার অনুরাগী তাঁহারা নিশ্চয়ই এই মিথ্যা-প্রচারে ভুলিবেন না বা ভুলেন নাই। যাহাকে 'রাতুল' বলিয়া হাজির করা হইয়াছিল, তাহার বন্ধু ভবতোষ মিত্র সুদূর এডেন হইতে আসিয়া সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন।—আজ সকলকে সভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করি। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের সম্মুখে নিজের বক্তব্য পেশ করিবেন—এবং··· আশাকরি এবার আর কাহারো সন্দেহ থাকিবে না যে, আমি যাহা এতদিন ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছি সমস্ত সত্য। আমার পুত্র জড়দেহ ত্যাগ করিয়া এখন সূক্ষ্ম-আত্মা লইয়া পরলোকে বাস করিতেছে—ইহাই সত্য। তাহা না হইলে আমার এতদিনকার সাধনা, গবেষণা, বিদ্যা, বুদ্ধি সমস্ত মিথ্যা—ইত্যাদি ইত্যাদি—

পড়তে পড়তে রাতুলের আবার ভীষণ হাসি এল। সত্যিই যখন এবার সে নিজে আত্মপ্রকাশ করবে, তখনই চূড়ান্ত যবনিকা পড়বে—তার নাটকের শেষ অঙ্কে। অনেক পথ চলার পর, এবার চলার পথের শেষ মিলবে। কোথায় যেন কোন্ বইতে পড়েছিল—আবার

সেই কথাটা মনে পড়ল তার ; পৃথিবী গোল—সে গোলাকার পৃথিবী, ভূগোলের পৃথিবী ; মানুষের পৃথিবী বড় বন্ধুর, বড় চড়াই-উৎরাই, এ পৃথিবীতে খানা-খন্দ অনেক, অনেক প্রতিবন্ধক, অনেক দুঃখের পাহাড়, অনেক চোখের জলের সমুদ্র এখানে।—

ভোম্বল এল। বললে—তোকে তাড়াতাড়ি খবরটা দিতে এলাম—

—কী ?

—আজ রাত্রে আমাদের জাহাজ ছাড়বে—

—কখন, ক'টার সময় ? রাতুল জিজ্ঞেস করলে।

—তা' ঠিক নেই, সন্ধ্যেবেলাও ছাড়তে পারে—আবার রাত দু'টোও হতে পারে।

রাতুল বললে—আজই তা'হলে তোর সঙ্গে শেষ দেখা ? আবার কতদিন পরে আসবি ?

—তার কি ঠিক আছে। হয়ত আর ফিরেই আসবো না। হয়ত টিম্বাক্টু কিম্বা কিম্বারলিতে নেবে যাবো—আমার কিসের টান বল, তোর মতন নিজের বাবা মাও নেই, নিজের দেশও নেই—সব জাতই আমার স্বজাত, সব দেশই আমার স্বদেশ—

—আমি চলে যাবার আগে নাম জিজ্ঞেস করবার লোভ হচ্ছেনা তোর ?

ভোম্বল হাসলো। হাসতে হাসতে বললে—আমি কাঁদিনা কখনও—কিন্তু তুই দেখছি আমাকে না কাঁদিয়ে ছাড়বি না ভাই—

ব'লে ভোম্বল আর কিছু কথা না কয়ে হঠাৎ ওধারে হন্ হন্ করে চলে গেল। আর ফিরে এল না।

বেলা বাড়ছে। কে একজন এসে দুপুরবেলা রাতুলের জন্যে একথালা ভাত দিয়ে গেল। রাতুল জিজ্ঞেস করলে—কার জন্যে ? কে পাঠিয়েছে ?

—ভোম্বল—বলে লোকটা চলে গেল।

তারপর ক্রমে দুপুর বাড়তে লাগলো। খিদিরপুরের ডকের বাতাসে অনেক কয়লার গুঁড়ো আর গরমের হল্‌কা এসে লাগলো মুখে। একবারও ভোম্বল এল না, দুপুর একটার ঘণ্টা বাজলো। দুটোর ঘণ্টা ; বাজলো তিনটের। তারপর চারটের। আর অপেক্ষা করা যায় না। ওদিকে মিটিং আরম্ভ সাড়ে পাঁচটায়। আস্তে আস্তে জাহাজের বাইরে এসে ভোম্বলের চেনা মুখটার জন্যে চারদিকে চাইতে লাগলো। কিন্তু যে ধরা দেবেনা, তাকে ধরতে যাওয়া বৃথা।

একলা ডক পেরিয়ে এসে ট্রামে উঠলো রাতুল। আর বেশি দেরি নেই। সভায় আসবে বাবা। আর আসবে ভবতোষবাবু। রাতুলের টেলিগ্রাম পেয়েই এসে গেছে।

নিশ্চয়ই প্লেন-এ করে এসে গেছে। আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা হবে! জাল-রাতুল তার স্বস্থানে ফিরে যাবে—আর…আর…আর—

*   *   *   *   *   *

বিরাট সভা বসেছে। মাঝখানে বসে আছে নিত্যানন্দ সেন। আশেপাশে আরো অনেক লোক। ভবতোষবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা দিলে।

অনেক কথা বললে। বললে—আপনারা যাকে রাতুল সেন বলে জানেন, সে আমার বন্ধু হরিদাস। হরিদাস ঘোষ। এই দেখুন তার ফোটো। আমরা দু'জনে এক গাঁয়ে মানুষ—একসঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম—একসঙ্গে চায়ের দোকান করেছিলাম—

তারপর ভবতোষবাবু সমস্ত ইতিহাস বলে গেল তার। কবে গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়ে, কোথা দিয়ে কেমন করে এডেন-এ গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তারা। তারপর হরিদাসের কেমন সব সময়েই সন্ন্যাসী হয়ে যাবার ঝোঁক। তারপর একদিন কেমন করে হঠাৎ হরিদাস নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কেমন করে ভবতোষবাবু সমস্ত জায়গা ঘুরেছে। তারপর সেই দাদামশাই-এর দু'লক্ষ টাকার উইলের কথাটাও বললে।

তারপর ভবতোষবাবু বললে—আমি প্রেততত্ত্ব বা পরলোকতত্ত্ব বুঝি না, আমি এসেছি আমার বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে—বর্মায়। যেখানে সে গিয়ে দাঁড়ালেই দু'লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যাবে—আর আরো এসেছি একথা বলতে যে, এ ভদ্রলোকের নাম রাতুল নয়, প্রফেসার নিত্যানন্দ সেন-এর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই—আমার বন্ধু হরিদাস আপনাদের সামনে নিজেই তার আত্মপরিচয় বলতে রাজী হয়েছে—

সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

গেরুয়া কাপড় পরা হরিদাস এবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় চোখ নীচু করে বললে—আমি হরিদাস ঘোষ—আমার নাম রাতুল সেন নয়—আমি সন্যাসী, আমার অন্য কোনও পরিচয়ই থাকা উচিত নয়—তবু সকলের অনুরোধে আমি আমার পূর্ব-পরিচয় প্রকাশ করলাম—

কিছু শোনা গেল, কিছু শোনা গেল না। তবু চারদিকে তুমুল হাততালি হতে লাগলো। সমস্ত সভায় আজ জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে নিত্যানন্দ সেনের বক্তৃতা শোনবার জন্যে। তিনি উঠলেন। আজ তাঁর গলায় আবার ফুলের মালা, আজ তাঁর চোখ আনন্দ-উজ্জ্বল। আজ সাফল্যের জ্যোতিতে তিনি ভাস্বর। রাত্রের দুঃস্বপ্নের পর আজ তাঁর নব-জাগরণ হয়েছে। তিনি বললেন—বন্ধুগণ, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ—

সমস্ত সভায় ছুঁচ পড়লে বুঝি শব্দ হবে—এমনি নিস্তব্ধতা।

—মূককে যিনি বাচাল করেন, পঙ্গুকে যিনি গিরি লঙ্ঘন করতে শেখান, আমি সেই অনন্ত অনাদি পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।

আবার হাততালি পড়লো।

—মানব-সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত যত কিছু দেখেছি, তার মধ্যে ভারতবর্ষের ঋষিদের জ্ঞানরাজ্যে দু'টি বিষয়ের গবেষণার গুরুত্ব সর্বাধিক। আমাদের জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হিসেবে তা' অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলে মনে হয়। সে দু'টি বিষয় হচ্ছে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মৃত্যু-রহস্য—

তারপর একে একে নিত্যানন্দ সেন সুরু হতে শেষ পর্যন্ত বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ঈশ্বর, ইহলোক, পরলোক সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা বললেন। যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর দুই পত্নীকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন, তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন—"যেনাহং নামৃতো স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।" অর্থাৎ, "যার দ্বারা আমি অমৃতা না হবো তা নিয়ে আমি কী করবো!" আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই বাণী বার বার নানাভাবে ধ্বনিত হচ্ছে—"কেমন করে সেই মৃত্যুকে এড়ানো যায়।" ইস্‌লাম ধর্মে মৃত্যুকে 'ইন্তেকাল' বলে। এই শব্দের অর্থ 'পরিবর্তন', এই মতে আত্মার নাশ হয় না। কোরাণ শরীফে আছে, "আমরা এ-জগতে খেলনার মত সৃষ্ট হইনি, আমাদের দেহত্যাগের পর অনন্ত জীবনের আরম্ভ হবে।" গীতা এ-যুগের মহাবেদ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

অর্থাৎ আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। জন্মগ্রহণ না করেও এর অস্তিত্ব থাকে। ইহা সর্বদাই আছে, ইহা জন্মরহিত, নিত্য এবং প্রাচীন, শরীর শেষ হলেও ইহার নাশ হয় না—এই তো গেল আত্মার কথা—

বলে নিত্যানন্দ সেন রুমাল দিয়ে মুখটা মুছলেন—তারপর বললেন—

—আত্মার অস্তিত্বের স্বীকার সম্বন্ধে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মমত বিন্দুমাত্রও ইতস্তত: করেনি। কিন্তু আমি আজ দেখাবো—আত্মা শুধু অমরই নয়, আত্মাকে আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ

করতেও পারি। আমার পরলোকগত পুত্র রাতুলের কথাই বলি।—তার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পর আমি তা'র যে ফটোগ্রাফ তুলেছি, তা-ও আমার সঙ্গে আছে, আপনাদের আজ তা' দেখাবো,—। তার আগে এখানে হয়ত অনেকে আছেন যাঁরা আমার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করতে পারছেন না, কিন্তু আজ বোধ হয় একটা বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, রাতুল আজ আর বেঁচে নেই—এ-পৃথিবীতে। পিতার পক্ষে পুত্র-শোক যে কত মর্মান্তিক তা পিতা মাত্রেই অনুমান করতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার তোয়াক্কা করে না—আমার পুত্রশোক যত বড় সত্যই হোক—আমার বিজ্ঞান তার চেয়ে আরো বড় সত্য—। সেই বিজ্ঞান-লব্ধ সত্যের ভিত্তিতেই আমি আজ বলতে পারি যে, আমার পুত্রের মৃত্যুর বিনিময়ে আমি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পিতার পুত্রশোক দূর করতে…

হঠাৎ বাধা পড়লো।

পাশের একটি ভদ্রলোক আচম্‌কা নিত্যানন্দ সেন-এর কাছে এসে বললেন—এই স্লিপ্‌টা একটু দেখুন তো স্যার—

নিত্যানন্দ সেন বাধা পেয়ে বক্তৃতা থামালেন। বললেন—এখন না, পরে—

—একটি ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমরা তাকে ভেতরে ঢুকতে দিইনি। বললাম—পরে দেখা কোর, সে বললে,—না এখনই এই স্লিপ্‌টা দিন ওঁকে গিয়ে—বিশেষ পেড়াপীড়ি করতে লাগলো, মনে হলো বিশেষ জরুরী—

—কই, দেখি—

চশমাটা বার করে স্লিপ্‌টা পড়তে লাগলেন তিনি। ছোট এক টুক্‌রো কাগজ। পড়তে বেশীক্ষণ সময় লাগবার কথা নয়। কিন্তু পড়া যেন আর তার শেষ হয় না। সমস্ত সভার জনসমুদ্রের মধ্যে গুঞ্জন সুরু হলো। পল, দণ্ড, মিনিট—সমস্ত নিঃশব্দে পার হয়ে চলেছে।

নিত্যানন্দ সেন যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে গেছেন। হঠাৎ মাথায় বজ্রাঘাত হলে মানুষের যেমন হয়—এও যেন তেমনি।

হঠাৎ সোজা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

হৈ চৈ উঠলো চারিদিকে। জল আন, পাখা, বরফ, ভীড় ছাড়ো। য়্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠাও। ডাক্তার কেউ আছেন এখানে? সর্বনাশ! বাড়িতে খবর পাঠাও! বাড়িতে ওঁর কেই বা আছে এক চাকর ছাড়া! তা'হলে কী হবে? সেই কাগজের টুক্‌রোটাই বা কোথায় গেল! কী লেখা ছিল তা'তে? কোথায় গেল কাগজটা! ভীড়ের মধ্যে লোকের জুতোর চাপাচাপিতে সে কি আর আছে এতক্ষণ! কে স্লিপ্‌টা পাঠিয়েছিল—তাকে খোঁজো! কে সে? কেউ তো নেই কোথাও—। কে তা'কে দেখেছিল? কে স্লিপ্ নিয়ে এসেছিল? কী সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল কে জানে? ভীড়ের মধ্যে খোঁজা কি সহজ? গেট দাও বন্ধ করে। নইলে পালিয়ে যাবে সে! তাছাড়া পুলিসেও খবর পাঠানো হোক—।

নিত্যানন্দ সেন তখনও সেইভাবে সেখানে পড়ে আছেন।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

একজন মনীষী

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

বর্তমান জগতের যে কোন একজন বৈজ্ঞানিক-মনীষীর নাম জিজ্ঞাসা করা হলে তোমরা সবাই এক সঙ্গে হয়ত বলে উঠবে আলবার্ট আইনষ্টাইনের নাম। অন্যান্য আরও নাম-করা বৈজ্ঞানিক অবিশ্যি আছেন, কিন্তু ইনিই বর্তমান জগতের অন্যতম প্রতিভাবান বিজ্ঞান-মনীষী হিসাবে জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত।

আইনষ্টাইনের জীবন-কাহিনী ভারী মজার। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন, যাকে অতি-চলিত বাংলায় বলা হয় 'গোবর-গণেশ'। স্কুলের মাষ্টারমশাইদের কাছে তিনি ছিলেন বিরক্তির বোঝা-স্বরূপ। তাঁর মা-বাবাও তাঁকে নিয়ে বড় দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন। এমন গোবর-গণেশ ছেলেই যে কালে একজন মহামনীষী হবেন, তা' তখন আর কে জানত!

আইনষ্টাইন যার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন, সেই Theory of Relativity-র কথা তোমরা সবাই শুনেছ বোধ হয়। তাঁর এই Theory-র ব্যাখ্যা করে জগতের অন্যান্য অনেক বড় বড় পণ্ডিত মোটা মোটা বই লিখেছেন। আইনষ্টাইন কিন্তু তাঁর Theory-টি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। উদাহরণটি হ'ল এই: একটি চুল্লির কাছে একমিনিট বসে থাকলে মনে হবে বুঝি একঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যদি একঘণ্টা গল্প করা যায়, তখন মনে হবে বুঝি সবে একমিনিট কাটল। এই হলো Theory of Relativity-র মূল কথা। এই Theory-র ব্যাখ্যা করবার জন্যে অনেক পণ্ডিত মাথা ঘামিয়ে হদ্দ হলেও, আইনষ্টাইন বলেন যে, জগতের বারোজন বৈজ্ঞানিকই খালি এই Theory ভালো করে বুঝেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমাদের দেশের সত্যেন্দ্র বোস।

ব্যক্তিগত জীবনে আইনষ্টাইন অত্যন্ত সরল, নিরহঙ্কারী, সাদাসিধে এবং আমুদে। নাম-যশ-অর্থের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক বৈরাগ্য। একবার একটি trns-Atlantic জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁকে জাহাজের একটি সুদৃশ্য কামরা, যে কামরায় সাধারণ লোকেরা থাকতে পায় না, সেই কামরা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আইনষ্টাইন সে কামরায় তো থাকেনই নে, উপরন্তু বলেছিলেন যে, তিনি বরং সেই সব কামরায় থাকবেন, যে সব কামরায় অতি-সাধারণ যাত্রীরা থাকে, তবুও এ ধরণের অনুগ্রহ নেবেন না।

বেশভূষার কোন রকম আড়ম্বর তাঁর নেই। অতি সাধারণ জামা-কাপড় পরে তিনি থাকেন, টুপি কখনো ব্যবহার করেন না। তাঁর দুটো সখ আছে শুধু—একটি বেহালা বাজান, অপরটি ছোট নৌকা চালান। বেহালা বাজাতে তিনি খুব ভালবাসেন। তিনি বলেন, তাঁর জীবনের যত মধুর স্বপ্ন, যত না-বলা গোপন কথা, সব-ই ঐ বেহালার সুর-ঝংকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

তাঁর আর-ও একটা মজার খেয়াল আছে। সেটি হচ্ছে, তিনি স্নানের ঘরে প্রাণ খুলে গান করেন আর শিস্ দেন। বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এটা একটু আশ্চর্যের কথা, না ?

আরেকটা মজার কথা হচ্ছে যে, আইনষ্টাইন গায়ে-মাথা সাবান দিয়ে দাড়ি কামান। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দু'রকমের সাবান (গায়ে-মাথার জন্য একরকম সাবান, আর দাড়ি কামাবার জন্য আর একরকম সাবান) ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ তাতে জীবন জটিল হয়ে পড়ে।

আইনষ্টাইন দু'বার বিয়ে করেছেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী দু'ছেলে রেখে মারা গেলে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। ছেলে দুটির চোখে-মুখেও প্রতিভার ছাপ লেগে আছে। 'বাপ্‌কা বেটা' কিনা।

সে যাক্। আইনষ্টাইনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী Frau Einstein তাঁর স্বামী সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেছেন। তিনি ছিলেন পতিগতপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী। তিনি এই বলে গর্ব করতেন যে, Theory of Relativity ভালো না বুঝলেও, সে Theory-র আবিষ্কর্তা তাঁর স্বামীকে সব চাইতে ভালো বুঝেছিলেন, যেটা প্রত্যেক স্ত্রীর পক্ষে গর্বের বিষয়। ব্যক্তিগত জীবনে Frau Einstein স্বামীকে সর্বদা ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। স্বামীর যাতে কোনরকম কষ্ট-অসুবিধা বা অযত্ন না হয়, তার প্রতি তিনি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। দিন-রাত্তির পড়াশুনায় ব্যস্ত আত্মভোলা আইনষ্টাইনকে তিনি অনেক কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে খাওয়াতেন। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি আইনষ্টাইনের কোন খেয়ালই থাকে না।

Frau Einstein বলেছেন, যে তাঁর স্বামী মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে একটা পূর্বা-পর সামঞ্জস্য-শৃংখলা এবং সংহতি যাতে থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য থাকা কর্তব্য বলে মনে করেন। তবে ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম-নির্দিষ্ট খাতে না চলবার জন্যই তিনি উপদেশ দেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যাতে মুক্তির হাওয়া বয়, তার প্রতি তিনি বিশেষ জোর দেন। মানুষের চিন্তা-ক্ষেত্রে দু'টি নিয়ম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে বা বজায় থাকে, তার প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখতে বলেন।

একটি নিয়ম : বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম থাকবে না, অর্থাৎ আমাদের চিন্তা কোন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না।

দ্বিতীয় নিয়ম : মানুষের মতামতে নিজস্বতার স্বাক্ষর থাকবে, এবং যে মতামতে নিজস্বতার স্বাক্ষর থাকবে, সে মতামত স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত হবে, অপর কারও মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

জগতের এই মহামনীষীর জীবনে একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। সে ঘটনাটা বলে আমি এই রচনার উপসংহার টানব। একবার আইনষ্টাইন বার্লিনের কোন একটা বাসে চেপে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। কন্‌ডাক্‌টার ভাড়া চাইতে তিনি একটি নোট দেন এবং সে ভাড়া নিয়ে তাঁকে বাদবাকী পয়সা ফেরত দেয়। খানিক বাদে আইনষ্টাইন তাকে পয়সাগুলো দেখিয়ে বলেন যে, সে তাঁকে কম পয়সা ফেরত দিয়েছে, তিনি তার কাছ থেকে আরও পাবেন। কন্‌ডাক্‌টার গুনে দেখল যে, সে ঠিকই ফেরত দিয়েছে—কম দেয়নি মোটেই। তখন সে তাঁকে বললে, 'আমি আপনাকে ঠিক পয়সাই ফেরত দিয়েছি, কিন্তু মুশকিল হ'ল আপনি গুনতে জানেন না।'

জগতের এত বড় গণিতজ্ঞ বিজ্ঞানী মনীষীর পক্ষে এটা খুব মজার কথা নয় কি?

● চোখ ধাঁধানো গোলক-ধাঁধা ●
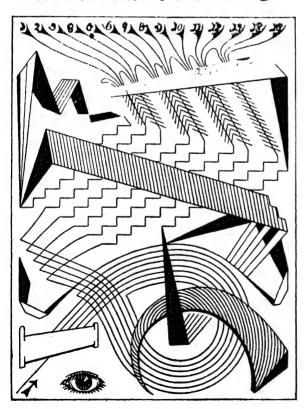
এই গোলোক-ধাঁধাটি নিছক দৃষ্টি-বিভ্রম স্থষ্টি করে বানানো। তোমার চোখের জোর কেমন, জেল্লা কতদূর—এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তার পরীক্ষা করতে পারো। বাঁ-হাতি কোণের তীর-চিহ্ন থেকে যাত্রা স্থরু করো—তীরবেগে যাবার দরকার নেই—ধীর গতিতে গেলেও চলবে—খালি চোখ দিয়ে যে কোনো একটি লাইন ধরে এগোও। সমস্তা হচ্ছে আসল লাইনটি বেছে নিয়ে, সমস্ত বাধা-বন্ধ এড়িয়ে—সিঁড়িদের টপ্‌কে যথার্থ নম্বরে গিয়ে পৌঁছনো। এর একটি মাত্র লাইনই যথার্থ নম্বরে গিয়ে যে ঠেকেছে তা বলাই বাহুল্য। নম্বরটি কি বার করো দেখি, না পারলে জবাব দেখো।

জবাব : আসল লাইন ছয় নম্বরে গিয়ে পৌঁছেচে। বাকী সব নয়ছয়।

পরিচয়

সুখের দিনে দেখা যখন
দিলে মোহন বেশে,
ভুল করেছি চিন্‌তে তোমার
বাঁশীর সুরের রেশে।
দুখের দিনে বাজ্‌ল যবে
তোমার বিজয় ডঙ্কা
চিনে নিলেম তোমায় আমি
ঘুচলো সকল শঙ্কা॥

শ্রীসুব্রত রায়

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ

একবার ঠিক হোল আমাদের বাড়ীর সকলে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে যাবে। আমার এক কাকা ছিলেন ওখানে লালবাগের A. D. M.। বেলা একটায় আমরা গাড়ীতে উঠলাম, আর মুর্শিদাবাদ পৌছলাম রাত ন'টায়। ষ্টেশন থেকে A. D. M-এর কোয়াটারে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম রাস্তার দু'ধারে নিবিড় বন। সোনিকাকু বল্লেন যে, "এই জঙ্গলের মধ্যে বাঘও থাকে।" আমরা দলে ছিলাম এগার জন। ছোট মাত্র আমরা দু'জন, আর তার মধ্যে একজন আবার নিতান্তই শিশু।

পরদিন সকালে সব দেখতে বেরোলাম। সোনিকাকু বল্লেন, এখন জাহানকোষা কামান দেখতে যাওয়া হচ্ছে। সারা রাস্তায় অসম্ভব ধুলো। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী একটা উঁচু টিলার পাশে এসে থামল। গাড়ী থেকে নেমে টিলার উপর উঠে দেখি জাহানকোষা কামান এমন কিছুই না, শুধু এক ফুট চার ইঞ্চি ব্যাস, চার ইঞ্চি পুরু লোহার পাতের তৈরী একটা একমুখ বন্ধ নল। বন্ধ দিকটা ঈষৎ মোটা, আর সেখানে অগ্নি-সংযোগের জন্য একটা ফুটো। আর একটা মজার ব্যাপার দেখলাম কামানটার পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ জন্মেছিল, এবং এখনও আছে। সেটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কামানটাকেও মাটিথেকে প্রায় দেড় ফুট তুলে ধরেছে। তার পাশে যে নৌকায় করে কামানটাকে ওখানে আনা হয়েছিল তার নোঙ্গরটাও আছে,এখানো। স্থানীয় লোকেরা এটাকে চাল-কলা দিয়ে পুজো করে। এই জায়গা থেকে মীরজাফরের বাড়ীতে গেলাম। তার পাশে যেখানে সিরাজদ্দৌল্লাকে হত্যা করা হয়েছিল

হাতে আঁকা ছবি
কুমারী ঝরণা চট্টোপাধ্যায়

সে জায়গাটিও দেখলাম। দেখে বাড়ী চলে এলাম। সেদিন ছিল সরস্বতী পূজো। সরস্বতী পূজো উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়ের মেয়েরা একটি নাটক অভিনয় করেছিল রাত্রে সেটা দেখলাম।

পরদিন সকালে ঠিক হোল যে, একটা পিকনিক হবে। সেইজন্য কয়েকজন নদীর ওপারে আজিমগঞ্জ চলে গেল। আর আমরা প্রথমে গেলাম হীরাঝিলে। সেখানে আছে সিরাজদ্দৌলা, আলীবর্দী ও লুৎফন্নেসা ইত্যাদি অনেকের কবর। তারপর সেখান থেকে গেলাম সুজাউদ্দৌলার মস্‌জিদে; তারপরে বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের ছেলে রঘু পণ্ডিতের মন্দির। এই মন্দির সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। সেটি হচ্ছে এই যে: ভাস্কর পণ্ডিত যেদিন মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন, সেদিন ছিল বিজয়া-দশমী। সেইজন্য তাঁর পুত্র রঘু পণ্ডিত তাঁকে বলেন, "বাবা, আজ বিজয়া-দশমী, তুমি আজকে তোপ দেগো না, কালকে দেগো।" কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত বলেন, "না, তা হতে পারে না, কারণ আলীবর্দী সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসছে,

হাতে আঁকা ছবি
শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী

দেরি করলে সে এসে পড়বে; তখন মুশিদাবাদ জয় করা কঠিন হবে।" তখন রঘু পণ্ডিত বাধা দেবার ইচ্ছায় তোপের মুখে গিয়ে দাঁড়ায়।

হাতে আঁকা ছবি
শ্রীরত্না রায়

ফলে তোপ দাগবার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তখন তার স্মৃতিতে-ভাস্কর পণ্ডিত ঐ মন্দির নির্মাণ করেন। সেখান থেকে গেলাম রাণী ভবানীর মন্দিরে। সেখানকার সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখলে অবাক হতে হয়। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আজিমগঞ্জ পৌঁছলাম বেলা সাড়ে চারটায়। সেখানে গিয়ে দেখি সবার খাওয়াদাওয়া শেষ, শুধু আমরা বাকী। ভাগ্যিস্ আমাদের জন্য কিছু রেখেছিল তারা, নইলে উপোস করে থাকতে হ'ত! সেখান থেকে খেয়ে-দেয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে দেখতে গেলাম মোতিঝিল। সেখানে একটা প্রকাণ্ড পাথ-রের সিন্দুক আছে, সেটা খোলা যায় না। তারপর গেলাম মুর্শিদকুলি খাঁর মসজিদে। তার সিঁড়ির তলায় মুর্শিদকুলি খাঁ ও তার মেয়ের কবর আছে। মসজিদটার চারদিকে চারটা প্রকাণ্ড উঁচু মিনার। আমি সিঁড়ি দিয়ে একটাতে উঠলাম। দুপুরে নবাবের প্রাসাদের অস্ত্রাগারে তিন ইঞ্চি লম্বা পিস্তল, আকবরের বর্ষা, নাদির-শার বল্লম, মোহনলালের কামান ইত্যাদি দেখলাম। রাত্রে বহরমপুর যাবার পথে একটা চিতাবাঘও দেখলাম। তারপর রাতের গাড়ীতে ফিরে এলাম কলকাতায়।

শ্রীঅমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

❋ ছবি ও লেখা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ❋

প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নং অবশ্য দেবে। ফেরত পেতে হ'লে সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দিয়ে দেবে। ছবি মোটা কাগজে চাইনীজ ইংক্-এ এঁকে পাঠাবে। গল্প ও অন্যান্য রচনা যথাসম্ভব ছোট হওয়া চাই।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কিন্তু শম্ভু যা আশঙ্কা করেছিল তেমন কিছুই ঘটল না। নিরুপদ্রব নিদ্রায় রাত ভোর হোল। শুধু সে রাতই বা কেন কয়েকটা দিন বেশ আরাম-স্ফূর্তিতেই কাটল, অথচ শম্ভু যে রকম ঘাবড়ে গেছল, ভয় ভয় করছিল, তাতে মনে হয়েছিল সেই রাত্রেই চুরি-বাটপাড়ি কি জানি কি ঘটে যায়। এই নিয়ে অবশ্য বিজু আর অমল ওকে ঠাট্টা-তামাসা করতেও ছাড়ল না। বিজুরই যেন সবচেয়ে বেশী মজা লাগছে। যাই বল, বিদেশে থাকতে হ'লে ভাল মেস, নয়তো ভাল হোটেল। খাওয়াদাওয়া ভাল। বেশ স্বাধীনভাবে থাকাও যায়। বাড়ীর আরাম আছে, কিন্তু হুকুম-মাফিক চলার ঝামেলা অনেক। এখানে ওসব নেই. বরং ঠাকুর চাকরের ওপর হুকুম চালাও, ছোট-খাট দরকার পড়লে এটা-ওটা আনিয়ে নাও। আত্মীয়স্বজনের বাড়ী আবার মানুষে ওঠে, ছোঃ! শম্ভুর পিসীর বাড়ীর কথা মনে হলে বিজুর যেন আজও গা ঘিন ঘিন করে। কিন্তু হোটেল-মেসও যে কেবল আরামের আস্তানাই নয়, সে কথা টের পেল সেদিন দুপুরে। নাওয়া-খাওয়ার ডাক একবার পড়েছে কিন্তু ওরা তখনও উঠি উঠি করছে। অমল আর বিজু বসেছে চৌকির ওপর। আর শম্ভু চিৎ হয়ে আছে একটা পুরান ক্যাম্প-চেয়ারে। হীরালালবাবুর দৌলতে ওটা ফালতু পাওয়া গেছে।

বেরোবার মুখে হঠাৎ হীরালাল ঘরে ঢুকে তিন বন্ধুকে ডেকে বলল, 'বেশ এখনও বসে গল্প করা হচ্ছে। যাও এইবেলা সব খেয়ে নাওগে। হোটেলে এবেলা স্পেশাল মাংস হয়েছে, জুড়িয়ে গেলে কিন্তু ঠকবে। চট্‌পট্ উঠে পড় সব। হ্যাঁ ভাল কথা। গোটা তিরিশেক টাকা হবে তোমাদের কারো কাছে ?

তিন বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দলের হয়ে শম্ভু বলল, 'না অত টাকা তো হবে না। কেন বলুন তো ?'

হীরালাল একটু ভ্রূ কুঁচকাল, তারপর হেসে বলল, 'হোটেলের নিয়ম কিছু টাকা এ্যাডভান্স দিতে হয়। যাকৃগে নেই তো নেই। আমি যখন রয়েছি বলে দেবখন পরে যখন হয় দিলেই চলবে।' বলে হীরালাল আর দাঁড়াল না, সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু হীরালালের ভরসায় ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। আজ না হোক দু'দিন বাদে আবার টাকার কথা উঠবে, তখনই বা ওদের কাছে টাকা আসবে কোত্থেকে ? ওদের কাছে যা আছে তা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, সব মিলে, টাকা পনের হতে পারে। কিন্তু তাতে আর ক'দিন। থাকার মধ্যে তো হার আছে এক-ছড়া অমলের কাছে। তাতে তো হাত দেওয়া যাবে না। এদিকে হোটেলের দেনা দিন দিন বেড়েই চলবে। তারও যে রেটটা কি হিসাবে বাড়বে তারও কিছু হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তবে খাওয়া দাওয়ার যা বহর তাতে যে দু'দশ, টাকায় চুকবে তাও নয়। ব্যাপারটা সত্যি এবার ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

ভাবনার কথাটা শম্ভুই তুলেছিল আবার শম্ভুই ওদের ভরসা দিয়ে বলল, 'অত ভাবছিস কেন। চেষ্টা করলে কি একটা চাকরি-বাকরি আমরা জুটিয়ে নিতে পারব না।'

বিজুর কিন্তু কথাটা ভালো লাগলো না। বেড়াতে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চাকরি ? তা'হলে আর বেড়াবার আনন্দ রইল কোথায় ? তাছাড়া চাকরির বয়স কারই বা হয়েছে। চাকরি করে ওর দাদারা, করে মেজকাকা। তাঁরা কত পড়াশুনা করেছেন, পাশ পরীক্ষা দিয়ে তবে তো চাকরিতে ঢুকেছেন। সে এখনই কি চাকরি করবে ? শম্ভুর মত ঐ ধরণের দোকানের কাজ। সে তা মরে গেলেও করতে পারবে না।

তাই শম্ভুর প্রস্তাবে সে মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'দূর চাকরি করার জন্য এসেছি নাকি এখানে ? তুইও যেমন !'

শম্ভু বলল, 'নবাব ! কাজকর্ম না করলে এখানে চলবে কি করে ? এতো আর নিজের বাড়ী নয়। বড়লোক বাবা-কাকাও নেই যে মাসে মাসে পকেট খরচ যোগাবে।'

অমল বাধা দিয়ে বলল, 'তুই থাম শম্ভু। চাকরি-বাকরি যাই হোক একটা কিছু যে না করলে আর চলবে না সে যেন বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে বিজুকে ধমকালে কি হবে, ও চাকরি করে এনে খাওয়াবে ! তুইও যেমন—সে যদি করতে হয় তো তোকে-আমাকেই করতে হবে !'

ভাবনাটা ওদের ঘাড়ে চলে যাওয়ায় মনে মনে বিজু বেশ খুসী হয়ে উঠল। বলল, 'চল এবার খাওয়াদাওয়া তো সেরে নি।—ঠিকই বলেছিস, যাহোক একটা কিছু ভেবে-চিন্তে ঠিক করে ফেলতে হবে আজই।'

শম্ভু হেসে বলল, 'তোর তো কেবল খাওয়ার চিন্তা।'

কথাটা ঠিক নয়। আগে-পিছে চিন্তা করলেও, খায় বিজু নিশ্চিন্তে। সেদিনের খাওয়াটা বেশ জুৎসই হ'ল। ডাল তরকারির পরও বিজু দু'প্লেট মাংস টানল। পাশে বসে শম্ভুর অবশ্য চোখ টাটাচ্ছিল, ভাবনা চিন্তার মগজ নিয়ে কি করে যে মানুষে এভাবে খায় ও ভেবে পায়না। শম্ভুর হঠাৎ মনে হ'ল এই আপদটাকে জুটিয়েই যত জ্বালা। যেখানে গিয়ে উঠছে সেখানেই একটা-না-একটা ঝঞ্ঝাট এসে জুটছে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে ওরা যখন ঘরে ফিরে এল মেস তখন নিঃঝুম হয়ে গেছে। কেবল নিচে হোটেলের ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। বাইরের একটা লোকের সঙ্গে কিসের হিসেব নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল সে। সেদিকে কান না দিয়ে ক্যাম্প-চেয়ারে গা ছেড়ে দিল বিজু। বাইরে কড়া রোদ, বড় রাস্তা বেশ একটু দূরে বলে গাড়ী-ঘোড়ার আওয়াজ আসছে না। সব কিছু মিলিয়ে কেমন যেন একটা ঝিমন্ত ভাব। অমল আর শম্ভু চুপচাপ চেয়ে থাকলেও বিজুর এরই মধ্যে একটু ঢুলুনি আসছিল। খাওয়াটা একটু বেশী হয়ে গেছে। পেটের গেঞ্জি টান হয়ে উঠছে।

খানিক বাদে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হ'ল, দেখা গেল ঠাকুর একেবারে উপরে উঠে এসেছে। জাতে উড়ে হলেও কথাবার্তা চেহারায় একেবারে বাঙালী বনে গেছে। লম্বাচুলে সৌখীন ছাঁট। বেশ পোক্ত মজবুত চেহারা, ঠাকুরে ঠাকুর, চাকরে চাকর, আবার হোটেলের বার আনা মালিকও সেই। ঘরে ঢুকেই বিজুর দিকে চেয়ে বলল, 'ঘুমুলেন নাকি বাবু, আপনাদের টাকা কিছু জমা দিতে হবে আজই।' ওদের মধ্যে বিজুকেই সে আসল বাবু ঠাউরেছে।

চোখ না খুলেই বিজু বলল, আজ বলে তো এক্ষুণি আর নয়। এখন একটু ঘুমুতে দাও বাবা, যা বলবার বিকেলে এলে বলো।' ঠাকুর খেঁকিয়ে উঠল, 'টাকা দেবেন, তার আবার সকাল বিকেল কি? সকালে হীরালাল দা' বলে যায়নি আপনাদের?'

বিজু বলল, 'বেশ তো হীরালাল দাকেই দেব। তার কাছ থেকেই নিও।'

'কেন মালিকের হাতে দিতেই বা আপত্তি কিসের?'

'মালিক কি তুমি নাকি?' বিজু চোখ মেলে বলল।

ঠাকুর বলল, 'আপনি বুঝি সেটা আজও ঠাওর পাননি? খাচ্ছেন দেখি সাতদিন ধরে।'

বিজুর আর সহ্য হ'ল না। ভারী তো হোটেলওয়ালা তার আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। ইচ্ছে হ'ল পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে মারে দু'চার ঘা, ক্যাম্প চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল।

'যা পাবিনে টাকা। যা পারিস করগে।'

৬

শম্ভু আর অমল হৈ হৈ করে উঠল, 'ওকি হচ্ছে বিজু, ছিঃ ছিঃ ঠাকুরের সঙ্গে আবার কেন লাগতে যাচ্ছিস, হীরালালবাবু শুনলে কি ভাববেন বলত ?'

ঠাকুর আর সেখানে দাঁড়াল না। যাওয়ার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে কেবল শুনিয়ে গেল। এ্যাড্‌ভান্সের তিরিশ টাকা আজকের মধ্যে না পেলে সেও দেখে নেবে এ হোটেলে কেমন করে ওদের আর খাওয়া জোটে।

বিজু কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইল, তারপর সার্টটা গলিয়ে বেরোবার আয়োজন করল। শম্ভু বলল।

'কোথায় চললি ?'

'দাঁড়া আসছি এক্ষুণি' বলে বিজু সিড়ি দিয়ে নামতে লাগল। কিন্তু শম্ভু ওকে একা ছেড়ে দিতে ভরসা পেল না। অমলকে বসতে বলে সেও পিছনে পিছনে চলল।

খানিকটা চলার পর বিজু কথা বলল, 'খোঁজ দেখি স্যাকরার দোকান কোথায় আছে।'

শম্ভু বলল, 'কেন কি করবি !'

বিজু জবাব দিল, 'আংটিটা বেচে দেব—ঘেন্না ধরে গেছে। সব সওয়া যায় জানলি শম্ভু, ছোটলোকের কথা সওয়া যায় না।'

'তাই বলে হাতের আংটি বেচে দিবি।'

'তা নয়ত কি ? নইলে কি ফের আবার ওদের কাছে অপমান হতে বলিস। হাতের আংটিটাই বড় হ'ল, তিন জনকে শুনিয়ে যে যা নয় তাই বলে গেল সেটা কিছু নয় ?' তাছাড়া তোরাই বা রাতারাতি টাকা পাচ্ছিস্ কোথায়। তিনজনে যখন একসঙ্গে বেরিয়েছি আর আছে যতক্ষণ। আংটি আমার হাতে থাকলেও আংটি তো কেবল আমার না। তিনজনেরই।'

বেশী খোঁজ করতে হ'ল না। স্যাকরার দোকান একটা আগেই দূর থেকে ওদের দেখা ছিল। হীরালাল যে দোকানে চা খায় তা থেকে অনেকটা এগিয়ে গেলেই সে দোকান। বুড়ো গোছের একটা লোক জোড়াসন হয়ে নিক্তি সামনে করে বসে আছে। হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত কাপড় তোলা, চোখে কালো ফ্রেমে বাদামী চশমা। মাথায় টাক। পাকা গোঁফে দু'ঠোঁটই ঢেকে আছে, কথা বললে মনে হয় গোঁফই বুঝি কথা বলছে।

সব শুনে বুড়ো বলল, 'কিন্তু এ আংটি তোমরা পেলে কোথায়, বেচবেই বা কেন।

বিজু বলল, 'পাব আবার কোথায় ? বাপ মা পরিয়ে ছিল সখ করে। দেখছনা আঙুল থেকে খুলেছি এই মাত্র। দাগ রয়েছে, সত্যি আংটিটা একটু আঁট ছিল বিজুর হাতে। ওর মাঝের আঙুলে দাগ কেটে আছে।' ফের বলল, 'জিনিস তো সখের কিন্তু এখন তো যায়।'

'যায় কেন ?'

তার জবাব দিল শম্ভু।

যাবেনা। বেড়ান-টেড়ান দেখাশানা শেষ করে কলকাতা ফিরে যাওয়ার সময় যখন হ'ল, পড়বি তো পড় ঠিক যাওয়ার মুখে বন্ধু পড়ল জ্বরে, আর আজকাল এখানকার জ্বর মানে তো টাইফয়েড, জ্বর হয়ে আর ছাড়বার নাম নেই। বাড়ীতে টেলিগ্রাম অবশ্য গেছেই কিন্তু টাকার অপেক্ষায় তো রোগ বসে থাকবেনা, ডাক্তারও সবুর করবে না।

রোগ, ডাক্তারের কথা শুনে বুড়ো আর কথা বাড়াল না। আংটির ওজন করল, ওজন হ'ল ছ'আনা তিন রত্তি। দাম ক'ষে বের করল আটত্রিশ টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। ওরা আর দেরি করল না, কি জানি আবার কে কোথায় দেখে ফেলে ফ্যাসাদ বাঁধাবে।

কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলই, কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম ভেঙে ছিল !

ফিন ফিনে ধুতি পাঞ্জাবী পরা, ব্যাকব্রাস করা খুব ফর্সা রঙয়ের এক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বিজুকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন, বিজুর চিনতে দেরি হ'ল না; মেজকাকা, কিন্তু মেজকাকা এখানে কেন ? উনি তো দিল্লীতে ইঞ্জিনিয়ার। দু' মাস আগেও দিল্লী থেকে বাবাকে চিঠি দিয়েছিলেন। সে চিঠি বিজু দেখেও এসেছে, উনি এখানে কেন ? তবে কি তিনি ধারেকাছে কোথাও বদলি হয়ে এলেন ? না বেড়াতে এলেন কাশীতে ? হয়ত তাই হবে। মেজো কাকীমার পিসেমশাই না কে যেন কাশীবাসী হয়েছেন, সে নাম বিজুর মনে এলোনা। যাকৃগেক ওসব ভাববার সময় নেই এখন। চট্‌করে পকেট থেকে নোটগুলো ও শম্ভুর হাতে পার করে দিল।

মেজকাকা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কিরে তুই এখানে ?'

মনে মনে বিজু ভাবছিল, তুমিই বা এখানে কেন, কিন্তু সেকথা তো আর বলা যায় না। বিজু একটু হাসবার চেষ্টা করল, 'এই এলাম একটু বেড়াতে। ওদের সাথেই এসেছি, একা আসিনি। এই বলে শম্ভুকে দেখিয়ে দিল।

মেজকাকা ধমকে উঠলেন, একটু বেড়াতে তুমি কাশী এসেছ ? না পালিয়ে এসেছিস বল ঠিক করে।'

বিজু জবাব দিল না।

মেজকাকা আবার ললবেন, 'চল আমার সঙ্গে, যা শোনবার বাসায় গিয়েই শুনব।'

বিজু প্রতিবাদ করল, 'কিন্তু ওরা রয়েছে যে, তাছাড়া আমার জামা কাপড় সেগুলি ওতো মেসে পড়ে রইল।'

মেজকাকা বললেন, 'থাক্, 'সে সব আমি শঙ্করকে দিয়ে পরে আনাব। তোকে আর যেতে হবে না।' তিনি একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

শম্ভু আর বিজুতে চোখাচোখি হ'ল একবার, কিন্তু কথা আর হ'ল না, শম্ভু ফিরে এল।

(ক্রমশঃ)

বিস্মৃত পৃথ্বী

শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

চলে গেছে যারা জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে
চলে গেছে যারা সকল গরল পিয়ে
ভুলেছি তাদের ভাই।

চলে গেছে যারা কালের সে পথ ধরে
বারেক তবে কি পৃথিবী তাদের স্মরে
যাদের জ্ঞানের অন্ত নাই।

চলে গেছে যারা আলোক চিহ্ন রেখে
জগত কি ভাই চলবে না দেখে দেখে
থাকবে শুধুই অন্ধকারে ওরে!

রেখে গেছে যারা রক্তের আলপনা
জগত কি ওরে সে পথ মানবেনা
থাকবে শুধুই অন্ধকারে মরে।

চলে গেছে যারা কীর্তিরে রেখে পিছে
বসুমতী তায় এখনও ডুবিছে মিছে
বসিয়া আঁধার মাঝে!

দিয়াছিল যারা নূতনের সন্ধান
জগৎ কি তায় হবে নাক গরীয়ান
ভুলেছে তাদের মিথ্যা সাজে।

ওরে ও বসুধা জ্বালাবে আলোক
অন্ধকারের মাঝে
ওরে ও জগত সাজ পুনরায়
পুরাতনী সেই সাজে।

ওরে ও! পৃথিবী নূতন করিয়া
জ্বালারে জ্ঞানের আলো
নিজের পূণ্যে হ'রে গরীয়ান
দেখিবি আসিবে ভালো।

নতুন বই

সমালোচনার জন্ত দু'খানি বই পাঠাবেন

ছোটদের কবিতা শেখা—শ্রীসুনির্মল বসু। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : ১৷৹

কবি হিসাবে, বিশেষ করে ছোটদের জন্য কবিতা লেখায় সুনির্মল বাবুর নাম সুপ্রসিদ্ধ। কাজেই ছেলেদের কবিতা লেখা শেখাবার অধিকার তাঁর আছে। এই বইটি সেদিক থেকে যেমন নতুন, তেমনি কবিতা শেখার দিক থেকে বিশেষ উপযোগী। কি করে মিল দিয়ে কবিতা লিখতে হয়, কত রকমের ছন্দ আছে, উচ্চারণ দোষে কবিতা কেন পড়া হয় না, এই সকল বহু বিষয় সুন্দর ভাবে বইটির মধ্যে ধরে দেওয়া হয়েছে। যারা কবিতা লেখা শিখতে চায় তাদের পক্ষে এ বইটি অবশ্য পাঠ্য। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

যে গল্পের শেষ নেই—(দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য : ২৲

ইতঃপূর্বে 'যে গল্পের শেষ নেই' বইখানির প্রথম খণ্ড আমাদের কাগজে সমালোচিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডটিতে পৃথিবীর জন্ম ও গ্রহ উপগ্রহ কি ক'রে হ'ল, পৃথিবীর জল মাটি ও পাহাড়ের সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে, জলজ, স্থলজ প্রাণীর জন্ম বৃত্তান্ত কথা ছিল। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে আরম্ভ হয়েছে মানুষের জন্ম, তার জ্ঞান বৃদ্ধি, শিল্পবোধ ও বিষয় প্রভৃতি বুদ্ধি প্রভৃতির কথা। জটিল ইতিহাস ও জীববিদ্যার-বিষয় লেখকের লেখার গুণে যেমন হয়েছে সহজবোধ তেমনি সুখপাঠ্য। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এমন একটি বই পড়া উচিত।

ছড়ায় ছবিতে জানোয়ার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ হইতে প্রকাশিত। ৩২এ, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য : ১৲

শিশু সাহিত্য সংসদের এই বইগুলি ছোটদের সাহিত্যে এক নবরূপ দান করেছে বললেও বেশী বলা হয় না। বিদেশী এই ধরণের বইগুলির তুলনায় এই বইখানি কোন অংশে কম নয়। ছোটদের সঙ্গে কয়েকটি বিখ্যাত জীবজন্তু যথা—বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার, শাপ, কুমীর, জলহস্তী, উঠ, হরিণ, গরিলা, ক্যাঙারু প্রভৃতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় করিয়ে দেবার জন্ম অফ্‌সেটে ছাপা সুন্দর ছবির সঙ্গে শ্রীসুনির্মল বসুর কবিতাগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। অল্প মূল্যে এ ধরণের মূল্যবান ছবির বইয়ের নিশ্চয়ই বহুল কাট্‌তি হবে।

নাগওয়ার অভিযোগ—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। গুপ্ত প্রকাশনী, ৮ গুপ্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

ছেলেদের রচনায় কৃতী-লেখক বিশু মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি রোমাঞ্চকর ও অলৌকিক গল্পের সুন্দর একটি ডালি-বলা যায় এই বইখানিকে। শুধু ছোটরা কেন বড়রাও এ বইখানি পড়ে অনাবিল আনন্দ পাবেন। ভেতরের ছবিগুলিও সুন্দর।

আমাদের কথা

দেখতে দেখতে এই এই সংখ্যার সঙ্গে আমাদের বছর শেষ হয়ে গেল। কত কথা-কাহিনী, কবিতা-গাথা, ইতিহাস-বিজ্ঞান, ও বহু বিচিত্র জিনিস সাধ্যমত পরিবেশন করার চেষ্টা করলুম আমরা তোমাদের নানা জনের রুচি অনুযায়ী। কত অনুযোগ, অভিযোগও শুনলুম। সবাইকে খুশি করা ত আর সম্ভব নয়!

কিছুদিন ধরে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখার যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, তা থেকে ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে মৌচাকে ছাপা হচ্ছে এবং আরও হবে। আগামী বছরের শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসে কয়েক বছর পূর্বের মত আমরা কেবল তোমাদের জন্য একটি 'গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা' বার করব স্থির করেছি। ঐ সংখ্যায় কেবল তোমাদেরই লেখা থাকবে এবং ঐ সংখ্যার লেখাগুলির মধ্যেই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। বাকী পুরাতন অন্যান্য সব রচনাই বতিল বলে গ্রাহ্য হবে।

এই সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে যাদের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা শেষ হ'ল, তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মনিঅর্ডার যোগে আগামী বছরের টাকাটা পাঠিয়ে দিলে বৈশাখের কাগজ পেতে অসুবিধা বা দেরি হবে না। আর যারা কোন কারণে গ্রাহক থাকতে চাও না, তারা একটি পোষ্ট কার্ড দিয়ে জানিয়ে দিলে আমরা তাদের নামে মিথ্যা ভিঃ পিঃ পাঠিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হব না। যারা টাকাও পাঠাবেনা এবং পত্রও দেবে না, তাদের নামে অগত্যা আমরা ভিঃ পিঃ করেই নববর্ষের প্রথম সংখ্যা পাঠাব। বর্ষ-শেষের এই বিদায়-বাণীর সঙ্গে আমরা তোমাদের কাছে আমাদের অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটির জন্য মার্জনা চাইছি।

ফটো প্রতিযোগিতার কথা

গত বৈশাখ থেকে প্রতিযোগিতার ছবিগুলি আমরা যথাসম্ভব ছেপে চলেছি, কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশই অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে যাওয়ায় এবং বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এ সম্বন্ধে আপত্তি করায়, আমরা বাধ্য হয়ে এই সংখ্যার সঙ্গেই প্রতিযোগিতার ফটো ছবি ছাপা বন্ধ করে দিলাম। প্রথম দিকে কত ছবি আসবে তা আমরা সঠিক আন্দাজ করতে পারি নি, এবং তা করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু শেষের দিকে ছবির পরিমাণ এত বেশী আসতে আরম্ভ হ'ল যে, আমাদের পক্ষে তার যথাযথ ব্যবস্থা করাই হয়ে উঠল অসম্ভব। সে জন্য শেষের দিকে সকল ছবিগুলির উপর আমরা সুবিচারও করে উঠতে পরিনি, এবং বহু মনোনীত ছবিও ছেপে ওঠা সম্ভব হ'ল না। আশা করি আমাদের আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, তারা অবস্থাটা বিবেচনা করে আমাদের এই ব্যবস্থা সমর্থন করবেন।

যে ছবিগুলি এই সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হ'ল, সেই ছবিগুলির মধ্যেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসেই এই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

যে সকল ছবির সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেওয়া আছে সেগুলি যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা ফেরত দিতে আরম্ভ করেছি এবং আশা করছি বৈশাখ মাসের মধ্যেই সমস্ত ছবি আমরা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে পারব। যাঁরা সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেননি পরে পাঠাতে পারেন অথবা লোক পাঠিয়ে ছবি ফেরত নিতে পারেন।

মধুচক্র

...বারোটি মাস ঘুরে ঘুরে একটি বছরকে প্রদক্ষিণ করে এসে থামলো নূতনের দুয়ারে। বর্ষ শেষ হলো, নতুন বছরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে দিকে দিকে। পুরাতনের বিদায়, নতুনের সুরু—আজ এসো নতুন দিনের পৃথিবীতে নব-সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে বলি—স্বাগতম!

নতুক বছর শুভ হোক, মঙ্গল হোক—তার বলিষ্ঠ নবীন স্পর্শে আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা—বিশেষ করে যারা শহরে আছে, তাদের জীবনযাত্রা সত্যই দুর্বহ হয়ে উঠেছে। বাড়ীতে বড়দের মাঝে অনাবরত শুনি 'নেই' 'নেই' শব্দ। চাল ডাল র‍্যাশান কিছুই কুলোয় না—এই চিন্তা প্রতিপালকদের দুর্ভাবনায় ফেলেছে—তার সুর অনবরত আমাদের কানে আসছে—এও ক্রমশঃ সহ্য হয়ে এলো—এর উপর আবার শহরতলীতে যা উপদ্রব সুরু হয়েছে, তা তোমরা অনেকে হয়তো কাগজে পড়ছো। সাম্প্রতিক একটি ঘটনা বলি, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে একটি ছোট মেয়ে তার দিদিমার সঙ্গে গিয়েছিল মেলায়, যাবার পথে একটি মলিন কাপড় পরা লোক তাদের সঙ্গ নেয়, দিদিমা সেই লোকটিকে দেখলেও কোনো সন্দেহ মনে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের জন্য যখনি তিনি প্রবেশ করেন পিছনে ছোট নাতনীটিকে আর দেখতে পান না। হঠাৎ তাঁর সন্দেহ হয় সেই মলিন পোষাকের লোকটিকে, সে একটা ছোট ঢোল বাজিয়ে আসছিল। তখনি তিনি খোঁজ খবর সুরু করেন—কিন্তু মেয়েটিকে পান না। ইতোমধ্যে মুখে মুখে কিছুটা খবর ছড়িয়ে পড়ার জন্য—মন্দির থেকে অনেক দূরে এক রাস্তায় কোন গৃহস্থের বাড়ীর একজন লোক দেখে—দরিদ্রের বেশে একটি লোক ঢোল বাজিয়ে চলেছে, তরে পিছনে একটি মেয়ে যন্ত্রচালিতের মত চলেছে। লোকটি এবং আরো কয়েকজন লোক গিয়ে মেয়েটির হাত ধরতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মেয়েটি ও সেই ঢোলক বাজান লোকটিকে থানায় আনা হয়।

শোনা যায় ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে এইসব দুষ্টু লোকেরা ছোট ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে যায়—পরে তাদের দিয়ে তাদের দুষ্ট অভিষ্ট সিদ্ধ করে। সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা বলি ছেলেধরা। অনেক সময় লজেন্স বা খাবারদাবারের লোভ দেখিয়েও দুষ্টু লোকেরা ভুলিয়ে নেয়—এ কাহিনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি, কিন্তু ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে ছেলেমেয়ে চুরির কাহিনী নতুনত্ব বটে। যাই হোক তোমরা যারা এ খবরের সঙ্গে পরিচিত হলে বা আগেই হয়েছ—তারা বেশ ভালো ভাবেই সাবধানতা অবলম্বন করিবে। স্কুলে বা এদিক ওদিক যাওয়া আসা তো করতেই হবে,

তাই যতখানি সম্ভব সতর্ক থাকবে। কোলকাতা শহরে এতদিন বাস ট্রাম, মোটর ইত্যাদির জন্য পথচারীকে সাবধান করতে হতো—এখন আবার অন্য উৎপাতও এসে ঘিরেছে। তাছাড়া ছেলেমেয়ে চুরি করে ব্ল্যাকমেল করার খবরও আমরা সংবাদপত্র মারফৎ পাচ্ছি। ছেলে চুরি করে তার আঙ্গুল কেটে বাপ মাকে পাঠানর করুণ মর্মন্তুদ কাহিনীও সেদিনের খবর—কাজেই তোমরা খুব সাবধানে থাকবে এইজন্যই এত কথা বলা।

তোমাদের যাদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা ছিল, তারা অনেকেই মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছ—কেমন? আশাকরি ভালই হয়েছে পরীক্ষা। গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ এখন কাটতে চাইবে না। যারা গ্রামে আছো তাদের ও যারা শহরে আছো তাদেরও বলি এসময় কিছু ভালো বই পড়ো এবং সম্ভব হলে পল্লীতে পল্লীতে সংগঠনী কাজও কিছু করো—এটা খুব দরকার। তবে শহরের ছেলেমেয়েরা গ্রীষ্মের ছুটিতে অনেক সময় বাইরে যায়—গ্রামে আম কাঁটালের নিমন্ত্রণ ও আসে—এসবের মধ্যেই কাজ করা যায়। তাই এ-কথা সব সময় মনে রেখো 'আত্মশক্তি' জাগাতে হবে, তা না হলে আমরা পেছিয়ে পড়ে থাকবো। তোমাদের কার কি ইচ্ছা আমায় জানিও।

এবারের এই মজার খেলাটি তোমাদের জন্য পাঠিয়েছে রুণু, রাণা ও গোপা দত্ত বহরমপুর থেকে—

'ঘরে বসে জানলার কাঁচ দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে পারো—যতদূর চোখ যায় কেবল বরফ আর বরফ। কোথায় এমন তুষার ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে—ও যে মাটির উপর ঢেউ খেলে যায় বরফ কাহার দেশে'। সূর্যের আলো যখন সেই বরফের উপর ঝকমক করে সাত রঙে বিভক্ত হয়ে যায় আর চাঁদের আলো যখন সেই বরফের উপর মুক্তোর মত দাঁত বার করে হাসে, তখন সে যে কি অপূর্ব স্বপ্নের মত মনে হয়। যে দুধ সাগরের কূলে এসে পৌঁচেছি, তার ওপারে রাজকন্যার ঘুমন্তপুরীর দেউড়ীতে পর্বত পাহারা দিচ্ছে, পর্বতের পাগড়ীতে সাপের মাথার মণির মত জ্বলছে আকাশের যত তারা…।"

বলো, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে আর কার লেখা এটি?

তোমাদের চিঠির জবাব—**মৈত্রেয়ী দত্ত**, (বহরমপুর)—চিঠি যে পেয়েছি বুঝতে পারছো, কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর অত চট করে বলা যায় না যে ভাই! **উষাপ্রসন্ন, সবিতৃপ্রসন্ন** ও **সুভদ্রা মুখোপাধ্যায়**, (গোরবডাঙ্গা)—তিন জনেই তোমরা খুব ভালো—তবে দাদাকে বেশী প্রশংসা করা হলো লেখার জন্য বলে তোমাদের আনন্দ হওয়াই উচিত—নয় কি? দাদার মত তোমরাও লিখতে পারবে আবার। উষা! তোমার প্রতিভা উষার আলোর মতই ছড়িয়ে পড়ুক।

তোমাদের মধুদি—**ইন্দিরা দেবী**

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক কলিকাতা, ১৪, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।